রবিজীবনী

প্রশান্তকুমার পাল

রবিজীবনী

প্রশান্তকুমার পাল

রবিজীবনী

নবম খণ্ড

১৩৩০–১৩৩২

প্রশান্তকুমার পাল

শ্রীরুদ্রপ্রসাদ চক্রবর্তী
প্রিয়বন্ধুবরেষু

মুখবন্ধ

রবিজীবনীর নবম খণ্ড প্রকাশিত হল। ১৩৩০ থেকে ১৩৩২ বঙ্গাব্দ [1923–1926]— রবীন্দ্রজীবনের তেষট্টি থেকে পঁয়ষট্টি— তিনটি বৎসর এই খণ্ডের উপজীব্য। পূর্ববর্তী কয়েকটি খণ্ডের সঙ্গে তুলনায় খণ্ডটি প্রকাশিত হয়েছে মাত্র দু'বৎসর বিরতির পরে, শান্তিনিকেতন রবীন্দ্রভবনের দায়িত্ব থেকে মুক্তি এই সুযোগ সৃষ্টি করেছে — এর জন্য বর্তমান কর্তৃপক্ষের কাছে লেখক অপরিসীম কৃতজ্ঞ।

এই মুখবন্ধে নূতন কথা বিশেষ কিছু বলার নেই। যথারীতি লন্ডনের কৃষ্ণা দত্ত ও অ্যান্ড্রু রবিনসন, জার্মানি-শান্তিনিকেতনের ড মার্টিন কেম্পশেন, রবীন্দ্রভবনের ড গৌরচন্দ্র সাহা, সুপ্রিয়া রায়, শান্তশঙ্কর দাশগুপ্ত, দিলীপ হাজরা, আশিসকুমার হাজরা, উকিল রায়, সুশোভন অধিকারী, তুষারকান্তি সিংহ, উৎপল মিত্র, জ্যোৎস্না চট্টোপাধ্যায় ও আরও অনেকে সর্ববিধ সাহায্য দিয়েছেন। কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের স্বপনকুমার ঘোষের সহায়তাও স্মরণীয়। বন্ধুবর অনাথনাথ দাসের কাছে পেয়েছি বেশ-কিছু দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ, পুস্তিকা ও পত্রিকা। 'সুবর্ণরেখা'র ইন্দ্রনাথ মজুমদার কলকাতা ও শান্তিনিকেতনের মধ্যে পত্রদূতের কাজ করেছেন, তাঁর সাহায্য ছাড়া শান্তিনিকেতনে বসে বই প্রকাশ করা যে কত কঠিন ভুক্তভোগী মাত্রই তা জানেন।

খণ্ডটি উৎসর্গ করেছি আমার কলেজের দীর্ঘকালের সহকর্মী ও সর্বব্যাপারে ঘনিষ্ঠ উপকারী বন্ধু রুদ্রপ্রসাদ চক্রবর্তীকে। তার সঙ্গে আমার সম্পর্ক ব্যাখ্যার অতীত।

প্রশান্তকুমার পাল

১ পৌষ ১৪০৯

'গুলঞ্চ', অবনপল্লি

শান্তিনিকেতন – ৭৩১২৫

দূরভাষ : (০৩৪৬৩) ২৫৩৮২৩

ই-মেল : praspaul@vsnl.com

praspal@sancharnet.in

পাঠ-নির্দেশ

এই গ্রন্থ রচনায় রবীন্দ্রনাথ-লিখিত পুস্তকের ক্ষেত্রে সাধারণভাবে বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ-কর্তৃক প্রকাশিত রবীন্দ্র-রচনাবলী-র বিভিন্ন খণ্ড ব্যবহৃত হয়েছে। বিভিন্ন মুদ্রণে পৃষ্ঠাঙ্কের সামান্য ব্যতিক্রম হয়ে থাকতে পারে, কিন্তু তা সত্ত্বেও পাঠকের পক্ষে উদ্ধৃতি বা উল্লেখের মূল খুঁজে পেতে খুব বেশি অসুবিধা হবে না ভেবে মুদ্রণ-সাল নির্দেশিত হয়নি। অন্যান্য গ্রন্থের ক্ষেত্রে উল্লেখপঞ্জিতে প্রথম উল্লেখের স্থানে তৃতীয় বন্ধনীর মধ্যে প্রকাশ-সন দেওয়া হয়েছে। দণ্ড-চিহ্নের পরের সংখ্যাটি পৃষ্ঠাঙ্ক-সূচক।

গ্রন্থের মূল-পাঠে তৃতীয় বন্ধনীর অন্তর্গত তারিখগুলি সাধারণত পুরোনো পঞ্জিকা বা Ephimeris বা Century Calendar অবলম্বনে নির্ধারিত। চিঠির ক্ষেত্রে বন্ধনীভুক্ত তারকা-চিহ্নিত [*] তারিখগুলি খাম বা পোস্টকার্ডের উপরে প্রদত্ত ডাকঘরের মোহর থেকে সংগৃহীত। উদ্ধৃতির মধ্যে তৃতীয় বন্ধনীর মধ্যস্থ ছাপা ভুল বানানের প্রতি '[য]' অক্ষর-যোগে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছি, ইংরেজির ক্ষেত্রে যথারীতি '[sic]' ব্যবহৃত। [?]-চিহ্ন সংশয়-সূচক। উদ্ধৃতি ছাড়া অন্যত্র খ্রিষ্টাব্দ সর্বদাই ইন্দো-আরবীয় হরফে [1.2.3… ইত্যাদি] লিখিত, 'শক'-শব্দটির ব্যবহার না থাকলে বাংলা হরফে লেখা অব্দগুলি বঙ্গাব্দ বুঝতে হবে। বানানের ক্ষেত্রে অধুনাপ্রচলিত বানান-বিধি অধিকাংশ স্থলে অনুসরণ করা হয়েছে, তাই কোনো-কোনো শব্দে পূর্ববর্তী খণ্ডে ব্যবহৃত বানানের পার্থক্য লক্ষিত হবে।

শব্দ-সংক্ষেপণ

প্রবাসী, বৈশাখ ১৩৩১ [২৪। ১। ১]।/ ১–২ 'লীলাসঙ্গিনী' দ্র পূরবী ১৪। ৩৫-৩৮। 'প্রবাসী' পত্রিকার ২৪ বর্ষ ১ম খণ্ড ১ম সংখ্যা [বৈশাখ ১৩৩১]-র ১–২ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত ও বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ-প্রকাশিত রবীন্দ্র-রচনাবলী ১৪শ খণ্ডে 'পূরবী' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত 'লীলাসঙ্গিনী'-শীর্ষক কবিতা, ৩৫ থেকে ৩৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

'সংহতি' দ্র র° র° ১৫ [প.ব. ১৪০৬]। ৮১০–১১ : পশ্চিমবঙ্গ সরকার-কর্তৃক ১৪০৬ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত রবীন্দ্র-রচনাবলী ১৫শ খণ্ডের ৮১০ থেকে ৮১১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

শান্তিনিকেতন··· ১২০–৩৩ 'ভারতবর্ষীয় বিবাহ' দ্র র°র° [শত] ১৩। ৫–২০ : 'শান্তিনিকেতন' পত্রিকার ১২০ থেকে ১৩৩ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত 'ভারতবর্ষীয় বিবাহ' প্রবন্ধটির জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার-প্রকাশিত শতবার্ষিক-সংস্করণ রবীন্দ্র-রচনাবলী ১৩শ খণ্ডের ৫ থেকে ২০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

দেশ, শারদীয় ১৪০১। ৩৪, পত্র ৪৭ : ১৪০১ বঙ্গাব্দের শারদীয়-সংখ্যা দেশ-এর ৩৪ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত ৪৭-সংখ্যক পত্র দ্রষ্টব্য।

দেশ, সাহিত্য ১৩৮৩। ৯, পত্র ১ : ১৩৮৩ বঙ্গাব্দের সাহিত্য-সংখ্যা দশ–এর ৯ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত ১-সংখ্যক পত্র দ্রষ্টব্য।

চিঠিপত্র ১৮ [১৪০৯]। ৩৫৭–৫৮, পত্র ৭ : ১৪০৯ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত চিঠিপত্র ১৮শ খণ্ডের ৩৫৭ থেকে ৫৮ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত ৭-সংখ্যক পত্র।

বি.ভা.প. : বিশ্বভারতী পত্রিকা।

রবীন্দ্র-প্রসঙ্গ ১ : চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়-সম্পাদিত 'রবীন্দ্র-প্রসঙ্গ / আনন্দবাজার পত্রিকা' ১ম খণ্ড।

রক্তকরবী : পাণ্ডুলিপি : প্রণয়কুমার কুণ্ডু-সম্পাদিত 'রক্তকরবী : পাণ্ডুলিপি-সংবলিত সংস্করণ'।

রবীন্দ্রজীবনী ৩ : প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় রচিত রবীন্দ্রজীবনী ও রবীন্দ্রসাহিত্য-প্রবেশক ৩য় খণ্ড।

রঙ্গমঞ্চ ও রবীন্দ্রনাথ : রুদ্রপ্রসাদ চক্রবর্তী-রচিত রঙ্গমঞ্চ ও রবীন্দ্রনাথ / সমকালীন প্রতিক্রিয়া [1995]।

ভারতে জাতীয়তা : নেপালচন্দ্র মজুমদার : ভারতে জাতীয়তা ও আন্তর্জাতিকতা এবং রবীন্দ্রনাথ।

ভারতবর্ষ : দিনপঞ্জী : অবন্তীকুমার সান্যাল-অনুদিত রম্যাঁ রলাঁ : ভারতবর্ষ / দিনপঞ্জী (১৯১৫–১৯৪৩)।

র-মূল : রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত মূল পত্র বা উপকরণ।

র-প্রতিলিপি : রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত প্রতিলিপি।

গীত : গীতবিতান।

স্বর : স্বরবিতান।

গবেষণা-গ্রন্থমালা ৩ : রবীন্দ্রসংগীত-গবেষণা-গ্রন্থমালা, প্রফুল্লকুমার দাস রচিত।

V.B.Q. Visva-Bharati Quarterly.

V.B.N. : Visva-Bharati News.

Imperfect Encounter : Imperfect Encounter : Letters of William Rothenstein and Rabindranath Tagore, 1911–1941 [1972] ed. Mary M. Lago

Asian Ideas : Stephen N. Hay : *Asian Ideas of East and West : Tagore and His Critics in Japan, China, and India.*

CWMG : The Complete Works of Mahatma Gandhi.

EWRT : The English Writings of Rabindranath Tagore.

ed. Sisir Kumar Das [Sahitya Akademi]

Flower-Garden : Ketaki Kushari Dyson : *In Your Blossoming Flower-Garden.*

Centenary Volume : Rabindranath Tagore, A Centenary Volume, 1861–1961 [Sahitya Akademi, 1961]

বিষয়সূচী

প্রতিক্রিয়া— অবশিষ্ট ভাষণগুলি বাতিল; রাশিয়ায় আমন্ত্রণ; ছাত্রছাত্রীদের আহ্বানে প্রদত্ত বক্তৃতা; পিকিং বিশ্ববিদ্যালয়ে বিদায়-সংবর্ধনা; সর্বধর্মসভায় ভাষণ; পিকিং ত্যাগ, শান্‌সি-তে বক্তৃতা; হ্যাংকৌতে ভাষণ, যুব-বিক্ষোভ সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথ নির্বিকার; ইয়াংসি নদীপথে সাংহাই পৌঁছে মিসেস বেনা-র বাড়িতে বক্তৃতা ১১৮; জাপানি বিদ্যালয়ে ও কারসন চ্যাঙের বাড়িতে বিদায়-সংবর্ধনার প্রত্যুত্তর; ভারতীয়দের বিদায়-সংবর্ধনা, জাপান-যাত্রা; ওসাকায় বক্তৃতা; মেয়েদের সভায় ভাষণ; টোকিয়ো-তে, দুই ভারতীয় বিপ্লবী রাসবিহারী বসু ও কেশোরাম সবেরওয়ালের সঙ্গে সাক্ষাৎ; ইম্পিরিয়াল য়ুনিভার্সিটিতে বক্তৃতা; নারী বিশ্ববিদ্যালয়ে ও ইন্ডাস্ট্রিয়াল ক্লাবে ভাষণ; জাপানি শিল্পীদের উদ্দেশে ও ভিসকাউন্ট শিবুসাওয়ার বাগানবাড়িতে চিত্রকলা ও শিক্ষাদর্শ বিষয়ে বক্তৃতা; কিয়াটো টাউনহলে বিজ্ঞান-বিষয়ক ভাষণ; গার্লস কলেজে বক্তৃতা; কোবে শিক্ষক-শিক্ষায়তনে ভাষণ; দক্ষিণ আমেরিকার পেরুতে আমন্ত্রণ; ভারতীয়দের উদ্দেশে সতর্কবাণী; জাপান পরিত্যাগ, জাহাজে ভাষণ; কেশোরাম সবেরওয়ালকে সেক্রেটারি নিয়োগ, ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের বাধা; সাংহাই ও হংকঙে; স্বদেশাভিমুখে; কলকাতায়, আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের স্মৃতিতর্পণ; শান্তিনিকেতনে অভ্যর্থনা, চা-চক্র প্রতিষ্ঠা; শিশিরকুমার ভাদুড়ী-প্রসঙ্গ; লিটন-বিতর্ক; দক্ষিণ আমেরিকা-যাত্রার প্রস্তুতি; কলকাতায় বিভিন্ন অনুষ্ঠান; ‘অরূপ-রতন’ অভিনয়; বিশ্বভারতী সংগীত বিদ্যালয়; দক্ষিণ আমেরিকার পথে কলম্বো যাত্রা; রাণুর সঙ্গে সম্পর্কের জটিলতা; ডায়ারি লেখার জন্য নলিনী মৈত্রের অনুরোধ-রক্ষা, জাহাজে নূতন কবিতাধারার সূচনা; ফ্রান্স হয়ে এল্‌ম্‌হার্স্ট-সহ দক্ষিণ আমেরিকা যাত্রা, ‘আন্ডেস’ জাহাজে লিখিত কবিতাবলি; পাণ্ডুলিপির কাটাকুটিকে চিত্ররূপ দেওয়ার সূত্রপাত; ইনফ্লুয়েঞ্জার আক্রমণে হৃদ্‌যন্ত্রের দুর্বলতা, মৃত্যুচিন্তা; আর্জেন্টিনার রাজধানী বুয়েনোস আইরেস বন্দরে অবতরণ, অভ্যর্থনা, প্লাজা হোটেলে; ভিক্টোরিয়া ওকাম্পো, রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সাক্ষাৎকার, তাঁর গ্রামাঞ্চলে বিশ্রামের সুবিধার জন্য সান ইসিদ্রোর ‘মিরালরিও’ বাড়িতে যাওয়া; পেরু যাত্রা নিয়ে জটিলতা; ভিক্টোরিয়ার সঙ্গে সম্পর্কের টানাপোড়েন, কবিতা-রচনার ধারা অব্যাহত; বহু দ্বিধার পরে স্বাস্থ্যের কারণে পেরু-যাত্রা বাতিল করে ‘জুলিয়ো সিজারে’ জাহাজে আর্জেন্টিনা ত্যাগ; ইতালিতে অবতরণ, কার্লো ফর্মিকির অভ্যর্থনা; ইতালির আমন্ত্রণ-বৃত্তান্ত; মিলানে আগমন; লেকচার অ্যাসোসিয়েশনে বক্তৃতা, ফ্যাসিস্তদের প্রতিক্রিয়া; ইনফ্লুয়েঞ্জার আক্রমণে সমস্ত কর্মসূচি বাতিল; চিকিৎসকদের পরামর্শে ইতালি পরিত্যাগ করে দেশে প্রত্যাবর্তনের সিদ্ধান্ত ও তার প্রতিক্রিয়া; ভেনিস পরিদর্শন; ব্রিন্দিসি থেকে ‘ক্রাকোভিয়া’ জাহাজে স্বদেশযাত্রা; রবীন্দ্রনাথের ইতালি-ভ্রমণ বিষয়ে বিতর্ক; সমুদ্রপথে ডায়ারি রচনা; বোম্বাই পৌঁছে রাণুর বিবাহ-সংবাদ লাভ; ফ্রি-প্রেসের সাংবাদিককে প্রদত্ত সাক্ষাৎকার; শান্তিনিকেতনে ফিরে ‘সুন্দর’ রচনা, অকালবর্ষণে উৎসব বাতিল; কলকাতায়; ‘চিরকুমার সভা’ নাট্যরূপান্তর; দিলীপকুমার রায়ের সঙ্গে সংগীত-বিষয়ে আলোচনা; শান্তিনিকেতনে বর্ষশেষ উপলক্ষে ‘সুন্দর’ অভিনয়; সাময়িকপত্রে প্রকাশ-সূচি

প্রাসঙ্গিক তথ্য : ১। পারিবারিক-প্রসঙ্গ : বিনয়নী দেবী ও জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনাবসান; ২। রাজনৈতিক প্রসঙ্গ : মোতিলাল নেহরু, চিত্তরঞ্জন দাশ প্রভৃতির গান্ধী-বিরোধিতা, হিন্দু-মুসলমান-সংঘর্ষ, সন্ত্রাসদমন-মূলক আইন, অহিফেন-বিতর্কে গান্ধীজি ও রবীন্দ্রনাথ; ৩। বিশ্বভারতী ও শ্রীনিকেতন-প্রসঙ্গ

উল্লেখপঞ্জি

রবিজীবনী

ত্রিষষ্টি অধ্যায়

১৩৩০ [1923–24] ১৮৪৫ শক ॥ রবীন্দ্রজীবনের ত্রিষষ্টি বৎসর

১৩৩০ বঙ্গাব্দের প্রথম দিনটির [শনি 14 Apr 1923] সূচনা রবীন্দ্রনাথ করলেন 'নববর্ষে মন্দিরের উপদেশ' দিয়ে [দ্র শান্তিনিকেতন, ভাদ্র ১৩৩০। ১১৯–২১; বিশ্বভারতী ২৭। ৩৭১–৭৫, ৭-সংখ্যক]। তিনি বললেন, নিজেকে বিকশিত করার একটি প্রেরণা আমাদের মধ্যে সব সময়েই আছে। নিজের প্রত্যক্ষ অবস্থার মধ্যে সে খুশি নয়, অন্যের কাছে নিজের আবরণ উন্মোচন করাতেই তার সার্থকতা। 'সভ্যতা শব্দটার আসল মানে হচ্ছে, সভার মধ্যে আপনাকে পাওয়া, সকলের মধ্যে নিজেকে উপলব্ধি করা। ···যেখানে এই মিলনতত্ত্বের যতটুকু খর্বতা সেইখানেই মানুষের সত্য সেই পরিমাণেই আচ্ছন্ন।' নববর্ষের দিনে আশ্রমের ভিতরকার সত্যকে প্রত্যক্ষ করতে হবে। এ নিজেকে যে নিয়ত উদ্‌ঘাটিত করছে সেইটিই তার সৃষ্টি। সত্য আমাদের ত্যাগ করতে আহ্বান করে, কেন-না ত্যাগেই আমাদের আত্মপ্রকাশ—রবীন্দ্রনাথের মতে, সেই আহ্বানের নামই 'বিশ্বভারতী'।

স্বজাতিকে মনুষ্যত্বের সবচেয়ে বড়ো সত্য বলে মনে করে কয়েক শতাব্দী ধরে পৃথিবীতে এই আহ্বানই প্রবল হয়ে উঠেছিল যে, মানুষ স্বজাতির নামে ত্যাগ করবে। এর ফল হয়েছিল, এক জাতি অন্য জাতিকে শোষণ করে স্বজাতিকে স্ফীত করার সাধনায় দস্যুবৃত্তিকে প্রশ্রয় দিয়েছে। কিন্তু এই পাপ ক্রমাগত জমা হতে হতে যখন মহাযুদ্ধের রূপ নিয়েছে, তখন বিশেষত য়ুরোপে নেশন তার নিজের মূর্তি দেখে নিজেই আতঙ্কিত হয়ে উঠেছে। রবীন্দ্রনাথ বললেন, নূতন যুগের বাণী হচ্ছে 'অপাবৃণু', হে মানব, আপন উদার রূপ প্রকাশ করো। আজ নববর্ষের প্রথম দিনে আশ্রমকে যদি সর্বপ্রকার ভেদবুদ্ধির আবরণ মুক্ত করে দেখা যায় তা হলেই তার সত্যরূপ প্রত্যক্ষ হবে।

> আমাদের এখানে নানা দেশ থেকে নানা জাতির অতিথি এসেছে। তারা যদি অন্তরের মধ্যে কোনো বাধা না পায় তবে তাদের এই আসার দ্বারাতেই আপনি এখানে নবযুগের একটি মিলনতীর্থ তৈরি হয়ে উঠবে। ···তীর্থযাত্রীরা যে ভক্তি নিয়ে আসে, যে সত্যদৃষ্টি নিয়ে আসে, তার দ্বারাই তারা তীর্থস্থানকে সত্য করে তোলে। আমরা যারা এই আশ্রমে এসেছি, আমরা এখানে যে সত্যকে উপলব্ধি করব বলে শ্রদ্ধাপূর্বক প্রত্যাশা করি সেই শ্রদ্ধার দ্বারা সেই প্রত্যাশা দ্বারাই সেই সত্য এখানে সমুজ্জ্বল হয়ে প্রকাশ পাবে। আমরা এখানে কোন্ মন্ত্রের রূপ দেখব বলে নিয়ত প্রত্যাশা করব। সে মন্ত্র হচ্ছে এই যে— 'যত্র বিশ্বং ভবত্যেকনীড়ম্'। দেশে দেশে আমরা মানুষকে তার বিশেষ স্বাজাতিক পরিবেষ্টনের মধ্যে খণ্ডিত করে দেখেছি, সেখানে মানুষকে আপন ব'লে উপলব্ধি করতে পারি নে। পৃথিবীর মধ্যে আমাদের এই আশ্রম এমন-একটি জায়গা হয়ে উঠুক যেখানে ধর্ম ভাষা এবং জাতিগত সকলপ্রকার পার্থক্য সত্ত্বেও আমরা মানুষকে তার বাহ্যভেদমুক্তরূপে মানুষ বলে দেখতে পাই। সেই দেখতে পাওয়াই নুতন যুগকে দেখতে পাওয়া।

'যত্র বিশ্বং ভবত্যেকনীড়ম্' মন্ত্রটির ব্যবহার ঠিক কবে থেকে আরম্ভ হয়েছিল বলা শক্ত। 10 Apr 1921 [২৮ চৈত্র ১৩২৭] লন্ডন থেকে সন্তোষচন্দ্র মজুমদারকে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন : 'আমাদের বিশ্বভারতীর বীজমন্ত্র হচ্চে "যত্র বিশ্ব ভবত্যেক নীড়ং"।'[১] অর্থাৎ এর অনেক আগেই বিধুশেখর শাস্ত্রী, ক্ষিতিমোহন সেন বা অনুরূপ কোনো পণ্ডিতের সহায়তায় রবীন্দ্রনাথ মন্ত্রটি সংগ্রহ করে এটিকে বিশ্বভারতীর motto হিসাবে গ্রহণ

করেছিলেন। ড পম্পা মজুমদার তাঁর 'রবীন্দ্রসংস্কৃতির ভারতীয় রূপ ও উৎস' [১৩৭৯] গ্রন্থে [প ৪৫৪} শুক্লযজুর্বেদ বাজসনেয়ী সংহিতা কাণ্বশাখার অন্তর্গত মন্ত্রটির পূর্ণরূপ উদ্ধার করেছেন :

বেনস্তৎপশ্যন্নিহিতং গুহা সদ্যত্র বিশ্বং ভবত্যেকনীড়ম্।

তস্মিন্নিদংসং চ বি চৈতি সর্বং স ওতঃপ্রোত বিভূঃ প্রজাসু॥

অথর্ববেদ, তৈত্তরীয় আরণ্যক প্রভৃতি গ্রন্থেও মন্ত্রটি পাওয়া যায়।

এইদিন নববর্ষের উপাসনার পরে বিদেশি অধ্যাপকদের বাসস্থল হিসেবে একটি অতিথিশালার ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনামূলক ভাষাবিজ্ঞানের অধ্যাপক ড তারাপুরওয়ালা [Dr. I. Jehangir Tarapourwala, 1884-1956]। 'পূজনীয় গুরুদেব ও আশ্রমবাসী সকলে এই অনুষ্ঠানটিতে যোগদান করিয়াছিলেন।' এর জন্য ২৫ হাজার টাকা অনুদান পাওয়া গিয়েছিল বোম্বাইয়ের স্যার রতন টাটা ট্রাস্ট থেকে [দ্র প্রাসঙ্গিক তথ্য : ৩]।

পরের দিন ২ বৈশাখ [রবি 15 Apr] সকাল সাতটায় রবীন্দ্রনাথের সভাপতিত্বে সংসদের দ্বিতীয় অধিবেশন বসে; শান্তিনিকেতনে অধিবেশন বসলেও রবীন্দ্রনাথ-যে প্রত্যেক অধিবেশনে উপস্থিত থাকতেন তা নয়— এত সদস্যও হাজির হতেন না; নববর্ষের উৎসব উপলক্ষে কলকাতা থেকে অনেকে এসেছিলেন, আর রবীন্দ্রনাথের উপস্থিতি অনেককে আকর্ষণ করেছিল। এই অধিবেশনে অনেকগুলি গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব গৃহীত হয় [দ্র প্রাসঙ্গিক তথ্য : ৩)।

৪ ও ৫ বৈশাখ [মঙ্গল-বুধ 17–18 Apr] রবীন্দ্রনাথ দুটি গান রচনা করেন—দুটিই ফরমায়েশি রচনা :

৪ 'অগ্নিশিখা এসো এসো' দ্র গীত ২। ৬১৩–১৪; স্বর ৩০— গানটি Girl Guide-এর শান্তিনিকেতন-শাখা 'সহায়িকা'র জন্য লেখা।

৫ 'আয় রে মোরা ফসল কাটি' দ্র গীত ২। ৬১৩; স্বর ৩০— সুরুল গ্রামপুনর্গঠন কেন্দ্রের উদ্দেশে লেখা গানটি মাঘ ১৩৩০-সংখ্যা শান্তিনিকেতন-এ [পৃ ১৬] মুদ্রিত হয়েছিল, তারিখটি সেখান থেকে পাওয়া। দুটি গানেরই স্বরলিপি করেন বিশ্বভারতীর তৎকালীন ছাত্র অনাদিকুমার দস্তিদার [103–74]— দিনেন্দ্রনাথের এই প্রিয় শিষ্যটি সেই সময়ে গুরুর একটি প্রধান দায়িত্ব দক্ষতার সঙ্গে পালন করছেন।

৫ বৈশাখ বুধবার রবীন্দ্রনাথ সকালে মন্দিরে উপাসনা করেন, ভাষণটি অগ্র-সংখ্যা শান্তিনিকেতন-এ [প ১৭৫–৭৭] 'মন্দির/ ৫ই বৈশাখ ১৩৩০' নামে মুদ্রিত হয় দ্র বিশ্বভারতী ২৭। ৩৭৫–৭৮ [৮সংখ্যক]। এই ভাষণে তিনি বললেন, কিছুদিন আগে কালিঘাটে গিয়ে আদিগঙ্গার দুর্গতি দেখে তিনি দুঃখিত হন। পলি ও আবর্জনায় সজীবতা হারিয়ে সমুদ্রে আনাগোনার পথ তার রুদ্ধ হয়ে গেছে দেখে তাঁর মনে হয়েছিল, এই নদী পুণ্যনদীর মর্যাদা হারিয়েছে। যখন তার ধারা সজীব ছিল তখন বণিকেরা এই পথেই ভারত ছাড়িয়ে সিংহল গুজরাট প্রভৃতি দেশে নিজেদের বাণিজ্যের সম্বন্ধ বিস্তার করেছিল— 'এ যেন মৈত্রীর ধারার মতো মানুষের সঙ্গে মানুষের মিলনের বাধাকে দুর করেছিল', সেইজন্য তার ধার তীর্থোদক-রূপে গণ্য হত। আজও অনেকে সেইরকমই ভাবে, কিন্তু সে তাদের অভ্যাসমাত্র— তার জলে এখৰ সেই পুণ্যরূপ নেই। এই ভূমিকার পরে রবীন্দ্রনাথ বললেন, শান্তিনিকেতন আশ্রমে সেই পুণ্যরূপটি বিকশিত হয়ে উঠছে :

আমাদের এ কথা মনে রাখতে হবে, পুণ্যধর্ম মাটিতে বা হাওয়ায় নেই। চিন্তার দ্বারা, সাধনার দ্বারা পুণ্যকে সমর্থন করতে হবে। আমাদের আশ্রমে সে বাধা অনেক দূর হয়েছে। আপনা-আপনি বিদেশের অতিথিরা এখানে এসে তাঁদের আসন পাতছেন। তাঁরা বলছেন যে, তাঁরা এখানে

এসে তৃপ্তি পেয়েছেন। এমনি করেই ভারতের গঙ্গা আমাদের আশ্রমের মধ্যে বইল। দেশবিদেশের অতিথিদের চলাচল হতে লাগল। তাঁরা আমাদের জীবনে জীবন মেলাচ্ছেন। এই আশ্রমকে অবলম্বন করে তাঁদের চিত্ত প্রসারিত হচ্ছে। এর চেয়ে সফলতা কিছু নেই। তীর্থে মানুষ উত্তীর্ণ হয় বলেই তার নাম তীর্থ।

—শান্তিনিকেতন আশ্রম বা বিশ্বভারতী সেই তীর্থের মর্যাদা লাভ করেছিল।

৭ বৈশাখ [শুক্র 20 Apr] কলাভবনে রবীন্দ্রনাথের সভাপতিত্বে শান্তিনিকেতন বিশ্বভারতী সম্মিলনীর [আমাদের পরিভাষায়, 'বিশ্বভারতী সম্মেলনী'] বিশেষ অধিবেশনে অধ্যাপক বোগদানভ Tamgiband of Hatif [?] নামক পারসিক কবিতা পড়ে তার অর্থ ও তাৎপর্য ইংরেজিতে বুঝিয়ে দেন। অবশেষে তিনি রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সুফি ও বাহাই ধর্ম নিয়ে আলোচনায় প্রবৃত্ত হন।

গ্রীষ্মবকাশটি রবীন্দ্রনাথ সপরিবারে দেরাদুনে কাটাবার পরিকল্পনা করছিলেন। তারই মধ্যে ৮ বৈশাখ [শনি 21 Apr] কাশী থেকে রাণু অধিকারী কোনো খবর না দিয়ে শান্তিনিকেতনে এসে উপস্থিত হন। রবীন্দ্রনাথ সেইদিনই তাঁর পিতা ফণিভূষণকে লিখলেন :

আজ সকালে ডেস্কে বসে একটা নূতন গান নিয়ে তার উপর সুর চড়াচ্ছিলাম [গানটি আমরা শনাক্ত করতে পারিনি]; এমন সময় হঠাৎ আমার চৌকির পিছনে রাণুর আবির্ভাব। জিজ্ঞাসা করলাম— বাড়ি থেকে পালিয়ে আসনি ত। সে বললে— পালিয়ে এসেছি। কিন্তু সম্মতি নিয়ে এবং সঙ্গিনী সহযোগে। অতএব পুলিশে খবর দেবার দরকার হবে না। ওকে দেখে খুশী হলুম। কিন্তু ওকে আশার সঙ্গে কাশীতে ফিরিয়ে দেব না। আমরা দেরাদুনে যাচ্ছি। সেখানে ওকে নিয়ে যাব। বলাবাহুল্য ওর নিজের তাতে অসম্মতি নেই, আমার প্রতি ওর জন্মজন্মান্তরের দাবী আছে।[২]

ফণিভূষণের বিদুষী জ্যেষ্ঠা কন্যা আশা এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের বৃত্তি নিয়ে জার্মান অতিথি-অধ্যাপক ভিন্টানিংসের কাছে সংস্কৃত পড়ার জন্য বিশ্বভারতীতে ভর্তি হয়েছিলেন। এই চিঠি থেকে জানা যায়, আশা আবার কাশীতে ফিরে যাচ্ছেন। রবীন্দ্রনাথের দেরাদুনে যাওয়া হয়নি, তিনি যান শিলঙে এবং রাণুকেও সঙ্গে নিয়ে যান।

১০ বৈশাখ [সোম 23 Apr] সকাল সাড়ে আটটায় কলাভবনে বিশ্বভারতী সম্মেলনীর দশম বিশেষ অধিবেশনে রবীন্দ্রনাথের সভাপতিত্বে চেক প্রাচ্যবিদ্‌ অতিথি-অধ্যাপক ভিনসেন্স লেস্‌নির [Vincenc Lesney, 1882–1953] বিদায়-সংবর্ধনা অনুষ্ঠিত হয়। প্রথমে বিশ্বভারতীর ছাত্রী তটিনী দাস ও আশা অধিকারী তাঁকে দুটি অভিজ্ঞান উপহার দেন। পরে রবীন্দ্রনাথ ও বিধুশেখর শাস্ত্রী সুদূর চেকোশ্লোভাকিয়া থেকে লেস্‌নি এখানে এসে বিশ্বভারতীর অধ্যাপনাকার্যে যথেষ্ট সাহায্য করেছেন বলে তাঁকে ধন্যবাদ দেন। প্রত্যুত্তরে লেস্‌নি বলেন, তিনি এখানে এসে যে আতিথ্য পেয়েছেন তার কথা কোনোদিনই ভুলতে পারবেন না। পরে দিনেন্দ্রনাথ ও অনাদিকুমার একটি গান গেয়ে সভাভঙ্গ করেন।

এই সময়ে ফরাসি শিল্পী আঁদ্রে কার্পেলেস [Andree Karpeles, 1885–1956] শান্তিনিকেতন ত্যাগ করেন। নির্মলকুমারী মহলানবিশ 'কবির সঙ্গে য়ুরোপে' [১৩৭৬, পৃ ৩৩] গ্রন্থে লিখেছেন : "এঁরই বিদায় সম্বর্ধনার দিন করি নতুন লেখা গান 'ভরা থাক, ভরা থাক স্মৃতিসুধায় বিদায়ের পাত্রখানি' গাওয়া হয়েছিল। বিশেষ ক'রে এই দিনের জন্যেই কবি লিখেছিলেন গানটা।" জ্যৈষ্ঠ-সংখ্যা প্রবাসী-তে গানটি মুদ্রিত হয়। ১১ বৈশাখ আনন্দবাজার পত্রিকায় লেখা হয় :

কুমারী আঁন্দ্রে কাপ্লে ফরাসী দেশীয় চিত্রশিল্পী। আচার্য্য রবীন্দ্রনাথের পুত্রবধূ শ্রীমতী প্রতিমা দেবী ইঁহারই সাহায্যে বাঙ্গলা দেশের নারীগণের উন্নতির জন্য একটি শিল্পগার প্রতিষ্ঠা করেন। কুমারী কাপ্লে গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া আমাদের দেশের কৃষক-সম্প্রদায়ের মধ্যে যে চারুশিল্পের প্রয়োজন রহিয়াছে, তাহা দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছেন। ইনি আশ্রমের শিল্পী শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসু ও শ্রীমতী প্রতিমা দেবীর সহিত মিলিত হইয়া আমাদের দেশের কাঠের কারিগর, মাটির কারিগর ও গালার কারিগরদের লইয়া আধুনিক সময়োপযোগী করিয়া ভারতের পুরাতন ঐ সমস্ত নষ্ট শিল্পের পুনরুদ্ধার

করিতেছেন। কাপড়ের উপর কাজ করা আমাদের দেশের একটি মূল্যবান সম্পদ— এই দিকেও শিল্পীদের লইয়া তাঁহারা অনেক উন্নতি বিধান করিয়াছেন। তিনি স্বদেশ যাত্রা করিতেছেন এবং আগামী শীতের প্রারম্ভে পুনরায় বিশ্বভারতীর কার্য্যে আসিয়া যোগদান করিবেন।[৩]

—আঁদ্রের আর-কখনো শান্তিনিকেতনে আসা হয়নি।

বিশ্বভারতীতে এই বৎসরে গ্রীষ্মবকাশের সূচনা হয়েছিল ১৩ বৈশাখ [বৃহ 26 Apr]। কিন্তু এবারে গরমের প্রকোপে রবীন্দ্রনাথ তার আগেই শান্তিনিকেতন ত্যাগে বাধ্য হন। 16 Aug [৩১ শ্রাবণ] তিনি ইংল্যাণ্ড-প্রবাসী দৌহিত্র নীতীন্দ্রনাথকে লেখেন : "এবারকার গর্ম্মিকালে আমাদের এখানেও অসহ্য গরম হয়েছিল, আমরা তখন শিলঙ পাহাড়ে গিয়েছিল [গিয়েছিলাম]।'[৪] রবীন্দ্রনাথের চিঠি থেকে জানা যায়, তাঁদের যাওয়ার কথা ছিল দেরাদুনে— কিন্তু শিলঙে ভ্রাতুষ্পুত্রী অভিজ্ঞ/ মনীষার স্বামী ডাঃ দেবেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের[৫] জিৎভূম বা জিৎভূমি নামক বাড়িটি ২০০৲ টাকা ভাড়ায় পাওয়া গেলে শিলঙে যাওয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ক্যাশবহিতে উক্ত বিষয়ে একটি হিসাব দেখা যায় : 'শ্রীযুক্ত রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর দিগর সহ খোদ কর্ত্তা মহাশয়ের শিলং যাওয়ার খরচ··· ৮০০৲ শিলংএর বাড়ী ভাড়া বাবদ ২০০৲ / ১০০০৲'।

দলটি বেশ বড়ো ছিল। ১০ বৈশাখ [সোম 23 Apr] 'ক্যাশবহি'তে 'গুরুদেব মীরা দিদি দিগরের কলিকাতা যাওয়ার টিকিট ৮২ ॥ ১৫' হিসাব পাওয়া যায়— 'দিগরের' মধ্যে ছিলেন অন্তত দৌহিত্রী নন্দিতা [বুড়ি], রাণু, রথীন্দ্রনাথ, প্রতিমা দেবী ও পালিতা পৌত্রী নন্দিনী [পুপে] এবং গ্রেচেন গ্রিন। উক্ত তারিখে বা তারই কাছাকাছি সময়ে এঁরা শান্তিনিকেতন ত্যাগ করে শিলঙের পথে কলকাতা রওনা হন।

কলকাতায় রবীন্দ্রনাথ কয়েকদিন ছিলেন ও অন্তত একটি অনুষ্ঠানে যোগ দেন। সীতা দেবী লিখেছেন :

এপ্রিল মাসে আমাদের Social Fraemity প্রথম আরম্ভ হয়। এই সময় তাহার বার্ষিক প্রতিষ্ঠা-উৎসব করার কথা উঠিল। প্রশান্তচন্দ্র আলিপুর মিটিয়রলজিক্যাল অফিসে কাজ লইয়া, সেইখানেই বাস করিতে আরম্ভ করাতে, স্থানাভাবে আমাদের ক্লাবটির অধিবেশন আর তেমন নিয়মিত হইত না। এইবারে আলিপুরেই উৎসবের আয়োজন হইল। রবীন্দ্রনাথ আসিবেন বলিয়া কথা দিলেন। প্রশান্তচন্দ্রের নূতন বাড়িতে সুন্দর বাগান ছিল, সেইখানেই সব ব্যবস্থা করা গেল। ···মেয়েরা সকলে রঙিন কাপড় পরিয়া সাজিয়া গেলেন, কারণ কবি সাদা সাজের বিরুদ্ধে এই সময় যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছিলেন।

রবীন্দ্রনাথ যথাসময়েই আসিলেন, সঙ্গে প্রতিমা দেবী ও নন্দিনী। ···ক্লাবের প্রতিষ্ঠা-দিবস যদিও, তবু ক্লাবের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নন এমন অনেকে আসিয়াছিলেন। প্রশান্তচন্দ্রের তখন বিবাহ হইয়া গিয়াছে, তাঁহার পত্নী অভ্যাগতদের অভ্যর্থনার ভার লওয়াতে আমি নিষ্কৃতি পাইলাম। ···

প্রোফেসার উইন্টারনিজও এই উৎসবে নিমন্ত্রিত হইয়া আসিয়াছিলেন; তিনি এই সময় আমাদের কাছে আসিয়া বসাতে, রবীন্দ্রনাথ তাঁহার সহিত গল্প করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, আমি অন্য অতিথিদের খাওয়ার তদারক করিতে গেলাম।

গানের আয়োজন ছিল। শ্রীমতী সাহানা বসু দুই-তিনটি গান করিলেন, রবীন্দ্রনাথ স্বয়ংও কয়েকটি গান গাহিয়া শুনাইলেন। অতঃপর সভাভঙ্গ করিয়া তিনি চলিয়া গেলেন।[৬]

সীতা দেবীর বিবাহ ঠিক হয়ে গিয়েছিল, তার পর থেকে রবীন্দ্রনাথ তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ হলেই নানাবিধ রসিকতা করতেন— এবারেও তার কোনো ব্যতিক্রম হয়নি। 'মনস্তত্ত্ব সম্বন্ধে আমার আর জ্ঞান কতটা হইল তাহাও একবার জিজ্ঞাসা করিলেন। গল্প লেখা ভালো, না গল্প হওয়া ভালো, সেও ছিল তাঁহার একটা প্রশ্ন।'

সীতা দেবী আরও লিখেছেন : 'দিন-দুই পরে জোড়াসাঁকোয় গেলাম তাঁহার সহিত দেখা করিতে। সেদিন ঘরে অনেক লোক, তবু জনান্তিকে দুই-চারিবার রসিকতা করিলেন। মনস্তত্ত্বের জ্ঞান ক্রমেই আমার গভীর হইতেছে কি না, সে প্রশ্ন আজও একবার শুনিলাম। ইহার পর কিছুদিনের জন্য তিনি শিলং চলিয়া গেলেন।'

রবীন্দ্রনাথ ঠিক কবে কলকাতা ত্যাগ করে শিলং রওনা হয়ে সেখানে পৌঁছন জানা যায়নি। ড প্রণয়কুমার কুণ্ডু জানিয়েছেন : 'গরমের ছুটিতে শান্তিনিকেতন বিদ্যালয় বন্ধ হবার আগেই কবি বিশ্রামের জন্য শিলঙ যাত্রা

করেন ২৬ এপ্রিল ১৯২৩ তারিখে [বস্তুত এই দিনই গ্রীষ্মাবকাশ আরম্ভ হয়]।' তিনি আরও লিখেছেন :

কবি একা একটি ঘরে থাকতেন, তার পাশের ঘরে থাকতেন মীরা দেবী, রাণুকে নিয়ে। তার উল্টোদিকের ঘরে প্রতিমা দেবী থাকতেন পুপে বা নন্দিতাকে [?নন্দিনী] নিয়ে। এই সময়, এই বাংলোর নীচে থাকতেন মিস গ্রিন নামে এক মার্কিন মহিলা। প্রায় প্রতিদিন প্রতিমা দেবী মেয়েদের নিয়ে বেড়াতে বেরোতেন। এই 'জিৎভূম' বাংলোর কাছেই ময়ূরভঞ্জের রাজার আবাস, সেখানে তখন থাকতেন সুচারু দেবী। সঙ্গে ধ্রুবেন্দ্র এবং মেয়ে সিসি। সিসির সঙ্গে রাণুর 'খুব ভাব' ছিল। তাঁরা মাঝে মাঝেই একসঙ্গে বেড়াতেন।[৭]

গ্রেচেন এই ভ্রমণ সম্পর্কে লিখেছেন : '...at Shillong, the hill city of Assam, the Poet and his family have taken a house and borrowed another for me. The house has seven sides opening on a terrace. Seven gardeners salaam each morning with seven nosegays. I trifle with the Poet's correspondence, picnic with Protima near a waterfall, nurse the ill children of three gardeners, and hold daily receptions, none of which justify this so perfect existence.

My neighbour is the Maharani of M[ayurbhanj], whose virtue and wisdom are far above her rubies, the daughter of a great leader of Brahma Samaj [Keshab Chandra Sen].'[৮]

সেই সময়ে ইন্ডিয়ান এডুকেশন সার্ভিসে ঢাকায় কর্মরত সতীশচন্দ্র রায় গ্রীষ্মের ছুটি কাটাতে শিলঙে অবস্থান করছিলেন। তিনি মাঝেমাঝেই রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করতেন। তিনি লিখেছেন : 'তখন একটা ডিনার পার্টি হয় ময়ূরভঞ্জের মহারাণী মাতার বাড়ীতে। এক সাহেব ছোক্‌রা শিলঙে বেড়াতে এসেছিল,— সে হাইল্যাণ্ডার। মেঝের ওপরে দুটো কাঠি দিয়ে নাচ দেখালে,— হাতে তার তরবারি। 'ওয়ার ড্যান্সে'র মত কতকটা। ডিনারে বসে রবীন্দ্রনাথ যেন হাসি-আনন্দের ফোয়ারা ছুটিয়ে দিলেন।'[৯] তিনি আরও একটি ঘটনার উল্লেখ করেছেন :

উনিশশো তেইশ সনের চব্বিশে মে [বৃহ ১০ জ্যৈষ্ঠ] তারিখে একটি জন্মোৎসবের অনুষ্ঠান হয়েছিল ডাক্তার বিধান রায়ের বাড়ীতে। ··· সেবারে রবীন্দ্রনাথও শিলঙে এসেছিলেন। লক্ষ্নৌ বিশ্ববিদ্যালয়ের তদানীন্তন ভাইস্ চ্যান্সেলার ডক্টর জ্ঞান চক্রবর্তীও··· তখন এখানে ছিলেন। তা' ছাড়া আমার শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ এবং আরো কয়েকজন বন্ধু ছিলেন। ওঁদের সকলকে নিমন্ত্রণ করি সেদিনকার টি-পার্টিতে। এতসব বিদ্যানুরাগী পণ্ডিত ও কবির শুভ উপস্থিতিতে বেশ জমেছিল হাসি ও রসালাপে মুখরিত আসরখানি।[১০]

হেম চট্টোপাধ্যায় একটি অনুষ্ঠানে রবীন্দ্রনাথের বাংলা প্রবন্ধ পাঠের কথা উল্লেখ করেছেন : 'স্থানীয় কুইচটচ হলে একদিন তিনি জনকয়েক ভদ্রমহোদয়ের আগ্রহে একটি বাংলা প্রবন্ধ পাঠ করেছিলেন। শিলঙে তখন সাহিত্যের আবহাওয়া ছিলনা বললেই চলে, সাহিত্যিক আসর তো দূরের কথা। সেই জন্যেই সভায় আশানুরূপ জনসমাগম হয়নি। প্রবন্ধ পাঠ হওয়ার পরক্ষণেই কবি সভাস্থল পরিত্যাগ করেছিলেন।[১১]আর কারো বর্ণনায় এই তথ্যের কোনো সমর্থন পাওয়া যায়নি।

শিলঙে রবীন্দ্রনাথের জীবনযাত্রার আরও-কিছু সংবাদ পাওয়া যায় ইংল্যান্ড-প্রবাসী পুত্র নীতীন্দ্রনাথকে লিখিত মীরা দেবীর একটি তারিখহীন পত্রে। তাঁর চিঠি থেকে জানা যায়, অরুণেন্দ্রনাথের কন্যা লতিকা তখন ভাই অজিনেন্দ্রনাথ ও পুত্রকন্যা নিয়ে শিলঙে ছিলেন। তিনি লিখেছেন : "পুপে এখনও ছোট্টখাট্টই আছে তার বয়সী ছেলেদের কাছে তাকে খুবই ছোট দেখায় তবে বুদ্ধিতে সে কারোর থেকে ছোট নয়। সবে একটু দাদা মামা বাবা বলতে শিখেছে কিন্তু আশ্চর্য্য রকম কথা বোঝে। গান শুনতে খুব ভালবাসে শিলংএ রোজ সন্ধ্যেবেলায় বাবার কোলে বসে গান শুনত আর হাত ঘোরাত। 'আজু সব আমুয়া বোলে' গানটা তার সব

চেয়ে পছন্দ সেটা গাইলে সে এত জোরে হাত পা ছুঁড়তে আরম্ভ করে যে তা দেখে কেউ না হেসে থাকতে পারে না। ওর ভঙ্গী দেখে বাবা বলেন বড় হয়ে ও নাচতে শিখবে।"[১২]

আমরা পূর্ববর্তী খণ্ডে জানিয়েছি, চিনদেশ থেকে রবীন্দ্রনাথকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। এলম্‌হার্স্ট যখন চিন ভ্রমণে গেলেন, রবীন্দ্রনাথ তাঁকে প্রস্তাবটি যাচিয়ে দেখতে বলেন। 26 Apr *Peking & Tientsin Time*s পত্রিকা সংবাদ দেয় : 'Tagore to Visit China ...(Chung Mei News Agency)/ Peking, April 25./ Mr. L. K. Elmhirst is now in Peking for a short stay representing Rabindranath Tagore, ... and is paving the way for a visit to China of the former.' 2 May উক্ত পত্রিকাই লিখেছে : 'A cablegram has been received from Rabindranath Tagore, the Indian philosopher, accepting the invitation of the Chinese educationalists to come to China this year. It is expected that Tagore will be in Peking by August and give a series of lectures here and elsewhere in the provinces. He is coming under the auspices that sponsored the visits of Dr. John Dewey of Columbia, and the Hon. Bertrand Russell.' খবরটি ২৯ বৈশাখ [12 May] রবীন্দ্রনাথ প্রশান্তচন্দ্রকে জানিয়েছেন : 'চীন থেকে আমার নিমন্ত্রণ এসেচে। অগষ্ট মাসে যেতে হবে।'[১৩] অবশ্য সেই সময়ে রবীন্দ্রনাথের যাওয়া সম্ভব হয়নি, তিনি কলকাতা থেকে চিন রওনা হন 21 Mar 1924 [৮ চৈত্র ১৩৩০] তারিখে।

বৈশাখ ১৩৩০-এ সাময়িকপত্রে প্রকাশিত রবীন্দ্র-রচনার সুচিটি এখানে সংকলিত হল :

সন্দেশ, বৈশাখ ১৩৩০ [১১ । ১]:

৩২ 'সময় হারা' ['যত ঘণ্টা, যত মিনিট'] দ্র শিশু ভোলানাথ ১৩। ৭৫

শান্তিনিকেতন, বৈশাখ ১৩৩০ [৪ । ৪] :

৩৮–৩৯ 'মন্দির, ২রা ফাল্গুন'

৩৯–৪১ 'বলাকা / (ব্যাখ্যা ও আলোচনা)'

৪৭–৪৯ 'বক্তৃতা / (করাচী নগরে নারীসভায় কবি রবীন্দ্রনাথের ইংরাজী বক্তৃতার সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম)'

৫২ 'গান'

'হাটের ধূলা সয় না যে আর' দ্র গীত ২। ৫৫২; স্বর ৩০

'কালের মন্দির যে সদাই বাজে' দ্র গীত ২। ৫৪৫; স্বর ৩০

দিনেন্দ্রনাথ-কৃত গানগুলির স্বরলিপি ৫২–৫৭ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত হয়।

The Visva-Bharati Quarterly, April 1923 [Vol. I, No. 1]:

1–4 'Visva-Bharati'

4 'My nest weary wings fluttered in the hesitating dusk of dawn'

5–31 'A Vision of India's History' দ্র *EWRT* 3/ 439–58

32 'Tumultuous years bring their voice to your bosom'

ক্ষিতীশচন্দ্র সেন-কৃত কবিতার অনুবাদগুলি যথাক্রমে ‘প্রথম আলোর চরণধ্বনি’ গান ও ‘কথা কও কথা কও’ কবিতার তর্জমা।

The Modern Review, May 1923 [Vol. XXXIII, No. 5] :

573–89 ‘Gora’ 26–3)

শিলঙে গিয়ে সেখানকার মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেশে রবীন্দ্রনাথের শারীরিক ও মানসিক ক্লান্তির অবসান ঘটে। *The Visva-Bharati Quarterly*-র প্রথম সংখ্যা [April 1923] রবীন্দ্রনাথের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়েছিল। তাঁর নিজের রচনা ছাড়াও ভিন্টারনিৎস, জেম্‌স এইচ. কাজিন্‌স্‌, ও. সি. গাঙ্গুলি এবং এফ. বেনোয়া-র চারটি রচনা এই সংখ্যায় মুদ্রিত হয়। রবীন্দ্রনাথ পরের সংখ্যার জন্য প্রস্তুতিও আরম্ভ করে দিয়েছিলেন। এই সংখ্যার সম্পাদক হন সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর; কিন্তু অন্তরাল থেকে রবীন্দ্রনাথ সম্পাদকীয় কাজকর্মের অনেকটাই দেখাশোনা করতেন। ২৯ বৈশাখের পত্রে তিনি প্রশান্তচন্দ্রকে লেখেন :

Paragraphs আকারে আমার একটা লেখা সুরেনকে পাঠিয়েচি। তার পরে, অর্থাৎ পত্রিকার সব শেষে যে কবিতা যাবে এই সঙ্গে পাঠাই। এটা বলাকার তর্জ্জমা। লেখাটার সঙ্গে এর ভাবের যোগ আছে।

সুরেন ক্ষিতিবাবুকে “দাদু” সম্বন্ধে তাঁর লেখাটা পাঠিয়ে দিয়েচে। কিন্তু তিনি আসাম প্রভৃতি নানা দুর্গম স্থানে ঘুরে বেড়াচ্চেন—

ঐ দাদু লেখাটার আগে কিম্বা পরে বলাকার যে তর্জ্জমাটা গেলে ভাল হয় সেটাও পাঠালুম।[১৩]

‘Notes and Comments’ নামে রবীন্দ্রনাথের অনেকগুলি রচনা কোয়ার্টার্লির বিভিন্ন সংখ্যায় মুদ্রিত হয়েছিল— কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, এদের মধ্যে একটি ছাড়া আর-কোনোটিই ড শিশিরকুমার দাশ-সম্পাদিত *The English Writings of Rabindranath Tagore [EWRT]*, Vol. 3 [1996]-তে সংকলিত হয়নি। লেখাগুলি সমসাময়িক কোনো প্রসঙ্গ অবলম্বনে প্রধানত ধর্ম ও দর্শন বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের বিচ্ছিন্ন চিন্তার সংগ্রহ— বাংলা পত্রিকাতেও তিনি এই রকমের রচনা অনেক লিখতেন।

সম্ভবত প্যারাগ্রাফ আকারে লেখাটির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ হিন্দু-মুসলমান সমস্যা ও তার প্রতিকার সম্বন্ধে ‘The Way to Unity’ নামে একটি দীর্ঘ ইংরেজি প্রবন্ধ লেখেন, যেটির কিয়দংশ প্রথমে অশোক চট্টোপাধ্যায়-সম্পাদিত *Welfare* মাসিকপত্রে ও পূর্ণাঙ্গ আকারে জুলাই-সংখ্যা *Visva-Bharati Quarterly* [pp. 83–98]-তে মুদ্রিত হয়। কোনো বাইরের তাগিদ ছাড়া ইংরেজিতে এত বড়ো একটি প্রবন্ধ রচনা করা রবীন্দ্রনাথের পক্ষে স্বাভাবিক নয়, কিন্তু নূতন পত্রিকার আবির্ভাবে এর আগেও তাঁর রচনাস্রোত [অবশ্য বাংলায়] নির্গলিত হওয়ার উদাহরণের অভাব নেই।

বলাকা-র দুটি তর্জমাই ক্ষিতীশচন্দ্র সেনের করা— প্রথমটি ‘This Beggar’s Heart I Cannot Bear!’ [‘তুমি দেবে, তুমি মোরে দেবে’ (১২)] এবং দ্বিতীয়টি ‘With the Song I am a Song’ [‘আজ প্রভাতের আকাশটি এই’ (৩৫)]।

২৮ বৈশাখ [শুক্র 11 May] রবীন্দ্রনাথ অমিয় চক্রবর্তীকে লিখলেন : ‘তুমি এবার শিলঙে এলে খুসি হতুম। আমার শরীর অনেকটা সুস্থ হয়েচে। বিশ্বভারতী ত্রৈমাসিকের জন্যে প্যারাগ্রাফ আকারে একটা লেখা শেষ করেচি। একটা নাটক গোচের একটা কিছু লেখবার ইচ্ছে আছে। তুমি কি ছুটিটা কলকাতাতেই কাটাবে?

যদি আমার কোনো লেখা তর্জ্জমা করে দাও সেটাকে সংস্কার করে বিশ্বভারতী পত্রিকার কাজে লাগানো যেতে পারবে।’[১৪]

‘নাটক গোচের’ লেখাটি হল ‘রক্তকরবী’ নাটকের প্রথম খসড়া। নাটকের মূল বক্তব্যটি বীজের আকারে দীর্ঘদিন ধরে রবীন্দ্রনাথের মনে গড়ে উঠছিল। 1920–21-এ নিউইয়র্ক থেকে তিনি ‘Flowing Oil Well, Shreveport, La—II’ পিকচার-পোস্টকার্ডটি দিনেন্দ্রনাথকে পাঠিয়ে লিখেছিলেন :

ছবিটা ভাল করে দেখ্— কেরোসিন্ তেলের অন্ধকূপ— এর তলায় আছে তেল আর মাথায় উঠ্‌চে ধোঁয়া। এখানকার লক্ষেশ্বরদের এই দশা — এরা নিজের ধোঁয়ার মধ্যে নিজে বিলুপ্ত, সুর্য্যের আলো এদের মানস চক্ষে পৌঁছয় না। বলি রাজা পাতালপুরীর রাজা— তার বল হরণ করেছিলেন বামন অবত্রার। বিষ্ণু ছোট হয়ে বড়কে অভিভূত করেন। সময় এসেচে। যারা এতকাল ছোট হয়ে ছিল, তারাই বড়র ধন হরণ করার জন্যে হাত বাড়িয়েচে— বড় ভয়ে কম্পান্বিত, চারদিকে দুর্গপ্রাচীর শক্ত করে গেঁথে তুল্‌চে— কিন্তু দৈত্যভায়ার পাপের ধন আর টিক্‌বে না।[১৫]

14 Jan 1921 তিনি অ্যান্ডরুজকে লেখেন : ‘To me, humanity is rich and large and many-sided. Therefore, I feel deeply hurt when I find that, for some material gain, man’s personality is mutilated in the westem world and he is reduced to a machine. The same process of repression and curtailment of humanity is often advocated in our country under the name of patriotism.’[১৬] অন্যত্রও এই ধরনের মন্তব্যের অভাব নেই।

উক্ত উদ্ধৃতিতে দেখা যায়, রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে যন্ত্র শব্দটির তাৎপর্য বহুমুখী। পরে বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন উপলক্ষে তিনি রক্তকরবী-র মর্ম ব্যাখ্যা করেছেন। সম্ভবত এর প্রথমটিকে ‘নাট্যপরিচয়’ নামে পাওয়া যায় নাটকটির দ্বিতীয় খসড়ায় [রবীন্দ্রভবন সংগ্রহণ-সংখ্যা Ms. 151 (v)], যেটি অপরিবর্তিত আকারে প্রচলিত রক্তকরবী গ্রন্থে [দ্র ১৫। ৩৪৩–৪৪] গৃহীত হয়েছে। এখানে রবীন্দ্রনাথ নাটকটির ঘটনাস্থল ও বিভিন্ন প্রধান চরিত্রের বিবরণ দিয়ে একে সত্যমূলক আখ্যা দিয়ে লিখেছেন : ‘এইটুকু বললেই যথেষ্ট যে কবির জ্ঞানবিশ্বাস-মতে এটি সম্পূর্ণ সত্য।’ রবীন্দ্রজীবনী-কার জানিয়েছেন : ‘শিলঙে এই সময়ে অধ্যাপক রাধাকমল মুখোপাধ্যায় আছেন—কবির সহিত তাঁহার দেখাসাক্ষাৎ হয় প্রায়ই। রাধাকমল অল্পকাল পূর্বে বোম্বাই-এর শিল্পকেন্দ্রের শ্রমিকদের অবস্থা স্বচক্ষে দেখিয়া আসিয়াছিলেন— সেই-সব কথা তিনি কবির কাছে গল্পচ্ছলে বলেন। রাধাকমল জীবনীলেখককে বলিয়াছেন যে কবি খুব মনোযোগ দিয়া তাঁহার কথাগুলি শুনিতেন; তখন কি তিনি জানিতেন যে কবির মনে একটি নাটকের প্লট জুটিতেছে।’[১৭] তিনি টীকায় লিখেছেন : ‘১৯৪৮ সালের ২৫ অক্টোবর লখনৌতে জীবনীলেখককে অধ্যাপক রাধাকমল এই তথ্যগুলি বলেন।’ উল্লেখ্য, এই রাধাকমলই ১৩২১ সালে ‘রবীন্দ্র-সাহিত্য বস্তুতন্ত্রহীন’ অভিযোগ করে ‘সাহিত্যের আভিজাত্য’, ‘সাহিত্যে বাস্তবতা’ প্রভৃতি প্রবন্ধ রচনা করেছিলেন। পাঠককে স্মরণ করানো যেতে পারে, রক্তকরবী-তে একটি অধ্যাপক চরিত্র আছে যিনি ‘বস্তুবাগীশ’ নামে আখ্যাত।

এইবার গ্রীষ্মকালে শিলঙে রাধাকমলের মতো দীনেশচন্দ্র সেন, ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় প্রভৃতি কিছু বিশিষ্ট ব্যক্তির সমাগম হয়েছিল। অধ্যাপক ড বিশ্বনাথ রায় কয়েকটি রচনায় রক্তকরবী-র সত্যমূলকতার প্রমাণ খুঁজেছেন এঁদের মধ্যে— তিনি উক্ত দুজনকে যথাক্রমে পুরাণবাগীশ ও চিকিৎসক চরিত্রের মূল বলে চিহ্নিত করেছেন। এ ছাড়া তিনি কারাবন্দী অনশনরত কবি নজরুল ইসলামের প্রভাব প্রমাণ করতে চেয়েছেন

বিশুপাগল চরিত্রের মধ্যে।[১৮] সাহিত্যালোচনা আমাদের লক্ষ্যবহির্ভূত, তাই প্রসঙ্গটি উল্লেখ করেই ক্ষান্ত হওয়া গেল।

অনুমান করা যায়, 'রক্তকরবী'র নামহীন প্রথম খসড়াটি লেখা শুরু হয়েছিল অমিয় চক্রবর্তীকে লিখিত ২৮ বৈশাখের [11 May] চিঠির অব্যবহিত পরে অর্থাৎ May 1923-র মাঝামাঝি বা জ্যৈষ্ঠ ১৩৩০-এর প্রথম দিকে। রবীন্দ্রভবনে রক্তকরবী-র নয়টি পাণ্ডুলিপি রক্ষিত আছে, আর-একটির উল্লেখ পাওয়া যায় অজ্ঞাত কোনো ব্যক্তির কাছ থেকে পাওয়া ফোটোকপি অবলম্বনে মুদ্রিত 'বহুরূপী' পত্রিকার May টঠঠথসংখ্যায়। তথাকথিত সর্বশেষ পাণ্ডুলিপির সঙ্গে পত্রিকায় প্রকাশিত পাঠ মেলালে অন্তত একাদশতম পাণ্ডুলিপিটির অস্তিত্বও মেনে নিতে হয়। এদের মধ্যে Ms. 151(ix) -সংখ্যা পাণ্ডুলিপিটিকে নিঃসন্দেহে প্রথম খসড়া হিসেবে চিহ্নিত করা চলে— ড প্রণয়কুমার কুণ্ডুর সম্পাদনায় বিস্তৃত টীকাটিপ্পনী-সহযোগে পাণ্ডুলিপিটি 'রবীন্দ্রবীক্ষা' সংকলন ১৬ [পৌষ ১৩৯৩]-তে মুদ্রিত হয়েছে।

৪ পৃষ্ঠার ১০টি সূক্ষ্ম রুলটানা কাগজে কালো কালিতে পাণ্ডুলিপিটি লিখিত, লেখা পৃষ্ঠা ৩৭। প্রত্যেকটি পৃষ্ঠা আড়াআড়িভাবে ভাঁজ করে বাঁ দিকের অংশে মূল পাঠ লেখা হয়েছে, ডান দিকের অংশটি ব্যবহৃত হয়েছে সংযোজন বা সংশোধনের জন্য। সাধারণভাবে রবীন্দ্রনাথ এই পদ্ধতিতেই তাঁর অধিকাংশ রচনা লিপিবদ্ধ করতেন। খসড়াটিতে কোথাও নাটকটির নামের উল্লেখ নেই, রচনাটি সংলাপধর্মী হলেও সংশ্লিষ্ট সংলাপের সঙ্গে পাত্রপাত্রীর নাম উল্লিখিত হয়নি— প্রবেশ-প্রস্থান ইত্যাদি কোনো নাট্যক্রিয়ার নির্দেশও নেই এই খসড়াতে। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য তথ্য এই যে, নাটকের নায়িকার নাম 'খঞ্জন' বা 'খঞ্জনী'— 'নন্দিনী' নয়।

এই নাটক রচনার সময়েই রবীন্দ্রনাথ একটি ঘটনার সংবাদে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন। আমরা পূর্ববর্তী খণ্ডে উল্লেখ করেছি, 'আনন্দময়ীর আগমনে' কবিতা লেখার জন্য রাজদ্রোহের অভিযোগে নজরুলকে গ্রেপ্তার করে কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। রবীন্দ্রনাথের উৎসর্গীকৃত 'বসন্ত' গীতিনাট্যটি নজরুলকে জেলে পৌঁছে দেন তাঁর প্রিয় বন্ধু পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়। কিন্তু এর পরেই অবস্থার অবনতি ঘটে। 14 Apr 1923 [১ বৈশাখ ১৩৩০] নজরুলকে আলিপুর সেন্ট্রাল জেল থেকে বহরমপুর জেলে পাঠাবার নাম করে সাধারণ কয়েদি হিসেবে হুগলি জেলে পাঠানো হয়। নৈহাটি স্টেশনে ট্রেন বদলের সময়ে তাঁকে পরানো হয় সাধারণ কয়েদির পোশাক। এই জেলে যাওয়ার পরে জেল সুপারের আচরণের প্রতিবাদে নজরুল আমরণ অনশন আরম্ভ করেন। খবরটি সরকার প্রথমে গোপন রাখতে সচেষ্ট হলেও প্রায় সপ্তাহ-দুয়েক পরে 28 Apr [১৫ বৈশাখী] আনন্দবাজার পত্রিকা-য় সংবাদটি প্রকাশিত হয়, রবীন্দ্রনাথ তখন কলকাতায়। ড বিশ্বনাথ রায় লিখেছেন : 'তাঁর শারীরিক অবস্থা সংকটজনক হয়ে উঠলে বিচলিত সাহিত্যিক বন্ধুরা রবীন্দ্রনাথের শরণাপন্ন হন। পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় লিখেছেন, "স্থির হল, শিলং-এ কবির কাছে চিঠি লেখা হবে, তিনি কাজীকে অনশন ভাঙতে অনুরোধ করবেন। কিন্তু কবি যা লিখলেন [চিঠিটি পাওয়া যায়নি], তাতে আমরা নিজেদের আরো অসহায় বোধ করলাম। তিনি লিখলেন,— আদর্শবাদীকে আদর্শত্যাগ করতে বলা তাকে হত্যা করারই সামিল। অনশনে যদি কাজীর মৃত্যুও ঘটে তাহলেও তার অন্তরের সত্য ও আদর্শ চিরদিন মহিমময় হয়ে থাকবে।"[১৯] 'পথের দাবী' উপন্যাস বাজেয়াপ্ত হলে রবীন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্রকে যা লিখেছিলেন, তা থেকে মনে হয় তাঁর পক্ষে নজরুল-প্রসঙ্গে অনুরূপ কথা লেখা অসম্ভব নয়। কিন্তু রথীন্দ্রনাথকে লেখা তাঁর একটি তারিখহীন চিঠির বক্তব্য আলাদা :

'নজরুল ইসলামকে Presidency Jailএর ঠিকানায় টেলিগ্রাম পাঠিয়েছিলুম, লিখেছিলুম, Give up hunger strike, our literature claims you,— জেল থেকে memo এসেচে The addressee not found। অর্থাৎ আমার message ওকে দিতে চায় না— কেননা নজরুল প্রেসিডেন্সি জেলে না থাকলেও ওরা নিশ্চয় [জানে] সে কোথায় আছে। অতএব নজরুল ইস্‌লামের আত্মহত্যায় ওরা বাধা দিতে চায় না।'[২০] নজরুল ৯ জ্যৈষ্ঠ [বুধ 23 May] সকালে অনশন ভঙ্গ করেন।

দশটিরও বেশি পাণ্ডুলিপিতে সংশোধিত ও পরিবর্ধিত রক্তকরবী-র কতগুলি পাঠ রবীন্দ্রনাথ শিলঙে রচনা করেছিলেন বলা কঠিন। দ্বিতীয় খসড়ার [151 (v)] ১১৬ পৃষ্ঠার খাতাটি [লিখিত পৃষ্ঠা ১০৯] 'Student Exercise Book, No. 5' কলকাতায় প্রস্তুত, তৃতীয়টিও [151 (iii) ও 151 (iv)] তাই— তবে 'Specially made for/ The KAMALA AGENCY… /SHILLONG', সুতরাং অনুমান করা চলে রক্তকরবী-র প্রয়োজনে এগুলি শিলঙেই কেনা হয়েছিল। এদের মোট পৃষ্ঠা ৬০ ও ৫৪, লিখিত পৃষ্ঠা ৫৯ ও ৪৮]। মনে হয়, অন্তত এই দুটি খাতা শিলঙে ব্যবহৃত হয়েছিল। *12 Jun [মঙ্গল ২৯ জ্যৈষ্ঠ] রবীন্দ্রনাথ প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশকে লেখেন : 'নাটকটা একরকম শেষ হয়েচে। এঁকে নাটক নাম দেওয়া যায় কিনা জানি নে। কলকাতায় শীঘ্র যাচ্চি তখন শুনতেই পাবে। কিন্তু আগেভাগে রামমোহন লাইব্রেরিতে ওটা পড়তে গেলে চল্‌বে না।'[২১] শিলঙেও রক্তকরবী পড়ে শোনাবার কথা লিখেছেন হেম চট্টোপাধ্যায় : " 'রক্ত করবীর' কিছু কিছু লেখা আমাদের পড়ে শোনাতেন। কী যাদু ছিল সেই সুললিত কণ্ঠস্বরে। কথা শুনতে শুনতে সম্মোহিত হয়ে যেতুম।'[২২]

দ্বিতীয় খসড়াটি রবীন্দ্রবীক্ষা সংকলন ১৯ [শ্রাবণ ১৩৯৫]-এ মুদ্রিত হয়েছে। এর প্রধান বৈশিষ্ট্য, নায়িকার নাম খঞ্জনীর পরিবর্তে নন্দিনী এখানেই প্রথম ব্যবহৃত হল [অল্প সময়ের জন্য এই পাঠে 'সুনন্দা' নামটি ব্যবহৃত হয়]; পাত্রপাত্রীর নাম পৃথকভাবে লেখা হল প্রতিটি সংলাপের পূর্বে; নাটকটিকে ৬টি পর্বে সংখ্যা-চিহ্নিত করে বিভক্ত করা হয়েছে; 'নাট্যপরিচয়' শিরোনামে একটি ভূমিকা যুক্ত হয়েছে নাটকের সূচনায়; 'রক্তকরবী' ফুলটির প্রথম উল্লেখ দেখা গেল মাত্র দু'বার— একবার শুরুতে 'আমাকে মানাবে না, আমি পরেচি রক্তকরবী', আর-একবার নাটকের শেষে যুদ্ধযাত্রার পূর্বলগ্নে রাজা নন্দিনীকে বলে, 'তোমার ঐ রক্তকরবীর মালা দাও আমাকে পরিয়ে!' — প্রথম খসড়ার সূত্রপাত হয়েছিল ফাগুলাল-চন্দ্রার সংলাপ দিয়ে, দ্বিতীয় খসড়ার সূচনা রাজা-নন্দিনীর সংলাপে।

তৃতীয় খসড়া মুদ্রিত হয় রবীন্দ্রবীক্ষা সংকলন ২২ [পৌষ ১৩৯৬]-এ। এখানে নাটক শুরু হয়েছে অধ্যাপক-নন্দিনীর সংলাপে।

রক্তকরবী-র এই তিনটি খসড়ায় রবীন্দ্রনাথের কিছুদিন আগে লেখা কয়েকটি গান ছাড়া অনেকগুলি নূতন গানের সন্ধান পাওয়া যায়, তাদের সবগুলি অবশ্য গ্রন্থে ব্যবহৃত হয়নি। এগুলিকে জ্যৈষ্ঠ ১৩৩০-এ রচিত বলে মনে করা যেতে পারে। নূতন গানগুলি হল :

'কাজ ভোলাবার কে গো তোরা' দ্র গীত ৩। ৮০৩–০৪; এর সুর রক্ষিত হয়নি, দ্বিতীয় খসড়াতে এই পাঠের কয়েকটি ছত্রের আভাস নিয়ে রবীন্দ্রনাথ একে একটি নূতন গানে পরিবর্তিত করেন : 'মোর স্বপনতরীর কে তুই নেয়ে'।

‘তোর প্রাণের রস ত শুকিয়ে গেল ওরে’ দ্র গীত ২। ৩৪১; এর কোনো সুর রক্ষিত হয়নি, তবে ‘রক্তকরবী’র প্রকাশিত পাঠে গানটি গৃহীত হয়েছে।

‘ও চাঁদ, চোখের জলের জাগল জোয়ার’ দ্র গীত ২। ৩৬৮, স্বর ১; কয়েকটি পাঠান্তরের মধ্য দিয়ে গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

‘নূতন পথের পথিক আসে সেই পুরাতন সাথি’ দ্র গীত ৩। ৮০৩; পাণ্ডুলিপিতেই এর পাঠান্তর ঘটে, গ্রন্থে বর্জিত।

‘এতদিন পরে মোরে’ দ্র গীত ৩। ৮০২; দ্বিতীয় খসড়াতেই বর্জিত হয়েছে।

‘পৌষ তোদের ডাক দিয়েছে’ দ্র গীত ২। ৪৯৬–৯৭; স্বর ৩০।

‘আমার মনের বাঁধন ঘুচে যাবে যদি’ দ্র গীত ৩। ৮০৩; গ্রন্থে গৃহীত হয়নি।

রক্তকরবী নাটক ছাড়া শিলঙে রবীন্দ্রনাথ সম্ভবত মাত্র একটি বাংলা রচনাই লিখেছিলেন, ‘শিলঙের চিঠি’ [দ্র পূরবী ১৪। ১৭–১৯] নামে একটি ফরমায়েশি দীর্ঘ কবিতা— শোভনা ও নলিনী নাম্নী দুটি বালিকার অনুরোধে ২৬ জ্যৈষ্ঠ [শনি 9 Jun] তারিখে রচিত। রবীন্দ্রজীবনী-কার এঁদের পরিচিতি দিয়ে লিখেছেন : ‘বালিকা দুইটির মধ্যে একটির নাম শোভনা দেবী (বয়স ১৩); পিতা গোপেন্দ্রনারায়ণ বাগচী। গোপেন্দ্রনারায়ণ কবি দ্বিজেন্দ্রনারায়ণ বাগচীর কনিষ্ঠ ও কবি যতীন্দ্রমোহন বাগচীর খুল্লতাত পুত্র। অমিয় চক্রবর্তীর মাসতুতো বোন। দ্বিতীয় বালিকা নলিনী দেবী; স্বর্গীয় অধ্যাপক নিখিলনাথ মৈত্রের কন্যা ও অমিয় চক্রবর্তীর মামাতো বোন।’[২৩] নলিনীর [তালুকদার] সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের দীর্ঘদিন চিঠিপত্র আদানপ্রদানের প্রমাণ রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত আছে। ১৯ আষাঢ় [4 Jul] রবীন্দ্রনাথ তাঁকে লেখেন : ‘আমি আর দুই সপ্তাহ পরে বিসর্জ্জনের অভিনয়ের জন্য কলকাতায় যাব— তখন তোমার সঙ্গে দেখা করে তোমার মুখে শিশু ভোলানাথের কবিতা আবৃত্তি শুনব। শিলঙ থেকে তোমাদের যে কবিতাটি লিখেছিলুম, সেটি দেখ্‌লুম বঙ্গবাণী সম্পাদকের হাতে গেছে, সেটা ওঁরা পেয়ে খুব খুশী হয়েছেন।’[২৪] কবিবরের শিলং অবস্থান কালে এই চিঠিখানির পুরোভাগে উক্ত বালিকা দুইটী শিলং গিরি সম্বন্ধে একটী কবিতার জন্য লিখিলে, প্রত্যুত্তরে তিনি এই চিঠিখানি লিখিয়াছিলেন। শ্রীযুত শিশির কুমার মৈত্র মহাশয়ের সৌজন্যে প্রাপ্ত’ টীকা-সহ কবিতাটি শ্রাবণ-সংখ্যা বঙ্গবাণী-তে [পৃ ৬৭৭–৮০] মুদ্রিত হয়।

শিলং থেকে রবীন্দ্রনাথের সম্ভবত ত্রিপুরা যাওয়ার কথা ছিল, কিন্তু পাহাড় অঞ্চলে প্রবল বৃষ্টি নামায় সেই যাত্রা পরিত্যক্ত হয়। আনন্দবাজার পত্রিকা [৭ আষাঢ়] থেকে সংবাদটি পাওয়া যায় : ‘রবীন্দ্রনাথের আগরতলা যাত্রা :— গত ১৬ই [Jun:১ আষাঢ়] তারিখে রবীন্দ্রনাথের শিলং হইতে আগরতলা পৌঁছিবার কথা ছিল। কিন্তু এ, বি, রেলের হিলসেক্সন্ বন্যার দরুণ বন্ধ হইয়া যাওয়াতে তিনি আসিতে পারেন নাই।’[২৫] এইজন্য তিনি কলকাতায় প্রত্যাবর্তনের সিদ্ধান্ত নিয়ে ৩০ জ্যৈষ্ঠ [বুধ 13 Jun] দৌহিত্র নীতীন্দ্রনাথকে জানান : ‘আমরা কাল আবার কলকাতায় ফিরে যাচ্ছি। জুলাই মাসে শান্তিনিকেতনের ইস্কুল খুলবে, তখন সেখানে যাব।’[২৬] এই পত্র অনুযায়ী অনুমান করা যায় রবীন্দ্রনাথ সপরিবারে ৩২ জ্যৈষ্ঠ [শুক্র 15 Jun] কলকাতায় রওনা হন। সীতা দেবী লিখেছেন : “ফিরিয়া আসিলেন জুন মাসের মাঝামাঝি। শুনিলাম নূতন একখানি নাটক

লিখিয়া আনিয়াছেন, সকলকে শুনিবার জন্য ডাকিয়া পাঠাইলেন। নাটকটির প্রথম নামকরণ হয় 'যক্ষপুরী', পরে বদলাইয়া 'রক্তকরবী' নাম দেন।"[২৭] আনন্দবাজার পত্রিকাও [১৪ আষাঢ়] সংবাদটি পরিবেশন করে : 'রবীন্দ্রনাথ আর একখানি নূতন নাটক লিখিয়াছেন। তাহার নাম "যক্ষের ধন"। নাটকখানি তিনি ঠাকুরবাড়ীতে একটি সাহিত্যিক মজলিশে পাঠ করিয়াছেন।'[২৮] উল্লেখ্য, কোনো পাণ্ডুলিপিতেই 'যক্ষপুরী' বা 'যক্ষের ধন' নাম লেখা নেই, পঞ্চম খসড়ার [151 (i–ii)] দুটি খাতায় যথাক্রমে 'নন্দিনী ১' ও 'নন্দিনী ২' নাম রবীন্দ্র-হস্তাক্ষরে পাওয়া যায়।

গ্রীষ্মবকাশের পরে বিশ্বভারতী খোলে ১১ আষাঢ় [মঙ্গল 26 Jun]। রবীন্দ্রনাথ কলকাতায় ফিরে কয়েকদিন সেখানেই ছিলেন ও কয়েকটি অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে পরে শান্তিনিকেতনে যান।

জ্যৈষ্ঠ ১৩৩০-এ রবীন্দ্রনাথের নিম্নলিখিত রচনাগুলি বিভিন্ন সাময়িকপত্রে মুদ্রিত হয় :

প্রবাসী, জ্যৈষ্ঠ ১৩৩০ [২৩। ১। ২] :

২৩২ 'দূর-দেশী সেই রাখাল ছেলে' দ্র গীত ২। ৫৮১–৮২; স্বর ১

'বিদায়' ['ভরা থাক স্মৃতিসুধায়'] দ্র গীত ২। ৩৬৬–৬৭; স্বর ৩১

'পাখী ও চাঁপা' ['পাখী বলে— চাঁপা আমারে কও'] দ্র গীত ২। ৫৮৫; স্বর ৩০

শান্তিনিকেতন, জ্যৈষ্ঠ ১৩৩০ [৪। ৫] :

৫৯–৬৬ 'উত্তর ভারতীয় বঙ্গ সাহিত্যসম্মিলনে সভাপতির অভিভাষণ' দ্র সাহিত্যের পথে ২৩। ৪৬৭–৭৭

৬৬–৬৮ 'সভাপতির শেষ বক্তব্য' দ্র ঐ ২৩। ৪৭৭–৮১

৭৪ 'গান' ['তোমার শেষের গানের রেশ নিয়ে কানে'] দ্র গীত ২। ২৮০, স্বর ৩০

৭৬ 'নাই বা এলে সময় যদি নাই' দ্র গীত ২। ৩৩১–৩২; স্বর ৩০

দিনেন্দ্রনাথ গানগুলির স্বরলিপি করেন [প ৭৪–৭৬, ৭৬–৭৮]।

বঙ্গবাণী, জ্যৈষ্ঠ ১৩৩০ [২।১। ৪] :

৪১৫ 'গান' ['তোমার বীণায় গান ছিল, আর'] দ্র গীত ২। ৩৬৮–৬৯; স্বর ৩০

সংহতি, জ্যৈষ্ঠ ১৩৩০ [১। ১] :

'সংহতি' দ্র র° র° ১৫ [প.ব. ১৪০৬]। ৮১০–১১

রচনাটি শ্রাবণ-সংখ্যা প্রবাসী-র 'কষ্টি পাথর'-এ উদ্ধৃত হয় [দ্র পৃ ৫০৮–০৯]। জ্ঞানাঞ্জন পাল ও মুরলীধর বসুর সম্পাদনায় এই স্বল্পজীবী পত্রিকাটির প্রকাশ উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথ রচনাটি লিখে দেন।

The Modern Review, June 1923 [Vol. XXXIII, No. 6]:

655–75 'Gora' 32–40

'সংহতি' রচনাটি ফরমায়েশি, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের সমাজতান্ত্রিক ভাবনার একটি দৃষ্টান্ত হিসেবে উল্লেখের দাবি রাখে। তিনি লিখেছেন, এতদিন য়ুরোপের রাষ্ট্রিক প্রতাপ দাসের কাঁধে চড়ে জগৎজয় করে বেড়াত। দাসের দল ভেবেছিল যারা তাদের চালাচ্ছিল তারা যেহেতু ক্ষমতাশালী ও চতুর, অতএব তাদের দাসত্ব করে যেতেই হবে। ইদানীং তারা এই সহজ কথাটা আবিষ্কার করেছে যে, তারা না চালালে উপরওয়ালারা অচল—

অতএব বর্তমানের ঐশ্বর্য তাদেরই হাতে। এই আবিষ্কারের জোরে বর্তমান সভ্যতার বাহনের দল মাঝে মাঝে কাঁধঝাড়া দিতে আরম্ভ করেছে— আর উপরে যারা বসে আছে তারা অত্যন্ত বিচলিত হয়ে উঠেছে। শক্তির যে-উপলব্ধির উপরে তারা চড়ে বসেছিল সেই উপলব্ধিটা নীচে বাহনের মধ্যে প্রবেশ করেছে।

এই বাহনদের সংহতিই যে মানুষের সকল সংহতির চেয়ে বড়ো তা রবীন্দ্রনাথ মনে করেন না। কেননা এখানেও দ্বন্দ্বের প্রভাব। 'শক্তি উপরে বসেও নখদন্ত চালনা করে, নীচে নেমেও সে বৈষ্ণব হয়ে ওঠে না। আমেরিকায় দক্ষিণ আফ্রিকায় অস্ট্রেলিয়ায় এশিয়বাসীদের সঙ্গে পাশ্চাত্যদের যে অন্যায় বিরোধ দেখা যায়, তার মধ্যে কেবল যে ধনীদের হাত আছে তা নয়, ধনের বাহনদেরও হাত আছে।'

য়ুরোপে কর্মজীবীদের যে দল গড়ে উঠেছে, আশা করা যায়, সেই দল একদিন নেশনের বেড়াকে সম্পূর্ণ অতিক্রম করবে, কারণ ধনের রথযাত্রায় যে দড়িটায় টান দিতে হচ্ছে সেই দড়িটা সমস্ত পৃথিবীর উপরেই বিস্তৃত, টান দিচ্ছে সকল দেশের মানুষ। এই দড়িটার ঐক্যে তারা এক, একে অবলম্বন করেই তাদের ঐক্য দৃঢ় হবে। যদি এই ঐক্যবন্ধন সম্পূর্ণ হয় তা হলে পৃথিবীতে একদিন একটি প্রচণ্ড শক্তির উদ্ভব হবে। 'এই দুঃসহ শক্তির প্রলোভনই সোভিয়েট সম্প্রদায়কে বিচলিত করেছিল। তারা তাড়াতাড়ি এইটেকে জাগ্রত এবং অধিকার করতে লোলুপ হয়ে উঠেছিল। এবং সকল লোলুপতারই যে লক্ষণ, নিষ্ঠুরতা ও জবরদস্তি— তা সেখানেও দেখা দিয়েছিল।'

লক্ষণীয়, রবীন্দ্রনাথ 1923-তেই সোভিয়েত শাসন সম্পর্কে অতীতকালের ক্রিয়া ব্যবহার করেছেন, তার ইতিহাস তখন মাত্র ছ'বছরের পুরোনো— লেনিন যথেষ্ট অসুস্থ হলেও তখনও বেঁচে, কম্যুনিজমের নামে স্তালিনের স্বৈরতন্ত্র তখনও পূর্ণমূর্তিতে আবির্ভূত হয়নি। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ইতিহাসের বক্রগতি সম্পর্কে সচেতন ছিলেন; তাই লিখলেন : 'শক্তির লীলা সমাজের উপরের স্তরে আপনার ভাঙাগড়ার কাজ অনেকদিন ধরে করে এসেছে। এই শক্তি এবার নীচের স্তরে আপনার কাজ করবে বলে উদ্যোগ করছে। ··· এই স্তরে যখন তার আধিপত্য দেখা দেবে তখনি যে মানুষের সকল পাপ মোচন হবে, আর শক্তি তার শৃঙ্খল রচনার চিরকেলে ব্যাবসা ছেড়ে দিয়ে রাতারাতি মানুষের মুক্তি-সাধনায় প্রবৃত্ত হবে এ কথা আমি বিশ্বাস করি নে। তবে এই কথা সত্য যে, সুখ-দুঃখ ভালো-মন্দের প্রবল সংঘাতের দ্বারাতেই শক্তি সৃষ্টিকার্যের প্রয়োজন সাধন করে—··· সমাজের নীচের তলার যে-উপকরণভাণ্ডারে এতদিন শক্তির কারখানাঘর বসে নি আজ সেখানে যদি বসে, তা হলে মানুষ তাতে করে নিছক সুখ পাবে না, তাকে অনেক নতুন নতুন ব্যথা সইতে হবে। সৃষ্টিকার্যে এই ব্যথার দরকার আছে। অতএব তার জন্যে প্রস্তুত থাকাই ভালো।'

এই প্রবন্ধ জানায়, রক্তকরবী-র কল্পনা রবীন্দ্রনাথের সমাজচিন্তার কোন গভীর স্তর থেকে উৎসারিত হয়েছিল।

এই বৎসরে বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের চতুর্দশ অধিবেশন নৈহাটির অন্তর্গত কাঁঠালপাড়ায় বঙ্কিমচন্দ্রের জন্মস্থানে অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতি বর্ধমানের মহারাজা বিজয়চাঁদ মহতাব, অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি হরপ্রসাদ শাস্ত্রী। প্রধানত তাঁরই নির্বন্ধাতিশয্যে রবীন্দ্রনাথ অধ্যাপক নীহাররঞ্জন রায়ের [1903–81] সঙ্গে মোটরযোগে নৈহাটি যান সম্মিলনের প্রথম দিন ৮ আষাঢ় [শনি 23 Jun]। অপরাহ্ণ প্রায় ৩টার সময়ে 'সভাস্থলে পদার্পণ করিলে তাঁহাকে সমুচিত অভ্যর্থনা করা হয়। সভাপতির বিশেষ অনুরোধে রবীন্দ্রনাথ অতি মনোহর কবিত্বপূর্ণ ভাষায় নবযুগের সাহিত্য ও বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে দু'একটি কথা বলেন। বক্তৃতা স্বল্পকাল ব্যাপী

হইলেও সমস্ত সভা মন্ত্রমুগ্ধবৎ তাহা শুনিয়াছিল।'[২৯] ভাষণটির জ্ঞানেন্দ্রনাথ শাস্ত্রী-কৃত অনুলিপি বঙ্গীয় চতুর্দশ সাহিত্য-সম্মিলনের 'কার্য-বিবরণী পুস্তক'-এ ছাপা হয় [দ্র 'ব্যক্তিসঙ্গ-পরিশিষ্ট' ৩১। ১৭৭—৭৯]। ১২ আষাঢ় আনন্দবাজার পত্রিকা-য় মুদ্রিত তার সারমর্মটি উদ্ধৃত করছি :

রবীন্দ্রনাথ বলেন যে নব্যবাঙ্গলা সাহিত্যের ভগীরথ বঙ্কিমচন্দ্রের স্মৃতির উদ্দেশে অর্ঘ্য দিতেই নৈহাটী সম্মিলনে আসিয়াছেন। বঙ্কিমচন্দ্র বাঙ্গলার গ্রাম্য-সাহিত্যের ভাবকে বিশ্ব-সাহিত্যের উপকরণরূপে গড়িয়াছেন, টোলের পণ্ডিত ও কর্মীনবীশেরা তাঁহাকে যে সমস্ত শৃঙ্খল পরাইয়াছেন, তাহা স্বহস্তে মোচন করিয়া তিনি বাঙ্গলা ভাষাকে মুক্ত করিয়া দিয়াছেন। তিনি কেবল সাহিত্যের বিজয়যাত্রার পথই তৈরী করেন নাই, রথও নিজে গড়িয়াছিলেন। তখনকার দিনে সে যে কত বড় কৃতিত্ব তাহা আধুনিকেরা বুঝিতে পারিবেন না। বঙ্কিমচন্দ্র বাঙ্গলা-সাহিত্যের শৈশবে যে বীজ বপন করিয়াছিলেন, তাহাই আজ অরণ্যকে বহন করিয়া আনিয়াছে। অতএব বঙ্কিমের নিকট বাঙ্গলাসাহিত্যের ঋণের পরিমাণ করা যায় না।[২৯]

কয়েকদিন পরে ১৩ আষাঢ় [বৃহ 28 Jun] সন্ধ্যা সাড়ে ছ'টায় ভবানীপুর ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরে কালীঘাট সাহিত্য সম্মিলনীর দ্বিতীয় পূর্ণিমা মিলনে রবীন্দ্রনাথের সভাপতিত্বে বিপিনচন্দ্র পাল 'বাংলার নবযুগে বঙ্কিম-সাহিত্য' বিষয়ে বক্তৃতা করেন। বিপিনচন্দ্র বাংলা সাহিত্যকে তিনটি যুগে বিভক্ত করে প্রথম যুগটিকে ব্রাহ্মযুগ আখ্যা দিলে রবীন্দ্রনাথ সভাপতির ভাষণে এইরূপ সাম্প্রদায়িক যুগবিভাগ সম্পর্কে আপত্তি জানান। তাঁর ভাষণটি শ্রুতিলিখিত হয়ে ভাদ্র-সংখ্যা নবভারত-এ প্রকাশিত হয়। সেখান থেকে সেটি পুনর্মুদ্রিত হয় কার্তিক-সংখ্যা শান্তিনিকেতন-এ [পৃ ১৫৮—৬১]। তাঁর মতে, বাংলা গদ্যসাহিত্যের যে-যুগকে বিপিনচন্দ্র ব্রাহ্মযুগ বলছেন সেই যুগের লেখকদের দৃষ্টি গিয়েছিল আমাদের আচারমূলক ধর্ম থেকে মুক্তির সাধনার দিকে, একে সাম্প্রদায়িকতা বলা উচিত নয়। নবযুগের য়ুরোপের সঙ্গে পরিচয়ের অভিঘাতে যে প্রকাশের উদ্যম দেখা দিয়েছিল সেটিকে নবযুগের ভাবী বাহকদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার উদ্দেশ্যে পাঠ্যপুস্তক রচনায় প্রবৃত্ত করেছে। স্বভাবতই সাহিত্যের এই আদিপর্বটি ভিত খোঁড়া আর মালমসলা সংগ্রহের পর্ব। যৌবনের বার্তাটি এসে পৌঁছল বঙ্কিমচন্দ্রের কাছ থেকে।

বিপিনচন্দ্র বলেছিলেন, বঙ্কিমসাহিত্যে একটি message আছে। রবীন্দ্রনাথ বলেন, 'সাহিত্যের মন্দিরে message নামক পদার্থটিকে সর্বোচ্চ চূড়ার মত খাড়া করে তোলা আমি ভাল বুঝিনে।' বঙ্কিম বলেছেন, ইংরেজ রাজত্বে আমাদের প্রয়োজন ছিল বহির্বিষয়ক জ্ঞান লাভ করার জন্য। রবীন্দ্রনাথের মতে, যেহেতু ইংরেজের হাতেই সেই জ্ঞান পরিবেশনের ভার ছিল সেই কারণে ইংরেজ নিজেদের স্বার্থেই আমাদের অনেকটা বঞ্চিত করেছে; তাই এর জন্য তিনি ইংরেজের কাছে কৃতজ্ঞ হতে রাজি নন। 'সাহিত্যে আনন্দরূপের সৃষ্টি হয়, তা ভুল মেসেজ নিয়েও হতে পারে। আমি সেখানেই আনন্দ পাই এবং সেখানেই আমি বঙ্কিমের কাছে কৃতজ্ঞ যেখানে মেসেজ দেননি, যেখানে উনি আপনার সৃষ্টি করবার আনন্দকে রূপ দান করেছেন।'

১৬ আষাঢ় [রবি 1 Jul] রবীন্দ্রনাথ শিবপুর ইনস্টিট্যুটের সপ্তম বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন। বহুদিন আগে ২৯ পৌষ ১৩২৪ শরৎচন্দ্র একবার এই প্রতিষ্ঠানে রবীন্দ্রনাথকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন, সেবার তিনি আসতে পারেননি। তাই এবারে এই অধিবেশনে 'আধুনিক সাহিত্যের কৈফিয়ৎ' নামে একটি প্রবন্ধ পাঠ করতে গিয়ে তিনি বলেন, 'সমস্ত বিশ্বের বরণীয় কবি আজ আমাদের সভাপতি। অনেক কষ্টে তাঁহাকে সংগ্রহ করিয়াছি।'[৩০] এই সভায় রবীন্দ্রনাথের ভাষণের বিবরণ পাওয়া যায়নি।

১৭ আষাঢ় [সোম 2 Jul] 'গুরুদেবের আগমন দিনে ষ্টেশনে কুলীখরচ' ইত্যাদি ক্যাশবহির হিসাব দেখে অনুমান করা যায়, রবীন্দ্রনাথ হয়তো এইদিন কলকাতা থেকে শান্তিনিকেতনে আসেন। এসেই তিনি রক্তকরবী

নাটকটি আশ্রমবাসীদের পড়ে শোনান; ১৯ আষাঢ় তিনি অমিয় চক্রবর্তীকে লিখলেন : 'আমার নূতন নাটকটি পড়া হয়ে গেল।'[৩১] আষাঢ়-সংখ্যা শান্তিনিকেতন-এ লেখা হয় : "সেই নাটকটি তিনি আশ্রমে দুইদিন পড়িয়া শুনাইয়াছেন। নাটকটির নাম 'যক্ষপুরী'।"

এই সময়ে আশ্রমে অনেক অতিথি। লখনৌ বিশ্ববিদ্যালয়ের দুই অধ্যাপক রাধাকুমুদ ও রাধাকমল মুখোপাধ্যায় ২০ ও ২১ আষাঢ় যথাক্রমে 'প্রাচীন ভারতে শিক্ষাপদ্ধতি' ও 'বৌদ্ধজাতকে শিক্ষাপদ্ধতি' এবং 'ভারতের অর্থনীতি' বিষয়ে বক্তৃতা করেন। আইরিশ অধ্যাপক জেম্‌স্‌ এইচ. কাজিন্‌স্‌ ২২ ও ২৩ আষাঢ় আইরিশ সাহিত্য বিষয়ে ভাষণ দেন।

শান্তিনিকেতনে এসে বর্ষার প্রকৃতির স্পর্শে রবীন্দ্রনাথের মনে গানের আবহ ঘনিয়ে এল। এ-যাত্রায় তিনি তিনটি বর্ষার গান লেখেন :

২৪ [সোম 9 Jul] 'আকাশতলে দলে দলে মেঘ যে ডেকে যায়' দ্র গীত ২। ৪৪৪; স্বর ৩০;

২৫ 'পথিক মেঘের দল জোটে ওই' দ্র গীত ২। ৪৫০; স্বর ৩১;

২৬ 'ধরণী, দূরে চেয়ে কেন আজ আছিস জেগে' দ্র গীত ২। ৪৬৫; স্বর ৩০।

16 Aug [৩১ শ্রাবণী] রবীন্দ্রনাথ দৌহিত্র নীতীন্দ্রনাথকে লেখেন : 'বর্ষামঙ্গলের নতুন গান তৈরি করে ঠিক করে রেখেছিলুম, কিন্তু এবারে যে রকম দেরী হয়ে গেল তাতে বর্ষামঙ্গল হওয়া আর সম্ভব রইল [না]। এখন ত ভাদ্রমাস এল বলে।'[৩২] আমাদের অনুমান, উপরে উল্লিখিত বর্ষার গানগুলি বর্ষামঙ্গল অনুষ্ঠানের কথা মাথায় রেখেই রচিত হয়। শান্তিনিকেতন পত্রিকার ভাদ্র, আশ্বিন, কার্তিক ও অগ্রহায়ণ সংখ্যায় মুদ্রিত তারিখহীন চারটি বর্ষাগীতিও হয়তো এই সময়েই লেখা :

'আষাঢ় কোথা হতে আজ পেলি ছাড়া' দ্র গীত ২। ৪৪৪, স্বর ৩০

'ছায়া ঘনাইছে বনে বনে' দ্র গীত ২। ৪৪৫, স্বর ৩০

'কদম্বেরই কানন ঘেরি' দ্র গীত ২। ৪৪৪; স্বর ৩০

'এই শ্রাবণ-বেলা বাদল-ঝরা দ্র গীত ২। ৪৪৫, স্বর ৩০

অতুলপ্রসাদ সেনের কাছ থেকে লখনৌ আমের ঝুড়ি পেয়ে রবীন্দ্রনাথ ২৬শে তাঁকে লিখলেন : 'আগামী কাল কলকাতায় যাচ্ছি। আগামী ২৮। ২৯। ৩০শে জুলাই বিসর্জ্জনের অভিনয় হবে— আমি তা'তে আবদ্ধ আছি। তুমি দেখ্‌তে আস্‌তে পারবে ত? এই সমস্ত উপদ্রব নিয়ে কলকাতায় দীর্ঘকাল কাটাতে হবে।'[৩৩] পরদিন ২৭ আষাঢ় [বৃহ 12 Jul] 'শ্রীযুত এণ্ড্রুজ সাহেব ও রাণুকে লইয়া গুরুদেবের কলিকাতা গমনের খরচ' দেখে জানা যায়, তাঁরা কলকাতায় ফিরে গেছেন।

কলকাতায় 'বিসর্জন' অভিনয়ের পরিকল্পনাটি গত বৎসর 'বর্ষামঙ্গল' উৎসবের সমকালীন, ৯ শ্রাবণ ১৩২৯ [?] রবীন্দ্রনাথ রাণুকে লিখেছিলেন: 'এর পরে একদিন বিসর্জ্জন অভিনয় হবার কথা চল্‌চে।'[৩৪] পরিবর্তে অভিনীত হয় শারদোৎসব [ঋণশোধ] নাটক। বর্তমান বৎসরে ১৪ আষাঢ় [29 Jun] আনন্দবাজার পত্রিকা-য় সংবাদ প্রকাশিত হল : 'শীঘ্রই বিশ্বভারতীর সাহায্যকল্পে কবিবর রবীন্দ্রনাথের "বিসর্জ্জন" নাটকের অভিনয় হইবে। রঘুপতির ভূমিকায় স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ অবতীর্ণ হইবেন। জোড়াসাঁকো ঠাকুর বাড়ীতে নাটকের মহড়া চলিতেছে।'[৩৫] সীতা দেবী লিখেছেন :

এই সময় হইতেই 'বিসর্জন' অভিনয়ের আয়োজন চলিতে লাগিল। প্রতিমা দেবী একদিন বিকালে চা খাইতে নিমন্ত্রণ করিলেন, সেই সুযোগে রিহার্সালও দেখিয়া আসিলাম। আমার খুড়তুতো ভাই শ্রীমান হেমন্ত ও শ্রীমান অশোক দুজনেই দলে ভিড়িয়াছেন দেখিলাম। হেমন্ত গ্রামবাসী সাজিয়াছেন ও আশোক সাজিয়াছেন চাঁদপাল। রবীন্দ্রনাথ সেদিন রঘুপতির ভূমিকায় অভিনয় করিলেন। এ তাঁহার এক নূতন রূপ দেখিলাম। অভিনয় তো তাঁহাকে অসংখ্যবার করিতে দেখিয়াছি, কিন্তু তাহা অভিনয় বলিয়াই প্রায় বোধ হই না। যেন তিনি রবীন্দ্রনাথ রূপে দাঁড়াইয়া নিজেরই কথা বলিয়া যাইতেছেন। কিন্তু রঘুপতির ভূমিকায় তাঁহার নূতন মুর্তি দেখিলাম।[৩৬]

রবীন্দ্রনাথ অবশ্য রঘুপতির ভূমিকায় অভিনয় করেননি, কিন্তু সে পরবর্তীকালের ব্যাপার। রাণু গ্রীষ্মবকাশে শিলং ভ্রমণে তাঁর সঙ্গিনী হয়েছিলেন, কিন্তু তার পরেও তিনি কাশী ফিরে যাননি বিসর্জন নাটকে অভিনয়ের কারণে। রবীন্দ্রনাথ তাঁকে অপর্ণার ভূমিকায় মনোনীত করেন। রাণু-যে অভিনয়ে খুব-একটা পারদর্শিনী ছিলেন তা নয়। অনেকেই তাঁর অভিনয়-সাফল্য নিয়ে সংশয়াপন্ন ছিলেন। মীরা দেবী কলকাতা থেকে একটি তারিখহীন পত্রে প্রবাসী পুত্রকে লিখেছিলেন : 'এখানে বিসর্জ্জন অভিনয় হবে তাই আমরা এখনও বোলপুরে যাইনি। কলকাতার লোকেই অভিনয় করবে বোলপুরের কেউ থাকবে না। বাবা রঘুপতি, দাদা গোবিন্দমাণিক্য সৌম্য জয়সিংহ সংজ্ঞা বোঠান গুণবতী, রাণু অপর্ণা হয়েছে। ও বাড়ির হাসির ছেলে তাতার পার্ট এমন সুন্দর আধ ২ করে বলে বড় ভাল লাগে। রাণু ছাড়া আর সকলেরই বোধহয় ভাল হবে।'[৩৭] সম্ভবত এই কারণেই অভিনয়শিক্ষায় যাতে কোনো ছেদ না পড়ে সেইজন্য রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে যাওয়ার সময়ে রাণুকে সঙ্গে করে নিয়ে যান। 3 Jul [১৮ আষাঢ়] প্রশান্তচন্দ্র কলকাতা থেকে শান্তিনিকেতনে রথীন্দ্রনাথকে চিঠিতে জানতে চেয়েছেন : 'ওখানে রিহার্শাল কেমন চলছে··· রাণু কি improve করছে?'[৩৮]

সীতা দেবীর স্মৃতিকথায় আছে যে, রবীন্দ্রনাথ প্রথমে রঘুপতির ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন, মীরা দেবীর চিঠিতেও তার সমর্থন পাওয়া গেল। কিন্তু আষাঢ়-সংখ্যা শান্তিনিকেতন-এর [নিশ্চয়ই অনেক পরে প্রকাশিত হয়েছিল] 'আশ্রম-সংবাদ'-এ খবর দেওয়া হয় : 'শীঘ্রই কলিকাতায় গুরুদেবের বিসর্জ্জন নাটকের অভিনয় হইবে। এই অভিনয়ে পূজনীয় গুরুদেব জয়সিংহের ভূমিকা গ্রহণ করিবেন।'

এর আগে বিসর্জন-এর যে-অভিনয়গুলিতে রবীন্দ্রনাথ যুক্ত ছিলেন, তার প্রত্যেকটিতেই তিনি রঘুপতির ভূমিকাতে অবতীর্ণ হয়েছিলেন— এবারেও মহড়া শুরু হয়েছিল সেইভাবেই। কিন্তু সম্ভবত অভিনয়ে রাণুর অস্বাচ্ছন্দ্য কমাবার অভিপ্রায়ে রবীন্দ্রনাথ জয়সিংহের ভূমিকা নেওয়ার কথা ভাবেন, যদিও তাঁর বয়স তখন এই চরিত্রাভিনয়ের প্রতিকূল ছিল— কিংবা সেই প্রতিবন্ধকতা কাটিয়ে অভিনয়-সামর্থ্য প্রমাণের জেদ তাঁকে এই ভূমিকা গ্রহণে প্রণোদিত করে।

এই অভিনয়ের জন্য রবীন্দ্রনাথ নাটকটিকে নবরূপ দান করেন। রবীন্দ্রভবনে এর পাণ্ডুলিপি রক্ষিত আছে [Ms. 134 (i)]। রুল-টানা এক্সারসাইজ খাতা ভাঁজ করে ডানদিকে মূলগ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণের কোনো মুদ্রণের ছাপা পাঠ জুড়ে পাণ্ডুলিপিটি প্রস্তুত করা হয়, বাঁদিকে মঞ্চনির্দেশ সংশোধন-সংযোজন ইত্যাদি করা হয়েছে। মুদ্রিত রচনার স্থানবিশেষ বর্জিত হয়েছে লেড বা নীল পেনসিলে কেটে দিয়ে। বিসর্জন-এর প্রথম সংস্করণ থেকে হাসি, তাতা [ধ্রুব] ও কেদারেশ্বর চরিত্রগুলি ফিরিয়ে আনা হল। যাত্রার বিবেক-এর মতো একটি চরিত্র এখানে যুক্ত হয়েছে— যার কাজ শুধু গান গাওয়া, ইংরেজিতে ছাপা চরিত্রলিপিতে তিনি 'World Mother' নামে অভিহিত।

এই চরিত্রটির পরিকল্পনা রবীন্দ্রনাথের মনে আসে সাহানা বসুকে [ঝুনু] কাছে পেয়ে। তিনি লিখেছেন : "গোটা দশেক গান দিয়ে রবীন্দ্রনাথ আমাকেও এর মধ্যে ঢুকিয়ে দেন। এই দশটি গানের মধ্যে 'বিসর্জন'এর

জন্যে আগেকার রচিত গান ছিল তিনটি। এই তিনটি গান হচ্ছে— 'ওগো পুরবাসী', 'আমি একলা চলেছি এ ভবে', আর 'থাকতে আর ত পারলিনে মা পারলি কৈ'। …পুরানো গান থেকে কবি বেছে দেন— 'তিমির দুয়ার খোল' 'আর [য] দিন ফুরালে হে সংসারী'— এই গান দুটি। নতুন রচনা করে দেন আরও পাঁচটি গান।"[৩৯] গানগুলি হল :

'ও আমার আঁধার ভালো' দ্র গীত ১। ৮৭–৮৮; স্বর ৩;

'কোন্ ভীরুকে ভয় দেখাবি' দ্র গীত ৩। ৮৫৭; স্বর ২;

'আঁধার রাতে একলা পাগল' দ্র গীত ১। ২৩০; স্বর ১;

'আমায় যাবার বেলা পিছু ডাকে' দ্র গীত ২। ৩৩৮; স্বর ৩১;

'জয় জয় পরমা নিষ্কৃতি হে নমি নমি' দ্র গীত ১। ২৩০; স্বর ৫।

সাহানা দেবী লিখেছেন, এই পাঁচটি গান রবীন্দ্রনাথ তাঁকে শেখান মহর্ষিভবনের দোতলায় সামনের দিকের বসবার ঘরে বসে। 'দিন ফুরালো হে সংসারী' [দ্র গীত ১। ২০২; স্বর ৬৩] গানটির সুর তিনি জানেন এ কথা শুনে রবীন্দ্রনাথ ঠিক করেন, এই গানটি তিনি নাটকে ব্যবহার করবেন। এটি সাহানা দেবী তাঁর মাসিমা অমলা দাসের কাছে শিখেছিলেন। 'শুনেছি আমার মাসিমা এই রাগপ্রধান গানের সুরটি কণ্ঠে তুলেছিলেন কোনও এক বিয়েবাড়ির নহবৎ শুনে তাই থেকে। এবং রবীন্দ্রনাথ মাসিমার কণ্ঠে সুরটি শুনে তখুনি তাইতে কথা বসিয়ে দেন। মাসিমার কাছে আমি এই গানটি শিখেছিলাম শুনে কবি খুবই উৎফুল্ল ও আশ্বস্তও হলেন। কেননা ওঁর ধারণা হয়েছিল মাসিমার মৃত্যুর সঙ্গে ওঁর এই গানটিও হয়ত বা লুপ্ত হয়ে গিয়ে থাকবে।'[৪০]

উক্ত পাণ্ডুলিপির সূচনাতেই এই চরিত্রটির আবির্ভাব হয় রবীন্দ্র-হস্তাক্ষরে : 'ঝুনু/ জননী তোমার অরুণচরণখানি/ প্রণাম ও প্রস্থান/ শঙ্খ ঘণ্টা ইত্যাদি'। 'তিমির দুয়ার খোলো' ও 'জয় জয় পরমা নিষ্কৃতি' গান দুটিকে নিয়ে তিনি দ্বিধান্বিত ছিলেন কোন্ দৃশ্যের শুরুতে ব্যবহার করবেন তা ভেবে। 'যে রাতে মোর দুয়ারগুলি' গানটিও নাটকে ব্যবহারের ইচ্ছা ছিল তাঁর।

এই পাণ্ডুলিপির অন্তর্ভুক্ত আর-একটি খাতায় [Ms. 134 (ii)] দেখা যায় দৃশ্যগুলি ভাগ করা হয়েছে 'ভোর', 'লাল আভা', 'morning', '8 A.M.', '12 A.M.' 'Afternoon', 'বৈকাল', 'সূর্যাস্ত', 'Evening, 'Night 9 P.M.', 'midnight' 'শেষ রাত্রি' ও 'Early dawn' কাল-নির্দেশ দ্বারা। অভিনয়পত্রীতেও একই ধরনের কালনির্দেশ দেখা যায়।

জগন্মাতার ভূমিকায় গান গাওয়ার জন্য সাহানা দেবী রোজই রিহার্সালে উপস্থিত থাকতেন। রবীন্দ্রনাথের অভিনয় শিক্ষা দেওয়ার পদ্ধতি সম্পর্কে তিনি লিখেছেন :

…রবীন্দ্রনাথের শেখানোর কায়দা দেখাও একটা মস্ত শিক্ষা— এইটেই বার বার মনে হত। আমি যা দেখেছি তাতে এই মনে হয়েছে যে কবি, ব'লে বিশেষ কিছু যে বোঝাতে চাইতেন তা নয়, অভিনয় করে দেখিয়ে দিতেন। যতবার দরকার হত ততবারই দেখতাম উনি অম্লানবদনে করে যেতেন। যখন যে চরিত্রটি করে দেখাতেন তখন সেই চরিত্রের সঙ্গে একীভূত হয়ে যেতেন। অনেক সময় একই সঙ্গে অনেককে হয়ত পর পর দেখিয়ে দিতে হত, সে সময় আশ্চর্য হয়ে দেখতাম যে নিজের মধ্যে কি দ্রুত পরিবর্তনই না উনি আনতে পারতেন। …

রবীন্দ্রনাথের 'অপর্ণা'-কে শেখানোর কথা মনে পড়ে। প্রথম দৃশ্যে অপর্ণার ছুটে গিয়ে গোবিন্দমাণিক্যের পায়ের কাছে ভেঙে পড়া ও দুঃখ বেদনা ক্ষোভজড়িত কাতরকণ্ঠে বলা— 'বিচার প্রার্থনা করি।'— এই 'বিচার প্রার্থনা করি'— এইটুকু ঠিকমত ঠিকভাবে ঠিকভঙ্গীতে কি ভাবে কেমন করে বলতে হবে তা বার বার নিজে করে দেখিয়ে দেবার যে শিক্ষা দেওয়া রবীন্দ্রনাথের দেখেছি, তা দেখে তখনই শুধু বিস্ময় বোধ করিনি, তা

স্মরণ করে আজও বিস্ময় বোধ করি। ··· অপর্ণাকে কবির আপন হাতে তিল তিল করে গড়ে তোলার পর যেদিন রঙ্গমঞ্চে অপর্ণার প্রথম অভিনয় দেখি, সেদিন তার অভিনয় ও উক্তির মাঝে দেখতে পেয়েছিলাম রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টির আর একটা দিক।[৪১]

রাণুও স্মৃতিচারণে লিখেছেন : 'বিসর্জন নাটকে ভানুদাদা জয়সিংহ, আমাকে করলেন অপর্ণা। আমার অভিনয় তাঁর পছন্দ। বারে বারে ওই ভূমিকায় নেমেছি তাই। কিন্তু মহড়ার সময় সে কী শাস্তি! জোড়াসাঁকোর মহড়ার আসর ছিল ঠিক যাত্রার আসরের মতো। মহড়ার চারিদিক ঘিরে লোক। লোক বলতেও সাধারণ নয়, জগদীশচন্দ্র, শরৎচন্দ্রদের মতো বিশিষ্ট বর্গ। তারই মাঝখানে একটুও আড়ষ্ট না হয়ে কেবল বাক্‌ভঙ্গি নয়, অঙ্গভঙ্গি করে পার্ট করতে হবে। ভয়ে কাঠ হয়ে যাওয়া আমার বাহু কতবার যে সজোরে টেনে স্বচ্ছন্দ ক'রে দিতেন, বকতেন, তার ইয়ত্তা নেই।'[৪২]

৪ শ্রাবণ [20 Jul] অভিনয়ের বিজ্ঞপ্তি মুদ্রিত হল আনন্দবাজার ও অন্য পত্রিকায়। আনন্দবাজার পত্রিকা-র বিজ্ঞাপনটি উদ্ধৃত করছি :

বিশ্বভারতীর সাহায্যার্থে / "বিসর্জন" / অভিনয়ে / রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং যোগদান করিবেন। / মঙ্গলবার, ৩১শে জুলাই, বৈকাল ৫ ।।টা / বুধবার, ১লা আগষ্ট, বৈকাল ৫ ।।টা / শুক্রবার, ৩রা আগষ্ট, বৈকাল ৫।।টা / এম্পায়ার থিয়েটার— / প্রবেশিকা / বক্স—৫০৲, ৪০৲, ৩০৲, ও ২৫৲, / গ্যালারি—১৲ / মহিলাদিগের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা / প্রবেশ পত্র পাইবার স্থান— / কার এণ্ড মহলানবীশ / ১ / ২ চৌরঙ্গী / ১২টা হইতে ৭টা পর্য্যন্ত ভোলা থাকিবে / সম্মিলনী কার্যালয় / ১০ নং কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট / প্রাতে ৭টা হইতে ১০টা পর্য্যন্ত খোলা থাকিবে।[৪৩]

কিন্তু প্রথম অভিনয়ের দিন ১৫ শ্রাবণ [31 Jul] বিশ্বভারতী সম্মিলনীর সম্পাদক প্রশান্তচন্দ্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করলেন; 'রবিবার [১৩ শ্রাবণ : 29 Ju] সন্ধ্যাবেলা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের হঠাৎ জ্বর হওয়ায় নির্দ্দিষ্ট দিনগুলিতে এম্পায়ার থিয়েটারে "বিসর্জ্জন" নাটকে অভিনয় করা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব। এই কারণে অভিনয় আপাতত স্থগিত রহিল। পুনরভিনয় সম্বন্ধে বিশেষ সংবাদ যতশীঘ্র সম্ভব দেওয়া হইবে।'[৪৪]

কলকাতায় বিশ্বভারতী সম্মিলনীর অধিবেশনগুলিকে গ্রীষ্ম বর্ষা হেমন্ত ও বসন্ত পর্বে বিভক্ত করা হয়েছিল। ৪ শ্রাবণ [শুক্র 20 Jul] সন্ধ্যা সাড়ে ছ'টায় রামমোহন লাইব্রেরি হলে বর্ষাপর্বের সূচনা হয় রবীন্দ্রনাথের ভাষণ দিয়ে। তিনি এই ভাষণের জন্য আদৌ প্রস্তুত ছিলেন না, সেই কথাই কৌতুকের সঙ্গে বিবৃত করেন এইদিনকার বক্তৃতায়। *The Statesman* [21 Jul] 'Art of Speech Making' শিরোনামে তার সারাংশ প্রকাশ করে :

Dr. Rabindranath Tagore delivered a very interesting speech at Ram Mohan Library yesterday the occasion being the commencement of the Monsoon Term of the Visva-Bharati Sammilani.

The poet who spoke in Bengali, said he was asked to deliver a speech but no subject was suggested. In the circumstances, he did not come prepared to speak on any particular subject.... Speech-making is not Indian, but foreign....

Referring to the peace talk in Europe Dr. Tagore said that if one nation tried to keep its own interests in tact and at the same time desired other nations to forego theirs, it would not lead to any peace....

৯ শ্রাবণ [বুধ 25 Jul] সন্ধ্যা ৭টায় বিশ্বভারতী সম্মিলনীর অপর একটি অধিবেশনে রবীন্দ্রনাথ কবিতা পড়বেন বলে আনন্দবাজার পত্রিকা-য় বিজ্ঞপ্তি মুদ্রিত হয়।[৪৫] অনুষ্ঠানটির আর-কোনো বিবরণ পাওয়া যায়নি।

রবীন্দ্রজীবনী-কার জানিয়েছেন, 26 Jul 1923 [বৃহ ১০ শ্রাবণ] বিশ্বভারতীর পক্ষে রবীন্দ্রনাথের দুটি দলিল রেজেস্ট্রি হয়। 'প্রথম দলিল দ্বারা কবি তাঁহার বাংলায় রচিত সমস্ত গ্রন্থাদির (১৯২৩ পর্যন্ত) স্বত্ব বিশ্বভারতীকে দান করেন। অবশ্য এতকাল রবীন্দ্রনাথের বাংলা গ্রন্থের রয়ালটি শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ই ভোগ করিয়া আসিতেছিল; এইবার তাহা আইনসিদ্ধ হইল। বাংলা রচনা (১৯২৩ পর্যন্ত) ব্যতীত কবির রচিত ইংরেজি পুস্তকাদি, তাঁহার গ্রন্থের অনুবাদ, ফিলম্ ও অভিনয় করণের অধিকার বর্তায় রথীন্দ্রনাথের উপর। দ্বিতীয় দলিলে বিশ্বভারতীর জন্য একটি ট্রাস্টি সভা গঠিত হয়। ট্রাস্টি হন রবীন্দ্রনাথ, ডাক্তার নীলরতন সরকার ও অ্যাটর্নি হীরেন্দ্রনাথ দত্ত। বিশ্বভারতীর যাবতীয় স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তির ভার অর্পিত হয় এই ট্রাস্টির উপর।'[৪৬]

—এই দুটি দলিল রবীন্দ্রভবনে পাওয়া যায়নি।

রবীন্দ্রনাথ ডেঙ্গুজ্বরে আক্রান্ত হওয়ায় অভিনয় পিছিয়ে গেলে রাণু কাশীতে ফিরে যান। তিনি তখন সেখানে আই.এ. পড়ছিলেন। গ্রীষ্মবকাশের সূচনায় তিনি শান্তিনিকেতনে এসে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে শিলং পাহাড়ে গিয়ে প্রায় দেড় মাস কাটিয়ে আসেন। কলকাতায় ফেরার পরে যদিও তাঁর কলেজ তখন খুলে গিয়েছিল তবুও বিসর্জন অভিনয়ে অপর্ণার ভূমিকায় নির্বাচিত হওয়ার জন্য তাঁর ফেরা হয়নি। ফিরলেন ১৪–১৫ শ্রাবণে অভিনয় স্থগিত হয়ে যাওয়ায়।

বিসর্জন-এর রিহার্সালের সময়ে রবীন্দ্রনাথ যথারীতি থাকতেন মহর্ষিভবনের ত্রিতলে তাঁর নিজের কামরায়। রাণুও একই তলায় থাকতেন প্রতিমা দেবীর সঙ্গে। রাণু তাঁর অভ্যস্ত সংকোচহীন চলাফেরায় অবসর সময়ে প্রায়ই রবীন্দ্রনাথের ঘরে গিয়ে উপস্থিত হতেন। রবীন্দ্রনাথ এই দিনগুলির স্মৃতিচারণ করেছেন রাণুকে লেখা সম্ভবত ২৬ আশ্বিনের পত্রে : '…মনে পড়ল, যখন তুমি জোড়াসাঁকোয় থেকে বিসর্জ্জনের জন্যে প্রস্তুত হচ্ছিলে সেই সব দিনের কথা,— আমি তখন নন্দিনী নাটকটার সংস্কারকার্য্যে নিযুক্ত। তুমি তাতে বিঘ্ন ঘটাবার জন্যে নানা প্রকার চেষ্টা করেচ— আমি তাতে প্রকাশ্যে আপত্তি করেচি কিন্তু গোপনে কিছুই যে খুসি হই নি তা মনে কোরো না। কর্ত্তব্যের টান বলে একটা জিনিষ আছে কিন্তু কর্ত্তব্যের বাধার যে কোনো টান নেই এমন কথা জোরের সঙ্গে বলতে গেলে অন্তর্যামী তার প্রতিবাদ করবেন। স্মৃতির চিত্রপটে সেই বাধার ছবিগুলি খুব স্পষ্ট হয়ে জাগ্‌চে। বিসর্জ্জনের সেই রিহার্সাল্-পর্ব্বের ধ্বনি প্রতিধ্বনিতে আমার এই তেতালার ঘর ভরা আছে।'[৪৭]

রাণুও স্মৃতিচারণ করেছেন একটি ঘটনার : 'একদিন অভিনয়শেষে একটু অসুস্থ ছিলাম, তাই ফিরে এসে ভানুদাদার শোবার ঘরের পাশের ঘরে শুয়ে আছি। কী কাজে বাড়ির একটি আলতাপরা [?মেয়েদের আলতা পরানো যার কাজ] দাই ঢুকেছিল ঘরে। সে আমাকে দেখেই— ও মা গো— ব'লে এক চিৎকার দিয়ে ঘর ছেড়ে পালাল। কী ব্যাপার? সে নাকি তাদের মরা-বউঠানকে দেখেছে ঘরে। এই বউঠান হল কবির বহু কাব্যপ্রেরণার উৎস কাদম্বরী দেবী। কিন্তু আমাকে কি তার মতো দেখতে? অনেকেই বললেন, হ্যাঁ অনেকটা। ভানুদা বলতেন, কপাল থেকে নাকু পর্যন্ত এক রকম, তারপর আলাদা। রং তাঁর শ্যামবর্ণ ছিল।'[৪৮]

এইভাবে এই রিহার্সাল-পর্বের নানা গল্প জমে উঠছিল। কিন্তু তার অনেকটা গল্প-ই, তাদের সবগুলিকে তথ্যের তকমা পড়াতে গেলে ভুল হবে। সাহানা দেবী লিখেছেন :

হাস্য পরিহাস ছাড়া রবীন্দ্রনাথকে ভাবাই যায় না। কি সব অদ্ভুত মার্জিত সরস রসিকতা, উপমা, আর সে সব বলার অননুকরণীয় সেই ভঙ্গী — যে সবের সত্যই তুলনা মেলা ভার। স্বচক্ষে না দেখলে বলে বোঝানো যায় না। বোঝাবার জিনিসও নয়। তাছাড়া এমনিতেই ওঁর কথাবার্তা ছিল অসম্ভব চিত্তাকর্ষক, যা কিছু বলতেন আলাপ আলোচনা, সবই এমন করে বলতেন আর সে বলা হ'ত এতই সরেশ, এত উচ্চাঙ্গের আর এমনই একটা বৈশিষ্ট্যে ভরা যে, সবের মধ্যে সর্বদাই পাওয়া যেত ওঁর 'জিনিয়স'এর নানা ভাবের পরিচয়, নানা নমুনা। কথায় কথায়, অবলীলাক্রমে যে ধরনের কৌতুক, যে ধরনের রসিকতা উনি হরদম করতেন তার অজস্রতা দেখে আর সে সবে ওঁর তৎপরতার অমন 'অনায়াসলীলা' দেখে অবাক না হয়ে পারা যেত না।[৪৯]

কিন্তু অবাক হতে হয়, রবীন্দ্রনাথের রসিকতাকে সত্য ভেবে অনেকে তখন এবং আজও ক্ষতিকর প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করেছেন ও করছেন দেখে। বর্তমান পর্বে এর প্রধান শিকার হয়েছেন রাণু। সংসারজ্ঞানহীন সরলস্বভাবা এই বালিকাটি তখন বয়সে কিছুটা বড়ো হয়েছেন, কিন্তু মনের দিক দিয়ে তিনি তখনও অনেকটাই অপরিণত। ফলে রবীন্দ্রনাথ ও অন্যান্যদের সঙ্গে তিনি এমন-সব আচরণ করতেন, যাদের ভুল ব্যাখ্যা করা অস্বাভাবিক নয়। রাণুর বয়স তখন প্রায় সতেরো বছর, তখনকার আদর্শানুযায়ী বিবাহযোগ্যা পূর্ণ যুবতী ও অপূর্ব সুন্দরী। পূর্বোদ্ধৃত স্মৃতিকথাগুলি থেকে জানা গিয়েছে, জোড়াসাঁকোয় বিসর্জন-এর রিহার্সালে বাইরের অনেকে উপস্থিত থাকতেন— তাঁদের মধ্যে রাণুর রূপমুগ্ধ ঠাকুরবাড়ির কিছু আত্মীয় ও অনাত্মীয় যুবকও ছিলেন। রাণু বাস্তবজ্ঞানের অভাবে তাঁদের কাউকে-কাউকে প্রশ্রয় দিয়েছেন, দু'একজনের সঙ্গে পত্রালাপেও প্রবৃত্ত হয়েছেন। এঁদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথও কোনো-কোনো যুবককে উৎসাহ দিয়েছেন, তাঁদের সঙ্গে রাণুর সম্পর্ক নিয়ে রসিকতা করেছেন— পরে যার জন্য তাঁকে অনুশোচনা করতে হয়েছে। এঁদের সবার পরিচয় উদ্ধার করা দুরূহ, কিন্তু অন্তত দুজনকে— সুসঙ্গের রাজকুমার সুহৃদ সিংহ ও পাথুরিয়াঘাটা ঠাকুরপরিবারের প্রফুল্লনাথ ঠাকুরের পুত্র পূর্ণেন্দ্রনাথ [বুড়ো]-কে— শনাক্ত করা যায়। এঁদের প্রসঙ্গ পরে আবার উত্থাপিত হবে।

১৩ শ্রাবণ [29 Jul] রবীন্দ্রনাথ ডেঙ্গুজ্বরে আক্রান্ত হওয়ায় বিসর্জন অভিনয় স্থগিত হয়ে গিয়েছিল। ২৩ শ্রাবণ [8 Aug] আনন্দবাজার পত্রিকা 'রবীন্দ্রনাথের স্বাস্থ্য / বর্ত্তমানে ভাল আছেন' শিরোনামে একটি সংবাদ প্রকাশ করে। তাঁর স্বাস্থ্য সম্পর্কে অনেকে প্রশ্ন করতে থাকায় পত্রিকাটি একজন প্রতিনিধিকে তাঁর কাছে প্রেরণ করলে তিনি বলেন, 'পাঁচ ছয় দিন হইল তাঁহার ডেঙ্গুজ্বর হইয়াছে। প্রথমে জ্বর খুব বেশী হইয়াছিল, সঙ্গে সঙ্গে গা ব্যথা ইত্যাদিও খুব বেশী রকমের ছিল। সম্প্রতি তিনি সুস্থ হইয়া উঠিয়াছেন তবে শরীর বড়ই দুর্ব্বল।'[৫০] একই দিনে রবীন্দ্রনাথ কাদম্বিনী দত্তকে লেখেন : 'আমার অসুখ সেরে গেছে। কিন্তু দুর্ব্বলতা এখনো যেন সমস্ত দেহ আঁকড়ে আছে। দেহমনের এই অবসাদ দূর হতে বোধ হয় কিছুদিন যাবে।'[৫১]

সুস্থ হয়ে উঠতেই স্থগিত অভিনয়ের কথা তাঁর মনে হয়েছে। ২৩ শ্রাবণ রাণুকে লিখলেন :

সঙ্গীত চলে গিয়েছে যন্ত্র পড়ে রয়েচে। রথীকে বল্লুম এসরাজ সুবীরের হাত দিয়ে পাঠিয়ে দিতে। রথী কোনো জবাব করলে না। বোধ হয় তার ভাবখানা এই যে, যন্ত্রটা এইখানে বন্ধক রইল যতক্ষণ না সঙ্গীত স্বয়ং এসে ওটা খালাস করে না নিয়ে যায়।···

তোমাকে অভিনয়ে পাঠাবার জন্যে তোমার বাব্‌জাকে লিখেচি। তুমি না এলে মুস্কিলে পড়তে হবে। মঞ্জুকে তৈরি করবার জন্যে গগনকে বলেছিলুম কিন্তু সে হয়ে উঠ্‌ল না। তুমি ত জান, তোমাকে ছাড়া গগনের আর কাউকে পছন্দ হয় না। সুবীরের বাবা আজ কাশীতে যাচ্চেন। তাঁর সঙ্গে যদি তোমাকে পাঠানো সম্ভব হয় তাহলে কোনো হাঙ্গাম থাকে না। নইলে আবার হপ্তাখানেক পরেই তোমাকে আনবার জন্যে আর কাউকে পাঠাবার বন্দোবস্ত করতে হবে। কেননা আবার কিছুদিন রিহার্সাল দিতে হবে। তোমার জন্যে হয়ত ভাবনা নেই, তোমার নিশ্চয় সব মনে আছে।

কিন্তু তোমার ভানুদাদা যে কি রকম মেধাবী সে তোমার অগোচর নেই। আবার পাঁচ ছয় দিন ভালো করে রিহার্সাল না দিলে হয় ত বেশ বড় রকমের গলদ করে বসব।[৫২]

২৯ শ্রাবণ [14 Aug] আনন্দবাজার পত্রিকা-য় বিজ্ঞপ্তি মুদ্রিত হল : 'বিশ্বভারতী সম্মিলনী / বিশ্বভারতীর সাহায্যার্থে / "বিসর্জন" / রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং যোগদান করিবেন। / এম্পায়ার থিয়েটার / নূতন দিন স্থির হইয়াছে। / শনিবার, ২৫শে আগষ্ট, বৈকাল ৫ ৷৷টায় / সোমবার, ২৭শে আগষ্ট, বৈকাল ৫ ৷৷টায় / মঙ্গলবার, ২৮শে আগষ্ট, বৈকাল ৫ ৷৷টায় / মঙ্গলবার ৩১শে জুলাই-এর প্রবেশপত্র শনিবার ২৫শে আগষ্ট; বুধবার ১লা আগষ্টের প্রবেশপত্র সোমবার ২৭শে আগষ্ট; শুক্রবার ৩রা আগষ্টের প্রবেশপত্র ২৮শে আগষ্ট চলিবে। / প্রবেশপত্র বদলাইবার দরকার নাই।[৫৩]

ফলে রবীন্দ্রনাথ [16 Aug: ৩১ শ্রাবণ] আবার রাণুকে তাগিদ দিয়ে লিখলেন : 'কি করে যথাসময়ে তোমাকে এনে উপস্থিত করা যেতে পারে সেই চেষ্টাতে প্রবৃত্ত হয়েচি। ক্ষিতিমোহনবাবু এসেছিলেন তাঁকে জিজ্ঞাসা করা গেল, তিনি বল্লেন তাঁর পক্ষে যাওয়া সম্ভব হবে না। এখানে উপস্থিত এমন কেউ নেই যাঁর হাতে তোমার ভার সমর্পণ করে নিশ্চিন্ত হওয়া যেতে পারে। তোমার বাবজাকে আজ টেলিগ্রাফ করা গেছে, দেখি কি উত্তর আসে। যদি ওখান থেকে আনবার লোক কেউ না থাকে তাহলে এণ্ড্রুজকে পাঠিয়ে দেব স্থির করেচি। ··· অন্তত ১৯শে তারিখে তোমার এখানে এসে পৌঁছন দরকার। আমি ত একরকম সব ভুলে টুলে বসে আছি। ৭টা দিন ভাল করে রিহার্সাল না দিতে পারলে জিনিষটা মনের মত হবে না। দর্শকের দল এবার খুব ব্যগ্র হয়ে আছে— মনে করচে ভারি একটা কাণ্ড হবে। সেইজন্যে অভিনয়টাকে সম্পূর্ণ নিখুঁৎ করে তোলবার ইচ্ছে আছে।[৫৪]

আশা করা যেতে পারে, রাণু যথাসময়েই এসেছিলেন। কিন্তু জ্বরে পড়ায় ৮ ভাদ্র [শনি 25 Aug] এম্পায়ার থিয়েটারে বিসর্জন অভিনয়ের প্রথম দিনে তিনি অপর্ণার ভূমিকায় অভিনয় করতে পারেননি। তাড়াতাড়ি সুরেন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠা কন্যা মঞ্জুশ্রীকে তৈরি করে নিয়ে মঞ্চে নামানো হয়। এইদিনের চরিত্রলিপি ছিল নিম্নরূপ :

জয়সিংহ	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
রঘুপতি	দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর
গোবিন্দমাণিক্য	রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর
নক্ষত্রমাণিক্য	তপনমোহন চট্টোপাধ্যায়
নয়নরায়	ক্ষিতীশপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়
চাঁদপাল	অশোক চট্টোপাধ্যায়
রানী গুণবতী	সংজ্ঞা ঠাকুর [প্রথম দিন, পরে মঞ্জুশ্রী ঠাকুর]
অপর্ণা	মঞ্জুশ্রী ঠাকুর [প্রথম দিন, পরে রাণু বা প্রীতি অধিকারী]
হাসি	অনুভা ঠাকুর
তাতা	সঞ্জয় মুখোপাধ্যায়
জনতা	হরিপদ রায়, সঞ্জীব চৌধুরী, প্রফুল্লচন্দ্র মহলানবিশ, হেমন্ত চট্টোপাধ্যায়,

সুশীল বন্দ্যোপাধ্যায়, ধীরেনকৃষ্ণ দেববর্মা

জগন্মাতা সাহানা বসু [ঝুনু][৫৫]

অভিনয়ের প্রশংসা হয় সর্বত্র। সীতা দেবী লিখেছেন : 'রবীন্দ্রনাথ যুবক জয়সিংহ সাজিয়াই নামিলেন, যদিও বয়স তখন ৬২ বৎসর। যে-কেহ তখন দেখিয়া যুবক বলিয়া ভ্রম করিতে পারিত, এমন সতেজ চলাফেরা, দৃপ্ত কণ্ঠস্বর। রঘুপতি সাজিলেন দিনেন্দ্রনাথ। রক্তাম্বরপরিহিত তাঁহার ভৈরবমূর্তি এখনও মানসনেত্রে দেখিতে পাই। ··· গ্রামবাসীদের নৃত্যগীতগুলি অতিশয় উপভোগ্য হইয়াছিল। একটি নৃত্য মনে করিয়া এতকাল পরেও হাস্য-সংবরণ করিতে পারি না।[৫৬] আনন্দবাজার পত্রিকা [১২ ভাদ্র] লেখে : 'অভিনয়ের সাজসজ্জা বিশেষতঃ বর্ণ-সমাবেশ, উচ্চ শিল্পকলার পরিচায়ক। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ জয়সিংহের ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার অভিনয় চাতুর্য্যের বর্ণনা করা আমাদের সাধ্যায়ত্ত নয়। জয়সিংহের চরিত্রে লোকাচার ও ধর্ম্ম, অন্ধ বিশ্বাস ও মানব হৃদয়ের মধ্যে পদে পদে যে দ্বন্দ্ব সংঘর্ষ ফুটিয়া উঠিয়াছে— রবীন্দ্রনাথের অভিনয়ে তাহা মূর্ত্তিমান হইয়া দেখা দিয়াছিল। এরূপ উচ্চাঙ্গের অভিনয়কলা দর্শনের সৌভাগ্য সকল সময় হয় না।'[৫৭]

এই অভিনয় উপলক্ষে কলকাতার আর্ট প্রেসে ছাপা ২+১৪ পৃষ্ঠার একটি অভিনয়পত্রী প্রকাশিত হয়। হলুদ মলাটের উপরে লাল কালিতে 'বিসর্জ্জন' লেখা পত্রীতে প্রথম পৃষ্ঠায় 'নাটকের পাত্রগণ'-এর তালিকা [অভিনেতাদের নাম নেই], দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় 'ভাদ্র ১৩৩০', ৩–৭ পৃষ্ঠায় তিনটি দিনে বিভিন্ন পর্বে নাট্যঘটনার সংক্ষিপ্তসার প্রদত্ত হয়েছে; পর্বগুলি প্রথম দিন— প্রাতঃকাল, দ্বিপ্রহর, অপরাহ্ন, সন্ধ্যা, রাত্রি ও রাত্রিশেষ; দ্বিতীয় দিন— প্রাতঃকাল, অপরাহ্ন, সন্ধ্যা, রাত্রি ও গভীর রাত্রি এবং তৃতীয় দিন— প্রাতঃকাল ও রাত্রি— মোট ১৩টি দৃশ্যে বিভক্ত; প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় দিনের মধ্যে দুটি 'অবকাশ' আছে। ৯–১৩ পৃষ্ঠায় ১১টি গান সম্পূর্ণ মুদ্রিত হয়েছে। গানগুলি হল : তিমির দুয়ার খোলো, ঝর ঝর রক্ত ঝরে, আমি একলা চলেছি ভবে, এত রঙ্গ শিখেছ কোথায় মুণ্ডমালিনি, আমার আঁধার ভালো, দিন ফুরাল হে সংসারী, কোন্ ভীরুকে ভয় দেখাবি, থাকতে আর ত পারলি নে মা পারলি কৈ, আঁধার রাতে একলা পাগল, আমায় যাবার বেলা পিছু ডাকে এবং জয় জয় পরমা নিষ্কৃতি হে।

অভিনয়ে পর্ববিভাগ করা হয়েছিল পর্দা নামিয়ে-উঠিয়ে নয়, আলো নিভিয়ে ও জ্বেলে। দিনের বিভিন্ন সময় বোঝানো হয়েছিল আলোকসম্পাতের কৌশলে।

বিসর্জন-এর মঞ্চসজ্জা ও পাত্রপাত্রীদের পোশাক-পরিকল্পনা বহু গবেষণার ফল। সমর ভৌমিক লিখেছেন :

···রবীন্দ্রনাথই ছিলেন সকল কিছুর কাণ্ডারী। কাজেই রূপ বিন্যাস মঞ্চ কেমন হবে সে বিষয়ে প্রাথমিক রঙিন স্কেচ করে অবনীন্দ্রনাথ বা গগনেন্দ্রনাথকে রবীন্দ্রনাথের অনুমোদন নিতে হত। ঠিক পাত্র-পাত্রীর বেশভূষা মেক-আপ, মঞ্চ কেমন হবে তেমনটির character sketch সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের চূড়ান্ত মতামত নিয়ে আসল কাজ আরম্ভ হত। নাটকের রূপায়ণে এ জাতীয় কাজ করতে গিয়ে গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং অবনীন্দ্রনাথ দুজনেই তাঁদের কর্মময় জীবনের অমূল্য সময় ব্যয় করেছিলেন, এর ফলে এক জাতীয় নাট্য সম্বলিত চিত্রেরও সৃষ্টি হয়েছিল। এই সমস্ত চিত্র নিঃসন্দেহে রবীন্দ্রনাট্য রূপায়ণে নির্দেশক হিসেবে কাজ করবে। '২৩ সালের অভিনয় উপলক্ষে কমপক্ষে ছয় ডজন এজাতীয় খসড়া প্রস্তুত হয়েছিল। ··· এবার যে বিসর্জনের মঞ্চ আঙ্গিক পরিকল্পনায় প্রস্তুত হল— এর কার্যকর রূপ দিলেন নন্দলাল বসু ও সুরেন্দ্রনাথ কর। ···

দিনেন্দ্রনাথ লাল চেলীর পোষাক নিয়েছিলেন, আর রবীন্দ্রনাথ হলদে পোষাক, অন্যান্য ভূমিকায় গুরুত্ব মত। অপর্ণা শাড়ী না পরে রঙিন অভ্র দেওয়া লম্বা জামা পরে রঙ্গমঞ্চে নেমেছিল। জামার হাতাও লম্বা— চুলও খোলা থাকত, গলায় পুঁতির মালা। গগনেন্দ্রনাথ ও অবনীন্দ্রনাথ

পুরবাসীদের ভূমিকায় নেমেছিলেন। গগনবাবুর হাতে হুঁকো ছিল— অবনীবাবু ছিলেন কমিক রোলে।[৫৮]

শ্রাবণ-সংখ্যা 'প্রবর্তক' অবশ্য তিনদিন ধরে রঘুপতি থেকে রানী গুণবতীর একই পোশাকে আবির্ভূত হওয়ার সমালোচনা করেছে— 'অবিরাম অভিনয়ের জন্য হয়ত পরিচ্ছদ পরিবর্ত্তনের চেষ্টা করা হয় নাই; কিন্তু সময়াভাব যথেষ্ট কারণ বলিয়া স্বীকার করা সম্ভব নয়।'

Visva-Bharati Quarterly, Oct 1923 'Visva-Bharati Bulletin'-এ 'The Staging of Rabindranath's "Visarjan" [pp. 308–10] নামে একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করে, তাতে মঞ্চসজ্জার বিষয়ে লেখা হয়েছে :

...the stage was draped throughout in different shades of dark blue, deepening as they receded into the background. There was no change of scene; the blood-stained temple steps, designed in Cubist fashion, dominated the eye throughout; a lurid red light marked the entrance to the Temple itself, invisible in the darkness beyond the wings; while the songs.of the World Mother served to punctuate the otherwise continuous action. The other stage accessories, requisitioned to assist in the interpretation, were the colour schemes of the costumes in combination with changing light effects against the dark blue of hangings, symbolic of the play of samsara on the continum of Mahakala.

বিখ্যাত নট ও নাট্যকার অমৃতলাল বসু বিসর্জন অভিনয়ের প্রথম দিন ৮ ভাদ্র [শনি 25 Aug] নাটকটি দেখতে গিয়েছিলেন। তাঁর দীর্ঘ সপ্রশংস সমালোচনা 'Visarjan— An Appreciation' প্রকাশিত হয় *The Indian Daily News* [4 Sep] পত্রিকায়। তিনি লেখেব :

On Saturday last I went to see the performance of Rabindranath's "Visarjan" produced at the "Empire" under the author's direction, himself taking a leading role....

Few actors know how to make their entrances and exits, Babu Dinendranath Tagore, as the high priest of the Holy Mother's Temple, entered and, before he uttered a single word, we knew that the genius of an actor was in him....

Next comes the little lady in the character of Aparna, the beggar girl. As everything on the stage must be counterfeit, a real Ranee was chosen to represent a beggar, the duckling glides in and out of the stage as if the board were her play-pond; naive in speech, artless in manner, how sweetly she laid her virgin cheek on the step-stone to caress her pet, her stolen and slain kid, the aching heart murmuring soft words soaked in tears.

After the officers have preceded comes the General. The Rabindranath. Bom great, he has achieved greatness and greatness courts him, too. The great poet is a great actor, almost a master of the technique of stagecraft. But, young aspirants to histrionic fame, beware of the

great master! As in poetry one must drink at the fountain of Rabindranath's mind and not simply borrow his words, so on the stage, one should imbibe the spirit of his acting and not imitate him in action, attitude, gesture or pose. They are all his own, and the copyright is not to be infringed.

In endowing Rabi Babu with a great mind, Providence seems to have prepared a special mould to cast the golden casket in which that mind was to find its home. There is, in the masculine frame of Rabindranath, such a judicious admixture of the feminine, that the product almost approaches the Divine. He sighs, murmurs, wails, kneels, claps his hands, draws out his long vowels; and we feel that the woman peeps out without making effeminate the poetry of his presentation....

Not in the plot but in the play was an angelic figure who came and went, justifying her own musical name by her sweet songs....

The play suceeded without any external aid. It was one continuous current of acting, without division into scenes or acts. No display of colour in wings, borders or back-scene. One looked on the neutral-tinted cloth before one's eyes, and imagination did the rest.[৫৯]

সুন্দর কবিত্বপূর্ণ ইংরেজিতে লেখা সত্যিকারের রসাস্বাদী এই সমালোচনা পড়ে রবীন্দ্রনাথ খুশি হয়ে অমল হোমকে লেখেন : 'তোমার কাগজে অমৃতলাল বসুর বিসর্জনের প্রশস্তি উদার। তাঁর এই অকুণ্ঠ সাধুবাদ আমাকে আনন্দ দিয়াছে [য], তুমি তাঁকে জানিও আমার সশ্রদ্ধ অভিবাদনসহ। বাংলা রঙ্গমঞ্চের শ্রেষ্ঠদের কাছ থেকে ইতিপূর্বে এমন প্রশংসাবাক্য পূর্বে কখনো শুনেছি বলে মনে পড়ে না।'[৬০] কিন্তু তিনি কৌতুক করে ২০ ভাদ্র শান্তিনিকেতন থেকে রাণুকে লিখলেন : 'প্রবীণ ও বিখ্যাত অভিনেতা অমৃত বোস তোমার অভিনয়ের জয়গান করে' ইংরেজি দৈনিক ডেলি নিউসে একটা পত্র লিখেচে। ··· প্রশংসার ছলে আমার কি রকম নিন্দা করেচে, তাও দেখো। বলেছে আমার অভিনয় কেউ যেন নকল করবার চেষ্টা না করে। অর্থাৎ ওটা খারাপ। অথচ মজা এই, যে-কয়জনে অভিনয় করেচে সকলে আমারই অভিনয়ের নকল করেচে— আমিই ত তাদের দেখিয়ে দিয়েচি— দিনুর রঘুপতি আমারই রঘুপতি অভিনয়ের প্রায় অবিকল নকল।'[৬১]

রবীন্দ্রনাথ অবশ্য একটি ভুল করেছেন— অমৃতলাল শনিবারের অভিনয় দেখতে গিয়েছিলেন, কাজেই তিনি রাণুর অভিনয়ের জয়গান করেননি, ঐদিন মঞ্জু অপর্ণার ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন!

বিসর্জন-এর দ্বিতীয় অভিনয় হয় ১০ ভাদ্র [সোম 27 Aug] তারিখে। রাণু এইদিন অপর্ণা চরিত্রে অভিনয় করেন, মঞ্জু মায়ের পরিবর্তে নামেন গুণবতীর ভূমিকায়। এদিকে সাহানা দেবী জ্বরে আক্রান্ত হন। তাড়াতাড়ি সন্তোষচন্দ্রের ভগ্নী নুটুকে [রমা মজুমদার, কর] কয়েকটি গান শিখিয়ে মঞ্চে নিয়ে যাওয়া হয় কোনো রকমে সংকট উত্তীর্ণ হওয়ার জন্য। সকলে চলে যাওয়ার পরে প্রতিমা দেবী যখন যাওয়ার জন্য তৈরি হচ্ছেন, তখন সাহানা দেবী তাঁর কাছে গিয়ে অনুরোধ করেন তাঁকে সাজিয়ে দেওয়ার জন্য। প্রতিমা দেবী বিস্মিত হলেও তাঁকে সাজসজ্জা করিয়ে নিয়ে যান। সাহানা দেবী লিখেছেন : 'অভিনয়ের দ্বিতীয় রাত্রে, যেদিন আমি জ্বর

গায়ে গান করি, সেদিন অভিনয় শেষ হয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই [রবীন্দ্রনাথ] আমার কাছটিতে এসে কৌতুকভরা নয়নে মৃদু মৃদু হেসে বলতে লাগলেন— "শোন ঝুনু, জ্বর হলে যদি তোমার এমন গান হয়, তবে আমি তোমার জ্বর হয়েছে শুনে দুঃখ করব না, খুশি হব, সে কথা তুমিই বল, তোমার কি মত?" উত্তরে আমি আর কী বলব, বেশ খুশি হয়েই উঠলাম আর উপভোগ করলাম যা বললেন তা।'[৬২]

১১ ভাদ্র [মঙ্গল 28 Aug] তৃতীয় দিন অভিনয় হওয়ার পরে ১২ ভাদ্র আনন্দবাজার পত্রিকা-য় বিজ্ঞাপন মুদ্রিত হয় : 'বিশেষ অনুরোধে / "বিসর্জ্জনের" / পুনরাভিনয় [য] / রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং যোগদান করিবেন / এম্পায়ার থিয়েটার / বৃহস্পতিবার ৩০শে অগস্ট বৈকাল ৫ ।৷টায় / টিকিটের মূল্য কমানো হইয়াছে'।[৬৩] এ ছাড়া *The Statesman* [29, 30, 31 Aug]-এর বিজ্ঞাপন উদ্ধৃত করেছেন রুদ্রপ্রসাদ চক্রবর্তী : 'EMPIRE THEATRE/ IN AID OF VISVA-BHARATI/ BY SPECIAL REQUEST/ FOR ONE DAY ONLY/ RABINDRANATH TAGORE/ IN VISARJAN/ Saturday 1st September at 5-30 p.m.'[৬৪] অর্থাৎ বিসর্জন-এর সর্বমোট পাঁচটি অভিনয় হয়। এরই মধ্যে কোনো একদিন একটি দুর্ঘটনা ঘটে, যার স্মৃতিচারণ করেছেন রাণু মুখোপাধ্যায় : 'একবার সে কী কাণ্ড! বিসর্জনের অভিনয় চলছে পুরোনো এম্পায়ারে। হঠাৎ কি করে উপর থেকে আগুনের ফুলকি পড়ল। ভয় পেয়ে ছুট লাগিয়েছি গ্রিনরুমের দিকে। খপ করে হাত টেনে ধরলেন জয়সিংহরূপী ভানুদাদা। পরিস্থিতি উপযোগী দু'একটা কথা ছুঁড়ে দিয়ে অবিচল অনর্গল সংলাপ চালিয়ে গেলেন তিনি।'[৬৫] রবীন্দ্রনাথও প্রসঙ্গটি উত্থাপন করেছেন চিনের ন্যান্‌কিঙে একটি বক্তৃতাশালায় সম্ভাব্য দুর্ঘটনার মুখে তাঁর অবিচল থাকার বর্ণনা দিতে গিয়ে, ৮ বৈশাখ ১৩৩১ [21 Apr 1924] চিনের ৎসিনান্‌সু শহর থেকে তিনি রাণুকে লিখেছিলেন : 'আমার মনে পড়ল সেই বিসর্জ্জন অভিনয়ের কথা— পিঠের দিকে অগ্নিবৃষ্টি হচ্চে, আর আমি একটি ভয়ত্রস্তা বালিকার হাত চেপে ধরে অভিনয় করে যাচ্চি। আমি সেদিন যদি পালাবার ভাব দেখাতুম তাহলে সেই মুহূর্ত্তে মহাকালীর কণ্ঠহারের জন্যে নরমুণ্ডের অভাব ঘটত না।'[৬৬]

বিসর্জন অভিনয়ের প্রশংসার অভাব হয়নি, আগ্রহী পাঠক এই প্রসঙ্গে রুদ্রপ্রসাদ চক্রবর্তীর 'রঙ্গমঞ্চ ও রবীন্দ্রনাথ : সমকালীন প্রতিক্রিয়া' গ্রন্থের ৫৬–৬৭ পৃষ্ঠা দেখতে পারেন। রবীন্দ্রনাথ রাণুকে লেখা পত্রে অন্তত তিনটি সমালোচনার উল্লেখ ক'রে— অমৃতলাল বসুর পূর্বোদ্ধৃত আলোচনা, *The Englishman* [7 Sep]-এ মুদ্রিত শচীন সেনের পত্র 'Aparna in Visarjan/ An Appreciation' ও শ্রাবণ-সংখ্যা প্রবর্তক [পৃ ৪৪৪–৪৭]— কৌতুক-ছলে মন্তব্য করেছেন, এইসব প্রশংসা রাণুর উদ্দেশেই নিবেদিত। ২৬ ভাদ্রের একটি চিঠিতে তিনি লিখেছেন :

> …কাগজে যা বেরিয়েচে তা ত বেরিয়েচে তার উপরে লোকমুখে বিসর্জ্জনের অভিনয় আলোচনা এখনো চল্‌চে। অধিকাংশ লোকের মত এই যে, এমন কাণ্ড তারা আর কখনো দেখে নি। আরো দশদিন যদি হত তাহলে দশদিনই ঘর ভরে' যেত। অনেক লোকই জায়গা না পেয়ে হতাশ হয়ে ফিরে গেছে। প্রশান্ত কয়েকদিন পূর্ব্বে এখানে এসেছিল। তার প্রস্তাব এই যে আগামী শীতের সময় আমি পর্য্যায়ক্রমে রঘুপতি এবং গোবিন্দমাণিক্য সেজে অভিনয়নৈপুণ্য দেখিয়ে সকলকে অভিভূত করে দিই। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, প্রশান্ত সেই সঙ্গে আমাকে অপর্ণা সাজতে অনুরোধ করে নি। তার থেকে এই প্রমাণ হয় যে, প্রশান্তর মতে অপর্ণার অভিনয়ে তোমার সঙ্গে টক্কর দিতে পারি আমার এমন সাধ্য নেই। এতে আমি মনের মধ্যে কিছু দুঃখ বোধ করেচি। সেই দুঃখের খেদে আমি রঘুপতি গোবিন্দমাণিক্য সেজে বাহাদুরী করতে কিছুতে সম্মত হলুম না।[৬৭]

বিসর্জন অভিনয়ের প্রথম তিন দিন অতিক্রান্ত হওয়ার পরেই ১২ ভাদ্র [বুধ 29 Aug] রবীন্দ্রনাথকে বিশ্বভারতী সম্মিলনীর একটি সভায় সভাপতিত্ব করতে হয়। আনন্দবাজার পত্রিকা [১১ ভাদ্র] বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে : 'আগামী ২৯শে আগষ্ট বুধবার ৭ ঘটিকায় রামমোহন লাইব্রেরী গৃহে, গ্রামের পুনর্গঠন এবং ম্যালেরিয়া সম্বন্ধে বক্তৃতা ও আলোচনা হইবে। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সভাপতির আসন গ্রহণ করিবেন। সম্মিলনী ও সাংলগ্নিক এবং এ্যন্টি ম্যালেরিয়া সোসাইটির সভ্যগণের উপস্থিতি প্রার্থনীয়।'[৬৮] রবীন্দ্রনাথের ভাষণটি 'সমবায়ে ম্যালেরিয়া-নিবারণ' নামে ভাদ্র-সংখ্যা সংহতি-তে মুদ্রিত হয় [দ্র পল্লীপ্রকৃতি ২৭। ৫৬৮–৭২]। বিখ্যাত চিকিৎসক ও জীবাণুবিজ্ঞানী ডঃ গোপালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় [1869–1953]] সমাজসেবায় ব্রতী হয়ে 'সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ অ্যান্টি-ম্যালেরিয়া সোসাইটি স্থাপন করে বাংলাদেশের এই শক্তিক্ষয়কারী রোগের বিরুদ্ধে সক্রিয় আন্দোলন গড়ে তুলতে প্রয়াসী হয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথও সুরুলে এল্‌ম্‌হার্স্ট, গ্রেচেন গ্রিন ও অন্যান্যদের সহায়তায় একই কাজ করতে চাইছিলেন। এই সূত্রে গোপালচন্দ্র নিজে যখন তাঁর সঙ্গে দেখা করলেন, 'তখন এ কথা আমার মনে উদয় হল, যদি এঁর কাজের সঙ্গে আমাদের কাজ জড়িত করতে পারি তা হলে কৃতার্থ হব, কেবল সফলতার দিক থেকে নয়— এঁর মতো লোকের সঙ্গে যোগ দেওয়া একটা গৌরবের বিষয়।' জমিদারি পরিচালনার সময়ে গ্রামের উন্নয়নমূলক কাজ করতে চেয়ে পল্লিবাসিদের মানসিক ক্ষুদ্রতার অনেক পরিচয় রবীন্দ্রনাথ পেয়েছিলেন। তারই কয়েকটি বিবৃত করে তিনি এই ভাষণে বললেন, এই সর্বজনীন শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াই করতে সকলকে এক সঙ্গে কাজ করতে হবে। গোপালচন্দ্রের ভাষণে জানা গেছে, তিনি কিছু ব্যক্তির সঙ্গে একযোগে অতি ক্ষুদ্র শত্রু মশা মারবার জন্য কাজ শুরু করেছেন। 'এর মতো সুলক্ষণ আর নেই। কারণ, প্রত্যেকের হিতের জন্যে সকলেই দায়ী এবং পরের হিতই নিজের সকলের চেয়ে বড়ো হিত, এই শিক্ষার উপলক্ষ আমাদের দেশে যত বেশি হয় ততই ভালো।'

গান্ধীজি কারাগারে যাওয়ার পরে অসহযোগ আন্দোলন এমনই বন্ধ্যাদশায় উপনীত হয় যে, রবীন্দ্রনাথের রাজনৈতিক বিষয়ে মতামত প্রকাশের অবকাশ ছিল না। তা ছাড়া তিনি বিশ্বভারতীর আদর্শ প্রচার, অর্থসংগ্রহ, রক্তকরবী রচনা, বিসর্জন নাট্যাভিনয় প্রভৃতি নিয়ে খুবই ব্যস্ত হয়ে পড়েন। কিন্তু ইতিমধ্যে গয়া-কংগ্রেসের পরে দেশের রাজনীতি নূতন মোড় নিয়েছিল। কাউন্সিলে প্রবেশ করা ও না-করা নিয়ে সংঘাতে দল দু'টুকরো হয়ে যায়— চিত্তরঞ্জন দাস, মোতিলাল নেহরু-প্রমুখ নেতারা স্বরাজ্য দল প্রতিষ্ঠা ক'রে কাউন্সিল-নির্বাচনে অংশগ্রহণের সপক্ষে প্রচার আরম্ভ করেন— অপর দিকে তাঁদের বিরোধীরা গঠনমূলক কোনো কার্যসূচি উপস্থিত করতে পারেননি, অথচ অন্ধ গান্ধীভক্তিতে অটল থেকে কার্যত রাজনৈতিক সন্ন্যাস অবলম্বন করেন। তুরস্কে খলিফা পদের উচ্ছেদ ঘটায় খিলাফত আন্দোলন অবান্তর হয়ে পড়ে। ইত্যবসরে হিন্দু মহাসভা শক্তি সঞ্চয় ক'রে স্বামী শ্রদ্ধানন্দের নেতৃত্বে শুদ্ধিযজ্ঞ দ্বারা ধর্মান্তরিত মুসলমানদের পুনরায় হিন্দুধর্মে ফিরিয়ে আনায় ব্রতী হন। এর পরিণতি ঘটে দেশের বিভিন্ন অংশে হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে দাঙ্গায়। এই পরিপ্রেক্ষিতে সাংবাদিক মৃণালকান্তি বসু [1886–1957]19 Aug [রবি ২ ভাদ্র] জোড়াসাঁকোয় গিয়ে সমসাময়িক রাজনীতি নিয়ে রবীন্দ্রনাথকে বিভিন্ন প্রশ্ন করেন ও তাঁর মতামত 'রবীন্দ্র-সদনে' শিরোনামে 'বিজলী' সাপ্তাহিক পত্রিকার ১৪ ভাদ্র [শুক্র 31 Aug]-সংখ্যায় প্রকাশ করেন। সেখান থেকে রচনাটি আনন্দবাজার, ভারতী, প্রবাসী প্রভৃতি বিভিন্ন পত্রিকায় উদ্ধৃত হয়ে বিপুল চাঞ্চল্য সৃষ্টি করে।

কংগ্রেসে দলাদলি প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বলেন, মতপ্রকাশের স্বাধীনতা থাকলে ভিন্ন দলের উদ্ভব হতেই পারে কিন্তু তা যেন পারস্পরিক দোষারোপের পর্যায়ে না যায়। কাউন্সিল-প্রবেশের বিরুদ্ধে তাঁর কিছু বলার নেই, কিন্তু কোনো একটা জিনিস ভাঙার চেয়ে নিজেদের স্বতন্ত্র অনুষ্ঠান গড়ে দেশের উন্নতি করার চেষ্টা করাই বাঞ্ছনীয়। গড়ে তুলতে হবে একেবারে গোড়া থেকে। আমাদের নিজেদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, নিজেদের স্বাস্থ্যরক্ষার ব্যবস্থা, গাঁয়ে গাঁয়ে কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক ও ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান আমাদের নিজেদেরই স্থাপন করতে হবে। তিনি স্পষ্ট করে বলেননি কিন্তু তাঁর অবশ্যই মনে ছিল, নূতন ভারতশাসন আইনে ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডগুলি স্বায়ত্তশাসন পেয়ে জনসাধারণের মনে যে প্রভাব বিস্তার করছে তা সরকারের পক্ষেই যাচ্ছে। তাই তিনি বললেন, 'সাধারণের অগোচরে কিন্তু সুনিশ্চিতভাবে, লোকের মনের উপর সরকারের এই যে প্রভাব বিস্তার হচ্ছে, এ দূর করে আমাদেরই প্রভাব বিস্তার করতে হবে। … তা করবার প্রকৃষ্ট উপায়ই হচ্ছে আমাদের প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা এবং তাদের কর্ম্মকুশলতা দিয়ে সরকারী প্রতিষ্ঠানগুলিকে এমন অ-কেজো করে ফেলতে হবে, যাতে করে সরকার সেগুলি বন্ধ করে দিতে বাধ্য হয়।' অবশ্য সুরুল গ্রামপুনর্গঠন প্রকল্পে রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর সহকর্মীগণ যেভাবে ডিস্ট্রিক্ট বোর্ড এবং সরকারি কৃষি ও শিল্পবিভাগের সঙ্গে সহযোগিতার সম্পর্ক গড়ে তুলছিলেন তাতে তাঁর পক্ষে এমন মন্তব্য করা স্বাভাবিক বলে মনে হয় না।

হিন্দু-মুসলমান সমস্যার সমাধান সম্পর্কে তিনি বললেন, 'একমাত্র অর্থনীতিক ব্যাপার আশ্রয় করে একটা সত্যিকার স্থায়ী মিলন সম্ভবপর করে তোলা যায় অন্য কোনো ভাবে যা যায় না। এইখানে আমাদের স্বার্থ এক, আমরা একে অন্যের সাহায্যে পুষ্ট।' ক্ষুধা উভয় সমাজকেই কাতর করে, তাই ক্ষুধা মেটানোর কাজেই উভয়ে একসঙ্গে কাজ করতে পারে। 'হিন্দু আর মুসলমানের সমবেত চেষ্টায় পল্লীতে পল্লীতে যে অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলি গড়ে উঠে হিন্দু মুসলমান উভয়েরই কল্যাণ সাধন করবে, সেগুলি ক্রমশঃ দুই সম্প্রদায়ের ভিতরকার ব্যবধান কমিয়ে দেবে এবং মিলনের বেদী গড়ে তুলবে যা আর কোন মতে সম্ভবপর হবে না।' হিন্দু মহাসভা হিন্দুদের সঙ্ঘবদ্ধ করার চেষ্টা করছে বলে মুসলমানরা ক্ষুব্ধ হচ্ছে দেখে তিনি বিস্ময় প্রকাশ করেছেন — তারা নিজেরা সঙ্ঘবদ্ধ, হিন্দুকে ধর্মান্তরিত করার কাজে তারা চিরকালই সক্রিয়, তাই হিন্দুরা সেই কাজ করতে গেলে তারা কেন বাধা দেবে তিনি তা বুঝতে পারেন না। অবশ্য সামাজিক ভেদনীতির ফলে হিন্দুদের সঙ্ঘবদ্ধ হওয়াও খুবই কঠিন।

মৃণালকান্তি বসু সম্ভবত আরও এক বা একাধিক দিন বিভিন্ন প্রশ্ন নিয়ে রবীন্দ্রনাথের সাক্ষাৎপ্রার্থী হন। তার বিবরণও তিনি 'বিজলী' পত্রিকায় প্রকাশ করেন এবং সেগুলি 'হিন্দু-মুসলমান সমস্যায় রবীন্দ্রনাথ' [২৮ ভাদ্র] ও 'পল্লী-গঠনে হিন্দু মুসলমান' [৫ আশ্বিন] নামে আনন্দবাজার পত্রিকা-য় [যথাক্রমে ২১ ও ২৮ ভাদ্র] উদ্ধৃত হয় [দ্র রবীন্দ্র-প্রসঙ্গ ১। ২৫৬–৬১]— শেষ সংখ্যাটিতেও 'ক্রমশঃ' ছাপা হয়েছে।

'বিসর্জন' অভিনয়, সাক্ষাৎকার, ভাষণ ইত্যাদি ব্যস্ততার অবসানে রবীন্দ্রনাথ কলকাতা থেকে শান্তিনিকেতনে ফিরে আসেন ১৬ ভাদ্র [রবি 2 sep]। রাণুও তাঁর সঙ্গে এসেছিলেন, ১৭ ভাদ্র তাঁর কাশী যাত্রার সংবাদ দিয়ে রবীন্দ্রনাথ সরযূবালা অধিকারীকে লিখলেন :

আমাদের পালা সাঙ্গ হল। রাণু যাচ্চে এণ্ড্রুজ সাহেবের সঙ্গে। … ওর অভিনয়ের খুবই সুখ্যাতি হয়েছে, ওকে সাজেসজ্জায় খুব ভালই দেখাচ্ছিল। তা ছাড়া আমার বিশ্বাস এ রকম অভিনয় ওর পক্ষে একটা বড় শিক্ষা।

এবার দীর্ঘকাল আমি কলকাতায় আবদ্ধ ছিলুম। কাল নিষ্কৃতি পেয়েচি, এখানে এসে আরাম পাওয়া গেল। কিন্তু অনেকদিন রাণু আমাদের খুব কাছে কাছে ছিল, সে চলে যাচ্চে বলে আমাদের ফাঁকা ঠেকচে। শুধু আমার নয়, আমাদের জোড়াসাঁকো অঞ্চলে গগন প্রভৃতি সবাই ওর অভাব অনুভব করবে; ওর হাসিতে গল্পে ও সমস্ত পাড়া জমিয়ে রেখেছিল। যা হোক্, এখন ওর কর্ত্তব্যের মধ্যে নিমগ্ন হতে হবে, আমারও কর্তব্যের পালা আবার সুরু হল। আমাকে চীন দেশে যেতে হবে, তার জন্যে লেকচার তৈরি করা চাই, দুই একদিনের মধ্যেই স্থির হয়ে বসে লিখ্‌তে প্রবৃত্ত হব।[৬৯]

কাজে তাঁকে এই দিনেই লাগতে হয়েছে। সকাল আটটায় বিশ্বভারতী সংসদের চতুর্থ অধিবেশনে তিনি সভাপতিত্ব করেন।

পরের দিন ১৮ ভাদ্র [মঙ্গল 4 Sep] বাংলা ও ইংরেজিতে লেখা তাঁর অনেকগুলি চিঠি পাওয়া যায়। রবীন্দ্রনাথ 1916-এ যখন আমেরিকা সফর করছিলেন, তখন ক্যালিফোর্নিয়ার Pasadena স্টেশনে বিখ্যাত আমেরিকান সমাজতন্ত্রী ঔপন্যাসিক Upton Sinclair [1878–1968]-এর সঙ্গে তাঁর আলাপ হয়। সিনক্লেয়ার 3 Jul 1923 একটি চিঠি লিখে তাঁকে সেই আলাপের কথা স্মরণ করিয়ে নিজের লেখা সমস্ত বই পাঠিয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেন। বইগুলি শান্তিনিকেতনে পৌঁছলে 4 Sep [১৮ ভাদ্র] তাঁকে ধন্যবাদ জানিয়ে রবীন্দ্রনাথ তাঁর *The Brass Check* [1919] উপন্যাস পাঠের কথা উল্লেখ করে লেখেন : 'Your fearless stand for truth, for the things that are right, your viewpoint of the humiliation that worship of money brings, its stifling quality, its empty arrogance, its insidious undermining of self-respect, its valuelessness, all the attributes which are its curse when dollars own the man; these ideas which you inculcated in this particular book immediately made a bond of sympathy. For years I have thought over these things, this especial phase of our modern civilisation, and only a few weeks ago I have myself finished a drama on the same subject.'[৭০] এ ছাড়া রক্তকরবী-র ইংরেজি অনুবাদ *Red Oleanders* প্রকাশিত হলে তার এক খণ্ড তাঁকে পাঠিয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতিও দেন তিনি। সিনক্লেয়ারের সঙ্গে তাঁর পত্রালাপ বজায় ছিল জীবনের শেষ পর্যন্ত।

1916-এ জাপান ভ্রমণের সময়ে নারী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী টামিকো ওয়ালা [কোরা]-র সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের পরিচয় হয়েছিল; তিনি আমেরিকায় পড়াশোনা করেছিলেন বলে রবীন্দ্রনাথের ইংরেজি ভাষায় কথিত বক্তব্যগুলি তাঁর সাহায্যে জাপানি ছাত্রীদের কাছে পৌঁছতে পেরেছিল। 1920-তে তিনি যখন আমেরিকায় যান, নিউ ইয়র্কে শ্রীমতী ওয়াডার সঙ্গে তাঁর দেখা হয়। তাঁর একটি চিঠি পেয়ে রবীন্দ্রনাথ 4 Sep উত্তর দেন, টাইপ-করা মূল চিঠিটির লিপিচিত্র উদ্ধৃত করেছেন অমিতাভ গুপ্ত 'জাপানী শান্তিনিকেতন' [দ্র অমৃত, ৯ পৌষ ১৩৮৩। ১০] নামক টোমিকা ওয়াডা-কোরা-র সঙ্গে সাক্ষাৎকার-ভিত্তিক একটি প্রবন্ধে। তিনি লেখেন, শীঘ্রই চিন ভ্রমণের পরে তিনি জাপানে যাবেন। প্যালেস্টাইন-বাসিনী মিস ফ্লাউমের মতো টোমিকেও একদিন শান্তিনিকেতনে এসে কিছুদিন কাটিয়ে যাবেন এই আশা প্রকাশ করে তিনি লিখলেন : 'I have recently completed a drama which will probably be published in English before long. I think that you will be interested since you wrote that Japan too is suffering a change which may turn into a "clever commercialist" and my tale is concerned with the present [...] of unrighteousness and industrialism.' 1924এ জাপানে গেলে টোমিকো ওয়ালা তাঁর দোভাষীর কাজ করেন।

উপরে উদ্ধৃত চিঠিগুলিতে প্রায়ই ‘রক্তকরবী’ ও তার ইংরেজি অনুবাদের প্রসঙ্গ আছে। ২০ ভাদ্র [6 Sep] রবীন্দ্রনাথ রাণুকে জানান : ‘বেনোয়াকে নিয়ে এখনো আমার নন্দিনীর তর্জ্জমা করে চলেচি। কাল সকালে বোধহয় শেষ হয়ে যাবে।’[৭১] এর আগের দিন অর্থাৎ ১৯ ভাদ্র রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়কে লিখেছিলেন : “‘যক্ষপুরী’ নাটকটি প্রবাসীর পূজা সংখ্যায় প্রকাশ না করিয়া ফাল্গুন বা চৈত্র মাসে প্রকাশের যদি ব্যবস্থা করেন তবে ভাল হয়। অভিনয়ের পূর্ব্বে আমি উহা বাহির করিতে ইচ্ছা করি না। যথাসময়ে লেখাটি পাঠাইয়া দিব।”[৭২] লক্ষণীয়, নাটকটির নাম তখন ‘নন্দিনী’ বা ‘যক্ষপুরী’— যদিও রবীন্দ্রনাথ কোনো পাণ্ডুলিপিতেই একে ‘যক্ষপুরী’ নামে অভিহিত করেননি, কিন্তু এটি লোকমুখে উক্ত নামে এতটাই পরিচিত হয়েছিল যে, তাঁর কলমেও স্বতই এসে পড়েছে— নাটকটি তখনও ‘রক্তকরবী’ নাম লাভ করেনি, যেটি প্রথম দেখা যায় অষ্টম পাণ্ডুলিপিতে, রক্তকরবী ফুলের উল্লেখ তখন যথেষ্ট বেড়েছে, তার তাত্ত্বিক তাৎপর্যও তখন অনেকটা স্পষ্ট হয়ে আসছে। অথচ দেখা যাচ্ছে, এখনই নাটকটি পত্রিকায় প্রকাশের কথা ভাবা হচ্ছে ও সুইস-ফরাসি বহুভাষাবিদ্ অধ্যাপক Fernand Benoit-র সহায়তায় তার ইংরেজি অনুবাদ সমাপ্তপ্রায়; নাটকটি অভিনয়ের কথাও গুরুত্ব দিয়ে চিন্তা করা হচ্ছে।

রবীন্দ্রভবনে এই অনুবাদটির একটিমাত্র টাইপ-করা পাণ্ডুলিপি আছে [Ms. 36]— রবীন্দ্রনাথ ও ইন্দিরা দেবীর দ্বারা সংশোধিত। রক্তকরবী-র খসড়াগুলির সঙ্গে মেলালে বোঝা যায়, তর্জমাটি ষষ্ঠ খসড়া [Ms. 149 (ii)] অবলম্বনে করা, যেটি সুধেন্দুরঞ্জন হোম রায়-কৃত অনুলিপি ও যার ঘোষিত সময়কাল ‘End of 1923 or beginning of 1924— Gurudev was then staying with Prasanta Ch. Mahalanobis at his Alipore residence.’ এই শেষোক্ত তথ্যটি যদি ঠিক হয় [যতদূর মনে হয়, ঠিক নয়— এই বিষয়ে আমরা পরে আলোচনা করব], তাহলে বেনোয়ার সহায়তায় রবীন্দ্রনাথ যে-তর্জমাটি প্রায় শেষ করে এনেছিলেন এটি সেই পাণ্ডুলিপি নয়। আমরা আগেই বলেছি, শিলঙে থাকার সময়ে তিনি তিনটি খসড়া রচনা করেছিলেন। কলকাতায় আসার পরে তিনি যদিও বিসর্জন-এর রিহার্সাল ও অন্যান্য কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন, তবু তাঁর পত্রের সাক্ষ্যেই বলা যায় তিনি তখনও নাটকটির পাঠ সংস্কারের কাজে নিযুক্ত আছেন অর্থাৎ অন্তত চতুর্থ খসড়াটি তৈরি হয়ে গেছে— যেটি বহুরূপী পত্রিকায় মুদ্রিত হয়েছে। পঞ্চম খসড়াটির হস্তলিপি অমিয় চক্রবর্তীর, তিনি পুজোর ছুটির আগে কিছুদিন শান্তিনিকেতনে এসে ছিলেন— রবীন্দ্রনাথ সেই সময়েই তাঁকে দিয়ে নাটকটির একটি সংশোধিত প্রতিলিপি প্রস্তুত করান। সুতরাং আমরা প্রায় নিশ্চিতভাবেই সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে, বহুরূপী পত্রিকায় মুদ্রিত পাঠটিই বেনোয়ার সহায়তায় রবীন্দ্রনাথ তর্জমা করেছিলেন।

রবীন্দ্ররচনার সাময়িকপত্রে প্রকাশসূচি আমরা জ্যৈষ্ঠ ১৩৩০ পর্যন্ত সংকলন করেছি। এখানে আষাঢ় ও শ্রাবণ মাসের প্রকাশসূচি দেওয়া হল :

শান্তিনিকেতন, আষাঢ় ১৩৩০ [৪। ৬] :

৭৯–৮১ ‘বলাকা / (ব্যাখ্যা ও আলোচনা)’

৮১–৮২ ‘ছন্দ’ দ্র ছন্দ [১৩৮২]। ৭০–৭১ [‘ছন্দের অর্থ’, দ্বিতীয় পর্যায়]

৮৮–৮৯ ‘সুদামাপুরী বাসীদের প্রতি / (পারবন্দরে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রদত্ত বক্তৃতা হইতে গৃহীত)’

৯২–৯৩ ‘গান’ [‘পাখী বলে চাঁপা আমারে কও’] দ্র গীত ২। ৫৮৫; স্বর ৩০

৯৫ 'গান' ['তোমার বীণায় গান ছিল'] দ্র গীত ২। ৩৬৮; স্বর ৩০

দুটি গানই পূর্বপ্রকাশিত, দিনেন্দ্রনাথ-কৃত এগুলির স্বরলিপি বর্তমান সংখ্যায় মুদ্রিত হয় [পৃ ৯৩–৯৫, ৯৬–৯৭)।

প্রাচী, আষাঢ় ১৩৩০ [১ / ৩] :

'প্রাচী' [জাগো হে প্রাচীন প্রাচী' দ্র পরিশেষ [সংযোজন] ১৫। ২৮৯–৯০

The Modern Review, July 1923 [Vol. XXXIV, No. 1]:

1–18 'Gora' 41–47

Visva-Bharati Quarterly, July 1923 [Vol. I, No. 2] :

83–98 'The Way to Unity' দ্র *EWRT* 3/ 459–69

99–100 'The Beggar's Heart I Cannot Bear'

177–84 'Notes and Comments'

185 'With the Song I am a Song'

'Notes and Comments' 'Paragraph আকারে' লিখিত সেই রচনা যার কথা রবীন্দ্রনাথ অমিয় চক্রবর্তী ও প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশকে লেখা পূর্বোদ্ধৃত পত্রে উল্লেখ করেছিলেন। আমরা আগেই বলেছি, সম্ভবত এরই সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ হিন্দু-মুসলমান সমস্যা ও তার সমাধান সম্পর্কে 'The Way to Unity' নামে দীর্ঘ প্রবন্ধটি রচনা করেন।

বলাকা-র কবিতার তর্জমাগুলি ক্ষিতীশচন্দ্র সেনের করা, প্রথমটির মূল 'তুমি দেবে, তুমি মোরে দেবে' ও দ্বিতীয়টি 'আজ প্রভাতের আকাশটি এই শিশির-ছলছল'।

শান্তিনিকেতন, শ্রাবণ ১৩৩০ [৪ / ৭] :

১১০ 'গান' [যুগে যুগে বুঝি আমায় চেয়েছিল সে'] দ্র গীত ২। ৩৭৩–৭৪; স্বর ৩০

১১৩ 'গান' ['তোমায় গান শোনাব তাই ত আমায়'] দ্র গীত ২। ২৭২–৭৩; স্বর ৩০

দুটি গানেরই স্বরলিপি করেন দিনেন্দ্রনাথ [পৃ ১১০–১২, ১১৩–১৫]।

বঙ্গবাণী, শ্রাবণ ১৩৩০ [২ / ১ / ৬] :

৬৭৭–৮০ 'একখানি চিঠি' ['ছন্দে লেখা একটি চিঠি'] দ্র পুরবী ১৪। ১৬–১৯ ['শিলঙের চিঠি']

The Modern Review, August 1923 [Vol. XXXIV, No. 2] :

121–39 'Gora' 48–56

রাণু কাশীর উদ্দেশে রওনা হয়ে যাবার পরে হয়তো প্রস্তাবিত চিনের বক্তৃতা রচনা ইত্যাদি কাজ করার জন্য রবীন্দ্রনাথ বাসস্থান পরিবর্তন করে ২০ ভাদ্র [বৃহ 6 Sep] তাঁকেই লিখলেন : 'তুমি জানতে চাও আমি কোথায় বসে লিখচি। যেখানে তুমি আমাকে দেখে গিয়েছিলে সেখানে নয়। সেই যেখানে আমার পাকা বাসস্থান সেখানে কাল ফিরে এসেচি। আমার এই লেখবার ঘর তোমার পরিচিত কিন্তু তার আসবাবপত্রের বদল হয়ে গেচে। আমার সেই স্লেট বাঁধানো লেখবার টেবিলটা দক্ষিণ পূর্ব্ব কোণ থেকে সরে এসে উত্তর

পশ্চিম কোণ আশ্রয় করেচে। সেই দক্ষিণ পূর্ব্ব দেয়ালের গায়ে মস্ত একটা তক্তপোষ পড়েচে।'[৭৩] তখন তিনি বেনোয়াকে নিয়ে নন্দিনী নাটকের তর্জমায় ব্যাপৃত— তাঁর আশা, পরের দিনে সেটি শেষ হয়ে গেলে তিনি 'চীনযাত্রার জন্যে বক্তৃতা লিখতে' বসবেন।

চিনের বক্তৃতা নয়, এই সময়ে তাঁর লেখার তারিখযুক্ত [২২ ভাদ্র : ৪ Sep] যে লিখিত প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে সেটি হল জনৈকা 'শ্রীমতী কল্পনা দেবীর প্রতি' 'আশীর্বাদ'-শীর্ষক একটি ফরমায়েশি কবিতা 'সুন্দর ভক্তির ফুল অলক্ষ্যে নিভৃত তব মনে' [দ্র পরিশেষ (সং) ১৫। ২৯২; বিচিত্রা, শ্রাবণ ১৩৩৫]।

ভিন্টারনিৎসের শান্তিনিকেতন ত্যাগের সময় এগিয়ে আসছিল। মহাভারতের একটি তুলনামূলক সংস্করণ প্রস্তুত করার জন্য পুনার ভাণ্ডারকর ইনস্টিট্যুটের সহযোগে তিনি বিশ্বভারতীতে অধ্যাপক-ছাত্রদের সমবায়ে একটি কর্মকাণ্ডের সূত্রপাত করেছিলেন। তাঁর অবর্তমানে কাজটি অব্যাহত রাখার জন্য তিনি 5 Sep [১৯ ভাদ্র] রবীন্দ্রনাথকে লেখা একটি পত্রে নিজের ছাত্র Dr. Otto Stein-এর নাম সুপারিশ করেন। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ছুটি না পাওয়ায় তাঁকে নিয়োগ করা সম্ভব হয়নি।

শান্তিনিকেতনে থাকলেই রবীন্দ্রনাথকে কতকগুলি রুটিন-বাঁধা কাজে যোগ দিতে হত। সেইভাবেই তিনি ২৩ ভাদ্র [রবি 9 Sep] সন্ধ্যায় লাইব্রেরির উপরের ঘরে বিশ্বভারতী সম্মেলনীর সাধারণ অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন; এই অনুষ্ঠানে ভিন্টারনিৎস ভারতীয় সাহিত্যের সঙ্গে বিশ্বসাহিত্যের সম্বন্ধ বিষয়ে প্রবন্ধ পড়েন, ২৭ ভাদ্র তাঁর পাঠ শেষ হয়। প্রবন্ধটি রবীন্দ্রনাথের খুব ভালো লাগে। ভিন্টারনিৎসের কাশী যাওয়ার কথা ছিল, রবীন্দ্রনাথ ২৬ ভাদ্র রাণুকে লিখলেন : 'উইন্টারনিজ সেপ্টেম্বরের শেষভাগে কাশী যাবেন— তোমার বাবজাকে বোলো তাঁর যেন উপযুক্ত অভ্যর্থনা হয়। সেদিন তিনি Indian Literature as a World Literature নামক একটি বক্তৃতা দিয়েছিলেন, খুব ভাল লেগেছিল। তোমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে যদি তাঁকে বক্তৃতায় আমন্ত্রণ করা হয় তবে সেইটি তাঁকে বলতে বোলো।'[৭৪]

15 Sep [শনি ২৯ ভাদ্র] ভিন্টারনিৎসের বিদায়সংবর্ধনা উপলক্ষে ছাত্র-শিক্ষকদের অভিনয়ের দিন ধার্য হয়েছিল। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ সকৌতুকে রাণুকে উক্ত পত্রে লেখেন :

> উইন্টারনিট্জ্ আগামী ১৫ই তারিখে আশ্রম থেকে বিদায় নেবেন। তদুপলক্ষে বিশ্বভারতীর ছাত্ররা উত্তররামচরিতের একটা অংশ অভিনয় করবে। সীতা বাসন্তী তমসা প্রভৃতি সাজবার জন্যে এখন থেকে পুরোদমে দাড়ি গোঁফ কামানো চল্‌চে। এই ব্যাপার দেখে দীনু ভীষণ ক্ষাপা হয়ে উঠেচে, সে আকাশে তার দুই বাহু প্রক্ষেপ করে বল্‌চে—
>
> ঘোর কলি এসেচে ঘনায়ে— ছিন্ন গুম্ফ
> দম্ভ ভরে নারী-কান্তি হরিবারে চায়,
> কাছা-কোঁচা সাড়িরূপে আস্ফালন করে!
>
> এই মাত্র তাঁর তো আমার কাছে এসে তাঁর আক্ষেপোক্তি জানিয়ে গেল। আমারও মনে ক্ষোভ জন্মালো। এই সেদিন যে আমি রঙ্গমঞ্চপরে দাঁড়ায়েছি গর্ব্বভরে, সাথে লয়ে অভিনেত্রী সখী মোর। আমার মনে হল যেন তারই কণ্ঠ আমাকে বল্‌তে লাগ্ল, "ভানুদাদা, এস যাই এ নাট্যমন্দির ছেড়ে।" আমি তার জবাবে বল্‌লুম, "যাব যাব, তাই যাব, হায় রাণু, তাই যেতে হবে।" আগামী কাল অভিনয়ের দিন; আমি ঠিক করেচি অভিনয় শেষ হয়ে গেলে উপস্থিত হয়ে ওদের উৎসাহ দেব। কারণ অভিনয়কালে উপস্থিত থাকলে উৎসাহ দেওয়া আমার পক্ষে কঠিন হবে।[৭৪]

২৯ ভাদ্র উত্তররামচরিত অভিনয়ের পরের দিন ৩০ ভাদ্র [রবি 16 sep] রাত্রে ভিন্টারনিৎসের বিদায়সভায় প্রথমে তাঁকে মাল্যচন্দনে ভূষিত করে পট্টবস্ত্র, উত্তরীয় ও অঙ্গুরীয় উপহার দেওয়া হয়। অতঃপর বেদমন্ত্র পাঠের পরে রবীন্দ্রনাথ, বিধুশেখর শাস্ত্রী ও বেনোয়া অভিনন্দনপত্র পাঠ করেন। রবীন্দ্রনাথ বলেন :

Acharya M. Wintemitz,

Before you came to us we had been aware of your reputation as one of the foremost scholars whose knowledge comprehended an amazingly vast field of Indian literature. We felt grateful to you for having accepted our invitation and were proud to be able to receive you as our honoured guest. On the day when we must bid you farewell, let us assure you that our love for your personality has become equal to our reverence for your scholarship, and that though in outward appearance the time of your stay with us has been short, spiritually it has acquired a permanence in our heart.

Through the reticence of your modesty has sweetly shone the love of truth, and the love of man which is so completely free from race prejudice, from the narrow spirit of egotism, your intellectual outlook has found its moral background in the unity of man; and this has strengthened our love for the Visvabharati ideal. In fact, your personal contact with the inmates of this Asrama has been a living contribution to the building up of our Institution which for its materials must never depend upon bricks and mortar, rules and regulations, but upon its faith in human history as the history of the ceaseless endeavour to reach the highest expression of the spiritual meaning of existence.

It is needless to tell you that we have started our Visvabharati with the expectation of attracting round it, from all parts of the world, individuals who, in the present turmoil of contradiction, still cherish hope in the ultimate triumph of the **Shantam** and **Shivam**, who in the light of the **Advaitam** will recognise themselves as brothers when they meet, though belonging to different climates and races. We have found you, dear friend, as one such, and our brothers' greetings we offer to you at this time of our parting.

পরদিন সকালে রবীন্দ্রনাথ স্টেশনে গিয়ে তাঁকে ট্রেনে তুলে দিয়ে আসেন।

২৪ ভাদ্র [সোম 10 Sep] সকালে মাত্র ৩৬ বৎসর বয়সে সুকুমার রায়ের জীবনাবসান ঘটে; প্রায় আড়াই বৎসর তিনি তখনকার দিনে দুরারোগ্য কালাজ্বরে ভুগছিলেন। রবীন্দ্রনাথ কলকাতা থেকে শান্তিনিকেতনে আসবার আগে তাঁকে দেখতে গিয়েছিলেন, মৃত্যুপথযাত্রী সুকুমারের অনুরোধে তিনি 'আছে দুঃখ, আছে মৃত্যু, বিরহদহন লাগে' ও 'দুঃখ এ নয়, সুখ নহে গো— গভীর শান্তি এ যে' গান-দুটি গেয়ে শোনান— শেষোক্ত গানটি তাঁকে দুবার গাইতে হয়েছিল। এইসব কথাই তিনি বললেন ২৬ ভাদ্র [বুধ 12 Sep], মন্দিরের উপাসনায় [দ্র শান্তিনিকেতন, ভাদ্র। ১২৭–২৯; ব্যক্তিপ্রসঙ্গ ৩১। ৯৩–৯৭]। তিনি বললেন, মানুষ যখন কঠিন রোগে পীড়িত তখন মৃত্যুর সঙ্গে তার প্রাণশক্তির সংগ্রামটাই সকলের চেয়ে প্রধান হয়ে ওঠে। কিন্তু অন্যান্য জীবের মতো মানুষ তো কেবল প্রাণী নয়, মৃত্যুকে অমৃতলোকে উত্তীর্ণ করে দেওয়ার পাথেয় নিয়ে সে জন্মায়। 'আমার পরম স্নেহভাজন যুবকবন্ধু সুকুমার রায়ের রোগশয্যার পাশে এসে যখন বসেছি এই কথাই বার বার আমার মনে হয়েছে। আমি অনেক মৃত্যু দেখেছি কিন্তু এই অল্পবয়স্ক যুবকটির মতো, অল্পকালের আয়ুটিকে নিয়ে মৃত্যুর সামনে দাঁড়িয়ে এমন নিষ্ঠার সঙ্গে অমৃতময় পুরুষকে অর্ঘ্যদান করতে প্রায় আর কাউকে

দেখি নি। মৃত্যুর ঘরের কাছে দাঁড়িয়ে অসীম জীবনের জয়গান তিনি গাইলেন। তাঁর রোগশয্যার পাশে সেই গানের সুরটিতে আমার চিত্ত পূর্ণ হয়েছে।'

শান্তিনিকেতনে এসেই রবীন্দ্রনাথ একবার ঘর পরিবর্তন করেছিলেন, আবার একবার বদলের সংবাদ রাণুকে জানালেন ৩১ ভাদ্র [সোম 17 Sep] তারিখে : 'ইতিমধ্যে আমার দৈনিক কার্যকলাপের একটুখানি scene বদ্‌লে গেছে। সেই বড় ঘরটা ছেড়ে দিয়েচি। সেটা রাস্তার ধারে থাকাতে যখন তখন যে সে এসে বড় উৎপাত করত। এখন এসেচি দক্ষিণের বারান্দার পূর্ব্বকোণে, নাবার ঘরটার ঠিক বিপরীত প্রান্তে একটি ছোট্ট ঘরে। এ ঘরটার গোড়াপত্তন তুমি বোধ হয় দেখে গিয়েছিলে। আমার সেই কালো স্লেট-বাঁধানো লেখবার টেবিলেই ঘরের প্রায় সমস্ত জায়গা জুড়ে গিয়েচে। কেবল আর একটি মাত্র চৌকি আছে— ঘরের মধ্যে লোকের ভিড় হবার জায়গা রাখি নি।'[৭৫]

কলকাতায় বক্তৃতা দেওয়ার জন্য প্রশান্তচন্দ্র আহ্বান করেছিলেন, *16 Sep তাঁকে লিখলেন : 'রামমোহন রায়ের স্মরণ সভায় বক্তৃতা দিতে যাওয়া ঘট্‌বে না। যাতায়াতের দুঃখ আমার পক্ষে দুঃসহ।'[৭৬] বিশ্বভারতীর আর্থিক অবস্থা তখন শোচনীয়। সুতরাং নানা উপায়ে অর্থাগমের চেষ্টায় অন্যতম কর্মসচিব প্রশান্তচন্দ্র রবীন্দ্রনাথের জন্য নানা ধরনের ফরমায়েশি কাজ সংগ্রহে ব্রতী হয়েছিলেন। নিরুপায় হয়ে তাঁকে এইসবে সম্মতি দিতে হলেও তার গ্লানিতে তাঁর মন পীড়িত হত। ইন্দিরা দেবী এম্পায়ার একজিবিশনের জন্য কলাভবনের শিল্পীদের ছবি পাঠাবার কথা লিখেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ পত্রপাঠ সেই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে ৩১ ভাদ্র লেখেন : 'এম্পায়ার একজিবিশনের সঙ্গে আমরা সম্বন্ধ রাখতে নারাজ, তার প্রধান কারণ যাঁদের এম্পায়ার তাঁরা আমাদের এম্পায়ারভুক্ত করে রেখেচেন যেহেতু আমরা না হলে তাঁদের তোষাখানা শূন্য হয়, সেটা ঐশ্বর্য্যহানির লক্ষণ। আমি তা নিয়ে নিজেদের অযোগ্যতাকেই দোষ দিই কিন্তু তবুও যথাসম্ভব মান বাঁচিয়ে চলবার খাতিরে, তাঁদের ভোজের পাত পাড়বার বেলায় আমাদের ডাক পড়লে, আমি গা ঢাকা দিয়ে বেড়াই। এম্পায়ার একজিবিশনে শান্তিনিকেতন থেকে ছবি গেলে আমাদের জাত যাবে।' শিল্পকলার ক্ষেত্রে সরকারি সাহায্য নিতে তাঁর আপত্তি ছিল সরকারি খবরদারির আশঙ্কায়, কিন্তু চিত্রপ্রদর্শনীর ব্যাপারে তাঁর সাধারণত ছুঁৎমার্গ ছিল না— এই আপত্তির কারণ সম্ভবত আরও গভীর যা আমাদের জানা নেই। অর্থাভাবের কারণে সমসাময়িক মানসিক উত্তেজনাও এর অন্যতম কারণ হতে পারে। বিশেষত এর পরেই তিনি লিখেছেন : 'আমি এখানে এসেও ব্যস্ত আছি। ··· বোধ হয় জানিস্ আমার কর্ম্মস্থানে শনিগ্রহ তার স্বভাব হচ্চে এই যে, সে বেদম কাজ করিয়ে নেয় আর দাম চাইলেই দাঁত খিঁচোয়। ঘরে বাইরে সবাই বিশ্বভারতীর নাম শুন্‌লেই বলে, আগে ঘরের কাজ সারো, তার পরে বাইরের দিকে মন দিয়ো··· বড় আইডিয়াকে "বড়" বদনাম দিয়েই লোকে গাল দিয়ে থাকে।'[৭৭]

তাই বিবিধ কাজের ফরমায়েশে বিরক্ত রবীন্দ্রনাথ ২ আশ্বিন [বুধ 19 Sep] প্রশান্তচন্দ্রকে লিখলেন :

দীর্ঘকাল কলকাতায় বৃথা কাটিয়ে অত্যন্ত বিতৃষ্ণা জন্মেছে। এমন করে সময় নষ্ট আর কোনোদিন করিনি। তুমি ডেকেচ। যাতায়াত এবং কাজ ধরে অন্তত সাতদিন কাটবে। ··· আমার উপরে তোমরা কত যে অনাবশ্যক দায় চাপিয়েছ ঠিক নেই— তার মধ্যে Calcutta University একটা। ··· বঙ্গবাণীর জন্যে কবিতা লেখা অসম্ভব, কেননা ইচ্ছা করলেই কবিতা লেখা সম্ভব হয় না। কাজেই গদ্য লিখ্‌তে বসেচি, এমন সময় যখন এর চেয়ে বড় কাজ আমার হাতে ছিল। কিন্তু ভিক্ষুকের নিজের সময় ও ইচ্ছার উপর নিজের জোর খাটে না। এমনি করে আমি দিনে দিনে জাত খুইয়ে বসেচি। ···

আমি কলকাতায় যেতে রাজি আছি যদি তোমাদের বেগারের কাজ ছাড়াও আমি নিজের কাজ করতে পারি। অহরহ অর্থের চিন্তা থেকে নিষ্কৃতি পাবার জন্যেই অর্থ সংগ্রহ [করার] চেষ্টা করতে হয়। আগামী বৎসরের কথা ভাবলে ভাবনার অন্ত থাকে না। এইবেলা যদি একটা বাঁধা আয়ের ব্যবস্থা না করি তাহলে আমাকেই দ্বারে দ্বারে আবার হাত জোড় করে ফিরতে হবে। এবার কলকাতায় গিয়ে বিশ্বভারতীর কি কাজ করতে পারব যদি তার একটা তালিকা পাঠাও তাহলেই আমি যাব, নইলে announce কর আর না কর আমি এখান থেকে নড়ব না। অর্থাৎ নির্মল বড়াল, বল্লভ, বীরলা, প্রভৃতি কার কার কাছে যাব সে কথা স্পষ্ট জানা চাই— তার পরে আর একটা অত্যাবশ্যক কাজ আছে সে হচ্চে সম্মিলনীতে আমার গান শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা করা— অনেকদিন থেকে শুনে আসচি ব্যবস্থা হবে কিন্তু হয়নি— এবার গিয়ে যথোচিত উপায় যদি অবলম্বন করতে পারি তাহলেই যাব। ··· যদি যাই তোমাদের ওখানে থাকব, কেননা লোকজন বয়ে নিয়ে, জোড়াসাঁকোয় কয়দিনের জন্যে উপনিবেশ স্থাপন করতে যাওয়া বিষম হাঙ্গামা।[৭৮]

যাই হোক, প্রশান্তচন্দ্র কিছু-একটা প্রতিশ্রুতি দিয়ে তাঁকে রাজি করিয়েছিলেন, তিনি যাত্রার আয়োজন শুরু করেন।

উপরের চিঠিতে বঙ্গবাণী-র জন্য কবিতা লেখার প্রসঙ্গ আছে। বিষয়টি স্পষ্ট হয় ৪ আশ্বিন রাণুকে লেখা চিঠি থেকে : '···আজ অত্যন্ত ব্যস্ত আছি। প্রথম ব্যস্ততা একটা কবিতা লেখা নিয়ে— বঙ্গবাণী নামক এক মাসিক পত্র আমার সম্মতি না নিয়েই বিজ্ঞাপন দিয়েচে যে আশ্বিনের বঙ্গবাণীতে আমার কবিতা বেরবে। পিতৃসত্য পালনের জন্যে রামচন্দ্র বনে গিয়েছিলেন সে ত্রেতাযুগে, সম্পাদকের সত্য পালনের জন্যে কবিকে কবিতা লিখতে হয় সে কলিযুগে। আজই লিখে না দিলে চলবে না।'[৭৯] বিষয়টি নিয়ে বঙ্গবাণী পত্রিকার অন্যতম স্বত্বাধিকারী আশুতোষ-পুত্র শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে [1901–53] একটি তারিখহীন পত্রে লেখেন : 'কবিতা বুনো পাখী, তাকে আয় বলে ডাকলেই ধরা দেয় না। তার বদলে "সমস্যা" নামক একটা গদ্য প্রবন্ধ লিখ্‌তে বসলুম। এটাতে তোমাদের পাঠকমহলে উত্তেজনা হবে। পদ্যের শীতলভোগের চেয়ে সেটা বর্ত্তমান কালের উপযোগী হতে পারবে বলে আশা করি। যদি লিখ্‌তে লিখ্‌তে পুঁথি বেড়ে যায় তাহলে ওটা একবার বক্তৃতামঞ্চে পড়ে নেবার ইচ্ছে আছে। বাকি সব কলকাতায় গিয়ে হবে।'[৮০] 'সমস্যা' নামে রাজনৈতিক প্রবন্ধটি তিনি লিখলেন, কিন্তু সম্পাদকের সত্য পালনের ফরমায়েশ থেকেই দীর্ঘদিন পরে একটি কবিতা জন্ম নিল 'যাত্রা' ['আশ্বিনের রাত্রিশেষে ঝরে-পড়া শিউলি-ফুলের'] সেইদিন ৪ আশ্বিনেই, প্রতিশ্রুতি রক্ষার জন্য রচনা-শেষেই সেটি শ্যামাপ্রসাদকে পাঠিয়ে দেন। পরের দিন ৫ আশ্বিন [শনি 22 Sep] তার একটি পাঠান্তর [দ্র দেশ, সাহিত্য ১৩৯০। ১০–১২] পাঠিয়ে লিখলেন : 'কাল যে কপি পাঠিয়েছিলুম তাড়াতাড়িতে সেটা সংশোধন করা হয়নি আজ সংশোধিত কপি পাঠাই— এইটি ছাপিবেন'।[৮১] পরিবর্তিত পাঠটিই ছাপা হয় [দ্র বঙ্গবাণী, কার্তিক। ২৬৯–৭১; পূরবী ১৪। ১৯–২১]— সংখ্যাটিতে 'কার্তিক' লেখা থাকলেও শারদীয়া সংখ্যা বলে ১৫ আশ্বিনের মধ্যে প্রকাশিত হয়।

22 Sep কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থানাপন্ন রেজিস্ট্রার জে.সি. চ্যাটার্জি রবীন্দ্রনাথকে একটি চিঠি পাঠালেন : 'I am directed by the Vice-Chancellor and Syndicate to inform you that on the recommendation of the Executive Committee of the Council of Post-Graduate Teaching in Arts, which has been adopted by the Senate, you have been appointed a University Reader to deliver a course of lectures on "Sahitya", on an honorarium of Rs. 2000/-.' সম্ভবত বিষয়টি নিয়ে অনেক দিন ধরে

আলোচনা চলছিল। ২০ আষাঢ় [5 Jul] আশুতোষ মুখোপাধ্যায়কে লেখা রবীন্দ্রনাথের একটি চিঠি পাওয়া যায় :

বিশ্ববিদ্যালয়ে আমাকে বক্তৃতা করিতে অনুরোধ করিয়াছেন আমি তাহা পালন করিতে প্রস্তুত আছি। কিন্তু আপনারা যে দক্ষিণা বরাদ্দ করিয়াছেন তাহা স্বীকার করিতে আমি কুণ্ঠিত। আমি অন্য দেশেও বক্তৃতা করিয়াছি সেখানকার আদর্শে দাবী করিলে সহিবে না তাহা জানি। কিন্তু আপনারাও অনেককে যে হারে পুরস্কৃত করিয়াছেন আমার সম্বন্ধে তাহার লাঘব করিলে আমি এ কাজে হাত দিতে উৎসাহ বোধ করিবনা। আর একবার বিবেচনা করিয়া দেখিবেন এবং দয়া করিয়া বক্তৃতা পিছু এমন কিছু স্থির করিয়া দিবেন যাহাতে আমার মান রক্ষা হয়।[৮২]

আপত্তিটি আসলে উত্থাপন করেছিলেন প্রশান্তচন্দ্র 3 Jul [১৮ আষাঢ়] রবীন্দ্রনাথকে লেখা একটি চিঠিতে : 'আশুবাবু ২০০০ টাকায় ৬টা বক্তৃতা চাচ্ছেন; এবং বক্তৃতাগুলি নিজেই publish করবেন। এটাকে ridiculous ছাড়া আর কিছু বলা যায় না। অবনীবাবু পান ৬টা বক্তৃতার জন্য বছরে ৬০০০ টাকা।' আশা করা যায়, বর্তমান ব্যবস্থায় রবীন্দ্রনাথের মান সম্ভবত রক্ষিত হয়েছিল, ১৮—২০ ফাল্গুন [1—3 Mar 1924] পর-পর তিন দিন রবীন্দ্রনাথ সিনেট হলে তিনটি মৌখিক ভাষণ প্রদান করেন ও সেগুলি আশুতোষ-পরিবারের পত্রিকা বঙ্গবাণী-তে ছাপা হয়েছিল।

আশ্বিন-কার্তিক-সংখ্যা শান্তিনিকেতন-এর 'আশ্রম-সংবাদ'-এ জানানো হয় : 'গত ২২শে সেপ্টেম্বর [শনি ৫ আশ্বিন] পূজনীয় গুরুদেব, রথীবাবু, ক্ষিতিমোহনবাবু প্রভৃতি মিস গ্রীনের অতিথি হইয়া সুরুলে আসিয়াছিলেন। মিস গ্রীন সেই দিন সুরুলের ছাত্রদিগকে একটি ভোজ দেন।'

৬ আশ্বিন [রবি 23 Sep] সন্ধ্যায় কলাভবনে বিশ্বভারতী সম্মেলনীর ২৬তম সাধারণ অধিবেশনে রবীন্দ্রনাথ 'সমস্যা' প্রবন্ধটি পাঠ করেন।

৮ আশ্বিন [মঙ্গল 25 Sep] ক্যাশবহিতে 'গুরুদেবের কলিকাতা গমনের খরচ'-এর হিসাব থেকে মনে হয়, রবীন্দ্রনাথ এইদিন শান্তিনিকেতন থেকে কলকাতা রওনা হন। পূর্বনির্ধারিত ব্যবস্থানুসারে তিনি আলিপুর অবজারভেটারিতে প্রশান্তচন্দ্রের সরকারি আবাসে আতিথ্য গ্রহণ করেন। এই যাত্রায় তিনি সেখানে প্রায় তিন সপ্তাহ বাস করেছিলেন।

১১ আশ্বিন [শুক্র 28 Sep] সন্ধ্যা সাড়ে ছ'টায় রামমোহন লাইব্রেরি হলে বিশ্বভারতী সম্মিলনীর উদ্যোগে রামমোহন রায়ের বাৎসরিক স্মৃতিসভার নবতিতম অধিবেশনে রবীন্দ্রনাথ সভাপতিত্ব করেন। কিন্তু তাঁর ভাষণ কোথাও প্রকাশিত হয়েছিল বলে জানা যায়নি।

কলকাতায় এলেই লোকজন সভাসমিতি প্রভৃতির দাবিতে রবীন্দ্রনাথ অতিষ্ঠ হয়ে উঠতেন। এইরূপই এক বা একাধিক কোনো দাবির [বঙ্গবাণী-র জন্য কবিতা লেখার ফরমায়েশটি স্মরণীয়] সম্মুখীন হয়ে তিনি এক দীর্ঘ 'কৈফিয়ৎ' রচনা করেন। এটি 'বিজলী' পত্রিকায় মুদ্রিত হয়। 'বিজলী' আমরা দেখিনি, অগ্র-সংখ্যা প্রবাসী-র 'কষ্টি পাথর'-এ রচনাটি পুনর্মুদ্রিত হয় [পৃ ২০৯—১১], সেখানে বিজলী-র তারিখ ২০ আশ্বিন— কিন্তু নেপাল মজুমদার লিখেছেন : "কবি তাঁহার ব্যক্তিগত জীবন ও কার্যকলাপের সুদীর্ঘ এক 'কৈফিয়ৎ' লিখিলেন (১২ই আশ্বিন-১৩৩০)। উহা 'বিজলী' পত্রিকায় কিছুদিন পর প্রকাশিত হয় (২৫শে আশ্বিন)।"[৮৩] চিঠিপত্রের জবাব দেওয়া, আশীর্বাণী বিতরণ ইত্যাদি থেকে অব্যাহতি চেয়ে পরিণত বার্ধক্যে রবীন্দ্রনাথকে সংবাদপত্রে

বিজ্ঞপ্তি দিয়ে অব্যাহতি চাইতে হয়েছিল, কিন্তু তার অনেক আগেই প্রায় অনুরূপ প্রার্থনা যথেষ্ট কৌতূহলজনক; রচনাটি যথেষ্ট পরিচিত নয় বলে এর কিছু অংশ উদ্ধার করছি :

কবি হোন বা কলাবিৎ হোন তাঁরা লোকের ফরমাস টেনে আনেন,— রাজার ফরমাস, প্রভুর ফরমাস, বহুপ্রভুর সমাবেশরূপী সাধারণের ফরমাস। ফরমাসের আক্রমণ থেকে তাঁদের সম্পূর্ণ নিষ্কৃতি নেই। তার একটা কারণ, অন্দরে তাঁরা মানেন সরস্বতীকে, সদরে তাঁদের মেনে চলতে হয় লক্ষ্মীকে। ··· জনসাধারণ বলতে যে প্রকাণ্ড জীবকে বোঝায়, স্বভাবতই তার প্রয়োজন প্রবল এবং প্রভূত। ··· সেই বহুরসনাধারী জীব তার বহুতর ফরমাসে মানব-সংসারকে রাত্রিদিন উদ্যত করে রেখেচে··· এই গর্জ্জনটা লীলার আসরেও প্রবেশ করে; দাবী প্রচার করতে থাকে যে, তোমাদের বীণা, তোমাদের মৃদঙ্গও আমাদের জয়যাত্রার ব্যাণ্ডের সঙ্গে মিলে আমাদের কল্লোলকে ঘনীভূত করে তুলুক। সে জন্যে সে খুব বড় মজুরী আর জাঁকালো শিরোপা দিতেও রাজী আছে। ··· সেই জন্যে ঢাকীর পক্ষে এ' সময়টা সুসময় কিন্তু বীণকারের পক্ষে নয়। ··· লোভে পড়ে স্বধর্ম্ম বিকিয়ে সে যদি পরধর্ম্মের ডঙ্কা বাজাতে যায়, তবে হাটে বাজারে তার নাম হবে। কিন্তু বিধাতার দরবারে তার নাম খোয়া যাবে।

এই ভূমিকার মধ্যে আমার নিজের কৈফিয়ৎ আছে। কখনো অপরাধ করিনি তা নয়। সেই অপরাধের লোকসান ও পরিতাপ তীব্র বেদনায় অনুভব করেছি বলেই সাবধান হই। ঝড়ের সময় ধ্রুবতারাকে দেখা যায় না বলে' দিক্‌ভ্রম হয়। এক এক সময়ে বাহিরের কল্লোলে উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে স্বধর্ম্মের বাণী স্পষ্ট করে' শোনা যায় না। তখন "কর্ত্তব্য" নামক দশমুখ-উচ্চারিত একটা শব্দের হুঙ্কারে মন অভিভূত হয়ে যায়, ভুলে যাই যে কর্ত্তব্য বলে' একটা অবচ্ছিন্ন পদার্থ নেই— আমার "কর্ত্তব্যই" হচ্ছে আমার পক্ষে কর্ত্তব্য। ···

বর্ত্তমান বয়সে আমার জীবনের প্রধান সঙ্কট এই যে, যদিচ স্বভাবত আমি আরণ্যক তবু আমার কর্ম্মস্থানের কুগ্রহ সকৌতুকে আমাকে সাধারণ্যক করে' দাঁড় করিয়েচেন। ··· কাব্যসরস্বতীর সেবক হয়ে গোলেমালে আজ গণপতির দরবারের তকমা পরে' বসেচি— তার ফলে কাব্যসরস্বতী আমাকে প্রায় জবাব দিয়েচেন, আর গণপতির বাহনটি আমার সকল কাজেরই ছিদ্র অন্বেষণ কর্‌চেন।

ফরমাসের শরশয্যাশায়ী হবার ইচ্ছা আমার কেন নেই সেই কথাটা এই উপলক্ষ্যে জানালুম। যেখানে দশে মিলে কাজ সেখানে আমার অবকাশের সব গোরু বাছুর বেচে খাজনা জোগাবার তলবে কেন আমি সিভিল অথবা আন্‌সিভিল ডিস্‌-ওবীডিয়েন্সের নীতি অবলম্বন করতে চেষ্টা করি তার একটা কৈফিয়ৎ দেওয়া গেল। সব সময়ে অনুরোধ উপরোধ এড়িয়ে উঠতে পারিনি— তার কারণ আমার স্বভাব দুর্ব্বল। পৃথিবীতে যাঁরা বড়লোক তাঁরা রাশভারি শক্ত লোক; মহৎ সম্পদ অর্জ্জন করবার লক্ষ্যপথে, যথা-যোগ্য স্থানে যথোচিত দৃঢ়তার সঙ্গে "না" বলবার ক্ষমতাই তাঁদের পাথেয়; মহৎ সম্পদকে রক্ষা করবার উপলক্ষ্যে রাশভারি লোকেরা "না"-মন্ত্রের গণ্ডিটা নিজের চারিদিকে ঠিক জায়গায় মোটা করে' টেনে দিতে পারেন। আমার সে মহত্ব নেই, পেরে উঠিনে; হাঁ-না দুই নৌকার উপর পা দিয়ে দুলতে দুলতে হঠাৎ অগাধ জলের মধ্যে গিয়ে পড়ি।

উল্লেখ্য, এই রচনাটিই ঈষৎ সংশোধিত আকারে 'যাত্রী'-র 24 Sep 1924 তারিখে লিখিত ডায়ারিতে ব্যবহৃত হয়েছে; রচনাটি পাণ্ডুলিপিতে [Ms. 109 (i)] নেই, হয়তো প্রবাসী-র জন্য প্রেরিত পাঠে সংযোজিত হয়।

এর মধ্যে একটি দুঃসংবাদ য়ুরোপ থেকে শান্তিনিকেতনে পৌঁছল। এদেশে পিয়র্সনের শরীর ভালো ছিল না, মানসিক অশান্তিতেও তিনি পীড়িত হচ্ছিলেন। সেইজন্য বর্তমান বৎসরের শুরুতে তিনি কিছুদিনের জন্য ইংল্যান্ডে চলে যান। সেখানে পারিবারিক পরিবেশে কিছুকাল কাটানোর পরে অপেক্ষাকৃত সুস্থ হয়ে হল্যান্ড ও অন্যান্য দেশে কয়েকটি আদর্শ বিদ্যালয় দেখে অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের উদ্দেশ্যে তিনি য়ুরোপ রওনা হন। সেখানে রম্যাঁ রলাঁর সঙ্গে দেখা করে তিনি বন্ধু বেটম্যানকে নিয়ে যখন ট্রেনে মিলান থেকে ফ্লোরেন্সে যাচ্ছিলেন, তখন জানলা দিয়ে ঝুঁকে বাইরের প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখতে গিয়ে চলন্ত ট্রেন থেকে বাইরে পড়ে যান, দরজার ছিটকিনি ভালো করে লাগানো ছিল না— তারিখটি ছিল 18 Sep [মঙ্গল ১ আশ্বিন]। কয়েকজন শ্রমিক গুরুতর আহত অবস্থায় তাঁকে রেললাইনের ধারে পড়ে থাকতে দেখে তুলে নিয়ে আসেন একটি ভিলায়, পরে অ্যাম্বুলেন্সে তাঁকে নিয়ে আসা হয় Pistoia-র একটি হাসপাতালে। কয়েকদিন অসীম ধৈর্যে তীব্র যন্ত্রণা ভোগ করে তাঁর মৃত্যু হয় 25 Sep [মঙ্গল ৮ আশ্বিন] বিকেল সাড়ে চারটায়। ভাই এডগার ও বোন ডরোথি তখন তাঁর সঙ্গে ছিলেন। ডরোথিই টেলিগ্রাম করে দুঃসংবাদটি অ্যান্ডরুজকে জানান [সেখানে অবশ্য তারিখটি 24 Sep], খবর এসে পৌঁছয় 30 Sep [রবি ১৩ আশ্বিন] তারিখে, রবীন্দ্রনাথ তখন কলকাতায়। সংবাদটি জানার পরে তাঁর

তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ার কথা জানা যায় না, সম্ভবত পরের দিন তিনি একটি তারিখহীন চিঠিতে সংক্ষেপে রোটেনস্টাইনকে লেখেন : 'I do not know if you have heard of Pearson's death from accident in Italy. It is a great loss to our Ashram and to me personally, to which it will be hard for us to be reconciled.'[৮৪] পিয়র্সনের স্মৃতিরক্ষার্থে শান্তিনিকেতন আশ্রমের হাসপাতালটির উন্নতিসাধনের জন্য সাহায্য চেয়ে তিনি একটি বিজ্ঞপ্তি প্রচার করেন, আমরা *The Modern Review* [Nov/ 625, 'Notes']-এর পাঠটি উদ্ধৃত করছি :

...He is not known to the wide public, but we feel sure that his loss is not merely a loss to the individuals who came into intimate touch with him. We seldom met with anyone whose love of humanity was so concretely real, whose ideal of service so assimilated to his personality as it had been with him.... His patriotism was for the world of Man; he intimately suffered for all injustice or cruelty inflicted upon any people in any part of the earth, and his chivalrous attempt to befriend them he bravely courted punishment from his own countrymen. He had accepted Santiniketan Asram for his home where he felt he could realise his desire to serve the cause of humanity and express his love for India which was deeply genuine in his nature, all his aspirations of life centering round her.

৯ পৌষ [25 Dec] পরলোকগত আশ্রমবাসীদের স্মরণসভায় পিয়র্সনের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ বলেন :

...আমাদের যে বন্ধুর আগমনের জন্যে আমরা কিছুকাল ধরে প্রতীক্ষা করছিলুম, কিন্তু যাঁর আর আসা হল না সেই অকাল-মৃত্যুগ্রস্ত আমাদের পরম সুহৃৎ পিয়র্সনের কথা আজ বিশেষভাবে স্মরণ করার দিন। তিনি চলে যাওয়ার ক্ষতির কথা কিছুতে আমরা সহজে ভুলতে পারি নে। কিন্তু তাঁকে কেবল এই ক্ষতির শূন্যতার মধ্যে দেখলে ছোটো করে দেখা হবে। আমাদের যে ধন বাইরের জিনিস বাইরে থেকে যাবামাত্রই তার ক্ষতি একান্ত ক্ষতি ছাড়া আর কিছুই নয়। কিন্তু যাঁর জীবন নিজের আমি-গণ্ডিকে ছাড়িয়ে গিয়েছিল, যিনি কেবল নিজেরই মধ্যে বেঁচে ছিলেন না মৃত্যুর দ্বারা তাঁর বিনাশ হবে কী করে?

...এখানকার ছাত্র অধ্যাপক যাঁরা তাঁর বন্ধুত্বের ও প্রেমের আস্বাদ পেয়েছেন তাঁরাই জানেন যে কী পবিত্র দান তিনি চারি দিকে রেখে গেছেন। তিনি এখানকার সাঁওতালদের একমাত্র বন্ধু ছিলেন, নিজে তাদের ঘরে ঘরে গিয়ে তাদের মধ্যে কাজ করেছেন। আজ সেই-সব সাঁওতালরাই জানে যে কী সম্পদ তিনি দিয়ে গেছেন। তিনি এই সাঁওতালদের আর আশ্রমের শিশুদের সেবা করতে গিয়ে যে মহাসম্পদ লাভ করেছেন তা অতি মহামূল্য, তা সস্তায় পাওয়া নয়। তিনি সমস্ত দান করে তবেই সমস্ত গ্রহণ করতে পেরেছেন, জীবনের পাত্রকে পূর্ণ করে নিয়ে গেছেন। তিনি তাঁর মহৎজীবনকে পরিপূর্ণ করে সেই দান গ্রহণ করেছেন। তাঁর জীবনের পাত্র তাতে ভরপুর হয়ে উপচে পড়েছে, তিনি তার আনন্দে অধীর হয়েছেন।

আজ আমাদের তাঁর জীবনের এই কথাই স্মরণ করতে হবে তিনি যেমন বড়ো দান রেখে যেতে পেরেছেন তেমনি বড়ো সম্পদ পেয়ে গেছেন। তাঁর জীবনের এই মহত্ত্বকে শ্রদ্ধা করতে পারলেই তাঁর প্রতি যথার্থ শ্রদ্ধা প্রকাশ করা হবে। আশ্রমে যে সত্য কালে কালে ক্রমে ক্রমে পূর্ণ প্রকাশের মধ্যে উদ্‌ঘাটিত হয়ে উঠেছে, পিয়র্সন সাহেব তাকে জীবনে স্বীকার করে নিয়ে মৃত্যুর মধ্য দিয়ে তার সাক্ষ্য রেখে গেছেন।[৮৫]

১৮ আশ্বিন [শুক্র 5 Oct] সন্ধ্যা ৬টার সময়ে রবীন্দ্রনাথ আলফ্রেড রঙ্গমঞ্চে বিশ্বভারতী সম্মিলনীর উদ্যোগে 'সমস্যা' প্রবন্ধটি পাঠ করেন। শ্রোতারা আশা করেছিলেন, বাংলায় রাজনৈতিক আন্দোলন দমনের উদ্দেশ্যে সরকার যে 1818-র ৩ নং রেগুলেশন আইনটি ব্যবহার করতে শুরু করেছে রবীন্দ্রনাথ হয়তো এই ভাষণে তার বিরুদ্ধে কিছু বলবেন। কিন্তু তিনি সূচনাতেই বলেন, উক্ত বিষয়ে কিছু বলার ইচ্ছা তাঁর নেই। হিন্দু-

মুসলমান সমস্যা ও অন্যান্য কিছু বিষয়ে তিনি বিজলী-সম্পাদক মৃণালকান্তি বসুকে যা বলেছিলেন, পত্রিকায় মুদ্রিত প্রতিবেদনে তাঁর মূল বক্তব্য ঠিক থাকলেও তার গড়ন বদলে যাওয়ায় জনসাধারণের মধ্যে যে বিভ্রান্তি দেখা দিয়েছে তা নিরসনের জন্যই তিনি স্বয়ং এই বিষয়ে লিখে সভায় পাঠ করতে এসেছেন— এই ভূমিকা করে তিনি প্রবন্ধটি পড়তে শুরু করেন। ১৯ আশ্বিন আনন্দবাজার পত্রিকা-য় বক্তৃতাটির দীর্ঘ প্রতিবেদন মুদ্রিত হয় : 'গতকল্য অপরাহ্নে নির্দ্দিষ্ট সময়ের পূর্ব্বেই এলফ্রেড রঙ্গমঞ্চ শ্রোতৃমণ্ডলীতে পূর্ণ হইয়া যায়। মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী, শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পালও উপস্থিত ছিলেন। ঠিক ৬টার সময় কবি রবীন্দ্রনাথ প্রবন্ধ হস্তে মঞ্চে প্রবেশ করিবামাত্র শ্রোতৃবৃন্দ করতালিধ্বনিতে তাঁহার অভ্যর্থনা করেন। গরদের ধুতি, পাঞ্জাবী ও চাদর পরিহিত কবিকে বড়ই সুন্দর দেখাইতেছিল। … কবি তাঁহার নিজস্ব ভঙ্গীতে, সতেজকণ্ঠে, শব্দসম্পদ ও উপমাচাতুর্য্যের সমস্ত মাধুর্য্য ঢালিয়া দিয়া প্রবন্ধটি পাঠ করেন।'

এরই মধ্যে নন্দিনী নাটকের সংস্কারকার্যে বিরতি ছিল না। ২৪ আশ্বিন [বৃহ 11 Oct] অমিয় চক্রবর্তীকে লিখেছেন : 'নন্দিনী নাটকটার উপর ক্ষণে ক্ষণে প্রায়ই তুলি বুলচ্চি— তাতে তার রং ফুটচে বলেই বোধ হচ্চে। কাল সন্ধ্যাবেলায় আত্মীয়সভায় ওটা আর একবার পড়বার কথা আছে। আগাগোড়া সবটা একটানে পড়ে' গেলে বুঝতে পারব কোথাও ওর ওজনের বেঠিক আছে কি না। এই নাটকটা ক্ষিতীশ[চন্দ্র সেন]কে দিয়ে তর্জ্জমা করিয়ে নিলে কি রকম হয়? ইতিমধ্যে তুমিও চেষ্টা ছেড় না।'[৮৬]

জোড়াসাঁকোর আত্মীয়সভায় এই পাঠের সংবাদ তিনি ২৬ আশ্বিন [শনি 13 Oct] দিলেন রাণুকে : 'কাল সন্ধের সময় সেই নন্দিনী নাটকটার একটা পাঠ দিয়েছিলুম। অনেক বদল হয়ে গেচে। জান বোধহয় এখন তার নাম হয়েচে রক্তকরবী। সবাই শুনে বল্‌লে, রাণু না হলে নন্দিনীর ভূমিকা আর কেউ করতে পারবেনা।'[৮৭] রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত পাণ্ডুলিপিতে দেখা যায় অষ্টম খসড়ার [Ms. 151 (vii)] মলাটে নাটকটি প্রথম 'রক্তকরবী' নামে আখ্যাত হয়। কিন্তু এরই মধ্যে রবীন্দ্রনাথ অষ্টম খসড়ায় পৌঁছে গেছেন বলে মনে হয় না, তিনি সম্ভবত তখন মনের মধ্যে এই নামকরণের সংকল্প পোষণ করছিলেন।

তিনি ইতিপূর্বে ২৪ আশ্বিন অমিয়চন্দ্রকে লিখেছিলেন, 'আমি বোধ হয় শনিবারে আশ্রমে পৌঁছব।' রাণুকেও ২৩ আশ্বিন লেখেন : 'আমার কলকাতার কাজ শেষ হয়ে এল পর্শু কিম্বা শনিবারে শান্তিনিকেতনে ফিরে যাব।' কিন্তু 'ভিক্ষাবৃত্তির তাগিদে' তাঁর যাওয়া পিছিয়ে গেল। 8 Oct [সোম ২১ আশ্বিন] প্রশান্তচন্দ্র রথীন্দ্রনাথকে আলোচনার অগ্রগতি প্রসঙ্গে লিখেছেন :

> …কাল বিকালে যুগলকিশোর বিরলা (বড় ভাই)কে সুধীরবাবু আলিপুরে নিয়ে গিয়েছিলেন। ঘণ্টাখানেক কথাবার্ত্তা হল; যুগলকিশোরবাবু বেশ রীতিমত interested হয়েছেন কিন্তু ইংরেজি বা বাংলা না জানায় খুব অসুবিধা হয়েছিল। হিন্দিতে কথাবার্ত্তা বলতে হল বলে' আপনার বাবার কিছু অসুবিধা হচ্ছিল। China tripএর কত খরচ হবে জিজ্ঞাসা করায় আপনার বাবা বলেন ৫। ৭ হাজার; Birla নিজে থেকে China tripএর জন্যে ৭০০০৲ দেবেন বলেছেন— নন্দলালবাবু আর ক্ষিতিবাবুকে সঙ্গে নিয়ে যাওয়া হবে— Siam ঘুরে যেতে হবে— দরকার হয় ১০। ১২ হাজার দেবেন অর্থাৎ China tripএর সমস্ত খরচটা পাওয়া যাবে। … অন্যান্য কথাবার্ত্তাও হয়েছে; mainly Hindu Philosophy সম্বন্ধে— Birla জিজ্ঞাসা করলেন কত টাকা হলে চলে? ওঁকে বলা হয়েছে যে Hindu Philosophyর জন্য মাসে ৩০০০৲ হলে আপাতত চলবে। উনি তারপরে জিজ্ঞাসা করলেন যে এখন ৫ বছরের মত যদি এই টাকা পাওয়া যায় তাহলে কাজ আরম্ভ করা যায় কি না ইত্যাদি।
>
> কাল কিম্বা পরশু আবার Birlaর সঙ্গে দেখা করবার জন্য সুধীরবাবু ব্যবস্থা করতে চেষ্টা করছেন, কাল কিংবা পরশু এখনো ঠিক হয় নি কিন্তু এর মধ্যেই। এবারে ক্ষিতিমোহনবাবুর থাকা চাইই। আপনি কালকেই ক্ষিতিবাবুকে কলকাতা পাঠিয়ে দেবেন এবং আমাদের সঙ্গে touchএ থাকতে বলবেন। কাল সন্ধেবেলাই হতে পারে— একটুও দেরি করবেন না। Birla আপাতত বিদ্যালয়ের জন্য ৩০০০৲ দিয়েছেন কাল cheque পাব।[৮৮]

14 Oct-[২৭ আশ্বিন] প্রশান্তচন্দ্র আবার রথীন্দ্রনাথকে লিখলেন : 'আজ দুপুরবেলা সুধীরবাবু খবর দিলেন কাল সোমবার (১৫ই অক্টোবর) সন্ধ্যা ৭টার সময় Birlaদের বাড়ি যাবার engagement ঠিক হয়েছে। অবিলম্বে ক্ষিতিবাবুকে পাঠিয়ে দেবেন।' এই সাক্ষাৎকারে তাঁদের মধ্যে যে ফলপ্রসূ আলোচনা হয়েছিল তা জানা যায় ৫ কার্তিক যুগলকিশোর বিরলার বকলমে [শুধু স্বাক্ষর দেবনাগরীতে] লেখা বাংলা চিঠিতে : 'আপনার চীন, জাপান ও শ্যাম গমন বিষয়ে আপনার সহিৎ [য] আমার যে কথা হইয়াছিল সে সম্বন্ধে আমি পণ্ডিত মদন মোহন মালবীজীর নিকট লিখিয়াছিলাম। আপনার যাওয়ার কথায় তিনি অতিশয় আনন্দ প্রকাশ করিয়াছেন এবং লিখিয়াছেন যে আপনার ন্যায় প্রতিনিধি আমরা আর কোথায় পাইব। ··· তিনি আরও লিখিয়াছেন যে আপনি হিন্দুজাতির বর্ত্তমান অবস্থা ও তাহার উন্নতি সম্বন্ধে সম্প্রতি যে মত প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতে হিন্দু মহাসভা, তাহার নেতাগণ এবং আরও অনেকে সমধিক বল ও উৎসাহ প্রাপ্ত হইয়াছেন— পণ্ডিতজী আশা করেন যে আপনি চীন, জাপান ও শ্যাম যাত্রা করিবার পুর্ব্বে তিনি আপনার সহিৎ [য] সাক্ষাৎ করিয়া এ বিষয়ে কথাবার্ত্তা বলিতে পারিবেন।' রবীন্দ্রনাথ এই চিঠি পেয়েই তার উত্তর দেন [পাওয়া যায়নি], প্রত্যুত্তরে ৭ কার্তিক যুগলকিশোর লেখেন : 'পত্রপ্রাপ্তি মাত্র আপনাকে একটী তার করিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম আপনি কবে কাঠিয়াবাড় রওনা হইবেন, এবং কবে বেনারস ও বোম্বাই পহুঁছিবেন। আপনার উত্তর এখনও পাই নাই,··· আমার ভ্রাতা ঘনশ্যামদাস··· আপনি কবে বেনারসে যাইবেন সংবাদ পাইলে তাহাকে লিখিব। আমার অন্য ভ্রাতা রামেশ্বরদাস··· আপনি কবে বোম্বাই যাইবেন জানাইলে যদি তিনি তখন বোম্বাইয়ে থাকেন তাহাকে আপনার বিশ্বভারতীর জন্য তথাকার হিন্দুসমাজের নিকট হইতে সাহার্য্য [য] দেওয়াইবার জন্য লিখিয়া দিব।'

আলোচনা ও পত্রালাপের এই গতিপ্রকৃতি দেখে বিশ্বভারতীর ধর্মনিরপেক্ষ আদর্শের কথা তুলে অনেকেই ভ্রূকুঞ্চন করতে পারেন, কিন্তু আমাদের মতে তা অর্থহীন। মৃণালকান্তি বসুর সঙ্গে আলোচনায় রবীন্দ্রনাথ হিন্দুমহাসভা ও শুদ্ধি-আন্দোলনের সপক্ষে যা বলেছিলেন বাংলার বাইরে হিন্দুসমাজের মধ্যে তার যথেষ্ট প্রতিক্রিয়া হয়েছিল এই পত্রালাপই তার প্রমাণ— কিন্তু রবীন্দ্রনাথ সেখানে সমদর্শিতার আদর্শ থেকে স্খলিত হননি। মনে রাখা দরকার, সংখ্যালঘুদের সীমাহীন যথেচ্ছাচার নির্বিকার ভাবে সহ্য করার নাম ধর্মনিরপেক্ষতা নয়। রবীন্দ্রনাথের বিশ্বভারতীতে বৌদ্ধ, জৈন, জরথ্রুস্থীয়, খ্রিষ্টীয়, ইসলামী প্রভৃতি বিভিন্ন ধর্মতত্ত্ব আলোচনার ক্ষেত্র প্রশস্ত ছিল, সুতরাং হিন্দুদর্শন আলোচনার জন্য অর্থসাহায্যের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করা নিছক অবাস্তব গোঁড়ামি ছাড়া আর কিছু প্রমাণ করত না!

প্রশান্তচন্দ্র রথীন্দ্রনাথকে লিখেছিলেন, 'আপনার বাবা মঙ্গলবার সকালের গাড়িতে যাবেন।' এই পত্র অনুযায়ী মনে করা যেতে পারে, তিন সপ্তাহ আলিপুরে কাটানোর পরে রবীন্দ্রনাথ ২৯ আশ্বিন [16 Oct] দুর্গাসপ্তমীর দিন সকালের ট্রেনে শান্তিনিকেতনে ফিরে আসেন।

ভাদ্র ও আশ্বিন মাসে রবীন্দ্রনাথের নিম্নলিখিত রচনাগুলি বিভিন্ন সাময়িকপত্রে প্রকাশিত হয় :

প্রবাসী, ভাদ্র ১৩৩০ [২৩।১।৫] :

৫৮৫ 'গান'

‘পূব হাওয়াতে দেয় দোলা’ দ্র গীত ২। ৪৫৯; স্বর ৩০

‘পথিক মেঘের দল জোটে ঐ’ দ্র গীত ২। ৪৫০; স্বর ৩১

শান্তিনিকেতন, ভাদ্র ১৩৩০ [৪।৮] :

১১৯–২১ ‘নববর্ষে মন্দিরের উপদেশ’ দ্র শান্তিনিকেতন ১৪ [প.ব., ১৩৯৮]। ৯৩১–৩২

১২২–২৪ ‘বলাকা’

১২৭–২৯ ‘২৬শে ভাদ্র / মন্দিরের উপদেশ / (সুকুমার রায়ের মৃত্যু উপলক্ষে)’ দ্র ব্যক্তিপ্রসঙ্গ ৩১ [১৪০৭]। ৯৩–৯৭ [‘সুকুমার রায়’]

১৩৪ ‘গান’ [‘অগ্নিশিখা এস এস’] দ্র গীত ২। ৬১৩–১৪; স্বর ৩০

১৩৬ ‘গান’ [‘কদম্বেরি কানন ঘেরি’] দ্র গীত ২। ৪৪৪; স্বর ৩০

গানগুলির স্বরলিপি করেন অনাদিকুমার দস্তিদার [পৃ ১৩৪–৩৫, ১৩৬–৩৭]

উপাসনা, ভাদ্র ১৩৩০ [১৯ বর্ষ] :

‘গান’

‘আমার আঁধার ভাল,— আলোর কাছে’ দ্র গীত ১। ৮৭–৮৮; স্বর ৩

‘কোন ভীরুকে ভয় দেখাবি’ দ্র গীত ৩। ৮৫৭; স্বর ২

প্রাচী, ভাদ্র ১৩৩০ [১।৫] :

‘গান’ [‘আকাশ তলে দলে দলে মেঘ যে ডেকে যায়’] দ্র গীত ২। ৪৪৪; স্বর ৩০

The Modern Review, September 1923 [Vol. XXXIV, No. 3] :

257–74 ‘Gora’ 57–63

280 ‘Sishu Bholanath, or the Infant Lord Forgetful’ (‘O Infant Lord all self-oblivions!’] কবিতাটি ছন্দে অনুবাদ করেন হারীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

শান্তিনিকেতন, আশ্বিন ১৩৩০ [৪।৯] :

১৩৯–৪১ ‘মন্দির’ / ১৯শে ভাদ্র ১৩৩০’

১৪২–৪৪ ‘বলাকা’

১৫০ ‘গান’ [‘আকাশ তলে দলে দলে’] দ্র গীত ২। ৪৪৪; স্বর ৩০

১৫২ ‘গান’ [‘আষাঢ় কোথা হতে আজ’] দ্র গীত ২। ৪৪৪–৪৫; স্বর ৩০

গানগুলির স্বরলিপি অনাদিকুমার দস্তিদারের করা [পৃ ১৫০–৫১, ১৫২–৫৩]

প্রাচী, আশ্বিন ১৩৩০ [১।৬] :

‘রাখী’ [‘তোমার হাতের রাখীখানি’] দ্র গীত ১। ১৪২–৪৩; স্বর ৬০

The Modern Review, October 1923 [Vol. XXXIV, No. 6] :

385–406 ‘Gora’ 64–69

496 ‘A Song’ [‘My days and nights are for thoughts of you, my love’] গানটির তর্জমা রবীন্দ্রনাথ-কৃত।

Visva-Bharati Quarterly, October 1923 [Vol. I, No. 3] :

191–207 ‘The Indo-Iranians’ দ্র *EWRT* 3/ 477–88

248 ‘Judgment’

279–89 ‘Notes and Comments’

‘Judgment’ ক্ষিতীশচন্দ্র সেন কৃত ‘বিচার’ কবিতার অনুবাদ।

বিশ্বভারতীতে পূজাবকাশ শুরু হয় ২৫ আশ্বিন [শুক্র 12 Oct]। সুতরাং রবীন্দ্রনাথ ২৯ আশ্বিন যখন এখানে এলেন, তখন ছাত্রছাত্রীরা অনুপস্থিত, তবে আশ্রমবাসী শিক্ষক ও তাঁদের পরিবারের সদস্যেরা ছিলেন এবং সেই সময়ে তাঁদের সংখ্যা খুব কম নয়। এঁদের কাছেই ‘গত পূজার ছুটিতে বিজয়াদশমীর দিন [২ কার্তিক শুক্র 19 Oct] আশ্রমস্থ সকলকে পূজনীয় গুরুদেব তাঁহার “যক্ষপুরী” নামে নাট্যটি পাঠ করিয়া শুনাইয়াছিলেন।’[৮৯] ‘গত লক্ষ্মীপূর্ণিমা [৭ কার্তিক বুধ 24 Oct] ও তাহার পরদিনও সন্ধ্যায় গানের আসর বসিয়াছিল।’

জাপানে প্রচণ্ড ভূমিকম্পে টোকিয়ো ও য়োকাহামা শহরের বিপুল ক্ষতি হলে বিশ্বভারতী এই বিপর্যয়ে জাপানের পাশে এসে দাঁড়ায়। কার্তিক-সংখ্যা প্রবাসী-তে জানানো হয় : ‘জাপান-সাহায্যে বিশ্বভারতী। ভূমিকম্পে ধ্বংসপ্রাপ্ত জাপানকে সাহায্য করিবার জন্য শান্তিনিকেতনে বিশ্বভারতীর একটি সাহায্য-ভাণ্ডার খোলা হইয়াছে। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই ভাণ্ডারের সম্পাদক হইয়াছেন। ইতিমধ্যেই বিশ্বভারতীর ছাত্র এবং শিক্ষকদের নিকট হইতে চাঁদা তুলিয়া ৭৫০্ টাকা সংগ্রহ করা হইয়াছে। ইঁহারা যে টাকা সংগ্রহ করিবেন তাহা সমস্তই জাপানের রাজদূতের নিকট পাঠাইয়া দিবেন।’ ২৪ মাঘ রবীন্দ্রনাথের ক্যাশবহিতে ‘জাপান দুর্ভিক্ষে এককালীন দান··· ১০০্’-র উল্লেখ পাওয়া যায়।

আলোচ্য পর্বে রবীন্দ্রনাথের দুটি রচনার সন্ধান পাওয়া যায়, যেগুলি কবে কোন্ পরিবেশে লেখা হয় জানার কোনো সূত্র পাওয়া যায়নি। ‘তপোভঙ্গ’ [‘যৌবনবেদনা-রসে উচ্ছল আমার দিনগুলি’]-শীর্ষক বিখ্যাত কবিতাটি ‘কার্তিক ১৩৩০’ কাল-চিহ্নিত— এই প্রথম ছত্রটিকেই শিরোনাম করে ফাল্গুন-সংখ্যা প্রবাসী-তে এটি চার পৃষ্ঠার ক্রোড়পত্র হিসাবে প্রকাশিত হয় [দ্র পূরবী ১৪। ২১–২৬]। অপর রচনা ‘রথযাত্রা’ নাটিকাটি অগ্র-সংখ্যা প্রবাসী-তে [পৃ ২১৬–২৫] মুদ্রিত হয় [দ্র কালের যাত্রা (পরিশিষ্ট) ২২। ১৫৭–৭০]— পাদটীকায় রবীন্দ্রনাথের স্বীকৃতি আছে : ‘আমার স্নেহাস্পদ ছাত্র শ্রীমান প্রমথনাথ বিশির কোনও রচনা হইতে এই নাট্যদৃশ্যের ভাবটি আমার মনে আসিয়াছিল।’ ১০ শ্রাবণ ১৩৩০ [বৃহ 26 Jul 1923] সন্ধ্যায় কলাভবনে বিশ্বভারতী সম্মেলনীর নবম সাধারণ অধিবেশনে সৈয়দ মুজতবা আলির সভাপতিত্বে প্রমথনাথ ‘রথযাত্রা’ নামে স্বরচিত নাটিকাটি পাঠ করেন— রবীন্দ্রনাথ তখন কলকাতায়। শান্তিনিকেতনে ফিরে তিনি কোনো সময়ে এটি পড়েন বা এর অভিনয় দেখে তার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে একই নামে নিজের নাটিকাটি রচনা করেন। 1917-এ শ্রমিক ও কৃষকদের নিয়ে গঠিত বলশেভিক পার্টির নেতৃত্বে প্রবল পরাক্রমশালী জারের পরাজয়ের বৃত্তান্তটি ও তার অন্তর্নিহিত তাৎপর্য রবীন্দ্রনাথকে যে বিশেষভাবে আলোড়িত করেছিল ‘মুক্তধারা’, ‘রক্তকরবী’ ও

'রথযাত্রা' নাটকে এবং সমকালীন কিছু প্রবন্ধ ও চিঠিতে তার আভাস দুর্লক্ষ্য নয়। নিজে মধ্যস্বত্বভোগী জমিদার পরিবারের সন্তান ও প্রজাদের কাছ থেকে সংগৃহীত খাজনা তাঁর জীবনধারণের প্রধান উপায় হলেও উনিশ শতকের শেষ দশক থেকেই য়ুরোপের সমাজতান্ত্রিক চিন্তাবিদদের ভাবনার সঙ্গে তিনি পরিচয় স্থাপন করেছিলেন, 'সাধনা' ও 'বঙ্গদর্শন'-এর অনেক প্রবন্ধ ও কিছু কবিতা তার সাক্ষ্য বহন করে। রুশবিপ্লবের পরে আমরা মাঝেমাঝেই তাঁর রচনায় সে-বিষয়ে তাঁর সচেতনতার পরিচয় পেয়েছি। তাই অধ্যাপক শঙ্খ ঘোষ যখন *The Communist Manifesto* [1848]-র কয়েকটি লাইনের সঙ্গে রক্তকরবী-র দু-একটি সংলাপের সাদৃশ্যের ইঙ্গিত পাশাপাশি তুলে ধরেন [দ্র কবির অভিপ্রায়। ১১২–১৪], তখন মনে প্রশ্ন না জেগে পারে না যে, রবীন্দ্রনাথ কি এই জাতীয় গ্রন্থের সঙ্গেও পরিচিত ছিলেন— প্রকাশের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই তিনি যে Upton Sinclair-এর সমাজতান্ত্রিক উপন্যাস *Brass Check* [1919] পাঠ করেছিলেন সে-খবর তো আমরা ইতিপূর্বেই জানতে পেরেছি। মন্ত্রী যে-বিপ্লবকে মাত্র অল্প কয়েকটি কথায় তুলে ধরেন : 'নিচের তলাটা হঠাৎ উপরের তলা হয়ে ওঠাকেই বলে প্রলয়। ··· যা বরাবর প্রচ্ছন্ন আছে তাই প্রকাশ হবার সময়টাই যুগান্তরের সময়।'— নিশ্চয়ই কারো-কারো দৃষ্টিতে রুশবিপ্লব সেই যুগান্তরের সূত্রপাত করেছিল। তবে বলশেভিক পার্টির জবরদস্তির নীতি রবীন্দ্রনাথ প্রথম থেকেই সমর্থন করেননি, এখানে 'কবি'র সংলাপে সেই সতর্কতাই ধ্বনিত হয়েছে : 'একদিন ভাববে ওরাই রথের কর্তা, তখনই মরবার সময় আসবে। দেখো-না, কালই বলতে শুরু করবে, আমাদেরই হাল লাঙল চরকা তাঁতের জয়। যে বিধাতা মানুষের বুদ্ধিবিদ্যা নিজের হাতে গড়েছেন, অন্তরে বাহিরে অমৃতরস ঢেলে দিয়েছেন, তাঁকে গাল পাড়তে বসবে। তখন এঁরাই হয়ে উঠবেন বলরামের চেলা, হলধরের মাতলামিতে জগৎটা লণ্ডভণ্ড হয়ে যাবে।' বিশ শতকের শেষ দশকে রাশিয়ায় সমাজতন্ত্রের পতন রবীন্দ্রনাথের ভবিষ্যদ্বাণীকে সপ্রমাণ করেছে। অবশিষ্ট কয়েকটি সমাজতান্ত্রিক দেশ দ্রুত তাদের চরিত্র পরিবর্তন করছে। জবরদস্তি করে অল্পবিস্তর দাবী আদায় করা যায়, সাময়িকভাবে কতকগুলি জাতির উপর প্রভুত্ব কায়েম করাও সম্ভব, কিন্তু ইতিহাসের গতি বদলানো যায় না!

তখনকার পরিপ্রেক্ষিতে নাটিকাটির বিষয়বস্তুর গুরুত্ব অনুভব করে রবীন্দ্রনাথ নিজেই অবিলম্বে নাটিকাটি '*The Car of Time*' [দ্র *V.B.Q.*, Jan 1924/ 321–42]নামে ইংরেজিতে অনুবাদ করেন, বেনোয়ার মতো কোনো ব্যক্তির সাহায্য তিনি নিয়েছিলেন কিনা জানা যায়নি।

কার্তিক-সংখ্যা শান্তিনিকেতন-এ জানানো হয়েছিল : 'পূজনীয় গুরুদেবের পূজার ছুটিতে কাটিওয়ার ভ্রমণের কথা ছিল, কিন্তু নানা কারণে এবার তাহা স্থগিত রহিল। পূজার ছুটিতে সম্ভবত তিনি আশ্রমেই থাকিবেন।' কিন্তু অগ্র-সংখ্যাতেই খবর দেওয়া হয় : 'পূজনীয় গুরুদেবের কাটিওয়ার যাত্রা স্থগিত থাকিবে কথা ছিল, কিন্তু তিনি পূজার ছুটির মধ্যে কাটিওয়ার ভ্রমণে বাহির হইয়াছেন। সম্ভবত ৭ই পৌষের উৎসবের পূর্ব্বে তিনি আশ্রমে প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন।' ৯ কার্তিক [শুক্র 26 Oct] কাদম্বিনী দত্তকে বিজয়ার আশীর্বাদ জানিয়ে রবীন্দ্রনাথ লিখলেন : 'আমি দুই মাসের জন্য ভিক্ষাব্রত লইয়া বোম্বাই গুজরাট কাঠিয়াবাড় প্রভৃতি স্থানে ভ্রমণে বাহির হইতেছি।'[৯০] যাত্রার পূর্বে ১০ কার্তিক বিধুশেখর শাস্ত্রীকে লিখলেন :

আমাদের বিশ্বভারতী ক্রমশই য়ুনিবর্সিটির মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিবার উদ্যোগ করিতেছিল। আমি তাহাতে অন্তরের মধ্যে পীড়াবোধ করিতেছিলাম। তাহার এই দেহান্তরপ্রাপ্তির আশঙ্কা দূর করিবার অভিপ্রায়ে আমি তাহার একটি আদর্শ খাড়া করিয়া কর্ম্মপ্রণালী লিপিবদ্ধ করিয়া দিলাম। আশা করি

ইহার মধ্যে আপনার অনভিপ্রেত কিছুই নাই। ইহা অবলম্বন করিলে বিশ্বভারতী ও সেই সঙ্গে আপনারাও মুক্তি পাইবেন। আশা ছিল আপনি ফিরিয়া আসিলে আপনার সঙ্গে পরামর্শ করিয়া কাজ করিব। সহসা ধনীর ঘরে ভিক্ষুকের ডাক পড়িয়াছে— ভিক্ষাঝুলি কাঁধে ঝুলাইয়া অবিলম্বে দৌড় মারিতে হইল। তাই নিজের বুদ্ধি অনুসরণ করিয়াই বিশ্বভারতীর নিয়ম বাঁধিয়া দিলাম। নিয়মগুলি কাগজেই বাঁধা না থাকে, যাহাতে সম্পূর্ণই কাজে খাটে, সে সম্বন্ধে আপনার আনুকূল্য ও সতর্কতা প্রার্থনা করি। কবে ফিরিব জানি না, রিক্তহস্তে ফিরিব না ইহাই সঙ্কল্প।[৯১]

— কিন্তু এই মূল্যবান দলিলটি আমরা দেখতে পাইনি।

রবীন্দ্রনাথ ঠিক কবে শান্তিনিকেতন পরিত্যাগ করে পশ্চিমভারতের উদ্দেশে রওনা হন সে-বিষয়ে কোনো তথ্য জানা নেই। এবারে গৌরগোপাল ঘোষ তাঁর সঙ্গী হন। রবীন্দ্রজীবনী-কার জানিয়েছেন, অ্যান্ডরুজ ও ক্ষিতিমোহন সেনও তাঁর সঙ্গে ছিলেন,[৯২] কিন্তু তথ্যটি সম্পূর্ণ ঠিক নয়। অ্যান্ডরুজ তাঁর সঙ্গে গিয়েছিলেন বোম্বাই থেকে য়ুরোপের জাহাজ ধরার জন্য— ক্ষিতিমোহন এবারে তাঁর সঙ্গী হননি। রবীন্দ্রনাথ প্রথমে বোম্বাই গিয়েছিলেন, কিন্তু তাঁর সেখানকার কর্মসূচি জানা যায়নি। কয়েকদিন পরে সম্ভবত ২০ কার্তিক [6 Nov] তিনি ধ্রাঙ্গধ্রা থেকে রথীন্দ্রনাথকে লেখেন : 'গোরাকে বোম্বাইয়ে চেষ্টা করবার জন্যে রেখে এলুম। সেখানে সে technicalএর জন্যে কিছু করতে পারবে বলে আশা হয়। লেগে থাকতে পারলে তবে চেষ্টা সফল হতে পারে, একবার এসে ঘুরে গেলে কিছুই হয় না। Morris বলেচে এবার বোম্বাইয়ে গিয়ে মাসখানেক রীতিমত চেষ্টা করলেই টেকনিকালের দরকারমত টাকা ও জিনিষ সে নিশ্চয় জোগাড় করতে পারবে। এণ্ড্রুজকে লিখে দিয়েচি টাটাকে এই জন্যে বিশেষ করে ধরতে।'[৯৩] বোম্বাইয়ের পরে তাঁর অবস্থানের প্রথম হদিশ পাওয়া যায় আমেদাবাদের 'রিট্রিট' বাড়ি থেকে 4 Nov [রবি ১৮ কার্তিক] 'দেশিক' এল্‌ম্‌হার্স্টকে লেখা একটি চিঠিতে, তিনি তখন চিন, আমেরিকা ও ইংল্যান্ড ঘুরে বোম্বাই বন্দরে পৌঁছনোর মুখে : '...I am not very far from Bombay, engaged in a wild goose chase of money. Extricate yourself from your engagements or go through them quickly and come to me. Do not let me wait to see you after your long absence till others have had their chance. You know how proud I am by nature.... Kathiawar is one of the most interesting corners of India— the land of a magnificent breed of cattle and a people who still love colour and music and do not allow their womenfolk to wear khaddar.'[৯৪] এর পরে পরিশিষ্টে তিনি স্বভাবসুলভ রসিকতা করে লিখেছেন, তাঁর বেনারসের পূর্বনির্ধারিত কর্মসূচি অর্থাৎ রাণুর সঙ্গে সাক্ষাৎকার নিয়ে ভাবার কিছু নেই, তবে গ্রেচেনকে তাঁর এই আহ্বানের কথা না-জানানোই ভালো।

গৌরগোপাল ঘোষ ভ্রমণপথে রথীন্দ্রনাথকে যে-চিঠিগুলি লিখেছিলেন সেগুলি বিভিন্ন তথ্যে পূর্ণ— আমরা তার থেকে কিছু-কিছু উদ্ধৃতি দেব। 9 Nov [শুক্র ২৩ কার্তিক] তিনি লিখেছেন : 'আজ সকালে Elmhirstকে জাহাজ থেকে আনিতে গিয়াছিলাম। কাল··· গুরুদেবের সঙ্গে দেখা করিবার জন্য Rajkot রওনা করে দিচ্ছি।'[৯৫]

7 Nov [বুধ ২১ কার্তিক] রবীন্দ্রনাথ দেশীয় রাজ্য ধ্রাঙ্গধ্রা [Dhrangadhra] থেকে কৌতুক করে রাণুকে একটি চিঠি লেখেন, তাতে তাঁর ভ্রমণবৃত্তান্তের একটি রূপরেখা পাওয়া যায়। তিনি লিখেছেন :

······ধ্রাঙ্গধ্রা কোথায় আমাকে বল দেখি। আধুনিক গানের মধ্যে যাকে "আমার দেশ" বলে সুর তান লয়ে গৌরব করে থাকি এ জায়গাটি তারই মধ্যে, কিন্তু রামকেলী কিম্বা ভৈরবী সুরে যদি এই শব্দটাকে বসাবার ভার আধুনিক কবির উপর পড়ে তাহলে নিশ্চয় তার কলম ভোঁতা হবে, তার

তানপুরার তার ছিঁড়ে যাবে। ··· যা হোক্ এই রকম সব দুর্ণামধারী [য] জায়গায় কবিকে ঘুরে বেড়াতে হচ্চে। হয়রান হয়ে গেচি— যাকে তোমাদের হিন্দীতে বলে, থক্ গয়া। ধ্রাঙ্গধ্রা থেকে আজ রাত্তিরে যাব "মোরবি", শব্দটা তেমন শ্রুতিকটু নয় বটে কিন্তু ওর অর্থটা একটুও ভাল নয়। "মোরবি" যারা নাম রেখেছিল তারা না হয় "বাঁচবি" নাম রাখত তাতে দোষ কি ছিল? ···যে জংসন দিয়ে মোরবিতে যেতে হয় তার নাম বাধা-বান (Wadhawan)। পথিকদের এরকম করে আগে থাকতে ভয় দেখাবার কি দরকার ছিল? নামের মধ্যেও ত একটা ভদ্রতা থাকা উচিত— নামটা "বাধাহীন" হয়ে কাজে না হয় বাধাবান হ'ত?···

যে ঘরে বসে চিঠি লিখ্‌চি সে ঘরের ছবি মনে আন্‌তে পারবেনা। রাজার অতিথিশালা, মস্ত ইমারত, কার্পেটমণ্ডিত পর্দ্দাবগুণ্ঠিত উন্নত ভিত্তিমান ঘর, গোলাপচিত্রিত ছিটের কাপড়ে ঢাকা মোটা মোটা আসবাবগুলো আমার প্রতি কৃপাকটাক্ষপাত করচে। ··· মরিস্ আমার সঙ্গীরূপে এখানে এসেচে··· তাকে দূরে অন্য বাড়িতে বাসা দেওয়া হয়েচে। এই বহু কক্ষবিচিত্র প্রাসাদ সৌধে আমি একা; সঙ্গীর মধ্যে বনমালী নামধারী আমার উৎকলবাসী সেবক। ··· কালযাপনের সাহায্যকল্পে মাঝে মাঝে এরা আমাকে উপলবন্ধুর দুর্গমপথে এখানকার মরুপ্রান্তরের মাঝখানে ঘুরিয়ে আন্‌চে। গতকল্য মধ্যদিনের অসহ্য উত্তাপে আটঘন্টাকাল বিচলিত দেহে অবিচলিত ধৈর্য্যে এই রকম রথযাত্রা করে এসেচি···[৯৬]

এর আগে 2 Apr 1923 [১৯ চৈত্র ১৩২৯] রবীন্দ্রনাথ ধ্রাঙ্গধ্রা এসেছিলেন, সেবার মহারাজ ঘনশ্যাম সিংজি বাহাদুরের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়নি। এবারে মহারাজ বিশ্বভারতীর উন্নতিকল্পে ২৫০০০্ টাকা দান করেন।

সেইখান থেকেই সম্ভবত ২০ কার্তিক [মঙ্গল 6 Nov] রথীন্দ্রনাথকে এই সংবাদ জানিয়েছেন : 'ধরাঙ্গধরায় কাল এসেচি। এখানকার রাজার সঙ্গে দেখা হয়েচে। লোকটি ভাল বলে কাল তাঁকে বেশ একটু চেপে ধরতে পেরেছিলুম। আমি ৫০,০০০ হাজারের জন্যে দাবী করেছিলুম শেষকালে ২৫ হাজারে রফা হয়েচে— পাঁচহাজার করে' পাঁচ বৎসরে শোধ হবে। এই প্রথম কাঠিয়াবাড়ে এবার চেষ্টা আরম্ভ হল, প্রথমেই এই টাকাটা পাওয়ায় বোধহয় অন্য সকলের কাছ থেকে বেশি পাবার সম্ভাবনা হল। কিছু কিছু জিনিষপত্রও পাওয়া যাবে — পাঠিয়ে দেব কিন্তু হারিয়ে না যায় যেন।[৯৭]

বরোদা রাষ্ট্রীয় পুথিশালার প্রাক্তন কর্মী অনন্ত শাস্ত্রী কিছুকাল ধরে বিশ্বভারতীর পুথি-সংগ্রাহক হিসাবে কাজ করছিলেন। এই সময়ে তিনি গুজরাট অঞ্চলে সংগ্রহের কাজে নিযুক্ত। রবীন্দ্রনাথ এঁর সম্পর্কে রথীন্দ্রনাথকে লিখেছেন : 'শাস্ত্রীর প্রধান লক্ষ্য পুঁথিসংগ্রহে, সেই কাজে তিনি লেগে গেছেন, কিন্তু টাকা সংগ্রহ তাঁর দ্বারা কতটা হবে ঠিক জানিনে। বোধ হচ্চে তিনি লাইব্রেরিকে সম্পূর্ণ করবার জন্যে কিছু টাকা তুলতেও পারেন। আমাদের ওখানে ভারতবর্ষের পুরাতত্ত্ব নৃতত্ত্ব প্রভৃতি বই খুব কম আছে— যদি লাইব্রেরির নামে হাজার দশেক টাকা ওঠে তাহলে research করবার উপযুক্ত বই সংগ্রহ হতে পারবে।'

8 Nov [বৃহ ২২ কার্তিক] রবীন্দ্রনাথ পার্শ্ববর্তী দেশীয় রাজ্য মর্ভি [Morvi] গমন করেন। মর্ভির ঠাকুর সাহেব লাখাধারাজি ওয়াদ্যি বাহাদুর দান করেন দশ হাজার টাকা। এই কথাই রবীন্দ্রনাথ 'Morvi State' থেকে একটি তারিখহীন চিঠিতে লিখেছেন রথীন্দ্রনাথকে : 'মোর্ব্বি দশহাজার দিয়েচেন। কাল যাচ্চি গোণ্ডল।' এই চিঠিতেও অনন্ত শাস্ত্রীর কথা আছে : 'শাস্ত্রীজি লাইব্রেরির Endowmentএর জন্যে এখানে সেখানে খুচরো খুচরো টাকা তুলতে লেগেচেন। আমার বিশ্বাস, তিনি কিছুকাল এই রকম কাজ করলে লাইব্রেরির বিস্তর ভার লাঘব করতে পারবেন। কিন্তু আমাদের ওখানে পুঁথির অনাদর নিয়ে তাঁর মন বড় ক্ষুণ্ণ আছে। অনেক পুঁথি বর্ষার সময়ে ষ্টেষণে পড়ে ভিজে damaged হয়েচে— demurrage দিয়ে তাদের খালাস করে আনতে হয়েচে — কোনো কোনো পুঁথির উপরকার নূতন ভালো কাপড়ের মোড়ক চুরি গেচে, কেউ খেয়াল করে নি— ইত্যাদি।'[৯৮]

গোণ্ডলের কথা জানা নেই, এর পরে রবীন্দ্রনাথকে দেখা যায় রাজকোটে। 9 Nov গৌরগোপাল ঘোষ রথীন্দ্রনাথকে লিখেছিলেন যে, তিনি এল্‌ম্‌হার্স্টকে বোম্বাইতে জাহাজ থেকে নামিয়ে 'কাল গুরুদেবের সঙ্গে দেখা করিবার জন্য Rajkot রওনা করে দিচ্চি' অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথ অন্তত 10 Nov [শনি ২৪ কার্তিক] রাজকোটে পৌঁছে গিয়েছিলেন। সেখান থেকে তিনি 11 Nov দিলীপকুমার রায়কে লেখেন : 'ঘুরে ঘুরে ক্লান্ত হয়ে পড়েছি, সম্প্রতি আছি কাঠিয়াবাদে রাজকোটে, এখান থেকে আরো নানাস্থানে ঘুরপাক খেতে হবে। হয় ত ডিসেম্বরের আরম্ভে একবার আমেদাবাদ যাব, তখন যদি তুমি সেখানে যাও দেখা হবে।'[৯৯] এখান থেকেই 13 Nov রাণুকে লিখলেন : 'তোমাকে একটা সুখবর দেবার জন্যে এই চিঠি লিখ্‌তে বসেচি। এল্‌ম্‌হর্স্ট এসে পৌঁচেচে। সে বোম্বাই থেকেই কোনো এক জায়গায় দৌড় দেবার চেষ্টায় ছিল আমি তাকে ডাকিয়ে এনেচি। সে এখন আমার সঙ্গে ঘুরচে।'[১০০] এই কৌতুকাবহ চিঠির উদ্দেশ্য আর-কিছুই নয়, রাণু ও এল্‌ম্‌হার্স্টের মধ্যে যে কল্পিত প্রণয়সম্পর্কের রসিকতা তিনি অনেকদিন ধরে করে আসছিলেন তাকেই উস্‌কে দেওয়া। এই পত্রেই তিনি রসিকতাটিকে প্রসারিত করেছেন রাণুর অন্যান্য প্রেমিকদের ক্ষেত্রে : 'তোমার সাধকদের মধ্যে ইদানীং কার কি দশা ঘটেচে তার হাল খবর কিছুকাল পাইনি, আরো কিছুকাল পাব না। কিন্তু আন্দাজ করতে পারচি। পুরাণে লিখচে গৌরী ভানুর দিকে তাকিয়ে তপস্যার উগ্রতা বাড়িয়ে তুলে অবশেষে সকলপ্রকার ভোগসামগ্রীর সঙ্গে গাছের পত্র পর্য্যন্ত যখন ত্যাগ করলেন তখন তিনি বরলাভ করতে পেরেছিলেন— তোমার তপস্যায় আমি ত দেখচি পত্রসংখ্যা বাড়চে বই কমচেনা— তাতে তোমার বরলাভের কোনো বাধা ঘটবেনা, এও স্পষ্টই বুঝতে পারা যাচ্চে। অপর্ণার এই তপঃকাহিনী লেখবার জন্যে পুরাকালে এক কবি জন্মগ্রহণ করেছিলেন— বর্ত্তমান কালেও এক কবিকে দেখতে পাওয়া যাচ্চে, কিন্তু এখনো তিনি অবাক্ হয়ে আছেন; হয়ত কোনদিন ছন্দে বন্ধে তাঁরও বাক্‌স্ফূর্তি হতে পারে।' আমরা আগেই বলেছি, এইসব রসিকতা রাণুর জীবনে বিপর্যয় ঘনিয়ে তুলেছিল।

২৮ কার্তিক আনন্দবাজার পত্রিকা প্রকাশ করে : 'বহু সামন্তরাজের নিমন্ত্রণে, কবি রবীন্দ্রনাথ আপাততঃ কাথিয়াবারে ভ্রমণ করিতেছেন। তিনি ১২ই নবেম্বর, রাজকোটের দরবার গৃহে বিশ্বভারতীর আদর্শ সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন। সভায় বহুলোক স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া অর্থ সাহায্য করিয়াছেন। বিশ্বভারতীর কলা বিদ্যালয়ের জন্য অর্থ সংগ্রহ করাই কবির প্রধান উদ্দেশ্য।'[১০১]

এল্‌ম্‌হার্স্ট এসে রাজকোটে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে মিলিত হন। এই যাত্রায় তিনি বিভিন্ন স্থান থেকে ডরোথিকে অনেকগুলি চিঠি লিখেছেন, কিন্তু তাতে ভ্রমণবৃত্তান্ত বা রবীন্দ্রনাথের কার্যাবলির বিবরণ বিশেষ কিছু পাওয়া যায় না।

রাজকোটের পরে লিমডি যাওয়ার পথে রবীন্দ্রনাথ বাধাবান জংশন স্টেশনে এলে সেখানকার অসহযোগীরা তাঁকে একটি ভাষণ দিতে অনুরোধ করলে তিনি তীব্রভাবে তাঁদের তত্ত্বকে আক্রমণ করে বলেন, আত্মনিপীড়ন, ত্যাগের উদ্দেশ্যেই ত্যাগ প্রভৃতি যে ব্রতগুলি তাঁদের সবচেয়ে প্রিয়, সেগুলি ভারতীয় গ্রীষ্মের শুষ্কতার প্রতীক হিসেবে মূল্যবান হলেও তিনি যেহেতু কবি তাই বসন্তের অগ্রদূত রূপেই তিনি আবির্ভূত হয়েছেন— বৈমাতৃক ভাষা হলেও অবাঙালির কাছে তাঁর পক্ষে ইংরেজিতেই বক্তব্য উপস্থাপন করা

সহজতর। অর্থাৎ গান্ধীজির প্রচারিত আদর্শগুলির তিনি বিরোধিতা করলেন তাঁরই নিজের প্রদেশে।[১০২] অতঃপর 14 Nov [বুধ ২৮ কার্তিক] তিনি সদলবলে লিম্‌ডিতে এসে উপস্থিত হন।

গৌরগোপাল ঘোষ 17 Nov [শনি ১ অগ্র] লিম্‌ডি থেকে রথীন্দ্রনাথকে লেখেন :

আমরা Limdiতে দু'দিন হল আছি। ··· কাল [৩০ কার্তিক] সকালে Guest Houseএ মহারাজ একজন Jain Priestকে লইয়া আসিয়াছিলেন। গুরুদেব সেই Jain Priestকে তাঁর ideal এবং শান্তিনিকেতনে কিরূপ কাজ হইতেছে তাহা বুঝাইতেছিলেন। মহারাজ নিজে interpreterএর কাজ করিতেছিলেন। ক্রমশ Ramgarএর কথা উঠে এবং গুরুদেব বলেন যে সেখানে পাহাড়ের উপরে তাঁর ২। ৪ acre জমি এবং একটী বড় Bunglowর দেওয়াল আছে— অর্থের জন্য সেটা complete করিতে পারিতেছেন না। ··· মহারাজ একটু ভাবিয়াই বলেন 'আচ্ছা আমার পিতার নামে যদি গৃহটী স্থাপন করেন তবে আমি ১৫ হাজার টাকা দিতে পারি।'···

কাল [৩০ কার্তিক শুক্র 16 Nov] সন্ধ্যার সময় এখানকার Town Hallএ গুরুদেব কিছু বলেন। মহারাজ preside করেন। লোক অনেক হয়েছিল কিন্তু তাদের মধ্যে খুব কম লোকই ইংরেজি বুঝে···

Elmhirst আমাদের সঙ্গেই আছে। ··· [গুরুদেব] নূতন নাটকটা rewrite করচেন

উল্লেখ্য, লিমডির মহারাজার দেওয়া এই পনেরো হাজার টাকার তহবিল মহারাজের পিতার নামে নয়, 'Limdi Sanatorium Fund' বা 'Limdi Kothi Fund' নামে আখ্যাত হয়েছিল।

আর উল্লিখিত 'নূতন নাটকটা' হল 'নন্দিনী' বা 'রক্তকরবী', যার সংশোধিত পাণ্ডুলিপি পুনঃসংস্কারের উদ্দেশ্যে এই ক্লান্তিকর ভ্রমণের মধ্যেও রবীন্দ্রনাথ সঙ্গে এনেছিলেন এবং অবসর পেলেই তার সংস্কারকার্যে ব্রতী হতেন। আমাদের অনুমান, রবীন্দ্রনাথ প্রশান্তচন্দ্রের আলিপুরের বাসস্থানে থাকার সময়ে সুধেন্দুরঞ্জন [হোম] রায় যে প্রতিলিপিটি [৬ষ্ঠ খসড়া : Ms. 149 (ii)] প্রস্তুত করেছিলেন, তাতে যদিও লেখা আছে 'End of 1923 or beginning of 1924', সেটি কিছুদিন পূর্বে রবীন্দ্রনাথ যখন দীর্ঘ তিন সপ্তাহ সেখানে ছিলেন সেই সময়েই তৈরি হয়েছিল এবং তিনি এটিকে সঙ্গে করে গুজরাট ভ্রমণে এসেছিলেন। মূল খসড়াটি বা ড প্রণয়কুমার কুণ্ডু-সম্পাদিত 'পাঠান্তর-সংবলিত' রক্তকরবী-র সংস্করণে পাঠপরিবর্তনের ক্রমটি পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে, কিশোর চরিত্রের সংযোজন ও সংলাপের ভাষাসংস্কার ছাড়া নাটকটি তখন প্রায় সম্পূর্ণ হয়ে এসেছে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তাঁর স্বাভাবিক কৌতুকপ্রিয়তাবশত এল্‌ম্‌হার্স্টকে বললেন, নাটকটি রচিত হয়েছে রাণু, তাঁর ও লেনার্ডের ত্রিকোণ প্রেম অবলম্বনে— রাণু নন্দিনী, তিনি রাজা ও লেনার্ড রঞ্জন; লিম্‌ডিতে থাকার সময়ে তাঁকে বললেন, তিনি নাটকটির শেষ দৃশ্যে পৌঁছে গেছেন— কিন্তু চরিত্রগুলির সঙ্গে এতদিন কাটিয়ে তাদের প্রতি তাঁর এমন মমতা জন্মে গেছে যে এদের সঙ্গ ত্যাগ করা তাঁর পক্ষে বেদনাদায়ক, তাই তিনি সমাপ্তির খড়্গটি একদিনের জন্য তুলে রাখছেন : 'Day by day, as we travelled, he would spend his spare hours reading, or dreaming about the new play he was then busy writing. When we arrived at the State of Limbidi [sic] he began to complain sadly that he had come to the last scene of the last act of his latest play and that having lived so long on such intimate terms with the characters of his invention, he could not bear to bring the play to a sudden end or say to these people his final farewell, "I have delayed the guillotine for one more day," he would say, "but fall it must."[১০৩]

তিনি লিখেছেন, এক বৎসর পরে অর্থাৎ আর্জেন্টিনায় থাকার সময়ে রবীন্দ্রনাথ নাটকটি সম্পর্কে তাঁকে বলেন, 'it was originally the human relationship between himself and myself and W. [Ranu]

that had given him the embryonic idea on which his imagination had set to work.' এই প্রসঙ্গে তিনি নূতন বৌঠান কাদম্বরী দেবীর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের 'remarkable,... creative and memorable friendship'-এর ইতিহাসও বিবৃত করেন। তাঁর পত্নীর অকালমৃত্যুর পরে তিনি দীর্ঘকাল কোনো প্রেরণাদায়িনী নারীর সান্নিধ্যে আসেননি, যতদিন-না রাণু তাঁর বাবার সঙ্গে শান্তিনিকেতনে কিছুদিনের জন্য থাকতে এলেন। 'This girl so vividly brought back to Tagore the memory of his boyhood companion that he begged the father to leave her behind as a guest in the poet's house. The relationship that developed was deep and lasting.' কিছু তথ্যবিভ্রান্তি সত্ত্বেও মন্তব্যটি বিবেচনাযোগ্য।

আনন্দবাজার পত্রিকা 'পোরবন্দর, ২২শে নভেম্বর' তারিখ দিয়ে সংবাদ পরিবেশন করে : 'গতকল্য [৫ অগ্র বুধ 21 Nov] রবীন্দ্রনাথ পোরবন্দর ষ্টেশনে পৌঁছিলে তত্রস্থ মহারাণা সাহেব [নটবর সিংজি ভবসিংজি] তাঁহাকে সম্বর্দ্ধনা করেন। মহারাণা সাহেব বিশ্বভারতীর শিল্পকলা-বিভাগের জন্য যে দশ সহস্র টাকা দিয়াছিলেন, যাহা বর্দ্ধিত করিয়া ২৫,০০০৲ টাকা দিয়াছেন।'[১০৪] গৌরগোপাল ঘোষ রথীন্দ্রনাথকে লেখেন : 'মহারাজার বয়স খুব অল্প কিন্তু ভারি চমৎকার লোক। ২২শে নভেম্বর এখানকার Club Houseএ গুরুদেব খুব কম কিন্তু selected audienceএর কাছে বিশ্বভারতীর ideal সম্বন্ধে বলেন। সকলেরই খুব ভাল লাগে এবং audienceএর মধ্য থেকে একজন দাঁড়িয়ে উঠে বলে যে প্রজাদের তরফ থেকে তারা বিশ্বভারতীর জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিবে।' এই পত্রেই তিনি জানান : 'নূতন নাটকটা rewrite করচেন— শীঘ্র শেষ হয়ে যাবে।'

পোরবন্দরের মহারাণার আতিথ্যে রবীন্দ্রনাথ এখানে কয়েকদিন অবস্থান করেন। এখান থেকে তিনি রথীন্দ্রনাথকে লিখলেন :

> মোটের উপর কাঠিয়াবাড়ে আমাদের আসর জমেচে। দুই তিনটি জায়গা ছাড়া আর সর্ব্বত্রই আশার অতীত ফল লাভ করা গেচে। এখানকার মহারাজা চমৎকার লোক। আমি না চাইতেই তিনি আমাদের পঁচিশ হাজার টাকা দিতে চাইলেন। তা ছাড়া ভবিষ্যতেও সুবৎসরে তাঁর কাছ থেকে সাহায্য পাবার আশা আছে। এল্ম্‌হর্স্ট্‌ আমার সঙ্গে থাকাতে ভারি সুবিধে হয়েচে। আরো দিন দশেক ওকে আমার সঙ্গে ঘুরিয়ে তার পরে সুরুলে পাঠিয়ে দেব। হায়দ্রাবাদের সেই collectionটা ও থাকলে হয়ত জোগাড় করা সহজ হবে। তা ছাড়া কৃষি সম্বন্ধে এখানে ও বক্তৃতা করচে তাতে খুব উপকার হচ্চে। লিমডির কুমার ত নিজেই একটা farm খুলবেন, তার সঙ্গে আমাদের সুরুলের যোগ থাকতে পারবে। এখানেও হয়ত কিছু হতে পারবে। নন্দলালদেরও এ দিকে হয়ত একটা opening হবে। আমাদের খুব দরকার হচ্চে ওখানে একটা furnitureএর কারখানা খোলা। এদিককার কোনো রাজা যদি একবার আমাদের design অনুসারে ঘর সাজায় তাহলে ক্রমে ভারতবর্ষের ঘরে ঘরে আমাদের কলাভবনের আদর্শ ছড়িয়ে যাবে।[১০৫]

বিধুশেখর শাস্ত্রীকে পোরবন্দর থেকে লেখা একটি তারিখহীন চিঠিকে আমরা ভ্রমক্রমে চৈত্র ১৩২৯-এ লিখিত বলে সিদ্ধান্ত করেছিলাম [দ্র রবিজীবনী ৮। ২৬৬], কিন্তু সেটি আসলে এই সময়ে লিখিত। রথীন্দ্রনাথকে লেখা আলোচ্য পত্রে তার উল্লেখ করে রবীন্দ্রনাথ লিখলেন : 'শাস্ত্রীমশায়কে যে চিঠি লিখ্‌লুম সেটা পড়ে দেখিস্‌। তাতে বিশ্বভারতীর অধ্যয়ন অধ্যাপনার কথা বিস্তারিত করে লিখেচি।' কাঠিয়াবাড়ে ভিক্ষাবৃত্তির সাফল্যে রবীন্দ্রনাথ তখন খুবই খুশি, তাই বিশ্বভারতীর বিচিত্র বিস্তার নিয়ে তাঁর কল্পনা পাখা মেলেছে। আরও অর্থসংগ্রহের কথাও তিনি ভেবেছেন। যুগলকিশোর বিড়লা তাঁকে লিখেছিলেন, তিনি কবে বোম্বাই যাবেন জানতে পারলে তিনি তাঁর ভ্রাতা রামেশ্বরদাসকে লিখবেন। সেই কথা স্মরণ করে রবীন্দ্রনাথ পুত্রকে লিখলেন : 'গোয়ালিয়র ইন্দোর প্রভৃতি রাজাদের সঙ্গে হয়ত সাক্ষাৎ হবার সুযোগ এখান থেকে হতেও

পারে। তাহলে বোম্বাইয়ে বিরলা প্রভৃতির সঙ্গে কাজ শেষ করে তারপরে ওদের সঙ্গে দেখা করার চেষ্টা করতে হবে। সব কাজ সেরে ৭ই পৌষের হয়ত দুই একদিন আগে আশ্রমে পৌঁছতে পারব। ··· এখানকার রাজাদের টাকা দেবার কথা রাষ্ট্র হয়ে গেচে বলেই অন্য রাজাদের কাছ থেকে টাকা পাবার পথ সুগম হবার সম্ভাবনা। ··· ওদিকে পিঠাপুরম্, বিজয়নগরমকে চেষ্টা দেখ্‌তে হবে। যদি সম্ভব হয় তবে ৭ই পৌষ সেরেই সেইদিকে যাবার চেষ্টা করতে হবে।'

এর মধ্যে নবনগরের জামসাহেবের আমন্ত্রণে রবীন্দ্রনাথ ১১ অগ্র [মঙ্গল 27 Nov] রাত্রে পোরবন্দর ছেড়ে নবনগর রওনা হন। এইদিন রথীন্দ্রনাথকে লিখলেন : 'টাকার দিক থেকে তাঁর কাছ থেকে কতটা সাহায্য পাব জানিনে, কিন্তু রাজাদের উপর তাঁর বিশেষ প্রভাব আছে— তিনি যদি আমাদের পক্ষ নেন তাহলে অন্যদের কাছ থেকে পাবার পথ হবে।' কলাভবন সম্পর্কে তাঁর ভাবনার প্রকাশ আছে এই চিঠিতে : 'কলাভবনের বাড়ি তৈরিতে খুব বেশি খরচ করা ঠিক হবেনা। এই fundএর যতটা স্থায়ী করা সম্ভব তারই চেষ্টা করা উচিত। কলাভবনে এখন যে মাসিক খরচটা হয় তার একটা পাকা সংস্থান হলে জিনিষটা চিরন্তন হয়ে থাকবে। বিশ্বভারতীর অন্য সব গেলেও ওটা মরবে না। বিশ্বভারতীর প্রত্যেক বিভাগকেই এইরকম স্বতন্ত্রভাবে স্থায়ী করে তোলবার চেষ্টা করতে হবে। তাহলে যার প্রাণ বেশি স্বাভাবিক নিয়মে সে আপনিই টিকে যাবে।'[১০৬]

জামনগরে গিয়ে সম্ভবত পরের দিন ১২ অগ্র [28 Nov] 'লাল বাংলো' থেকে রাণুকে লিখলেন : 'এখনো ঘুরচি। "রাজদ্বারে";— যে রকম ক্লান্তি তাতে "শ্মশানে চ" দূর বোধ হয় না। এখানে আর দুই একটা জায়গা আছে তার পরে সিন্ধু, তার পরে বোম্বাই, তার পরে শান্তিনিকেতনে। ৭ই পৌষের কিছু আগেই হয়ত পৌঁছব। তার কিছুদিন পরেই চীন যাত্রার উদ্যোগ করতে হবে।'[১০৭]

এবারে রবীন্দ্রনাথের কাঠিয়াবাড় সফর আর্থিক দিক দিয়ে আশাতীত সাফল্য লাভ করেছিল। পৌষ-সংখ্যা প্রবাসী-তে 'দেশবিদেশের কথা'য় 'রবীন্দ্রনাথের সফর' প্রসঙ্গে লেখা হয়েছে : "ধ্রাঙ্গদ্বার মহারাজা ২৫,০০০; পোরবন্দরের মহারাজা ২০,০০০; মার্ভির ঠাকুর সাহেব ১০,০০০ দান করিয়াছেন। ··· জামসাহেব ঘোষণা করিয়াছেন যে তিনি বিশ্বভারতী ভাণ্ডারে ৫০,০০০ টাকা দান করিবেন। এ পর্যন্ত বিশ্বভারতী ভাণ্ডারে ১৩৫,০০০ টাকা উঠিয়াছে।'[১০৮]

এর পরে রবীন্দ্রনাথ সম্ভবত 30 Nov [শুক্র ১৪ অগ্র] ভাবনগরে আসেন, এইদিন এখান থেকে ডরোথিকে লেখা এল্‌ম্‌হার্স্টের একটি চিঠি পাওয়া যায়।

The Bombay Chronicle [11 Dec] সংবাদ দিয়েছে, 2 Dec [রবি ১৬ অগ্র] সকাল ৯টায় Samaldas College-এর অধ্যক্ষের আমন্ত্রণে রবীন্দ্রনাথ 'Forester's Hermitage' [?The Message of the Forest] পাঠ করেন। সনাতন ধর্ম স্কুল পরিদর্শন করে তিনি যথাসময়ে দেশীয় প্রথায় সজ্জিত কলেজ হলে উপস্থিত হন। মন্ত্রমুগ্ধ শ্রোতাদের সামনে তিনি প্রায় আধঘন্টা ধরে তাঁর রচনা থেকে পাঠ করেন।

অতঃপর দেওয়ান স্যার প্রভাশঙ্কর পাট্টানি একটি সংক্ষিপ্ত ভাষণে রবীন্দ্রনাথকে ধন্যবাদ জানিয়ে রাজ্যের তরফে বিশ্বভারতীকে ১৫০০০ টাকা দানের কথা ঘোষণা করেন। অমাত্য ও জনসাধারণের পক্ষ থেকে আরও দানের প্রতিশ্রুতি দিয়ে একটি ছোটো কমিটি গঠিত হয়। 'Dr. Tagore made a nice little speech in the

end in which he expressed, in a poet's language, his love for Kathiawar, and a desire to come here over again with more leisure and no mission of collection.'

ভাবনগর থেকে রবীন্দ্রনাথ বোম্বাইতে কবে আসেন তা নিয়ে একটু বিভ্রান্তি দেখা দিয়েছে। 30 Nov [শুক্র ১৪ অগ্র] গৌরগোপাল ঘোষের 'C/o Sir Jehangir Petit/ Peddar Road/ Bombay' ঠিকানা থেকে রথীন্দ্রনাথকে লেখা একটি চিঠি পাওয়া যায় : 'আজ সকালে এখানে নিরাপদে এসে পৌঁচিয়েছি। গুরুদেবের শরীর শেষদিন গাড়িতে একটু খারাপ হয় কিন্তু এখানে এসে স্নান করার পর বেশ ভাল দেখাচ্চে। ··· একজন Italian Professor (Ph.D.) কাল ১০টার সময় গুরুদেবের সঙ্গে দেখা করিতে আসিবেন।' মনে হয়, তারিখটিতে কিছু ভুল আছে।

11 Dec-এর বোম্বে ক্রনিকাল-এর সংবাদে প্রকাশ : 9 Dec [রবি ২৩ অগ্র] সকালে বোম্বাইয়ের সান্তা ক্রুজে কানারা সারস্বত কলোনি কর্তৃক রবীন্দ্রনাথকে একটি মানপত্র ও বিশ্বভারতীর উদ্দেশে আর্থিক সাহায্য ['purse'] প্রদত্ত হয়। স্থানীয় সারস্বত ক্লাবের সভাপতি জি. পাণ্ডুরঙ রাও অভিনন্দন পত্রটি পাঠ করে একটি সুন্দর রৌপ্যপাত্রে সেটি রবীন্দ্রনাথের হাতে তুলে দেন। প্রত্যুত্তরে তিনি তাঁদের ধন্যবাদ দিয়ে বলেন, সহানুভূতি ও প্রীতির বন্ধনে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলকে একত্রিত করার যে কাজ তিনি শুরু করেছেন তার অনুমোদন হিসেবে তিনি এই সংবর্ধনাকে গ্রহণ করছেন। 'Speaking about India's ideals and civilisation he said that for centuries India did not reveal herself.... He then dwelt on the positive and negative side of India's poverty and said that they must not dwell too much only upon the negative side of poverty. They had a great inheritance of wealth from their ancestors as well as its responsibilities. He appealed to them never to forget the great ideal of ancient India, namely hospitality. Modern India had made no provision for her guests.' ভাষণটি 'The Guest House of India' নামে বিশ্বভারতী কোয়ার্টার্লি-র Apr 1924 [pp.95–98]-সংখ্যায় মুদ্রিত হয়।

রবীন্দ্রনাথ সম্ভবত বরোদাতেও গিয়েছিলেন। 'বোধ হচ্চে ১০ই ডিসেম্বর' [তারিখটি অবশ্যই ভুল] তিনি রাণু অধিকারীর প্রশ্নের জবাবে জানান : 'ছিলুম নানা জায়গায়, প্রধানত কাঠিয়াবাড়ে, তার পরে আমেদাবাদে, তার পরে বরোদায়। আজ সকালে এসেচি বম্বাইয়ে।' এর পরে তিনি যা লিখেছেন, বিশেষত নবনিযুক্ত সেবক বনমালী পারুই সম্পর্কে, তার অনেকটাই উদ্ধারযোগ্য :

> এবারে সাধুচরণের সঙ্গ ও সেবা থেকে বঞ্চিত আছি। বনমালী নামধারী উৎকলবাসী সেবক বৌমার আদেশক্রমে এসেচে। সে সর্ব্বদাই ভয়ে ভয়ে আছে— সব চেয়ে ভয় আমাকে, অথচ আমি বিশেষ ভয়ঙ্কর নই। দ্বিতীয় ভয় পাছে রাজবাড়ির অন্নপানে বিদেশে গঙ্গাতীর হতে দূরবর্ত্তী দেশে তার অকালমৃত্যু ঘটে। তৃতীয় ভয় রেলগাড়িতে বিদেশীর জনতাকে। তারা ওর সঙ্গে হিন্দী বলে, ও বলে বাংলা,— তাতে কথোপকথন উভয়পক্ষেই দুর্ব্বোধ হয়ে ওঠে। ওর বিশ্বাস এজন্যে বিদেশীরাই দায়িক। ওর আর একটা বিশেষ গুণ এই যে, ওকে যদি কোনো কাপড় বের করে দিতে বলি, তাহলে সিন্ধুক থেকে একে একে সব কাপড় বের করে তবে সেটা নির্ব্বাচন করতে পারে। আবার সবগুলো তাকে একে একে ফিরে গোছাতে হয়। মানুষের আয়ু যখন অল্প, সময় যখন সীমাবদ্ধ, তখন এরকম চাকর নিয়ে মর্ত্ত্যলোকে অসুবিধায় পড়তে হয়। ওর একটা মস্ত গুণ এই যে, ও ঠাট্টা করলে বুঝতে পারে, ঠিক সময়ে হাসতে জানে, আমার late lamented সাধুচরণের সে বালাই ছিল না। আমার আবার স্বভাব এমন যে, ঠাট্টা না করে বাঁচিনে। তাই, ও যতক্ষণ কাপড় বের করচে আর গোচাচ্ছে আমি ততক্ষণ সেই সুদীর্ঘ সময় ঠাট্টা করে অতিবাহন করি। যাই হোক্ ওকে বিদেশী হাওয়া, বিদেশী খাওয়া, বিদেশী ভিড় থেকে ফিরে নিয়ে গিয়ে কোনোমতে বৌমার হাতে আস্তটি ফিরে দিতে পারলে নিরুদ্বিগ্ন হই। আমার যে কত বড় দায়িত্ব, সে ওকে না দেখলে ভাল করে অনুধাবন করতেই পারবে না। একে আমার বিশ্বভারতী তার উপরে বনমালী, ভাবনার আর অন্ত নেই।[১০৯]

এর পরেই তিনি লেখেন : 'আমি বোধ হয় আর দুই তিনদিনের মধ্যেই রওনা হব। অতএব যদি চিঠি লেখ ত শান্তিনিকেতনের ঠিকানায় লিখো।' কিন্তু 15 Dec আনন্দবাজার পত্রিকা-য় 'কাশী, ১৪ই ডিসেম্বর' তারিখ দিয়ে সংবাদ পরিবেশিত হয় : 'অদ্য রবীন্দ্রনাথ কাথিয়াবার হইতে এখানে আসিয়াছেন। হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি বিশ্বভারতীর উদ্দেশ্য সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা দিয়াছেন।'[১১০] উক্ত পত্রিকাতেই [25 Dec] 'বঙ্গীয় হিন্দুসভার মন্ত্রী শ্রীরামশর্ম্মা'র প্রেরিত একটি প্রতিবেদন মুদ্রিত হয়। রবীন্দ্রনাথের চিন-জাপান প্রভৃতি সফর প্রসঙ্গে যুগলকিশোর বিরলা তাঁকে লিখেছিলেন, তাঁর কাশী যাওয়ার দিনক্ষণের সংবাদ পেলে তিনি ভ্রাতা ঘনশ্যামদাসকে লিখবেন, আর হিন্দু মহাসভার সভাপতি মদনমোহন মালব্য এ বিষয়ে অত্যন্ত আগ্রহী। তাঁর অপর ভ্রাতা রামেশ্বরদাসের সঙ্গে বোম্বাইতে রবীন্দ্রনাথের আলাপের কথা ছিল। সম্ভবত এই সাক্ষাৎকার ঘটেছিল ও তাঁর যোগাযোগেই রবীন্দ্রনাথের কাশীযাত্রা আয়োজিত হয়। শ্রীরামশর্মা আরও জানান :

> মালব্যজীর সভাপতিত্বে এস্থানে একটি মহতী সভার অধিবেশন হইয়াছিল। তাহাতে বহুসংখ্যক অধ্যাপক এবং বহুসহস্র ছাত্রের সমক্ষে রবিবাবু "আর্য্য-ধর্ম্মের মহত্ব" বিষয়ক বক্তৃতা করেন। তাহাতে তিনি বলেন, পুরাকালে তক্ষশীলা নালান্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিদেশ হইতে বহু ছাত্র আগমন করিয়া ধর্ম্মশাস্ত্র, দর্শনশাস্ত্র প্রভৃতি অধ্যয়ন করিয়া দূরতর প্রদেশে গমন করিয়া জ্ঞানপ্রচার করিতেন। বর্ত্তমানকালে চীনাদি বৌদ্ধ দেশের ছাত্রেরা এদেশে আগমন করিয়া ধর্ম্মশাস্ত্র অধ্যয়ন করিবার আশা হৃদয়ে পোষণ করিয়া থাকেন।
>
> চীনের রাজধানী পিকিনের সুবৃহৎ পুস্তকালয়ে আমাদের অনেক সংস্কৃত গ্রন্থ আছে। এই সকল গ্রন্থের মধ্যে সাংখ্যদর্শনের গ্রন্থই বেশী। ইহা প্রকাশিত হইলে সাংখ্যদর্শন বিষয়ক অনেক জ্ঞান বর্দ্ধিত হইবে। বর্ত্তমান সময়ে চীনে সাংখ্য দর্শন এবং সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতের সংখ্যা খুব কম। এজন্য তাঁহারা নিজেদের ধর্ম্মতত্ত্ব অবগত হইবার জন্য এদেশে আগমন করিতে ইচ্ছুক। দুঃখের বিষয়, এদেশে তাঁহাদের জন্য কোনরূপ ব্যবস্থা নাই। চীনে যাইবার পূর্ব্বে রবিবাবু তাঁহাদের জন্য বিশ্বভারতীতে কিছু ব্যবস্থা করিবার জন্য ভিক্ষায় বহির্গত হইয়াছেন। রবিবাবু বলেন, ভিক্ষা প্রার্থনায় অনভিজ্ঞ হইলেও আমি দেশবাসীকে এই সূচনা প্রদান করিতেছি। এই বক্তৃতার পর মালব্যজী বলেন, আপনি চিন্তা করিবেন না, ভিক্ষা করিতে আমি খুব অভ্যস্ত। এস্থানের বিশ্ববিদ্যালয়ে একশত বৌদ্ধছাত্রকে রাখিবার ভার আমি গ্রহণ করিতেছি— একথা আপনি প্রকাশ করিতে পারেন।
>
> রবিবাবু[র] বিশ্বভারতী বিদ্যাপীঠের জন্য রায় বাহাদুর শেঠ বলদেব দাস বিরলা মহোদয় ২০ হাজার টাকা প্রদান করিবেন বলেন। অনন্তর রবিবাবুকে ধন্যবাদ দিয়া সভা ভঙ্গ হয়।[১১১]

রবীন্দ্রনাথ ৩০ অগ্র [রবি 16 Dec] সন্ধ্যার পূর্বে শান্তিনিকেতনে প্রত্যাবর্তন করেন। বিশ্বভারতী সম্মেলনীর উদ্যোগে এইদিন সন্ধ্যায় লাইব্রেরির উপরে তাঁর সভাপতিত্বে সংগীতানুষ্ঠান আয়োজিত হয়। কণ্ঠ ও যন্ত্রসংগীতে অংশ নেন ছাত্রছাত্রীরা। 'তৎপর গুরুদেবের আদেশে ধীরেনকৃষ্ণ দেববর্মা এস্রাজে, রণজিৎ সিং সেতারে ও পণ্ডিতজি [ভীমরাও শাস্ত্রী] বীণায় ভৈরবীর আলাপ করেন।'

কার্তিক ও অগ্র ১৩৩০-এ রবীন্দ্রনাথের নিম্নলিখিত রচনাগুলি বিভিন্ন সাময়িকপত্রে প্রকাশিত হয় :

শান্তিনিকেতন, কার্তিক ১৩৩০ [৪।১০] :

১৫৮–৬১ 'বঙ্কিমচন্দ্র' (নব্যভারত ১৩৩০ ভাদ্র সংখ্যা হইতে উদ্ধৃত)

১৬১–৬৩ 'বলাকা'

১৭০ 'গান' ['ছায়া ঘনাইছে বনে বনে'] দ্র গীত ২। ৪৪৫; স্বর ৩০

১৭২ 'গান' ['পূব হাওয়াতে দেয় দোলা'] দ্র গীত ২। ৪৫৯; স্বর ৩০

দিনেন্দ্রনাথ-কৃত প্রথম গানটির স্বরলিপি ১৭০–৭১ পৃষ্ঠায় ও অনাদিকুমার দস্তিদার-কৃত দ্বিতীয়টির স্বরলিপি ১৭২–৭৩ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত হয়।

বঙ্গবাণী, কার্তিক ১৩৩০ [২।২।৩] :

২৬৯–৭১ 'যাত্রা' ['আশ্বিনের রাত্রিশেষে ঝরে'-পড়া শিউলি ফুলের'] দ্র পূরবী ১৪। ১৯–২১

The Modern Review, November 1923 [Vol. XXXIV, No. 5] :

513–30 'Gora' 70–76

প্রবাসী, অগ্র ১৩৩০ [২৩। ২। ২] :

১৪৫–৫৭ 'সমস্যা' দ্র কালান্তর ২৪। ৩৪০–৫৮

১৫৮–৬৩ 'সমাধান' দ্র ঐ ২৪। ৩৫৮–৬২

১৬৩–৬৪ 'উইলিয়াম্ পিয়ার্সন্' দ্র ব্যক্তিপ্রসঙ্গ ৩১। ৯৮–৯৯

২১৬–২৫ 'রথযাত্রা' দ্র কালের যাত্রা [পরিশিষ্ট] ২২। ১৫৭–৭০

২৬৬ 'বিশ্বভারতী-নারীবিভাগ'

শান্তিনিকেতন, অগ্র ১৩৩০ [৪। ১১] :

১৭৫–৭৭ 'মন্দির/ ৫ই বৈশাখ ১৩৩০' দ্র বিশ্বভারতী ২৭। ৩৭৫–৭৮

১৭৭–৮১ 'বলাকা'

১৮৭ 'গান' ['নিশীথরাতের প্রাণ'] দ্র গীত ২। ৫৩৩; স্বর ৩০

১৮৯ 'গান' ['এই শ্রাবণ-বেলা বাদলঝরা'] দ্র গীত ২। ৪৪৫; স্বর ৩০

দিনেন্দ্রনাথ প্রথম গানটির [পৃ ১৮৭–৮৯] ও অনাদিকুমার দস্তিদার দ্বিতীয় গানটির [পৃ ১৮৯–৯০] স্বরলিপি করেন।

The Modern Review, December 1923 [Vol. XXXIV, No. 6]:

633–48 'Gora' 77–85 'Epilogue'

পিয়র্সন-কৃত গোরা-র তর্জমার প্রকাশ এই সংখ্যায় সমাপ্ত হয়, কিন্তু তখন তিনি ইহলোকে নেই।

সম্ভবত ২২ অগ্র মোর্বি স্টেট থেকে রবীন্দ্রনাথ পুত্রকে লিখেছিলেন : 'পিয়র্সনের বাড়িটা আমার জন্যে বাসযোগ্য করে রেখে দিস্— এবার ফিরে গিয়ে যেন থাকতে পারি।' আমরা জানি, নিজের খরচে তৈরি 'দ্বারিক' বাড়ি তাঁর অনুপস্থিতিকালে বিশ্বভারতী নানা কাজে ব্যবহার করতে থাকলে 1921-এ শান্তিনিকেতনে ফিরে এসে পিয়র্সন 'কোণার্ক'-এর পাশে খানিকটা জমি কিনে সেখানে খড়ের চালের একটি মাটির বাড়ি প্রস্তুত করে বাস করতে থাকেন— সেটি 'মৃন্ময়ী' নামে পরিচিত হয়। রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনের অধিকাংশ বাড়িতেই কোনো-না-কোনো সময়ে বাস করেছেন, এবারে পশ্চিম ভারত ভ্রমণান্তে এসে উঠলেন মৃন্ময়ী বাড়িতে।

২ পৌষ [মঙ্গল 18 Dec] এখানে তাঁকে একটি গান লিখতে দেখা গেল 'আমার শেষ রাগিণীর প্রথম ধুয়ো' [দ্র গীত ২। ২৮০; স্বর ৩০]।

পৌষমেলা তখন অনতিদূরবর্তী, তাই কলকাতা ও অন্যান্য স্থান থেকে অনেক অতিথি সেখানে সমবেত হচ্ছিলেন। এই উপলক্ষেই প্রথম শান্তিনিকেতনে এলেন প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশের পত্নী নির্মলকুমারী বা রানী

মহলানবিশ, আমরা তাঁকে শেষোক্ত নামেই অভিহিত করব। আশ্বিন মাসে প্রায় তিন সপ্তাহ আলিপুর অবজারভেটরিতে তাঁদের সরকারি বাসস্থানে রবীন্দ্রনাথ তাঁর সেবাযত্ন ভোগ করে এসেছিলেন— তাঁর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের অবশিষ্ট জীবনব্যাপী ঘনিষ্ঠতার সূচনা তখন থেকেই। প্রশান্তচন্দ্র কলেজের কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ায় পৌষোৎসবে আসতে পারেননি, পত্নী রানীকে ৫ পৌষ [শুক্র 21 Dec] শান্তিনিকেতনে পাঠিয়ে দেন সম্ভবত কালিদাস নাগের সঙ্গে। তিনি এসে ৬ পৌষ রবীন্দ্রনাথের বিষয়ে স্বামীকে লিখলেন :

…তুমি আসনি বলে খুব বল্লেন। আমাকে বকলেন যে আমি কেন জোর করে ধরে আনলাম না। … বিকেলে ওঁর সঙ্গেই চা খেতে গেলাম। উনি এখন আবার পিয়ার্সন সাহেবের বাড়ীতে রয়েছেন— এ বাড়ী [কোণার্ক] চাবী বন্ধ। কাল রাত ১০টা পর্যন্ত আমার ঘরে বসে নতুন নাটকটা আবার পড়লেন। অনেক বদ্‌লেছেন— একেবারে প্রায় আলাদা চেহারা। নাম বদ্‌লিয়ে "রক্তকরবী" নাম দিয়েছেন— বেশ সুন্দর লাগ্‌ল।

…আজ [৬ পৌষ] সকালে যেই একটা গান লিখে সুর দেওয়া শেষ করেছেন অমনি আমি আর কালিদাসবাবু গিয়ে উপস্থিত হয়েছি। অম্‌নি আমাকে বল্‌ছেন "যেই খেজুর গাছ কাটা শেষ হয়েছে অমনি এসে দাঁড়িয়েছ?— টাট্‌কা টাট্‌কা রসের লোভে? তারপর আমাদের দুজনকে ভিতরে ওঁর ঘরে ডেকে নিয়ে গিয়ে দরজাটা বন্ধ করে গানটা একবার শোনালেন। তারপর যেই আমাদের শেখাতে যাবেন অমনি লোক এসে উপস্থিত— কাজেই আর তখন শেখা হোলো না। বল্লেন সুবিধা বুঝে আর এক সময় শিখিয়ে দেব।[১১২]

—দুঃখের বিষয়, তিনি উল্লেখ করেননি ৬ পৌষ রবীন্দ্রনাথ কোন্ নূতন গানটি রচনা করেছিলেন!

৭ পৌষ [রবি 23 Dec] সকালে রবীন্দ্রনাথ মন্দিরে উপাসনা করেন। তাঁর ভাষণটি '৭ই পৌষ / উদ্বোধন' [পৃ ১–৪] ও '২য় ব্যাখ্যান' [পৃ ৪–৭] নামে দুটি ভাগে মাঘ-সংখ্যা শান্তিনিকেতন-এ প্রকাশিত হয় [দ্র মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ। ১৮৩–৮৪ (আংশিক); বিশ্বভারতী ২৭। ৩৮০–৮৫ (১০)]। '২য় ব্যাখ্যান'-এ রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতন বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার কারণটি বিবৃত করতে গিয়ে শিশুদের শিক্ষায় বিশ্বপ্রকৃতির ভূমিকার কথা উল্লেখ করে বললেন : 'একটি দ্বার খুলে যাওয়াতে ভিতরের কপাটগুলি উদ্‌ঘাটিত হতে লাগল। আসলে খোলবার জিনিস একটি, কিন্তু পাবার জিনিস বহু। কিন্তু প্রথম দ্বারটি বন্ধ থাকলে ভিতরে প্রবেশ করবার উপায় থাকে না। … তাই মানুষের মুক্তির উপায় হচ্ছে, প্রকৃতিকে ধাত্রী বলে স্বীকার করে নিয়ে তাঁরই আশ্রয়ে শিক্ষকতা লাভ করা। এই মুক্তির আদর্শ নিয়েই এই শিক্ষাকেন্দ্রের পত্তন হল। … এতে করে আমাদের যে কত বন্ধনদশা ঘুচল, কত যে সংকীর্ণ সংস্কার দূর হল, তা বলে শেষ করা যায় না। … কিন্তু ক্রমশ আমার মনে হল যে, মানুষে মানুষে যে ভীষণ ব্যবধান আছে তাকে অপসারিত করে মানুষকে সর্বমানবের বিরাট লোকে মুক্তি দিতে হবে। আমার বিদ্যালয়ের পরিণতির ইতিহাসের সঙ্গে সেই আন্তরিক আকাঙ্ক্ষাটি অভিব্যক্ত হয়েছিল। কারণ বিশ্বভারতী নামে যে প্রতিষ্ঠান তা এই আহ্বান নিয়ে স্থাপিত হয়েছিল যে, মানুষকে শুধু প্রকৃতির ক্ষেত্রে নয়, কিন্তু মানুষের মধ্যে মুক্তি দিতে হবে।'

৮ পৌষ [সোম 24 Dec] সকালে প্রাক্তন ছাত্রদের বার্ষিক সভায় একটি বৈদিক মন্ত্র গীত হওয়ার পরে 'পূজনীয় গুরুদেব জীবিত ও পরলোকগত প্রাক্তন ছাত্রদের স্মরণ করিয়া অভিভাষণ দেন। তৎপরে তিনি শ্রীযুক্ত কালিদাস নাগ মহাশয়কে সভার নিকট পরিচয় করাইয়া দিলে তিনি বিশ্বভারতীর প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে এক নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা দেন।' এইদিন মেলাতে খেলাধূলার আয়োজন ছিল, 'পূজনীয় গুরুদেব উপস্থিত থাকিয়া খেলোয়াড়দিগকে উৎসাহ প্রদান করিয়াছিলেন।'

৯ পৌষ [মঙ্গল 25 Dec] আশ্রমের মৃত ব্যক্তিদের শ্রাদ্ধবাসর ও খ্রিষ্টোৎসব উপলক্ষে মন্দিরে উপাসনা হয়। রবীন্দ্রনাথ পিয়র্সনের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে যা বলেন, তার সারমর্ম 'পরলোকগত পিয়র্সন / ৯ পৌষ' শিরোনামে ফাল্গুন-সংখ্যা শান্তিনিকেতন-এ [পৃ ২১–২৪] মুদ্রিত হয় [দ্র ব্যক্তিপ্রসঙ্গ ৩১। ৯৯–১০৩]।

এবারে বহু বৎসর পরে খ্রিষ্টোৎসবের দিন অ্যান্ডরুজ আশ্রমে ছিলেন না বলে রবীন্দ্রনাথ এই উপলক্ষে উপাসনা করেন, তাঁর ভাষণটি চৈত্র-সংখ্যা শান্তিনিকেতন-এ (পৃ ৪৮–৪৯] '৯ই পৌষ / (খৃষ্টোৎসব)' শিরোনামে মুদ্রিত হয় [দ্র খৃষ্ট ২৭। ৫০১–০৩]। 'তাই তোমার আনন্দ আমার 'পর' গানটি দিয়ে উৎসবের সূচনা করে রবীন্দ্রনাথ বলেন, 'দুইয়ের মধ্যে একের যে প্রকাশ তাই হল যথার্থ সৃষ্টির প্রকাশ। নানা বিরোধে যেখানে এক বিরাজমান সেখানেই মিলন, সেখানেই এককে যথার্থভাবে উপলব্ধি করা যায়।' কিন্তু মানুষ নানাভাবে এই সত্যের অবমাননা করেছে। খ্রিষ্টধর্মের দীর্ঘ ইতিহাস, বিশেষ করে প্রথম মহাযুদ্ধের কথা স্মরণ করে তিনি বললেন : 'এই মহাত্মার বাণী যে তাঁর ধর্মাবলম্বীরাই গ্রহণ করেছিল তা নয়। তারা বারে বারে তাঁর বাণীর অবমাননা করেছে, রক্তের চিহ্নের দ্বারা ধরাতল রঞ্জিত করে দিয়েছে— তারা যিশুকে এক বার নয়, বার-বার ক্রুশেতে বিদ্ধ করেছে। সেই খৃষ্টান নাস্তিকদের অবিশ্বাস থেকে যিশুকে বিচ্ছিন্ন করে তাঁকে আপন শ্রদ্ধার দ্বারা দেখলেই যথার্থ ভাবে সম্মান করা হবে।'— ধর্মে খ্রিষ্টান হয়েও যারা খ্রিষ্টের উপদেশের বিরোধিতা করেছে তাদের সম্পর্কে 'খ্রিষ্টান নাস্তিক' অভিধাটির প্রয়োগ একেবারেই যথাযথ।

বহিরাগত অতিথিদের মনোরঞ্জনের জন্য এইদিন 'রাত্রে বিশ্বভারতীর ছাত্রছাত্রীরা একটি গানের মজলিসের আয়োজন করেন। পূজনীয় গুরুদেব ও শ্রীযুক্ত দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর বৈঠকটি পরিচালনা করেন। উহাতে গুরুদেবের কতকগুলি নূতন ও পুরাতন গান গীত হয়।'

১০ পৌষ [বুধ 26 Dec] বিশ্বভারতীর বার্ষিক সাধারণ অধিবেশনে রবীন্দ্রনাথ সভাপতিত্ব করেন।

পৌষ মাসে রবীন্দ্রনাথ-রচিত তিনটি গান রচনার সংবাদ পাওয়া যায় :

২ [মঙ্গল 18 Dec] 'আমার শেষ রাগিণীর প্রথম ধুয়ো' দ্র গীত ২। ২৮০; স্বর ৩০

১৬ [মঙ্গল 1 Jan 1924] 'যখন এসেছিলে অন্ধকারে' দ্র গীত ২। ৩৮১; স্বর ৩০

১৭ [বুধ 2 Jan] 'আমি সন্ধ্যাদীপের শিখা' দ্র গীত ২। ৫৮৬; স্বর ৩০— শেষ দুটি গান শ্রীনিকেতনে রচিত।

এই মাসে রবীন্দ্রনাথের লেখা কয়েকটি উল্লেখযোগ্য পত্র পাওয়া যায়। 2 Jan [বুধ ১৭ পৌষ] তিনি প্যাট্রিক গেডেসকে লেখেন, মন্দির ও পুষ্করিণী সংস্কারের পরিকল্পনা তিনি ত্যাগ করেননি, শুধু কিছু অর্থসংগ্রহের অপেক্ষায় রয়েছেন। বৃক্ষরোপণও হচ্ছে, কিন্তু জলের অভাবে তাদের বৃদ্ধি সন্তোষজনক নয়। এর পরে তিনি লেখেন : 'I have already read, in spite of numerous distractions, a large portion of Branford's Science and Sanctity with a great deal of sympathy and interest. It is a highly suggestive book, very helpful for me as I am in full agreement with the idealism it represents. In fact I was about to ask you to write a review of it for our Visvabharati Journal.' —তিনি নিজেই কাজটি করতে পারতেন, কিন্তু চিন-ভ্রমণের জন্য বক্তৃতা রচনার তাগিদে সময় করে উঠতে পারছেন না। অধ্যাপক গেডেস তাঁর অনুরোধ রক্ষা করেছিলেন, বিশ্বভারতী কোয়ার্টার্লির Apr 1924 [pp. 77-83]-সংখ্যায় 'Education and Reconstruction' নামে বইটির একটি সমালোচনা প্রকাশ করেন, রবীন্দ্রনাথ তার সূচনা লিখে দেন।

অসিতকুমার হালদার কলাভবনের কাজ ছেড়ে দিয়ে দেশীয় রাজ্য জয়পুরের মহারাজা স্কুল অব্ আর্টের অধ্যক্ষ পদে যোগ দিয়েছিলেন। ২২ পৌষ [সোম 7 Jan] রবীন্দ্রনাথ অসিতকুমারকে লিখলেন, কাথিয়াবাড় ভ্রমণের ফাঁকে জয়পুরে ঘুরে আসার বাসনাও তাঁর মনে ছিল কিন্তু ক্লান্তির কারণে তা সম্ভব হয়নি। এর পরে লিখেছেন :

কলাভবনের আদর্শ তৈরি করবার যে প্রস্তাব করেছিস সে ত ভালই ঠেকচে। কিন্তু আমরা খুব বেশি ব্যয়সাধ্য ইমারৎ তৈরি করিয়ে Endowmentএর টাকা নষ্ট করতে ইচ্ছা করিনে। যে টাকাটা পাওয়া যাবে তাতে আমাদের কলাভবনকে চিরস্থায়ী করতে পারব এইটেই আনন্দের বিষয়। তারপরে ক্রমে ক্রমে building এবং অন্যান্য আসবাব বাড়ানো যাবে। ইতিমধ্যে তোর architectকে দিয়ে একটা খসড়া তৈরি করিয়ে যদি পাঠিয়ে দিস্ ত বেশ ভাল হয়।

তোদের ওখানে crafts শেখাবার জন্য কাউকে কাউকে পাঠাবার প্রস্তাব করে দেখব। আমার মনে হয় যারা যথার্থ craftsmen তাদেরই ঘরের ছাত্র পাঠালে বেশি কাজ হবে। যারা artist তাদের এরকম কাজে সহজে মন বসে না।[১১৩]

এই সময়ে কাশীর হিন্দু য়ুনিভার্সিটির কনভোকেশনে যোগ দেবার জন্য রবীন্দ্রনাথের কাছে আমন্ত্রণ আসে। প্রথমে ভেবেছিলেন, যাবেন না— কিন্তু এই উপলক্ষে সেখানে অনেক দেশীয় রাজ্যের রাজাদের সমাগম ঘটবে জেনে তাঁদের কাছে বিশ্বভারতীর জন্য দরবার করার সুযোগ পাবার উদ্দেশ্যে তিনি সম্মতি জ্ঞাপন করেন। রথীন্দ্রনাথের সেই সময়ে দিল্লি যাওয়ার কথা ছিল একই উদ্দেশ্যে। তাঁর পরামর্শ চেয়ে রবীন্দ্রনাথ একটি তারিখহীন চিঠিতে লেখেন : 'তোরা ইতিমধ্যে দিল্লি অভিমুখে রওনা হয়েচিস কিনা জানিনে। যা হোক্ যথাবিহিত ব্যবস্থা করিস। দেখা যাচ্চে দিল্লিতে বরোদার মহারাজা যাচ্চেন না; তিনি যাবেন কাশীতে। তোদের ঠিক সেই সময়ে দিল্লিতে থাকতে হবে। তাহলে বরোদাকে তাঁর প্রতিশ্রুতি স্মরণ করিয়ে দেবার জন্যে কাশীতে আমার যাবার দরকার কিনা শীঘ্র লিখিস্। কাশীতে ভিজিয়ানগরমের মহারাণীও যাচ্চেন। ··· বরোদার সঙ্গে বমনজিও কাশীতে আসতেও পারেন এমন কথা ছিল।'[১১৪] শেষ পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের কাশী যাওয়াই স্থির হয়, সঙ্গী হবার জন্য কালিদাস নাগকে আহ্বান করে 11 Jan [শুক্র ২৬ পৌষ] লিখলেন : 'তোমাকে সঙ্গে নিতে চাই, তুমি সেখানে একটা লেকচার দেবে, সেটাতে বিশ্বের মধ্যে বিশ্বভারতীর স্থান তোমাকে নির্দেশ করতে হবে। বৃহস্পতিবারে রাত্রে ছাড়ব রবিবার রাত্রে প্রত্যাবর্তনের যাত্রা করব।'[১১৫] '২৩শে কিম্বা ২৪শে পৌষ' রাণুকে লিখলেন : 'এবারে ছোট্ট চিঠি লিখ্ব। কেননা শীঘ্রই চিঠির খনিসুদ্ধ তোমার ওখানে গিয়ে পৌঁছবে। শুধু বিশল্যকরণী নয় স্বয়ং গন্ধমাদন গিয়ে উপস্থিত হবে। নিশ্চয়ই এতক্ষণে বিদ্যুদ্বাহিনী বার্ত্তা তোমার কানে গিয়ে পৌঁচেছে যে হিন্দুবিশ্ববিদ্যালয় ভানুকে তার পূর্ব্ব দিক্‌প্রান্ত হতে আমন্ত্রণ করে নিয়ে যাচ্চে। ··· সম্প্রতি কাশীর দিকে স্বর্ণচক্রের একটা আওয়াজ শোনা যাচ্চে, তাই লৌহচক্রযানে ভানু তদভিমুখে যেতে উৎসুক। এর থেকে মনে কোরো না ভানুর মনে আর কোনো চক্রান্ত নেই। কিন্তু মনের কথা অনুমানে বুঝে নিতে হবে।'[১১৬]

কাশী রওনা হবার অব্যবহিত পূর্বে 15 Jan [মঙ্গল ১ মাঘ] এডোয়ার্ড টমসনকে রক্তকরবী-রচনা, চিন-ভ্রমণ ইত্যাদি সংবাদ দিয়ে বাংলায় লিখলেন : 'বিশ্বভারতীর ভার নিয়ে অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে আছি। অর্থের চিন্তা করতে করতে আমার মন বৃদ্ধ হয়ে যাচ্চে। আমি সে দিন পর্য্যন্ত ষাট বৎসরের পূর্ণ যৌবন ভোগ করছিলুম। দুই বৎসরের পরেই হঠাৎ তেষট্টি বৎসরের বুড়ো হয়ে উঠেচি। একদিন আমার পণ ছিল যতই আমার বয়স হোক্ না কেন আমি বুড়ো হয়ে মরবনা— কিন্তু সে পণ রক্ষা করতে পারলুম না।'[১১৭] কথাটি একই সঙ্গে

সত্য এবং সত্য নয়— অর্থের চিন্তায় শারীরিকভাবে তিনি অনেকটা দুর্বল হয়ে পড়ছিলেন বটে, কিন্তু তাঁর মানসিক যৌবন, এমন-কি শৈশবও, তিনি অক্ষুণ্ণ রেখেছিলেন প্রায় তাঁর জীবনান্তকাল পর্যন্ত।

কালিদাস নাগকে লেখা চিঠি অনুযায়ী, রবীন্দ্রনাথ ৩ মাঘ [বৃহ 17 Jan] রাত্রে তাঁকে নিয়ে কাশী রওনা হন, তাঁর চিঠি থেকেই জানা যায় প্রতিমা দেবী ও সেবক বনমালী তাঁর সঙ্গে ছিলেন। কাশীতে হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যসূচি, দেশীয় রাজ্যের রাজা-রানী প্রভৃতির সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎকার প্রভৃতি বিষয়ে আমাদের হাতে কোনো তথ্য নেই। রবিবার ৬ মাঘ তিনি ফিরতে পারেননি, রাণুকে 30 Jan [বুধ ১৬ মাঘ] তারিখে লেখা একটি চিঠি থেকে জানা যায়, ৯ মাঘ [বুধ 23 Jan] তিনি কাশী থেকে সদলবলে কলকাতা রওনা হন। পত্রটি তথ্যে-কৌতুকে-রচনাসৌকর্যে এমনই উপভোগ্য যে, কিঞ্চিৎ দীর্ঘ উদ্ধৃতি দেবার লোভ সংবরণ করা সম্ভব হল না :

কাশি থেকে প্রথম আসা গেল মোগল সরাইয়ে। বৌমা স্টেশনে যেখানে যত রং-করা পুতুল দেখ্‌লেন পুপের জন্যে কিন্‌তে বললেন। সঙ্গে কেবল ৮২৫ টাকা ছিল। আমি ভাবলুম, পথে আমাদের জলযোগের মত টাকাও বাকি থাক্‌বেনা। পুতুলের দোকান সব যখন খালি হয়ে গেল তখন বৌমার চোখ পড়ল পেয়ারার ঝাঁকার 'পরে। বল্লেন কাশির পেয়ারা যদি শান্তিনিকেতনে না নিয়ে যাই তাহলে কাশিতে আসাই নিষ্ফল হল। এক ঝাঁকা শেষ হল। আরেক ঝাঁকাও শেষ হল। ইতিমধ্যে গাড়ি ছেড়ে দিলে বলে তৃতীয় ঝাঁকাটা বাকি রয়ে গেল। দ্বিতীয় শ্রেণীর তিন্‌টে সিটের মধ্যে একটা সীট্ [য] পেয়ারায় ভরে গেল। দীর্ঘকাল স্থায়ী হবে আশা করে একটু কাঁচা গোছের পেয়ারা কেনা হয়েছিল, অথচ তাতে পাকা রংটি ধরেচে। আমি তাকিয়ে তাকিয়ে মনে ভাবলুম এ ত দেখি আমার রাণুরই মত— তার মধ্যে কোথাও বা কাঁচা কোথাও বা পাকা, কোথাও বা শ্যামল, কোথাও বা গৌর, কোথাও বা কঠিন, কোথাও বা কোমল। এই রকম চিন্তা করতে করতে দানাপুরে এসে উপস্থিত। এমন সময় দেখি এসিষ্টান্ট স্টেশন মাষ্টার মচ্‌মচ্ করতে করতে আমারই গাড়ির সামনে হাজির। ভাবলুম পেয়ারা ওজন করিয়ে মাশুল আদায় করবার প্রস্তাব করতে এসেচে। ইচ্ছা করল, কালিদাসের মুখের কাছে হাত নেড়ে নেড়ে কেদারা রাগিণীতে গান ধরি "সখি আমারি দুয়ারে কেন আসিল?" এমন সময়ে সে জিজ্ঞাসা করলে, "Are you Sir R. N. Tagore?" সত্যের খাতিরে আমাকে কথাটা স্বীকার করতে হল। সে বল্লে, এ গাড়ীতে নিশ্চয়ই অসুবিধা হচ্চে, আমি তোমার খবর পেয়েই একটা ফার্ষ্ট ক্লাস গাড়ি নতুন জুড়ে দিয়েচি, পাটনা জংসন স্টেশনে সেই গাড়ি দখল কোরো। পাছে ভদ্রলোক মনে মনে দুঃখিত হয় সেই জন্যে পাটনা জংসনে ফার্ষ্টক্লাসে রওয়ানা হলুম। পেয়ারাগুলোকে নানা ট্রাঙ্কের কোণে সন্নিবেশিত করা গেল। আমাদের লীলমণি হাতে কাঠের পুতুল নিয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে এসে উপস্থিত। বল্‌লে, "এটা ফেলে আসা হচ্চিল আমি এনেচি।" আমি বল্লুম "অনেক লোকসান বাঁচিয়েচ, কিন্তু হে লীলমণি, এর চেয়ে দামী জিনিষ ছিল সেগুলোর কি গতি হল?" সে বল্‌লে, "কুলীরা সব নিয়ে আস্‌চে।" আমি, এমন কি বৌমাও, লীলমণির এই আশ্চর্য্য বিবেচনা শক্তি ও সতর্কতা দেখে বিস্ময়াবিষ্ট হলুম। কিছুক্ষণ পরে বেচারা পুরাতত্ত্ববিদ্ কালিদাস তোরঙ্গ বালিশ বিছানা ঝুড়ি চুপড়ি পুঁটুলি বাক্স টিফিন ক্যারিয়র জলের কুঁজো ইত্যাদি উপকরণ বাহক কুলীদের পথপ্রদর্শক হয়ে এসে বল্‌লে, "আমি একলা এই প্রভূত অস্থাবর সম্পত্তির গুরুভার দায়িত্ব বহন করে হয়রাণ হয়ে পড়েচি— আমাদের লীলমণিকে কোথাও দেখা গেল না।" আমি তাকে অনেক আশ্বাস দিয়ে বল্‌লুম "তার জন্যে কিছুই উৎকণ্ঠিত হোয়ো না। সে পৌত্তলিক একখানি কাঠের পুঁতুলের তদারকে তার দেহমনপ্রাণ একান্ত উৎসর্গ করেছিল। সম্প্রতি সেই ভারমুক্ত হয়ে ভৃত্যাবাসের কাষ্ঠাসনে বিশ্রামের আনন্দ উপভোগ করচে।" লীলমণির স্বভাব সম্বন্ধে তোমার মনে নিশ্চয়ই অনেক বিতর্ক উপস্থিত হয়েচে। তার পিতৃদত্ত নাম বনমালী। কিন্তু হঠাৎ এক সময়ে শোনা গেল তোমার পিতা তাকে নীলমণি বলে সম্ভাষণ করলেন। আমার মনে হল তোমার পিতৃদত্ত নামটি তার মুখচ্ছবির সঙ্গে সুন্দর খাপ খায়। সেই অবধি আপোষে আমাদের নিজেদের মধ্যে তাকে লীলমণি বলেই আখ্যা দিয়েচি। যাক্ কলকাতায় এসে পৌঁছন গেল। এসে দেখা গেল পরদিনেই এগারই মাঘ। আমি জন্মকালে ব্রাহ্ম ছিলুম। কিন্তু যেমন আমি কোনো ইস্কুলের পড়া স্বীকার করতে পারিনি তেমনি আমি কোনো ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের বেড়ি মনকে পরাতে পারলুম না। সেই কারণে আমি সাম্প্রদায়িক উৎসবে যোগ দিতে পারি নে। স্থির করা গেল, জোড়াসাঁকোয় না থেকে আলিপুরে দুটো দিন অজ্ঞাতবাস যাপন করেই শান্তিনিকেতনে দৌড় মারব। প্রশান্তকে টেলিফোন করা গেল। প্রশান্ত বল্‌লে "তথাস্তু, আজ রাত্রে গিয়ে মোটর রথে করে আলিপুরে নিয়ে আসব।" বৌমার সঙ্কল্প হল তিনি সেই অপরাহ্নেই তাঁর কাঠের পুতুল আর কাশীর পেয়ারার বৃহৎ ঝুড়ি নিয়ে বোলপুরে যাত্রা করবেন। আমাদের সম্পত্তি যা কিছু ছিল দুই ভাগ হল। এক ভাগ যাবে আশ্রমে, একভাগ যাবে আলিপুরে। এমন সময় কি হল সেকথা লিখতে গেলে কিছুতে আজকের ডাক পাওয়া যাবেনা। অথচ আমি নিশ্চয় জানি তুমি প্রতিদিন ডাকের অপেক্ষা করচ আর ভাবচ "ভানুদাদা নিষ্ঠুর কঠিন।" তাই অনতিবিলম্বে এই চিঠি রওনা করে দিচ্চি গল্পের অবশিষ্ট অংশ পরের কিস্তিতে সমাপ্য।[১১৮]

পরের কিস্তির চিঠি আমরা পাইনি, তাই গল্পের পরবর্তী অংশ সংগ্রহ করতে হয়েছে ক্যাশবইয়ের '১০ই মাঘ শ্রীযুত কর্ত্তামহাশয় ও শ্রীমতী বধূমাতা ঠাকুরাণীর কলিকাতা হইতে বোলপুর আগমন খরচ'-এর হিসাব

থেকে অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথ আলিপুরে না গিয়ে প্রতিমা দেবীর সঙ্গেই ১০ মাঘ [বৃহ 24 Jan] বিকেলের ট্রেনে শান্তিনিকেতনে ফিরে আসেন।

আঁদ্রে কার্পেলেস গত বৎসর কয়েকমাসের জন্য শান্তিনিকেতনে এসে কলাভবনে কারুশিক্ষার অনেকগুলি কার্যক্রম প্রবর্তন করেছিলেন। তাঁর প্রতিশ্রুতি ছিল এবং তা শান্তিনিকেতন ও আনন্দবাজার পত্রিকায় ঘোষিতও হয়েছিল যে, তিনি আগামী বৎসরে শীতকালে আবার এখানে আসবেন। কিন্তু তার পরিবর্তে এল তাঁর বিবাহ-সংবাদ। তিনি Dal Hogman নামক একজন স্ক্যান্ডিনিভিয়ান যুবককে বিয়ে করেন, যাঁর বড়োসড়ো চেহারার জন্য রবীন্দ্রনাথ পরে আঁদ্রেকে 'your big Scandinivian' বলে ঠাট্টা করতেন। এখন 26 Jan [১২ মাঘ] তাঁকে লিখলেন :

...I forgive your husband for wrenching you away from us with such a sudden jerk—and I hope you understand what a degree of generosity that forgiveness of mine represents....

Your own cottage here still remains vacant. I have come to its neighbourhood occupying the bunglow which for sometime belonged to Pearson. You know we all mourn his loss though it is true that death for a man like him is merely a physical fact; his living spirit will always dwell in the heart of the Ashram.

I have been travelling a great deal from province to province pursuing the elusive lure of money. This is a hateful task which attacks one's bloom of life and it has at least brought upon me the wintry touch of a premature old age when I am barely 63. I try to use the torn remnants of my leisure in composing songs which occasionally makes me forget that I have nearly squandered away my gift of youth.[১১৯]

—এই কথাটি কিছুদিন ধরে রবীন্দ্রনাথের লেখায় বারবার ফিরে আসছিল, আমরা ইতিপূর্বে টমসন ও রাণুকে লেখা চিঠিতেও একই ধরনের বেদনার প্রকাশ দেখেছি।

আঁদ্রেকে লেখা চিঠিতে গান লেখার কথা আছে, *31 Jan [১৭ মাঘ] রানী মহলানবিশকেও রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন : 'কিছুদিন থেকে আমি অসুস্থ হয়ে পড়াতে গান লেখা ছাড়া আর কিছুই করতে পারচিনে। গান বন্ধ হয়ে গেলে কাজে মন দিতে পারব।'[১২০] কিন্তু তারিখ-চিহ্নিত গানের তালিকার অভাবে নূতন গানগুলিকে শনাক্ত করা কঠিন।

২০ মাঘ [রবি 3 Feb] কলাভবনে বিকেল তিনটেয় বিশ্বভারতী সম্মেলনীর দ্বিতীয় বিশেষ অধিবেশনে রবীন্দ্রনাথ সভাপতিত্ব করেন। ফ্রান্সের Professor of Jurisprudence Dr. Henry Solus কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আমন্ত্রণে অতিথি অধ্যাপক হিসেবে এসেছিলেন, তিনি বিশ্বভারতী পরিদর্শনে এলে এই বিশেষ অধিবেশনের আয়োজন করা হয়। রবীন্দ্রনাথ বক্তার পরিচয় দেবার পরে তিনি 'The Position of Women in French Civil Law' বিষয়ে ভাষণ দেন।

২৫ মাঘ [শুক্র 8 Feb] তাঁরই সভাপতিত্বে সম্মেলনীর তৃতীয় বিশেষ অধিবেশনে বসন্তকুমার মল্লিক 'Doctrine of Equality in Relation to Gandhism' বিষয়ে বক্তৃতা করেন। গান্ধীজির নিরুপদ্রব প্রতিরোধ গ্রহণ করার কারণ দেখিয়ে 'বক্তা জিজ্ঞাসা করেন জয়লাভ কি ভাল? এর উত্তরে বলেন আমরা জয়লাভ চাই না তাহাতে বৈষম্য সৃষ্টি করে আমরা চাই সাম্য। তৎপর সভাপতি বলেন যে বক্তা সমস্ত বক্তৃতাতেই তাঁহার মতামত দিয়াছেন— কোনো যুক্তি দেন নাই বলিয়া তর্ক হাজির করা কঠিন। তিনি বলেন যে বক্তার এই সাম্যবাদ তিনি বিশ্বাস করেন না। সব কিছুই যদি সমান হইয়া যায় ত তাহাকে মৃত্যু বলা যাইতে পারে। বৈষম্যের ভিতর দিয়া সামঞ্জস্য রক্ষিত হওয়াই দরকার—এই মতের পক্ষে তিনি অনেক যুক্তি উত্থাপন করেন। বক্তার অন্যান্য নানা যুক্তিও খণ্ডন করিয়া সভাপতি মহাশয় সভাভঙ্গ করেন।'

২৩ মাঘ [বুধ 6 Feb] শ্রীনিকেতন পল্লীপুনর্গঠন কেন্দ্রের দ্বিতীয় সাংবৎসরিক উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এইদিন প্রাতঃকালে সুরুলের বনাঙ্গনে রবীন্দ্রনাথ উপাসনার কার্য করেন। বিশ্বভারতী কোয়ার্টার্লি-র Apr 1924 [pp. 85–94]-সংখ্যায় অনুষ্ঠানটিকে 'The First Anniversary of Sriniketan' নামে অভিহিত করা হয়েছে; রবীন্দ্রনাথের ভাষণটি 85–91 পৃষ্ঠায় মুদ্রিত হয়, সেখানে তিনি 'সত্যং জ্ঞানম্ অনন্তং ব্রহ্ম', 'আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি' ও 'শান্তং শিবম্ অদ্বৈতম্', তিনটি আলাদা উপনিষদ থেকে সংকলিত যে-মন্ত্রটি বাল্যকালে উপাসনা-মন্ত্র হিসেবে পেয়েছিলেন তার ব্যাখ্যা করেন এই ভাষণে। এর পরে ক্ষিতিমোহন সেন কয়েকজন ছাত্রের সঙ্গে বৈদিক মন্ত্র আবৃত্তি করেন। বিকেল তিনটেয় একটি জনসভা হয়। সেখানে রবীন্দ্রনাথ গ্রামবাসিদের সম্বোধন করে কিছু বলেন।

২৬ মাঘ [শনি 9 Feb] শ্রীপঞ্চমীর সন্ধ্যায় শান্তিনিকেতনে কলাভবনে বসন্তোৎসব পালিত হয়। ফাল্গুন-সংখ্যা শান্তিনিকেতন-এ অনুষ্ঠানটির একটি দীর্ঘ বিবরণ প্রদত্ত হয় :

> শ্রীপঞ্চমীর দিন সন্ধ্যাকালে মহাসমারোহে গানের সুরে বসন্তের উদ্বোধন হইয়া গিয়াছে। শ্রদ্ধেয় নন্দলালবাবু, সুরেন্দ্রবাবু ও কলাভবনের শিল্পার্থী ছাত্রছাত্রীগণ সমস্ত দিন পরিশ্রম করিয়া কলাভবনটিকে উৎসব তিথির অনুকূল করিয়া তুলিয়াছিলেন। একদিকে বৈতালিকদিগের বসিবার স্থানটি বিচিত্র বর্ণের আচ্ছাদনে রচিত ও দুইটি সুদৃশ্য বীণাযন্ত্রে খচিত ছিল। মধ্যস্থলে কিঞ্চিদুচ্চে পূজনীয় গুরুদেবের আসন, তন্নিম্নে শ্রদ্ধেয় দিনুবাবুর চারি পার্শ্বে গানের দলের ছাত্র ছাত্রীগণ বসিয়াছিলেন। সম্মুখে কারুললিত আলিম্পিত স্থানে বীণাপাণির বীণাটি অগীত সঙ্গীতে উৎসব প্রহরকে পূর্ণ করিয়া তুলিতেছিল। উভয় পার্শ্বে আশ্রমের অধিবাসিগণের বসিবার স্থান নির্দিষ্ট ছিল। যথাসময়ে গানের দল তাঁহাদের উত্তরীয় ও অঞ্চলে বসন্তের পীতাভাস লইয়া সভাস্থলে উপস্থিত হইলেন। সেদিন সভাতে পূজনীয় গুরুদেবের রচিত অনেকগুলি গান হইয়াছিল। স্বয়ং গুরুদেব "তোমায় গান শোনাবো তাইতো আমায় জাগিয়ে রাখো— ওগো দুখ-জাগানিয়া" গানটি গাহিয়াছিলেন।[১২১]

এল্‌ম্‌হার্স্ট এইদিনই অনুষ্ঠানটি প্রসঙ্গে রাণুকে লিখেছেন :

I wish you'd been here this evening, it was our spring celebration & I know you'd have appreciated it so much more than I could, though, Heaven knows, I wouldn't have missed it for worlds.... Surul had a special dance in the Art School arranged for its little family & all were dressed for the occasion.

There was a feast of song & best of all one solo from Gurudev full of tune & feeling. There are times now when his ear fails him & one finds oneself anxiously awaiting the false note, but to-night there was never a suggestion even of anything but the most perfect rendering. I suppose Dinu's singing may be more technically perfect, but for expression &

word I would choose Gurudev every time. All the experience of his life somehow comes welling out when he lifts his voice in song....

Gurudev is full of vigour & fun, even turning out new ideas, but not really fit & I only hope the sea voyage & the change of climate will work a miracle. Now he can't get alone & though he revelled I believe during his two days here in the tree house.[১২২]

রবীন্দ্রনাথের শরীর ভালো যাচ্ছিল না, সেই কারণেই তিনি এই-সব কাজের মধ্যেই দু'একদিনের জন্য কলকাতায় ঘুরে আসেন। 4 Feb [সোম ২১ মাঘ] সেখান থেকেই রাণুকে লেখেন : 'আমার শরীরের অবস্থা সম্বন্ধে কিছু উদ্বিগ্ন হয়ে আমি কলকাতায় এসেছিলুম। মনে হয়েছিল যেন কিছু কল বিগ্‌ড়েচে। আমি মেরামত-করা শরীর নিয়ে ব্যবহার করতে নিতান্তই নারাজ। এখানে এসে নীলরতন সরকারকে দিয়ে দুদিন ধরে দেহটাকে উল্টিয়ে পাল্টিয়ে পরীক্ষা করিয়ে নিলুম। তিনি বল্লেন, কল কোথাও কিছুই বিগ্‌ড়োয় নি; বল্লেন আমার নাড়ী যৌবনের নাড়ী। তবে আমি যে কথায় কথায় কেবলি ক্লান্ত হয়ে হাঁপিয়ে পড়ি তার কারণ আমার দেহের শক্তি, বিশেষভাবে হৃৎপিণ্ডের শক্তি, অতিরিক্ত খরচ করে দেহটাকে দেউলে করে আনচি— দেহযাত্রার পূর্ণ প্রয়োজনের জন্যে সর্ব্বদা যে পুঁজি হাতে রাখা উচিত অসাবধান হয়ে আমি সেটাকে উড়িয়ে দেবার চেষ্টায় আছি। কিছুকাল সম্পূর্ণ বিশ্রাম করে আবার কিছু মূলধন সঞ্চয় করা বিশেষ আবশ্যক।'[১২৩] শুধু ডাঃ নীলরতন সরকার নন, বিদেশের বিভিন্ন খ্যাতনামা চিকিৎসক তাঁর দেহ পরীক্ষা করে একই কথা বলেছেন — কিন্তু রবীন্দ্রনাথ কখনোই নিজের শরীরকে সম্পূর্ণ বিশ্রাম দেননি বা দিতে পারেননি বিভিন্ন দাবির মোকাবিলা করতে গিয়ে। অবশ্য সদাসক্রিয় জঙ্গমতাই ছিল তাঁর বহুবিচিত্র সৃষ্টিশীলতার প্রাণস্বরূপ— তাকে বা তাদের বাদ দিয়ে তিনি যদি শারীরিক ক্লান্তি দূর করার মানসে অবসরের জীবন বেছে নিতেন, তাহলে হয় তাঁর সৃষ্টির স্রোত রুদ্ধ হয়ে যেত, নয় অবিরাম পরিবর্তনের মাধ্যমে নিত্যনবীন হয়ে ওঠার পরিবর্তে আত্মানুকরণের সংকীর্ণতায় আবর্তিত হতেন! দেশেবিদেশে দীর্ঘজীবী বহুপ্রসূ সাহিত্যিকদের এই মর্মান্তিক পরিণতির দৃষ্টান্ত আমরা অনেক প্রত্যক্ষ করেছি ও করছি।

কলকাতায় বিসর্জন নাটকের রিহার্সালের সময়ে বাস্তবজ্ঞানের অভাবে রাণু কয়েকজন যুবকের সঙ্গে অন্তরঙ্গতা সৃষ্টি ক'রে এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাট্টা ক'রে তাদের মধ্যে কয়েকজনকে প্রশ্রয় দিয়ে যে জটিলতার জন্ম দিয়েছিলেন, সেই যুবকদের আগ্রহাতিশয্যে তা এখন অনেক গুরুতর আকার ধারণ করছিল। রবীন্দ্রনাথ নিজেও নিছক কৌতুক করার জন্য তাঁর প্রতি যে-দুর্বলতার অভিনয় করতেন, রাণু তাকেও ভুল বুঝছিলেন। প্রায় এক বৎসর পরে লেখা রাণুর একটি চিঠি ছাড়া এই বিষয়ে তাঁর আর-কোনো পত্র আমরা পাইনি এবং তাঁকে লেখা রবীন্দ্রনাথের সব চিঠিই যে আমরা দেখবার সুযোগ পেয়েছি এমন দাবি করা সম্ভব নয়। তাই কিছু অনুমানের আশ্রয় নিতে আমরা বাধ্য। কিন্তু অন্তত রবীন্দ্রনাথের যে-চিঠিগুলি আমরা পেয়েছি, মনে হয়, তা আমাদের অনুমানেরই পোষকতা করে। এর প্রমাণস্বরূপ আমরা উক্ত 4Feb 1924 তারিখের চিঠিরই প্রথমাংশ উদ্ধৃত করছি তার অতিদীর্ঘতা সত্ত্বেও :

লক্ষ্মী মেয়ে, তুমি মনকে শান্ত কর। তোমার জন্যেই আমি উদ্বিগ্ন হয়েছিলুম। যে একটা জটিল জালের মধ্যে তুমি জড়িয়ে পড়েছিলে, তার জন্যে অনেক পরিমাণে আমিই দায়ী বলে আমি ক্ষুব্ধ হয়েছিলুম [এই ক্ষোভের প্রকাশ আমরা প্রাপ্ত সমসাময়িক কোনো পত্রে পাইনি]। তোমার এই প্রথম বয়েস, এই সময়ে তোমার পড়াশুনো তোমার নিশ্চিন্ত হাসি উল্লাসের মাঝখানে এই সমস্ত উপদ্রব এনে তোমার সমস্ত জীবনকে এমন করে

যে একটা ঘূর্ণিপাক খাইয়ে দেওয়া গেল সেটাতেই আমাকে দুঃখ দিয়েচে। তোমার উপর আমি কখনো এমন রাগ করতেই পারিনে যাতে তুমি স্থায়ীভাবে ব্যথা পেতে পার। আমার স্নেহ তুমি হারিয়েচ কল্পনা করে যে কষ্ট পাচ্চ তার কোনো মূল নেই। আমার যে-স্নেহ তুমি এমন করে টেনে নিয়েচ সে আমি কোনোদিন কিছুতেই প্রত্যাহরণ করতে পারিনে। আমার স্নেহে যদি তোমার কোনো সান্ত্বনা থাকে, তাতে যদি তোমার হৃদয়ের ক্ষুধা মেটাতে পারে, তাহলে সে তুমি সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত মনে ভোগ কর— তার দ্বারা তুমি বল পাও, সুখ পাও, কল্যাণ পাও, এই আমি সর্ব্বান্তঃকরণে প্রার্থনা করি। আমার কক্ষপথে কোথা থেকে কেমন করে তুমি একটি প্রাণের জ্যোতিষ্ক এসে পড়েচ, তোমার সংসারের অভিজ্ঞতা কিছুই নেই, তোমার মন কাঁচা, আমি কি তোমাকে রূঢ় ভাবে আঘাত করতে পারি? তোমার উপরে আমার বেদনাপূর্ণ স্নেহ সর্ব্বদা আপনি গিয়ে বিকীর্ণ হচ্চে। আমার জীবনের দায়িত্ব, কখন্ আমার অগোচরে, এবং জানিনে কার প্রেরণায় ক্রমশই বিশ্বব্যাপী হয়ে উঠচে— তার সমস্তটার সঙ্গে তোমার সম্পূর্ণ যোগ হওয়া সম্ভবপর নয়, তুমি ছাড়া আর কারো যে যোগ আছে তাও নয়,— ঐখানে বিধাতা আমাকে অনেকটা পরিমাণে একলা করে দিয়েচেন। কিন্তু তুমি হঠাৎ এসে আমার সেই জটিলতার একান্তে যে-বাসাটি বেঁধেচ, তাতে আমাকে আনন্দ দিয়েচে। হয়ত আমার কর্ম্মে আমার সাধনায় এই জিনিষটির বিশেষ প্রয়োজন ছিল, তাই আমার বিধাতা এই রসটুকু আমাকে জুটিয়ে দিয়েচেন। আমার অনেক সহযোগী আছে যারা আমার কর্ম্মে আমাকে প্রত্যক্ষভাবে সাহায্য করে, তুমি তা কর না; আমার জীবনের লক্ষ্যের দিকে তুমি হয়ত আমাকে সম্পূর্ণ বুঝতে এখনো পার না। কিন্তু জীবনের সেই লক্ষ্য যেখানেই থাক্ না, তুমি তোমার সরল প্রাণের অর্ঘ্যের দ্বারা আমার সেই জীবনকেই জাগিয়েচ তুমি কি মনে কর সে আমার পক্ষে সম্পূর্ণ অনাবশ্যক? তা যদি হ'ত তাহলে তুমি কখনই আমার কাছে আস্‌তে পেতে না। কেন না আমি জানি আমার ভাগ্যদেবতা আমাকে দিয়ে তাঁর একটা কোনো বিশেষ কাজ আদায় করবেন বলেই শিশুকাল থেকে আমার জীবনকে নানা অবস্থার মধ্যে দিয়ে গড়ে নিচ্চেন। তারি ডাকে আজ হঠাৎ তুমিও আমার কাছে এসে দাঁড়িয়েচ। কি রকম অভাবনীয়রূপে এসেচ সে কথা মনে করলে আশ্চর্য্য হতে হয় না কি? আমার পক্ষে তুমি যে বন্ধন হয়ে আসবে এ কিছুতে হতেই পারে না, কেননা মুক্ত না থাক্‌লে, আমার মধ্যে যা সব চেয়ে বড় তাকে আমি ব্যক্ত করতে পারি নে, আর তা না করতে পারা আমার পক্ষে এক রকমের মৃত্যুরই মত। সেই জন্যেই তুমি আমার জীবনের প্রাঙ্গণে ফুল-ফোটা লতার মতই এসেচ, বেড়ার মত আস নি। তোমার সেই ফুলের গন্ধ আমার মনে লেগেচে। তারই আনন্দে আমার কাজের অনেক ক্লান্তি দূর করে, এবং অবকাশের মধ্যে গানের সুর লাগায়।[১২৩]

রবীন্দ্রনাথ সম্ভবত ২৩ মাঘ রাণুকে লিখেছিলেন : 'আজকাল সন্ধের সময়ে আমার ঘরে সব গানশিক্ষার্থীর দল এসে জমে— তারা রাত্রি আটটা ন'টা পর্য্যন্ত আমার কাছ থেকে নতুন গান শেখে। অনেকগুলো নতুন গান তৈরিও হয়েচে।'[১২৪] এই প্রসঙ্গে ফাল্গুন-সংখ্যা শান্তিনিকেতন-এর বিবরণটি এইরূপ : 'আজকাল বিনোদন পর্ব্বে পূজনীয় গুরুদেব গানের দলকে নূতন গান শিখাইতেছেন।' আমরা আগেই বলেছি, এই 'নূতন' গানগুলিকে শনাক্ত করা যায়নি। সম্ভবত ২৮ মাঘ রাণুকেই লিখলেন : 'পূর্ব্বেই শুনেচ, রোজ সন্ধ্যাবেলায় মেয়েদের গান শেখাচ্চি। এত দিন রোজই একটা না একটা নতুন গান চল্‌ছিল ইদানীং তাদের অনুরোধক্রমে পুরোণো গান ধরা গেছে।' এর পরেই তিনি লিখলেন : 'গত তিন দিন গানের বদলে তিনটে বড় বড় নতুন কবিতা লিখেচি। তাতে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পাঠকেরা আশ্চর্য্য হয়ে গেচে। তারা ভেবে রেখেছিল রবি ঠাকুরের কবিতার ডানা থেকে তার সব পালকগুলো ঝরে গিয়েচে, এখন সে কেবল গদ্যের চালে মাটির উপরে লাফিয়ে লাফিয়ে বেড়াতে পারে, পদ্যের চালে মেঘলোকে উড়তে পারে না। কিন্তু রবি ঠাকুর অস্তাচলের ধারে এসেও তার ছটা বিস্তার করচে। তাতে রঙের ঘটার কৃপণতা নেই, বিচারকদের এই মত।'[১২৫] তারিখ-চিহ্নিত কবিতার অভাবে গানের মতো এই কবিতাগুলিকেও চিনে নেওয়া শক্ত। পূরবী [১৩৩২] কাব্যের অন্তর্ভুক্ত 'ভাঙা মন্দির' [দ্র ১৪। ২৬–২৮] ও 'আগমনী' [দ্র ১৪। ২৮–৩০]-শীর্ষক দুটি দীর্ঘ কবিতা মাঘ ১৩৩০ কাল-চিহ্নিত, তৃতীয় কবিতাটিকে শনাক্ত করা যায়নি।

অসহযোগ আন্দোলনের পরে আবার একটি ঘটনা নিয়ে এই সময়ে শরৎচন্দ্র রবীন্দ্রনাথের উপরে ক্ষুণ্ণ হন। তাঁর 'দেনাপাওনা' উপন্যাসটিকে 'ষোড়শী' নামে নাট্যরূপ দিয়ে তিনি রবীন্দ্রনাথকে অনুরোধ করেন তার জন্য কয়েকটি গান লিখে দেবার জন্য। এই ফরমায়েশ জানানোর সময়ে শরৎচন্দ্র একবারও ভাবেননি এর দ্বারা তিনি রবীন্দ্রনাথের কতটা অমর্যাদা করছেন। তাঁর প্রত্যুত্তরটি পাওয়া যায়নি, কিন্তু অনুমান করা যায় অনবকাশ ও অসুস্থতার কারণ দেখিয়ে তিনি সবিনয়ে অনুরোধটি পালন করাতে তাঁর অসামর্থ জ্ঞাপন করেন। ক্ষুব্ধ

শরৎচন্দ্র ২ মাঘ [বুধ 16 Jan] তাঁকে লেখেন : 'সহস্র প্রকার কাজের মধ্যে সম্প্রতি আপনার যে কিছুমাত্র অবকাশ নেই, সে আমরা সকলেই জানি। তবুও আমি এই ভেবে লিখেছিলাম যে গান আপনার কাছে কথা বলার মতই সহজ, অথচ একমাত্র এর জোরেই আমার নাটকের সব ত্রুটি ঢেকে যেতো।' গোপালচন্দ্র রায় জানিয়েছেন, ক্ষুণ্ণ শরৎচন্দ্র দু'তিন বৎসর রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে যোগাযোগ রাখেননি।[১২৬] এতেই বোঝা যায়, রবীন্দ্রনাথ বৃথাই বিজলী-তে 'কৈফিয়ৎ' প্রবন্ধ প্রকাশ করেছিলেন!

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের আনুকূল্যে রবীন্দ্রনাথের কনিষ্ঠ জামাতা নগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় মাসিক ৫০০ টাকা বেতনে গুরুপ্রসাদ সিং প্রফেসার অব্ এগ্রিকালচার পদে নিযুক্ত হন। চাকরির শর্তানুযায়ী স্নাতকোত্তর পর্যায়ে পঠনপাঠন ও গবেষণার জন্য নিজেকে উপযুক্ত করে তোলার উদ্দেশ্যে নগেন্দ্রনাথ দু'বছরের সবেতন ছুটি নিয়ে Apr 1923-তে ইংল্যান্ড রওনা হন, মীরা দেবীকে কষ্ট দেবার জন্য পুত্র নীতীন্দ্রনাথকেও জোর করে সঙ্গে নিয়ে যান বিদেশে তাঁর পড়াশোনার ব্যবস্থা করবার অজুহাতে। কিন্তু অমিতব্যয়ী নগেন্দ্রনাথের পক্ষে ৫০০ টাকা বেতনও যথেষ্ট ছিল না, সুতরাং পুত্রের নাম করে রবীন্দ্রনাথের কাছে বারংবার টাকা চাইতে তাঁর লজ্জা হয়নি। তিনি অবশ্য তাঁকে বঞ্চিত করেননি। ২৮ চৈত্র ১৩২৯ তাঁকে লিখেছিলেন : 'আমি অত্যন্ত নিঃস্ব ও ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়েচি নইলে তোমাকে সহজেই যথেষ্ট সাহায্য করতে পারতুম। যাই হোক্ পিয়র্সনের হাতে ৫০০ টাকা দেবার ব্যবস্থা করচি।' অধিক অর্থসাহায্য করতে না পারলেও অন্য আশ্বাস দিয়েছেন : 'য়ুরোপের মহাদেশে তুমি যেখানেই যাও আমার সঙ্গে তোমার সম্বন্ধ আছে একথা জান্‌লে যথেষ্ট পরিমাণে আদর ও আনুকূল্য পেতে তোমার কিছুমাত্র বিলম্ব হবে না।'[১২৭] আবার একই চাহিদার উত্তরে 26 Jan 1924 [১২ মাঘ ১৩৩০] তিনি লেখেন : 'বিশ্বভারতীর ভারে আমাকে আজকাল অভিভূত করে দিয়েচে। ... দুর্ভাগ্যক্রমে বন্যা এবং তার পরবৎসরই অনাবৃষ্টি এসে আমাদের সংসারকে নিঃস্ব করে দিয়েচে— আমার যা কিছু দেবার ছিল সমস্তই বিশ্বভারতীকে উজাড় করে দিয়েও তার ক্ষুধা মেটাতে পারচি নে।' এখানেও অন্য ব্যবস্থার প্রস্তাব আছে : 'আমাদের এখানে পারিসবাসিনী একজন ধনী ইংরেজ মহিলা এসেছিলেন তিনি নীতুর কথা শুনে বলেছিলেন প্যারিসে তাঁর কাছে নীতুকে রেখে তিনি তাকে শিক্ষা দেবার ভার নিতে রাজি আছেন।'[১২৮] কিন্তু নগেন্দ্রনাথের প্রয়োজন ছিল টাকা, তাই এইসব সুযোগ তিনি গ্রহণ করেননি।

চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় রবীন্দ্র-কবিতার নির্বাচিত সংকলন 'চয়নিকা' প্রথম প্রকাশিত হয় আশ্বিন ১৩১৬-তে [Sep 1909]। পরে গ্রন্থটির একাধিক সংস্করণ ও পুনর্মুদ্রণ হয়। ইন্ডিয়ান প্রেসের পরিবর্তে রবীন্দ্রনাথের গ্রন্থপ্রকাশের দায়িত্ব বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়ের কাছে হস্তান্তরিত হবার পরেও ফাল্গুন ১৩৩০-এ গ্রন্থটির চতুর্থ পুনর্মুদ্রণ প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ সংকলিত কবিতাগুলি সম্পর্কে সন্তুষ্ট ছিলেন না। তাই তিনি চাইছিলেন, নিজের বক্তব্য একটি ভূমিকার আকারে গ্রন্থটিতে সংযুক্ত করে দিতে। ভূমিকাটি লিখে তিনি সম্ভবত আগেই প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশকে দিয়েছিলেন, কিন্তু বৈজ্ঞানিক প্রশান্তচন্দ্র ঐতিহাসিক ক্রমের বিচ্যুতি ঘটাতে সম্মত ছিলেন না। এই বিতর্কের পটভূমিকায় *8 Feb [শুক্র ২৫ মাঘ] রবীন্দ্রনাথ তাঁকে লিখলেন :

হোক্ না reprint— এই উপলক্ষে আমি পাঠকদের কাছে আমার বক্তব্য জানাতে চাই। আমার কবিতা সম্বন্ধে আমার দায়িত্ব কোথায় আরম্ভ হয়েচে সে কথা স্পষ্ট করে যদি না জানিয়ে রাখি তা'হলে আমার নিজের পরে অবিচার করা হবে। আমি আমার গ্রন্থ থেকে ভাল ও মন্দ কবিতাকে বেছে আলাদা করতে চাই নে কিন্তু অকবিতা ও কবিতাকে আলাদা করতে চাই। যাঁরা ঐতিহাসিক বিকাশ দেখতে চান তাঁদের মালমশলার অভাব হবে না— কিন্তু আমি যাকে আমার কাব্য বলে স্বীকার করি নে তাকে বারেবারে আমার কাব্য সংগ্রহের মধ্যে স্থান দিতে চাই নে। তুমি লিখেচ ভবিষ্যতে কোনো উপলক্ষে আমার এই ঘোষণাপত্র হয়ত ছাপানো যেতেও পারে। তোমাদের বয়স অল্প, ভবিষ্যতের উপর তোমাদের ভরসা আছে — আমার নেই— আমি সঙ্কীর্ণ সময়ের মালিক। আমাকে তাড়াতাড়ি কথা শেষ করে নিতে হবে। অতএব সেই ভূমিকাটা চয়নিকার এই সংস্করণেই দিয়ো। তোমরা প্রকাশকরূপে নীচে একটুখানি নোট করে দিতে পার যে এই চয়নিকা কেবলমাত্র পুনঃসংস্করণ— এটা পরিবর্ত্তন করবার সময় হাতে নেই। তাছাড়া আমার মতের সঙ্গে তোমাদের মতের যদি অনৈক্য থাকে তাও তোমরা জানাতে পার— কিন্তু আমার কথাটা আমাকে বলে নিতে দাও।[১২৯]

—প্রশান্তচন্দ্র রবীন্দ্রনাথকে সম্ভবত তাঁর জেদ ত্যাগ করাতে সমর্থ হয়েছিলেন, তাঁর ভূমিকা ছাড়াই ফাল্গুন মাসে চতুর্থ ও বৈশাখ ১৩৩১-এ পঞ্চম পুনর্মুদ্রণ প্রকাশিত হয়।

১৩৩০ বঙ্গাব্দের পৌষ ও মাঘ মাসে রবীন্দ্রনাথের নিম্নলিখিত রচনাগুলি বিভিন্ন সাময়িকপত্রে প্রকাশিত হয় :

শান্তিনিকেতন, পৌষ ১৩৩০ [৪। ১২] :

১৯৫–৯৭ 'যোগ'

১৯৭–২০৩ 'বলাকা'

২০৩–০৪ 'বিশ্বভারতী' দ্র বিশ্বভারতী ২৭। ৩৭৮–৮০ (৯)

২০৪ 'গান' ['মন চেয়ে রয় মনে মনে'] দ্র গীত ২। ৩৯৭; স্বর ৩০

২০৭–০৮ বক্তৃতা'

২০৯–১০ 'গান' ['পৌষ তোদের ডাক দিয়েছে'] দ্র গীত ২। ৪৯৬–৯৭; স্বর ৩০

'মন চেয়ে রয় মনে মনে' গানটির রচনাকাল জানা যায়নি, 'পৌষ তোদের ডাক দিয়েছে' রচিত হয়েছিল জ্যৈষ্ঠ ১৩৩০-এ রক্তকরবী-র প্রাথমিক খসড়াগুলি রচনার সময়ে। 'যোগ' ও 'বিশ্বভারতী' রচনাগুলি আশ্রমে উপাসনায় ও কোনো আলোচনায় কথিত ও অনুলিখিত হয়। 'পৌষ তোদের' গানটির স্বরলিপি করেন অনাদিকুমার দস্তিদার।

The Modern Review, January 1924 [Vol. XXXV, No.1] : 1–10 'The Problem'

এটি 'সমস্যা' প্রবন্ধটির সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর-কৃত 'Authorised translation for the Modern Review'।

Visva-Bharati Quarterly, January 1924 [Vol. I, No. 4] :

321–42 'The Car of Time' (Translated)/ A Drama in one Act.

360–61 'The Freedom of Neglect'

381–89 'Notes and Comments' দ্র *English Writings of Tagore* 3/ 489–94

401 'W. W. Pearson' ['Thy nature is to forget thyself']

408–09 'II Sanskrit Books for German Scholars' (An Appeal by the President, Visva-Bharati)

'The Car of Time' 'রথযাত্রা' নাটিকাটির ইংরেজি অনুবাদ, অনুবাদকের নাম নেই বলেই ধরে নিতে হয় রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং এটি অনুবাদ করেছিলেন। 'W. W. Pearson' বলাকা-র উৎসর্গ-কবিতা ['আপনারে তুমি

সহজে ভুলিয়া থাক']-র রবীন্দ্রনাথ-কৃত তর্জমা। 'Freedom of Neglect' বলাকা-র ২২-সংখ্যক কবিতা ['যখন আমায় হাতে ধরে']-র ক্ষিতীশচন্দ্র সেন-কৃত সমিল তর্জমা। আর্থিক দুরবস্থার জন্য জার্মান প্রাচ্যবিদেরা সংস্কৃত গ্রন্থ কিনতে পারছেন না বলে তাঁদের বিদ্যাচর্চার ক্ষতি হচ্ছে জানিয়ে রবীন্দ্রনাথ তাঁদের সাহায্য করার জন্য আবেদন জানিয়ে উক্ত বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেন। তাঁদের আবেদনে সাড়া দিয়ে বিশ্বভারতী গ্রন্থাগারে রক্ষিত সংস্কৃত পুস্তকের অতিরিক্ত কপি জার্মানিতে পাঠানো হয়।

শান্তিনিকেতন, মাঘ ১৩৩০ [৫। ১] :

১–৪ '৭ই পৌষ / উদ্বোধন' দ্র মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ। ১৮৩–৮৪ [একাংশ]

৪–৭ '২য় ব্যাখ্যান' দ্র বিশ্বভারতী ২৭। ৩৮০–৮৫ (১০)

৭–৯ 'বলাকা'

৯–১১ 'গুরুদেবের পত্র / (পরলোকগত মহাত্মা ডব্লিউ, ডব্লিউ, পিয়ার্সন সাহেবের নিকট লিখিত)

১৪ 'গান' ['আমি সন্ধ্যাদীপের শিখা'] দ্র গীত ২। ৫৮৬; স্বর ৩০

১৬ 'গান ['আয়রে মোরা ফসল কাটি'] দ্র গীত ২। ৬১৩; স্বর ৩০

দুটি গানেরই স্বরলিপি করেন অনাদিকুমার দস্তিদার (পৃ ১৫–১৬, ১৭–১৯]; দুটির রচনা-তারিখ এখানেই উল্লিখিত হয়।

১ ফাল্গুন [বুধ 13 Feb] রবীন্দ্রনাথ 'বিশ্বসাথে যোগে যেথা বিহারো' গানটি অবলম্বনে মন্দিরে উপাসনা করেন [দ্র শান্তিনিকেতন, বৈশাখ ১৩৩১। ৬১–৬৩]।

এল্‌ম্‌হার্স্ট ১ ও ২ ফাল্গুন বিশ্বভারতী সম্মেলনীর বিশেষ অধিবেশনে তাঁর চিন-পরিক্রমার অভিজ্ঞতা বিবৃত করেন।

[শান্তিনিকেতন আশ্রমিক সঙ্ঘের সৌজন্যে প্রাপ্ত বিশ্বভারতী সম্মেলনীর হস্তলিখিত বিবরণী অবলম্বনে আমরা প্রথমাবধি এর উদ্যোগে আয়োজিত অনুষ্ঠানাদির বিবরণ দিতে সমর্থ হয়েছিলাম; কিন্তু অতঃপর 21 Jul 1927 পর্যন্ত বিবরণী আমরা পাইনি বলে আমাদের অন্য সূত্রের আশ্রয় নিতে হবে।]

৬ ফাল্গুন [সোম 18 Feb] রবীন্দ্রনাথ দুটি নূতন গান রচনা করেন :

'তোমায় চেয়ে আছি বসে' দ্র গীত ১। ২১০; স্বর ৩১

'আমার ভুবন তো আজ হল কাঙাল' দ্র গীত ২। ৩৮১; স্বর ১।

এর পরে ৮ ফাল্গুন [বুধ 20 Feb] প্রাতে রবীন্দ্রনাথ 'আলোয় আলোকময় করে হে' গানটির সূত্র অবলম্বনে মন্দিরে উপাসনা করেন।

এইদিন রাত্রে আশ্রম সম্মিলনীর পূর্ণিমা অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। ফাল্গুন-সংখ্যা শান্তিনিকেতন-এ অনুষ্ঠানটির বর্ণনা দেওয়া হয় : 'গত মাঘী পূর্ণিমার রাত্রে পুস্তকালয়ের সম্মুখে বারান্দায় সম্মিলনীর পূর্ণিমা অধিবেশন হয়। পলাশ স্তবকে ও রঙীন আলিপনা খচিত সভাস্থলে পূজনীয় গুরুদেব, দিনুবাবু ও গানের দল আসীন হইলে সভার কার্য্য আরম্ভ হয়। পূজনীয় গুরুদেবের নব রচিত সঙ্গীতগুলি গীত হইতে থাকে। সেদিন চন্দ্রগ্রহণ হইবার কথা ছিল; ক্রমে ক্রমে চাঁদের আলো ম্লান হইয়া আসিতে লাগিল; আকাশের ক্ষীণ তারাগুলি

পরিস্ফুট হইয়া উঠিতে লাগিল; জ্যোৎস্না বিকশিত মাঠের উপর গাঢ় একখানি ছায়া ঢলিয়া পড়িতে লাগিল। অবশেষে যখন পূর্ণিমার চন্দ্র অমাবস্যার চন্দ্রে পরিণত হইল তখন পূর্ণিমা সম্মিলনীর সভা ভঙ্গ হইল।'

22 Sep [৫ আশ্বিন] কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থানাপন্ন রেজিস্ট্রার দু'হাজার টাকার সাম্মানিক মূল্যে রীডার পদ গ্রহণ করে 'সাহিত্য' বিষয়ে কয়েকটি ভাষণ দেবার জন্য রবীন্দ্রনাথকে বিশ্ববিদ্যালয়ের আহ্বান জানিয়েছিলেন। এই বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ 13 Feb [১ ফাল্গুন] শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে লিখলেন : 'কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য কিছু লেখবার সময় পাইনি— শীঘ্র যে সময় পাব এমন আশা করিনে। অথচ যখন প্রতিশ্রুতিদ্বারা বদ্ধ আছি তখন ফাঁকি দেওয়া চলবে না। অতএব যদি না লিখে মুখে মুখে কিছু বললে নিয়মবিরুদ্ধ না হয় তাহলে চীনে যাবার আগে একটা বক্তৃতা দিয়ে যেতে পারি। মার্চ্চমাসের মাঝামাঝি আমাকে ছাড়তে হবে। আমাকে আগামী ২৩শে তারিখে ডাক্তার গোপাল চাটুয্যের একটি সভায় সভাপতির কাজ করতে যেতে হবে। সেই সময়ে যদি দেখা করতে পার তাহলে সব কথা আলোচনা হতে পারবে। চীনে যাবার আগে তোমার বাবার সঙ্গে একবার কোনো সুযোগে দেখা করে যেতে চাই— কি উপায়ে হতে পারবে তোমার সঙ্গে পরামর্শ করা যাবে।'[১৩০] শ্যামাপ্রসাদের কাছ থেকে অবশ্যই কোনো ইতিবাচক উত্তর এসেছিল।

কলকাতা যাওয়ার প্রাক্কালে তাঁর নর্মাল স্কুলের সহপাঠী অক্ষয়কুমার মিত্রের কাছ থেকে চিঠি এল, রবীন্দ্রনাথ কলকাতায় এলে তিনি দেখা করতে চান। তিনি ৯ ফাল্গুন [বৃহ 21 Feb] তাঁকে লিখলেন : 'কাল শুক্রবারে কলিকাতায় পৌঁছিব। শনি বা রবিবারে মধ্যাহ্নে [য] আসিলে বিরলে দেখা হইতে পারিবে।'[১৩১] রবীন্দ্রনাথ ১০ ফাল্গুন কলকাতায় গিয়েছিলেন, কিন্তু আমাদের জানা নেই বাল্যবন্ধুর সঙ্গে তাঁর দেখা হয়েছিল কিনা।

23 Feb [শনি ১১ ফাল্গুন] বিকেল ৪ টেয় অ্যালফ্রেড থিয়েটারে সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ অ্যান্টি-ম্যালেরিয়া সোসাইটির চতুর্থ বার্ষিক অধিবেশনে রবীন্দ্রনাথ সভাপতিত্ব করেন। বিভিন্ন প্রাতিষ্ঠানিক কার্যাবলি ও কামাখ্যাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বক্তৃতার পরে রবীন্দ্রনাথ সভাপতির দীর্ঘ ভাষণে যা বলেন, তার অনুলিখন জ্যৈষ্ঠ ১৩৩১-সংখ্যা বঙ্গবাণী-তে মুদ্রিত হয় [দ্র পল্লী প্রকৃতি ২৭। ৫৭৩–৮০]। অনুলিখন ভালো হয়নি, রবীন্দ্রনাথও প্রকাশের আগে কোনো পাঠসংস্কার করেননি। তুলনায় ১২ ফাল্গুন আনন্দবাজার পত্রিকা-র 'নিজস্ব প্রতিনিধির বিবরণ' অনেক বেশি পাঠযোগ্য [দ্র রবীন্দ্র-প্রসঙ্গ ১। ২৬৪–৬৬]। রবীন্দ্রনাথ ১২ ফাল্গুন রাণুকে এই ভাষণের একটি কৌতুকাবহ প্রতিবেদন পাঠালেন :

ম্যালেরিয়া সভায় বক্তৃতা করে এসেছি যে, ম্যালেরিয়া রোগটা ভাল জিনিষ নয়— ওর সঙ্গে প্রেমের সম্বন্ধ পাতিয়ে শ্রীমতী ম্যালেরিয়াকে অর্দ্ধাঙ্গিনী করবার চেষ্টা করলে ও দেখ্‌তে দেখ্‌তে সর্ব্বাঙ্গিনী হয়ে ওঠে। সাধারণত প্রেয়সীরা হৃৎকমলে স্থান গ্রহণ করে থাকেন কিন্তু শ্রীমতী ম্যালেরিয়া হচ্চেন যকৃৎবাসিনী, প্লীহাবিনোদিনী। কবিরা বলে থাকেন প্রেয়সীর আবির্ভাবে হৃদয়ে ঘন ঘন স্পন্দন উপজাত হয়, কিন্তু ম্যালেরিয়ার আবির্ভাবে সর্ব্বাঙ্গ মুহুর্মুহু স্পন্দিত হতে থাকে। অবশেষে অত্যন্ত তিক্ত উপায়ে তার বিচ্ছেদ ঘটাতে হয়। কিন্তু তার সঙ্গে একবার মিলন হলে বারে বারে সে ফিরে ফিরে আসে। তাই আমি করুণকণ্ঠে সানুনয়ে সকলকে অনুরোধ করে বলেছিলেম, "ভদ্রমহিলাগণ এবং ভদ্রলোক সকল, ধর্ম্মের নামে, দেশের নামে, সর্ব্বমানবের নামে আমি আপনাদের নিবেদন করচি, কদাচ আপনারা ম্যালেরিয়াকে প্রশ্রয় দেবেন না, আপনাদের প্লীহা ও যকৃতকে কদাচ তার চরণে উৎসর্গ করবেন না। আর যদি কখনো শোনেন মশা কানের কাছে মৃদুমন্দ গুঞ্জনধ্বনি করচে তবে তার সেই মায়ায় ভুলবেন না, যদি দেখেন সে আপনাদের চরণাশ্রয় গ্রহণ করেচে তবে নির্ম্মমভাবে এক চপেটাঘাতে তাকে বিনাশ করতে কুণ্ঠিত হবেন না। উত্তিষ্ঠত, জাগ্রত, প্রাপ্য ডাক্তারাণ্‌ নিবোধত।" আমার সেই সারগর্ভ চিন্তাপূর্ণ উপদেশ বাক্যে, আমার সেই জ্বালাময়ী বাগ্মিতায় সেই সভায় এমন অল্পবুদ্ধি, এমন জড়প্রাণ একজনও ছিল না ম্যালেরিয়ার অপকারিতায় যার কিছুমাত্র সংশয় ছিল। সকলেই বারবার বল্‌তে লাগ্ল, "ধন্য সার্‌ রবীন্দ্রনাথ, ধন্য ডাক্তার রবীন্দ্রনাথ, ধন্য বিশ্ববরেণ্য কবি, ম্যালেরিয়া যে এমন সর্ব্বনাশিনী এ কথা এমন ওজোময়ী বিশদভাষায় আর কোনোদিন কারো কাছে শোনা

যায় নি। আজ হতে আমরা সকলেই দৃঢ় সঙ্কল্প হলেম আর কোনোদিন ম্যালেরিয়ার প্রতি কিছুমাত্র শ্রদ্ধা রাখবো না, আর মশা গায়ে বসলেই হয় তালবৃন্ত ব্যজনে তাকে দূরীকৃত করব, নয় বীরোচিত অধ্যবসায় সহকারে নির্ভয়ে নিঃসংকোচে তাকে যমসদনে প্রেরণ করব।"[১৩২]

এর আগে ৫ ফাল্গুনে লিখিত একটি দীর্ঘ পত্রে [দ্র ভানুসিংহের পত্রাবলী, পত্র ৫৯] বা বর্তমান চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ-যে এত রসিকতা করেছিলেন, তার কারণ রাণুকে কিছু কঠিন কথা লেখার প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল। পাথুরিয়াঘাটা ঠাকুরবাড়ির প্রফুল্লনাথ ঠাকুরের পুত্র পূর্ণেন্দ্রনাথ বা বুড়ো রাণুর প্রণয়ীদের অন্যতম ছিলেন। সমগ্রোত্রীয় বলে তাঁদের বিবাহে আপত্তি উঠেছিল, তাছাড়া একাধিক প্রণয়ীর টানাপোড়েনে সমস্ত ব্যাপারটি এমন কুশ্রী হয়ে উঠেছিল যে এর কোনো সন্তোষজনক পরিণতি আর সম্ভবপর ছিল না। সেই কথাই রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন পত্রটির অসমাপ্ত বা খণ্ডিত শেষাংশে :

এতক্ষণ তোমার সঙ্গে হাসি তামাসা করেচি এখন একটু গম্ভীর হতে হবে। ইচ্ছে করেনা গম্ভীর হয়ে তোমার মনকে নাড়া দিতে— কিন্তু অত্যন্ত আবশ্যক বলেই তোমাকে বলচি। তোমার একটা কথা বিশেষ জানা উচিত যে তোমার সম্বন্ধে বুড়োদের বাড়িতে কুশ্রীরকম অপমানজনক কথাবার্ত্তা চল্‌চে। এমন একটা অবস্থায় এসে ঠেকেচে যে তোমার সঙ্গে বুড়োর বিবাহ কোনোমতেই সম্ভবপর নয়। অথচ তুমি এখনো যদি বুড়োকে চিঠি লেখ তাহলে কেবল যে তোমারই আত্মসম্মানের হানি হবে তা নয় তোমার বাপ মায়ের প্রতি অবমাননা টেনে আনবে। আমি গোপনে বলচি তোমার সম্বন্ধে তোমার বাবাকে অপমান করতে বুড়োর বাড়ি থেকে আর একটু হলে চেষ্টা করা হচ্ছিল এ সত্ত্বেও যদি তুমি বুড়োকে চিঠি লিখতে না ছাড়ো তাহলে তাকেও তুমি বিপদে ফেল্‌বে, নিজেদেরও অপমানিত করবে, আর তা ছাড়া এতে আমারও খুব লাঞ্ছনা হবে। আমার সম্বন্ধেও ওদের বাড়িতে আলোচনা চল্‌চে তুমি যদি এখনো আত্মসংবরণ করতে না পার তাহলে আমার পক্ষেও গুরুতর লজ্জার কারণ হবে। অবশ্য জানি, আমি না বুঝে গোড়াতে প্রশ্রয় দিয়েচি— সেটা আমার গভীর বেদনা ও অনুশোচনার বিষয় হয়ে রয়েচে। অনেকটা পরিমাণে আমারই উৎসাহে যখন বুড়োর প্রতি তোমার হৃদয় আবদ্ধ হয়ে পড়েচে, তখন হঠাৎ সেদিক থেকে তোমার ভালোবাসা প্রত্যাহরণ করতে বল্‌লেই যে অমনি তখনি সেটা সুসাধ্য হবে এটা আশা করাই যায় না। কিন্তু ভালোবাসারও ত একটা আত্মসম্মান এবং একটা দায়িত্ব আছে। বুড়োকে যখন তুমি ভালোবাসো তখন বুড়োর কল্যাণের কথাও ত তোমার ভাবা উচিত।[১৩২]

—আশীর্বচন, স্বাক্ষর ও তারিখ ছাড়া প্রাপ্ত পাণ্ডুলিপি-পত্রটি হঠাৎ এখানেই সমাপ্ত হয়েছে দেখে মনে হয়, হয়তো পত্রের বাকি অংশ স্খলিত হয়ে হারিয়ে গেছে নতুবা এই আকস্মিক সমাপ্তিকে রবীন্দ্রনাথের ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ বলে অনুমান করতে হয়।

ঘটনাটি ক্রমশই জটিল হয়ে উঠছিল। কিঞ্চিৎ গোঁড়া পিতা ফণিভূষণ রাণুর বিবাহ দিয়ে এই সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করছেন জেনে রবীন্দ্রনাথ তাঁর আপত্তি জানিয়ে তাঁকে একটি তারিখহীন পত্রে লিখলেন : '…তাতে সামাজিক সমস্যার মীমাংসা হতেও পারে, কিন্তু রাণুর নিজের পক্ষে সেটা সুখকর কিম্বা কল্যাণকর হবে কিনা সেটাই বিশেষ করে ভাববার কথা। দুঃখ পাবার শক্তি ওর এত তীব্র যে ও যদি অস্থানে গিয়ে পড়ে তাহলে ভিতরে ভিতরে ও নিজেকে দগ্ধ করে মারবে। যতক্ষণ খুব নিশ্চিত করে না বুঝবে ততক্ষণ উপস্থিত সঙ্কট কোনমতে এড়াবার জন্য একটা ঠেকা দেবার চেষ্টা কোরো না। আমার বিশ্বাস, রাণুর মা রাণুর নিজের পক্ষের কথাটা তোমার চেয়ে ঠিক বুঝতে পারবেন। তিনি এ সম্বন্ধে কি ভাবছেন আমি জানতে ইচ্ছা করি। … আমার ত মনে হয় আরো কিছুদিন পড়াশোনার ভিতর দিয়ে নিয়ে গিয়ে বর্ত্তমান এই সমস্ত জঞ্জালের চিহ্ন মুছে ফেলা সর্ব্বপ্রথমে দরকার। … আমার যদি সময় থাকত রাণুর সঙ্গে আর রাণুর মার সঙ্গে এ সম্বন্ধে কথা কয়ে ভিতরকার অবস্থাটা ভালো করে বোঝবার এবং রাণুকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করতুম।'[১৩৩] ক্যাশবহির '১১ই মার্চ্চ [২৮ ফাল্গুন] গুরুদেবের ও রাণু দিদির এবং চাকরদিগের কলিকাতা গমন কালীন ও ১২ই মার্চ্চ শ্রীযুক্ত রথীন্দ্র বাবু মহাশয় গবা বাবুর এবং রাণু দেবীর মাতার ও একজন চাকরের যাওয়ার কালীন মটর ভাড়া'

প্রভৃতি হিসাব থেকে মনে হয়, রাণু ও তাঁর মা সরযূবালা রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আলোচনার জন্য শান্তিনিকেতনে এসেছিলেন— কিন্তু এই সময়ে তাঁর গতিবিধির অন্য বিবরণ থাকাতে তারিখটি নিয়ে আমাদের সংশয় আছে।

১৮, ১৯ ও ২০ ফাল্গুন শনি-সোম 1–3 Mar] রবীন্দ্রনাথ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট হলে তাঁর পূর্বপ্রতিশ্রুত তিনটি বক্তৃতা প্রদান করেন— তিনি মৌখিক ভাষণ দেন, অনুলিখিত ও সংশোধিত হবার পরে তাদের নামকরণ হয় 'সাহিত্য', 'তথ্য ও সত্য' এবং 'সৃষ্টি' [দ্র সাহিত্যের পথে ২৩। ৩৭৫–৮১, ৩৮২–৯২, ৩৯২–৪০০]। অবশ্য দৈনিক ও বিভিন্ন সাময়িকপত্রের তরফে ভাষণগুলির বহুবিধ অনুলেখন হয় ও সেগুলি মুদ্রিতও হয় নানা বয়ানে ও শিরোনামে। আনন্দবাজার পত্রিকা-র প্রতিবেদন প্রকাশিত হয় ১৯, ২০ ও ২১ ফাল্গুনে [দ্র রবীন্দ্র-প্রসঙ্গ ১। ৩৫৩–৫৫]; ফাল্গুন-সংখ্যা পরিচারিকা-য় প্রথম দুটি ভাষণের তারানাথ রায়-কৃত অনুলেখন মুদ্রিত হয় 'সাহিত্যের মূলতত্ত্ব' ও 'সাহিত্যের রসতত্ত্ব' নামে, বৈশাখ ১৩৩১-সংখ্যা পল্লীশ্রী 'সাহিত্য' নামে তৃতীয় ভাষণটি ছাপে— আমরা অবশ্য যথাক্রমে জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় ১৩৩১-সংখ্যা প্রবাসী-র 'কষ্টি পাথর'-এ উদ্ধৃত পাঠগুলিই দেখেছি। সম্ভবত রবীন্দ্রনাথ-কর্তৃক সংশোধিত পাঠ 'সাহিত্য', 'তথ্য ও সত্য' এবং 'সৃষ্টি' নামে মুদ্রিত হয় ১৩৩১ বঙ্গাব্দের বঙ্গবাণী-র যথাক্রমে বৈশাখ, ভাদ্র ও কার্তিক-সংখ্যায়। সুধেন্দুরঞ্জন [হোম] রায় রক্তকরবী-র ষষ্ঠ খসড়াটির [Ms. 149 (ii)] প্রতিলিপি প্রস্তুত করেছিলেন, তিনি কোনো পত্রিকার জন্য রবীন্দ্রনাথের ভাষণের অনুলেখন করেন। তাঁর ভাষণের অনুলেখন নিয়ে রবীন্দ্রনাথ নানা প্রসঙ্গে যথেষ্ট অসন্তোষ ব্যক্ত করাতেই অভ্যস্ত, কিন্তু সুধেন্দুরঞ্জনের অনুলেখন তাঁকে তৃপ্ত করে। সেগুলি পড়ে ১ চৈত্র [14 Mar] রবীন্দ্রনাথ তাঁকে লেখেন :

প্রতিলিপির কাজে তুমি যে রকম ওস্তাদি দেখিয়েচ, অনুলিখনের কাজেও দেখচি তোমার পাকা হাত। যা মুখে বলেছিলেম ঠিক তাই ত দেখলুম ছাপার কাগজে। আমাকে অনেক সভায় অনেকবার ডাক পড়েচে তাতে অনেক কথাও বলেচি— আজ তাদের টিকি দেখবার জো নেই। তাই মাঝে মাঝে গুঞ্জনস্বরে মনের খেদে বলে থাকি :

আশার ছলনে ভুলি কি ফল লভিনু, হায়
তাই ভাবি মনে।
বকুনিপ্রবাহ বহি কালসিন্ধুপানে ধায়
ফিরাব কেমনে।

তুমি যদি আরো কিছুকাল পূর্ব্বে সভাসমিতিলোকে আবির্ভূত হতে তাহলে আমাকে এত বড় শোকাবহ গানটা গাইতে হত না। কথার পুঁজি শূন্য করে আমার কণ্ঠ যখন হাঁ হাঁ করচে তখন তোমার অনুলিপির নিপুণ পাশ হস্তে আজ কোন বাণীকে শিকার করতে এসেচ, বাজপক্ষী গেল, কোকিলপক্ষী গেল, ধরেচ কি না এক চড়াই পক্ষীকে। তবু তোমার তারিফ করচি।[১৩৪]

বক্তৃতাগুলি আয়োজিত হয় সিনেট হলে প্রত্যহ বিকেল ৪-৪৫ মিনিটে। যদিও বিশ্ববিদ্যালয়ের 'রীডার' হিসেবে স্নাতকোত্তর ছাত্রদের কাছে তাঁর এই বক্তৃতাগুলি দেবার কথা, কিন্তু তিনি রবীন্দ্রনাথ বলেই সিনেট হলের মতো প্রশস্ত স্থানে আয়োজন করতে হয়েছিল এবং জনতা হল পূর্ণ করে বাইরের বারান্দাতেও ছড়িয়ে পড়ে। তিনি নিজেই এই প্রসঙ্গে ৩০ ফাল্গুন রাণুকে লিখেছেন : 'এবার কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে আশুবাবু যখন আমাকে তিনটে বক্তৃতা করতে বল্‌লেন আমি কিছুই ভেবে পাই নি আমি কি বল্‌ব। যখন সেনেট হলে গিয়ে দাঁড়ালুম দেখ্‌লুম অত বড় হল ঠাসাঠাসি ভর্তি করি [য] লোক বাইরের বারান্দায় পর্য্যন্ত ভিড় করে দাঁড়িয়েচে। সবাই বলে চার পাঁচ হাজার শ্রোতা হয়েছিল। মনের মধ্যে ভয় হল, কিচ্ছুই ত তৈরি হয়ে আসি নি; এক টুক্‌রো কাগজে এক লাইনও নোট লেখা হয় নি। কিন্তু পালাবার পথ ত ছিল না। উঠে দাঁড়ালুম যেমন করে

হোক বল্‌তে আরম্ভ করলুম। দেখলুম বলবার কথা ত আপনিই জুটে যাচ্চে। সে সব কথা যেমন অন্যে শুন্‌চে তেমনি আমি নিজেও শুনচি। সে ত আমারই বানিয়ে বলা কথা নয়।'[১৩৫]

অনুলেখন অবলম্বনে রবীন্দ্রনাথ ভাষণগুলি বঙ্গবাণী-র জন্য পুনরায় লিখে দেন। তবে প্রথম বক্তৃতা 'সাহিত্য' সাহিত্যের পথে [১৩৪৩] গ্রন্থে সংকলনের সময়ে অনেক অংশ বাদ দেন, সেগুলি রবীন্দ্র-রচনাবলী ২৩শ খণ্ডের 'গ্রন্থপরিচয়'-এ (পৃ ৫৪৬–৫১] সংকলিত হয়েছে।

২০ ফাল্গুন [সোম 3 Mar] তৃতীয় বক্তৃতা 'সৃষ্টি'র সূচনাতেই রবীন্দ্রনাথ বলেন : 'আজ এই বক্তৃতাসভায় আসব ব'লে যখন প্রস্তুত হচ্ছি তখন শুনতে পেলুম, আমাদের পাড়ার গলিতে সানাই বাজছে। কী জানি কোন্ বাড়িতে বিবাহ। খাম্বাজের করুণ তান শহরের আকাশে আঁচল বিছিয়ে দিল।' এরই পটভূমিকায় তিনি 'উৎসবের বাঁশি' কবিতাটি রচনা করেন ও শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে সেটি পাঠিয়ে লেখেন :'পূর্ব্বে তুমি আমাকে পত্র লিখেছিলে লিখেচ, পাইনি। "বঙ্গবাণী"র জন্যে একটি কবিতা পাঠালুম।'[১৩৬] কিন্তু কবিতাটি চৈত্র-সংখ্যা ভারতী-তে [পৃ ১০৮৩–৮৪] মুদ্রিত হয় [দ্র পূরবী ১৪। ৩১–৩২, 'উৎসবের দিন']।

রবীন্দ্রনাথ এই সময়ে বেশ-কিছুদিন কলকাতায় কাটান। ২৪ ফাল্গুন তাঁর লেখা 'কণ্ঠে নিলেম গান, আমার শেষ পারানির কড়ি' [দ্র গীত ১। ১৭; স্বর ৩০] বিজলী-তে প্রকাশিত হয়। অনাদিকুমার দস্তিদার-কৃত গানটির স্বরলিপি চৈত্র-সংখ্যা শান্তিনিকেতন-এ [পৃ ৫৪–৫৫] ছাপা হয়েছে।

7 Mar [শুক্র ২৪ ফাল্গুন] রবীন্দ্রনাথ রাণুকে লিখলেন : 'তোমাকে যে বেদনা দিয়েছিলুম তারি কান্নার চিঠি এতদিন পেয়ে আসচি। তুমি জাননা এতে আমাকে কত ব্যথিত করে তুলেছিল। আমার পরের চিঠি পেয়ে তোমার হৃদয়ের ক্ষতযন্ত্রণা অনেকটা দূর হয়েচে এইটি জানবার জন্যে আমার মন অপেক্ষা করেছিল। সমুদ্রের উপর দিয়ে যখন ঝড় বইতে থাকে তখন তার সমস্ত অশ্রুরাশি তরঙ্গিত হয়ে ওঠে— ঝড় থেমে যাওয়ার পরেও অনেকক্ষণ থাকে ঢেউয়ের ভিতরকার সেই কান্না, তোমার এই চিঠির ভিতরেও তোমার ব্যথার সেই ঢেউ এখনো যেন ফুলে ফুলে উঠ্‌চে। যাক্ সে ঝঞ্ঝা কেটে গেছে— এখন তোমার মনের উপর একটি প্রশান্ত প্রসন্নতা মেঘমুক্ত প্রভাত আলোর উপর বিকীর্ণ হোক।'[১৩৭] তিনি জানিয়েছেন, চিনে যাবার দিন কয়েক সপ্তাহ পিছিয়ে গিয়ে ২৩ মার্চ জাহাজ ছাড়বে। কিন্তু ক্ষণে ক্ষণে মনের ভিতরটাতে বসন্তকালের ডাক এসে পৌঁছে তাঁর চিনে যাবার ইচ্ছেটাকে দুর্বল করে দিয়েছে। 'এই জোড়াসাঁকোর গলিতেও দেখ্‌তে দেখ্‌তে তিনটে কবিতা লিখেচি।' পূরবী কাব্যে সংকলিত ফাল্গুন মাসে লিখিত কবিতার সংখ্যা অবশ্য আরও বেশি, আমরা সেগুলি তালিকাবদ্ধ করে দিচ্ছি :

'উৎসবের দিন' ['ভয় নিত্য জেগে আছে'] দ্র ভারতী, চৈত্র। ১০৮৩–৮৪; পূরবী ১৪। ৩১–৩২;

'গানের সাজি' ['গানের সাজি এনেছি আজি'] দ্র পূরবী ১৪। ৩৩–৩৪;

'লীলাসঙ্গিনী' ['দুয়ার-বাহিরে যেমনি চাহি রে'] দ্র প্রবাসী, বৈশাখ ১৩৩১। ১–২; পূরবী ১৪। ৩৫–৩৮;

'শেষ অর্ঘ্য' ['যে তারা মহেন্দ্রক্ষণে প্রত্যুষবেলায়'] দ্র কল্লোল, বৈশাখ ১৩৩১। ১; পূরবী ১৪। ৩৮;

'বেঠিক পথের পথিক' ['বেঠিক পথের পথিক আমার'] দ্র প্রবাসী, আষাঢ়। ২৯৭; পূরবী ১৪। ৩৯–৪০;

'বকুল-বনের পাখি' ['শোনো শোনো ওগো, বকুল-বনের পাখি'] দ্র প্রবাসী, জ্যৈষ্ঠ ১৩৩১। ১৫৩–৫৪; পূরবী ১৪। ৪০–৪২।

প্রবাসী-তে মুদ্রিত ‘বেঠিক পথের পথিক’ কবিতাটিতে পাঠনির্দেশ ছিল : ‘এই কবিতাটির সমস্ত অকারান্ত শব্দকে হসন্তরূপে গণ্য করিতে হইবে ও কবিতাটি দাদরা তালে পড়িতে হইবে।’ পড়ার সুবিধার জন্য সমস্ত অকারান্ত শব্দ হসন্তযোগে মুদ্রিত হয়েছিল।

কলকাতায় রবীন্দ্রনাথের আরও কাজ ছিল। ২৫ ফাল্গুন আনন্দবাজার পত্রিকা জানায় : ‘বাদুরবাগান জাতীয় বালিকা বিদ্যালয়ের বাৎসরিক পুরস্কার বিতরণ সভায় আগামী সোমবার [২৭ ফাল্গুন : 10 Mar] সভাপতির আসন গ্রহণ করিবার জন্য ডাঃ রবীন্দ্রনাথের নিকট বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষয়িত্রী শ্রীমতী লজ্জাবতী বসু তার করিয়াছিলেন। উত্তরে তিনি জানাইয়াছেন যে তিনি সভাপতিত্ব করিতে সমর্থ হইবেন।’[১৩৮] অনুষ্ঠানটির কোনো বিবরণ পাওয়া যায়নি।

রাজনারায়ণ বসুর দৌহিত্র রবীন্দ্রনাথের বন্ধু অধ্যাপক ও কবি মনোমোহন ঘোষের [1869–1924] অকালমৃত্যুর পরে তাঁর স্মরণার্থে 9 Mar [রবি ২৬ ফাল্গুন] য়ুনিভার্সিটি ইনস্টিট্যুটে একটি সভায় রবীন্দ্রনাথ সভাপতিত্ব করেন। তাঁর মৌখিক ভাষণের অনুলেখন Mar 1924 [pp. 307–08]-সংখ্যা *Presidency College Magazine*-এ মুদ্রিত হয় [দ্র ব্যক্তিপ্রসঙ্গ ৩১। ১০৩–০৭]। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে মনোমোহন ও তাঁর পরিবারের সম্পর্ক বহু পুরোনো, তারই স্মৃতিচারণ করে তিনি ভাষণ শুরু করেন। ইংল্যান্ডে বাল্যকাল ও শিক্ষাজীবন কাটিয়ে সরকারি কলেজে ইংরেজির অধ্যাপকের পদ নিয়ে মনোমোহন ভারতে এসে প্রেসিডেন্সি ও ঢাকা কলেজে অধ্যাপনা করেন। কিন্তু কবি মানুষটি এখানকার ছাত্রদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে তুলতে পারেননি, ফলে তাঁর গোপনচারী কবিমনই ব্যথিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর ব্যক্তিজীবনের যন্ত্রণার কথা এই ভাষণে বলেননি। কিন্তু তাঁর বিবাহিত জীবনের অধিক সময়ই কেটেছে অসুস্থ স্ত্রীর সেবা ক'রে; ভালোবাসা ছিল বলে সেই জীবন দুঃসহ হয়নি, কিন্তু উদ্বেগপীড়িত সেই মানসিক অবস্থা নিশ্চয়ই কাব্যচর্চার অনুকূল নয় — সবাই তো আর রবীন্দ্রনাথ নন! সবশেষে তিনি বলেছিলেন : “তাঁর কাব্যের সঙ্গে আমার কিছু পরিচয় ছিল; তিনি প্রায়ই তাঁর কাব্য আমাকে শুনাতেন। আমি শুনে মুগ্ধ হতেম। তাঁর প্রত্যেক শব্দচয়নের মধ্যে একটা বিশেষ সৌন্দর্য ছিল— আশ্চর্য নৈপুণ্যের সহিত তিনি তাঁর কাব্যের রূপ দিয়েছিলেন। আমার আশা আছে এ-সকল কাব্য হতে সকল দেশের লোক আনন্দ পাবে— কেবল ‘গৌড়জন’ নহে— সমস্ত বিশ্বজন ‘তাহে আনন্দে করিবে পান সুধা নিরবধি’।”

পরদিন ২৭ ফাল্গুন [সোম 10 Mar] সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জ্যেষ্ঠা কন্যা মঞ্জুশ্রীর সঙ্গে ক্ষিতীশপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের বিবাহ হয়। ‘পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বেদী হইতে নব-দম্পতীকে সময়োপযোগী একটি সুন্দর উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন।’ এই দিনেই ‘শ্রীযুক্ত গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের অঙ্কিত “সাত ভাই চম্পা” নামক চিত্র-সহযোগে পরিণয়-উপহাররূপে রচিত’ ‘বধূমঙ্গল’ [‘ওগো বধূ সুন্দরী’] কবিতা বা গানটি রচনা করে রবীন্দ্রনাথ সম্ভবত মঞ্জুশ্রীকেই উপহার দেন— কবিতাটি ভাদ্র ১৩৩১-সংখ্যা প্রবাসী-তে [পৃ ৫৭৭] প্রকাশিত হয় [দ্র গীত ২। ৫০৫–০৬; স্বর ১]।

বিয়ের পরের দিন সকালবেলায় মঞ্জুশ্রী শ্বশুরবাড়ি গেলেন কাঁদতে কাঁদতে। সেই দৃশ্য দেখে মেয়েদের দাম্পত্যজীবনের সূচনাপর্ব নিয়ে রবীন্দ্রনাথের মনে যে দার্শনিক ভাবনার উদয় হল সেইদিনই সেটি ব্যাখ্যা করে লিখলেন রাণুকে :

…ওর কান্না দেখে বুঝতে পারি মেয়েদের পক্ষে প্রথম শ্বশুরবাড়ি যাওয়া বল্‌তে কতখানি বোঝায়। স্বামীর উপর কতখানি ভালোবাসা থাক্‌লে এই বন্ধন ছেদনটা সহজ হয় তা ঠিক বুঝতে পারা পুরুষদের পক্ষে শক্ত। মঞ্জুর এই কান্নাটা নিশ্চয়ই ক্ষিতীশের মনকে খুব বেদনা দিচ্চে, তার মনে হয়ত সংশয় হচ্চে মঞ্জু তাকে যথেষ্ট ভালোবাসে। কিনা। এই সংশয়ের উপর এই অনিশ্চয়ের উপরই মানুষের বড় বড় ট্র্যাজেডির পত্তন। … এইরকম আলোআঁধারে নিজের অগোচরেই যতরকম উৎপাতের সৃষ্টি হয়। আমি অনেকবার ভেবেচি মঞ্জু ক্ষিতীশকে ঠিক কতখানি ভালোবাসে? এ তো ভালোবাসার মরীচিকা নয়? মঞ্জুই কি তা ঠিক বল্‌তে পারে? উপস্থিতমত সে কি একটা মনে করে নিয়েছিল, তার পরে তার সত্যের পরীক্ষা ধীরে ধীরে হতে থাকবে। কিন্তু মোটের উপর একথা বলা যায় যে, দুজন মানুষের মধ্যে যদি অত্যন্ত বেশি পার্থক্য না থাকে তাহলে ক্রমে ক্রমে সংসার-বন্ধনের সঙ্গে সঙ্গে হৃদয়ের বন্ধনও পাকা হয়ে উঠ্‌তে থাকে। যখন পরস্পরের সুখ দুঃখ ও সাংসারিক ক্ষতিলাভকে একান্তভাবে অন্তরঙ্গভাবে আপন করে নিতেই হয় তখন তারই যোগসূত্র দু'জনকে ধীরে ধীরে এক করে' আনে। জীবনের সম্মিলন থেকেই হৃদয়ের সম্মিলন হতে থাকে। দুজনের সম্মিলিত জীবনের ঐক্যের ভিত্তির উপরেই সংসারের সৃষ্টি হয়। এই সংসারটিই হচ্চে মেয়েদের সৃষ্টিক্ষেত্র, এইখানেই তাদের সমস্ত শক্তি আপনাকে কল্যাণের মধ্যে সুন্দরের মধ্যে প্রকাশ করতে পারে বলে এইখানে যে-মানুষকে মেয়ে আপনার একমাত্র অংশীরূপে পায় তার মূল্য আপনিই তার কাছে বড় হয়ে ওঠে। মঞ্জু আজও তার নিজের সংসারটিকে সৃষ্টি করতে আরম্ভ করে নি বলেই তার মা বাপের সংসার ত্যাগ করে যেতে তার এত কষ্ট হচ্চে। কিন্তু যে-মুহূর্ত্তে তার আপন জীবন দিয়ে তার সংসার সৃষ্টি করতে পারবে, সেই মুহূর্ত্তেই তার বাপমায়ের সংসার তার কাছে ছায়ার মত হয়ে যাবে।[১৩৯]

এই চিঠিরই শেষাংশে তিনি লেখেন : 'কাল ভোরের গাড়িতে শান্তিনিকেতনে যাত্রা করব।' '২৯শে ফাল্গুন শ্রীযুক্ত কর্ত্তামহাশয় দিগরের কলিকাতা হইতে বোলপুর আগমন'-এর হিসাব থেকে জানা যায়, রবীন্দ্রনাথ কথার অন্যথা করেননি।

শনিবার [২ চৈত্র : 15 Mar] রাণুর মা সরযূবালাকে রাণুর ভাবী স্বামী হিসেবে সুসঙ্গের জমিদারপুত্র সুহৃদ সিংহের নাম সুপারিশ করে রবীন্দ্রনাথ লিখলেন : 'ছেলেটি সকল দিকে ভালো তার সন্দেহমাত্র নেই। কিন্তু ভালোকেই যে সব সময়ে ভালো লাগে এমন কোনো বাঁধা নিয়ম নেই। পৃথিবীতে সত্যকার ভালোবাসা দুর্লভ সে কথাও ভেবে দেখা চাই। ও রাণুকে ভালোবাসবে সুতরাং ওকে ভুল বুঝবে না— ওর মধ্যে যে দুর্দ্দমতা আছে তার সম্বন্ধেও অসহিষ্ণু হবে না। তাছাড়া সুহৃদ আমাকে সত্যই শ্রদ্ধা করে সুতরাং আমার সম্বন্ধে রাণুকে বোধ করি বেদনা দেবে না। মুস্কিল এই রাণুর জীবনের মাঝখানে কেমন করে আমি একটা কেন্দ্র দখল করে বসে আছি, সুতরাং ওর যেখানেই গতি হোক্ আমাকে সম্পূর্ণ বাদ দিয়ে চলবে না তাতে সমস্ত ব্যাপারটা জটিল হয়ে উঠেচে। সেই জট যদি ছাড়ানো সম্ভব হত তাহলে সবই সোজা হত। কিন্তু বেদনা পেতে [ও] যেরকম অসাধারণ পটু তাতে ওকে কাঁদাতে আমার মন সরে না। ওকে সম্পূর্ণ সান্ত্বনা দেবার পথ আমার হাতে নেই— তবে কিনা আমার অন্তরের স্নেহ পাবার পক্ষে ওর কোন ব্যাঘাত না হয় এই সম্ভাবনার কথাই আমি আশা করতে পারি। যার জন্যে আমার মনে খুব একটা উৎকণ্ঠা আছে সেই জন্য একটি যথার্থ ভদ্রলোকের হাতে ওকে দিতে পারলে আমি সুখী হই।'[১৪০] রাণুকে লেখা চিঠির দার্শনিকতার পটভূমিকা বোঝার পক্ষে বর্তমান পত্রটি যথেষ্ট সহায়ক হতে পারে।

রাণু হয়তো লিখেছিলেন, রবীন্দ্রনাথ চিনে না গেলে তিনি তাঁকে অনেক বেশি সময় কাছে পেতেন। রবীন্দ্রনাথ প্রত্যুত্তরে ৩০ ফাল্গুন তাঁকে, যে-চিঠিটি লেখেন সেটি উভয়ের সম্পর্ক ও এই সম্পর্ক সম্বন্ধে তাঁর মনোভাব বোঝার পক্ষে খুবই মূল্যবান :

আমাকে চীন থেকে যে নিমন্ত্রণপত্র পাঠিয়েচে সে বোধহয় তুমি পড়ে দেখেচ। আমাকে ওরা কত আদর করে ডেকেচে আর আমার কাছে কত প্রত্যাশা করেচে। আমি তাদের এই প্রত্যাশা পূরণের যোগ্য কিনা জানিনে, কিন্তু স্পষ্টই ত দেখ্‌তে পাচ্চি আমার উপরে এই কাজেরই ভার পড়েচে। … তোমাকে যে এই কথাটা আজ লিখ্‌চি তার মানে হচ্চে এই যে, আমি বল্‌তে চাই এতে তুমি আনন্দিত হও। তুমি বিধাতার উপরে ঈর্ষা কোরো না। বোলো না তোমার ভানুদাদাকে যদি নিজের কাজে তিনি দেশে বিদেশে ঘুরিয়ে না বেড়াতেন তাহলে হয়ত তুমি তাকে আরো অনেকটা সময় কাছে পেতে। কিন্তু সেই ফাঁকা ভানুদাদাকে কাছে পেয়েই বা লাভ কি। বিধাতার বরখাস্ত করা সেই ভানুদাদা ত নিতান্তই বাজে লোক। … সে হচ্চে সকাল বেলাকার আলো-নেবানো বাতি— নিতান্ত নিরর্থক। … চীন আমাকে না ডাক্‌লে বেশ হত এমন কথা তুমি মনে মনেও বোলো না।

আমাকে খর্ব্ব করে' তাতে ত তোমার লাভ নেই— বরঞ্চ তাতে তোমার ভানুদাদার অনেকখানিই বাদ গেল বলে তোমার সেটা লোকসান। ··· তোমার কাছে থাকবার দ্বারাই তুমি যে আমাকে বেশি পাবে সে তোমার ভুল। আমাকে জগতের লোকের মধ্যে ছড়িয়ে পাও যদি তাহলেই তুমি সবচেয়ে বেশি পাবে। ··· তুমি যদি ভানুদাদাকে ভালোবাসো তাহলে তার এই সার্থকতাকে তুমি অভিনন্দন কর— যাতে সে সঙ্কীর্ণ পরিধির মধ্যে সঙ্কুচিত হয়ে, ক্ষুদ্রতার ভারে ভারাক্রান্ত হয়ে, অবসন্ন হয়ে না থাকে সেই কামনা কর। সেই কর্ম্ম সত্যই আমার, সেই কর্ম্মেই আমার মুক্তি— সেই মুক্তির মধ্যে যখন আমি নিজেকে দেখি তখনই আমার জীবনের আকাশ প্রসন্ন হয়ে ওঠে— আমার জীবনের প্রসন্নতায় তোমার চিত্ত প্রসন্ন হোক — আমার সঙ্গ পাওয়ার চেয়েও তাতে তুমি আমাকে অনেক বেশি করে পাও এই আমি কামনা করি।[১৪১]

রাণু ও রবীন্দ্রনাথের সম্পর্কের সঙ্গে কাদম্বরী দেবী ও তাঁর সম্পর্কের এক ধরনের সাদৃশ্য অনুমান করেছেন এল্‌ম্‌হার্স্ট, এবং হয়তো-বা কৃষ্ণ কৃপালনি ও আরও কেউ-কেউ। কাদম্বরী দেবী ও রাণু রবীন্দ্রনাথকে অবশ্যই ভালোবাসতেন— নারীর ভালোবাসা রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা বিকাশের পক্ষেও আকাঙ্ক্ষিত ছিল, কিন্তু সেই ভালোবাসা যখন নারীর দিক থেকে সর্বগ্রাসী হয়ে উঠতে চেষ্টা করেছে, রবীন্দ্রনাথ তখন পীড়া বোধ করে বন্ধনমুক্তির আকাঙ্ক্ষায় চঞ্চল হয়ে উঠেছেন। অবশ্য কাদম্বরী দেবী বা রাণুর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সম্পর্কের মধ্যে কোনো সাদৃশ্যের অনুমান, অন্তত রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে, আমাদের মতে নিছকই কষ্টকল্পনা— আর তার সম্ভাবনামাত্রেই তিনি কতটা সতর্ক হয়ে উঠেছেন উদ্ধৃত পত্রগুলি তার অন্যতম প্রমাণ।

কলকাতা থেকে চিন রওনা হবার দিন ধার্য হয়েছিল 21 Mar 1924 [শুক্র ৮ চৈত্র]। ২ চৈত্র রবীন্দ্রনাথ রাণুকে লিখলেন, তিনি চিনের লেকচার লেখার জন্য তখনও আশ্রম ত্যাগ করেননি। কাশীতে রাণুদের বাড়িতেই তিনি লেখা শুরু করেছিলেন, কিন্তু রাণুর উৎপাতে তিনি কেবল চার পাঁচ পাতা লিখতে পেরেছিলেন। এখানেও যে সেই কাজ বিশেষ এগোচ্ছে না তার কারণ, 'তুমি যেমন, তেম্‌নি তোমার একটি জুড়ি আছে সে থাকে আমার মস্তিষ্কের ভিতরে— সেটি হচ্চে আমার কবিতা, আমার গান। সেও যখন জানে আমি চীনের লেকচার লিখ্‌তে বসেছি অমনি বন্ধ দরজা ঠেলে ডাক দেয় "কবি!"— আমি বলি, "থাক, এখন থাক্‌, ব্যস্ত আছি।" সে আবার বলে, "কবি, একবার দরজা খোলো, আমি একটুখানি থেকেই চলে যাব।" তখন দিই দরজাটা খুলে— তারপরেই সে আমার মনটি দখল করে বসে, আর গুন্‌গুন্‌ তার গুঞ্জন চল্‌তে থাকে। সে তার কথা রক্ষা করে, একখানা গান হতেই সে চলে যায়। কিন্তু চলে গেলে হবে কি, মাথার মধ্যে গুন্‌গুন্‌ থামতে চায় না— চীনের লেকচারটার আর উপায় থাকে না।' ফাল্গুন মাসে তাঁর লেখা গান ও কবিতার বিবরণ আমরা আগেই দিয়েছি, অনুমান করা হয়েছে নিম্নোল্লিখিত তিনটি গানও এই মাসে লেখা[১৪২]:

'দিনশেষের রাঙা মুকুল জাগল চিতে' দ্র গীত ২। ৩১১; স্বর ৩১;

'এবার অবগুণ্ঠন খোলো' দ্র গীত ২। ৪৯১; স্বর ৩০;

'যে কেবল পালিয়ে বেড়ায়' দ্র গীত ২। ৫৮০–৮১; স্বর ৩০।

আরও একটি গানের কথা আমরা শীঘ্রই জানতে পারব।

পত্রটির শেষাংশে রবীন্দ্রনাথ জানালেন : 'মিস্‌ গ্রীন এবারে দেশে চলে যাচ্চে। আমাদের সঙ্গে চীন পর্য্যন্ত যাচ্চে। তার পরে যাবে আমেরিকায়। আজ তার বিদায়ের অনুষ্ঠান হ'ল। লাইব্রেরি ঘরের বারান্দার পরে আলপনা কেটে, ফুল দিয়ে সাজিয়ে, শাঁখ বাজিয়ে, মেয়েদের হাতে তাকে বরণ করিয়ে দামী একটি ময়ূরকণ্ঠী সিল্কের শাড়ি অর্ঘ্য দিয়ে বেশ একটু ধুমধাম করা হল। মেয়েরা গাইলে, "ভরা থাক্‌ ভরা থাক্‌" ইত্যাদি। শেষে একটা গান গাওয়ানো হল, তার আরম্ভটা হচ্চে এইরকম—

"পাগল যে তুই, কণ্ঠ ভরে' জানিয়ে দে তাই সাহস করে।"

ওটা আর কিছু নয়, নিজের পরিচয়টা ঘোষণা করে দিলুম।'[১৪৩]

'পাগল যে তুই' গানটি যে এই সময়ে লেখা সেটি এই সূত্রে জানা গেল দ্র গীত ২। ৫৫৪; স্বর ৩১।

গ্রেচেন গ্রিন তাঁর আত্মজীবনীতে ঘটনাটির বিবরণ দিতে গিয়ে লিখেছেন : 'In front of the white columns of the library, an Eastern audience hall was set for the ceremony of *Baroni* (acceptance), performed for me because I am accepted in India. I stood before the poet in the centre of a circle, seven women in scarlet saris circling round me to purify with water and fire. They bore offerings on a petah (gift dish) of rice-grains and fruit, a red marriage sari and a wedding bracelet of carved iron. The Poet spoke words of welcome and gave me a crystal amulet, the girls sang songs of evening, and the full moon looked on.'[১৪৪] গ্রেচেন 'বরণ' ও 'পাটা' দুটি বাংলা শব্দ একটু ভুল বানানে লিখেছেন।

রবীন্দ্রনাথ রাণুকে লিখেছিলেন : 'পরশু মঙ্গলবার [৫ চৈত্র : 18 Mar] বিকেলের গাড়িতে কলকাতা যাত্রা করব।' এই উপলক্ষে তিনি মন্দিরে উপাসনা করেন, সেটির অনুলেখন 'মন্দির / বুধবার [য] ৫ই চৈত্র, ১৩৩০। / (চীনযাত্রার পূর্ব্বদিন)' নামে ভাদ্র ১৩৩১-সংখ্যা শান্তিনিকেতন-এ মুদ্রিত হয়, স্পষ্টতই শিরোনামে একাধিক ভুল দেখা যাচ্ছে। 'আপনাকে এই জানা আমার ফুরাবে না' গানটি দিয়ে উপাসনার সূত্রপাত করে রাণুকে লেখা চিঠির সুরেই রবীন্দ্রনাথ দূরদেশে যেতে ছোটো-আমির বাধা ও সংকোচের কথাই বললেন। অবশ্য ভাষণটি তিনি শেষ করলেন বড়ো কিছু পাবার আশা ব্যক্ত করে : 'সমস্ত বিশ্বকে এখানে নীড় করব, সমস্ত বিশ্ব এখানে একনীড় হবে, তা হলে মানুষের মধ্যে সেই অসীমকে, সেই ভূমাকে উপলব্ধি করব। বাহিরের সঙ্গে যাওয়া আসার পথ প্রশস্ত করতে পারলে, নির্ম্মল প্রাণপরিপূর্ণ হাওয়া সব কলুষ দূর করবে, চিত্তভূমিতে যে সব প্রাণের চেষ্টা অঙ্কুরিত হচ্ছে তাতে ফুল ফুটিয়ে তুল্‌বে এই আশা নিয়ে আমার ছোট আমিকে এখানে ফেলে রেখে যেন যেতে পারি, বিদায়ের পূর্ব্বে এই আমার একান্ত প্রার্থনা।'

যাত্রার আগের দিন সন্ধ্যায় বিশ্বভারতী সম্মিলনীর উদ্যোগে আলিপুর আবহাওয়া অফিসের বিস্তৃত প্রাঙ্গণে প্রায় ৫০০ জন প্রাচ্য-পাশ্চাত্য অতিথির উপস্থিতিতে রবীন্দ্রনাথকে বিদায়-সংবর্ধনা জানানো হয়। 'স কশ্চিৎ কিল কালোহভূদদ্ভুদয়োজ্জ্বলঃ' ইত্যাদি ১৪ ছত্রের ৭টি শ্লোকে 'পরমপূজনীয় আচার্য্য রবীন্দ্রনাথের চীনযাত্রা উপলক্ষ্যে আহূত সভায় পঠিত অভিনন্দনপত্র' তাঁকে অর্পণ করা হয়। বিশ্বভারতীর পক্ষে চিনবাসিকে উপহার প্রদানের জন্য সংস্কৃত ভাষায় লিখিত ১৪ ছত্রের ৫টি শ্লোকও তাঁকে দেওয়া হয়। আনন্দবাজার পত্রিকা [১০ চৈত্র] লেখে : 'গত বৃহস্পতিবার বিশ্বভারতী সম্মিলনীর বিদায় অভিনন্দন সভায় কবি তাঁহার ভ্রমণের উদ্দেশ্য ব্যক্ত করিয়াছেন। তিনি সুদূর প্রাচ্যে ভারতের বাণী বহিয়া লইয়া যাইবেন। তিনি সুদূর প্রাচ্যের সহিত ভারতের শিক্ষা-সভ্যতা ও ধর্ম্মগত সম্বন্ধ পুনঃসংস্থাপন করিবার চেষ্টা করিবেন। বৌদ্ধ ও সংস্কৃত সাহিত্যের মধ্য দিয়া এক সময়ে ঐ সকল দেশ ও ভারতের মধ্যে একতা স্থাপিত হইয়াছিল। যাহাতে বৌদ্ধ ও সংস্কৃত সাহিত্যের চর্চ্চা নূতন করিয়া আরম্ভ হয়, তিনি তাহার জন্য চেষ্টা করিবেন।'[১৪৫] *The Statesman* [21 Mar] লেখে : 'Light refreshments and a conversazione followed. The occasion was used by the Marcony Company, who broadcasted a concert from Temple Chambers, and the whole gathering listened in.'

৮ চৈত্র [শুক্র 21 Mar] সকাল সাতটায় বিলিতি জাহাজ 'ইথিওপিয়া'য় রবীন্দ্রনাথ চিনের উদ্দেশে সপার্ষদ সিঙাপুর রওনা হন। তাঁর সঙ্গে ছিলেন গ্রেচেন গ্রিন, এল্‌ম্‌হার্স্ট, ক্ষিতিমোহন সেন, নন্দলাল বসু, কালিদাস নাগ ও লিমডির রাজকুমার ঘনশ্যাম সিংজি। আনন্দবাজার পত্রিকা-র পূর্বোদ্ধৃত সংবাদে আছে : 'পিকিং বিশ্ববিদ্যালয় [লেকচার অ্যাসোসিয়েশন] রবীন্দ্রনাথের চীন ভ্রমণ ও তথা হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের খরচ বহন করিবেন। কবির অন্যান্য দেশ ভ্রমণের ব্যয় ও পণ্ডিত ক্ষিতিমোহন শাস্ত্রীর পাথেয় খরচ নির্ব্বাহার্থ বাবু যুগলকিশোর বিড়লা দশ সহস্র মুদ্রা দান করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত রাজা বলদেও দাস বিড়লা ও বাবু যুগলকিশোর বিড়লা ইতিপূর্ব্বেই বিশ্বভারতীতে যথাক্রমে ২০,০০০৲ ও ৩০০০৲ টাকা দিয়াছেন। শ্রীযুত নন্দলাল বসুর পথ খরচ আংশিক বিশ্বভারতী ও আংশিক ভারতীয় চিত্র-শিল্পের উন্নতিকামী ব্যক্তিদিগের অর্থ সাহায্য হইতে নির্ব্বাহ করা হইবে।' এল্‌ম্‌হার্স্ট ও গ্রেচেনের খরচ ডরোথি স্ট্রেট-প্রদত্ত সুরুল ফান্ড থেকে দেওয়া হয়। লিমডির রাজকুমার নিজব্যয়ে সহযাত্রী হয়েছিলেন। বিশ্বভারতী-সচিবের এই সংবাদ দেবার সময় ঠিক ছিল, রবীন্দ্রনাথ এই যাত্রায় চিন ছাড়াও জাপান, ইন্দোচিন, কম্বোডিয়া, শ্যাম ও জাভা ভ্রমণ করবেন। কিন্তু এবারে চিন ও জাপান ছাড়া অন্য দেশগুলি ভ্রমণ সম্ভব হয়নি।

আমরা আগেই বলেছি, রাণুকে লেখা রবীন্দ্রনাথের ২৯ পৌষ ১৩২৯ [11 Jan 1923] তারিখের চিঠি থেকে জানা যায়, চিন দেশ থেকে এক ভদ্রলোক এসে তাঁকে অনুরোধ করেন সেখানকার যুবকদের আগ্রহে তাঁকে অক্টোবর, নভেম্বর ও ডিসেম্বর তিন মাস উত্তর ও দক্ষিণ চিন ভ্রমণ করতে হবে [দ্র রবিজীবনী ৮। ২৪৮]। এল্‌ম্‌হার্স্ট যখন চিনে গেলেন, রবীন্দ্রনাথ তাঁকে বলেছিলেন এই আমন্ত্রণ সম্পর্কে খোঁজখবর নিতে। লেনার্ড নিশ্চয়ই তাঁকে কোনো ইতিবাচক সংকেত পাঠিয়েছিলেন, তার উত্তরে রবীন্দ্রনাথ তাঁকে ও আমন্ত্রণকর্তা লেকচার অ্যাসোসিয়েশনকে দুটি কেবলগ্রাম প্রেরণ করেন। দ্বিতীয়টি লক্ষ্যভ্রষ্ট হলেও লেনার্ড তাঁকে পাঠানো বার্তাটি উক্ত প্রতিষ্ঠানের সেক্রেটারিকে দেখালে তিনি [E. C. Tsiang] 6 Jun 1923 [২৩ জ্যৈষ্ঠ ১৩৩০] রবীন্দ্রনাথকে লেখেন :

We just received from Mr. Elmhirst your cablegram to him and are exceedingly happy to know that you are already arranging to come over. We have a suspicion that you might have replied us directly as well, but as we didn't give sufficient address the message might have miscarried somehow or other. In any case we are glad that you have made up your mind to visit China, and the news has proved a tremendous joy to all your admirers already. We are expecting your arrival either end of July or beginning of August. Please let us know the exact date directly you have booked your passage. We are to remit you, by cable, the sum of $1000, in a day or two, to cover the expenses of your first voyage.

Address for cable : "Liangchichas Nanchangchieh Peking".[১৪৬]

এরপরে বিসর্জন অভিনয়, রবীন্দ্রনাথের অস্বাস্থ্য ইত্যাদি কারণে অনেকদিন প্রসঙ্গটি নিয়ে কিছু শোনা যায়নি। অক্টোবরে যুগলকিশোর বিড়লার অর্থসাহায্যের প্রস্তাবকে কেন্দ্র করে বিষয়টি আবার আলোচিত হতে থাকে। 18 Oct *North China Star* 'Indian Philosopher Will Lecture In Peking Next Spring'

শিরোনামে একটি সংবাদ পরিবেশন করে জানায়, রবীন্দ্রনাথ পিকিং বিশ্ববিদ্যালয়ের আহ্বানে আগামী মার্চ মাসে এক মাস সেখানে থেকে বক্তৃতা করবেন। মাদ্রাজি পত্রিকা *Swarajya* [11 Nov] সতর্কবাণী উচ্চারণ করে : 'The newspapers report that Rabi Babu's visit to China will do no good either to himself or the Chinese, as the political conditions are so unsettled, and the bandits so active all over China that the people will not listen to the author of Gitanjali. Besides the Chinese are downright materialists today, and Rabi Babu's idealism, which does not promise gold, opium, and concubines is not likely to appeal them.' ঘটনাপ্রবাহ প্রমাণ করেছে, স্বরাজ্য-এর সতর্কবাণী সম্পূর্ণ অমূলক ছিল না— কিন্তু আমেরিকা ও ইংল্যান্ডে শিক্ষিত আধুনিক চৈনিক কবি Hsu Chi-mo [Tsemon Hsu, 1896–19 Nov 1931] 27 Dec [১১ পৌষ] রবীন্দ্রনাথকে একটি চিঠি লিখে অন্যান্য কথার সঙ্গে এই বক্তব্যের প্রতিবাদ করেন :

...Perhaps India is not well informed of the literary news in China. We have been doing well in preparing ourselves in welcoming you when you arrive. Nearly all the leading magazines here have published articles on you and special numbers are issued in honor of your visit. Most of your works in English have appeared in Chinese translation, some in more than one version. Never before has a single writer, Eastern or Western, excited so much genuine interest in the heart of our young nation, and few, not even our ancient sages perhaps, have gifted us with such a vivid and immense inspiration as you have done.... Your poems have colored our ways of thinking and feeling; have revealed new possibilities in our otherwise rigid and lurid language. If a creative writer is one whose words have a power to quicken the heeart-beats of the reader and exalt the state of his soul, I have known no better illustration than yourself in the present instance. That is why we so eagerly covet your presence : a presence, we believe, which will lend comfort and calm and joy to this age of gloom and doubt and agitation : a presence which will further strengthen our faith and hope in larger things in life, which you have helped to instal into our minds.

...One needn't take the newspaper accounts of politics, in China as elsewhere, too seriously. They are nearly always exaggerations, when not flat lies.[১৪৬]

আনন্দবাজার পত্রিকা-য় [৯ ফাল্গুন] পত্রটির বঙ্গানুবাদ মুদ্রিত হয় [দ্র রবীন্দ্র-প্রসঙ্গ ১। ৪৯৬–৯৭]।

বস্তুত শু চি মো [সু সী-মো]-র দেওয়া তথ্যও অতিরঞ্জিত ছিল না। আসলে সমকালীন চিনের সংকট অন্যান্য কারণের সঙ্গে নিহিত ছিল পরস্পরবিরোধী দুই আদর্শবাদের সংঘর্ষের মধ্যে। বিভিন্ন বিদেশি শক্তির শোষণে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক দিক দিয়ে জীর্ণপ্রায় চিনের তৎকালীন অবস্থার জন্য সোভিয়েত রাশিয়ার সাম্যবাদের আদর্শে দীক্ষিত বুদ্ধিজীবী ও যুবসমাজের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ দায়ি করছিলেন

পুরাতনপন্থী সমাজব্যবস্থা ও আদর্শকে। শিশিরকুমার দাশ ও তান ওয়েন-রচিত 'বিতর্কিত অতিথি' [১৩৯২] গ্রন্থে এই সংঘর্ষের চিত্রটি সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। তাঁরা লিখেছেন :

রবীন্দ্রনাথ যখন চীনে যান তখন সমস্ত দেশের ওপর দিয়ে বয়ে চলেছে পরিবর্তনের ঝোড়ো হাওয়া। তার কয়েক বছর আগে থেকে শুরু হয়েছে ভাষা ও সাহিত্যে এক অভূতপূর্ব বিপ্লব। গত পাঁচ সাত বছর ধরে নতুন শিক্ষিত সমাজ চাইছিল আমূল পরিবর্তন— ভাষায়, লিখনরীতিতে, ধর্মচিন্তায়, সমাজে, রাজনীতিতে। কয়েক বছর আগেই [1919] ঘটেছে চৌঠা মে-র ঐতিহাসিক আন্দোলন। ইতিমধ্যেই প্রতিষ্ঠিত চীনা কমিউনিস্ট পার্টি [1921]। দক্ষিণপন্থী এবং বামপন্থী উভয়দলের চিন্তাশীলেরাই চাইছেন সামাজিক এবং রাজনৈতিক পরিবর্তন। এই পরিবর্তনকে ত্বরান্বিত করবার জন্য একদল চাইছেন দেশকে দ্রুত শিল্পায়িত করতে। যন্ত্রের সাহায্যে প্রাচীন জড়তাকে ভাঙতে, প্রাচীন ধর্মচিন্তাকে সম্পূর্ণ নির্মূল করতে। ··· চীনের নতুন সমাজ শিক্ষা-দীক্ষা পেয়েছিলেন হয় জাপানে, নয় ইউরোপে-আমেরিকায়। তাঁরা লক্ষ্য করেছিলেন যন্ত্রশিল্পের সাহায্যে জাপান অর্জন করেছিল বিপুল সামরিক শক্তি (চীনকে সেই শক্তির প্রধান ভুক্তভোগী হতে হয়েছিল), অর্থনৈতিক উন্নতিতে হয়ে উঠছিল ইউরোপীয় দেশগুলির সমকক্ষ। জাপানের অগ্রগতির দিকে তাকিয়ে চীনের বুদ্ধিজীবী বুঝেছিলেন চীনকে যদি শক্তিমান হতে হয়, তাকে হতে হবে যন্ত্র-নির্ভর, যন্ত্রই তাকে দিতে পারে আধ্যাত্মিক জড়তা থেকে মুক্তি। ··· পাশ্চাত্য দর্শনের মধ্যে বিশেষভাবে জন ডিউই এবং বার্ট্রাণ্ড রাসেলের চিন্তাধারা একদলকে অনুপ্রাণিত করেছিল কনফুশিয়াস-শাসিত চিন্তাধারার আমূল পরিবর্তনে। আরেক দলের ওপর পড়েছিল বিশেষভাবে রুশ বিপ্লব ও মার্ক্সীয় দর্শনের প্রভাব। চৌঠা মে-র আন্দোলনের পর থেকেই শুরু হয় অসংখ্য সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের উদ্ভব, বিদেশী সাহিত্যের অনুবাদ (রবীন্দ্রসাহিত্য তার একটি), মার্ক্সীয় চিন্তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় এবং তীব্র রাজনৈতিক চেতনার জাগরণ।[১৪৭]

1921-এ চিনা কম্যুনিস্ট পার্টির প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। কিন্তু রবীন্দ্ররচনার ইংরেজি অনুবাদের সঙ্গে চিনের বুদ্ধিজীবী ও তরুণদের পরিচয়ের সূত্রপাত ঘটেছিল সেগুলি প্রকাশের কিছুদিন পর থেকেই, আর তাঁর ইংরেজি রচনার চিনা অনুবাদ আরম্ভ হয় 1915 -এ। তারপরে 1922 পর্যন্ত তাঁর কাব্যগ্রন্থ, নাটক, উপন্যাস, প্রবন্ধাদির চিনা অনুবাদ করা হয়েছে— কখনো-বা একাধিকবার। তাঁর রচনার প্রভাবও পড়েছে চিনা সাহিত্যে, বিশেষত কবিতায়। শিশিরকুমার দাশ ও তান ওয়েন 'বিতর্কিত অতিথি' গ্রন্থে এইসব অনুবাদ ও তার প্রভাব নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা করেছেন। কিন্তু গত এক শতাব্দী ধরে মার্ক্সবাদী চিন্তাভাবনা ও কার্যধারার যে-পরিচয় পাওয়া গেছে, তার প্রধান বৈশিষ্ট্যই হল মার্ক্সবাদ ছাড়া অন্য কোনো মতবাদ ও তার প্রভাবকে অকারণ সন্দেহ ও নিন্দা করা এবং পরবর্তীকালে তার জন্য ভুল স্বীকার করে ক্ষমা ভিক্ষা। রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রেও তা-ই হয়েছে। যাঁরা আগে রবীন্দ্ররচনায় মুগ্ধ হয়ে অনুবাদ ও প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়েছিলেন, তাঁরাই মার্ক্সবাদে দীক্ষিত হয়ে তাঁর নিন্দায় প্রবৃত্ত হয়েছেন এবং সন্দিহান হয়ে উঠেছেন বিশেষ করে যাঁরা তাঁকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন তাঁদের উদ্দেশ্য সম্পর্কে। চিনা তরুণদের একাংশের বিক্ষোভকে এই পরিপ্রেক্ষিতে দেখতে হবে। এল্‌ম্‌হার্স্ট এদেশে ফিরে আসার পরে তাঁর দেওয়া বিবরণে রবীন্দ্রনাথের কাছে চিনের তৎকালীন রাজনৈতিক-সাহিত্যিক দ্বন্দ্ব ও জটিলতার রূপটি অবশ্যই অস্পষ্ট ছিল না, তাই চিনের জন্য বক্তৃতা লিখতে গিয়ে তিনি খুবই আলস্যবোধ করছিলেন। বস্তুত চিনের জনসাধারণের, বিশেষত সেখানকার ছাত্র ও যুবসমাজের জন্য তিনি নিজের ও ভারতের পক্ষ থেকে কোন বাণী বহন করে নিয়ে যাবেন তা নিয়ে রবীন্দ্রনাথ খুবই দ্বিধাগ্রস্ত ছিলেন। এই দ্বিধার পরিচয় আছে রম্যাঁ রলাঁকে লেখা তাঁর 28 Feb ['ভারতবর্ষ' গ্রন্থে 21 Feb] তারিখের চিঠিতে :

...I myself have a kind of civil war constantly going on in my own nature between my personality as a creative artist who necessarily must be solitary and that as an idealist who must realise himself through works of a complex character needing a large field of collaboration with a large body of men.... I suppose a proper rhythm is possible to be attained in which both may be harmonised, and my work in the heart of the crowd may find

its grace through the touch of breath that comes from the solitude of the creative mind.... I earnestly hope that I shall be rescued in time before I die. In the meantime I go to China, in what capacity I do not know. Is it as a poet, or as a bearer of good advice and sound common sense?[১৪৮]

৭ চৈত্র [20 Mar] আলিপুর আবহাওয়া অফিসে অনুষ্ঠিত বিদায়সভায় রবীন্দ্রনাথ তাঁর ভাষণে বলেন, তাঁর বিদায়কালে এতজন বন্ধুর সমাগমে তিনি অভিভূত এবং এর ফলে তিনি যথেষ্ট আত্মবিশ্বাসও পাচ্ছেন। তাঁর বয়স বাড়ছে, স্বাস্থ্যও ভালো নয়, সুতরাং দূর ভ্রমণ এখন তাঁর কাছে কষ্টকর। তবু চিনের আমন্ত্রণ যখন তাঁর কাছে পৌঁছল তখন তিনি তা প্রত্যাখ্যান করতে পারলেন না— তাঁর মনে হল, এই আমন্ত্রণ ভারতের কাছে ও ভারতসন্তান হিসেবে তাঁকে তা স্বীকার করতেই হবে। দরিদ্র ভারতের কোনো ঐহিক ঐশ্বর্য নেই, কোনো রাজনৈতিক মর্যাদা নেই, গর্ব করার মতো কোনো সামরিক সাফল্য নেই। বস্তুর প্রভূত উৎপাদনে নয়, শক্তির প্রতিযোগিতায় নয়, ভারত জানে আধ্যাত্মিক শক্তির জোরেই সভ্যতা চরম পরিণতি লাভ করতে পারে — সে সর্বমানবের ঐক্যে বিশ্বাস রাখে, সে জোরের সঙ্গে বলতে পারে সর্বভূতের মধ্যে ঐক্যকে যে বোধ করতে পারে সে-ই সত্যকে জানে। তাঁর জানা নেই কোন্ প্রত্যাশা নিয়ে চিন তাঁকে ডেকেছে, কিন্তু তিনি এইটুকু জানেন এই বাণীই তাঁকে বহন করে নিয়ে যেতে হবে। এ এক গুরু দায়িত্ব, কিন্তু বন্ধুদের শুভেচ্ছা তাঁকে সাহস দিয়েছে। তাঁর বিশ্বাস তাঁদের ভ্রমণ চিন ও ভারতের মধ্যে সুপ্রাচীন সাংস্কৃতিক ও আধ্যাত্মিক সম্পর্কের পুনরুদ্ধার করতে পারবে। উভয় দেশের মধ্যে শিক্ষক ও ছাত্রবিনিময়ের ব্যবস্থা যদি তাঁরা প্রতিষ্ঠা করতে পারেন তা হলেই তাঁদের ভ্রমণ সার্থক হবে।[১৪৯] আর সেইজন্যই তিনি নন্দলাল বসু, ক্ষিতিমোহন সেন ও কালিদাস নাগকে সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন— যাতে তাঁরা চিনের প্রাচীন ও আধুনিক শিল্পকলা, দর্শন ও সংস্কৃতিকে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার মাধ্যমে বুঝে নিতে পারেন ও এইসব ক্ষেত্রে উভয় দেশের মধ্যে যোগসূত্র রচনায় সক্ষম হন।

আগেই বলা হয়েছে, রবীন্দ্রনাথ সদলবলে ৮ চৈত্র [শুক্র 21 Mar] সকালে আউটরাম ঘাট থেকে British India Steam Navigation Co.-র 'Ethiopia' জাহাজে চিনের পথে সিঙাপুরের উদ্দেশে রওনা হন। আমেরিকান গবেষক Stephen N. Hay লিখেছেন : 'Tagore and his party sailed from Calcutta on the Japanese passenger freighter *Atsuta Maru*'[১৫০] — তথ্যটি অবশ্যই ভুল।

পরের দিন যাত্রার বর্ণনা দিয়ে রবীন্দ্রনাথ রাণুকে লিখলেন : 'কাল সকাল বেলায় গঙ্গার ঘাটে এসে জাহাজে উঠ্‌লুম। তোমার বাবা ছিলেন আরো অনেক লোক আমাকে বিদায় করবার জন্যে ভিড় করেছিলেন। ··· জাহাজ প্রায় নটার সময় ছাড়ল। সেই আমাদের পুরোণো গঙ্গাতীর— এই তীর ছেলেবেলায় আমাকে কতদিন কি গভীর আনন্দ দিয়েচে। ··· কাল দোলপূর্ণিমা গঙ্গার উপরেই দেখা দিল। জাহাজ বালির চরে আট্‌কে গিয়েছিল। তাই জোয়ারের অপেক্ষায় রাত্রি সাতটা পর্যন্ত আট্‌কা পড়ে ছিল। সমুদ্রে যদি দোল পূর্ণিমার আবির্ভাব হ'ত তা হলেই তার নাম সার্থক হত— তাহলে দোলনও থাকত, আর নীলের সঙ্গে শুভ্রের,

সাগরের সঙ্গে জ্যোৎস্নার মিলনও দেখ্‌তুম। আজ ভোরে উঠে দেখ্‌লুম জাহাজ কূলরেখাহীন জলরাশির উপরে ভেসে চলেছে— "মধুর বহিছে বায়ু।" আজ শনিবার। সোমবারে শুন্‌চি রেঙ্গুনে পৌঁছব।'[১৫১]

রবীন্দ্রনাথের ভ্রমণসঙ্গীদের একটি দায়িত্ব ছিল, পথিমধ্যে রথীন্দ্রনাথকে পত্র লিখে রবীন্দ্রনাথের সংবাদ পাঠানো। এল্‌ম্‌হার্স্ট ছিলেন রবীন্দ্রনাথের সেক্রেটারি, তিনি মাঝেমাঝেই রিপোর্ট পাঠিয়েছেন এবং সেই রিপোর্ট অবলম্বনে ও সঙ্গে পাঠানো সংবাদপত্রের কর্তিকা থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে *Visva-Bharati Bulletin*-এর প্রথম দুটি খণ্ড সংকলিত হয়েছিল। তাছাড়া রবীন্দ্রনাথের বক্তৃতার নোট নেওয়া ও সেগুলিকে টাইপ করার কাজও ছিল তাঁর। এই ব্যবস্থানুযায়ী ক্ষিতিমোহন জানাচ্ছেন, এইদিনই রবীন্দ্রনাথ চিনের বক্তৃতা রচনায় হাত দিয়েছেন, 23 Mar [১০ চৈত্র] 'বল্লেন প্রথম বক্তৃতাটা বড় হয়েছে। তাকে ছেঁটে সেই ছাঁটা মশলা দিয়ে দোসরা বক্তৃতা' রচনা করবেন।

কালিদাস নাগ ডায়ারি রাখতেন, সংক্ষেপে লেখা হলেও এতে যাত্রার অনেক খুঁটিনাটি বিবরণ রক্ষিত আছে — এগুলি তাঁর 'কবির সঙ্গে একশো দিন' [১৩৯৪] গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে। এই নোট অবলম্বনে তিনি বঙ্গবাণী-তে 'পূবের চিঠি', মডার্ন রিভিয়্যু-তে 'Rabindranath Tagore's Visva-Bharati Mission' [Sep 1924/ 288–301] ও *Tagore and China* [1945] প্রভৃতি বিবরণী সংকলন করেন।

আমরা জানি, প্রত্যেকটি বিদেশ ভ্রমণের পদচিহ্ন রবীন্দ্রনাথ নিজেই এঁকে যেতেন বিভিন্ন জনকে লেখা চিঠিতে বা ডায়ারিতে। কিন্তু বর্তমান ভ্রমণের এইরূপ কোনো উপকরণ এতকাল না পেয়ে আশ্চর্য লাগত। এখন রাণু অধিকারীকে লেখা চিঠিগুলি আয়ত্তে আসায় সেই অভাব পূর্ণ হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের চিন ভ্রমণের ইতিহাস রচনায় আমরা এই সব উপকরণই ব্যবহার করব।

১১ চৈত্র [সোম 24 Mar] সকাল আটটায় জাহাজ রেঙুন পৌঁছয়। ঘাটে নোঙর করার আগেই অভ্যর্থনা সমিতির কয়েকজন বিশিষ্ট সদস্য একটি লঞ্চে করে জাহাজে গিয়ে রবীন্দ্রনাথকে সংবর্ধনা জানান। বন্দরে পৌঁছনোর পরে বিশিষ্ট ব্যবসায়ী জে.এ.কে. জামাল মালা পরিয়ে ও একজন বর্মি রমণী একটি সুন্দর ফুলের তোড়া উপহার দিয়ে তাঁকে অভ্যর্থনা করেন। এর পর সকলকে নিয়ে যাওয়া হয় বিগানডেট স্ট্রিটের একটি সুসজ্জিত বাড়িতে। বর্মার গবর্নর Sir Harcourt Butler তাঁদের মধ্যাহ্নভোজে আপ্যায়িত করেন। কালিদাস নাগের ডায়ারি থেকে জানা যায়, 22 Mar গবর্নর ও রেঙুনের চিনা সম্প্রদায়ের আমন্ত্রণ বেতার-বার্তায় জাহাজে পৌঁছেছিল।

এইদিন সন্ধ্যা সাড়ে পাঁচটায় শহরের সবচেয়ে বড়ো প্রেক্ষাগৃহ জুবিলি হলে প্রায় পাঁচ হাজার লোকের উপস্থিতিতে U. Tuk Kyi, M.L.A.-র সভাপতিত্বে রবীন্দ্রনাথকে নাগরিক সংবর্ধনা জানানো ও একটি অভিনন্দনপত্র দেওয়া হয়। এর কিছু অংশ উদ্ধৃত করি : 'We greet you in the name of that universal culture which you have promoted with admirable devotion and singleness of aim. We greet you in the name of Human Brotherhood, the inculcation of which in East and West has been with you a consuming passion. We greet you as a votary of Truth sensed through Beauty. We greet you as one representing the rebirth of Asia, as one who has thrown across the chasm of ignorance and misunderstanding a bridge of future comprehension between Asia and Eur-America. We greet you as the lineal descendant of philosopher-seers of Ancient India, who at

the dawn of civilisation proclaimed the Unity of Life, and knew Humanity for one family transcending barriers of race and clime.'

রবীন্দ্রনাথ অভিনন্দনের উত্তরে দীর্ঘ ভাষণ দেন; বলেন, পৃথিবীর প্রত্যেক বড়ো জাতি এমন কিছু দান করেছে যা বিশ্বমানবের সম্পদ হয়ে আছে। পূর্বকালে ভারত অন্য দেশের সঙ্গে যে-সম্পর্ক সৃষ্টি করেছিল তা পণ্যবিনিময় বা রাজত্বপ্রসারের উপরে প্রতিষ্ঠিত হয়নি, তার প্রতিষ্ঠা ছিল কোনো মহৎ আদর্শের উপর। জাতির গৌরবময় অতীতে ভারতের ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক দূতেরা মরুপর্বত পার হয়ে দূর দূর দেশে উপস্থিত হয়ে জানিয়েছিল, তারা এমন কিছু এনেছে যা তাদের চিরকাল আত্মীয়তাসূত্রে আবদ্ধ করবে— মৈত্রীর আদর্শই জগতের ইতিহাসে হিন্দুভারতের শ্রেষ্ঠ দান। 26 Mar এল্‌ম্‌হার্স্ট রথীন্দ্রনাথকে লিখেছেন, স্থানীয় গুজরাটিরা সভাটিকে রাজনৈতিক প্রচারের কাজে ব্যবহার করার চেষ্টা করে।

১২ চৈত্র [মঙ্গল 25 Mar] সুনেইরাম হলে প্রবাসী বাঙালিদের সাহিত্যসম্মিলনী *Rangoon Mail*-সম্পাদক নৃপেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে কবি-সংবর্ধনার আয়োজন করে। মোয়াজ্জেম আলি অভিনন্দনপত্র পাঠ করেন। রবীন্দ্রজীবনী-কার লিখেছেন : 'এই অভিনন্দনপত্র রচনা ও সম্বর্ধনার অন্তরালে ছিলেন স্থানীয় বেঙ্গল আকাদেমি নামে বাঙালিদের স্কুলের প্রধান শিক্ষক মহিতকুমার মুখোপাধ্যায় ও সাহিত্যিক সুধীরচন্দ্র[কুমার] চৌধুরী। ইঁহাদের চেষ্টায় বর্মী-নৃত্যের ব্যবস্থা হয়।'[১৫২] মহিতকুমার তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ও সুধীরকুমার রামানন্দ-কন্যা সীতা দেবীর স্বামী— সীতা দেবী তখন সন্তানসম্ভবা হয়ে কলকাতায় অবস্থান করছেন। উক্ত বর্মী-নৃত্য সম্পর্কে বিশ্বভারতী বুলেটিনে লিখিত হয়, সাহিত্যসম্মিলনী 'provided the best entertainment for the poet by organising a classical Burmese dance party to the accompaniment of Burmese orchestra dominated by a dainty Burmese girl interpreting the delicate dance rhythms of Burma, which fascinated the poet and provoked the celebrated artist Nandalal Bose to draw a series of quick sketches while the dance was going on.' রবীন্দ্রনাথ রাণুকে লিখেছেন : 'পর্শু সন্ধ্যায় একটি ব্রহ্মণী মেয়ে আমাকে নাচ দেখিয়েছিল। তার নাচ ভারি মনোহর, ঠিক যেন পল্লবিত লতার উপরে কখনো পূর্ব্বদিক থেকে কখনো দক্ষিণ দিক থেকে বাতাসের হিল্লোল লেগে তাকে লীলাচঞ্চল করছিল।' সাহিত্যসম্মিলনীতে রবীন্দ্রনাথের ভাষণের অনুলিপিকে পূর্ণাঙ্গ রূপ দেন কালিদাস নাগ, সেটি জ্যৈষ্ঠ-সংখ্যা বঙ্গবাণী-তে [পৃ ৫১৪–১৬] মুদ্রিত হয়।

১৩ চৈত্র [বুধ 26 Mar] রেঙ্গুনের শহরতলিতে চিনাদের Kemmendine School-এ বর্মা-নিবাসী চিনাদের পক্ষ থেকে রবীন্দ্রনাথকে সংবর্ধনা জানানো হয়। Tao Sein Ko, M.L.C. সভাপতিত্ব করেন ও স্কুলের অধ্যক্ষ Lim No Chiong রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর সঙ্গীদের অভ্যর্থনা জানিয়ে বলেন : 'I have no doubt that this mission of Dr. Tagore and his illustrious company will mark another epoch of great spiritual influence upon the people of China, such has had been felt in the days of the Tang dynasty when the teaching of Buddha flourished in China.... We hope that through his efforts, the best which is in the East and the West may be made to shine side by side and to contribute to the progress, the unity and the perfection of the whole world.' এর পর চিনাদের পক্ষ থেকে একটি অভিনন্দনপত্র পাঠ করে গজদন্তখচিত পাত্রে রবীন্দ্রনাথকে উপহার দেওয়া হয়। তিনি প্রত্যুত্তরে বলেন, এক

সময়ে ভারতের বাণীবাহকেরা নূতন জীবনদর্শনের আদর্শ নিয়ে চিনে গিয়েছিলেন এবং সেই সম্মিলনে উভয়ই শিল্প, সাহিত্য ও বিজ্ঞানে সুমহান মানসিক উদ্বোধন ঘটেছিল। যে আধুনিক যুগে আমাদের জন্ম তার প্রধান বৈশিষ্ট্যই হল জীবনীশক্তির প্রাচুর্য। একে যেন আমরা ভয় না করি। এ ভুলও করবে, পরীক্ষাও করবে। 'Do not try to keep yourself secure from such blunders by remaining in your tombstones. So the newly awakened China will, through mistakes, find her truth.... We in the East have believed in some fundamental reality, some great philosophy of life and if we can keep that truth in the centre of our being, then we have the privilege to walk abroad courting disaster and death and yet attain immortality.... That is the message which I shall take to your country.'

দেশে ফিরে রবীন্দ্রনাথ ৫ শ্রাবণ [21 Jul] য়ুনিভার্সিটি ইনস্টিট্যুটে তাঁর সংবর্ধনা-সভায় রেঙ্গুনের অভিজ্ঞতা বিষয়ে বলতে গিয়ে বলেছিলেন :

প্রথম ঘাটে যেখানে নামলুম, সে হচ্ছে ব্রহ্মদেশের রেঙ্গুন। আপনারা সবাই জানেন, পৃথিবীর ইতিহাসে রেঙ্গুন ব্রহ্মদেশে নয়, সেখানে ব্রহ্মবাসী ছাড়া আর সব দেশের লোক আছে, অনেক চীনের লোক সেখানে আছে। যখন গেলুম, সেখানকার ভারতবাসীরা আমার সম্মান করেছিল, সেটা না করলেও ক্ষতি ছিল না। তার পর আমাকে যখন চীন-বন্ধুরা আমন্ত্রণ করলেন, তখন আমি মনের ভিতর তৃপ্তিলাভ করলুম। এই প্রথম আমার চীনের সঙ্গে পরিচয়। সেখানে চীনবাসীদের একটা বিদ্যালয় আছে, সে-বিদ্যামন্দিরের অধ্যক্ষ আমাকে সম্বর্ধনা করবার জন্যে সেখানে নিমন্ত্রণ করলেন। তাতে বড় আনন্দ লাভ করেছি। চীনের আতিথ্য প্রথম সেদিন লাভ করি। তারা আদর-অভ্যর্থনা করে বল্‌লে— তুমি কি বলবে আগে আমাদের বলো, কেননা আমাদের অনেকে ইংরেজী জানে না। তুমি যা বলবে, আমরা তখনি তা চীন-ভাষায় অনুবাদ করব। আমি বললুম, তা ত ঠিক বলতে পারিনে, কি বলব। তবে মোটামুটি কথা হচ্ছে— আমি দেশ-বিদেশে গিয়েছি, নিমন্ত্রণ পেয়েছি, বক্তৃতা করেছি, সম্মান-সমাদর লাভ করিনি তা নয়, কিন্তু একটা কথা জানিনি, সেটা জানবার জন্যে চীনে যাচ্ছি, সেইজন্যে তার আকর্ষণ বেশি। সেটা কি? আমি জানি এখানে মানুষের স্পর্শে অনেক হয়, আমাদের প্রাচ্য দেশে যখন নিমন্ত্রণ পেয়েছি, তখন সত্যিকার আতিথ্য লাভ করব। গৃহস্বামী, যারা নিমন্ত্রণ-কর্ত্তা তাদের হৃদ্যতা লাভ করতে পারব, শুধু করতালি লাভ করব না। তাদের কাছে আর্থিক পুরস্কার শুধু লাভ করব না, আমি তাদের হৃদয় লাভ করতে পারব, এ-কথা মনে করে এসেছি। আপনার ঘরে অনেকে আদর-অভ্যর্থনা পায়। আমার ভাগ্যে আত্মীয়ের আদর-অভ্যর্থনা জোটেনি তা নয়, তা সম্যক্ লাভ করেছি, কিন্তু মানুষের আত্মীয়তা, যাদের সঙ্গে আমাদের জাতিগত যোগ নেই, যারা ভাষায়, ভাবে, ধর্ম্মে, কর্ম্মে পৃথক, সেখান থেকে যখন আত্মীয়তা আসে, মনুষ্যত্বের গভীর উৎস থেকে আত্মীয়তার অমৃতধারা উৎসারিত হ'য়ে সমস্ত বাঁধন ভেদ করে' অনাত্মীয়তার বাইরের আবরণ-কুহেলিকা ভেদ করে' মানুষের অন্তর্নিহিত স্বাভাবিক যে জ্যোতি আছে, সে-আত্মীয়তার জ্যোতি যে ভোগ করতে পারে, সে ধন্য হয়। আমি তোমাদের কাছে এই একটি মাত্র আকাঙ্ক্ষা নিয়ে যাচ্ছি, যারা পরদেশবাসী, পরভাষাভাষী, তারা আমাকে আপনাদের জাতি বলে জানবে, আমি তাদের আপনাদের জাতি বলে জানব, তাদের কাছে থেকে হৃদ্যতা লাভ করব, এর চেয়ে মানুষের কাছে মূল্যবান জিনিষ হতে পারে না।[১৫৩]

কালিদাস নাগ ডায়ারিতে লিখেছেন : 'পরে বাঙ্গালীদের সম্বর্দ্ধনা— প্রায় ২০০০ লোক।' রবীন্দ্রনাথ এখানে ঘরোয়াভাবে তাঁর প্রতিষ্ঠিত ছোটো বিদ্যালয়টির কথা বলেন, যার পরিণতি ঘটেছে বিশ্বভারতীতে।

রবীন্দ্রনাথের রেঙ্গুনে আগমন সেখানকার অধিবাসীদের মনে বিশ্বভারতী সম্পর্কে আগ্রহ জাগিয়ে তুলেছিল। এই আগ্রহকে অর্থকরী রূপ দেওয়ার জন্য এল্‌ম্‌হার্স্ট সেখানে বিশ্বভারতী সম্মিলনীর একটি শাখা স্থাপনের প্রস্তাব করেন ও রথীন্দ্রনাথের উদ্দেশে লিখেছেন, অবিলম্বে সম্মিলনীর নিয়মাবলি, সাধারণ সদস্য ও আজীবন সদস্য হওয়ার আবেদনপত্র ইত্যাদি সুধীরকুমার বা মহিতকুমারের কাছে পাঠিয়ে দেবার জন্য।

১৪ চৈত্র (বৃহ 27 Mar] সকালে রবীন্দ্রনাথ কৌতুকের ভঙ্গিতে রাণুকে রেঙ্গুনের অভিজ্ঞতার বিবরণ লিখে পাঠালেন :

আজ তিনদিন রেঙ্গুনে জাহাজ থেমে ছিল। তাই এখানকার জনসাধারণ হিড় হিড় করে' আমাকে ডাঙ্গায় টেনে আন্‌লে। এরা সকলে মিলে রিসেপ্‌শন কমিটি বলে একটা পদার্থ সৃষ্টি করেচে। সেই পদার্থ আমার কানের কাছে জয় কবিরাজ রবীন্দ্রনাথ টাগো-ও-ও-ওর কী জয় বলে চেঁচাচ্চে, আমার গলায় মালা দিচ্চে, আমাকে গল্‌দা চিংড়ির কালিয়া খাওয়াচ্চে, সহরের মাঝখানে একটা দোতলা বাড়ি ঠিক করে দিয়েচে, সেই বাড়িতে মানুষ আর মশা দিনরাত্রি ভন্‌ভন্ করচে। সেই পদার্থ আমাকে এক সভায় বিকেল চারটেয়, তার পরের সভায় সাড়ে পাঁচটায়, তার পরের

সভায় সাতটায়, তার পরের ভোজে সাড়ে নটায় ঘুরপাক খাওয়াচ্চে। সেই পদার্থ আমাকে মাচার উপর চড়িয়ে বক্তৃতা করাচ্চে আর সভাপতিকে দিয়ে বলাচ্চে আমি একাধারে কবি ঋষি তত্ত্বজ্ঞানী শিক্ষক স্বদেশপ্রেমিক ইত্যাদি ইত্যাদি— শুন্‌তে শুন্‌তে ক্রমে আমার বিশ্বাস হচ্চে যে, তারা যা বল্‌চে কথাটা সম্পূর্ণ আজগুবী নয়— নিশ্চয়ই সর্ব্বগুণ আমার মধ্যে মিলে আগুন হয়ে উঠেচে— এখন এর উপরে fire brigade লাগিয়ে দিয়ে নির্ব্বাণ মুক্তি লাভ করলে বাঁচি। আজ অপরাহ্ন [য] দুটোর পর কমিটি রাহুর পূর্ণগ্রাস থেকে রবি বেরিয়ে আস্‌বেন। আজ বৃহস্পতিবারে জাহাজ ছাড়বে বেলা চারটের সময়— জাহাজের ঘাটে পৌঁছতে হবে দুটোর মধ্যে। কমিটি নামক পদার্থ— শতশতকণ্ঠকলকল নিনাদকরালা— আমার পিছন পিছন গলা ভাঙতে ভাঙতে বল্‌বে "জয় কবি-ই রা-আজ রবীন্দ্রনাথ টাগো-ও-ও-ওর কী জয়!" রবীন্দ্রনাথ তখন মালার ভারে লজ্জার ভারে ঘাড় হেঁট করে অশ্বিনীকুমারদ্বয়বাহিতা ফিটন গাড়ির পরে নির্ব্বোধের মত বসে জনতাতরঙ্গবিক্ষুব্ধ অন্তরাত্মাকে সান্ত্বনা দেবার উপায় খুঁজে পাবে না। ১৫৪

এখানে একটি চিনা ছাত্রীর সঙ্গে তাঁদের পরিচয় হয়। কালিদাস নাগ তাঁর ডায়ারিতে লিখেছেন : 'চীনে মেয়েটির সঙ্গে (Miss Lin Siang-Ying) আলাপ করে খুব সুখী হওয়া গেল— চীনের সম্বন্ধে অনেক দরকারী খবর দিলেন— চমৎকার মেয়েটি'। রবীন্দ্রনাথ 28 Mar রাণুকে এঁর সম্বন্ধে লিখেছেন :

...আসবার আগের দিন একটি চীনের মেয়ের সঙ্গে আলাপ হল। সে পিকিন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী। তার ইচ্ছে বিশ্বভারতীতে গিয়ে অন্তত একবছর থেকে আমার কাছে সাহিত্য অধ্যয়ন করে। এই অল্প সময়টুকুর মধ্যে সে আমার সঙ্গে এত ভাব করে নিলে যে আশ্চর্য্য হয়ে গেছি। ঘাটে এসে দেখি, সেখানে সে উপস্থিত। জাহাজ ছিল মাঝনদীতে কিছু দূরে। একটা ছোট স্টীমারে সব যাত্রীদের সেখানে পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা ছিল। মেয়েটিও সেই জাহাজে উঠে পড়ল। আমার হাত চেপে ধরে বল্লে, আপনি চলে যাচ্চেন, আমার কষ্ট হচ্চে,— ফিরে এসে যেন আপনাকে দেখ্‌তে পাই। যখন ছোট জাহাজ আমাদের জাহাজে এসে পৌঁছল, আমি বল্লুম, এবার গুড বায়। সে আমার বুকের উপর এসে পড়ল— চারদিকে সব লোকজন, তার তাতে খেয়াল নেই, সবাই হাস্‌তে লাগ্ল। জাহাজে আমার ক্যাবিনে মুখ ধুয়ে যখন জিনিষপত্র গোচাচ্ছি সে তার একটি আত্মীয় পুরুষের সঙ্গে সেখানে এসে উপস্থিত। এল্‌ম্‌হর্স্টকে ডেকে বল্‌লে তুমি কবিকে খুব যত্ন কোরো, দেখো এঁর শরীর যেন কিছুতে ক্লান্ত এবং অসুস্থ না হয়। এল্‌ম্‌হর্স্ট্ বল্‌লে, আমি এত বড় দায়িত্ব নিতে পারব না, আমার বদলে তুমি না হয় এসো। ও বল্‌লে আমার যদি যাবার কোনো সুবিধে থাকত আমি নিশ্চয় যেতুম, দেখ্‌তে আমি কত যত্ন করতুম। বলে' দুই হাতে আমার হাত চেপে রইল। জাহাজ যখন ছাড়ে ছাড়ে তার আত্মীয় তাকে টেনে নিয়ে চলে গেল।১৫৫

কালিদাস নাগ ডায়ারিতে লিখেছেন : 'Russian musician Mr. & Mrs. Premizlosদের সঙ্গে আলাপ হল'; তাঁর পরের দিনের বর্ণনা : 'Premizlos ও তাঁর স্ত্রী violin ও celloতে আলাপ শোনালেন— অমায়িক লোক।' রবীন্দ্রনাথের চিঠিতেও এঁর ও অন্যান্য সহযাত্রীদের উল্লেখ আছে : 'আমাদের সঙ্গে এই জাহাজে সেই বেহালার ওস্তাদ প্রেমিস্‌লাভ্ এবং তাঁর স্ত্রী যাচ্চেন। ওঁদের সঙ্গে আমাদের খুব জমেচে। আরও অনেক নরনারী আছে কিন্তু তাঁরা যেন সমুদ্রের ওপারে আছে বলে মনে হয়।' এল্‌ম্‌হার্স্ট রথীন্দ্রনাথকে লিখেছেন, প্রেমিসলাভ-দম্পতি পেনাঙে নেমে যান ও আশা প্রকাশ করেন পিকিঙে আবার তাঁদের সঙ্গে দেখা হবে।

জাহাজ ১৭ চৈত্র [রবি 30 Mar] সকালে পেনাঙ বন্দরে পৌঁছয়। *Straits Echo* [31 Mar] পত্রিকার সংবাদ থেকে জানা যায়, পূর্বদিন সন্ধ্যাতেই হ্যান্ডবিল বিতরণ করে জনসাধারণকে জানানো হয়, আগামীকাল সকাল দশটায় বিখ্যাত ভারতীয় কবি রবীন্দ্রনাথ এই শহরে পৌঁছবেন। ফলে পরদিন সকালে বন্দর এলাকা জনপূর্ণ হয়ে যায়। জাহাজ বন্দরে পৌঁছবার আগেই অ্যাডভোকেট ও আইনসভার সদস্য পি. কে. নাম্বিয়ার ও কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তি একটি লঞ্চে করে জাহাজে উঠে রবীন্দ্রনাথকে অভ্যর্থনা জানান। তিনি এইদিনই রাণুকে সারাদিনের ঘটনার বিবরণ দিয়ে লিখলেন :

বাস্ রে, কি কাণ্ড, কি ভীড়! বোধ হয় 'পিনাঙের সহরে যত পুরুষ আছে সবাই সেখানে জমা হয়েছিল। আমার সামনে দাঁড়িয়ে বাজনদাররা শানাই ঢাক ঢোল বাজিয়ে আকাশ তোলপাড় করতে লাগল। এক একদল করে অভ্যর্থনার দল এসে মোটা মোটা গড়ে' মালা আমার কাঁধে চাপাতে লাগ্‌ল। কাঁধে আর জায়গা ছিল না— কাঁধ ছাপিয়ে মুখের অর্দ্ধেক ঢাকা পড়ে গেল— মালার ভারে আমার ত মাথা হেঁট। চযমা সামলানো দায়, নিশ্বাস নেওয়া কঠিন। বহুকষ্টে বিষম ভিড় ঠেলে মোটর গাড়িতে উঠে পড়লুম। কিন্তু মোটর চলে কি করে। হাজার হাজার লোক ডাইনে বাঁয়ে

ঠেলাঠেলি বাধিয়ে দিয়েচে— তারা আমার পা ছুঁয়ে যাবে। তাদের তুফানের ভিতর দিয়ে মোটর অতিশয় ধীর গমনে চল্‌তে লাগ্‌ল। কোনোমতে একটা বাড়িতে এসে পৌঁচেছি। ··· ডানপাশের জানলার নীচে বড় রাস্তা। সেই রাস্তায় লোক দাঁড়িয়ে গেছে আমাকে দেখবার জন্যে।[১৫৬]

এই বিবরণে যে বিন্দুমাত্র অতিরঞ্জন নেই তার সমর্থন মেলে *Straits Echo* [31 Mar]-র সংবাদ থেকে : ‘A party of Indian musicians played weird airs on their sharp-pitched instruments.... After the great poet had stepped on to the gangway there was a rush to offer the usual floral tribute. ... with great difficulty that he was got into a car and home away.... The distinguished guest was driven to the residence of the Hon. Mr. P. K. Nambyar in Farquhar Street, where large crowds besieged him throughout the day.’ এই ভিক্তির উচ্ছ্বাস রবীন্দ্রনাথের কাছে কোনোদিনই উপাদেয় লাগেনি; তাই রাণুকে লিখেছেন : ‘একটা জিনিষ আজও আমার কিছুতেই অভ্যেস হল না। কোনোকালেই হবে না। যখন ভিড় ঠেলাঠেলি করে’ আমার পায়ের কাছে ভক্তির অর্ঘ্য আস্‌তে থাকে একেবারে যেন মুষলধারায় তখন আমি কিছুতেই তা গ্রহণ করতে পারিনে। এত অদ্ভুত অসঙ্গত মনে হয় যে কেমন যেন আমার মন বিষণ্ণ হয়ে ওঠে। ··· আমি মাঝে মাঝে আপত্তি করতে, বাধা দিতে চেষ্টা করেচি— কিন্তু তাতে উল্টো ফল হয়— আমার বিনয় থেকে লোকের ভক্তি আরো বেড়ে যায়।’

রবীন্দ্রনাথ সারা দুপুর সেই বাড়িতেই বিশ্রাম নেন, তাঁর সঙ্গীরা পাহাড়ের উপরে একটি চিনা বৌদ্ধমন্দির দেখতে যান। এইদিনই রবীন্দ্রনাথ প্রতিমা দেবীকে একটি চিঠিতে লিখেছেন : ‘পুপের কথা মাঝে মাঝে ভাবি। কিন্তু সে যে আমার বিরহে নিতান্ত কাতর হয়ে পড়েচে এমন মনে হয় না। তাকে ‘মানে না মানা’ গান শোনাবার অনেক লোক জুটবে।’[১৫৭]

য়ুনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটের ভাষণে রবীন্দ্রনাথ মালয়ের অভিজ্ঞতা সম্পর্কে বলেন :

আমি অনেক দেশ ভ্রমণ করেছি কিন্তু মালয়ে একটা আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখেছি, যা আমাকে আনন্দ দিয়েছে। সেটা হচ্ছে এই— এটা একটা ঘাটের মত জায়গা, যেখানে চীন, জাপান, জাভা, সুমাত্রা অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি দেশের লোকের আনাগোনা চলে। এখানে নানা-জাতীয় লোকের সমাবেশ, তা সত্ত্বেও পরস্পরের ভিতর কোনরকম বিদ্বেষবুদ্ধি জাগেনি। ··· চীনদেশ থেকে বহুতর শ্রমজীবী মালয় উপদ্বীপে এসে সমস্ত মালয়কে প্রায় অধিকার করেছে, সেখানকার দেশবাসী যারা তাঁরা পরিশ্রম-বিমুখ। ··· ভারতবর্ষ থেকে যে-সমস্ত শ্রমজীবী গিয়েছে, তাদের অধিকাংশ মান্দ্রাজী, কয়েক অংশ পাঞ্জাবী শিখ। চীন থেকে যারা এসেছে তারা দক্ষিণ-চীনের লোক··· দেখতে-দেখতে তাদের সমৃদ্ধি হয়েছে, তারা জমি-জমা করেছে, বড়-বড় rubber plantation (রবারের চাষ)— ঐশ্বর্য্যের যে লক্ষণ, তা চীনেদের ভিতর প্রকাশ পেয়েছে··· আমাদের দেশের যারা এসেছে, তাদের মধ্যে সেই অকিঞ্চন ভাব। ··· মান্দ্রাজ-কুলী অবজ্ঞাভাজন··· তারাই সমস্ত ভারতবাসীর নাম করেছে কুলী। ৩০। ৪০ সেন্ট-এর জন্যে তাদের চিরজীবন খেটে মরতে হয়, উদ্‌বৃত্ত কিছু থাকে না। ··· যার কিছু উদ্‌বৃত্ত থাকে না, সে পুরুষানুক্রমে চিরকালের জন্য দাস্যবৃত্তি করতে বদ্ধ হয়েছে, আর এইজন্যে মান্দ্রাজীরা অবজ্ঞাভাজন হয়ে রয়েছে··· মান্দ্রাজ থেকে যারা গিয়েছে, তারা পরস্পর সম্মিলিত হয়ে পরস্পরের সম্মান রক্ষা করতে অগ্রসর হয় না। ··· পরস্পরকে শোষণ করতে পরস্পরের চেষ্টা। উপর থেকে যেমন শোষণশক্তি কাজ করছে, ওদের নিজেদের ভিতর তেমনি শোষণশক্তি তাদের দুর্ব্বল করেছে। ···

···আর এক দল পাঞ্জাবী শিখ, তারা রাজশক্তির পিছনে-পিছনে আছে। রাজশক্তি যখন অন্যকে দলন করে, তখন সে ঘৃণ্য কাজের ভার ওদের উপর। তার যা ফল, তাই হয়েছে। রাষ্ট্রশক্তির পিছনে ক্ষমতার অভিমান আছে। দাস যখন মনে করে সে প্রভু, পরের ধার-করা প্রভুত্ব নিয়ে যখন সে তার শক্তির অপব্যবহার করে, তখন তার মত বিষময় বীভৎস জিনিষ আর কিছু নেই। ··· আমি মালয় উপদ্বীপে তেমন করে’ দেখবার সময় পাইনি, কিন্তু চীনদেশে এত বড় ঘৃণা আর কোন জাতিকে করে না। শিখেরা চীনেদের টিকি ধরে’ লাথি মেরেছে, যা ইংরেজ কনেষ্টবলেরাও করে না। তাদেরও যেখানে মনুষ্যত্ব, দয়া-দাক্ষিণ্য আছে, এই দাস-শিখদের ভিতর তার বিন্দুমাত্রও দেখা যায় না, সেটা আমার হৃদয়ে বিদ্ধ হয়ে আছে।[১৫৮]

জাহাজ ছাড়বার কথা ছিল বিকেল ছ’টায়, তাই সকলে সাড়ে পাঁচটায় বন্দরে পৌঁছে যান। কিন্তু শোনা গেল জাহাজ ছাড়বে রাত্রি দশটায়। তাই রবীন্দ্রনাথকে পেনাঙের বিভিন্ন অঞ্চল মোটরে ঘুরিয়ে আনা হল। মি.

নাম্বিয়ারের বাড়িতে নৈশভোজন সমাধা করে সকলে জাহাজে উঠে পরবর্তী বন্দর সুইটেনহামের [Sweetenham] উদ্দেশে রওনা হন। আগেই জানানো হয়েছিল, সেখানে কুয়ালালামপুর শহরে রবীন্দ্রনাথকে সংবর্ধনা জানানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে। তাই ১৮ চৈত্র [সোম 31 Mar] দুপুর একটায় জাহাজ বন্দরে পৌঁছলে অভ্যর্থনা সমিতির কয়েকজন সদস্য রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর সঙ্গীদের জাহাজ থেকে নামিয়ে ত্রিশ মাইল দূরে কুয়ালালামপুর শহরে মি. রামস্বামীর বাড়িতে নিয়ে যান। ডাঃ পরেশনাথ সেন, মি. কুমারস্বামী, Mr. H. N. Ferrars প্রভৃতির উদ্যোগে অনুষ্ঠিত নাগরিক সংবর্ধনায় বিশ্বভারতীর জন্য অর্থসংগ্রহের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়। পরেশনাথের বাড়িতে নৈশভোজন সমাধা করে সকলে জাহাজে ফিরে আসেন ও রাত্রি সাতটায় সিঙাপুরের উদ্দেশে রওনা হন। রবীন্দ্রনাথ যখন বাংলাদেশ ত্যাগ করেন তখন বৃষ্টির অভাবে সেখানে হাহাকার দেখা দিয়েছিল, তাই এখানকার প্রবল বৃষ্টি তাঁকে মুগ্ধ করে। সেই কথাই তিনি লিখে পাঠালেন রাণুকে লেখা চিঠিতে :

…বন্দর থেকে তিন মোটর গাড়ি বোঝাই করে বেরলুম। দুই ধারে কোথাও ঘন অরণ্য, কোথাও রবর গাছের চাষ, মাঝে মাঝে চিনেদের পাড়া, কোথাও বা মালয়দের গ্রাম। এত ঘন গাছপালা কোথাও দেখা যায় না। … নীল মেঘে আকাশ আচ্ছন্ন। সেই মেঘের ছায়া এখানকার অরণ্যের ছায়ার সঙ্গে যেন মালাবদল ও গ্রন্থিবন্ধনের মত দেখাচ্ছিল— শ্যামল পৃথিবীর আকাশের মিলন। … ভারতবর্ষ থেকে বেরবার আগে বহুকাল পর্য্যন্ত বাংলাদেশ বৃষ্টির জন্যে শূন্যের দিকে তাকিয়ে তার শুষ্কতপ্ত দিন কাটাচ্ছিল। … কুমারসম্ভবের কথা মনে পড়ছিল। আকাশ যেন শিবেরই মত রুদ্র তপস্যায় আত্মবিস্মৃত। … আর পৃথিবীও গৌরীর মত তপস্যায় প্রবৃত্ত হয়েছিল— আমাদের আশ্রমের গাছগুলোর পাতা প্রায় [হলুদ] হয়ে এসেছিল — পৃথিবী যেন অপর্ণা হবারই উদ্যোগ করছিল। … তাই এখানে যখন আকাশে ঘন ঘোর মেঘে বিদ্যুৎ চমকাতে লাগ্ল তখন সেই বনভূমির মাঝখান দিয়ে সেই সমারোহ দেখ্‌তে দেখ্‌তে মন ভরে উঠ্‌ছিল। যখন সহরের প্রায় কাছাকাছি এসেচি এমন সময় কি ঘোর বৃষ্টি। একেবারে অবিরল ধারা। এমন বৃষ্টি কতদিন দেখি নি। কি ভালো লাগ্‌ল বলতে পারি নে। ভিজে গেলুম কিন্তু তাতে দুঃখ রইল না।[১৫৯]

এল্‌ম্‌হার্স্ট রথীন্দ্রনাথকে লিখেছেন, মালয়ে বিশ্বভারতী সম্পর্কে মানুষ যথেষ্ট আগ্রহ বোধ করছে এবং ইতিমধ্যেই অর্থসংগ্রহের কাজে লেগেছে। রবার ও টিনের দৌলতে এখানকার জনসাধারণ যথেষ্ট অর্থবান, সুতরাং টাকা পাওয়ার সম্ভাবনাও প্রবল। তিনি রথীন্দ্রনাথকে বিশ্বভারতী সম্মিলনীর নিয়মাবলি, আজীবন সদস্যপদ ও বিশ্বভারতী কোয়ার্টার্লির গ্রাহক হওয়ার আবেদনপত্র পাঠিয়ে দেওয়ার অনুরোধ করেছেন।

জাহাজে সিঙাপুর অভিমুখে যাওয়ার পথে রবীন্দ্রনাথ পরদিন 1 Apr [মঙ্গল ১৯ চৈত্র] রাণুকে আর-একটি চিঠি লিখলেন। 31 Mar রাণুর আই.এ. পরীক্ষা আরম্ভ হয়। রবীন্দ্রনাথও তখন দক্ষিণমুখী জাহাজে ক্রমশ বেড়ে-ওঠা গরমে সংকীর্ণ ক্যাবিনে চিনের বক্তৃতা লিখতে ব্যস্ত। দুটির তুলনা করে তিনি লিখলেন : 'আমার পরীক্ষা তোমার চেয়ে একটুও কম কঠিন নয়। আমি ঠিক পরীক্ষা প্রশ্নের জবাব লেখার মতই গড়গড় করে লিখে চলেচি। তুমি ত পরীক্ষাশালায় যথোচিত আরামে লিখ্‌তে পাও, আমি প্রায় সমস্ত দিন এই ক্যাবিনটার ভিতরে বিছানায় বসে লিখ্‌চি। সামনে একটা টেবিলও নেই। … পশ্চিমের রৌদ্রে ক্যাবিন তেতে উঠে রাত দশটা পর্য্যন্ত ভিতরের বাতাসটাকে অপ্রসন্ন করে রাখে। ভাগ্যে একটা ইলেক্‌ট্রিক পাখা আছে, সেইটে দিন রাত মাথার উপর বোঁ বোঁ করে ঘুরচে— আর আমি কোনোমতে কোলের উপর কাগজ আঁকড়ে ধরে লিখে চলেচি। … তোমার পরীক্ষার কাগজ যদি এমন করে এমন জায়গায় লিখ্‌তে হত তাহলে প্রথম শ্রেণীতে পাস হতে কি না সন্দেহ। এত করে দুটো লেকচার শেষ হয়েচে। তৃতীয়টার অনেকখানি এগিয়েচে। সবসুদ্ধ ছটা লেকচার লিখ্‌তে হবে।'[১৬০] এল্‌ম্‌হার্স্ট লিখেছেন : 'Gurudev has advanced well with his third lecture, in which I believe he is sketching his ideal of Dharma. I have just finished typing the second

one.... In spite of lack of convenient writing place Gurudev works hard nearly all day sitting propped at on his bunk, & is full of fun at meal times.' কালিদাস নাগ ডায়ারিতে লিখেছেন : 'সারাদিন জাহাজে কবির সঙ্গে বক্তৃতা নিয়ে কথা।'

রবীন্দ্রনাথের প্রাথমিক পরিকল্পনা ছিল, চিন ও জাপান ভ্রমণের পরে তিনি সদলবলে ইন্দোচিন, সুমাত্রা, জাভা, শ্যামদেশ প্রভৃতি প্রাচীন হিন্দু ও বৌদ্ধ উপনিবেশগুলি পরিদর্শন করে পুরোনো ঐতিহাসিক সম্পর্ক পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করবেন। এল্‌ম্‌হার্স্ট সিঙাপুর যাওয়ার পথে রথীন্দ্রনাথকে জানালেন, হংকং থেকে তাঁরা আসবেন ইন্দোচিনে, যেখান থেকে শ্যামদেশে যাওয়ার একটি নূতন রাস্তা তৈরি হয়েছে। যদি শ্যামদেশ থেকে আমন্ত্রণ আসে, তাঁরা ব্যাঙ্কক হয়ে পেনাঙে যাবেন। মালয় জানিয়েছে, জাভা রওনা হবার আগে রবীন্দ্রনাথ যেন অন্তত দিন-পনেরো সেখানে কাটান। সাংহাই পৌঁছে 12 Apr এল্‌ম্‌হার্স্ট একটি প্রাথমিক ভ্রমণসূচি রথীন্দ্রনাথকে পাঠান, সেটি অবলম্বনে বিশ্বভারতী বুলেটিনে উদ্ধৃত হয় :

Our programme works out something like this:

Peking—April 1922-May 16 then to Shansi, Hankow.

Shanghai—May 28. Leave for Japan.

Leave June 15.

Hongkong—June 21. Canton and Saigon.

Bangkok—July 8.

Singapore—July 22.

Java—July 26-August 10.

Rangoon—August 15.

Calcutta—August 18.

Of course this is all provisional but we must not risk the typhoon season of July and I think in this way we shall escape easily and fit everything in.

রবীন্দ্রনাথের ভ্রমণসূচি কখনোই নির্ভরযোগ্য ছিল না, এবারেও তা-ই হয়েছে— হংকং থেকে তাঁরা সোজা রেঙুন হয়ে কলকাতা ফিরে আসেন 17 Jul [১ শ্রাবণ] তারিখে।

২০ চৈত্র [বুধ 2 Apr] সকালে যখন 'ইথিওপিয়া'র সিঙাপুর বন্দরে পৌঁছনোর কথা ছিল, তার অন্তত এক ঘন্টা পরে প্রায় ন'টার সময় জাহাজটি পৌঁছয়। এর অনেক আগে থাকতেই জেটিতে জনতা ও অভ্যর্থনা সমিতির সদস্যগণ অপেক্ষা করছিলেন। সমিতির সচিব Mr. L.G. Cranna রবীন্দ্রনাথকে স্বাগতসম্ভাষণ জানিয়ে দুঃখ প্রকাশ করে বলেন, তাঁর কর্মসূচির জন্য সিঙাপুরবাসীরা তাঁকে একটু বেশি সময়ের জন্য পেল না এর জন্য তাঁরা অত্যন্ত দুঃখিত। Low Kway Song নামক একজন শিল্পী তাঁর আঁকা রবীন্দ্রনাথের একটি তৈলচিত্র তাঁকে উপহার দেন; Granville Roberts রবীন্দ্রনাথকে Song Oug Siang-এর লেখা *One*

Hundred Years of the Chinese in Singapore গ্রন্থের একটি কপি উপহার দেন। কালিদাস নাগ লিখেছেন : 'বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ভারতীয় বন্ধুরা আমাদের নিয়ে গেলেন; বোম্বাইএর একজন বড় মহাজন Mr. Dawood তাঁর সুন্দর বাড়ীতে কবির বিশ্রামের ব্যবস্থা করলেন।' এখানেই তাঁদের সকলকে মধ্যাহ্নভোজনে আপ্যায়িত করা হয়। সিঙাপুরে রবীন্দ্রনাথ সদলবলে অস্ট্রেলিয়াগামী 'ইথিওপিয়া' জাহাজ ত্যাগ করে জাপান-অভিমুখী 'Atsuta Maru' জাহাজে আরোহণ করেন। পরবর্তী গন্তব্য হংকঙের অভিমুখে এইদিন বিকেলে যাত্রা শুরু হয়। বিশ্বভারতী বুলেটিন ও রবীন্দ্রজীবনী-তে ভ্রমবশত তারিখটি 7 Apr বলে উল্লেখিত হয়েছে। জাহাজটি সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ 5 Apr [শনি ২৩ চৈত্র] রাণুকে লেখেন : 'এখানে আমার আদরের সীমা নেই। আমি যা চাই তাই প্রস্তুত। কাপ্তেন বলে গেল, আমার যখন যা দরকার তাকে জানালেই সমস্ত বন্দোবস্ত করে দেবে। সকালে চায়ের সঙ্গে অন্য যাত্রীরা যখন বরাদ্দমত কমলালেবু পায় আমি তখন আনারস দাবী করলে আনারস এসে হাজির। নিয়ম হচ্চে সাড়ে আটটার মধ্যে স্নান সারতে হবে— সকলে তাড়াতাড়ি করে স্নান করে নেয়। আমি খবর পাঠিয়ে দিলুম সাড়ে এগারোটার সময় নাইব। তাই সই। ··· যেমনি খবর পেলে যে আমার ডেক চেয়ারের দুই হাতার উপর একটা কাঠের তক্তা পাতা থাকলে আমার লেখবার সুবিধে হয় অমনি জাহাজের ছুতোর মিস্ত্রিকে ডেকে তখনি একটা কাঠের তক্তা করিয়ে দিলে। খ্যাতির উৎপাত অনেক আছে সত্য কিন্তু খ্যাতির কিছু কিছু সুবিধাও আছে এ কথা স্বীকার করতেই হবে।'[১৬১] নানা জাতের যাত্রীদের ভিড়ে জাহাজে বাড়তি কোনো জায়গা না থাকলেও তাঁর জন্য একলা একটি ক্যাবিন বরাদ্দ হয়েছিল।

এর পরে তিনি কৌতুকের সুরে রাণুকে জানিয়েছেন, জাহাজের নৃত্যসভায় সঙ্গিনীর অভাবে এল্‌ম্‌হার্স্ট লিম্‌ডির রাজকুমারকেই নৃত্যসঙ্গী করতে বাধ্য হয়েছেন— রাণু থাকলে অবশ্য তাঁকেই সঙ্গিনী করতেন। অতঃপর লিখেছেন : 'আজ রাত্রে ওদের চিত্রবেশী নাচ হবে। যাকে বলে Fancy dress ball। এল্‌ম্‌হর্স্টকে বলেচি ধুতি চাদর পরে বাঙালী সাজতে। কুমার তাঁর পাগ্‌ড়ি-পরা কুমার বেশেই আসবেন। মিস্ গ্রীনের ভাবনা নেই, সে সাড়ি থেকে আরম্ভ করে মালয় মেয়েদের বেশভূষা প্রভৃতি নানা জবরজঙ্গ নানা জায়গা থেকে জোগাড় করে এনেছে। তারি মধ্যে একটা কিছু পরে' ও বোধ হয় সকলের উপর টেক্কা দেবে।'

7 Apr [সোম ২৫ চৈত্র] রবীন্দ্রনাথ প্রতিমা দেবীকে লিখেছেন : 'আজ হংকং পৌঁছবার কাছাকাছি। কিন্তু বড় দুর্য্যোগ। পথে একরকম মন্দ কাটেনি। সমুদ্র মোটের উপর শান্ত ছিল। পর্শু থেকে একটু নাড়া দিচ্চে— তাতে ক্ষিতিবাবু নন্দলাল প্রভৃতিকে কাবু করেচে। তাঁরা আজ ব্যাকুল নয়নে ডাঙ্গার দিকে তাকিয়ে আছেন। আমি ডেকের এক কোণে বসে কেবল লেকচার লিখে চলেচি— ঢেঁকির স্বর্গেও বিশ্রাম নেই।'[১৬২] সমুদ্রতরঙ্গ কালিদাস নাগকেও কাবু করেছিল, 5—6 Apr তাঁর ডায়ারির সংবাদ : 'Sea sickness— উপবাস ও পাঠ'।

জাহাজ এইদিন সকাল দশটায় হংকং বন্দরে নোঙর করে। হংকং চিনের অন্তর্ভুক্ত হলেও তখন ব্রিটিশ কলোনি ও বাণিজ্যকেন্দ্র। জাহাজঘাটায় তাঁকে স্বাগত জানান নবপ্রতিষ্ঠিত হংকং বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার W. W. Hornell, বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার N. T. Mackintosh, পিতাপুত্র সিনিয়র ও জুনিয়র J. H. Rustomjee, Mr. Nemazi, Bishen Singh প্রভৃতি ভারতীয় সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিবর্গ। বাংলার প্রাক্তন শিক্ষা-অধিকর্তা [D.P.I.] হর্নেলের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের পূর্বপরিচয় ছিল, তিনি তাঁকে নিজের বাড়িতে আতিথ্যদানের প্রস্তাব করেন। কিন্তু ভারতীয়দের দাবিই স্বীকৃত হয়, তাঁরা তাঁকে শহরের বাইরে নির্জন Repulse Bay Hotel-এ নিয়ে যান, অন্যদের আশ্রয় দেন পার্শি বণিক নিমাজি।

রবীন্দ্রনাথ হংকঙে পদার্পণ করার সঙ্গে সঙ্গেই পার্শ্ববর্তী অঞ্চলগুলি থেকে তাঁর কাছে আহ্বান আসতে থাকে। University of Amoy-এর ভাইস-চ্যান্সেলার Dr. Lim Bong Keng স্বয়ং এসে তাঁকে উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে ভাষণ দিতে আমন্ত্রণ জানান ও প্রস্তাব দেন সেখানে ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতি চর্চার জন্য একটি অধ্যাপক পদ প্রতিষ্ঠার জন্য। সবচেয়ে বড়ো আহ্বানটি আসে রিপাবলিক অব্ চায়নার প্রেসিডেন্ট Sun-Yat-Sen [1866–1925]-এর কাছ থেকে; তিনি লেখেন : 'Dear Mr. Tagore,/ I should greatly wish to have the privilege of personally welcoming you on your arrival in China. It is an ancient way of ours to show honor to the Scholar. But in you I shall greet not only a writer who has added lustre to Indian letters but a rare worker in those fields of endeavour wherein lie the seeds of man's future welfare and spiritual triumphs.

May I then have the pleasure of inviting you to Canton?'[১৬৩]

রবীন্দ্রনাথ এই আমন্ত্রণ রক্ষা করতে পারেননি— লেকচার অ্যাসোসিয়েশনের আহ্বানে চিনে আসতে তিনি ইতিমধ্যেই যথেষ্ট দেরি করে ফেলেছেন, এই যুক্তি দেখিয়ে ডাঃ সান-ইয়াত-সানের ব্যক্তিগত সচিবের কাছে দুঃখপ্রকাশ করে ফেরবার পথে ক্যান্টন যেতে পারেন এই প্রতিশ্রুতি দেন। কিন্তু সেটিও রক্ষা করা সম্ভব হয়নি। দক্ষিণ-চিন রিপাবলিকের সঙ্গে সোভিয়েত রাশিয়া তখন মৈত্রীচুক্তিতে আবদ্ধ, সুতরাং ডাঃ সেনের আমন্ত্রণে ক্যান্টন গেলে হয়তো পিকিঙের সাম্যবাদী যুবক ও বুদ্ধিজীবীদের রবীন্দ্রবিরোধিতা কিছুটা প্রশমিত হত!

হংকঙে বিশ্ববিদ্যালয় ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান থেকে রবীন্দ্রনাথের কাছে বক্তৃতার জন্য অনেকগুলি আমন্ত্রণ আসে, কিন্তু সময়াভাবের জন্য সেগুলিও গ্রহণ করা সম্ভব হয়নি। *China Mail* [10 Apr] দুঃখপ্রকাশ করে লেখে : 'Tagore goes North to Peking on a mission that excites our interest and envy. The North is fortunate, as fortunate as we hope Hongkong may be when the return journey has to be made, in no place than Hongkong is the doctrine of this poet more worthy of preachment and acceptance.' কিন্তু হংকংবাসীদের সেই আশা পূর্ণ হয়নি।

হংকং ত্যাগের আগে স্থানীয় শিখসম্প্রদায় তাঁদের গুরুদ্বারে রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর সহযাত্রীদের জন্য ভজন গানের আয়োজন করেন।

সম্ভবত ২৬ চৈত্র [মঙ্গল 8 Apr] রাত্রে জাহাজ হংকং ত্যাগ করে সাংহাই বন্দর অভিমুখে রওনা হয়। কালিদাস নাগ এইদিন ডায়ারিতে লিখেছেন : 'কবির তৃতীয় বক্তৃতা পড়া ও নানা পরামর্শ হল।'

10 Apr [২৮ চৈত্র] রবীন্দ্রনাথ রাণুকে লিখলেন :

চলেছি সাঙ্ঘাইয়ের ঘাটে। আজ বৃহস্পতিবার— পর্শু শনিবার সকালে পৌঁছব। তার পর থেকে কিছুকাল ডাঙার পালা চল্‌বে। হংকং বন্দরে নেবে দু দিন কাটিয়েচি। জায়গাটি ভাল, কিন্তু আকাশ ছিল অপ্রসন্ন, মেঘে কুয়াশায় বৃষ্টিতে অবগুণ্ঠিত। বাতাসের তাপ পূর্ব্বের চেয়ে হঠাৎ প্রায় ২০ ডিগ্রি নেবে গিয়েছিল… যত উত্তরে যাব শীত আরো বাড়বে।…

জাহাজে এতদিন আমি একটি নির্জ্জন ডেক্-এর কোণে কোণার্ক হয়ে বিরাজ করছিলুম। সেই মোটা কেদারায় ঠেসান দিয়ে প্রায় সমস্ত দিন সমুদ্রের ঢেউয়ের উপর সূর্য্যের আলো দেখেছি। … আজ দিন চারেক থেকে কোণার্কের কোণের আকাশটুকু হারিয়ে গেছে। বাদলায় শীতে আমাকে তাড়া করে ক্যাবিনের ভিতর ঠেলে এনেচে।[১৬৪]

কালিদাস নাগ 'বঙ্গবাণী' পত্রিকার জন্য ভ্রমণবিবরণ 'পূবের চিঠি' লেখার বরাত নিয়েছিলেন, তিনি 10 Apr ডায়ারিতে লিখেছেন : 'আজ সারাদিন কষে 'বঙ্গবাণী'র জন্য লেখা গেল গোড়া থেকে রেঙ্গুন পর্যন্ত।' পরের দিন লিখলেন : 'বিকালে গুরুদেবকে ফল দিয়ে দেখা করতে গিয়ে তাঁর রেখাশিল্প ও ছন্দতত্ত্ব নিয়ে গভীর প্রসঙ্গ হল'— এখানে 'রেখাশিল্প' কথাটি গুরুত্বপূর্ণ, রবীন্দ্রনাথ কবিতা লিখতে গিয়ে তাঁর কাটাকুটি বা পরিবর্তনগুলিতে কালি বুলিয়ে যে-নকশার রূপ দিতেন তা-যে শিল্পের আকার নিয়ে অন্যের দৃষ্টি আকর্ষণ করছে এবং তিনিও-যে সেই বিষয়ে সচেতন হয়ে উঠছিলেন এই সংবাদটি উল্লেখযোগ্য— আর বছরখানেকের মধ্যেই তা পূরবী-র পাণ্ডুলিপিতে অদ্ভুতদর্শন জীবজন্তুর মূর্তি পরিগ্রহ করবে।

12 Apr [শনি ৩০ চৈত্র] সকালে জাহাজ সাংহাই বন্দরে পৌঁছয়। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি ও জনসাধারণের সমাগমে জেটি পূর্ণ ছিল। কবি সু-সীমো [Tsemon Hsu] ও Dean of the National Institute of Self-Government S. Y. Ch'u এবং বিশিষ্ট চিনা বুদ্ধিজীবীদের অনেকে জাহাজে উঠে আসেন রবীন্দ্রনাথকে অভ্যর্থনা জানাবার জন্য। Ch'u সম্পর্কে কালিদাস নাগ লিখেছেন : 'লোকটি ভারি ঠাণ্ডা প্রকৃতির ও ভাবুক মানুষ— দর্শনশাস্ত্রে ঝোঁক— উপনিষৎ পড়েছেন— কবির চিত্রা, রাজা ও ফাল্গুনীর অনুবাদক— আলাপে খুশী হওয়া গেল।' সু-সীমো চিনের সর্বত্র রবীন্দ্রনাথের দোভাষী হিসেবে তাঁর সঙ্গী হয়ে ছিলেন। তিনি এঁর সম্পর্কে পরে বলেছেন : 'একজন বন্ধু যিনি আমার সঙ্গে-সঙ্গে থেকে ইংরেজী বক্তৃতা চীন-ভাষায় অনুবাদ করবার ভার নিয়েছেন, তিনিও দাঁড়িয়ে আছেন,— সৌম্যমূর্তি দীর্ঘকায়— চীনদেশে এটা অতি আশ্চর্য্য বিশেষত্ব। তাঁর শ্রী আর গাম্ভীর্য্য দেখে মুগ্ধ হলুম।' জনতা 'বন্দেমাতরম' ধ্বনি এবং ফুলমালায় তাঁকে অভিভূত করে দেয়। অধ্যাপক এইচ.পি. শাস্ত্রী জেটিতে সমাগত বিশিষ্ট ভারতীয় ও জাপানিদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলে শেঠ লালচাঁদ রবীন্দ্রনাথকে মাল্যভূষিত করেন। কোনো অনুমতি না নিয়েই স্থানীয় ভারতীয়েরা Y.M.C.A.তে রবীন্দ্রনাথের একটি বক্তৃতার কথা বিজ্ঞাপিত করেছিল। কিন্তু তিনি আপত্তি করায় তাঁরা খুবই দুঃখিত হন। ক্যামেরাম্যান ও রিপোর্টারদের হাত এড়িয়ে তিনি কোনোরকমে মোটরে চেপে বার্লিংটন হোটেলে এসে ওঠেন। এল্‌ম্‌হার্স্ট সংবাদ পাঠিয়েছেন : 'He has today finished no. 5 & it is ready for me to type.' লিম্‌ডির রাজকুমার সাংহাইতে না নেমে পুরোনো জাহাজেই জাপান রওনা হন, আবার পিকিঙে এসে দলের সঙ্গে যোগ দেন।

বিকেলে রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর সঙ্গীদের শহরের বাইরে ব্যারাকে পরিণত একটি বৌদ্ধমন্দির ও বসন্তপ্রকৃতির শোভা দেখাতে নিয়ে যাওয়া হয়।

13 Apr [রবি ৩১ চৈত্র] ভোরে ইহুদি ধনকুবের মি. হার্দুনের আমন্ত্রণে সকলে তাঁর বাগানবাড়িতে যান। বিশ্বভারতীর আদর্শের কথা শুনে মি. হার্দুন তার আজীবন সদস্য হন। রবীন্দ্রজীবনী-কার লিখেছেন : 'অধ্যাপক লেভি মিঃ হার্দুনের বদান্যতার কথা বলেন। বিশ্বভারতীতে চীনাভাষার চর্চা হইতেছে জানাইয়া একসেট চীনা ত্রিপিটক উপহার দিবার জন্য বিশ্বভারতীর গ্রন্থাগারিক রূপে আমি এক অনুরোধ-পত্র লিখি। ১৯২২ পৌষ উৎসবের সময় বহুখণ্ডে ত্রিপিটক ডাকযোগে পাইয়াছিলাম। পরে তিনি ২৪-বংশের চীনা ইতিহাসও পাঠান।'[১৬৫]

দুপুরে স্থানীয় শিখ গুরুদ্বারে সাংহাইয়ের হিন্দু ও শিখদের পক্ষ থেকে রবীন্দ্রনাথকে সংবর্ধনা জানানো হয়। চিনের শিখ অধিবাসীদের সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ সন্তুষ্ট ছিলেন না, সে কথা তাঁর মালয়ের অভিজ্ঞতার প্রসঙ্গেই

তিনি ব্যক্ত করেছিলেন। এখানে তিনি আরও কঠোর মনোভাবের পরিচয় দেন। য়ুনিভার্সিটি ইনস্টিট্যুটের ভাষণে তিনি বলেন :

শিখেরা যখন গুরুদ্বারে আমাকে নিমন্ত্রণ করতে এল, তাদের বললুম, ভারতবর্ষ থেকে যারা এসেছে, ঋষিদের প্রেমের ধর্ম্ম ও তাদের মহত্ত্ব প্রচার করতে যারা এসেছে, তারা ভারতবর্ষের সঙ্গে চীনকে, জাপানকে বহুরকম আত্মীয়তার সূত্রে বেঁধেছে, যা জগতের ইতিহাসে পাওয়া যায় না, এমনি করে করেছে। কোনো বাণিজ্যের শক্তি নেই, রাষ্ট্রের শক্তি নেই, তেমন করে প্রেমের বন্ধনে বাঁধতে পারে। একমাত্র আপনার প্রেমের হৃদয়ের প্রেমের প্রাচুর্য্যে ও ঐশ্বর্য্যে চীন-জাপানকে তারা আত্মীয় করেছে, তাদের বংশধর হয়ে তোমরা বিদ্বেষ রোপণ করে গিয়েছ। এরা চিরকাল ঘৃণা করবে, ভারতবাসীর উপর বিদ্বেষ-বুদ্ধি নিয়ে থাকবে, এত বড় ক্ষতি তোমরা ভারতের করলে! পূর্ব্বপুরুষদের নামে কলঙ্ক ঢেলে দিলে! আমাকে তোমাদের গুরুদ্বারে ডেকেছ, গুরুদ্বার কিসের জন্যে, গুরু নানকের মন্ত্র প্রেমের মন্ত্র, সকলে এক ভগবানের সন্তান, এ-বাক্য তিনি প্রচার করেছেন। সে-বাণী যদি এখানে না বহন করে থাকো, কিসের গুরুদ্বার? তাঁর বাণী বহন করতে পারলে না, শুধু দুঃখ আর বে না দিয়ে গেলে। এরা তোমাদের আপনার লোক, এসিয়াবাসী, এদের সঙ্গে যুগ-যুগান্তের আত্মীয়তা, সে-আত্মীয়তার বন্ধনকে এমন করে পীড়িত করলে, ক্ষুণ্ণ করলে। বলেছি, একথা তারা মনে নেবে কি না, জানিনে। আমি আপনাদের কাছে দুঃখ জানাচ্ছি। দুই দিকে দুঃখ। একদিকে প্রভুশক্তি যখন দাসকে অবলম্বন করে আপনার বীভৎস মূর্ত্তি প্রকাশ করছে, সে এক দুঃখ, আর-এক দিকে, দাস-শক্তি যখন অত্যন্ত হেয়ভাবে নিজ দুঃখ-দৈন্য-পীড়িত কলঙ্ককে সহনীয় বলে মনে করে, সে আর-এক দুঃখ। দুই দিকে দুই অন্ধকার ভারতবর্ষ বিতরণ করছে। ভারতবাসী এই দুঃখ কখনও ভুলবে না।[১৬৬]

সংবর্ধনা-সভায় প্রথমে মেয়েদের গাওয়া মীরাবাঈয়ের ভজন 'পিয়া ঘর আয়ে'-এর সঙ্গে উপাসনা হয়। এই পরিণত বয়সে চিনে ভারতের চিরন্তন আদর্শ প্রচারের উদ্দেশ্যে দীর্ঘ ভ্রমণের কষ্ট স্বীকারের জন্য কৃতজ্ঞতা জানিয়ে হিন্দিতে লেখা একটি অভিনন্দনপত্রে রবীন্দ্রনাথকে আশ্বাস দেওয়া হয় এশিয়ার আধ্যাত্মিক ঐক্য ও বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য বিশ্বভারতীর প্রচেষ্টায় তাঁরা যথাসাধ্য সাহায্য করবেন। রবীন্দ্রনাথ এর উত্তর দেন বাংলায়, ক্ষিতিমোহন সেন সেটি হিন্দিতে বুঝিয়ে দেন। রবীন্দ্রনাথের ভাষণের মর্ম কালিদাস নাগ ডায়ারিতে লিপিবদ্ধ করেন : 'যথার্থ গুরুর কাজ কি, গুরুর আদেশ পালন করার দায়িত্ব কি : গুরু আত্মাকে মুক্তি দেন অনন্তের ক্ষেত্রে এবং তাঁর আদেশ পালন করা হচ্ছে আমাদের জীবনকে অনন্তের সুরে ভরিয়ে তোলা— বিশ্বমানবের প্রেমে সার্থক করা। যে-মহাগুরু নানকের বাণীতে ভারত প্রাণ পেয়েছিল— শিখজাতি ও সমগ্র ভারতজাতি সেই কল্যাণমন্ত্রে দীক্ষা নিয়ে প্রাণ দিয়ে তার প্রমাণ যদি দেয় তবেই সার্থক হবে। চীনে ভারতবাসী যারা এসেছে তাদের কাজ সেবা আদর্শ দেখে চীনাবাসী যেন কৃতজ্ঞচিত্তে ভারতের নাম স্মরণ করে।'[১৬৭]

এখান থেকে যাওয়া হয় সুপরিচিত চিনা পণ্ডিত ও দার্শনিক Rudolf Eucken-এর সহযোগী Dr. Carsun Chang-এর বাগানবাড়িতে। এইখানে রবীন্দ্রনাথকে প্রথম আনুষ্ঠানিকভাবে সুশিক্ষিত চিনা মহিলা ও পুরুষদের কাছে উপস্থাপিত করা হল। চিনের যুবসমাজের প্রতিনিধি হিসেবে সু সী-মো একটি সুন্দর কবিত্বপূর্ণ ভাষণে রবীন্দ্রনাথকে স্বাগত জানিয়ে বলেন, তিনি এসেছেন চিনের একটি সংকটজনক সময়ে যখন সে নিরীশ্বরবাদ ও বস্তুতন্ত্রবাদের দোলাচলতার মধ্য দিয়ে অগ্রসর হচ্ছে— তিনি আশা করেন রবীন্দ্রনাথের উজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব, গভীর দর্শন ও সজীব কবিতা তাকে সেই অবস্থা থেকে উদ্ধার করবে। রবীন্দ্রনাথ প্রত্যুত্তরে কৌতুকের সুরে বলেন, তিনি একজন দায়িত্বজ্ঞানহীন কবি ছাড়া আর কিছু নন— কেন-না তিনি গান লিখে সময় নষ্ট করেছেন যখন তাঁর উচিত ছিল চিনের জন্য বক্তৃতা রচনা করা। কবিরা বসন্তবাতাসের মতো অর্থহীন যাওয়া-আসা করে থাকে, কিন্তু তাদের উদ্দেশ্যহীনতার জন্য পৃথিবীর কোনো লোকসান হয় না।

তিনি বলেন, এশিয়ার দূরপ্রান্তের অধিবাসী তাঁর পক্ষে এটি একটি আনন্দের দিন এই জন্য যে তিনি এখানে আমন্ত্রিত হয়ে আসতে পেরেছেন। চিন তাঁর কাছ থেকে কী শুনতে চায় বুঝতে না পেরে তিনি প্রথমে দ্বিধাগ্রস্ত ছিলেন এবং পরেও সময় নষ্ট করেছেন বসন্তের মায়ায় ভুলে। বহু শতাব্দী জুড়ে এদেশে বণিকেরা

এসেছে, সৈনিকেরা এসেছে, এসেছে আরও কত অবাঞ্ছিত ব্যক্তি— কিন্তু তাঁর আগে আর-কোনো কবিকে আমন্ত্রণ করার কথা কেউ ভাবেনি। তা হলেও তাঁর কাছে কেউ যেন বাণীর দাবি না জানায়? 'I am not a philosopher : therefore keep for me room in your heart, not a seat on the public platform. I want to win your heart… with the faith that is in me of a great future for you, and for Asia when your country rises and gives expression to its own spirit,— a future in the joy of which we shall all share.'

রবীন্দ্রনাথের মৌখিক ভাষণটির এল্‌ম্‌হার্স্ট-কৃত অনুলিখন তাঁর দ্বারা সংশোধিত হয়, তার পাণ্ডুলিপি রক্ষিত আছে রবীন্দ্রভবনে [দ্র Ms. 304 (i)]। ভাষণটি 'First Talk at Shanghai' নামে *Talks in China* [1924] গ্রন্থে ও 'To My Hosts I' নামে উক্ত গ্রন্থের 1925-সংস্করণে ছাপা হয় [দ্র *EWRT* 2 [1996]/ 641–42, 594–95]।

কালিদাস নাগ লিখেছেন : 'পরে কবি 'মাধবী কোথা হতে' গানটি গাইতে— চীনদেশীয় বীণার আলাপ শোনান হল— প্রথম এক দার্শনিক ও ধীবরের আলাপ, পরে একটি সুখের ও একটি দুখের রাগিণী শুনিয়ে শেষ হল।'

বর্তমান বৎসরের শেষ দুটি মাসে সাময়িকপত্রে প্রকাশিত রবীন্দ্ররচনার সূচি এখানে দেওয়া হল :

প্রবাসী, ফাল্গুন ১৩৩০ [২৩ / ২ / ৫] :

১–৪ 'যৌবন-বেদনা-রসে উচ্ছল আমার দিনগুলি' দ্র পূরবী ১৪। ২১–২৬ ['তপোভঙ্গ']

দীর্ঘ কবিতাটি পত্রিকার শেষে ক্রোড়পত্র-রূপে মুদ্রিত হয়।

শান্তিনিকেতন, ফাল্গুন ১৩৩০ [৫ / ২] :

২১–২৪ 'পরলোকগত পিয়র্সন' দ্র ব্যক্তিপ্রসঙ্গ ৩১। ৯৯–১০৩

২৯–৩১ 'মন্দির' / বুধবার ২৪ পৌষ ১৩৩০

৩২ 'গান' ['যে কেবল পালিয়ে বেড়ায়'] দ্র গীত ২। ৫৮০–৮১; স্বর ৩০

৩৫ 'গান' ['এবার অবগুণ্ঠন খোল খোল'] দ্র গীত ২। ৪৯১; স্বর ৩০

দুটি গানেরই স্বরলিপি করেন অনাদিকুমার দস্তিদার, সেগুলি ৩২–৩৪ ও ৩৫–৩৬ পৃষ্ঠাতে মুদ্রিত হয়।

ভারতী, চৈত্র ১৩৩০ [৪৭ / ১২] :

১০৮৩–৮৪ 'উৎসবের বাঁশি' [ভয় নিত্য জেগে আছে'] দ্র পূরবী ১৪। ৩১–৩২ ['উৎসবের দিন']

প্রবাসী, চৈত্র ১৩৩০ [২৩ / ২ / ৬] :

৭২৯–৩০ 'মাঘের বুকে সকৌতুকে কে আজি এল?'] দ্র পূরবী ১৪। ২৮–৩০ ['আগমনী']

শান্তিনিকেতন, চৈত্র ১৩৩০ [৫ / ৩] :

৪৮–৪৯ '৯ই পৌষ / (খৃষ্টোৎসব)' দ্র খৃষ্ট ২৭। ৫০১–০৩

৫৪ 'গান' ['আমার শেষ পারাণীর কড়ি কণ্ঠে নিলেম গান'] দ্র গীত ১। ১৭–১৮; স্বর ৩০

অনাদিকুমার দস্তিদার-কৃত গানটির স্বরলিপি ৫৪–৫৫ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত হয়েছে।

বঙ্গবাণী, চৈত্র ১৩৩০ [৩। ১। ২] :

১৩৭–৩৯ 'ভাঙা মন্দির' ['পুণ্যলোভীর নাই হল ভিড়'] দ্র পূরবী ১৪। ২৬–২৮

Visva-Bharati Quarterly, Apr-Jun 1924 [Vol.II, No.1]:

77 'Reviews/ Education and Reconstruction'

85–91 'Notes/ The First Anniversary of Sriniketan/ President's Address'

95–98 'The Guest House of India'

প্রাসঙ্গিক তথ্য : ১

বর্তমান বৎসরে [১৩৩০] জোড়াসাঁকো ঠাকুরপরিবার ও তাঁদের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়দের সম্পর্কে কিছু সংবাদ এখানে সংকলিত হল।

সরলা দেবীর স্বামী পাঞ্জাবের বিশিষ্ট জননেতা রামভজ দত্ত চৌধুরী ২১ শ্রাবণ [সোম 6 Aug 1923] কার্বাঙ্কল রোগে মুসৌরীতে মারা যান। তাঁদের একমাত্র পুত্র দীপক তখন গান্ধীজির সবরমতী আশ্রমে পড়াশোনা করছেন।

অগ্রহায়ণ মাসের শেষদিকে মৃণালিনী দেবীর মা, রবীন্দ্রনাথের শাশুড়ি দাক্ষায়ণী রায়চৌধুরীর মৃত্যু হয়। মীরা দেবী ৪ পৌষ [বৃহ 20 Dec] পুত্র নীতীন্দ্রনাথকে লিখেছেন :

> …গেল মেলডেতে দিদিমার অসুখের খবর পেয়ে হঠাৎ চলে এলুম তাই তোমায় লিখতে পারিনি। দিদিমাকে নিয়ে মামা যে দিন কলকাতায় এলেন আমিও সেই দিন এখানে এলুম। বিকেল বেলায় দিদিমা এলেন তার পরদিন সকালে মারা গেলেন। দাদাও সে সময়ে এখানে ছিল। কিন্তু দিদিমা কিছু জানতে পারেন নি অনেক দিন থেকে জ্ঞান ছিল না। দুদিন জ্বর হয়েই তিনি অজ্ঞান হয়ে পড়লেন তারপর ২৮ দিনের দিন মারা গেলেন। … দিদিমার শ্রাদ্ধ ৮ই তাই ৭ই পৌষে আমার যাওয়া হবে না।[১৬৮]

এই চিঠিতেই তিনি লিখেছেন : 'সোদ্দা নরু বোঠান ক মাস এখানে ছিলেন কাল তাঁরা বরোদায় গেলেন। সোদ্দার খুব অসুখ করেছিল একটু ভাল হতে সুপ্রকাশ এসে নিয়ে গেল।' রবীন্দ্রনাথের বাল্যসঙ্গী ভাগিনেয় সত্যপ্রসাদের পুত্র সুপ্রকাশ তখন বরোদা ম্যুজিয়ামের কিউরেটার, সত্যপ্রসাদ অবশিষ্ট জীবন সেখানেই কাটান।

২ চৈত্র [শনি 15 Mar 1924] আশুতোষ-প্রমথ চৌধুরীর মাতা মগ্নময়ী দেবী ৮৫ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করেন।

২৭ ফাল্গুন [সোম 10 Mar] সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জ্যেষ্ঠা কন্যা মঞ্জুশ্রীর সঙ্গে সুকিয়া স্ট্রিট-নিবাসী যামিনীমোহন চট্টোপাধ্যায়ের পুত্র ক্ষিতীশপ্রসাদের বিবাহ হয়। 'পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বেদী হইতে নব-দম্পতীকে সময়োপযোগী একটী সুন্দর উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন।'

১০ শ্রাবণ [26 Jul] বিশ্বভারতীর পক্ষে দুটি দলিল সম্পাদিত হয়। প্রথম দলিলে রবীন্দ্রনাথ 1923 পর্যন্ত প্রকাশিত সমস্ত বাংলা বইয়ের স্বত্ব বিশ্বভারতীকে দান করেন। এতদিন পর্যন্ত এই স্বত্ব বিদ্যালয়ই ভোগ করে আসছিল, এখন সেটি আইনসম্মত হল। অবশ্য এর পরে প্রকাশিত বাংলা বই, ইংরেজি বই, অনুবাদের স্বত্ব,

চলচ্চিত্র ও নাট্যাভিনয় এবং গানের রেকর্ডের স্বত্ব তাঁরই থাকে। অপর দলিলে বিশ্বভারতীর জন্য একটি ট্রাস্ট গঠিত হয়— রবীন্দ্রনাথ, ডাঃ নীলরতন সরকার ও হীরেন্দ্রনাথ দত্ত ট্রাস্টি হন।

প্রাসঙ্গিক তথ্য : ২

আমরা পূর্ববর্তী অধ্যায়ে [দ্র রবিজীবনী ৮। ২৭৬–৭৮] জানিয়েছি, চৌরিচৌরার ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে গান্ধীজি আইনঅমান্য আন্দোলন প্রত্যাহার করলে ভারতব্যাপী ক্ষোভের সঞ্চার হয় ও সেই সুযোগে ইংরেজ সরকার তাঁকে সামান্য অজুহাতে গ্রেপ্তার ক'রে 18 Mar 1922 [৪ চৈত্র ১৩২৮] ছ'বছরের জন্য বিনাশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করলে কংগ্রেসি রাজনীতিতে বিরাট শূন্যতা দেখা দেয়, অন্ধভক্ত-পরিবৃত একক ব্যক্তির খামখেয়ালির দ্বারা পরিচালিত রাজনৈতিক আন্দোলনের পক্ষে এইরূপ পরিণতি অবশ্যম্ভাবী। এর ফলে যাঁরা ওকালতি প্রভৃতি ব্যবসা বা সরকারি স্কুল-কলেজ পরিত্যাগ করেছিলেন, তাঁরা আবার পূর্বাবস্থায় ফিরে যান। চরকা-কাটা বা খদ্দর-প্রচার, অস্পৃশ্যতানিবারণ-মূলক প্রচারকার্য ইত্যাদি ছাড়া কংগ্রেসিদের সামনে আর-কোনো গঠনমূলক কর্মসূচি ছিল না। Nov 1923-তে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক কাউন্সিলগুলির নির্বাচন হওয়ার কথা ছিল। চিত্তরঞ্জন দাশ, মোতিলাল নেহরু, জয়াকর, মুঞ্জে, বিঠলভাই প্যাটেল প্রভৃতি কংগ্রেস নেতা এইসময়ে পরিকল্পনা নিলেন, তাঁরা কাউন্সিল-নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন ও বাজেট-সহ প্রতিটি সরকারি প্রস্তাবের বিরোধিতা করে শাসনযন্ত্রকে অচল করার প্রয়াস নেবেন। সেটিও হবে একধরনের অসহযোগ আন্দোলন।

1923-র নির্বাচনে বাংলা কাউন্সিলে ১৩৮ জন সদস্যের মধ্যে সাধারণ আসন সংখ্যা ছিল ৩৯, সংরক্ষিত মুসলিম আসন ৪৬। এই নির্বাচনে মডারেট মন্ত্রী স্যার সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বা অ্যাভোকেট জেনারেল এস.আর. দাশ প্রভৃতিকে হারিয়ে স্বরাজ্য দল অধিকাংশ আসন লাভ করে। কিন্তু মুসলিমদের অন্তত একাংশকে সঙ্গে না পেলে সংখ্যাগরিষ্ঠতা সম্ভব নয় বলে চিত্তরঞ্জন 18 Dec 1923 তাঁদের সঙ্গে 'বেঙ্গল প্যাক্ট' নামে একটি চুক্তি করলেন— ঠিক হল, স্বরাজ লাভের পরে সরকারি চাকুরির ৫৫ শতাংশ মুসলিমদের জন্য সংরক্ষিত হবে ও যতদিন সংখ্যানুপাতে সেই হারে না পৌঁছয় ততদিন ৮০ শতাংশও নিয়োগ হতে পারে; আইন পরিষদে মুসলিম আসনসংখ্যা নির্দিষ্ট হবে ও স্বতন্ত্র নির্বাচন বহাল থাকবে; মসজিদের সামনে গানবাজনা নিষিদ্ধ হবে ও ইদের সময়ে গোহত্যা বজায় থাকবে। ফলে স্বরাজ্যদল মুসলিমদের সহযোগিতা লাভ করে।

কিন্তু Dec 1924-এ মৌলানা মহম্মদ আলির সভাপতিত্বে কোকনদে অনুষ্ঠিত ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশনে এই চুক্তিটি অগ্রাহ্য হয়। এর আগেই ডাঃ এম.এ. আনসারি, লালা লাজপত রায় ও সর্দার মহতাব সিং-কে নিয়ে একটি কমিটি সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি-বিষয়ক একটি জাতীয় চুক্তির খসড়া প্রণয়ণ করে, সেটিও এই অধিবেশনে বিবেচিত হলে পুনরালোচনার জন্য আর-একটি কমিটি গড়া হয়। তবে পরের বৎসর বাংলার সিরাজগঞ্জে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেসের অধিবেশনে চিত্তরঞ্জন-প্রণীত বেঙ্গল প্যাক্ট অনুমোদিত হয়।

বাংলায় গবর্নর লর্ড লিটন সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা হিসেবে চিত্তরঞ্জনকে সরকার গঠনের জন্য আমন্ত্রণ জানালে তিনি সেই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। অগত্যা লিটন এ.কে. ফজলুল হক, এ.কে. গজনভি ও সুরেন্দ্রনাথ মল্লিককে মন্ত্রী নিযুক্ত করেন— কিছুদিন পরে আদালতের বিচারে সুরেন্দ্রনাথ মল্লিকের নির্বাচন বাতিল হলে দুজন মুসলিম মন্ত্রীই অবশিষ্ট রইলেন— কিন্তু য়ুরোপীয় সদস্য, সরকারি কর্মচারী ও অন্যান্য কিছু সদস্য তাঁদের সমর্থন করতেন।

23 Jan 1924 ব্যবস্থাপক সভার প্রথম অধিবেশন আহূত হয়। প্রথমেই স্বরাজ্য দলের যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত প্রস্তাব করেন, 1818-এর ৩ আইন অনুসারে যাঁদের বিনা বিচারে আটক রাখা হয়েছে তাদেঁর সকলকে ছেড়ে দেওয়া হোক। ভোটাধিক্যে প্রস্তাবটি গৃহীত হয়। এইদিন অনুরূপ দুটি দমনমূলক আইন বাতিল ও সেই আইনে কারারুদ্ধ ব্যক্তিদের মুক্তির প্রস্তাবও গৃহীত হয়। একই ভাবে মন্ত্রীদের বেতন-সহ বাজেট প্রস্তাবের বিরোধিতা করা হয়, ফলে মন্ত্রীরা পদত্যাগ করলে গবর্নর হস্তান্তরিত বিষয়গুলির শাসনভার নিজেই গ্রহণ করতে বাধ্য হন। স্বরাজ্যদলের উদ্দেশ্য ছিল দ্বৈতশাসনের অবসান, তাঁদের সেই লক্ষ্য পূর্ণ হল।

পূর্ববর্তী ব্যবস্থাপক সভায় সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সর্বপ্রধান কীর্তি ম্যুনিসিপ্যাল আইনের সংস্কার। এই আইনের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল, শতকরা ৮০ জন করদাতা ও স্ত্রীলোকদের ভোটাধিকার লাভ এবং কলকাতা ম্যুনিসিপ্যালিটির অধ্যক্ষ মেয়র ও প্রধান কার্যাধ্যক্ষের [Chief Executive Officer] জনগণের প্রতিনিধিদের দ্বারা নির্বাচন। স্বরাজ্যদল কলকাতা ম্যুনিসিপ্যালিটি-সহ ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডগুলিতেও সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়েছিল, সেখানেও মুসলিমদের নানাবিধ সুবিধা দেওয়া হয়। বাংলা সরকারে মন্ত্রিত্ব গ্রহণ না করলেও চিত্তরঞ্জন মেয়র পদে অধিষ্ঠিত হন ও তাঁর প্রিয়পাত্র সুভাষচন্দ্র বসুকে করেন প্রধান কার্যাধ্যক্ষ। এঁরা বহু জনহিতকর কাজ সম্পন্ন করে লোকপ্রিয়তা অর্জন করেন। ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডগুলিতেও কর্মকর্তারা সরকারি নীতি ও অর্থের সাহায্যে গ্রামাঞ্চলে রাস্তাঘাট নির্মাণ, প্রাথমিক শিক্ষা ও চিকিৎসার ব্যবস্থা করে দেশবাসীর বহুবিধ উপকার করেন। এই সূত্রে শ্রীনিকেতনের গ্রামোন্নয়ন পরিকল্পনার সঙ্গে বীরভূম ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের একটি সহযোগিতার সম্পর্ক গড়ে ওঠে।

কেন্দ্রীয় আইনসভা-সহ ভারতের অন্যান্য প্রদেশগুলিতেও স্বরাজ্যদল একই নীতি অনুসরণ করে শাসনকার্যে নানাবিধ অসুবিধা সৃষ্টি করতে থাকেন। কেন্দ্রীয় আইনসভায় স্বরাজ্যদলের সদস্যসংখ্যা ছিল ১০১টি নির্বাচিত আসনের মধ্যে ৪৫টি, কিছু স্বতন্ত্র সদস্য ও মহম্মদ আলি জিন্নার ইন্ডিপেন্ডেন্ট দল মিলে বিরোধীপক্ষে ছিলেন ৭০ জন— নেতা ছিলেন মোতিলাল নেহরু। টি. রঙ্গচারিয়ার প্রস্তাব আনলেন, প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন ও ডোমিনিয়ান স্ট্যাটাস প্রদানের ভিত্তিতে 1919-এর ভারতশাসন আইনের সংস্কার সাধন করা হোক; মোতিলাল গোলটেবিল বৈঠক ডাকার আহ্বান জানিয়ে ঘোষণা করলেন, স্বরাজ্য দলের সদস্যেরা আইনসভায় সহযোগিতা করতেই এসেছেন, সরকার তাঁদের মনোভাবকে সম্মান না জানালে তাঁরা নিজেদের স্বাধিকার রক্ষার্থে অসহযোগিতার পথ নেবেন। জিন্নার সমর্থন নির্ভরযোগ্য ছিল না বলেই তাঁকে সাবধানে চলতে হচ্ছিল। তবে স্বরাজ্যদলকে বিরোধিতার পথেই যেতে হয়েছে। বাজেটের অনেক ব্যয়বরাদ্দই তাঁরা প্রত্যাখ্যান করেন। কয়েকশ্রেণীর রাজবন্দীর মুক্তির প্রস্তাব গ্রহণ করতে তাঁরা সরকারকে বাধ্য করেন। ইংল্যান্ডের পার্লামেন্টের মতো প্রতিবাদ জানানোর জন্য সদলবলে সভাত্যাগের দৃষ্টান্তও তাঁরা স্থাপন করেন।

ছয় বছরের বিনাশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়ে গান্ধীজি পুনার যারবেদা জেলে মোটামুটি বিশ্রামেই দিনযাপন করছিলেন। কিন্তু 21 Apr 1923 [৮ বৈশাখ ১৩৩০] তিনি পেটে তীব্র যন্ত্রণা বোধ করেন। প্রথমে সাধারণ চিকিৎসার পরে 5 May সার্জন-জেনারেল কর্নেল ম্যাডক তাঁকে পরীক্ষা করেন, 15 May পুনঃপরীক্ষার পর তাঁকে য়ুরোপীয়ান ওয়ার্ডে স্থানান্তরিত করা হয় এবং কস্তুরবা গান্ধী ও অন্যান্যদের ডেকে আনা হয়। সাময়িকভাবে ব্যথা কমলেও তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ হননি, মাঝেমাঝেই পেটে বেদনা বোধ করতে থাকেন। 8 Jan 1924 [২৩ পৌষ] আবার তীব্র ব্যথা দেখা দিলে কর্নেল ম্যাডক 12 Jan অ্যাপেন্ডিসাইটিসের জন্য তাঁর শরীরে অপারেশন করেন। অতঃপর সরকার 4 Feb [২১ মাঘ] তাঁকে নিঃশর্ত মুক্তিদান করে— রবীন্দ্রনাথ পরের দিন পুনার Sasoon Hospital-এর ঠিকানায় তাঁকে টেলিগ্রামে জানান : 'We rejoice/ Rabindranath'[১৬৯]। অপারেশনের পরে 10 Mar [২৭ ফাল্গুন] পর্যন্ত গান্ধীজি উক্ত হাসপাতালেই ডাক্তারের চিকিৎসাধীনে ছিলেন, বিদায় নেবার আগে তিনি কর্নেল ম্যাডককে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। জীবনরক্ষার তাগিদে ইংরেজের সঙ্গে অসহযোগিতা ও যন্ত্রের প্রতি বিরূপতা তিনি সাময়িকভাবে বিস্মৃত হয়েছিলেন!

অবশ্য হারানো রাজনৈতিক মর্যাদা পুনরুদ্ধারের জন্য তিনি তখনও সক্রিয়তা প্রদর্শন করেছেন। 7 Feb কংগ্রেস সভাপতির মাধ্যমে দেশবাসীকে জানান, শারীরিক কারণে কারাবাস থেকে মুক্তিতে তিনি খুশি নন, একই দিনে মহম্মদ আলিকে লেখেন :

...I had during the last two years ample time and solitude for hard thinking. It made me a firmer believer than ever in the efficacy of the Bardoli programme and, therefore, in the unity between the races, the charkha, the removal of untouchability and the application of non-violence in thought, word and deed to our methods as indispensable for swaraj. If we faithfully and fully carry out this programme, we need never resort to civil disobedience and I should hope that it will never be necessary. But I must state that my thinking prayerfully and in solitude has not weakened my belief in the efficiency and righteousness of civil disobedience. I hold it as never before, to be a man's or a nation's right and duty when its vital being is in jeopardy. I am convinced that it is attended with less danger than war and, whilst the former, when successful, benefits both the resister and the wrongdoer, the latter harms both the victor and the vanquished.[১৭০]

পূর্বদিন হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়ে গান্ধীজি 11 Mar স্বাস্থ্যোদ্ধারের জন্য বোম্বাইয়ের জুহুতে নরোত্তম মোরারজির বাংলোয় আশ্রয় নেন।

গান্ধীজি কারান্তরালে থাকার সময়ে দেশে বহুবিধ পরিবর্তন হয়েছিল। অসহযোগ আন্দোলনের সময়ে আপাতভাবে হিন্দু-মুসলমান সম্প্রীতির যে পরিবেশ গড়ে উঠেছিল, আন্দোলন স্থগিত হওয়ায় ও গান্ধীজি জেলে যাওয়ায় সেই আবহাওয়া বিনষ্ট হয়। কংগ্রেসীদের কাউন্সিলে প্রবেশের প্রশ্নে গান্ধীজির সম্মতি ছিল না, কিন্তু তাঁর অনুপস্থিতিতে এই প্রশ্নেই দল দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়, মোটামুটি বোঝাপড়ার ভিত্তিতে স্বরাজ্য দল কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক আইনসভাগুলিতে প্রাধান্য লাভ করে ও তাঁদের কর্মসূচি অনুযায়ী আইনসভাগুলির

অভ্যন্তরেই সরকারের সঙ্গে অসহযোগিতা চালিয়ে যেতে থাকেন। গান্ধীজির মুক্তির পরে মার্চের শেষ দিকে মদনমোহন মালব্য, লাজপত রায়, মোতিলাল নেহরু, হাকিম আজমল খান প্রভৃতি নেতা কাউন্সিল-প্রবেশ ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি সমস্যা নিয়ে আলোচনার জন্য তাঁর সঙ্গে দেখা করেন। তিনি মত পরিবর্তন করেননি, তাঁর মতে কাউন্সিলে প্রবেশ করা সরকারে অংশগ্রহণেরই নামান্তর ও বাধাদানের নীতি একধরনের হিংসাই, এতে গঠনমূলক কাজ ব্যাহত হয়েছে ও কাউন্সিলে প্রবেশের অর্থ খিলাফত ও পাঞ্জাবের পক্ষত্যাগ। তাঁর কথার ভাবে মনে হয়, তুরস্কের রাজনৈতিক পরিবর্তন ও খলিফা পদের উচ্ছেদ বিষয়ে তিনি যেন কিছুই জানেন না এবং পাঞ্জাবের অন্যায়ের প্রতিকারে তাঁর তৎকালীন নির্বীর্য ভূমিকার বিষয়ে দেশবাসী অজ্ঞতার অন্ধকারে বাস করছে!

আমরা পূর্ববর্তী খণ্ডেই জানিয়েছি, মুস্তাফা কামালের নেতৃত্বে এক জাতীয়তাবাদী সরকার তুরস্কের শাসনভার গ্রহণ করে ও 1 Nov 1922 সুলতানি ব্যবস্থার উচ্ছেদ ঘটায়; 17 Nov সুলতান খলিফা ষষ্ঠ মহম্মদ দেশত্যাগ করেন। এরপরে 24 Jul 1923 য়ুরোপীয় শক্তিগুলি লুসানের চুক্তি স্বাক্ষর ক'রে আংকারার তুর্কি সরকারকে স্বীকৃতি দেয় ও তুরস্কের য়ুরোপীয় সীমান্ত নির্ধারিত হয়। 29 Oct 1923 তুর্কি সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। মুস্তাফা কামালের উদ্দেশ্য ছিল তুরস্কে মধ্যযুগীয়তার অবসান ঘটিয়ে দেশকে বিংশ শতকের উপযোগী করে তোলা। এই লক্ষ্যে 3 Mar 1924 আনুষ্ঠানিকভাবে খলিফা পদের উচ্ছেদ ঘোষণা করা হয়, ৪ Apr ইসলামি ধর্মীয় আদালতগুলি ভেঙে দিয়ে ধর্মমন্দিরসমূহের সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয়। স্ত্রীলোকদের উপর থেকে নানাবিধ নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়া হতে থাকে, ইসলামি ভ্রাতৃত্ববোধ বেআইনি ঘোষিত হয়, কিছুদিন পরে ফেজ টুপির পরিবর্তে য়ুরোপীয় পোশাকের প্রবর্তন ঘটে। সংখ্যাগরিষ্ঠ নিরক্ষর ভারতীয় মুসলমানদের কাছে এইসব তথ্য গোপন রাখা হয়েছিল, স্বয়ং গান্ধীজিই কি বুঝেছিলেন এই পরিবর্তনের তাৎপর্য?

ব্রিটেনেও তখন একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ঘটেছিল। 1923-র সাধারণ নির্বাচনে রক্ষণশীলরা বৃহত্তম দল হলেও সম্মিলিত শ্রমিক ও লিবারেল দল সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন ক'রে সরকার গঠন করে, লিবারেল দলের নেতা প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী অ্যাসকুইথের প্রস্তাবে শ্রমিক নেতা James Ramsay MacDonald [1866–1937] 22 Jan 1924 প্রধানমন্ত্রীর পদে শপথ গ্রহণ করেন। এই পটপরিবর্তনে মডারেট, লিবারেল, এমন-কি স্বরাজীরাও আশায় উৎফুল্ল হয়ে ওঠেন, কিন্তু তাঁদের প্রত্যাশা শেষপর্যন্ত বেদনার কারণ হয়। *Indian Annual Register* [1924]-এ ব্যঙ্গাত্মকভাবে লেখা হয়েছে : 'This MacDonald and the whole group of Labor leaders, like Wedgwood, Ben Spoor, Sidney Webb and others, have ever been talking of India in a language which excelled even the worst Indian extremist. From the platform of the Labor party these very men had before given pledge after pledge to India guaranteeing Self-Government and denouncing the sort of Tsarism that is running in India. But while actually exercising power, they turned traitor to India and passed a repressive ordinance in October (1924) which beats any enacted before by the most reactionary Tory Government.'

এই সময়ে আর্যসমাজের নেতা স্বামী শ্রদ্ধানন্দ শুদ্ধি আন্দোলনের নামে একটি রাজনৈতিক অস্থিরতা সৃষ্টি করলেন। তিনি দেখেছিলেন, অনেক সময়েই হিন্দু নরনারী, প্রধানত অন্ত্যজ সম্প্রদায়ভুক্ত, সমাজের অকারণ

গোঁড়ামি ও কুসংস্কারের জন্য ইসলাম বা খ্রিষ্টধর্মে দীক্ষিত হয়— খ্রিষ্টান পাদ্রিদের প্রলোভন ও মুসলমানদের জবরদস্তিও যার অন্যতম কারণ— ইচ্ছা থাকলেও এইভাবে. ধর্মান্তরিত হিন্দুদের আর নিজের সমাজে ফিরে আসার পথ থাকে না; আর জন্মসূত্রে হিন্দু না হলে অন্য ধর্মের কোনো নরনারীর হিন্দুধর্মে দীক্ষাগ্রহণের কোনো প্রশ্নই ছিল না। আর্যসমাজ শাস্ত্রবাক্য উদ্ধার ক'রে এঁদের জন্য শুদ্ধিযজ্ঞের প্রবর্তন করে। মালকানা রাজপুত নামে একটি সম্প্রদায় ছিল— যাঁরা কেবল নামেই মুসলমান, কিন্তু আচারবিধিতে হিন্দুরীতি অনুসরণ করতেন— স্বামী শ্রদ্ধানন্দের নেতৃত্বে আর্যসমাজ এঁদের হিন্দুধর্মে ফিরিয়ে আনার প্রয়াস করলে মুসলিমরা আপত্তি জানায়। হিন্দু সংগঠন নামে একটি প্রতিষ্ঠানও গড়ে উঠেছিল, যার উদ্দেশ্য ছিল হিন্দুদের মধ্যে সংহতি স্থাপন। হিন্দু মহাসভার অস্তিত্ব বহুপূর্বের, কিন্তু 1915-এ হরিদ্বারে মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দীর সভাপতিত্বে অখিল ভারতীয় হিন্দুমহাসভার সম্মেলন ও বার্ষিক অধিবেশনের পর থেকে হিন্দুমহাসভার বার্ষিক অধিবেশন ও কর্মকর্তাদের নির্বাচন নিয়মিত অনুষ্ঠানে পরিণত হয়। মুসলিমদেরও অনুরূপ প্রতিষ্ঠান ছিল, কিন্তু জাতিভেদ বা অস্পৃশ্যতার আচার-বিচারে খণ্ডিত হিন্দুরা সংগঠিত হওয়ার উপক্রম করলে মুসলিমরা প্রমাদ গোনে। ভারতে সংখ্যালঘু হওয়ার জন্য এমনিতেই তারা আত্মস্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠার জন্য অহিংস বা সহিংস যে-কোনো পথ গ্রহণেই উদ্‌গ্রীব ছিল; তাছাড়া মুসলিম শাসনের অবসানে ব্রিটিশ রাজত্ব শুরু হলে তাদের বৃহদংশ ইংরেজের সংস্পর্শ ও ইংরেজি শিক্ষা থেকে দূরত্ব বজায় রেখে অশিক্ষা বা কুশিক্ষার অন্ধকারে নিক্ষিপ্ত হয়, পক্ষান্তরে এতদিনের মুসলিম শাসনে শাসনকর্তাদের অনুগ্রহ-বিগ্রহের অনিশ্চয়তায় দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিকের জীবনযাপনে অভ্যস্ত [ইতস্তত কিছু ব্যতিক্রম বাদ দিয়ে] হিন্দুরা প্রথমাবধি ইংরেজি শিক্ষায় আগ্রহী হয়ে ব্রিটিশের সাম্রাজ্যরক্ষায় অন্যতম সহযোগীর ভূমিকা গ্রহণ করে। কাজেই হীনমন্যতা অশিক্ষা ও দারিদ্র্যে পীড়িত মুসলিমরা হিন্দুদের প্রতিবেশী না ভেবে প্রাগ্রসর প্রতিযোগীরূপে ভাবতে অভ্যস্ত হচ্ছিল। কিন্তু পাশ্চাত্যশিক্ষায় শিক্ষিত হিন্দুরা যখন রাজনৈতিক সুবিধা আদায়ের আন্দোলনে যোগ দিল, তখন ইংরেজ শাসকগণ বিশেষত বঙ্গভঙ্গের সময় থেকে মুসলিমদের অন্যায় সুবিধার ব্যবস্থা ক'রে হিন্দু-মুসলমানের চিরাগত ভেদবুদ্ধির মূলে জলসিঞ্চন আরম্ভ করল। তারপরে গান্ধীজির মতো অদূরদর্শী রাজনৈতিক নেতা অবাস্তব ও একান্তভাবে সাময়িক হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের লোভে খিলাফতের মতো ভারতীয়দের পক্ষে অবান্তর দাবি আদায়ের জন্য অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দেন। কিন্তু উক্ত আন্দোলনের অবসানে গান্ধীজি কারান্তরালে গেলে সেই আপাত-ঐক্যের বন্ধন সহজেই ভেঙে পড়ে, পাঞ্জাব ও উত্তর-পশ্চিম ভারতের বিস্তীর্ণ অঞ্চল সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার শিকার হয় [কেবল 1923-তেই 11 Apr অমৃতসরে, 28 Apr মুলতানে, 23 Jul আজমীরে ও 26 Jul মীরাটে ভয়াবহ দাঙ্গা দেখা দেয়]। এটা ঘটতই, তাই এর জন্য শুদ্ধি-আন্দোলনকে দায়ি করা এক জটিল মূলগত সমস্যার আত্যন্তিক সরলীকরণ ছাড়া আর-কিছু নয়। গান্ধী-শিষ্য জওহরলাল নেহরু তাঁর 'আত্মচরিত'-এ এই অবস্থার কারণটি সুন্দরভাবে বিশ্লেষণ করেছেন :

সহসা আন্দোলনের গতি রুদ্ধ হওয়ায় প্রতিক্রিয়ার মুখে উহাই সম্ভবতঃ দেশে এক নূতন বিপত্তির সৃষ্টি করিল। রাজনৈতিক সঙ্ঘর্ষে নিষ্ফল ও আকস্মিক হিংসা বন্ধ হইলেও অবরুদ্ধ হিংসা বাহির হইবার পথ খুঁজিতে লাগিল এবং সম্ভবতঃ পরবর্তী কয়েক বৎসরে সাম্প্রদায়িক অসন্তোষ ইহার ফলেই তীব্র হইয়াছে। রাষ্ট্রক্ষেত্রে প্রগতিবিরোধী বিভিন্নশ্রেণীর সাম্প্রদায়িকতাবাদীরা বিশাল জনসঙ্ঘ-সমর্থিত অসহযোগ ও নিরুপদ্রব প্রতিরোধ আন্দোলনের চাপে লুকাইয়া থাকিতে বাধ্য হইয়াছিল, এই অবস্থার সুযোগে তাহারা বাহিরে আসিল। ··· মোপলা বিদ্রোহ ও অস্বাভাবিক নিষ্ঠুরতার সহিত উহার দমন— বদ্ধদ্বার রেলওয়ে মালগাড়ীতে বোঝাই মোপলা বন্দীদের শোচনীয় মৃত্যু— সাম্প্রদায়িক অসন্তোষ

প্রচারকারীদিগকে একটা সুযোগ দিল। যদি নিরুপদ্রব প্রতিরোধ স্থগিত করা না হইত এবং যদি গভর্ণমেন্ট আন্দোলন দমন করিয়া ফেলিতেন তাহা হইলে হয়তো এত সাম্প্রদায়িক তিক্ততা দেখা দিত না এবং পরবর্তীকালে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামার জন্য এত উৎসাহ অবশিষ্ট থাকিত না।[১৭১]

তাই সেই সময় থেকে তৎকালীন অখণ্ড ও বর্তমানে ত্রিখণ্ডিত ভারতে মুসলিম রাজনীতি দাঁড়িয়ে আছে প্রধানত হিন্দু-বিরোধিতাকে আশ্রয় ক'রে, যদিও স্বাধীন ভারত ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শকে সাংবিধানিক মর্যাদায় অভিষিক্ত করেছে!

আপাতভাবে মনে করা হচ্ছিল, অসহযোগ আন্দোলনের ফলে সন্ত্রাসবাদ প্রশমিত হয়েছে— কিন্তু আকস্মিকভাবে তার পুনঃপ্রকাশ দেখা গেল 12 Jan 1924 [শনি ২৭ পৌষ] গোপীনাথ সাহা নামক একজন যুবক তৎকালীন অত্যাচারী পুলিশ কমিশনার চার্লস টেগার্ট-ভ্রমে কিলবার্ন কোম্পানির জনৈক ইংরেজ কর্মচারী আর্নেস্ট ডে-কে চৌরঙ্গির রাজপথে প্রকাশ্য দিবালোকে গুলি করে হত্যা ও তাঁর পশ্চাদ্ধাবনকারী তিনজনকে আহত করায়। গোপীনাথ ধরা পড়েন, বিচারের সময়ে নিরপরাধ একজনকে হত্যা করার জন্য দুঃখ প্রকাশ করে বলেন, টেগার্ট এই যাত্রায় বেঁচে গেলেও তাঁর অসমাপ্ত কাজ অন্য কেউ সম্পূর্ণ করবে। 1 Mar ফাঁসির সময়ে ঘোষণা করেন, তাঁর প্রতিটি রক্তবিন্দু ঘরে ঘরে স্বাধীনতার বীজ বপন করবে। কিছুদিন পরে পূর্ববঙ্গের সিরাজগঞ্জে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেসের বার্ষিক সম্মেলনে সন্ত্রাসবাদী কাজকর্মের নিন্দা করেও গোপীনাথের আত্মত্যাগের প্রশংসা করে প্রস্তাব গৃহীত হয় : 'This conference while denouncing and dissociating itself from violence and adhering to the principle of non-violence, appreciates Gopinaath Saha's ideal of self-secrifice, misguided though it is, in respect of the country's best interest and expresses respect for self-sacrifice.' কিন্তু Jun 1924-এ গান্ধীজি স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে এই বিষয়ে নিন্দাপ্রস্তাব আনয়ন করেন।

1917-এ মার্ক্সবাদে বিশ্বাসী বলশেভিকেরা রাশিয়ার জারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহে জয়যুক্ত হয়ে পৃথিবীতে শ্রমিক-কৃষক নেতৃত্বে এক নূতন শাসন ও সমাজ- ব্যবস্থা প্রবর্তন করে এবং এতাবৎ-প্রচলিত ধনতান্ত্রিক সাম্রাজ্যবাদী রাজনৈতিক আদর্শের এক প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে আবির্ভূত হয়। সমাজতন্ত্র নিয়ে উনিশ শতকের শেষ পর্ব থেকেই য়ুরোপে ও পৃথিবীর অন্যত্র আলাপ-আলোচনা চলছিল, শোষিত মানুষদের সপক্ষে নানাবিধ কার্যবিধির চর্চা ও আন্দোলনও শুরু হয়েছিল বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে ও অনেক চিন্তাবিদের ভাবনায়, রবীন্দ্রনাথও তার ব্যতিক্রম ছিলেন না। তাই অত্যাচারী শাসক জারের শাসন থেকে যখন রাশিয়ার মুক্তি ঘটল ও এতদিনের অবহেলিত শ্রমজীবী মানুষের মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হবার সম্ভাবনা দেখা দিল, রবীন্দ্রনাথ তখন স্বভাবতই খুশি হয়েছেন ও তার অগ্রগতির সংবাদ জানার চেষ্টাও করেছেন নানাভাবে। এ দেশে ব্রিটিশ গবর্মেন্টের চোখে রাশিয়ার শাসনব্যবস্থার পরিবর্তন ও অগ্রগতির সংবাদ তখন বিপজ্জনক বলে গণ্য, তাই রবীন্দ্রনাথের পক্ষে সেখানকার অধুনাতন উত্থানপতনের খবর পাওয়া সহজ ছিল না, সম্ভবত তিনি তা জানতেনও না। তবু বলশেভিকদের কার্যকলাপ ও মূল নীতিগুলি সম্বন্ধে তিনি অবহিত ছিলেন বলেই মনে হয়। নইলে 'রথযাত্রা' ও 'রক্তকরবী' নাটকে এবং 'সংহতি'-প্রমুখ প্রবন্ধে যে-ধরনের ইঙ্গিত পাওয়া যায় তা প্রকাশ করা তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না। তাই সংক্ষিপ্ত আকারে হলেও প্রসঙ্গটির কিছু আলোচনা আবশ্যক।

আধুনিক পঞ্জিকা অনুযায়ী 7 Nov 1917-এর বিপ্লবের পরে সমমনোভাবাপন্ন একটি বামপন্থী সমাজতান্ত্রিক দলের সহযোগিতায় লেনিনের [Vladimir Ilich Lenin, 1870–1924] নেতৃত্বে বলশেভিকেরা সরকার গঠন ক'রে দেশের পুনর্গঠনের লক্ষ্যে প্রথমেই য়ুরোপীয় মহাযুদ্ধ থেকে রাশিয়াকে সরিয়ে আনার অভিপ্রায়ে য়ুক্রেন, পোলান্ড ও বাল্টিক অঞ্চল এবং প্রচুর ক্ষতিপূরণের বিনিময়ে জার্মানির সঙ্গে 3 Mar 1918 'Treaty of Brest-Litovsk' স্বাক্ষর করে; তাছাড়া কৃষকদের অনুমতি দেওয়া হয় ব্যক্তিগত জমিজমা দখল করার জন্য। কিন্তু বলশেভিকদের এইসব কাজ ব্যাপক অসন্তোষ সৃষ্টি করে। সেনাবাহিনীর প্রাক্তন অফিসারদের একাংশ বিভিন্ন বিদেশি শক্তির সাহায্যপুষ্ট হয়ে প্রতিবিপ্লবী সংঘর্ষের সূচনা করে। এদের বলা হত হোয়াইট আর্মি, তাদের মোকাবিলা করার জন্য লেনিনের ঘনিষ্ঠ সহযোগী ট্রটস্কির [Leon Trotsky, 1879–1940] নেতৃত্বে রেড আর্মি নামে বলশেভিকদের একটি সেনাবাহিনী তৈরি হয়। এই সংঘর্ষের মধ্যে Aug 1918-এ লেনিন এক আক্রমণে গুলিবিদ্ধ হন। পরিণামে জনসাধারণের মধ্যে প্রতিবিপ্লবীর খোঁজে লাল সন্ত্রাস শুরু হয়। রেড আর্মির রসদ সরবরাহের জন্য কৃষকদের কাছ থেকে জোর করে শস্য ও খাদ্যদ্রব্য কেড়ে নেওয়া ও শহরাঞ্চলে কারখানাগুলির জাতীয়করণ ও শ্রমিকদের কঠোর শৃঙ্খলার অধীন করা প্রভৃতি দমনমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হয়। এই যুদ্ধকালীন সাম্যবাদী [War Communism] কার্যকলাপের ফলে দেশে শস্য ও শিল্পোৎপাদনে ব্যাপক ঘাটতি দেখা দেয়। শহর ও গ্রামাঞ্চলে তীব্র অসন্তোষ, ধর্মঘট ইত্যাদি বলশেভিক সরকারের অস্তিত্বকে অনিশ্চিত করে তোলে। এই অবস্থায় Mar 1921-এ অনুষ্ঠিত রাশিয়ান কম্যুনিস্ট পার্টির দশম কংগ্রেসে যুদ্ধকালীন সাম্যবাদী অর্থনীতি থেকে পশ্চাদপসরণ করে লেনিন নূতন অর্থনৈতিক ব্যবস্থা [New Economic Policy (NAP)] ঘোষণা করতে বাধ্য হন।

দেশের অভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলার মধ্যেও লেনিন Mar 1919-এ অনুষ্ঠিত তৃতীয় আন্তর্জাতিক [Third International] বা Comintern-এ রাশিয়ান বিপ্লবের আদর্শে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বিপ্লব রপ্তানি করার আদর্শ ঘোষণা করেন— কিন্তু য়ুরোপের দেশগুলিতে কোনো সাড়া না পেয়ে তাঁর দৃষ্টি পড়ে এশিয়ার সাম্রাজ্যবাদী শাসনের অধীন দেশগুলির দিকে, তবে সেই সময়ে অতি অল্পসংখ্যক ভারতীয় ও চিনের কিছু ছাত্র-যুবক ও বুদ্ধিজীবী ছাড়া আর-কোনো দেশ থেকে বিশেষ সাড়া পাওয়া যায়নি।

গুলিবিদ্ধ হওয়ার পরে সুস্থ হয়ে উঠলেও নানা সংকটে ও অত্যধিক কাজের চাপে লেনিনের স্বাস্থ্যের অবনতি হতে থাকে। May 1922-তে তিনি হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হন, তিন মাস বিশ্রামের পরে সুস্থ হয়ে কাজ শুরু করলেও Dec 1922-তে তিনি দ্বিতীয়বার উক্ত রোগে আক্রান্ত হন। এই মাসেই রাশিয়ান সেনাবাহিনীর অধীনস্থ বা কম্যুনিস্ট শাখাগুলির দ্বারা শাসিত রাষ্ট্রদের সমন্বয়ে Union of Soviet Socialist Republics (USSR) প্রতিষ্ঠিত হয়। লেনিনের জীবৎকালেই তাঁর স্থলাভিষিক্ত হওয়ার জন্য ক্ষমতার দ্বন্দ্ব আরম্ভ হয়েছিল, মুখ্য দ্বন্দ্ব ছিল ট্রটস্কি ও কম্যুনিস্ট পার্টির তৎকালীন সেক্রেটারি-জেনারেল স্ট্যালিনের [Joseph Stalin, 1879–1953] মধ্যে। লেনিন চাইছিলেন ক্ষমতা পরিচালিত হোক এক যৌথ নেতৃত্বের দ্বারা। এই অবস্থায় তাঁর বিখ্যাত 'Testament' শ্রুতিলিখিত হয়, যাতে তিনি পার্টির প্রধান ছ'জন নেতার মূল্যায়ন ক'রে ক্ষমতার অপপ্রয়োগের অপরাধে স্ট্যালিনের পদচ্যুতির সুপারিশ ও সোভিয়েত সরকারের স্বৈরতন্ত্রী কার্যকলাপের নিন্দা ক'রে ভবিষ্যৎ কর্মসূচির রূপরেখা নির্দেশ করেন। 21 Jan 1924 [৭ মাঘ ১৩৩০] লেনিনের মৃত্যু হয়, কিন্তু ইতিমধ্যে কেন্দ্রীভূত ক্ষমতার অধিকারী স্ট্যালিনের চক্রান্তে তাঁর শেষ ইচ্ছাসমূহের রূপায়ণ বা প্রচার হয়নি।

তার পরবর্তী সোভিয়েত যুনিয়নের ইতিহাস ভালো-মন্দে মেশানো, যার বাহ্যিক উন্নতি অন্তর্নিহিত দুর্বলতার চাপে 1991-এ ভেঙে পড়ে। বাহ্যিক উন্নতিসমূহের মধ্যে আছে শিক্ষা ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থার সার্বিক সম্প্রসারণ, কলকারখানার আধুনিকীকরণ ও বৈজ্ঞানিক গবেষণায় উৎসাহদান— কিন্তু সেগুলির প্রধান লক্ষ্য ছিল মানবকল্যাণের চেয়ে নূতন নূতন মারণাস্ত্রের উদ্ভাবন; মন্দের অংশে ছিল স্ট্যালিনের নিরঙ্কুশ ক্ষমতার প্রতিদ্বন্দ্বী সন্দেহে নির্বিচার ষড়যন্ত্র ও হত্যা, গোয়েন্দা-পুলিশি বাতাবরণে রুদ্ধশ্বাস জনজীবন ও মানুষের ব্যক্তিগত প্রয়োজনের দিকে না তাকিয়ে যুদ্ধাস্ত্র-নির্মাণে অত্যধিক মনোযোগ। ব্যক্তিগত সম্পত্তির বিলোপসাধন করাতে মানুষের ব্যক্তিগত উন্নতির আকাঙ্ক্ষা হ্রাস পায়; শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতি রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণাধীন হওয়ায় সার্বিক সাংস্কৃতিক অবনতি ও পার্টিতন্ত্রের কর্তাভজা সম্প্রসারণের ফলে দুর্নীতি গগনচুম্বী হয়ে ওঠে।

প্রাসঙ্গিক তথ্য : ৩

বিশ্বভারতীর 1923-র বার্ষিক প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, বছরের শুরু থেকে আর্থিক দায়দায়িত্ব পরিচালনার ভার বিশ্বভারতী অফিসই গ্রহণ করে। মোট সদস্য ছিলেন ৪১৬ জন, তাঁদের মধ্যে বাংলার ২৭৮ ও বাইরের সদস্য-সংখ্যা ১৩৮; ৯১ জন আজীবন সদস্যের মধ্যে ১৪ জন বাংলা ও বহির্বঙ্গ থেকে ৭৭ জন সদস্য হয়েছিলেন; আজীবন সদস্য হতে গেলে এককালীন ২৫০ টাকা দিতে হত, সাধারণ সদস্যের বার্ষিক চাঁদা ছিল ১২ টাকা।

কর্মকর্তাদের মধ্যে প্রধান পদে ছিলেন বোম্বাইয়ের বিচারক দিনশা মোল্লা, বেনারসের ভগবানদাস, স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, স্যার নীলরতন সরকার ও সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর। অ্যান্ডরুজ উপাচার্যের পদ ত্যাগ করলে সুরেন্দ্রনাথ তাঁর স্থলে মনোনীত হন, অবশ্য তিনি প্রধানের পদেও থেকে যান। সুরেন্দ্রনাথ অর্থসচিবের পদ ত্যাগ করলে সতীশরঞ্জন দাশ তাঁর স্থলাভিযুক্ত হন। গত বৎসরের প্রথম ছয় মাসে ঘাটতি ছিল প্রায় পঞ্চাশ হাজার টাকা, এর ফলে প্রতিটি বিভাগে কর্মী ছাঁটাই অনিবার্য হয়ে পড়ে।

উত্তরবিভাগে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ছিল ৩৪, যাদের মধ্যে মাদ্রাজের ২ জন, গুজরাটের ৬ জন, কুর্গের ১ জন, ত্রিবাঙ্কুরের ২ জন ছিলেন। ১২ জন অধ্যাপক ছিলেন : বিধুশেখর শাস্ত্রী, ভিন্টারনিৎস, অ্যান্ডরুজ, বেনোয়া, ক্ষিতিমোহন, কলিন্‌স, কপিলেশ্বর মিশ্র, ফণিভূষণ বসু, সরোজকুমার দাশ, অশোক চট্টোপাধ্যায়, এ. বাখম্যান, ভি. লেসনি ও অমরেন্দ্রনাথ তর্কতীর্থ। এছাড়া প্যাট্রিক গেডেস, তারাপোরওয়ালা, জি.এস. জোন্‌স্, খামবাটা, রাধাকমল ও রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় আংশিক সময়ে অধ্যাপনা করেছিলেন। পাঠ্যসূচিতে ছিল সংস্কৃত, প্রাকৃত, তিব্বতি, ধর্মশাস্ত্র, ফারসি, জার্মান, ফরাসি, লজিক, ন্যায়, বেদান্ত, গ্রিক, ইংরেজি, বাংলা এবং অর্থশাস্ত্র ও সমাজতত্ত্ব।

পূর্ববিভাগের অধ্যক্ষ ছিলেন প্রমদারঞ্জন ঘোষ। ২০ জন ছাত্রী-সহ পড়ুয়ার সংখ্যা ছিল বৎসর-শেষে ১৫৭, তাদের মধ্যে ৩ জন মুসলমান ও ৩১ জন অবাঙালি। মিস শ্লোমিথ ফ্লাউম নিচের ক্লাশগুলিতে হাতের কাজ শিখিয়েছেন। আমাদের পূর্বপরিচিত গায়ক সমরেশ সিংহ ও সমীর নামে অপর একটি ছাত্র প্রথম বিভাগে

ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন, বর্তমান বৎসরে মাত্র এই দুজনই এই বিদ্যালয় থেকে উক্ত পরীক্ষায় বসেছিলেন।

নন্দলাল বসুর অধ্যক্ষতায় কলাভবনে ৬ জন ছাত্রী-সহ ১৪ জন শিক্ষার্থী ছিল। অসিতকুমার হালদার জয়পুর আর্ট ম্যুজিয়মে কর্মগ্রহণ করেন। দিনেন্দ্রনাথ ও ভীমরাও শাস্ত্রীর অধীনে সংগীতবিভাগে ৬ জন ছাত্রী-সহ ১২ জন শিক্ষার্থী ছিল। রণজিৎ সিংহ যন্ত্রসংগীত শিক্ষা দেন।

নারীবিভাগের দায়িত্বে ছিলেন স্নেহলতা সেন, তিনি এক বৎসরের ছুটি নিলে হেমবালা সেন তাঁর দায়িত্ব নেন। ৩০ জন ছাত্রীর মধ্যে ১২ জন বোর্ডিঙে থাকতেন।

ইন্ডিয়ান প্রেস থেকে ছাব্বিশ হাজার টাকা দিয়ে রবীন্দ্রনাথের প্রকাশিত পুস্তকাবলি কেনা হয়, বৎসর শেষে প্রায় ৭৮ হাজার টাকার বইপত্র প্রকাশনা বিভাগের সম্পত্তি ছিল, প্রায় ২১ হাজার টাকার বই বিক্রয় হয়। দ্বিজেন্দ্রনাথ ও বলেন্দ্রনাথের গ্রন্থাবলির স্বত্ব বিশ্বভারতীকে দান করা হয়।

সুরুল কৃষিবিভাগের ডিরেক্টর এল্‌ম্‌হার্স্ট মার্চ মাসে চিন, আমেরিকা প্রভৃতি দেশ পরিদর্শনে গেলে সন্তোষচন্দ্র মজুমদার অস্থায়ী ডিরেক্টর হন। তাঁকে সাহায্য করেন আর্থার গেডেস, খামবাটা ও আয়েঙ্গার। অ্যান্টি-ম্যালেরিয়া সোসাইটির ডাঃ গোপাল চট্টোপাধ্যায় যথেষ্ট সহায়তা করেছেন। এই বৎসর থেকে 'শ্রীনিকেতন' নামটি আনুষ্ঠানিকভাবে ব্যবহৃত হতে থাকে।

উপকরণের অভাবে শ্রীনিকেতন-সহ বিশ্বভারতীর পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচনার কাজ খুবই দুরূহ। এতদিন 'শান্তিনিকেতন' পত্রিকার 'আশ্রম সংবাদ', *Visva-Bharati Bulletin* এবং কিছু মুদ্রিত প্রতিবেদন ও স্মৃতিচারণ ছাড়া আর-কোনো উপাদান পাওয়া যেত না। এখন অবস্থাটি কিঞ্চিৎ সহজ হয়েছে সংসদ, কর্মসমিতি, অর্থসমিতি, সুরুল বা শ্রীনিকেতন সমিতির হস্তলিখিত কার্যবিবরণীগুলি ব্যবহারের সুযোগ পাওয়ায়। কাজটি স্বতন্ত্রভাবে খুঁটিনাটি-সহ পূর্ণাঙ্গ আকারে করা আবশ্যক— আমরা প্রয়োজন অনুসারে এই-সব উপকরণ কিছু-কিছু ব্যবহার করব।

এই নবলব্ধ তথ্যের ভিত্তিতে অন্তত সুরুল বা শ্রীনিকেতন সমিতির কার্যকলাপের বিষয়ে আমাদের একটু ফিরে দেখা দরকার, যে অংশটি প্রকৃতপক্ষে পূর্ববর্তী খণ্ডের শেষ দুটি অধ্যায়ে বর্ণিত হওয়া উচিত ছিল।

সুরুল বা শ্রীনিকেতন সমিতির অধিবেশনসমূহে গৃহীত সিদ্ধান্তগুলি ['Minutes of the meetings of the Board of Directors of the Department of Agriculture of Visva-Bharati, Santiniketan'] লিখিত হয়েছিল একটি মোটা বাঁধানো খাতায়, আগের সভার লিখিত বিবরণী পরবর্তী সভায় অনুমোদিত হলে যথারীতি সেই সভার ভারপ্রাপ্ত সভাপতি ও সচিব তাতে স্বাক্ষর করতেন— এইভাবে অনেকগুলি বিবরণীতে আমরা রবীন্দ্রনাথের মূল স্বাক্ষর দেখতে পাই।

এই খাতা থেকে প্রাপ্ত তথ্যে দেখা যায়, কৃষিবিভাগের অস্থায়ী কর্মকর্তাদের প্রথম সভাটি হয় 13 Nov 1921 [রবি ২৭ কার্তিক ১৩২৮] তারিখে, এল্‌ম্‌হার্স্ট শান্তিনিকেতনে আসার অব্যবহিত পরেই। এই সভায় তিনি ছাড়া রথীন্দ্রনাথ, সন্তোষচন্দ্র ও গৌরগোপাল ঘোষ উপস্থিত ছিলেন। এখানে গৃহীত প্রথম সিদ্ধান্তটি হল, প্রতিষ্ঠানটি বিশ্বভারতীর অন্তর্ভুক্ত হবে, যার সংবিধান আগামী সপ্তাহেই প্রকাশিত হবে, এর নাম হবে 'Department of Agriculture, Santiniketan, Bengal', চ্যান্সেলার হবেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। প্রাথমিকভাবে এল্‌ম্‌হার্স্ট, রথীন্দ্রনাথ, সন্তোষচন্দ্র ও গৌরগোপাল বোর্ড অব্ ডিরেক্টরস্-এ থাকবেন, এল্‌ম্‌হার্স্ট হবেন

চেয়ারম্যান এবং রথীন্দ্রনাথ সচিব ও কোষাধ্যক্ষ। ঠিক হয়, ডিরেক্টর ও ছাত্রেরা যথাশীঘ্রসম্ভব সুরুলে গিয়ে কাজ শুরু করবেন— পোলট্রি, মৌমাছি-পালন, গোরু ও ছাগল-সমন্বিত গোশালা, উদ্যান-চর্চা, শাকসব্জি-উৎপাদন, প্রকৃতি-পর্যবেক্ষণ, সমবায়, দারুশিল্প ও ধাতুশিল্প শিক্ষা ও চর্চা হবে প্রতিষ্ঠানটির লক্ষ্য। Dr. Liberty Hyde Bailey, Sir Michael Sadler, Dr. H. Mann, K.T. Paul, S.N. Seal এবং প্রফুল্লচন্দ্র রায় ও জগদীশচন্দ্র বসু হবেন প্রধান পৃষ্ঠপোষক।

3 Dec 1921 রথীন্দ্রনাথের বাসগৃহে অনানুষ্ঠানিক দ্বিতীয় অধিবেশনে অন্যান্যদের সঙ্গে সুরেন্দ্রনাথ করও উপস্থিত ছিলেন। এক লক্ষ টাকা অনুদান পাওয়ার সম্ভাবনার পরিপ্রেক্ষিতে আগামী বৎসরের ব্যয়বরাদ্দ বিষয়ে ঘরোয়াভাবে এখানে আলোচনা হয়। অতঃপর অতিরিক্ত জমি সংগ্রহের জন্য ৩৫ হাজার টাকা বরাদ্দ করা ছাড়া খুঁটিনাটি বিবিধ খরচের হিসাব-সহ ৯৯৮০০ টাকার একটি বাজেট কার্যবিবরণীতে যুক্ত করে দেওয়া হয়।

আমরা জানি, এর পরে 6 Feb 1922 [সোম ২৩ মাঘ] তারিখে কোনোরকম অনুষ্ঠান ছাড়াই সুরুল কৃষি-বিদ্যালয়ের কাজ শুরু হয়— যে-প্রসঙ্গ এই খাতাটিতেও উল্লেখিত হয়নি।

অতঃপর 23 Jul 1922 [রবি ৭ শ্রাবণ ১৩২৯] রবীন্দ্রনাথের সভাপতিত্বে সুরুলে কৃষিবিদ্যালয়ের বোর্ড অব্ ডিরেক্টর্স-এর প্রথম আনুষ্ঠানিক অধিবেশন হল। রবীন্দ্রনাথ, এল্‌ম্‌হার্স্ট, অ্যান্ডরুজ, সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রথীন্দ্রনাথ, প্রশান্তচন্দ্র, ক্ষিতিমোহন, কালীমোহন, গৌরগোপাল, সন্তোষচন্দ্র ও সুরেন্দ্রনাথ কর এই সভায় উপস্থিত ছিলেন।

সভার শুরুতে প্রাথমিক অধিবেশনের কার্যবিবরণী অনুমোদনের পরে সন্তোষচন্দ্র মজুমদারকে সুরুল সমিতির সচিব পদে নির্বাচন করা হয়। সিদ্ধান্ত হয়, বৈধ সভার জন্য ডিরেক্টর [বা তাঁর অনুপস্থিতিতে কার্যনির্বাহী ডিরেক্টর]-সহ অন্তত চারজন সদস্যের উপস্থিতি আবশ্যক। সমিতির সাধারণ অধিবেশন প্রতি মাসের প্রথম রবিবারে অনুষ্ঠিত হবে [যে-বিধি প্রায়শই লঙ্ঘিত হয়েছে]। অতঃপর সুরুল-সচিব এল্‌ম্‌হার্স্ট বলেন, রবীন্দ্রনাথ-প্রদত্ত ৭০ হাজার টাকার ভূসম্পত্তি ও গৃহসরঞ্জামাদি ছাড়া মিসেস্ ডরোথি হুইটনি স্ট্রেটের অনুদান এক লক্ষ চার হাজার টাকা পাওয়ার ফলে প্রতিষ্ঠানটির অর্থনৈতিক পরিস্থিতি এখন মোটামুটি ভালো — কিন্তু ভবিষ্যৎ সম্প্রসারণের জন্য আরও অর্থের সংস্থান করাও আবশ্যক। 30 Jun 1922 তারিখের হিসাব অনুযায়ী, বেঙ্গল ন্যাশানাল ব্যাঙ্কে প্রতিষ্ঠানটির ৩৫ হাজার টাকার স্থায়ী আমানত ও ন্যাশানাল ব্যাঙ্ক অব্ ইন্ডিয়ায় ২১ হাজার টাকার চলতি আমানত রক্ষিত আছে।

6 Aug 1922 [রবি ২১ শ্রাবণ] সমিতির দ্বিতীয় সাধারণ অধিবেশনে রবীন্দ্রনাথ, অ্যান্ডরুজ, রথীন্দ্রনাথ, সন্তোষচন্দ্র, সুরেন্দ্রনাথ কর, গৌরগোপাল, কালীমোহন ও ক্ষিতিমোহন উপস্থিত ছিলেন। প্রথম ও দ্বিতীয় প্রস্তাবে বলা হয়, কৃষিবিদ্যালয় থেকে বহিষ্কৃত ও পরিত্যাগকারী চারজন ছাত্রের স্থলে যাদের নেওয়া হবে তাদের কাজকর্ম পর্যালোচনা করে ডিরেক্টররা সন্তুষ্ট হলে তবেই তারা সমস্ত সুবিধার অধিকার পাবে। বাজেট কমিটির পক্ষে রথীন্দ্রনাথ জানান, ছয় মাসের বিবরণী এখনও অসমাপ্ত আছে। সভাপতি রবীন্দ্রনাথ কয়েকজন সদস্যের সঙ্গে একমত হয়ে বলেন, আর্থিক পরিস্থিতি বিবেচনা ক'রে গৃহনির্মাণ ও জমিসংগ্রহের জন্য ব্যয়ের ক্ষেত্রে সতর্কতা আবশ্যক।

3 Sep 1922 [রবি ১৭ ভাদ্র] শান্তিনিকেতনে অনুষ্ঠিত সমিতির তৃতীয় সাধারণ অধিবেশনে রবীন্দ্রনাথ, অ্যান্ডরুজ, এল্‌ম্‌হার্স্ট, রথীন্দ্রনাথ, কালীমোহন, সুরেন কর, গৌরগোপাল ও সন্তোষচন্দ্র উপস্থিত ছিলেন।

গৌরগোপাল গত ছয় মাসের কার্যবিবরণী উপস্থাপিত করে জানান, সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের জন্য আরও অর্থের প্রয়োজন এবং জলাশয়, ছাত্রদের বাসস্থান ও কর্মশালা তৈরির কাজ সমাপ্ত করতে বৎসরখানেক সময় লাগবে।

7 Dec 1922 [বৃহ ২১ অগ্র] সুরুলে এল্‌ম্‌হার্স্টের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত চতুর্থ সাধারণ সভায় রথীন্দ্রনাথ, গৌরগোপাল, সন্তোষচন্দ্র ও কালীমোহনের উপস্থিতিতে কয়েকটি উপবিধি সংশোধিত হয়। পি.সি. গুপ্ত ডেয়ারি ম্যানেজার, শচীমোহন ভৌমিক অফিস-অ্যাসিস্ট্যান্ট, ননীগোপাল রায় অফিস-সুপারিন্টেন্ডেন্ট পদে নিযুক্ত হন— একজন দক্ষ বয়নশিল্পীকে নির্বাচন করার দায়িত্ব এল্‌ম্‌হার্স্টকে দেওয়া হয়। Dr. L.H. Bailey-কে 1923–24-এ অতিথি-অধ্যাপক হিসাবে আমন্ত্রণের প্রস্তাব গৃহীত হয়।

29 Dec 1922 [শুক্র ২১ পৌষ] সুরুলকুঠিতে রবীন্দ্রনাথের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত পঞ্চম মাসিক অধিবেশনে গ্রেচেন গ্রিন ও নন্দলাল বসুকে সমিতির সদস্য হিসেবে মনোনীত করা হয়। রবীন্দ্রনাথের পরামর্শে সুরুলের কর্মীদের একটি সভায় গৃহীত একটি প্রস্তাব সংসদের অনুমোদনের জন্য পাঠানোর সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় — এর একটি অংশ উদ্ধারযোগ্য :

'That so far as its function of Extension is concerned, and this shall be understood to include all activities relating to the reorganization or reconstruction of rural industries and the earning of its own income through agricultural or business enterprise, the Department shall make it its duty to welcome and stimulate to the full the cooperation of any other bodies, public or private which can be of help in the forwarding of such extension work.

That, with the assent of the Surul Samiti, the Department shall co-operate to the full with the Departments of Agriculture, of Industries, of Public Health or of any other Government Department interested in extension work, as well as with the forces of Government operating in the District of Birbhum, in so far as it finds such co-operation desirable and advantageous to the promotion of Extension work.'

সরকারি সাহায্যকে অচ্ছুত জ্ঞান করার গোঁড়ামি রবীন্দ্রনাথ যে শেষপর্যন্ত ত্যাগ করেছেন, এটিকে বাস্তবজ্ঞানের পরিচয় বলে গণ্য করা যায়। সম্ভবত এল্‌ম্‌হার্স্টের প্রভাব এখানে কার্যকর হয়েছিল।

19 Feb 1923 [সোম ৭ ফাল্গুন] রবীন্দ্রনাথের সভাপতিত্বে কলাভবনে সুরুল সমিতির ষষ্ঠ মাসিক অধিবেশনে এল্‌ম্‌হার্স্ট, গ্রেচেন গ্রিন, কালীমোহন, কেদারেশ্বর গুহ, রথীন্দ্রনাথ, সন্তোষচন্দ্র, নন্দলাল, সুরেন কর ও গৌরগোপাল উপস্থিত ছিলেন। অর্থসমিতির কাছে পাঠানোর জন্য এল্‌ম্‌হার্স্ট সংশোধিত বাজেট পেশ করার পর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, চিন, জাপান ও আমেরিকা ভ্রমণের জন্য তাঁর অনুপস্থিতির সময়ে সন্তোষচন্দ্র সুরুল-সচিব হিসেবে কাজ করবেন। এরপর এল্‌ম্‌হার্স্ট কৃষিবিভাগের সাধারণ নীতি বর্ণনা ক'রে বলেন, বর্তমানে এখানে ন'জন নিয়মিত ও দু'জন বিশেষ ছাত্র আছে। বাসস্থানের ব্যবস্থা হলে আরও দশ-পনেরো জন ছাত্রকে এখানে নেওয়া যেতে পারে। বিভিন্ন বিভাগের সমস্যা ও সমাধানের পথ নির্দেশ করে তিনি বলেন : 'Village organization work is going on well; this is our main work and our other departments

are feeders to this: we are gradually winning the friendship and affection of the villagers and cultivators and our students have now begin to show a real interest in all that concerns their life and welfare.'

এইখানে আমরা আলোচ্য সময়ে পৌঁছে গেছি বলে অতীত বিবরণের সংযোজন সমাপ্ত করতে পারি। তবে বর্তমানের প্রতিটি অধিবেশনের কার্যবিবরণী গতানুগতিকতার কারণে বর্ণনাযোগ্য নয়।

১ বৈশাখ ১৩৩০ [শনি 14 Apr 1923] প্রাতে রবীন্দ্রনাথ মন্দিরে নববর্ষের উপাসনা করেন, 'উপাসনার পর আম্রকুঞ্জে আশ্রমবাসী সকলে সমবেত হইয়াছিলেন। সেখানে পরস্পর পরস্পরকে নূতন বৎসরের সাদর সম্ভাষণ জানান। সেখানেই সকলের জলযোগের আয়োজন করা হইয়াছিল। এই উৎসব উপলক্ষ্যে কলিকাতা হইতে কয়েকজন অতিথি আশ্রমে আসিয়াছিলেন।'[১৭২]

বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠার পর থেকে বিদেশি অতিথি-অধ্যাপক বা বিশিষ্ট অতিথির আগমন অনেক বেড়ে যাচ্ছিল। তখন এঁদের থাকার জায়গা ছিল শান্তিনিকেতন-বাড়ি বা অন্য-কোনো সাময়িক বাসস্থান। তাই একটি নির্দিষ্ট অতিথিনিবাসের দরকার ছিল, কিন্তু তার জন্য অর্থের সংস্থান করাই ছিল কঠিন। গত বৎসর রবীন্দ্রনাথ যখন বোম্বাই গিয়েছিলেন, তখন সেখানকার পার্শি-সম্প্রদায়ের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপিত হয়, পার্শি ধনকুবের স্যার রতন টাটার [Sir Ratanji Tata, 1871–1932] ফরাসি স্ত্রী লেডি রতন টাটার সঙ্গে একটি নিমন্ত্রণ সভায় আলাপের কথা ক্ষিতিমোহন সেন উল্লেখ করেছেন [দ্র রবিজীবনী ৮। ২৬১]। সম্ভবত এরই পরিণতি ঘটল স্যার রতন টাটা ট্রাস্ট থেকে প্রাপ্ত পঁচিশ হাজার টাকার অনুদানে। 13 Jan 1923 জোড়াসাঁকোর বিচিত্রা বাড়িতে অনুষ্ঠিত সংসদের উক্ত বৎসরের প্রথম অধিবেশনের কার্যবিবরণীর ১৮শ ধারায় লেখা হয়েছে :

Read a letter from the Secretary to the Trustees of Sir Ratan Tata offering a donation of Rs. 25,000/- for a building to be named after him.

The Trustees of Sir Ratan Tata have considered at their last meeting your letter dated the 7th December last and also one dated the 14th idem from Mr. Hirji P. Morris ...decided to give you Rs. 25,000/- for the construction of a special block for the accomodation of scholars from foreign countries....

প্রস্তাবটির জন্য ট্রাস্টিদের ধন্যবাদ জানিয়ে ভবনটির নকশা প্রস্তুত করিয়ে তাঁদের অনুমোদনের সংবাদ জানানো হয় 23 Apr-এ অর্থসমিতির অধিবেশনে। ১ বৈশাখ [14 Apr] ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের পরে দরপত্র আহ্বান করা হয় ও শান্তিনিকেতনের প্রাক্তন ছাত্র ইংল্যান্ডে শিক্ষিত বাস্তুকার চণ্ডীচরণ সিংহের প্রদত্ত চব্বিশ হাজার টাকার প্রস্তাবটি কর্মসমিতি গ্রহণ করলে তিনি ভবন-নির্মাণের দায়িত্ব লাভ করেন।

২ বৈশাখ [রবি 15 Apr] সকাল সাতটায় রবীন্দ্রনাথের সভাপতিত্বে সংসদের দ্বিতীয় অধিবেশন বসে; শান্তিনিকেতনে অধিবেশন বসলেও রবীন্দ্রনাথ-যে প্রত্যেক অধিবেশনে উপস্থিত থাকতেন তা নয়— এত সদস্যও হাজির হতেন না; নববর্ষের উৎসব উপলক্ষে কলকাতা থেকে বহু সদস্য এসেছিলেন, আর রবীন্দ্রনাথের উপস্থিতি অনেককে আকর্ষণ করেছিল। উপস্থিত ছিলেন বিধুশেখর শাস্ত্রী, প্রমদারঞ্জন ঘোষ, জগদানন্দ রায়, ক্ষিতিমোহন সেন, নেপালচন্দ্র রায়, নন্দলাল বসু, সুরেন্দ্রনাথ কর, গৌরগোপাল ঘোষ, তেজেশচন্দ্র সেন, দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, স্নেহলতা সেন, হেমবালা সেন, প্রতিমা ঠাকুর,

কিরণবালা সেন, ড তারাপোরওয়ালা, সন্তোষচন্দ্র মজুমদার, কালীমোহন ঘোষ, চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য, প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবেন্দ্রমোহন বসু এবং যুগ্ম-কর্মসচিব রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ। নারীবিভাগের দায়িত্ব থেকে স্নেহলতা সেন এক বৎসরের ছুটি নিয়েছিলেন ও তাঁর স্থলে হেমবালা সেনকে মাসিক ১০০ টাকা বেতনে নিয়োগ করা হয়, স্নেহলতা আর-কখনও এই কাজে ফিরে আসেননি— তবে সংসদের বর্তমান অধিবেশনে তিনি উপস্থিত ছিলেন।

এই দিনের অধিবেশনে অনেকগুলি প্রস্তাব গৃহীত হয়, তাদের মধ্যে দুটি উল্লেখযোগ্য। আমরা পূর্ববর্তী খণ্ডে বলেছি, তাজমহল ফিল্ম কোম্পানি এল্‌ম্‌হার্স্টের নির্দেশে চিনদেশে প্রদর্শনের জন্য শ্রীনিকেতনের কাজকর্মের বিষয়ে একটি তথ্যচিত্র নির্মাণ করেছিল, এই অধিবেশনে তাদের পাওনা ২৩০০ টাকা মঞ্জুর করা হয়। অন্য একটি প্রস্তাবে শান্তিনিকেতন প্রেস, গ্রন্থপ্রকাশ, সাময়িকপত্র ও প্রচারের দায়িত্ব 'গ্রন্থপ্রকাশ সমিতি'-র উপর অর্পিত হয়— তার সদস্য ছিলেন রবীন্দ্রনাথ, সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, তপনমোহন চট্টোপাধ্যায়, নেপালচন্দ্র রায়, রথীন্দ্রনাথ ও প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ। অবশ্য শেষোক্ত ব্যক্তিকেই অধিকাংশ দায়িত্ব ও রবীন্দ্রনাথের গঞ্জনা ভোগ করতে হত।

উল্লেখ্য, বিশ্বভারতীর ত্রৈমাসিক ইংরেজি মুখপত্র *The Visva-Bharati Quarterly*-র প্রথম বর্ষ প্রথম সংখ্যা April 1923-তে প্রকাশিত হয়েছিল, এই সংখ্যাটির সম্পাদক হিসেবে রবীন্দ্রনাথের নাম মুদ্রিত হয়, পরের সংখ্যা থেকে সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্পাদক হন, তবে পরামর্শদাতা ও নির্দেশকের ভূমিকা রবীন্দ্রনাথই পালন করতেন।

নরেশচন্দ্র মিত্র ও শিশিরকুমার ভাদুড়ীর উদ্যোগে 1922-তে তাজমহল ফিল্ম কোম্পানি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, শরৎচন্দ্রের 'আঁধারে আলো'র চিত্ররূপ এঁদের প্রথম চলচ্চিত্র। 1923-তে নরেশচন্দ্র মিত্রের পরিচালনায় রবীন্দ্রনাথের 'মানভঞ্জন' গল্প অবলম্বনে একটি নির্বাক চলচ্চিত্র নির্মিত হয়, নরেশচন্দ্রই নায়ক গোপীনাথের ভূমিকায় অভিনয় করেন— এটি ভবানীপুরের রস থিয়েটারে [বর্তমান নাম 'পূর্ণ'] প্রদর্শিত হয়। অভিনয়ের নিন্দা ও প্রহঁয়ালিনাট্যও তাদের দ্বারা অভিনীত হয়। ১০ বৈশাখ চেক অধ্যাপক ভিনসেন্স লেসনিকে বিদায়সংবর্ধনা জানানো হয়। এরই কাছাকাছি কোনো দিন আঁদ্রে কার্পেলেসের বিদায়সভা অনুষ্ঠিত হয়। ১৩ বৈশাখ শিলঙে গ্রীষ্মবকাশ যাপনের উদ্দেশ্যে রবীন্দ্রনাথ সপরিবারে কলকাতা রওনা হন, ফলে এবারে আশ্রমে তাঁর জন্মদিন পালন করা হয়নি।

গ্রীষ্মবকাশের পরে বিশ্বভারতীর কাজ শুরু হয় ১১ আষাঢ়, এর দুদিন পরেই ১৩ আষাঢ় শিলং ভ্রমণ করে রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে ফিরে আসেন। শিলঙে থাকার সময়ে তিনি 'রক্তকরবী' নাটকের খসড়া রচনা করছিলেন, আশ্রমে এসে তিনি সেটি দুদিন সকলকে পড়ে শোনান। নাটকটি তিনি বহুবার সংস্কার করেন ও প্রায়ই আশ্রমবাসীদের পড়ে শুনিয়েছেন।

বিশ্বভারতীর জন্য অর্থসংগ্রহের উদ্দেশ্যে বিশ্বভারতী সম্মিলনী কলকাতায় 'বিসর্জন' অভিনয়ের আয়োজন করে, রবীন্দ্রনাথ জয়সিংহের ভূমিকা গ্রহণ করেন। কিন্তু ১৫ শ্রাবণ এম্পায়ার থিয়েটারে প্রথম অভিনয়ের আগে তিনি জ্বরাক্রান্ত হওয়ায় নাট্যানুষ্ঠান তখনকার মতো স্থগিত থাকে। সুস্থ হওয়ার পর ৮, ১০, ১১ ও ১২ ভাদ্র নাটকটি অভিনীত হয়ে উচ্চ প্রশংসা লাভ করে।

এই অভিনয়ে বিশ্বভারতীর তহবিলে যথেষ্ট অর্থাগম হয়। কিন্তু তৎসত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথকে কিছুদিন পরে আরও অর্থসংগ্রহের উদ্দেশ্যে গুজরাটের দেশীয় রাজ্যগুলি ভ্রমণ করতে হয়।

কিছুদিন আগে 17 Jul [১ শ্রাবণ] অর্থসমিতির বৈঠকে শতকরা ২৫ টাকা রয়্যালটি বা ২০ হাজার টাকার বিনিময়ে 'বসুমতী'র স্বত্বাধিকারী সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের সুলভ রবীন্দ্রগ্রন্থাবলি প্রকাশের প্রস্তাবটি বিবেচিত হয়; অর্থসমিতি ৫০ হাজার টাকা দাবি করলে বিষয়টি পরিত্যক্ত হয়।

অসহযোগ আন্দোলনের প্রভাবে বিদ্যালয়ের ছাত্রদের মধ্যে দাবিদাওয়ার পরিমাণ কিছু বেড়ে গিয়েছিল। খাদ্যের গুণাগুণ নিয়ে ক্ষোভ দেখা দিলে কর্তৃপক্ষ পাকশালায় নূতন ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন। 'কেবলমাত্র ছাত্রেরাই আজকাল স্কুলবিভাগের পাকশালায় আহার করিতেছে। উত্তরবিভাগের ছাত্রেরা তাঁহাদের নিজেদের আহারের সম্পূর্ণ পৃথক বন্দোবস্ত করিয়াছেন। ইহা ছাড়া আর যাঁহারা বাকি রহিলেন তাঁহাদের জন্য শান্তিনিকেতন-অতিথিশালার ম্যানেজার মহাশয়ের তত্ত্বাবধানে আর একটি পাকশালা খোলা হইয়াছে। বলাবাহুল্য এখানে যাঁহারা খাইবেন তাঁহাদের মাসের শেষে যথারীতি খাবার খরচ দিতে হইবে। আশ্রমের আহার্যবিভাগে উক্তরূপ বন্দোবস্ত হওয়ায় ছাত্রদের পূর্বাপেক্ষা অনেক সুবিধা হইয়াছে··· ছেলেদের সঙ্গে বসিয়া প্রতি মাসে দুইজন করিয়া অধ্যাপক রান্নাঘরে আহার করিবেন বলিয়া স্থির হইয়াছে।' যাঁরা বিদ্যালয়ের পাকশালায় খান না তাঁদের জন্য সমবায় ভাণ্ডার একটি মিষ্টান্নের দোকান খোলে। শ্রাবণ মাসের মাঝামাঝি কারখানায় বড়ো ডায়নামোটি চালু হওয়ায় আশ্রমিক ও ছাত্রদের খুবই সুবিধা হয়।

ছেলেদের ও মেয়েদের সাহিত্যসভা 'কণিকা'র কাজ ভালোই চলছিল। মেয়েরা 'লক্ষ্মীর পরীক্ষা' অভিনয় করে, ক্ষীরোর ভূমিকাভিনেত্রীর অভিনয় প্রশংসিত হয়। আশ্রমসম্মিলনীর পূর্ণিমা অধিবেশনে [৯ ভাদ্র : 26 Aug] মোলিয়েরের জ্যোতিরিন্দ্রনাথ-অনূদিত 'হঠাৎ নবাব' নাটকটির প্রথম তিনটি অঙ্ক অভিনীত হয়।

আশ্রমের বিশ্বভারতী সম্মিলনী [আমাদের পরিভাষায়, 'সম্মেলনী'] যথেষ্ট সক্রিয় ছিল। সম্পাদক ছিলেন অনাদিকুমার দস্তিদার ও সহ-সম্পাদক রমা মজুমদার। ২৭ আষাঢ় [12 Jul] কলাভবনে অনুষ্ঠিত সাধারণ অধিবেশনে প্রমথনাথ বিশীর সভাপতিত্বে গুজরাটি ছাত্র গিদওয়ানি বিশ্বভারতীতে তাঁর ছাত্রজীবনের প্রথম বৎসরের অভিজ্ঞতা বিবৃত করেন। ২৯ আষাঢ় বিশেষ অধিবেশনে অ্যান্ডরুজ তাঁর সাম্প্রতিক বিলাতপ্রবাসের বিবরণ দেন, তিনি কেনিয়া-সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা করেন ১৩ শ্রাবণ। ১০ শ্রাবণ মুজতবা আলির সভাপতিত্বে প্রমথনাথ স্বরচিত 'রথযাত্রা' নাটকটি পাঠ করেন। ১১ শ্রাবণ বিশেষ অধিবেশনে স্ট্যানলি জোন্স্ আমেরিকা সম্বন্ধীয় ভাষণে আব্রাহাম লিংকনের চরিতচিত্র বর্ণনা করেন। 'শেষে তিনি বলেন যে, যদিও তিনি শান্তিনিকেতনে অতিথিরূপে আসিয়াছিলেন, তবুও যে আতিথ্য এখানে পাইয়াছেন তাহা তিনি কখনও ভুলিবেন না। সেদিন একটি ছাত্র তাঁহাকে একটি পদ্ম উপহার দেন, তিনি বলেন, সেটি তিনি ভারতীয় চিত্তের স্বরূপ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন।' কিন্তু তিনি তখনই আশ্রম ত্যাগ করেননি, 25 Aug [৮ ভাদ্র] ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জকে স্বাধীনতা দেওয়ার জন্য আমেরিকা কোন্ পথ অনুসরণ করছে ও তাদের সমস্যাদি বিষয়ে আলোচনা করেন। ২৬ শ্রাবণ অধ্যাপক ফণীন্দ্রনাথ বসুর সভাপতিত্বে মুজতবা আলি রুশ সাহিত্যিক চেকভের জীবনী ও তাঁর ছোটোগল্প বিষয়ে প্রবন্ধ পাঠ করেন। ২৩ ভাদ্র [9 Sep] রবীন্দ্রনাথের সভাপতিত্বে ভিন্টারনিৎস্ ভারতবর্ষের সাহিত্যের সঙ্গে পৃথিবীর সাহিত্যের কী সম্বন্ধ সেই বিষয়ে ভাষণ দেন।

২৪ ভাদ্র [10 Sep] সুসাহিত্যিক সুকুমার রায়ের মৃত্যু হয়; ২৬ ভাদ্র রবীন্দ্রনাথ এই উপলক্ষে মন্দিরে উপাসনা করেন।

২৭ ভাদ্র ভিন্টারনিৎস্ ভারতীয় ও বিশ্বসাহিত্য বিষয়ে বিশ্বভারতীর অতিথি-অধ্যাপক হিসেবে তাঁর শেষ বক্তৃতা দেন। শান্তিনিকেতন থেকে বিদায়ের পূর্বরাত্র ২৯ ভাদ্রে তাঁর সম্মানার্থে বিশ্বভারতীর ছাত্রেরা সংস্কৃত 'উত্তররামচরিত' নাটকের প্রথম তিন অঙ্ক অভিনয় করেন। ৩০ ভাদ্র [রবি 16 Sep] রাত্রে তাঁকে বিদায়-সংবর্ধনা জানানো হয়। 'সভার প্রথমে আচার্যকে মাল্য ও চন্দনে অভিনন্দিত করা হয়। সেই সময়ে তাঁহাকে পট্টবস্ত্র, উত্তরীয় ও একটি অঙ্গুরীয় উপহার দেওয়া হয়। তাহার পরে বেদমন্ত্র পাঠ করা হইলে পূজনীয় গুরুদেব, শাস্ত্রী মহাশয় ও বেনোয়া সাহেব তাঁহাদের বিদায় অভিনন্দন পাঠ করেন। তৎপর আচার্য সমবেত আশ্রমবাসীদের সম্বোধন করিয়া তাঁহার বক্তব্য বলেন। পরে শান্তিমন্ত্র পাঠ করা হইলে "জনগণ মন অধিনায়ক" গানটি গাওয়ার পর সভাভঙ্গ করা হয়।' ৩১ ভাদ্র সকালে 'যখন আচার্য আশ্রম ত্যাগ করেন তখন আশ্রমবাসী ছাত্রছাত্রী ও অধ্যাপকবর্গ সকলেই শান্তিনিকেতনের আমলকী কুঞ্জে সমবেত হইয়াছিলেন। ছাত্র ও ছাত্রীরা আমলকীবীথিতে দুই সারে দাঁড়াইয়াছিল। আচার্য যখন তাহাদের ভিতর দিয়া অগ্রসর হইতেছিলেন তখন ছাত্র ও ছাত্রীরা তাঁহাকে মাল্যদান ও তাঁহার উপরে পুষ্পবৃষ্টি করিয়াছিল। তাহার পর তিনি যখন মোটরে উঠিলেন তখন সকলে "আমাদের শান্তিনিকেতন" গানটি গাহিয়া তাঁহাকে বিদায় দিলেন। পূজনীয় গুরুদেব এবং বিশ্বভারতীর ছাত্র ও অধ্যাপকেরা অনেকেই তাঁহাকে ট্রেনে উঠাইয়া দিতে ষ্টেশন অবধি গিয়াছিলেন।'

৬ আশ্বিন [রবি 23 Sep] সন্ধ্যায় রবীন্দ্রনাথ বিশ্বভারতীর সম্মেলনীর ১৩শ সাধারণ অধিবেশনে 'সমস্যা' প্রবন্ধটি পাঠ করেন। ৯ আশ্বিন অ্যান্ডরুজ সম্মেলনীর বিশেষ অধিবেশনে বিশ্বভারতীর আদর্শ সম্পর্কে ভাষণ দেন।

বিশ্বভারতীতে পূজাবকাশ শুরু হয় ২৫ আশ্বিন [12 Oct], খোলে ২৬ কার্তিক [12 Nov]। এর পূর্বেই আশ্বিন-সংখ্যা শান্তিনিকেতন-এর 'আশ্রমসংবাদ'-এ উল্লিখিত কয়েকটি অনুষ্ঠানের সংবাদ পাওয়া যায়, যাদের তারিখ উদ্ধার করা যায়নি। একটি সন্ধ্যায় 'বিশ্বভারতীর উত্তর ও পূর্ববিভাগের ছাত্রীরা বিনোদন পর্বে ঋতুমঙ্গল অভিনয় করেন। দুইজন করিয়া ছাত্রী এক একটি ঋতুর ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের বেশভূষাতেও প্রত্যেকটি ঋতুর পরিচয় সুস্পষ্ট রূপে প্রকাশ পাইতেছিল। এইরূপে তাঁহারা পূজনীয় গুরুদেবের ছয়টি ঋতুর উপযোগী ছয়টি গান গাহিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসু মহাশয় ও তাঁহার ছাত্রেরা সভাগৃহ সাজাইবার ভার লইয়াছিলেন। সেদিন আবীরের আলপনাটি খুব চমৎকার হইয়াছিল।'

সন্ধ্যায় বিনোদন পর্বে রবীন্দ্রনাথ কয়েকদিন 'আলোচনা ক্লাস' খুলেছিলেন। প্রথম দিনের আলোচনার বিষয় ছিল, বর্তমান সভ্যতা বিজ্ঞানের সাহায্যে তার চতুর্দিকে নানা উপকরণ সংগ্রহ করছে এবং তার ফলে আমাদের দেশের সরল জীবনযাপনের আদর্শ বিকৃত হয়ে পড়ছে; সুতরাং বিজ্ঞান যখন কলকারখানা গড়ে মানুষকে যান্ত্রিক করে তুলছে তাকে বর্জন করাই উচিত। কিছুক্ষণ আলোচনার পর গরিষ্ঠসংখ্যক সদস্যের মতে সিদ্ধান্ত হয়, বিজ্ঞানের অপব্যবহারের জন্য বৈজ্ঞানিকরা দায়ি নন— তাঁরা জ্ঞানানুশীলনের জন্য বিজ্ঞানের যে উন্নতি ঘটিয়েছেন, তার ব্যবহারের ত্রুটির জন্য বিজ্ঞানকে দোষী করা উচিত নয়। এর পরে রবীন্দ্রনাথ বলেন, জীবপর্যায়ের প্রাচীনতম জীব অ্যামিবার জীবনে কোনো জটিলতা ছিল না, তখন পাকযন্ত্র ও স্পর্শানুভূতি ছাড়া তাদের কোনো ইন্দ্রিয় ছিল না; কিন্তু ক্রমবিবর্তনের ফলে জীবের ইন্দ্রিয়বৃদ্ধির ফলে ও বুদ্ধিবৃত্তির সংযোগে

জীবন জটিলতর হয়েছে, এদের মধ্যে সামঞ্জস্য আনার পরিবর্তে অ্যামিবাদের অবস্থায় ফিরে যাওয়ার প্রশ্ন ওঠে না। একতারার চেয়ে বীণা অনেক জটিল যন্ত্র, কিন্তু বীণা বাজাতে না পারলে তারের বাহুল্যকে দায়ি করা ঠিক নয়— 'সত্যিকারের ওস্তাদের হাতে পড়িয়া বীণা যখন বাজে তখন তারের জটিলতা সত্ত্বেও যে সুরটি ফুটিয়া ওঠে সেটি harmony-র সুর। নানা উপকরণবহুল বর্তমান সভ্যতা যাহাতে তাহার মধ্যে সেই harmony-র সুরটি ফুটাইয়া তুলিতে পারে সেই দিকেই আমাদের চেষ্টা করিতে হইবে।'

দ্বিতীয় আলোচনার বিষয় ছিল পুরুষ ও নারী। 'সেই সভায় পূজনীয় গুরুদেব আমেরিকার কোন পত্রিকা হইতে উক্ত বিষয়ে লিখিত একটি প্রবন্ধ পাঠ ও মুখে মুখে তাহার তর্জমা করেন। সে সম্বন্ধে তাঁহার মতও তিনি পরবর্তী দুএকটি সভায় ব্যক্ত করেন।'

পুজোর ছুটির মধ্যে শিক্ষকেরা ও কিছু ছাত্র আশ্রমে থাকতেন। রবীন্দ্রনাথ ২ কার্তিক [19 Oct] বিজয়াদশমীর দিন 'রক্তকরবী' নাটকটির খসড়া তাঁদের পড়ে শোনান। ৭–৮ কার্তিক লক্ষ্মীপূর্ণিমা ও তার পরের দিন সন্ধ্যায় আশ্রমে মেয়েরা গানের আসর বসান।

কার্তিক-সংখ্যা শান্তিনিকেতন-এ জানানো হয়েছিল : 'পূজনীয় গুরুদেবের পূজার ছুটিতে কাটিওয়ার ভ্রমণের কথা ছিল, কিন্তু নানা কারণে এবার তাহা স্থগিত থাকিল।' অবশ্য অল্পদিন পরেই তিনি গৌরগোপাল ঘোষকে নিয়ে বিশ্বভারতীর জন্য অর্থসংগ্রহের লক্ষ্যে গুজরাটের দেশীয় রাজ্যগুলি সফরের উদ্দেশে আমেদাবাদ রওনা হন। অগ্রহায়ণ মাসের শেষদিকে তিনি ফিরে আসেন।

পুজোর ছুটির পরে বিশ্বভারতীর কাজ শুরু হয় ২৭ কার্তিক [13 Nov]। ৬ অগ্র [22 Nov] রাসপূর্ণিমার রাত্রে আশ্রমসম্মিলনীর অধিবেশনে 'পূজনীয় গুরুদেবের জ্যোৎস্না রাত্রের অনেকগুলি গান গাওয়া হইয়াছিল।' ৮ অগ্র সান্ধ্যোপাসনার পরে কলাভবনে বিশ্বভারতী সম্মেলনীর অধিবেশনে অধ্যাপক সরোজকুমার দাসের সভাপতিত্বে উত্তরবিভাগের ছাত্র রামচন্দ্র Whispering from Future নামক একটি নাতিদীর্ঘ প্রবন্ধ পাঠ করেন; কলিন্‌স্‌, বেনোয়া ও কয়েকজন ছাত্র আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন।

৩০ অগ্র [রবি 16 Dec] সন্ধ্যার সময়ে রবীন্দ্রনাথের সভাপতিত্বে একটি বিশেষ সংগীতানুষ্ঠানে বামন শিরোদকর, অনাদিকুমার দস্তিদার, অতুলানন্দ বক্সি, রমা মজুমদার, অমিতা চক্রবর্তী, পুরুষোত্তম হাতী সিং, মালতী সেন, রমেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, সত্যেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ দেববর্মা, বিনায়ক মাসোজি, যতীন্দ্রনাথ সরকার, রেবা মহলানবিশ, সতী সেন, অণুকণা গুপ্ত ও সরযূ দেবী কণ্ঠ ও যন্ত্রসংগীত পরিবেশন করেন। 'তৎপর গুরুদেবের আদেশে ধীরেনকৃষ্ণ দেববর্মা এস্রাজে, রণজিৎ সিং সেতারে ও পণ্ডিতজি বীণায় ভৈরবীর আলাপ করেন।'

৫ পৌষ ছাত্রদের বার্ষিক ক্রীড়াপ্রদর্শনী হয়। রাত্রে আহারের পরে কলাভবনে প্রমথনাথ বিশীর সভাপতিত্বে বিশ্বভারতী সম্মেলনীর বার্ষিক অধিবেশনে তৃতীয় বর্ষের কার্যনির্বাহক সমিতিতে নেপালচন্দ্র রায় সভাপতি, সৈয়দ মুজতবা আলি সম্পাদক, রেবা মহলানবিশ সহ-সম্পাদক এবং মালতী সেন ও রামচন্দ্র সভ্য নির্বাচিত হন।

৬ পৌষ সন্ধ্যায় কারমাইকেল বেদি আলপনা ও দেবদারু পাতা দিয়ে সাজিয়ে আম্রকুঞ্জে মেয়েদের আনন্দমেলা অনুষ্ঠিত হয়।

৭ পৌষ [রবি 23 Dec] প্রত্যুষে বৈতালিক দল সংগীত দিয়ে উৎসবের সূচনা করে। 'অতিথিবর্গ ও আশ্রমবাসীগণ গাত্রোত্থান করিতে না করিতেই রসুনচৌকির রাগিণীতে উৎসবের উদ্বোধন হয়।' রবীন্দ্রনাথ মন্দিরে উপাসনা করার পরে সকলে 'কর তাঁর নাম গান' গেয়ে ছাতিমতলা প্রদক্ষিণ করেন।

এবারে মেলা দুদিন স্থায়ী হয় বলে পানীয় জল, মেলাপ্রাঙ্গণের পরিচ্ছন্নতা, অতিথিদের আপ্যায়ন প্রভৃতির জন্য অধ্যাপকদের নেতৃত্বে স্বেচ্ছাসেবক ও আশ্রমের স্কাউটদল তৎপর ছিল। মেলায় নানাবিধ ক্রীড়া, চলচ্চিত্র প্রদর্শন, আতসবাজি প্রভৃতির সঙ্গে গ্রাম্য শিল্প ও কৃষিপ্রদর্শনী খোলা হয়। সেখানে শ্রীনিকেতন কৃষিবিভাগের উৎপন্ন শস্য শাকসবজি, তাঁতে প্রস্তুত কাপড়, উদ্যান রচনা, কৃত্রিম উপায়ে ডিম থেকে শাবক উৎপাদন, শিশুদের স্বাস্থ্যরক্ষা, ম্যালেরিয়া-নিবারণ প্রভৃতি বিষয়ক চিত্র ও ঔষধাদি প্রদর্শিত হয়।

৮ পৌষ প্রাক্তন ছাত্রদের বার্ষিক সভা হয়। একটি বৈদিক মন্ত্র গীত হওয়ার পরে রবীন্দ্রনাথ জীবিত ও পরলোকগত প্রাক্তন ছাত্রদের স্মরণ করে ভাষণ দেন। অতঃপর কালিদাস নাগ সভাপতির ভাষণে বিশ্বভারতীর মতো বিশ্ববিদ্যালয়ের উপযোগিতা বিষয়ে আলোচনা করেন। কলাভবনে ভারতীয় শিল্পকলার একটি প্রদর্শনীও খোলা হয়েছিল। প্রাক্তন ছাত্রদের সভার পরে নন্দলাল বসু অভ্যাগতদের পিকচার পোস্টকার্ড ও শিল্পীদের আঁকা ছবি দেখান। তাঁরা চিত্রকরদের ও মহিলা শিল্পীদের প্রস্তুত লাক্ষানুরঞ্জিত শৌখিন দ্রব্যাদির প্রশংসা করেন। গয়ার প্রসিদ্ধ ওস্তাদ চন্দ্রিকা দুবে সকালে ও রাত্রে এস্রাজ বাজিয়ে সকলকে মুগ্ধ করেন।

৯ পৌষ পরলোকগত আশ্রমিকদের শ্রাদ্ধবাসর ও খ্রিষ্টোৎসব উপলক্ষে মন্দিরে উপাসনা হয়। 'পূজনীয় গুরুদেব আচার্যের আসন হইতে একটি অতি সুন্দর মর্মস্পর্শী উপদেশ দিয়াছিলেন। তিনি আশ্রমবন্ধু স্বর্গীয় পিয়ার্সন সাহেবের কথা বিশেষভাবে স্মরণ করেন।'

এইদিন বিকেলে সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সভাপতিত্বে বিশ্বভারতী সংসদের স্থগিত সভায় একটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তে 'Visva-Bharati undertakes the management of the Santiniketan Trust so far as possible in accordance with the spirit of the original Santiniketan Trust Deed.' রাত্রে বিশ্বভারতীর ছাত্রছাত্রীরা রবীন্দ্রনাথ ও দিনেন্দ্রনাথের পরিচালনায় একটি গানের মজলিসের আয়োজন কবেন, সেখানে রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি নূতন ও পুরাতন গান পরিবেশিত হয়।

১০ পৌষ বিশ্বভারতীর বার্ষিক সাধারণ অধিবেশনে বৈদিক মন্ত্র ও সংকল্পবচন পাঠের পরে কর্মসচিব রথীন্দ্রনাথ বার্ষিক প্রতিবেদন পাঠ করেন, যার মূল অংশগুলি আমরা বর্তমান প্রাসঙ্গিক তথ্যের সূচনায় বর্ণনা করেছি। অতঃপর এল্‌ম্‌হার্স্ট শ্রীনিকেতন কৃষিবিভাগের বার্ষিক প্রতিবেদন উপস্থাপিত করেন। উল্লেখ্য, এই সময় থেকে সুরুল কৃষিবিভাগ 'শ্রীনিকেতন' নামে আনুষ্ঠানিকভাবে আখ্যাত হয়। সংসদের অন্যান্য কাজের মধ্যে নূতন সভ্য নির্বাচন, আগামী বর্ষের বাজেট পেশ, অর্থসচিব নির্বাচন, নিয়মাবলির কিঞ্চিৎ পরিবর্তন ও কয়েকটি নূতন বিধিব্যবস্থা প্রণয়ন করা হয়। 'তৎপর শ্রীযুক্ত এল্‌ম্‌হার্স্ট্ অভ্যাগতদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া তাঁহাদিগকে সুরুল কৃষিবিভাগ দেখান।'

1924-এ সংসদের সদস্য ও পদাধিকারীরা ছিলেন : আচার্য রবীন্দ্রনাথ, উপাচার্য সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর, অর্থসচিব হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, যুগ্ম-কর্মসচিব রথীন্দ্রনাথ ও প্রশান্তচন্দ্র, আশ্রমসচিব গৌরগোপাল ঘোষ, শ্রীনিকেতনসচিব 23 Mar 1924 পর্যন্ত এল্‌ম্‌হার্স্ট অতঃপর প্রেমচাঁদ লাল; সাধারণ সদস্য : অবনীন্দ্রনাথ, মেঘনাদ সাহা, অসিতকুমার হালদার, হেমলতা ঠাকুর, প্রতিমা ঠাকুর, অ্যান্ডরুজ, ক্ষিতিমোহন সেন, প্রমথনাথ

বন্দ্যোপাধ্যায়, দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, দেবেন্দ্রমোহন বসু, নেপালচন্দ্র রায়, হিরজিভাই মরিস; অধ্যাপকমণ্ডলির প্রতিনিধি : সুরেন্দ্রনাথ কর, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, নন্দলাল বসু, ধীরেন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়, বিধুশেখর শাস্ত্রী, প্রমদারঞ্জন ঘোষ, কিরণবালা সেন, হেমবালা সেন; শ্রীনিকেতন-প্রতিনিধি : সন্তোষচন্দ্র মজুমদার, প্রেমচাঁদ লাল; বিশ্বভারতী সম্মিলনী : সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, কালিদাস নাগ; আশ্রমিক সঙ্ঘ : প্রদ্যোকুমার সেনগুপ্ত; গৃহীত [co-opted] ও মনোনীত [nominated] সদস্য : শিশিরকুমার মৈত্র, চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য, অমল হোম, নির্মলচন্দ্র চন্দ্র, অনঙ্গমোহন সাহা এবং সুধীরকুমার লাহিড়ী, জিতেন্দ্রমোহন সেন, দ্বিজেন্দ্রনাথ মৈত্র।

ফাল্গুন-সংখ্যা শান্তিনিকেতন-এ জানানো হয়েছে, ৭ পৌষের পরে আশ্রমের ভিতরে অনেক পরিবর্তন হয়। কলাভবন ও সংগীতবিভাগ দ্বারিকের দ্বিতল অট্টালিকা ত্যাগ করে আপাতত শিশুবিভাগের একতলা দালানটি অধিকার করে; অবশ্য কিছুদিন পরেই কলাভবনের চিত্রবিভাগ গ্রন্থাগারের দ্বিতলে ও সংগীতবিভাগ শমীন্দ্রকুটিরে উঠে যায়। পুরাতন কলাভবন ও লেবুকুঞ্জ ছাত্রীনিবাসে পরিণত হয়। সেই বাড়ি ও দিনেন্দ্রনাথের বাড়িতে কয়েকজন অধ্যাপক বাস করছেন। দিনেন্দ্রনাথ উত্তরায়ণের পূর্বে যেখানে আগে ড লেভি ও ড ভিন্টারনিৎস থাকতেন সেই বাড়িতে গেছেন। এই বাড়িটির কাছেই টাটাদের অনুদানে বিদেশীয় অধ্যাপকদের জন্য রতনকুঠি নির্মিত হচ্ছে। শমীন্দ্রকুটির, পূর্বমঞ্চ, সতীশকুটির ও মোহিতকুটিরের ঘরগুলিতে শিশুরা থাকে। আদ্যবিভাগের ছাত্রদের জন্য আদিকুটির ও নাট্যগৃহ এবং মধ্যবিভাগের ছাত্রদের জন্য বীথিকাগৃহ ও পুস্তকাগারের উপরের দ্বিতল বরাদ্দ করা হয়। বিশ্বভারতীর ছাত্রগণ পশ্চিম মঞ্চ, সতীশকুটির ও পুস্তকাগারের উপরের একটি কক্ষ ব্যবহার করছেন। বিধুশেখর শাস্ত্রী বেণুকুঞ্জ, জগদানন্দ রায় প্রাক্তন ছাত্রদের গৃহ ও নেপালচন্দ্র রায় অসিতকুমার হালদার-ব্যবহৃত গৃহটিতে উঠে গেছেন।

নূতন বৎসরের জন্য নেপালচন্দ্র উত্তরবিভাগের ও বিভূতিভূষণ গুপ্ত পূর্ববিভাগের পরিচালক নির্বাচিত হন। বিভূতিভূষণ ও শশধর সিংহ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি.এ. পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছেন বলে সংবাদ দেওয়া হয়েছে। নূতন শিক্ষক নিযুক্ত হয়েছেন গণিতের জন্য শ্যামাচরণ দাশগুপ্ত ও ইংরেজির জন্য ইংল্যান্ড-প্রত্যাগত আশানন্দ নাগ।

আশ্রমের অধ্যাপকদের মধ্যে সামাজিকতা ও ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধির জন্য একটি বৈকালিক বৈঠকের প্রবর্তনা হয়; অপরাহ্নে পাঠশেষে অধ্যাপকেরা এখানে মিলিত হয়ে চা-পান ও নানাবিধ আলোচনার ভিতর দিয়ে ভাবের আদানপ্রদান করে থাকেন। রবীন্দ্রনাথ চিন থেকে চা-পানের বিভিন্ন সরঞ্জাম নিয়ে এসে এই বৈঠকটিকেই 'সুসীম চা-চক্র'-তে উন্নীত করেন।

২১ পৌষ [রবি 6 Jan 1924] সন্ধ্যায় কলাভবনে রাসবিহারী দাসের সভাপতিত্বে বিশ্বভারতী সম্মেলনীর তৃতীয় বর্ষের প্রথম অধিবেশনে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় প্রাচীন ভারতীয় উপনিবেশ বিষয়ে লিখিত 'প্রবাসী ভারতবাসী' প্রবন্ধ পাঠ করেন।

৬ মাঘ সরোজকুমার দাসের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় অধিবেশনে সতী দেবী অসহযোগ আন্দোলনে আধ্যাত্মিক ভাব-শীর্ষক প্রবন্ধটি পাঠ করার পরে সুধাময়ী মুখোপাধ্যায় বার্টান্ড রাসেলের প্রবন্ধ অবলম্বনে লিখিত একটি রচনা পড়ে শোনান।

১৬ মাঘ [30 Jan] কলাভবনে ফণীন্দ্রনাথ বসুর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সম্মেলনীর কার্যনির্বাহক সভায় বেনোয়াকে সভাপতি নির্বাচন করা হয়। 'বিশ্বভারতী' নামে একটি দ্বিভাষিক হাতে-লেখা মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হচ্ছিল; বিশ্বেশ্বর রাও এর সম্পাদক এবং রমা কর ও সুজিতকুমার মুখোপাধ্যায় সহ-সম্পাদক নির্বাচিত হন।

২০ মাঘ [3 Feb] কলাভবনে বিশ্বভারতী সম্মেলনীর ২য় বিশেষ অধিবেশনে রবীন্দ্রনাথের সভাপতিত্বে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়-কর্তৃক আমন্ত্রিত ফ্রান্সের Professor of Jurisprudence Dr. Henry Solus 'The Position of Women in French Civil Law' বিষয়ে প্রবন্ধ পাঠ করেন।

২১ মাঘ কালিদাস নাগের সভাপতিত্বে উক্ত সম্মেলনীর ৩য় সাধারণ অধিবেশনে রমা মজুমদার ও মালতী সেন 'আমি সন্ধ্যাদীপের শিখা' গানটি গেয়ে শোনান। এর পরে রমা দেবী রবীন্দ্রনাথের 'পূর্ণিমা' ও রেবা মহলানবিশ 'Three Years She Grew' কবিতাগুলি পাঠ করেন। এরপরে রামচন্দ্র 'Vision of Power and Vision of Beauty' প্রবন্ধটি পড়ে শোনান।

8 Feb [২৫ মাঘ] বিশ্বভারতী সম্মেলনীর ৩য় বিশেষ অধিবেশনে রবীন্দ্রনাথের সভাপতিত্বে বসন্তকুমার মল্লিক 'Doctrine of Equality in relation to Gandhism' বিষয়ে বক্তৃতা করেন। সভাপতির ভাষণে রবীন্দ্রনাথ তাঁর বক্তব্যের তীব্র সমালোচনা করেন।

২৬ মাঘ [9 Feb] শ্রীপঞ্চমীর সন্ধ্যায় কলাভবনে বসন্তোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। ৮ ফাল্গুন [20 Feb] রাত্রে আশ্রমসম্মিলনীর পূর্ণিমা অধিবেশনে রবীন্দ্রনাথের নবরচিত গানগুলি গীত হয়েছে।

২৮ মাঘ অধ্যাপক বেনোয়ার সভাপতিত্বে বিশ্বভারতী সম্মেলনীর ৪র্থ বিশেষ অধিবেশনে কার্যবিবরণী কোন্ ভাষায় লেখা হবে এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি আলোচিত হয়। তখন বিশ্বভারতীর অধ্যাপক ও ছাত্রছাত্রীদের একটি অংশ অবাঙালি বা অভারতীয়, এঁরা বাংলা শেখার চেষ্টা করতেন বটে কিন্তু সকলে এই ভাষায় যথেষ্ট স্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করতেন না। তাই সিদ্ধান্ত হয়, এর পর থেকে কার্যবিবরণী ইংরেজি ভাষায় লেখা হবে—বস্তুত এইবারের অধিবেশনের বিবরণী থেকেই এর সূচনা হয়।

ইতিমধ্যে এল্‌ম্‌হার্স্ট চিন, জাপান প্রভৃতি ভ্রমণ করে শান্তিনিকেতনে ফিরে এসেছেন। ১ ফাল্গুন [13 Feb] তিনি বিশ্বভারতী সম্মেলনীর অধিবেশনে তাঁর চিনভ্রমণের অভিজ্ঞতা বিবৃত করে বলেন : 'চীনদেশের… পুরাতন শিক্ষাপদ্ধতিতে চীনারা সন্তুষ্ট নহেন। — তাহাতে কেবল দার্শনিক ও কবির সৃষ্টি হয়। বর্তমান শিক্ষাপদ্ধতিও চীনাদিগকে সন্তুষ্ট করিতে পারিতেছে না— তাহাতে ছেলেরা অসংযমী ও অবাধ্য হইয়া উঠিতেছে। চীনদেশের পণ্ডিত ও য়ুরোপ প্রত্যাগত চীনারা সন্তোষজনক শিক্ষাপদ্ধতি বাহির করিবার জন্য খুব চেষ্টা করিতেছেন।'

পরের দিন সন্ধ্যায় কলাভবনে সম্মেলনীর ৫ম বিশেষ অধিবেশনে এল্‌ম্‌হার্স্ট চিনদেশ সম্বন্ধে তাঁর পূর্বরাত্রের অসমাপ্ত বক্তৃতা শেষ করেন। [এর পরে 21 Jul 1927 পর্যন্ত বিশ্বভারতী সম্মেলনীর হস্তলিখিত প্রতিবেদন পাওয়া যায়নি।]

অবশ্য চৈত্র-সংখ্যা শান্তিনিকেতন থেকে বিশ্বভারতী সম্মেলনীর আরও তিনটি তারিখ-বিহীন অধিবেশনের সংবাদ পাওয়া যায়। অনুজান আচান বসন্ত পঞ্চমী সম্পর্কে বলেন, গিদওয়ানি বলেন কবীরের জীবনী-বিষয়ে। আশ্রমে আগত আমেরিকান অতিথি Miss Jeanne Van Coover 'Buddhas of Bamian' ও পরের দিন

কাবুলের শিক্ষা ও রাজনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে নিজের অভিজ্ঞতা বিবৃত করেন। বামিয়ানের বুদ্ধমূর্তি সম্পর্কে তিনি বলেন : 'বড় মূর্তিটি ১৭৩ ফিট ও ছোটটি ১২০ ফিট উচ্চ। ছোট মূর্তিটির ভিতরে একেবারে মাথা পর্যন্ত উঠিবার জন্য সিঁড়ি আছে। মূর্তিগুলি চতুর্থ অথবা পঞ্চম শতাব্দীতে নির্মিত হইয়াছিল বলিয়া অনুমান করা হয়। ঐগুলির পিছনে একটি ছোট পাহাড়ে কতকগুলি গুহা আছে সেগুলিতে পূর্বে বৌদ্ধশ্রমণেরা বাস করিতেন। গুহার প্রাচীরে গাত্রে ও ছাদে অনেকগুলি ছবির অংশ দেখিতে পাওয়া যায়। ঐগুলি ভারতবর্ষের চিত্রকরগণ দ্বারা অঙ্কিত বলিয়া অনুমান করা হয়। ঐ চিত্রগুলি হইতে বুঝা যায় ঐ সময়ের ভারতীয় চিত্রকরগণ কিরূপ ক্ষমতাশালী ও চিত্রবিদ্যায় নিপুণ ছিলেন। গুহার ছবি ও অন্যান্য নানা জিনিস দশম শতাব্দীতে মুসলমানেরা ভাঙ্গিয়া ফেলেন।'

এ ছাড়া রমা মজুমদার ও রেবা মহলানবিশ বিশ্বভারতীর সাধারণ সভায় আবৃত্তি করেন। কয়েকটি সভায় মেয়েরা গানও করেন। রবীন্দ্রনাথ দুটি সভায় সভাপতির আসনে ছিলেন।

ফাল্গুন-সংখ্যা শান্তিনিকেতন-এ জানানো হয়েছে : 'কয়েকদিন হইল শ্রদ্ধেয় আচার্য শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও শ্রীযুত সমরেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় আশ্রমে আসিয়াছিলেন। তাঁহারা আশ্রমের সকলের সহিত আলাপ করিয়া এখানকার সকল রকম আনন্দ অনুষ্ঠানের সহিত যোগ দিয়া অতি সহজে সকলের সাথে আত্মীয়তার সম্পর্ক পাতাইয়া লইয়াছিলেন। আচার্য মহাশয় কলাভবনের অধ্যাপক ও ছাত্রদের সহিত আলোচনাদি করিয়া তাঁহাদিগকে উৎসাহিত করিয়াছিলেন।' তাঁদের আগমন ও অবস্থানের তারিখ জানা যায়নি।

এই বছর আশ্রম থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষা দেবার জন্য বামন ভাণ্ডারী, বুদ্ধদাস ও ক্ষেমেন্দ্রমোহন সেন শিউড়ি যান। সন্তোষচন্দ্রে ভগ্নী রেখা মজুমদার এই পরীক্ষা দেবার জন্য কলকাতায় গিয়েছেন— 'আশ্রমের ছাত্রীদের মধ্য হইতে ইনিই প্রথম উক্ত পরীক্ষা দিতেছেন।'

আশুতোষ মুখোপাধ্যায় ও তাঁর পুত্র শ্যামাপ্রসাদের সহযোগিতায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে বিশ্বভারতীর সম্পর্ক ক্রমশই ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠছিল। রবীন্দ্রনাথ 1920–21-এ যখন আমেরিকায় ছিলেন, তখন প্রধানত অ্যান্ডরুজের কৌশলে অসহযোগ আন্দোলনের অঙ্গ হিসেবে বিদ্যালয় থেকে প্রাইভেট ছাত্ররূপে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা তুলে দেওয়া হয়। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের প্রত্যাবর্তনের কিছুদিন পরেই উক্ত আন্দোলন মুখ থুবড়ে পড়ায় প্রায় নিঃশব্দে পরীক্ষা দেওয়ার প্রথা পুনঃপ্রবর্তিত হয়। শুধু তাই নয়, ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ যে-সব ছাত্রছাত্রী বিশ্বভারতীতে পড়াশুনো করতে চাইছিলেন তাঁদের জন্য এখানে কলেজ বিভাগও খোলা হয়। 9 Mar 1924 [রবি ২৬ ফাল্গুন ১৩৩০] সংসদের দ্বিতীয় অধিবেশনে প্রস্তাব নেওয়া হয় 'Resolved the work of teaching and research be organised into 3 departments... Patha-Vibhaga, the Siksha-Vibhaga and Vidya-Vibhaga and award of Adya, Madhya, Upadhi and other certificates.' শিক্ষাবিভাগ ছিল কলেজের নামান্তর, যেখানে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আই.এ. ও বি.এ. পরীক্ষার উপযোগী কয়েকটি বিষয়ে শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা হচ্ছিল। এই প্রসঙ্গে আমরা সংসদের 21 Jul 1925 [৫ শ্রাবণ ১৩৩২] তারিখের সিদ্ধান্তটি উদ্ধৃত করছি : 'Regular students of Santiniketan Siksha-Bhavan who have obtained the Madhya and Upadhi certificates of Visva-Bharati shall be permitted, if they so desire, to sit for respectively the I.A. and B.A. Examinations of the Calcutta University in the following subjects:

I.A.— Sanskrit, Pali, English, Bengali, Hindi, Marathi, Urdu, French, German, Tamil, Telegu and modern Tibet, History, Logic, Mathematics and Botany.

B.A.— Sanskrit (Pass and Honours), Pali (Pass and Honours), Linguistics (Pass and Honours), Bengali, Hindi, French, Philosophy and History.'

—কৌতুকের বিষয়, এই প্রস্তাব গ্রহণের সময়ে সভাপতিত্ব করছেন চার্লস ফ্রিয়ার অ্যান্ডরুজ!

কলকাতার বিশ্বভারতী সম্মিলনীও বর্তমান বৎসরে যথেষ্ট সক্রিয় ছিল। এই প্রতিষ্ঠানের দ্বারা আয়োজিত অনুষ্ঠানের বিবরণ আমরা প্রধানত 'রবীন্দ্র-প্রসঙ্গ / আনন্দবাজার পত্রিকা' গ্রন্থের ১ম খণ্ড [পৃ ১৫৯–৬২] থেকে সংগ্রহ করেছি।

বিশ্বভারতী সম্মিলনীর অনুষ্ঠানগুলি গ্রীষ্মপর্ব, বর্ষাপর্ব, হেমন্ত পর্ব ও বসন্ত পর্ব-রূপে বিভক্ত ছিল। এই বৎসর গ্রীষ্মের অধিকাংশ সময় [বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ] রবীন্দ্রনাথ শিলঙে অবস্থান করেন বলে উক্ত সময়ে সম্মিলনীর কর্তৃপক্ষ কোনো অনুষ্ঠানের আয়োজন করতে পারেননি। তিনি ১ বা ২ আষাঢ় [16–17 Jun] কলকাতায় ফিরে এসে 'বিসর্জন' নাটকের রিহার্সাল নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েন, ফলে সম্মিলনীর বর্ষাপর্বের প্রথম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয় ৪ শ্রাবণ [শুক্র 20 Jul] তারিখে, এইদিন সন্ধ্যা সাড়ে ছ'টার সময়ে রবীন্দ্রনাথ রামমোহন লাইব্রেরি হলে, *The Statesman* [21 Jul]-এ প্রকাশিত বিবরণ অনুযায়ী, 'Art of Speech Making' বিষয়ে বাংলা ভাষায় একটি বক্তৃতা করেন। এই বক্তৃতার সংক্ষিপ্তসার জীবনী অংশে পাওয়া যাবে।

৮ শ্রাবণ [24 Jul] ১০ কর্নওয়ালিশ স্ট্রিট-স্থ বিশ্বভারতীর কার্যালয়ে সম্মিলনীর বার্ষিক অধিবেশন হয়। এখানে বর্ষাপর্বের অনুষ্ঠানসূচির প্রাথমিক তালিকা ও প্রাসঙ্গিক বিষয় আলোচিত হয়, যার বিবরণ ১২ শ্রাবণ আনন্দবাজার পত্রিকা-য় 'বর্ষাপর্ব্বের কার্য্য-প্রণালী' শিরোনামে মুদ্রিত হয় [দ্র রবীন্দ্র-প্রসঙ্গ ১। ১৫৯–৬০]। এখানে খসড়া তালিকা ঘোষণার পর সম্পাদক প্রশান্তচন্দ্র জানান :

সভাগুলি সাধারণত রামমোহন লাইব্রেরীতে হইবে। সাধারণের উপকারার্থে যে সমস্ত অভিনয় হইবে সেইগুলি ছাড়া অন্যান্য সময় সদস্য ও সাংলগ্নিকগণ বিনামূল্যে প্রবেশাধিকার পাইবেন। সম্মিলনীর আফিসে বা গেটে অভ্যাগতদের জন্য অল্প সংখ্যক কার্ড দেওয়া হইবে।

চারি আনা পয়সা দিলে ডাকযোগে সদস্য ও সাংলগ্নিকগণের নিকট সংবাদ প্রদান করিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। সদস্য ও সাংলগ্নিকগণকে তাঁহাদের নূতন বৎসরের কার্ড সংগ্রহ করিবার জন্য অনুরোধ করা যাইতেছে।

১০নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটের সমগ্র বাড়ীটি বিশ্বভারতীর পক্ষ হইতে পত্তন লওয়া হইয়াছে এবং কার্য্যালয় ১২টা হইতে ৭টা পর্য্যন্ত খোলা রাখিবার বন্দোবস্ত করা হইয়াছে। বিশ্বভারতীর পুস্তকের দোকান, পাঠাগার, পুস্তকালয় ও সান্ধ্য সমিতিতে শীঘ্রই কার্য্যারম্ভ হইবে।

৯ শ্রাবণ সন্ধ্যায় রামমোহন লাইব্রেরি হলে বিশ্বভারতী-সম্মিলনীর অধিবেশনে রবীন্দ্রনাথ কবিতা পাঠ করেন।

সম্মিলনীর পরবর্তী অনুষ্ঠান ধার্য হয়েছিল বিশ্বভারতীর সাহায্যার্থে এম্পায়ার থিয়েটারে 29, 31 Jul, 1 Aug তারিখে 'বিসর্জন' অভিনয়, যা রবীন্দ্রনাথের আকস্মিক অসুস্থতার জন্য স্থগিত রাখা হয়। পরে

পরিবর্তিত তারিখ 25, 27, 28 Aug [৮, ১০, ১১ ভাদ্র] ও জনসাধারণের অনুরোধে ১৩ ভাদ্র 'বিসর্জন' অভিনীত হয়।

এরই মধ্যে 29 Aug [বুধ ১২ ভাদ্র] তারিখে বিশ্বভারতী সম্মিলনী ও অ্যান্টি-ম্যালেরিয়া সোসাইটির উদ্যোগে রামমোহন লাইব্রেরি হলে রবীন্দ্রনাথের সভাপতিত্বে 'গ্রামের পুনর্গঠন এবং ম্যালেরিয়া সম্বন্ধে বক্তৃতা ও আলোচনা' হয়। এখানে রবীন্দ্রনাথের 'সমবায়ে ম্যালেরিয়া নিবারণ' নামে মুদ্রিত হয়।

8 Sep [শনি ২২ ভাদ্র] ঔপন্যাসিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 'বাংলা সাহিত্য' সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন।

12 Sep [বুধ ২৬ ভাদ্র] অবনীন্দ্রনাথ 'ছেলেমানুষী শিক্ষা' [দ্র ভারতী, অগ্র। ৬৮৭–৯৫] প্রবন্ধটি পাঠ করেন।

28 Sep [শুক্র ১১ আশ্বিন] রামমোহন রায়ের নবতিতম স্মৃতিসভায় রবীন্দ্রনাথ সভাপতিত্ব করেন। কিন্তু তাঁর ভাষণ কোথাও প্রকাশিত হয়েছিল কিনা জানা যায় না।

বিশ্বভারতী সম্মিলনীর উদ্যোগে রবীন্দ্রনাথ 5 Oct [শুক্র ১৮ আশ্বিন] আলফ্রেড রঙ্গমঞ্চে 'সমস্যা' প্রবন্ধটি পাঠ করেন।

৭ চৈত্র [বৃহ 20 Mar] রবীন্দ্রনাথের চিনযাত্রার আগের সন্ধ্যায় বিশ্বভারতী সম্মিলনীর উদ্যোগে আলিপুর আবহাওয়া অফিসের বাগানে তাঁকে বিদায়-সংবর্ধনা জানানো হয়।

সুরুল গ্রামপুনর্গঠন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয় 6 Feb 1922 [সোম ২৩ মাঘ ১৩২৮] তারিখে। আমরা পূর্ববর্তী খণ্ডের শেষ দুটি অধ্যায়ের জীবনী অংশে ও প্রাসঙ্গিক তথ্য : ৩-এ এই প্রতিষ্ঠানের কার্যকলাপের বিস্তৃত বিবরণ দিয়েছি, বর্তমান প্রাসঙ্গিক তথ্যে সেই বিবরণে কিছু সংযোজনও করা হয়েছে। 'শান্তিনিকেতন' পত্রিকার 'আশ্রম-সংবাদ'-এ শান্তিনিকেতন ও সুরুলের দুটি প্রতিষ্ঠানের বিবিধ ঘটনার বিবরণ প্রকাশিত হত, বর্তমান বছরের শ্রাবণ ১৩৩০-সংখ্যা থেকে দেখা যাচ্ছে তাতে 'সুরুল সংবাদ' নামে একটি স্বতন্ত্র বিভাগে সংবাদ পরিবেশনের সূত্রপাত হয়েছে, যা প্রতিষ্ঠানটির ক্রমবিকশিত গুরুত্বের নিদর্শন হিসেবে গণ্য হতে পারে।

সুরুল বা শ্রীনিকেতন পল্লীপুনর্গঠন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল, সেখানে কৃষি শিল্প স্বাস্থ্য শিক্ষা ইত্যাদি চর্চার দ্বারা যে অভিজ্ঞতা অর্জিত হবে সেগুলি পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলিতে প্রচার করে তাদের অবস্থার উন্নয়ন। এই প্রচার হত হাতেকলমে কাজ করে, তত্ত্বগত শিক্ষার পথ ধরে নয়। এই কাজে জাতিধর্মশ্রেণী নির্বিশেষে সমস্ত গ্রামবাসীকে অন্তর্ভুক্ত করার প্রয়োজন ছিল। এই উদ্দেশ্যে প্রথমে সুরুল গ্রাম ও পরে মোদপুর, লোহাগড়, রায়পুর প্রভৃতি গ্রামেও এখানকার কর্মপদ্ধতি ছড়িয়ে পড়ে। শ্রাবণ-সংখ্যা শান্তিনিকেতন-এ জানানো হয়েছে, সহায়ক বা স্কাউট দলের সাহায্যে পার্শ্ববর্তী ছ'টি গ্রামে স্কাউটদের কৃষিশিক্ষার জন্য কতকগুলি ছোটো কৃষিক্ষেত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সুরুল কৃষিবিভাগে শিক্ষিত ছাত্ররা সেই গ্রামগুলিতে গিয়ে সেখানকার পাঠশালার পণ্ডিত ও স্কাউটদের শিক্ষা দিচ্ছে; এই জেলার মাটিতে উৎপাদনযোগ্য অপ্রচলিত শস্য চাষ করার জন্য গ্রামবাসীদের উৎসাহ দেওয়া হচ্ছে। এখানকার ছাত্র ও শিক্ষকেরা মহিদাপুর গ্রামে গিয়ে সেখানকার জলনিঃসরণের জন্য নর্দমা কেটে দেন, গ্রামের সহায়কদলের বালকেরা তাঁদের সাহায্য করছে দেখে অভিভাবকেরাও এই কাজে এগিয়ে আসেন। কালীমোহন ঘোষ একই কাজ করেন ভুবনডাঙা গ্রামে। এখানকার সাঁওতাল নৈশ বিদ্যালয়ে একজন সাঁওতাল শিক্ষক নিযুক্ত হয়েছেন, তিনি বিদ্যাশিক্ষা ছাড়াও ছাত্রদের

শ্রীরামপুরী তাঁতের কাপড় বোনাও শেখাচ্ছেন। সুরুলের নবপ্রতিষ্ঠিত বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রীসংখ্যা হয়েছে ২০ জন। এখানে ৫ জন মহিলা সতরঞ্চি বোনা শিখছেন। আসাম থেকে একজন রেশমি বস্ত্রবয়নে সুদক্ষ কারিগর এসেছেন, তিনি সপ্তাহে তিনদিন শান্তিনিকেতনে ও তিনদিন সুরুলে শিক্ষা দিচ্ছেন। রথীন্দ্রনাথ মণীন্দ্রকুমার সেন নামক একটি ছাত্রকে মাদ্রাজে 'ক্যালিকো' প্রিন্টিং শিখতে পাঠিয়েছিলেন, তিনি পুজোর ছুটির মধ্যে ফিরে এসে শান্তিনিকেতন ও সুরুলের ছাত্রদের উক্ত বিদ্যা শেখানো শুরু করেন।

আমেরিকায় শিক্ষাপ্রাপ্ত কেদারেশ্বর গুহ প্রায় এক বৎসর যাবৎ সুরুল কৃষিবিভাগে কাজ করছিলেন, ইনি আসামের কোনো জায়গায় আদর্শ কৃষিক্ষেত্র স্থাপনের উদ্দেশ্যে এখানকার কাজ পরিত্যাগ করেন। তাঁর শূন্যস্থান পূর্ণ করেন আর্থার গেডেস ও প্রেমচাঁদ লাল। অবশ্য আর্থার পুজোর ছুটির মধ্যেই দেশে ফিরে যান।

বয়স্কাউট দলের অধ্যক্ষ মি. রস আশ্রম ও সুরুলের কৃষিবিভাগ-পরিচালিত সহায়ক দল পরিদর্শন করেন, তাঁকে বিবিধ ক্রীড়াকৌতুক প্রদর্শন করা হয়— তিনিও কলাভবনে বিদেশি স্কাউটদের গান ও পাখির ডাকের রেকর্ড বাজিয়ে শোনান।

ইতালিতে ট্রেন থেকে পড়ে গিয়ে আশ্রমবন্ধু পিয়র্সনের অকালমৃত্যু হয় 24 Sep 1923 [৭ আশ্বিন] তারিখে। কার্তিক-সংখ্যা শান্তিনিকেতন-এ লেখা হয় :

> শ্রদ্ধাস্পদ পিয়ার্সন সাহেবের স্মৃতিরক্ষার্থ কি করা হইবে সে বিষয় নির্ধারণ করিবার জন্য কলাভবনে একটি সভা হয়। সভায় শ্রীযুক্ত এন্ডরুজ সাহেব বলেন যে হাসপাতালের উন্নতি সাধন করা মিঃ পিয়ার্সনের অত্যন্ত প্রিয় চিন্তা ছিল। তিনি "শান্তিনিকেতন" নামে ইংরাজিতে যে বই লিখিয়াছেন তাহার লভ্যাংশ এই হাসপাতালের সাহায্যকল্পে দান করিয়াছেন। ইহা ছাড়া তিনি বিদেশ হইতে মাঝে মাঝে হাসপাতাল ফন্ডে সাময়িক দানও পাঠাইয়াছেন। তাঁহার সেই টাকায় হাসপাতালের নানা রকম সংস্কার করা হইয়াছে। ইহাতে বোঝা যায় হাসপাতালের উন্নতি করা তাঁহার আন্তরিক ইচ্ছা ছিল। সেইজন্য শ্রীযুক্ত এন্ডরুজ সাহেব সকলকে জানাইলেন যে মিঃ পিয়ার্সনের নামে এখানে একটি চিকিৎসালয় খোলা হইবে। ইহার এক অংশে গরীব গ্রামবাসীদিগকে বিনা পয়সায় ঔষধ দান ও চিকিৎসা করা হইবে। পূজনীয় গুরুদেবও এ বিষয়ে সম্মতি দিয়াছেন। নূতন হাসপাতালের জন্য ত্রিপুরার পরলোকগত মহারাজা যে দান অঙ্গীকার করিয়াছিলেন তাহার কিছু পাওয়া গিয়াছে। বাকি টাকার জন্য শ্রীযুক্ত এন্ডরুজ পূজার ছুটিতে ত্রিপুরায় গমন করিবেন।

6 Feb 1923 [বুধ ২৩ মাঘ] সুরুল পল্লী পুনর্গঠন কেন্দ্রের দ্বিতীয় সাংবৎসরিক অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। ঐদিন প্রাতঃকালে রবীন্দ্রনাথ সুরুলের বনাঙ্গনে উপাসনা করেন। তারপরে ক্ষিতিমোহন সেন কয়েকজন ছাত্রের সঙ্গে বৈদিক মন্ত্র আবৃত্তি করেন। শান্তিনিকেতনের সকল অধিবাসী সেখানে আমন্ত্রিত হয়েছিলেন। প্রাতঃকালীন জলযোগান্তে সকলে বনের মধ্যে ঘুরে বেড়াতে যান। বেলা দেড়টায় দ্বিপ্রহরিক আহারের সময়ে বৃহৎ বটবৃক্ষের ছায়ায় সকলে ভোজনে উপবিষ্ট হন। এই বটগাছের উপরেই কাসাহারা-নির্মিত বিখ্যাত বৃক্ষবাটিকা অবস্থিত, রবীন্দ্রনাথ সেখানে বসে স্মিতমুখে সকলের খাওয়া দেখছিলেন। আশ্রমের মহিলারা পরিবেশনের দায়িত্বে ছিলেন। সুরুল-শান্তিনিকেতনের প্রখ্যাত কর্মী গোবিন্দচন্দ্র চৌধুরীর উপরে পাকশালার ভার ছিল।

এইদিন সুরুলে একটি হাট খোলা হয়। 'যাহাতে পার্শ্ববর্তী গ্রামের জনসাধারণের সহিত কেনাবেচার ভিতর দিয়া সুরুল শান্তিনিকেতনের লোকের আরও গভীর লেনাদেনা চলিতে পারে সেই উদ্দেশ্যে সুরুলের কর্তৃপক্ষগণ এই হাট স্থাপন করিয়াছেন।' বিকেল তিনটের সময়ে রবীন্দ্রনাথ সেখানে সমবেত গ্রামবাসীদের সম্বোধন করে কিছু বলেন। তাঁর পরে এল্‌ম্‌হার্স্ট ও জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ব্ল্যাকউড কিছু বলার পরে কালীমোহন ঘোষ সকলকে ধন্যবাদ দিয়ে সভাভঙ্গ করেন।

এর পরে ধর্মমঙ্গল, মুসলমানি গান প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়। সন্ধ্যায় ম্যালেরিয়া-নিবারণী সভার প্রধান ডাঃ গোপালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় চলচ্চিত্রের সাহায্যে ম্যালেরিয়ার বাহন মশার হাত থেকে কী করে উদ্ধার পাওয়া যায়

সেই বিষয়ে উপদেশ দেন। সুরুলের কর্মী খামবাটা ছায়াছবি অভিনয়ের দ্বারা ম্যালেরিয়া প্রভৃতি উপসর্গের হাত থেকে রক্ষা পাবার কয়েকটি নীতিপূর্ণ উপায় সকলকে প্রদর্শন করেন।

সুরুল পল্লিসংস্কার বিভাগের উৎসাহী কর্মী ধীরানন্দ রায়ের তত্ত্বাবধানে সেখানকার কাজ সুষ্ঠুভাবে চলছে। তাঁদের চেষ্টায় নায়েকবাজার, মুল্লুক ও চণ্ডিপুর গ্রামের কলেরা প্রশমিত হয়েছে। বর্ধমান বিভাগের কমিশনার জে.এম. গুপ্ত ও ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের চেয়ারম্যান রায়বাহাদুর অবিনাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 20 Feb পল্লিসেবকদের কাজ দেখার জন্য বাঁধগড়া গ্রামে এসেছিলেন; তাঁরা সহায়ক বা স্কাউট দলের কাজ দেখে সন্তুষ্ট হন।

গান্ধীজির প্রথমবারের শান্তিনিকেতন পরিদর্শনের স্মৃতিতে 10 Mar তারিখটি গান্ধীতিথি হিসেবে গণ্য হয়ে আসছিল। 'গত ২৬শে ফাল্গুন ভৃত্য পাচকরা কাজে ছুটি পাইয়াছিল। তৎস্থলে আশ্রমের যাবতীয় কার্য ছেলেরা করিয়াছিল। সেদিনকার রান্নার প্রত্যেকটি পদ অনভ্যস্ত হাতের এবং নব নব উন্মেষশালিনী প্রতিভার অপূর্ব সমন্বয়। ··· এক বেলার জন্য ভার পাইয়া রন্ধন জগতে যে সমস্ত অপূর্ব আবিষ্কার এখানে হইয়া থাকে লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিলে পাকপ্রণালীর এক লোভন সংস্করণ প্রকাশিত হইতে পারে।'

এবারে শান্তিনিকেতন-শ্রীনিকেতন সহ সমগ্র বীরভূম জেলা বৃষ্টির অভাবে প্রচণ্ড গরমে কষ্ট পাচ্ছিল, প্রায় সমস্ত কুয়োর জল শুকিয়ে গিয়ে তীব্র জলাভাব দেখা দেয়। এই কারণে ৪ বৈশাখ ১৩৩১ গ্রীষ্মবকাশ ঘোষণার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। দূরের যাত্রী উত্তর বিভাগের ছাত্রছাত্রীদের জন্য এক সপ্তাহ পূর্বে ২৮ চৈত্র ছুটি দেওয়া হয়।

৫ চৈত্র [মঙ্গল 18 Mar] রবীন্দ্রনাথ চিনযাত্রার উদ্দেশ্যে আশ্রম ত্যাগ করে কলকাতা রওনা হন। এই উপলক্ষে তাঁকে বিদায়-সংবর্ধনা জানানোর জন্য পূর্বদিন সায়াহ্নে একটি সভা হয়। 'পুস্তকালয়ের সম্মুখে চন্দ্রালোকতলে সকলে সমবেত হইলে সংস্কৃত মাঙ্গলিক পাঠ করিয়া সভার কার্য আরম্ভ হয়। সভায় পূজনীয় গুরুদেব তাঁহার চীনাযাত্রার উদ্দেশ্য বিবৃত করেন। সেই সভায় পূজনীয় আচার্যদেবের সহযাত্রী শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসু ও শ্রীযুক্ত এলম্‌হার্স্টকেও এতদুপলক্ষ্যে অভিনন্দিত করা হয়। তৎপূর্ব দিবস শ্রীমতী গ্রীনের আশ্রম হইতে যে বিদায়সভা হয় তাহাতে তাঁহাকে আশ্রমের সকলের শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জানানো হয়।'

৮ চৈত্র [শুক্র 21 Mar] 'দোল পূর্ণিমার উৎসব বর্ণে বর্ণে সত্য হইয়া গিয়াছে। সকাল হইতে আশ্রমবাসিগণ রঙে ও গানে মাতিয়া উঠিয়াছিলেন। সকালবেলায় নব বিকশিত শালবীথিকার ছায়ায় গানের বৈঠক বসে। রাত্রে টেনিস প্রাঙ্গণে পুনরায় সঙ্গীতাদি হয়। সঙ্গীতের পর প্রীতিভোজনের ব্যবস্থা ছিল। আশ্রম ও সুরুলের সকলেই তাহাতে যোগ দিয়া উৎসবটিকে সুচারুসম্পন্ন করিয়াছিলেন।'

উল্লেখপঞ্জি

১ দেশ, শারদীয় ১৩৫০। ১৫

২ চিঠিপত্র ১৮ [১৪০৯]। ৩৫৭–৫৮, পত্র ৭

৩ চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়-সম্পাদিত 'রবীন্দ্র-প্রসঙ্গ/ আনন্দবাজার পত্রিকা' ১ম [1993]। ১০০ [অতঃপর 'রবীন্দ্র-প্রসঙ্গ ১'-রূপে উল্লিখিত]

৪ দেশ, শারদীয় ১৪০১। ১৮, পত্র ১২

৫ দ্র ড ঊষারঞ্জন ভট্টাচার্য : রবীন্দ্রনাথ ও অসম [১৪০৮]। ১৩

৬ সীতা দেবী : পুণ্যস্মৃতি [১৩৭১]। ২৪০–৪১

৭ ড প্রণয়কুমার কুণ্ডু : রক্তকরবী : পাণ্ডুলিপি-সংবলিত সংস্করণ [১৪০৫]। ৫৮০ [অতঃপর ‘রক্তকরবী : পাণ্ডুলিপি’-রূপে উল্লিখিত]

৮ Gretchen Green : *The Whole World & Company* [1936]/175–76

৯ সতীশচন্দ্র রায়, ‘রবীন্দ্র-স্মৃতি’ : নলিনীকুমার ভদ্র ও অন্যান্যদের সম্পাদিত ‘কবি-প্রণাম’ [১৩৪৮]। ১০–১১

১০ ঐ। ১৩

১১ দ্র হেম চট্টোপাধ্যায়, ‘শিলঙে রবীন্দ্রনাথ’ : ঐ। ২৫–২৬

১২ দেশ, শারদীয় ১৪০১। ৩৪, পত্র ৪৭

১৩ দেশ, ২৩ জ্যৈষ্ঠ ১৩৮২। ৪১৫, পত্র ৩৪

১৪ চিঠিপত্র ১১। ৩৩, পত্র ২২

১৫ দিনেন্দ্র শতবার্ষিকী গ্রন্থ [1985]। ১৯, পত্র ৪

১৬ *Letters from Abroad* [1924]/ 56

১৭ প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় : রবীন্দ্রজীবনী ও রবীন্দ্রসাহিত্য-প্রবেশক ৩ [১৩৯৭]। ১৫৬ [অতঃপর ‘রবীন্দ্রজীবনী ৩’-রূপে উল্লিখিত]

১৮ দ্র ড বিশ্বনাথ রায়, ‘যক্ষপুরীতে রাজবন্দী ও কয়েকজন’ : নজরুল শতবর্ষের শ্রদ্ধার্ঘ্য [1999]। ২৯৬–৩২৯ এবং ‘রবীন্দ্রনাথ ও নজরুল’ : কোরক, নজরুল বইমেলা-সংখ্যা [১৪০৫]। ৯–৬১

১৯ ঐ : কোরক। ৩৮

২০ চিঠিপত্র ২ [১৩৪৯]। ৭৪

২১ দেশ, ২৩ জ্যৈষ্ঠ ১৩৮২। ৪১৫, পত্র ৩৫

২২ ‘শিলঙে রবীন্দ্রনাথ’ : কবি-প্রণাম। ২৫

২৩ রবীন্দ্রজীবনী ৩। ১৫৫, পাদটীকা ৩

২৪ অলকা, আশ্বিন ১৩৪৯। ১–২

২৫ রবীন্দ্র-প্রসঙ্গ ১। ৪৪৩

২৬ দেশ, শারদীয় ১৪০১। ১৮, পত্র ১১

২৭ পুণ্যস্মৃতি। ২৪১

২৮ রবীন্দ্র-প্রসঙ্গ ১। ১৭১

২৯ আনন্দবাজার পত্রিকা, ১১ আষাঢ় : রবীন্দ্র-প্রসঙ্গ ১। ৩৫২

৩০ গোপালচন্দ্র রায় : রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র [১৩৭১]। ২৭

৩১ চিঠিপত্র ১১। ৩৩, পত্র ২৩

৩২ দেশ, শারদীয় ১৪০১। ১৮, পত্র ১২

৩৩ উত্তরা, আশ্বিন ১৩৩৪। ৩

৩৪ চিঠিপত্র ১৮। ১৮৭, পত্র ১০১

৩৫ রবীন্দ্র-প্রসঙ্গ ১। ১৭১

৩৬ পুণ্যস্মৃতি। ২৪১

৩৭ দেশ, শারদীয় ১৪০১। ৩৩, পত্র ৪৭

৩৮ র-মূল

৩৯ সাহানা দেবী : স্মৃতির খেয়া [1978]। ১৫৪

৪০ ঐ। ১৫৯

৪১ ঐ। ১৬২–৬৩

৪২ রাণু মুখোপাধ্যায়, 'ভানুসিংহ ঠাকুর : কিছু তথ্য' : রবীন্দ্রবীক্ষা ৩২ [পৌষ ১৪০৪]। ৬৬

৪৩ রবীন্দ্র-প্রসঙ্গ ১। ১৭১–৭২

৪৪ দ্র ঐ। ১৬০

৪৫ দ্র ঐ। ১৫৯

৪৬ রবীন্দ্রজীবনী ৩। ১৫৮

৪৭ চিঠিপত্র ১৮। ২২২, পত্র ১২৩

৪৮ রবীন্দ্রবীক্ষা ৩২। ৬৬

৪৯ স্মৃতির খেয়া। ১৫৫

৫০ রবীন্দ্র-প্রসঙ্গ ১। ২৩৩

৫১ চিঠিপত্র ৭। ১১৫, পত্র ৮৪

৫২ চিঠিপত্র ১৮। ২০৮–০৯, পত্র ১১৬

৫৩ রবীন্দ্র-প্রসঙ্গ ১। ১৬১

৫৪ চিঠিপত্র ১৮। ২০৭, পত্র ১১৫

৫৫ দ্র *Visva-Bharati Quarterly* [Elsewhere, *V.B.Q.*], Oct 1923/309

৫৬ পুণ্যস্মৃতি। ২৪২

৫৭ রবীন্দ্র-প্রসঙ্গ ১। ১৭২

৫৮ সমর ভৌমিক : রাণু মুখোপাধ্যায়ের জীবনালেখ্য [১৪০৪]। ৭৪–৭৫

৫৯ রুদ্রপ্রসাদ চক্রবর্তী : রঙ্গমঞ্চ ও রবীন্দ্রনাথ : সমকালীন প্রতিক্রিয়া [1995]। ৬৪–৬৫ থেকে উদ্ধৃত [অতঃপর গ্রন্থটি 'রঙ্গমঞ্চ ও রবীন্দ্রনাথ' নামে উল্লেখিত হবে]

৬০ রবীন্দ্রজীবনী ৩। ১৬১, টীকা ১-এ উদ্ধৃত

৬১ চিঠিপত্র ১৮। ২১০—১১, পত্র ১১৭

৬২ স্মৃতির খেয়া। ১৬১

৬৩ রবীন্দ্র-প্রসঙ্গ ১। ১৭৩

৬৪ রঙ্গমঞ্চ ও রবীন্দ্রনাথ। ৫৫

৬৫ রবীন্দ্রবীক্ষা ৩২। ৬৬

৬৬ চিঠিপত্র ১৮। ২৮৫, পত্র ১৪৯

৬৭ ঐ ১৮। ২১২, পত্র ১১৮

৬৮ রবীন্দ্র-প্রসঙ্গ ১। ১৭২

৬৯ চিঠিপত্র ১৮। ৩৭৭, পত্র ১

৭০ Krishna Dutta & Andrew Robinson ed. *Selected Letters of Rabindranath Tagore* [1997]/ 304, Letter 193

৭১ চিঠিপত্র ১৮। ২১১, পত্র ১১৭

৭২ ঐ ১২। ৮৬, পত্র ৭৫

৭৩ ঐ ১৮। ২১০, পত্র ১১৭

৭৪ ঐ ১৮। ২১৩, ২১২—১৩, পত্র ১১৮

৭৫ ঐ ১৮। ২১২—১৩, ২১৪, পত্র ১১৯

৭৬ দেশ, ৩০ জ্যৈষ্ঠ ১৩৮২। ৪৯৫, পত্র ৩৬

৭৭ চিঠিপত্র ৫। ৪৭—৪৮

৭৮ দেশ, ৩০ জ্যৈষ্ঠ ১৩৮২। ৪৯৫, পত্র ৩৭

৭৯ চিঠিপত্র ১৮। ২১৭, পত্র ১২০

৮০ দেশ, সাহিত্য ১৩৯০। ৭

৮১ ঐ। ১২

৮২ র-প্রতিলিপি

৮৩ নেপাল মজুমদার : ভারতে জাতীয়তা ও আন্তর্জাতিকতা এবং রবীন্দ্রনাথ ২ [1963]। ২২১ [অতঃপর গ্রন্থটি 'ভারতে জাতীয়তা' নামে উল্লেখিত হবে]

৮৪ *Imperfect Encounter*, ed. May M. Lago (1972)/ 309

৮৫ 'পরলোকগত পিয়র্সন' : শান্তিনিকেতন, ফাল্গুন। ২১—২৪; ব্যক্তিপ্রসঙ্গ ৩১। ৯৯—১০৩

৮৬ চিঠিপত্র ১১। ৩৭, পত্র ২৬

৮৭ ঐ ১৮। ২২১—২২, পত্র ১২৩

৮৮ প্রশান্তচন্দ্র-নির্মলকুমারী মহলানবিশ-সংগ্রহ, র-মূল

৮৯ 'আশ্রম-সংবাদ' : শান্তিনিকেতন, অগ্র। ১৯২

৯০ চিঠিপত্র ৭। ১১৫, পত্র ৮৫

৯১ দ্র দেশ, ২৫ বৈশাখ ১৩৬১। ৯

৯২ দ্র রবীন্দ্রজীবনী ৩। ১৬৮

৯৩ বি. ভা. প., কার্তিক-পৌষ ১৩৭৫। ৯৮, পত্র ৬

৯৪ *Parabi*/ 81, Letter 17

৯৫ র-মূল

৯৬ চিঠিপত্র ১৮। ২২২–২৪, পত্র ১২৪

৯৭ বি. ভা. প., কার্তিক-পৌষ ১৩৭৫। ৯৮, পত্র ৬

৯৮ ঐ। ৯৯, পত্র ৭

৯৯ দেশ, সাহিত্য ১৩৮৩। ৯, পত্র ১

১০০ চিঠিপত্র ১৮। ২২৫, পত্র ১২৫

১০১ রবীন্দ্র-প্রসঙ্গ ১। ৪৪৩

১০২ ডরোথি স্ট্রেটকে লিখিত এল্‌ম্‌হার্স্টের পত্র, অ্যান্ড্রু রবিনসনের সৌজন্যে প্রাপ্ত

১০৩ Krishna Kripalani *: Rabindranath Tagore : A Biography* [1980]/ 321

১০৪ রবীন্দ্র-প্রসঙ্গ ১। ৪৪৩

১০৫ বি. ভা. প., কার্তিক-পৌষ ১৩৭৫, পত্র ৪

১০৬ ঐ। ৯৮, পত্র ৫

১০৭ চিঠিপত্র ১৮। ২২৬, পত্র ১২৬

১০৮ সোমেন্দ্রনাথ বসু-সংকলিত, সাময়িকপত্রে রবীন্দ্রপ্রসঙ্গ : প্রবাসী [1976]। ৭২ [অতঃপর 'রবীন্দ্রপ্রসঙ্গ : প্রবাসী' নামে উল্লেখিত]

১০৯ চিঠিপত্র ১৮। ২২৮–২৯, পত্র ১২৭

১১০ রবীন্দ্র-প্রসঙ্গ ১। ৪৪৩

১১১ ঐ ১। ৪৪৪

১১২ প্রশান্তচন্দ্রকে লেখা রানী মহলানবিশের পত্রাবলি, র-মূল

১১৩ দেশ, শারদীয় ১৪০৩। ২৮, পত্র ১৫

১১৪ বি. ভা. প., কার্তিক-পৌষ ১৩৭৫। ৯৯, পত্র ৮

১১৫ চিঠিপত্র ১২। ২৯২, পত্র ১৫

১১৬ ঐ ১৮। ২৩৪, পত্র ১৩০

১১৭ র-প্রতিলিপি

১১৮ চিঠিপত্র ১৮। ২৩৫–৩৭, পত্র ১৩১

১১৯ র মূল

১২০ দেশ, ১৯ কার্তিক ১৩৬৭। ২০, পত্র ১

১২১ 'আশ্রম সংবাদ' : শান্তিনিকেতন, ফাল্গুন। ৩৭

১২২ র-প্রতিলিপি

১২৩ চিঠিপত্র ১৮। ২৪০, ২৩৮—৩৯, পত্র ১৩২

১২৪ ঐ ১৮। ২৩২, পত্র ১২৯

১২৫ ঐ ১৮। ২৪৩, পত্র ১৩৩

১২৬ গোপালচন্দ্র রায় : রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র | [১৩৭১]। ৩৭

১২৭ দেশ, শারদীয় ১৩৯৮। ৫৭—৫৮, পত্র ৭৩

১২৮ ঐ, শারদীয় ১৪০১। ১৬, পত্র ২

১২৯ ঐ, ৩০ জ্যৈষ্ঠ ১৩৮২। ৪৯৬, পত্র ৪০

১৩০ ঐ, সাহিত্য ১৩৯০। ৮, পত্র [৭]

১৩১ রবীন্দ্রবীক্ষা ১২ [পৌষ ১৩৯১]। ১৩, পত্র ৬

১৩২ চিঠিপত্র ১৮। ২৫০-৫১, পত্র ১৩৫

১৩৩ ঐ ১৮। ৩৫৯, পত্র ৮

১৩৪ মাসিক বসুমতী, মাঘ ১৩৫৭। ৫০৩

১৩৫ চিঠিপত্র ১৮। ২৬১, পত্র ১৩৯

১৩৬ দেশ, সাহিত্য ১৩৯০। ১০

১৩৭ চিঠিপত্র ১৮। ২৫৪, পত্র ১৩৭

১৩৮ রবীন্দ্র-প্রসঙ্গ ১। ৩৫৫

১৩৯ চিঠিপত্র ১৮। ২৫৮—৫৯, পত্র ১৩৮

১৪০ চিঠিপত্র ১৮। ৩৭৮—৭৯, পত্র ২

১৪১ চিঠিপত্র ১৮। ২৬১—৬৩, পত্র ১৩৯

১৪২ দ্র গীতবিতান কালানুক্রমিক সূচী। ২৬৯

১৪৩ চিঠিপত্র ১৮। ২৬৪—৬৫, পত্র ১৪০

১৪৪ *The World & the Company* / 178

১৪৫ রবীন্দ্র-প্রসঙ্গ ১। ৪৯৭

১৪৬ র-মূল

১৪৭ শিশিরকুমার দাশ ও তান ওয়েন : বিতর্কিত অতিথি [১৩৯২]। ১০—১১

১৪৮ র-প্রতিলিপি

১৪৯ দ্র *Visva-Bharati Bulletin*, No. 1, Part I, From Calcutta to Peking (1924)/2

১৫০ Stephen N. Hay: *Asian Ideas of East and West : Tagore and His Critics in Japan, China, und India* [1970] / 14 [Elsewhere *Asian Ideas*]

১৫১ চিঠিপত্র ১৮। ২৬৬–৬৭, পত্র ১৪১

১৫২ দ্র রবীন্দ্রজীবনী ৩। ১৭৮

১৫৩ 'চীন ও জাপানে ভ্রমণবিবরণ' : প্রবাসী, কার্তিক ১৩৩১। ৯৩–৯৪

১৫৪ চিঠিপত্র ১৮। ২৬৮–৬৯, পত্র ১৪২

১৫৫ ঐ ১৮। ২৭১–৭২, পত্র ১৪৩

১৫৬ ঐ ১৮। ২৭৩–৭৪, পত্র ১৪৪

১৫৭ চিঠিপত্র ৩ [১৩৪৯]। ৩৮–৩৯, পত্র ১৭

১৫৮ প্রবাসী, কার্তিক ১৩৩১। ৯৫–৯৬

১৫৯ চিঠিপত্র ১৮। ২৭৬, পত্র ১৪৫

১৬০ ঐ ১৮। ২৭৭–৭৮, পত্র ১৪৬

১৬১ ঐ ১৮। ২৭৯–৮০, পত্র ১৪৭

১৬২ বি. ভা. প., শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৭২। ৪, পত্র ৬

১৬৩ র-মূল

১৬৪ চিঠিপত্র ১৮। ২৮২–৮৩, পত্র ১৪৮

১৬৫ রবীন্দ্রজীবনী ৩। ১৮২, পাদটীকা ২

১৬৬ প্রবাসী, কার্তিক ১৩৩১। ৯৬

১৬৭ কালিদাস নাগ : কবির সঙ্গে একশো দিন [১৩৯৪]। ১৩

১৬৮ দেশ, শারদীয় ১৪০১। ৩২, পত্র ৪৫

১৬৯ '*The Mahatma and the Poet*' ed. Sabyasachi Bhattacharyya [1997]/97

১৭০ *The Complete Works of Mahatma Gandhi* [Hereafter: *CWMG*], Vol.23 [1967]/ 201, No.105

১৭১ জওহরলাল নেহরু : আত্মচরিত [1997]। ৬৪–৬৫ [সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার-অনূদিত]

১৭২ 'আশ্রম সংবাদ' : শান্তিনিকেতন, বৈশাখ। ৫৭–৫৮; অপিচ, সুপ্তি মিত্র-সম্পাদিত 'সাময়িকপত্রে রবীন্দ্রপ্রসঙ্গ / শান্তিনিকেতন' [১৩৮৬]। ১২৪

১৭৩ দ্র রবীন্দ্র-প্রসঙ্গ ১। ১৬৯–৭১

চতুঃষষ্টি অধ্যায়

১৩৩১ [1924–25] ১৮৪৬ শক ॥ রবীন্দ্রজীবনের চতুঃষষ্টি বৎসর

১৩৩১ বঙ্গাব্দের প্রথম দিনটিতে [সোম 14 Apr 1924] রবীন্দ্রনাথ ছিলেন সাংহাইতে। এখানে চিন ও বিশ্বভারতীর মধ্যে অধ্যাপক ও ছাত্র-বিনিময়ের যে-প্রস্তাব উত্থাপিত হয়েছিল, তিনি তাতে খুবই উদ্দীপিত বোধ করছিলেন; সেই কথাই এদিন লিখলেন রথীন্দ্রনাথকে :

> এখানে খুব আদর যত্ন পাওয়া যাচ্চে। বেশ মনে হচ্চে এদের সঙ্গে আমাদের যথেষ্ট ঘনিষ্ঠতা হবে। শাস্ত্রীমশায়কে এখানে পাঠাবার দরকার আছে। আমাদের প্রস্তাব শুনে এরা ভারি খুসি হয়েচে। ওরাও এখান থেকে অধ্যাপক পাঠাতে সম্মত আছে। তাহলে বিশ্বভারতীতে চীনীয় ভাষা শেখবার সুব্যবস্থা হবে। চীনীয় থেকে হারানো সংস্কৃত বইয়ের তর্জ্জমারও সুবিধা হতে পারবে। এ সম্বন্ধে বীরলা ভ্রাতাদের সঙ্গে এখন থেকে আলাপ সুরু করিস্। শাস্ত্রীমশায় ছাড়া আর কারো দ্বারা কাজ হবে না। পীকিনে একজন খুব সংস্কৃত অভিজ্ঞ রাশিয়ান পণ্ডিত আছেন। আমাদের ওখান থেকে কোনো বাজে লোক এলে ধরা পড়বে।[১]

রাজা বলদেওদাস বিড়লা বিশ্বভারতীর উন্নতিকল্পে কুড়ি হাজার টাকা দান করেছিলেন। সংসদ সিদ্ধান্ত নিয়েছিল, এই টাকা দিয়ে দেশবিদেশের গবেষক-ছাত্রদের জন্য একটি অতিথিশালা নির্মাণ করা হবে। রবীন্দ্রনাথ তার কথা উল্লেখ করে রথীন্দ্রনাথকে লিখলেন : 'আর একটি জরুরী কাজ হচ্চে সেই বীর্‌লা ধর্ম্মশালা তৈরি করতে যেন আর দেরি না হয়। এখান থেকে ছাত্র গিয়ে প্রথমেই যদি অসুবিধা অযত্নের মধ্যে পড়ে তাহলে নাম খারাপ হবে।' এই অতিথিশালা কোনোদিনই গড়ে ওঠেনি।

চেকিয়াং [Chekiang] প্রদেশের রাজধানী হাংচৌ [Hangchow] থেকে রবীন্দ্রনাথের কাছে আমন্ত্রণ এসেছিল। দোভাষী সু সী-মো ও সঙ্গীদের নিয়ে রবীন্দ্রনাথ ট্রেনে ১১০ মাইল দূরের এই শহরের উদ্দেশে রওনা হন। কালিদাস নাগ লিখেছেন : 'নববর্ষে সকলে গুরুদেবকে প্রণাম করে সকাল ৮টার গাড়ী ধরে Hangchow যাত্রা, ১২টা নাগাদ পৌঁছান।'[২] এখানকার পশ্চিম হ্রদের সৌন্দর্য খুবই বিখ্যাত, তারই তীরবর্তী একটি হোটেলে সকলে আশ্রয় নেন। পরদিন রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীরা নিকটবর্তী একটি পাহাড়ে বৌদ্ধমঠ দেখতে যান। কথিত আছে, বোধিজ্ঞান বা হুই-লি নামে একজন ভারতীয় বৌদ্ধ এই মঠের প্রতিষ্ঠাতা।

16 Apr [বুধ ৩ বৈশাখ] বিকেলে Provincial Educational Society-র উদ্যোগে অনুষ্ঠিত প্রধানত কয়েক হাজার ছাত্রে পরিপূর্ণ একটি সভায় রবীন্দ্রনাথ উক্ত বৌদ্ধভক্তের কথা উল্লেখ করে বললেন, তিনিও সেই পূর্বপুরুষদের প্রতিনিধি হিসেবে একই প্রীতির বাণী বহন করে এখানে এসেছেন। সেই ভক্ত এখানে এসে একটি পাহাড় দেখে মনে করেছিলেন, তাঁর দেশের গৃধ্রকূট পাহাড়টি যেন উড়ে চলে এসেছে— এমনই তাদের সাদৃশ্য। তাঁরও এখানকার পাহাড় গাছপালা দেখে একই কথা মনে হচ্ছে, হৃদয়বিনিময়ের অসুবিধার কারণ শুধু

ভাষার পার্থক্য। কিন্তু সেটি প্রয়াসসাপেক্ষ— অনেক বাধা পেরিয়ে তা সম্ভব হয়। তিনি জানেন, ছাত্রদের অনেকেই তাঁকে বোঝেন না— কিন্তু তবুও যে তাঁরা দলে দলে তাঁর কাছে এসেছেন 'It is not because you expect any message from me, but, as I believe, because of some memory of that glorious time when India did send her messengers of love to this land,— not her merchants nor her soldiers, but the best of her children,— and they came bearing her gifts across deserts and seas.' এই পথনির্মাণই ছিল প্রাচীন ভারতের ব্রত— ব্যবসার জন্য নয়, ক্ষমতার জন্য নয়, দূর দেশের ভ্রাতাদের অন্তরে পৌঁছনোর জন্য। আজ বিজ্ঞানের সাহায্যে দূর অনেক সহজেই নিকটে চলে এসেছে, কিন্তু পারস্পরিক সহজ সম্পর্ক স্থাপন করার লক্ষ্য গেছে হারিয়ে। এটি সবসময়েই ক্ষতিকর যখন আমরা কাছাকাছি আসি অথচ মিলিত হই না। সে ক্ষেত্রে 'We form a crowd, but not a community.' এর পরে তিনি তাঁর চিনে আসার উদ্দেশ্য বর্ণনা করলেন স্পষ্ট ভাষায় : 'My friends, this is my mission. I have come to ask you to re-open the channel of communion which I hope is still there; for though overgrown with weeds of oblivion, its lines can still be traced. I shall consider myself fortunate if, through this visit, China comes nearer to India and India to China,— for no political or commercial purpose, but for disinterested human love and for nothing else.'

রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত Ms. 304 (ii)-সংখ্যক পাণ্ডুলিপিতে দেখা যায়, এলমহার্স্ট এই মৌখিক ভাষণের অনুলিপি নিয়েছেন পেনসিলে ও তার টাইপ-করা প্রতিলিপিটি রবীন্দ্রনাথের দ্বারা সংশোধিত হয়। পরে সেটি *Talks in China* [1924]-সংস্করণের দ্বিতীয় ভাষণ 'To Students at Hangchow' নামে মুদ্রিত হয়েছিল [দ্র *EWRT* 2/ 643–44]। স্টিফেন হে জানিয়েছেন, বৃষ্টি সত্ত্বেও ছাত্রেরা বিপুল সংখ্যায় হল পরিপূর্ণ করে ফেলেছিল ও সু সী-মো-র অনুবাদ শুনে তারা বহুবার উল্লাসধ্বনি করে ওঠে। এর পরে রবীন্দ্রনাথ সদলবলে চেকিয়াং প্রদেশের অগ্রণী শিক্ষাবিদ্‌দের সঙ্গে চা-পানে মিলিত হন। এই অঞ্চলের সর্বপ্রাচীন কবি Ch'en San-li তাঁর সঙ্গে পরিচিত হয়ে অত্যন্ত অভিভূত হন।[৩] কালিদাস নাগ লিখেছেন : 'কবি তাঁর দলের সকলকে দু-একটি কথায় বেশ ভাল করে introduce করে দিলেন— আমায় বলতে অনুরোধ করা হতে কিছু বললাম— "Role of India and China in the Cultural Unity of Asia"।

17 Apr [বৃহ ৪ বৈশাখ] 'সকাল ৮টার গাড়ী ধরে গুরুদেবের সঙ্গে এক ঘরে নানা বিষয় কথা বলতে [বলতে] Sanghai [sic] আসা'।

এইদিন রাত্রে North Szechwan Road-এর জাপানি স্কুলে সাংহাইয়ের জাপানি অধিবাসীরা রবীন্দ্রনাথকে সংবর্ধনা জানান। প্রত্যুত্তরে তাঁর ভাষণটির অনুলিপি নেন এলমহার্স্ট, রবীন্দ্রনাথের সংশোধন-সহ তার পাণ্ডুলিপি রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত আছে [দ্র Ms. 304 (x - A1, A2)]; ভাষণটি *Talks in China* [1924]-এর ১৩শ রচনা 'To The Japanese Community of China' [*EWRT* 2/ 670–72) নামে সংকলিত হয়েছে। 1916-এ তাঁর জাপান-ভ্রমণের অভিজ্ঞতা স্মরণ করে তিনি বললেন, সেখানে তিনি তাঁদের বাড়িতে বাস করেছেন ও তাঁদের প্রীতির আস্বাদ পেয়েছেন— সেইটিই জাপানের ঐতিহ্য। কিন্তু য়ুরোপীয় স্কুলে-পড়া আধুনিক জাপানকেও তিনি দেখেছিলেন— 'I had some glimpses also of political Japan and the Japan that was intent upon profit-making and augmenting political power— rigid, exclusive,

suspicous, lacking in humanity.' অবশ্য এর জন্য জাপান একা দায়ি নয়— 'Power is rampant in the human world to-day, the power of money, of machine guns and of bomb-dropping aeroplanes, and the primitive in us stands once more, in awe of that which is neither spiritual nor moral.'

পশ্চিমি যন্ত্রসভ্যতার এই নিন্দা অনেকের ভালো লাগেনি, *The Peking Leader* [24 Apr] তার সম্পাদকীয়তে রবীন্দ্রনাথের বক্তব্যের সমালোচনা করে।

রবীন্দ্রজীবনী-কার লিখেছেন : 'শাংহাইতে আর-একদিন ইহুদীসংঘ-কর্তৃক মি. কাদুরির (Kadoorie) গৃহে রবীন্দ্রনাথের সম্বর্ধনা হইল। ['Address to Rabindranath on behalf of the Jwish Community in China' নামে এই ভাষণটি *Visva-Bharati Quarterly, Oct 1924*-র অন্তর্গত Visva-Bharati Bulletin, pp. 302–05-এ ছাপা হয়।] কাদুরি নিজে কবি। তিনি রবীন্দ্রনাথকে স্বাগত করিয়া বলেন যে, কয়েক বৎসর পূর্বে তিনি *The Wedding of Death* নামে যে কাব্য লেখেন, তাহা পাঠ করিয়া সমালোচকেরা বলেন ইহাতে রবীন্দ্রনাথের ভাবধারা আছে। "This immediately aroused my great interest. Thanks to Dr. Tagore, an inspired vision of a new world was put before my eyes"... ইনি বিশ্বভারতীতে জলকষ্ট নিবারণের জন্য ১২,০০০ টাকা দান করেন।'[8] মি. কাদুরির অর্থসাহায্যের প্রসঙ্গ অন্যত্র উল্লেখিত হলেও সংবর্ধনার বৃত্তান্তের সমর্থন কোথাও পাওয়া যায়নি। বস্তুত সংবর্ধনা অনুষ্ঠানটি হয় জাপান থেকে প্রত্যাবর্তনের পথে 27 Jun [১৩ আষাঢ়] তারিখে, আমরা তার বিবরণ যথাস্থানে দেব।

18 Apr [শুক্র ৫ বৈশাখ] বিকেলে চিনের স্থানীয় শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানগুলির পক্ষ থেকে Pooshan Road-এ অবস্থিত এখানকার সর্ববৃহৎ প্রকাশনা-প্রতিষ্ঠান কমার্শিয়াল প্রেসের নূতন সভাগৃহে C.C. Nieh-এর সভাপতিত্বে রবীন্দ্রনাথকে সংবর্ধনা জানানো হয়— অভিনন্দনপত্রটি পাঠ করেন কিয়াংসু প্রদেশের এডুকেশনাল অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি Mr. Sung, সভায় উপস্থিতির সংখ্যা ছিল ১২০০-রও বেশি। ২৫টি নাগরিক ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান এই সভার আয়োজন করে। সংবর্ধনার উত্তরে রবীন্দ্রনাথ যা বলেন, দুর্ভাগ্যক্রমে সেটি রক্ষিত হয়নি। স্টিফেন হে চিনা সংবাদপত্র অবলম্বনে তার সারাংশ সংকলন করেছেন [দ্র p. 152]। কালিদাস নাগ লিখেছেন : 'কবি সারা এসিয়ার বিপদ কি? চীনের সমস্যা কি জটিল, কি ভয়ানক— তা গভীর বেদনার সঙ্গে জানিয়ে তাঁর ও ভারতের সহানুভূতি জানালেন এবং এই সর্বগ্রাসী নাস্তিক materialismএর অপমৃত্যু কি করে অবশ্যম্ভাবী তাও দেখালেন।'

বক্তৃতার পরে সাংহাইয়ের বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ তাঁকে সান্ধ্যভোজনের জন্য কুং তে লিন [Kung Teh Lin] নিরামিষ ভোজনালয়ে নিয়ে আসেন। সেখানে চিনা সংগীত পরিবেশিত হয়, পরে Ti-i Tai থিয়েটারে সকলকে প্রাচীন চিনা নাটক দেখানো হয়।

19 Apr [শনি ৬ বৈশাখ] সকাল আটটায় সাংহাই ত্যাগ করে ইয়াংসি নদীপথে পিকিঙের উদ্দেশে যাত্রা শুরু হয়। পথে এশিয়ার ভাবী রাজনীতি নিয়ে রবীন্দ্রনাথ সঙ্গীদের সঙ্গে যে-আলোচনা করেন, সেই মূল্যবান বক্তব্যটি কালিদাস নাগ ডায়ারিতে লিখে রেখেছিলেন, ঈষৎ দীর্ঘ হলেও সেটি উদ্ধৃত করছি :

ভারতের [জন]সংখ্যাকেও চীনের সংখ্যার মত শক্তির আধার বলে অনেকে জানে এবং রুষ হয়ত এই দুই দেশকে নিয়েই speculation শুরু করে দিয়েছে কে জানে। সুতরাং আমাদের হিসাব করে চলতে হবে। তবে ভারতের বা সারা এসিয়ার অবস্থা সমান। দুই দানব শক্তির সংঘাত জেগেছে— একদিকে মামুলী old world exploitation আর একদিকে নব্য বলশেভিক terrorism— দুই দুভাবে violence করবে— মামুলীদলের সঙ্গে যুক্ত থাকার কোন মানে নেই কারণ তারা দেখছি স্পষ্ট সত্য সুখের অবতারণা করেনি। লুটপাট জালিয়াতি নীচতা ভণ্ডামী— সব

মহা মহা যুগধর্ম তার স্পষ্ট প্রমাণ দিয়েছে। আর একদিকে শুনছি বলশেভিকের challenge যে তারা নতুন সমাজ, নতুন ধর্ম অথবা ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা করবেই : উদ্দেশ্য হয়ত ভাল, হয়ত সফল হবে এবং তার ভিতর দিয়ে এসিয়ার মস্ত পুনরুত্থান দেখব; কিন্তু উপস্থিত যে চেহারা দেখছি তাকে ভবিষ্যৎ স্বর্ণযুগের পূর্ণাবতার বলতে পারিনে। গোড়ার কথা গোটাকতক ভাবা যাক্— মানুষ, মানুষ হয়েই চিরকাল বাঁচতে চাইবে; ছাঁচে ঢালা মত বা আদর্শ নয়— যত ভালই হোক না কেন সে-আদর্শ— ব্যক্তিত্ব (individualism) বাদ দিয়ে সমষ্টি (communism) দাঁড়াতে পারবেনা কোনদিনই— যেমন unitকে বাদ দিয়ে infinityর মানে নেই। Communism যত সত্য individualism ততই সত্য— এই individualismএর সামাজিক ভিত্তি হচ্ছে family এবং আর্থিক ভিত্তি হচ্ছে property, এই দুইয়ের কোনটাকেই বাদ দিয়ে সত্য communisim গড়া যাবেনা— যবরদস্তি [য] অংশ যতটা বলশেভিজিমের মধ্যে আছে তা টিকবেনা। কারণ তা মিথ্যা— জোর করে ভাল করলে ভালরই মূলচ্ছেদ করা হয়।

অথচ এটা মানি যে এই নব্যদল সত্যি একটা নব্যন্যায়ের প্রতিষ্ঠা করতে চেষ্টা করছে এবং হয়ত ক্রমশ করবে। এদের মধ্যে সত্যি দরদ হয়ত আছে দলিত জাতিদের জন্য। সুতরাং এরা চীন ও ভারতের সঙ্গে মিলতে পারলে হয়ত মস্ত এক ঐতিহাসিক পরিবর্তনের সূচনা করবে— প্রাচ্যের এই বিরাট পুনরুত্থানকে রাষ্ট্রশক্তি 'বিপ্লব' বলে, বিপদ বলে প্রাণপণে নষ্ট করতে চেষ্টা করবে কিন্তু প্রাচ্য ও প্রতীচ্য— পদদলিত সমস্ত জাতির বেদনা ও লাঞ্ছনার মধ্যে যে সত্য আছে, ন্যায়ের যে দণ্ড দেখেছি— তা কোন রাষ্ট্র বা অর্থশক্তিই রুখতে পারবেনা— জয়ী হবেই এবং সে জয়ের মধ্যে দিয়ে বিশ্বমানব এক অভিনব সম্ভাব্যতার পথে এগিয়ে চলবে।[৫]

সাম্রাজ্যবাদীদের বেড়াজাল পেরিয়ে সোভিয়েত রাশিয়ার প্রকৃত অবস্থা জানা সেই সময়ে সহজ ছিল না, তবু আন্তর্জাতিক রাজনীতি সম্পর্কে সচেতন রবীন্দ্রনাথ এত খবর সংগ্রহ করেছেন ও অন্যান্য দেশের উপর তার প্রতিক্রিয়া বিষয়ে এতটা ভেবেছেন জেনে আশ্চর্য লাগে। বলশেভিক অর্থনীতি ও রাজনীতির কয়েকটি মূল তত্ত্ব সম্পর্কেই তিনি প্রশ্ন উত্থাপন করেছিলেন ও তাঁর সংশয়ও যে অভ্রান্ত ছিল পরবর্তী ইতিহাসই তা প্রমাণ করেছে। অন্যান্য দেশে বিপ্লব রপ্তানি করার যে লক্ষ্য প্রথমে রাশিয়া ও পরে চিন গ্রহণ করেছিল তার আভাসকেও তিনি শনাক্ত করতে পেরেছিলেন!

20 Apr [রবি ৭ বৈশাখ] সকালে স্টিমার নানকিং পৌঁছলে সকলে রিভার ব্রিজ হোটেলে ওঠেন। কালিদাস নাগ লিখেছেন, সু সী-মো রাজনীতির কথা তুললে রবীন্দ্রনাথ বলেন :

একটা মস্ত experiment তোমরা চীন থেকে করতে পার। তোমার আছে সংখ্যা, তোমাদের আছে Pacific Tradition। তোমরা যে-বেড়াপাকে পড়েছ, তা থেকে কেবলমাত্র কোনরকমে মুক্তি পেতে চেষ্টা না করে সেই মুক্তির মধ্য দিয়ে মানুষকে মস্ত শিক্ষা দিতে পার যদি non-violent non-co-operation নীতি তোমরা একবার প্রয়োগ করে দেখ : যারা তোমাদের কাপুরুষের মত ঘিরে লুঠ করছে, মারছে,— তাদের শিক্ষা যদি তোমাদের হাতে হয়— তাহলে সমস্ত পৃথিবী তোমাদের কাছে কৃতজ্ঞ থাকবে— দুটি জিনিষ তোমাদের মনে রেখে সাধনায় নামতে হবে— যা কিছু মন্দ অসুন্দর তার সম্বন্ধে ঔদাসীন্য বর্জন করে তার বিরুদ্ধে লড়া— অবশ্য জানোয়ারের যন্ত্রে নয়, মানুষোচিত যন্ত্রে— পশুবলে নয়— অধ্যাত্মবলে, হিংসার বিরুদ্ধে হিংসা দিয়ে নয়, ক্ষমা, পরিপূর্ণ ক্ষমা দিয়ে— তবেই সার্থক হবে সাধনা— এই যুদ্ধে যদি প্রথম ক্ষয়ও হয় তবু জেনো জয় তোমাদেরই— বালীদ্বীপের যে ৫০০০ নরনারী আত্মহত্যা করে তাদের Tyrant Dutch কর্তাদের শিক্ষা দিয়েছিল তার ধাক্কা epicএর মত চিরদিন মানুষের প্রাণে বাজবে— তোমরাও তেমনি করে অহিংসাব্রতে সিদ্ধ হয়ে এসিয়াকে সার্থক এবং সমস্ত বিশ্বমানবকে ঋণী করবে।[৬]

নিজের দেশে গান্ধীজি-প্রবর্তিত অসহযোগ আন্দোলনকে তিনি সমর্থন করতে পারেননি শিক্ষা ও সংস্কৃতিকে তিনি রাজনীতির আঙিনায় টেনে এনেছিলেন বলে, নইলে সেই অহিংস আন্দোলনে-যে তাঁর সাগ্রহ সমর্থন ছিল তার সর্বোৎকৃষ্ট প্রমাণ 'প্রায়শ্চিত্ত' ও 'মুক্তধারা' নাটকে ধনঞ্জয় বৈরাগীর চরিত্রায়ণে ও তার প্রচারিত আদর্শে।

এর পরে রবীন্দ্রনাথ কিয়াংসু, কিয়াংসি প্রভৃতি তিনটি প্রদেশের সমরনায়ক বা তুচুন চি শি-য়ুয়ান-এর সঙ্গে দেখা করেন। কালিদাস নাগ উভয়ের কথোপকথনের সারমর্ম লিখে রেখেছিলেন তাঁর ডায়ারিতে; রবীন্দ্রনাথ বলেন : 'চীন সম্বন্ধে আমার গভীর প্রীতি ও ঔৎসুক্য চিরদিনই আছে— আজ সেই কথা জানাবার সুযোগ পেয়ে বিশেষ সুখী হয়েছি— চীন বহু প্রাচীন কাল থেকে যে সভ্যতার আদর্শ নিয়ে আসছে— শান্তির ভিত্তিতে সেটি গড়েছে— তা মানবের অমূল্য সম্পদ। সেটিকে আধুনিক তথাকথিত সভ্য যুগের বর্বরতা প্রায় নষ্ট করতে বসেছে। এই বিষম বিপদ সম্বন্ধে সজাগ করিয়ে দেবার জন্যে আমার এখানে আসা— কারণ চীন

সম্বন্ধে গভীর আত্মীয়তাবোধ ভারতবাসীর আছে। ভারত উৎসুক হয়ে চেয়ে আছে— কবে চীন স্বাধীন স্বতন্ত্র ও নিজ সভ্যতায় স্বপ্রতিষ্ঠিত হয়ে বিশ্বের সামনে আবার মাথা তুলে দাঁড়াবে। শান্তিমন্ত্রের সাধক চীন পৃথিবীকে নতুন আদর্শ দেখাবে— তার এই সাময়িক গৃহবিচ্ছেদ ও মারামারির দুঃখকর অধ্যায় শেষ করে।' জেনারেল তাঁর সঙ্গে একমত হয়ে বলেন, তিনিও শান্তিতে বিশ্বাস করেন ও আক্রান্ত না হলে তিনি আক্রমণ করেন না।

পরে রবীন্দ্রনাথ অসামরিক শাসক হান ৎসে-সুই [Han Tze-sui]-এর সঙ্গেও দেখা করেন। ভক্ত মানুষটি তাঁকে বলেন, তাঁর সাংহাইয়ের বক্তৃতা পড়ে তাঁরা খুবই উপকৃত হয়েছেন; প্রতিশ্রুতি দেন, চিন-ভারত ছাত্র-বিনিময়ের জন্য আন্তরিক চেষ্টা করবেন তিনি। তিনি অবশ্য সতর্ক করে দেন, রবীন্দ্রনাথের বাণীর তাৎপর্য বর্তমান ছাত্রশ্রেণী হয়তো অগ্রাহ্য করতে পারে।

দুপুরে বিশ্ববিদ্যালয়ে রবীন্দ্রনাথের বক্তৃতার আসর এই ছাত্রশ্রেণীই পূর্ণ করে ফেলে। তাদের ভিড়ে বক্তৃতামঞ্চের উপরের ব্যালকনি ভেঙে পড়ার উপক্রম হয়েছিল— কোনোক্রমে ভয়ানক দুর্ঘটনার হাত থেকে রবীন্দ্রনাথ ও অন্যেরা রক্ষা পান। ৮ [৯] বৈশাখ তিনি রাণুকে লেখেন :

…পর্শু গিয়েছিলুম ন্যান্‌কিঙে। …সেখানে বিশ্ববিদ্যালয়ের বক্তৃতাশালায় আমার সভা ছিল। প্রকাণ্ড ঘর। উপরে দেয়াল ঘিরে একটা গ্যালারি। বিষম ভীড়। তারস্বরে আমি যেই বক্তৃতা আরম্ভ করেচি, দু চারটে কথা বলেচি মাত্র এমন সময় ধড়াম করে একটা শব্দ; সভা কেঁপে উঠ্‌ল, সমস্ত লোক চঞ্চল হয়ে বেরিয়ে পড়বার দরজার দিকে মুখ করেচে। আমি যে-মঞ্চে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা করচি ঠিক তারি মাথার উপরের গ্যালারি লোকের ভারে হঠাৎ বাঁধন ছাড়িয়ে চার পাঁচ ইঞ্চি নেবে পড়ল। ভেঙে পড়বার মত ভাব। অতি অল্প একটুতে আট্‌কে গেল। যদি ভাঙত তাহলে সেই মুহূর্ত্তে আমারও কপাল ভাঙত। আমার মাথার উপর পুষ্পবৃষ্টি না হয়ে নরনারী বৃষ্টি হত। এল্‌ম্‌হর্স্টের মুখ বিবর্ণ, কালিদাস ব্যস্ত হয়ে আমাকে টেনে বাইরে আনবার চেষ্টায় প্রবৃত্ত। আমি নড়লুম না। হাত তুলে সবাইকে শান্ত হতে ইঙ্গিত করলুম। যদি আমি ভয়ে ব্যস্ত হয়ে পালাবার পথ দেখতুম তাহলে সেই তিন হাজার লোক পালাবার ঠেলাঠেলিতে সর্ব্বনাশ কাণ্ড ঘটাত। আমি জোর করে কালিদাসকে থামিয়ে দিয়ে বক্তৃতা করে চল্‌লুম। আশ্চর্য্য এই আমার এই বক্তৃতা সবাই বল্‌লে আমার সব চেয়ে ভালো বক্তৃতা হয়েছিল।[৭]

রবীন্দ্রনাথের ভাষণটি 'To Students at Nanking' নামে *Talks in China* [1924]-এর তৃতীয় রচনা হিসেবে মুদ্রিত হয় [দ্র *Talks in China* (1925), 'To Students II']। এলমহার্স্ট-কৃত এর অনুলিখনের পাণ্ডুলিপি রবীন্দ্রনাথের সংশোধন-সহ রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত আছে [দ্র Ms. 304 (iii)]। রবীন্দ্রনাথ বলেন, ছাত্র ও তরুণদের সান্নিধ্য তাঁকে উজ্জীবিত করে তোলে। দৈত্যের হাতে বন্দিনী রাজকন্যাকে রাজপুত্র গিয়ে মুক্তি দিয়েছিল— ছাত্রদের সেই রূপকথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে তিনি বললেন, 'To-day the human soul is lying captive in the dungeon of Great Machine, and I ask you, my young princes, to feel this enthusiasm in your hearts and to be willing to rescue the human soul from the grip of greed which keeps it chained.'

21 Apr [সোম ৮ বৈশাখ] সকালে রবীন্দ্রনাথ সদলবলে ব্লু এক্সপ্রেস লাক্সারি ট্রেনে পিকিং অভিমুখে রওনা হন। নানকিঙের জঙ্গীশাসক চি শি-য়ুয়ান তাঁর ব্যবহারের জন্য একটি বিশেষ সেলুন এই ট্রেনে যুক্ত করে দিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ ইতিপূর্বে রাণুকে একটি চিঠিতে ঠাট্টা করে লিখেছিলেন, চিনে গেলে ডাকাতেরা যদি তাঁকে অপহরণ করে নিয়ে যায় তাহলে তিনি কিছুদিনের জন্য বিশ্রাম পেতে পারেন— চিনের বিশৃঙ্খল আবহাওয়ায় সেই সম্ভাবনা সুদূর ছিল না; গত বৎসরেই দস্যুরা এই ট্রেন থেকে ৩৫ জন আমেরিকান ও য়ুরোপীয় যাত্রীকে অপহরণ করেছিল। তাই সরকারের পক্ষ থেকে ট্রেনে সশস্ত্র রক্ষীর ব্যবস্থা করা হয়।

পথে রবীন্দ্রনাথ Ch'u-fu-তে নেমে কনফুশিয়াসের সমাধিতে শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করেন। তারপরে 22 Apr [মঙ্গল ৯ বৈশাখ] শানটুঙ প্রদেশের রাজধানী প্রাচীন চৈনিক সভ্যতার পীঠস্থান ৎসিনান-এ [Tsinan] যাত্রাবিরতি করা হয়। এখানে রবীন্দ্রনাথ Lotus Sect নামক বৌদ্ধ উপাসিকাসঙ্ঘের এক প্রতিনিধি-স্থানীয়া মহিলা ও উক্ত ধর্মের পুনরুজ্জীবনের উদ্দেশে স্থাপিত একটি সমিতি [Buddhist Revival Society]-র সভাপতি চিনা বিচারপতি Mr. Mai-র সঙ্গে আলাপ করেন। সবগুলি ঘটনাই রবীন্দ্রবিরোধীদের সমালোচনার কারণ হয়।

বিকেলে Provincial Assembly Hall-এ রবীন্দ্রনাথের বক্তৃতা শুনতে এত জনসমাগম হয় যে, সভাটিকে হলের বাইরের বিস্তৃত প্রাঙ্গণে স্থানান্তরিত করতে হয়। তিনি 'Materialism and the Spiritual Life' বিষয়ে ভাষণ দেন। তিনি বলেন, তাঁর জানা আছে আদর্শবাদ সম্বন্ধে তাঁর বক্তব্য অধিকাংশের ভালো লাগবে না; কিন্তু এক্ষেত্রে তাঁর কিছু করার নেই, কারণ তাঁর কাজই হচ্ছে 'সত্য'কে উপলব্ধি করার চেষ্টা ও তাকে প্রকাশ করা। তাঁর বিশ্বাস, মানুষ একদিন বুঝতে পারবে যথার্থ প্রগতি স্থূল বস্তুতন্ত্র ও কুৎসিত স্বার্থপরতায় নেই, আছে পরার্থবাদ ও সৌন্দর্যসৃষ্টির মধ্যে। আশ্চর্যজনকভাবে রবীন্দ্রনাথের এই ভাষণ জনতার হর্ষধ্বনিতে সংবর্ধিত হয়।

ড সরোজমোহন মিত্র লিখেছেন : "চীনের বক্তৃতামালায় একে 'সত্যম' নামে অভিহিত করা হয়েছে।"[৮] তিনি কোনো তথ্যসূত্র উল্লেখ করেননি— *Talks in China*-র উভয় সংস্করণেই 'Satyam' প্রবন্ধটি সংকলিত হয়েছে, কিন্তু রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত Ms. 304 (xi - A) পাণ্ডুলিপিতে মন্তব্য লেখা আছে, 'it was shortened for publication in Japan but was never either published or given'।

এরপরে রবীন্দ্রনাথ শানটুঙ ক্রিশ্চিয়ান বিশ্ববিদ্যালয়ে ভাষণ দেন। এখানে তিনি শান্তিনিকেতন বিদ্যালয় ও বিশ্বভারতীর ক্রমবিকাশের ইতিহাস বর্ণনা করেন। এই ভাষণের কোনো অনুলেখন রক্ষিত হয়নি।

23 Apr [বুধ ১০ বৈশাখ] সন্ধ্যা সওয়া সাতটায় রবীন্দ্রনাথ সদলবলে পিকিঙের চিয়েন মেন [Chien Men] স্টেশনে পৌঁছলে ছাত্র ও বুদ্ধিজীবীদের বিশাল জনতা পুষ্পবৃষ্টি ও পটকা ফাটিয়ে তাঁকে অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করেন। অবসরপ্রাপ্ত রাজনীতিবিদ্ লিন চিয়াঙ-মিন ও পিকিঙ বিশ্ববিদ্যালয়ের অস্থায়ী উপাচার্য ড চিয়াঙ মন-লিন অভ্যর্থনাকারীদের মধ্যে ছিলেন। তার আগে Tientsin স্টেশনে পিকিঙ লেকচার অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি লিয়াঙ চি-চাও ট্রেনে উঠে তাঁকে অভিনন্দন জানান ও বাকি ৭৫ মাইল গল্পগুজবে অতিবাহিত করেন। স্থানীয় কিছু পার্শি ও সিন্ধি ব্যবসায়ী রবীন্দ্রনাথকে মাল্যভূষিত করেন। অতঃপর সকলকে নিয়ে যাওয়া হয় গ্র্যান্ড হোটেল ডি পিকিঙ-এ [Grand Hotel de Pekin]। এই প্রসঙ্গে *North China Standard* [25 Apr] লেখে :

No events in the recent years has aroused so much interest in Chinese intellectual circles as the visit of Rabindranath Tagore. Many men have come to China and gone yet none of them has been so enthusiastically received. What is the explanation? It is because Dr. Tagore belongs to the East and in honouring him the Chinese intellectuals are honouring the civilisation of the East. What is more, Dr. Tagore has come with a message which cannot fail

to make a powerful appeal to both Young China and Cld China. Young China has often be criticised because of its attempt to transplant Western civilisation into Chinese soil, root and branch. The criticism was certainly justified a few years ago; but since then there has been unmistakable evidence that Young China is beginning to turn from the materialism of the West to the culture of their forefathers for spiritual relief. On the other hand, the will of Young China to examine the teachings of their forefathers in the light of the civilisation of the West, will be reinforced by the words of Mr. Tagore. In this way there will be soon brought about a reconcilliation between Young China and Old China, and if this turns out to be the ultimate result of Mr. Tagore's visit to this country, he will have rendered a great service to the cause of Chinese civilisation.'[৯]

—রবীন্দ্রনাথও অনুরূপ আশা নিয়ে প্রচণ্ড মানসিক দ্বিধা অতিক্রম করে চিনে এসেছিলেন, তাঁরও প্রত্যাশা ছিল প্রাচীন ও নবীন চিন এবং এশিয়ার দুটি পুরাতন সভ্যতার মধ্যে একটি সেতুবন্ধন তিনি রচনা করতে পারবেন— কিন্তু গোঁড়া ও সন্দেহবাতিকগ্রস্ত কম্যুনিস্ট বুদ্ধিজীবী ও ছাত্রদের অহেতুক বিরূপতার জন্য সেই উদ্দেশ্য সফল হয়নি। আজ সারা বিশ্ব জুড়ে সাধারণভাবে কম্যুনিজ্‌মের মৃত্যুঘণ্টা বাজছে— চিনেও তার রূপান্তর ঘটছে রকেটের বেগে; এ-পর্যন্ত *Talks in China*-র চৈনিক অনুবাদ প্রকাশিত হয়নি, এই পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে তার তর্জমা মুদ্রিত হলে আশা করা যায়, তৎকালীন হিমালয়প্রমাণ ভুলের জন্য অনুশোচনার অভিব্যক্তি শোনা যাবে সেখানে!

আমরা বলেছি, পিকিঙে এসে প্রথমে সকলে গ্র্যান্ড হোটেলে ওঠেন। ক্ষিতিমোহন স্ত্রী কিরণবালাকে লিখেছেন : 'আমরা ২৩শে Peking আসি সবচেয়ে বড় হোটেলে উঠি। ২৩শে রাত্রি ও ২৪শে, ২৫শে সেখান থেকে ২৬শে মধ্যাহ্নে আমি নন্দবাবু ও কালিদাসবাবু Peking Hotel ছেড়ে দিলাম। এখন আমরা ৩ জন একজন সিন্ধুবাসী বড় ব্যবসায়ীর [মি. লেখুমল] বাড়ি আছি। গুরুদেব ও Mr. Elmhirst ২৮শে ঐ হোটেল ছেড়ে একটি শান্ত চিনা হোটেলে একটি উঠান ও শান্ত কয়খানা ঘর নিয়েছেন। সেখানে খুব পরিষ্কার ও য়ুরোপীয়ভাবে খাওয়া দাওয়া…।'[১০]

24 Apr [বৃহ ১১ বৈশাখ] রবীন্দ্রনাথ হোটেলেই বিশ্রাম নেন। দু'একটি সাক্ষাৎকার দেওয়া ছাড়া তাঁর অধিকাংশ সময় কাটে যাত্রাসঙ্গীদের সান্নিধ্যে। তিনি তাঁদের যা বলেন, কালিদাস নাগ তার অনুলিখন রেখেছিলেন তাঁর দিনলিপিতে— স্মৃতিচারণটি মূল্যবান :

আজ গুরুদেব তাঁর জীবনের যত সংগ্রামের ইতিহাস প্রথম শোনালেন— এত প্রতিকূলতার মধ্যে সৃষ্টির কাজ কেমন করে গেছেন— এই তো মনীষা। আজ যেন প্রথম তাঁকে মানুষ, একজন মস্ত মানুষ বলে পেলুম— মন ভক্তিতে ভরে উঠল। শোনালেন— প্রথম ছেলেবেলায় অভাবদুঃখ অথচ সাধারণের ধারণা ছিল কবি পঞ্চ ম-কারে বহু টাকা উড়িয়েছেন। অক্ষয় চৌধুরীর স্ত্রী প্রথম এটা contradict করেন। কারণ, তিনি কবিকে জানতেন— কিন্তু ভাই প্রতাপ মজুমদারের মতো লোক মনে করতেন কবি মাতাল!!

বই কেনা ও পড়ার ঝোঁক, পড়ে আবার বেচে তবে কেনা হত : প্রিয়নাথ বেনের Wonderful Burgain— কবির বন্ধু ভাগ্য— বাড়ীর complications— বলেন্দ্র ঠাকুর ও সত্যেন ঠাকুর ও সুরেন ঠাকুর— এঁদের মানুষ কেমন ঠকিয়ে আসছে— মস্ত একটা fraud ধরে রক্ষা করেন — ফলে তাঁর উপর পড়ে চাপ— ধারের উপর ধার। T. Palit মধুর কষাই— টাকা ত নেই— লাল বাড়ী বাঁধা ৫০,০০০৲ — ভূপেন বসুর ব্যবহার— এত গোলের মধ্যে শান্তিনিকেতন প্রতিষ্ঠা— সব বাঙ্গলা বই শৈলেশ মজুমদারকে দেওয়া আশ্রমের কিছু মিলবে আশায়— কিন্তু এক

পয়সা পাননি— উল্টে ছাপার টাকা যখন দিতে হয়েছে— copyright ইত্যাদি বেচা— স্ত্রীর গহনা প্রায় সব বেচা— স্ত্রীর অদ্ভুত ধৈর্য— রথী ও মীরা কতক পেয়েছে তার— এর উপর শোক। কন্যা রেণুকা, শমী, বেলা, মীরা সকলেই বিষম ধাক্কা দিয়েছে তবু একমনে কী কাজ করে গেছেন!

সমস্ত বোঝেন— ১০ বছর জমিদারী নিজে দেখেন— প্রায় ৭০ হাজারের আয় বাড়ান— নিজের অংশ পেয়ে জমিদারীর কত সুব্যবস্থা করেন — প্রজারা কী ভালবাসত সাহাজাদপুর হাতছাড়া হলে বোঝা গেল— এখন রথী জমিদারী আপনা থেকে বিশ্বভারতীকে দেবেন— এটা জেনে কী আনন্দ, সব যেন আদর্শর সঙ্গে মিলিয়ে জীবন গড়ে গেছেন— কত বড় মানুষ![১১]

25 Apr [শুক্র ১২ বৈশাখ] দুপুর সাড়ে বারোটায় Grand Hotel des Wagons Lits-এ অ্যাংলো-আমেরিকান অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে রবীন্দ্রনাথকে মধ্যাহ্নভোজনে আপ্যায়িত করা হয়। এখানেই পিকিঙে সাধারণের উদ্দেশে রবীন্দ্রনাথের প্রথম ভাষণ প্রদত্ত হল। অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি স্যার ফ্রান্সিস আগলেন [Francis Aglen] সভাপতিত্ব করেন, কিন্তু শ্রোতাদের কাছে রবীন্দ্রনাথের পরিচয় প্রদানের ভার তিনি অর্পণ করেন তাঁর পূর্বপরিচিত Dr. Jacob Gould Schurman-এর উপর। তাঁর পরিচয়মূলক ভাষণের প্রত্যুত্তরে রবীন্দ্রনাথ একটি বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা এবং নিজের কবিতা ও গানের ইংরেজি অনুবাদক হিসেবে তাঁর অভিজ্ঞতার বিবরণ দিয়ে বলেন, 1912–13-এ ইংল্যান্ডে থাকার সময়ে তিনি ব্রিটেনের কয়েকটি শ্রেষ্ঠ মানবমনের পরিচয় লাভ ও কয়েকজন সেরা বন্ধু পেয়েছিলেন। আবার 1916-এ আমেরিকা যাওয়ার পথে জাপানে নেমে 'I realised for the first time... the terrible suffering with which the whole world was afflicted. I saw in Japan the war trophies taken from China publicly exhibited.... I felt humiliated in my own mind at this primitive and brutal perpetuation of the defeat of an enemy.... Nationalism, therefore, seemed to me to be pure barbarism, based on pride, greed and lust for power, with wealth dominating the disease, and I shuddered when I saw the result.' এই মানসিক অবস্থায় তিনি *Nationalism*-এর প্রবন্ধগুলি লেখেন, যেগুলি তিনি আমেরিকায় পড়ে শোনান। যুদ্ধের পরে য়ুরোপে গিয়ে তিনি যে বিপুল সংবর্ধনা লাভ করেন, তাতেই তাঁর মনে হয় 'the nations of the West were looking for some new ideal from the East which would reconstruct their civilisation on a better basis.' এই সম্মিলনের স্বপ্ন থেকেই তাঁর বিশ্বভারতীর সূত্রপাত।

এইদিনই [25 Apr] বিকেলে প্রায় পঞ্চাশ জন বিশিষ্ট পণ্ডিত ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি বিখ্যাত থ্রোন হলে রবীন্দ্রনাথকে সংবর্ধনা জানান ও চা-পান সভায় মিলিত হন— এখানেই এক সময়ে চিনের সম্রাট বিদেশি রাজদূতদের দর্শন দিতেন। পিকিঙ লেকচার অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি লিয়াঙ ছি-ছাও [Liang Ch'i-Ch'ao] একটি দীর্ঘ স্বাগত ভাষণে চিন ও ভারতের দীর্ঘদিনের ঐতিহাসিক আদানপ্রদানেব সম্পর্ক বিবৃত করে বলেন : 'The coming of Rabindranath Tagore will, I hope, mark the beginning of an important period of history. If we can avail of this occasion to renew the intimate relationship which we had with India and to establish a really constructive scheme of co-operation, then our welcome to Rabindranath Tagore will have real significance.' প্রবন্ধটি আগেই রচিত হয়েছিল এবং এটি *Talks in China*-র ভূমিকা হিসেবে ব্যবহৃত হয়। প্রত্যুত্তরে রবীন্দ্রনাথ বলেন, বহু শতাব্দী ধরে অনেক বিদগ্ধ পণ্ডিত চিনে এসেছেন— কিন্তু তিনি এসেছেন প্রাচীন ও সমকালীন উভয় সংস্কৃতিরই বাহক হিসেবে— পরিবর্তনশীল এই যুগে যার সংমিশ্রণ এখনও সম্পূর্ণ হয়নি। ভাষণটি সম্ভবত অনুলিখিত বা প্রকাশিত হয়নি, তবু 'To the Boys and Girls at Pei Hei, Peking' নামক অন্য উপলক্ষে প্রদত্ত বক্তৃতাটি থেকে স্টিফেন

হে কেন একাধিক দীর্ঘ উদ্ধৃতি ব্যবহার করেছেন তা বোঝা শক্ত। কালিদাস নাগ লিখেছেন : 'কবি উত্তরে উপযুক্ত বিনয়ের সঙ্গে জবাব দিলেন, "প্রেমের বন্ধনে বাঁধতে এসেছি— এসিয়ার দুটি সর্বপ্রাচীন অধ্যাত্মধারা আবার মিলুক— আমি ভারতের প্রতিনিধি হয়ে নিমন্ত্রণ করতে এসেছি— স্বপ্ন আমার সত্য হয়েছে।"

26 Apr [শনি ১৩ বৈশাখ] একটি প্রাচীন বৌদ্ধবিহারে লাইলাক পুষ্পকুঞ্জে রবীন্দ্রনাথকে সংবর্ধনা জানানো হয়। এখানে তিনি তরুণ বৌদ্ধদের উদ্দেশে একটি ভাষণ দেন। কালিদাস নাগ অনুষ্ঠানটির বিবরণ দিয়েছেন 'Rabindranath Tagore's Visva-Bharati Mission' প্রবন্ধে : 'The Poet and his party were welcomed by the priests of Fa-yuan-ssu, one of the oldest temples of Peking. Here under the lilac trees Tagore addressed the priests and the members of the Young Men's Buddhist Association. The temple bell sounded its rich music and the Poet also in his wonderfully musical voice expatiated on the deathless doctrine of *maitri*— universal love, like a Buddhist saint of yore.'[১২] ভাষণটি *Talks in China* [1924]-এ 'At a Buddhist Temple, Peking' নামে অন্তর্ভুক্ত হয় [দ্র *EWRT* 2/ 650–51]। এখানে তিনি অ্যাংলো-আমেরিকান অ্যাসোসিয়েশনে অনুষ্ঠিত মধ্যাহ্নভোজনে উপস্থিত এক ব্যক্তির উল্লেখ করে বললেন : 'When he heard me talk of the mission of co-operation and conciliation which I had in my heart, this man said that China was the one place where I would find good soil for the seed of ideals I had come to sow.'

এইদিন অপরাহ্নে ন্যাশনাল য়ুনিভার্সিটি, নর্মাল য়ুনিভার্সিটি ও বিভিন্ন সরকারি কলেজের প্রায় সহস্রাধিক ছাত্র ন্যাশনাল বিশ্ববিদ্যালয়ের অডিটোরিয়ামে রবীন্দ্রনাথের ভাষণ শোনার জন্য সমবেত হন। সম্ভবত বৌদ্ধমন্দিরের অনুষ্ঠানের জন্য এখানে পৌঁছতে তাঁর ঘণ্টাখানেক বিলম্ব হয়। লিয়াও ছি-ছাও তাঁর পূর্বদিনে পঠিত প্রবন্ধটি এখানেও পড়ে শোনান। রবীন্দ্রনাথ স্পষ্টই বললেন, তিনি শুনেছেন তাঁর চিনে আসার ব্যাপারে অনেকেরই বিরোধিতা ছিল 'because it might check your special modern enthusiasm for western progress and force'। কিন্তু তিনি সাবধানবাণী উচ্চারণ করলেন, যারা বস্তুগত শক্তির সাহায্যে ক্ষমতাশালী জাতি গড়তে চায় তারা ইতিহাস জানে না ও সভ্যতাকেও বুঝতে পারেনি। নিছক শক্তির উপর নির্ভরতা বর্বরতার লক্ষণ, যারা তার উপর নির্ভর করেছিল তারা হয় ধ্বংস হয়েছে অথবা বর্বরই থেকে গিয়েছে। অন্য জাতিরা শারীরিক শক্তির সঙ্গে বুদ্ধির যোগ ঘটিয়ে যান্ত্রিক শক্তিকেও আয়ত্ত করেছে— কিন্তু এই নূতন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য আত্মিক ও নৈতিক শক্তিরও উন্নয়ন ঘটানো প্রয়োজন, নইলে এরাই মানুষের উপর আধিপত্য বিস্তার করে তাদের ধ্বংস করবে। অনেকে চিন ও ভারতের দুর্বলতার দিকে ইঙ্গিত করে বলেন, ধ্বংসের হাত থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্যই তাদের শক্তিসাধনায় প্রবৃত্ত হওয়া উচিত। রবীন্দ্রনাথ এর উত্তরে মনুসংহিতা-র এই শ্লোকটির ইংরেজি অনুবাদ ব্যবহার করলেন : 'অধর্মেণৈধতে তাবৎ ততো ভদ্রাণি পশ্যতে। ততঃ সপত্নান্ জয়তি সমূলস্তু বিনশ্যতি॥'

চিনা যুবকেরা রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি সভাতেই তাঁকে একটি পরাজিত জাতির প্রতিনিধি হিসেবে আখ্যাত করে ধিক্কার দিয়েছিলেন, এই ভাষণে সেই অভিধা স্বীকার করে নিয়েই তিনি বললেন : 'I am ready to accept weakness and insult and oppression of the body, but I will never acknowledge the defeat, the last insult, the utter ruin, of my spirit being conquered, so that I am made to lose

my faith and purpose. My enemies may dominate and slay my body, but they cannot make me adopt their methods, or hate them. The devil helps in the sphere in which he is master, but we must reject such aid to save our life from utter destruction. Seek righteousness even though success be lost.'

চিনা তরুণ ও বুদ্ধিজীবীদের উপর রবীন্দ্রনাথের এই ভাষণের সদর্থক প্রতিক্রিয়া হয়েছিল। এল্‌ম্‌হার্স্ট লিখেছেন : 'The scholars and literary men of the Renaissance Movement in Peking were a little sceptical about the poet's philosophy and were not quite sure whether in his enthusiasm for old China he would not be somewhat of a reactionary. His first talk to them has completely won their hearts and minds. They found that he had all the time been as much of a revolutionary in the field of letters, as any of them,'[১৩] রবীন্দ্রনাথের ভাষণটি *Talks in China* [1924] সংস্করণের দশম রচনা 'First Public Talk in Peking' নামে মুদ্রিত হয় [দ্র *EWRT* 2/ 661–63]; 1925-সংস্করণে এর নাম 'To My Hosts V'।

27 Apr [রবি ১৪ বৈশাখ] সকালে [অনেক সংবাদপত্রে তারিখটি 28 Apr সোমবার সকাল বলে উল্লিখিত হয়েছে] সিংহাসনচ্যুত চিনসম্রাটের আমন্ত্রণে রবীন্দ্রনাথ সদলবলে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে নিষিদ্ধপুরী [Forbidden City]-র উদ্দেশে রওনা হন। 1911-এ চিনে রিপাবলিক প্রতিষ্ঠিত হলে ছয় বৎসর বয়স্ক মাঞ্চুবংশীয় সম্রাট পু-য়ী-কে ক্ষমতাচ্যুত করে নিজের প্রাসাদেই গৃহবন্দী করে রাখা হয়। স্যার রেজিনাল্ড জনস্টন নামক একজন ইংরেজ পণ্ডিত তাঁর গৃহশিক্ষক নিযুক্ত হন। তিনি এঁর নাম দেন হেনরি, সেইজন্য প্রাক্তন সম্রাট হেনরি পু-য়ী নামে পরিচিত ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর সঙ্গীদের আমন্ত্রণের পশ্চাতে এই পণ্ডিত মানুষটির আগ্রহ ছিল সর্বাধিক।

প্রবেশদ্বার থেকে প্রাসাদের দূরত্ব প্রায় এক মাইল। রবীন্দ্রনাথ এবং তাঁর দুই মহিলা সঙ্গিনী গ্রেচেন গ্রিন ও Miss Phyllis Lin-এর জন্য দুটি সুসজ্জিত তাঞ্জামের ব্যবস্থা হয়েছিল, অন্যেরা হেঁটে প্রাসাদে উপস্থিত হন। রবীন্দ্রনাথ সম্রাটের দুই মহিষীকে সৌভাগ্যের প্রতীক শঙ্খবলয় উপহার দেন, অন্যেরাও সম্রাটকে নানাবিধ উপঢৌকন প্রদান করেন। তিনিও রবীন্দ্রনাথকে একটি মূল্যবান বুদ্ধমূর্তি ও ট্যাপিস্ট্রি উপহার দেন।

এইদিন [27 Apr] সন্ধ্যায় নেভি ক্লাবে পিকিঙের বুদ্ধিজীবীরা রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর সঙ্গীদের একটি ভোজসভায় সংবর্ধনা জানান। লিয়াঙ ছি-ছাও, লিন চ্যাঙ-মিন ও ফান য়ুয়ান-লিয়েন প্রভৃতির মতো পণ্ডিত-রাজনীতিক, ড হু শি ইত্যাদি এই সভায় উপস্থিত ছিলেন। মি. লিন স্বাগত ভাষণে বললেন, তাঁরা রবীন্দ্রনাথকে ঋষি বা ধর্মসংস্কারক হিসেবে অভ্যর্থনা জানাচ্ছেন না, তাঁরা তাঁকে একজন মহান বিপ্লবী কবি বলে মনে করেন। তাঁদের দুর্ভাগ্য রবীন্দ্রনাথের মূল কবিতা তাঁরা পড়তে পারেন না, তবু চিনা কবিতার প্রাচীনপন্থী কাঠামোর পরিবর্তনে তাঁর কবিতা যথেষ্ট কার্যকর প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম। 'We cannot tell him how moved and touched we are by his presence. His appearance, his eyes, his deportment, his beard, his clothes,— everything about him is poetic. He is in fact poetry itself. We hope our poet will give us strength, courage and audacity. We hope that he will reveal to us the reality of truth, the beauty of moral courage and sacrifice.' [দ্র *EWRT* 2/ 656–58, 585–89]।

এই স্বাগতভাষণের প্রত্যুত্তরে রবীন্দ্রনাথ বললেন, বিদেশেও আমরা নিজের দেশকেই খুঁজি এবং সেটি পাওয়া যায় সেখানকার মানুষের হৃদয়প্রাচুর্যের উদ্বৃত্ত থেকে। সেই প্রাচুর্যের অংশ তিনি যথেষ্ট পরিমাণে লাভ করেছেন। লিন বলেছেন, চিনা সাহিত্য প্রাচীনতার বন্ধনে আবদ্ধ ছিল— একই ভাবে তাঁর দেশের সাহিত্যও সংস্কৃত ক্ল্যাসিক্যাল সাহিত্যের নিগড়ে বন্দী হয়ে কেবল শিক্ষিত সমাজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। এর পাশাপাশি নিশ্চয়ই জনসাধারণের ভাষায় রচিত একটি লৌকিক সাহিত্যের ধারা সমান্তরালভাবে প্রবাহিত ছিল, যেখান থেকে সংস্কৃত ক্ল্যাসিক্যাল সাহিত্যের প্রণেতারা তাঁদের রচনার প্রেরণা ও উপকরণ সংগ্রহ করতেন। কিন্তু সেই জনভাষা ক্রমাগত পরিবর্তিত হচ্ছিল এবং তাদের নমুনাও রক্ষিত হয়নি।

তবে কতকগুলি আধুনিক প্রাদেশিক ভাষা ধীরে ধীরে পরিণত হয়ে সমৃদ্ধ সাহিত্যের জন্ম দিয়েছে। এখানে উপস্থিত অধ্যাপক ক্ষিতিমোহন সেন সেই মধ্যযুগীয় ভারতীয় সাহিত্য নিয়ে চর্চা করেছেন ও আপনাদের বলতে পারবেন খ্রিষ্টীয় ত্রয়োদশ থেকে ষোড়শ-সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যে ভারতের মরমিয়া সাধকদের রচনাবলি কতটা সমৃদ্ধি লাভ করেছিল। তাঁরই সাহায্যে তিনি নিজে সেই সাহিত্যের পরিচয় লাভ করেছেন এবং 'I was amazed to discover how modern they were, how full of genuine and earnest feeling of life and beauty. All true things are ever modern and can never become obsolete.'

এই দীর্ঘ ভাষণে তিনি নিজের সাহিত্যরচনার উৎস ও প্রকৃতি সুন্দরভাবে বর্ণনা করলেন। এখানে এমন কিছু তথ্য তিনি জানিয়েছেন, যার উল্লেখ অন্য কোথাও পাওয়া যায় না। দান্তে পড়ার চেষ্টা, জার্মান ভাষা শিখে মূল অবলম্বনে হাইনে অনুবাদ, গ্যেটের ফাউস্ট পাঠপ্রয়াসের ব্যর্থতা ইত্যাদি সংবাদ শুধু এই ভাষণেই ব্যক্ত হয়েছে। সাহিত্য ও সংগীত রচনায় তাঁর ভূমিকাকে তিনি বৈপ্লবিক বলে অভিহিত করেছেন। সংগীতসৃষ্টিতে তিনি শাস্ত্রীয় রীতির আনুগত্য করেননি এবং তার জন্য নিন্দাভাজনও হয়েছেন। শেষে তিনি ঈষৎ গর্বের সঙ্গেই বললেন : 'Please do not think I am vain. I can judge myself objectively and can openly express admiration for my own work, because I am modest. I do not hesitate to say that my songs have found their place in the heart of my land, along with her flowers that are never exhausted, and that the folk of the future, in days of joy or sorrow or festival, will have to sing them. This too is the work of a revolutionist.'

28 Apr [সোম ১৫ বৈশাখ] বিকেল তিনটেয় Temple of Earth বা Altar of Agriculture নামে পরিচিত চিনসম্রাটদের পাঁচ ফুট উঁচু মর্মরপ্রস্তরে নির্মিত বক্তৃতামঞ্চ থেকে রবীন্দ্রনাথ পাঁচ থেকে দশ হাজার শ্রোতার উদ্দেশে, যাঁদের মধ্যে অধিকাংশই ছাত্র, ভাষণ দেন। *Talks in China* [1924]-এ ষষ্ঠ বক্তৃতা 'To Scholars at the Temple of the Earth, Peking' [দ্র *EWRT* 2/ 651–53] নামে এটি মুদ্রিত হয়।

এখানে রবীন্দ্রনাথ নিজেকে এশিয়ার প্রতিনিধি হিসেবে ঘোষণা করে বললেন, এশিয়া একদিন সারা পৃথিবীকে বর্বরতা থেকে উদ্ধার করেছে। তারপরে এল এক অন্ধকার রাত্রি, কী ভাবে তার কারণ তাঁর জানা নেই। কড়ানাড়ার শব্দে যখন ঘুম ভাঙল তখন শক্তি ও বুদ্ধির দম্ভ নিয়ে আগত য়ুরোপকে গ্রহণ করার জন্য আমরা প্রস্তুত ছিলাম না। য়ুরোপ এল কোনো সম্পদ দিতে বা নিতে নয়, এল ডাকাতি করে বস্তুসম্পদ অপহরণ করতে। আমরাও সমকক্ষতার ভিত্তিতে য়ুরোপের সম্মুখীন হতে পারিনি, নিজেদের কিছুই নেই মনে করে ভিক্ষুকের মতো তাদের দ্বারস্থ হয়েছি। এই দীনতার জড়ত্ব থেকে আমাদের মুক্তি পেতে হবে। এখানে

অনেকে মনে করেন আমাদের পাশ্চাত্যকে অনুকরণ করা উচিত, তিনি তা বিশ্বাস করেন না। কারণ প্রাচ্যের পক্ষে পাশ্চাত্য মন বা মেজাজ ধার করা সম্ভব নয়— 'The West is becoming demoralized through being the exploiter, through tasting of the fruits of exploitation.— Physical power is not the strongest in the end. That power destroys itself. Machine guns and bomb-dropping aeroplanes crush living men under them, and the West is sinking to its dust.' এই প্রতিযোগিতা, স্বার্থপরতা বা বর্বরতা আমাদের অনুসরণযোগ্য নয়।

এইসব কথা বলার সময়ে রবীন্দ্রনাথ নিশ্চয়ই লক্ষ্য করছিলেন যে, কয়েকজন যুবক শ্রোতাদের মধ্যে ছাপানো প্রচারপত্র বিলি করছে। নানকিঙের বক্তৃতাসভাতেও অনুরূপ ব্যাপার ঘটেছিল। 24 Apr এল্‌ম্‌হার্স্ট রথীন্দ্রনাথকে লিখেছিলেন : 'There was an organised opposition at Nanking which produced pamphlets criticising G[urudev]'s attitude on pacifism, to militarism, industrialism and the spiritual life', অবশ্য এই বিরোধিতাকে তিনি কোনো গুরুত্ব দিতে রাজি ছিলেন না।

29 Apr [মঙ্গল ১৬ বৈশাখ] সকালে পিকিং বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃতের অধ্যাপক, কাশীতে গঙ্গাধর শাস্ত্রীর ছাত্র ক্ষিতিমোহনের সতীর্থ Baron Staal Holstein-এর গৃহে তাঁর গ্রন্থাগার, ছবি ও মূর্তির সংগ্রহ দেখা হয়। ক্ষিতিমোহন স্ত্রীকে লিখেছেন, রবীন্দ্রনাথও সেখানে গিয়েছিলেন। বিকেলে চিনসম্রাটের ইংরেজ শিক্ষক Johnston-এর বাড়িতে চায়ের নিমন্ত্রণ ছিল। এখানেও অনেক বই, ছবি ও মূর্তি দেখা হয়। কালিদাস নাগ ডায়ারিতে লিখেছেন : 'বিকালে এক modern art exhibitionএ গিয়ে গুরুদেব কিছু বললেন— তাঁরা ছবি উপহার দেবেন— কিছু দেখা গেল।'[১৪] তিনি জানিয়েছেন, 'গুরুদেব আজ নতুন বাসায় গেলেন।' পিকিং লেকচার অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে রবীন্দ্রনাথের ভাষণ শুরুর আরও এগারো দিন দেরি ছিল। এই অবসরটি তিনি কাটালেন শহরের উত্তরপশ্চিমে দশ মাইল দূরে সুন্দর একটি হ্রদের তীরবর্তী ৎসিং হুয়া কলেজের [Tsing Hua College] সুরম্য অতিথিশালায়। তাঁর সঙ্গীরা বিভিন্ন শিক্ষাক্ষেত্র ও পুরাকীর্তি পরিদর্শনে বহির্গত হন।

29 Apr রবীন্দ্রনাথ ৎসিং হুয়া কলেজে তাঁর সংবর্ধনার উত্তরে ঘরোয়াভাবে কিছু বলেন। ভাষণটি 'To Students at Tsing-hua College, Peking' শিরোনামে *Talks in China* [1924]-এ সপ্তম বক্তৃতা হিসেবে মুদ্রিত হয়েছিল [দ্র *EWRT* 2/ 653–56]। তিনি ছাত্রদের উদ্দেশে বলেন, বয়সের বিপুল দূরত্ব থেকে তিনি তাদের আশীর্বাদ জানাচ্ছেন। কিন্তু তিনি তাঁদের ঈর্ষাও করেন। শৈশবে তাঁর জানা ছিল না কোন্ মহৎ যুগসন্ধিক্ষণে তাঁর জন্ম হয়েছে— এখন তা অনেকেরই কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠছে। ছাত্রদের কাছে তাঁর জিজ্ঞাসা, এই নূতন যুগকে তাঁরা কোন্ অর্ঘ্য প্রদান করবেন। তিনি শুনেছেন, তাঁরা বস্তুবাদী, তাঁদের আশাকে তাঁরা কোনো স্বপ্নলোকে পাঠাতে চান না। 'If it be true, we must accept this fact and not try to fight against it. We must realize that this gift has been given to you and that out of it you can make your own contribution.' কিন্তু তিনি বিশ্বাস করেন না শুধু বস্তুতান্ত্রিক হয়েই কোনো দেশ বা জাতি মহৎ হতে পারে। বস্তুতান্ত্রিক হতে গিয়েই নিউ ইয়র্ক, লন্ডন, কলকাতা, সিঙ্গাপুর, হংকঙের মতো সাংহাই বা তিয়েনৎসিনও কুশ্রী রূপ ধারণ করেছে— কিন্তু চিনের সর্বত্র সেই চেহারা নেই, এখানকার একটি সাধারণ

দোকানও ভালোবাসার স্পর্শে সৌন্দর্যমণ্ডিত। 'Love gives beauty to everything it touches. Not greed and utility: they produce offices, but not dwelling houses.'

এইসব স্বপ্নদর্শন চিনের কম্যুনিস্ট ছাত্রদের ভালো লাগেনি, এখানেও তাঁরা বিরোধিতামূলক প্রচারপত্র বিলি করেন।

ৎসিং হুয়া কলেজটি বক্সার যুদ্ধে আমেরিকান সম্পত্তি নষ্ট হওয়ার জন্য চিন-প্রদত্ত ক্ষতিপূরণের অর্থে নির্মিত হয়েছিল, সেই কারণে কলেজের পাঠ্যসূচি অনেকটা আমেরিকান আদর্শ অনুসরণ করত। তাই এখানকার ছাত্ররা ইংরেজি ভাষায় যথেষ্ট পারদর্শী ছিল। সেইজন্য রবীন্দ্রনাথের ভাষণের পরে সু সী-মো যখন যথারীতি চিনা অনুবাদ করা শুরু করেন, তখন অনেক ছাত্রই তা শোনা অবান্তর বিবেচনা করে বক্তৃতাস্থল পরিত্যাগ করেন। এঁদের অনেকেই পরে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে ঘরোয়াভাবে কথাবার্তা বলেন। একদিন এইরূপ একদল ছাত্রের সঙ্গে বেড়াতে গিয়ে যুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্ত প্যাগোডা এবং বিভিন্ন প্রাচীন শিল্পকর্ম দেখে তিনি শিল্প বিষয়ে একটি তাৎক্ষণিক বক্তৃতা দেন। এখানকার ছাত্রদের কিছু প্রশ্নের উত্তর 'Rabindranath's Answers to Questions by the Students of Tsing Hua College' নামে *Visva-Bharati Quarterly Bulletin* [Oct 1924/ 295–98 দ্র *Talks in China* ed. Sisir Kumar Das [1999]/ 132–35]-এ মুদ্রিত হয়েছে।

রবীন্দ্রজীবনী-কার এই প্রসঙ্গে লেখেন : 'এই কলেজে কবি কয়দিন থাকার সময়ে স্থানীয় ছাত্রসমাজের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে মিশিবার অবসর পান। ছাত্রেরা কবির কাছে নানাপ্রকার প্রশ্ন করিত; যেমন, ঈশ্বর সম্বন্ধে আপনার ধারণা কী' 'ঈশ্বরের সঙ্গে সম্বন্ধ কিরূপ' 'বাঁচিয়া থাকার সুখ কী' 'পাপ কাহাকে বলে'। রবীন্দ্রনাথ অতি ধৈর্যের সহিত তাহাদের প্রশ্নের উত্তর দিতেন। এই সূত্রে কবি Civilization and Progress শীর্ষক এক দীর্ঘ ভাষণ লিখিয়া তাহাদের কাছে পাঠ করেন। এই প্রবন্ধটিতে সভ্যতা ও ধর্ম সম্বন্ধে কবির মত অতি সুন্দরভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে।'[১৫] ড সরোজমোহন মিত্রও লিখেছেন : 'ৎসিঙ হুয়া কলেজে থাকতেই কবি ভারতীয়দের আয়োজিত এক সভায় 'সভ্যতা ও প্রগতি' নামে একটি দীর্ঘ লিখিত ভাষণ পাঠ করেন।'[১৬] প্রবন্ধটির বঙ্গানুবাদও তিনি 'রবীন্দ্রনাথ ও চীন' [পৃ ৬৩–৬৯] গ্রন্থে প্রকাশ করেছেন। বস্তুত *Talks in China* [1924, 1925] গ্রন্থে 'Civilisation and Progress' ও 'Satyam' নামে দুটি প্রবন্ধ আছে, যেগুলি রবীন্দ্রনাথ চিন বা জাপানে কোথাও পাঠ না করলেও গ্রন্থটির অন্তর্ভুক্ত হয়; দ্বিতীয়টির ক্ষেত্রে এল্‌মহার্স্টের স্বহস্তলিখিত টীকাও আছে Ms. 304 (xi - A) পাণ্ডুলিপিতে : 'Read all— it was shortened for publication in Japan but was never either published or given'. অপর প্রবন্ধটির ক্ষেত্রে অনুরূপ কোনো মন্তব্য না থাকলেও সেটিও কোথাও পঠিত হয়নি। সুতরাং রবীন্দ্রজীবনী-কার ও ড মিত্র উক্ত তথ্য কোথায় পেলেন এ নিয়ে আমাদের প্রশ্ন থেকে গেল, যার সূত্র তাঁরা ব্যক্ত করেননি। স্টিফেন হে-র গ্রন্থেও এরূপ কোনো তথ্য নেই।

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় আরও জানিয়েছেন : 'ৎসিঙহুয়া বাসকালীন একদিন শিক্ষা-শিক্ষণ বিদ্যায়তনের (Yen ching) ইংরেজি ভাষার শিক্ষকদের সমক্ষে কেন তিনি বিদ্যালয় স্থাপন করিতে প্রয়াসী হন তাহার ইতিহাস ব্যক্ত করিয়া বক্তৃতা করিলেন (৬ মে)।'[১৭] তিনি টীকায় উল্লেখ করেছেন, উক্ত প্রবন্ধটি হল 'To the English Teachers' Association'। কিন্তু স্টিফেন হে জানিয়েছেন : 'After a week's relaxation in these idyllic suburban surroundings, Tagore returned to Peking on Monday, May 5, and took up

residence in a private house.'[১৮] সুতরাং পিকিঙে ফিরে আসার পরের দিন রবীন্দ্রনাথ আবার ৎসিং হুয়া শিক্ষক-শিক্ষণ কলেজে বক্তৃতা দিতে গিয়েছিলেন, এই তথ্য নির্ভরযোগ্য বলে মনে হয় না।

রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত কাগজপত্রে তাঁর ৎসিং হুয়া কলেজে অবস্থানকালীন কিছু তথ্য পাওয়া যায়। 2 May [শুক্র ১৯ বৈশাখ] ছাত্রছাত্রীরা কয়েকটি প্রশ্ন-সংবলিত চিরকুট ড চ্যাঙ-এর কাছে জমা দেন; Ma Chieh জানতে চান: 'How will love and beauty of the world be kept everlasting?' Chao En Chu দুটি প্রশ্ন করেন : '1. What is the significance of our life? 2. What should be our attitude toward life during the present stage of great transition?' Wang Chih Hsu Tun Chang-এর দুটি প্রশ্ন হল : '1. Is it a privilege for a person to live? If it is, then how can we avoid sorrow and gain happiness? 2. In the near future, can the materialism conquer the spiritualism in the Far East?' Kuo Yuan-Hsi 'Conception of God to Life' বিষয়ে জানতে চান।

3 May [শনি ২০ বৈশাখ] সন্ধ্যায় ৎসিং হুয়া ছাত্র সংসদের উদ্যোগে রবীন্দ্রনাথের সংবর্ধনা অনুষ্ঠিত হয়। The Tsing Hua Students Association-এর আমন্ত্রণপত্রের বয়ানটি এইরূপ; 'The students of Tsing Hua College have the greatest pleasure and honor to invite the venerable presence of Mr. Tagore to a social to be given on the college lawn in front of the Auditorium, at eight o'clock in the afternoon, on Saturday, May the third.' অনুষ্ঠানসূচিটি উদ্ধৃত করছি :

STUDENTS SOCIAL & RECEPTION IN HONOR OF RABINDRANATH TAGORE/ May 3rd 1924/ PROGRAMME

Part I/ Students Mass Dinner Time 6:30 p.m. Dining Hall, H.S. [6 items]

Part II/ Social/ Time 7:45 p.m. Place : Auditorium

1. Opening Remarks : Wang Tsao Shih 2. College Song in Chinese 3. Welcome Address in Honor of Tagore : Chi Chao Ting 4. Music 5. Play etc.

4 May Hsiang Yu Lee রবীন্দ্রনাথকে একটি প্রশ্ন করে চিঠি লেখেন : '...I dare not trouble you any more, for you are very old and we, innocent boys, have troubled you enough already.

My question is "What trainings are necessary for a young man who is sentimental in nature and poetical in thinking in order to expect him become a poet?"

উল্লেখ্য, উদ্ধৃত কোনো প্রশ্নেই কম্যুনিস্ট রাজনীতির প্রসঙ্গ নেই!

স্টিফেন হে যদিও রবীন্দ্রনাথের পিকিঙে ফেরার তারিখ 5 May বলে উল্লেখ করেছেন, কিন্তু তিনি সম্ভবত 4 May [রবি ২১ বৈশাখ] তারিখেই ফিরে এসেছিলেন। এল্‌ম্‌হার্স্টের হস্তলিখিত ও রবীন্দ্রনাথ-সংশোধিত 'Theatre Address' [Ms. 304 (viii - A) পাণ্ডুলিপিটিতে তারিখ লেখা আছে 4 May 1924 [দ্র *EWRT* / 663–67, 'To the Public at the Theatre in Peking']। ৎসিং হুয়া কলেজে প্রদত্ত ভাষণে তিনি বড়ো শহরগুলির নিন্দা করে প্রকৃতির মধ্যে ফিরে যেতে চান, সংবাদপত্রের প্রতিবেদনে এমন বিবরণ পড়ে ড হু শি তাঁর বক্তব্যের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করতে বললে রবীন্দ্রনাথ বলেন, শহরগুলিকে হতে হবে সংস্কৃতির কেন্দ্রস্থল যেখান থেকে তা দেশের অন্যত্র ছড়িয়ে পড়বে। তাঁর দেশের ভ্রাম্যমান বাউলেরা ঘরে ঘরে কবিতা, সংগীত ও

কাহিনী নিত্য পৌঁছে দিয়ে সংস্কৃতির ধারাকে প্রবহমান রেখেছে; ‘In the West, Tagore felt, interest in Shakespeare had only been kept alive with the help of committees and benefit teas’.[১৯] জ্যোতিষবিদ্যায় পারদর্শী ড হু শি গ্রহনক্ষত্র পর্যালোচনা করে তাঁকে বলেছিলেন, ভুল সময়ে তিনি এই দেশে উপস্থিত হয়েছেন। বর্তমান ভাষণে প্রসঙ্গটি উত্থাপন করে তিনি বলেন, আরও খুঁটিয়ে বিবেচনা করলে তিনি হয়তো বলতেন 1861-এ তাঁর জন্মই হয়েছে ভুল সময়ে, কারণ অল্পবয়স থেকেই তিনি দেশের লোকের ক্রুদ্ধ সমালোচনা শুনে আসছেন তিনি বড়ো বেশি আধুনিক যাঁর সঙ্গে অতীতের কোনো সম্পর্ক নেই— আর এখানে এসে তিনি শুনছেন আধুনিক যুগের পক্ষে তিনি বড়ো বেশি বেমানান, তাঁর দু'হাজার বছর আগে জন্মানো বা এখানে আসা উচিত ছিল। এইজন্যই বন্ধুরা তাঁকে পরামর্শ দিয়েছেন এখানে তাঁর জীবনবৃত্তান্ত কিছুটা বর্ণনা করা উচিত ‘so that my ideas may not appear to you too visionary, and frighten you as does an apparition that has lost its context of life.’ অর্থাৎ তাঁকে প্রতিক্রিয়াশীল বলে কম্যুনিস্ট ছাত্র ও বুদ্ধিজীবীরা তাঁর যে সমালোচনা করছিলেন, এই ভাষণে রবীন্দ্রনাথ তার কিছুটা উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করলেন।

তিনি বলেন, তাঁর জন্মসময়ে বাংলাদেশে তিনটি প্রবল আন্দোলনের সঙ্গম ঘটেছিল। তার মধ্যে রাজা রামমোহন রায়-প্রবর্তিত আন্দোলনটি ধর্মীয় ও বিপ্লবাত্মক, কারণ স্থুল ধর্মীয় গোঁড়ামির সংকীর্ণতাকে আঘাত করে আত্মার মুক্তির পথ উন্মুক্ত করাই তার উদ্দেশ্য ছিল— তিনি এর জন্য গর্বিত, কারণ তাঁর পিতা এই আন্দোলনকে সজীব রাখতে সচেষ্ট ছিলেন। দ্বিতীয় আন্দোলনটি সাহিত্যিক, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় যার প্রবক্তা, যিনি তাঁর চেয়ে বয়সে অনেক বড়ো ছিলেন তবু তাঁর জীবৎকালেই রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যজীবন বিকশিত হয়েছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের আবির্ভাবের পূর্বে বাংলাসাহিত্যে সৃষ্টিশীলতার অবসান ঘটেছিল আলংকারিকতার কড়াকড়িতে ও সজীব আদর্শের অভাবে। বঙ্কিমচন্দ্র পণ্ডিতী বাংলার পৃষ্ঠপোষকদের সঙ্গে লড়াই করে সেই বন্ধ্যাদশা থেকে বঙ্গসাহিত্যকে মুক্তি দিলেন। এই সময়ে আর-একটি জাতীয় আন্দোলনের [হিন্দুমেলা] সূচনা হয়েছিল, যেটি পুরোপুরি রাজনৈতিক নয় তবু তার মধ্যে জনসাধারণ তাদের ব্যক্তিত্ব প্রকাশের একটা পথ পেয়েছিল; অপ্রাচ্য যে শক্তি তাদের নিজের আদর্শানুযায়ী মানববিশ্বকে ভালো ও মন্দে বিভক্ত করে অপমানের স্তূপ গড়ে তুলছিল তাকে ঘৃণা করার সাহস জুগিয়েছিল এই আন্দোলন। নিজেদের সংস্কৃতিকে অবজ্ঞা করার যে শিক্ষা আমাদের দেওয়া হচ্ছিল তার থেকে মুক্তির পথ গড়ে উঠছিল তাঁর নিজের পরিবারেই, ভাই ও ভ্রাতুস্পুত্রদের সাধনায়।

এই তিনটি বৈপ্লবিক আন্দোলনেই তাঁর পরিবার সক্রিয় অংশ নিয়েছিল। ধর্মীয় গোঁড়ামি না থাকার জন্য বৃহত্তর সমাজে তাঁরা ছিলেন প্রায় নির্বাসিত, সেইজন্য স্বাধীনভাবে নিজেদের জগৎ গড়ে তোলার সুযোগ তাঁরা পেয়েছিলেন— নিজের কবিতার ভাষা তিনি নিজেই নির্মাণ করে নিতে পেরেছিলেন। ভাষণটি তিনি শেষ করলেন এই বলে : ‘The impertinence of material things is extremely old. The revelation of spirit in man is modern: I am on its side, for I am modern. I have explained how I was born into a family which rebelled, which had faith in its loyalty to an inner ideal. If you want to reject me, you are free to do so. But I have my right as a revolutionary to carry the flag of

freedom of spirit into the shrine of your idols,— material power and accumulation.' প্রাচীনপন্থী বলে তাঁর যে সমালোচনা চিনে হচ্ছিল, এই ভাষণে রবীন্দ্রনাথ তার উত্তর দিলেন বলে মনে করা যেতে পারে।

এই সময়ে চিন থেকে লেখা রবীন্দ্রনাথের দুটি চিঠি পাওয়া যায়। ২০ বৈশাখ [শনি 3 May] জামাতা নগেন্দ্রনাথকে লিখেছেন : '...জাপান জাভা শ্যাম প্রভৃতি ঘুরে বোধ হয় সেপ্টেম্বর অক্টোবরে দেশে ফিরতে পারব। এখানে এসে অবধি যথেষ্ট আদর অভ্যর্থনা পাচ্চি— কিন্তু সেটা বড় কথা নয়— আমার মনে হচ্চে চীনে আমার আসা যতটা সার্থক হবে এমন আর কোথাও হয়নি। ... এণ্ড্রুজের প্রস্তাব ছিল আমাকে ইংলণ্ডে নিয়ে গিয়ে বক্তৃতা করাবে— সেইরকম ব্যবস্থাও করেছিল। কিন্তু বোধ হয় হয়ে উঠবে না। প্রতিদিনই বুঝতে পারচি আমার ভ্রমণ করবার বয়স চলে গেছে— অল্পেই ক্লান্ত হয়ে পড়ি। কেবল একবার ইটালি ও স্পেনে যাবার ইচ্ছে আছে— সেখান থেকে বারবার নিমন্ত্রণ পেয়েছি।'[২০] সম্ভবত ১৭ বৈশাখ [বুধ 30 Apr] ক্ষিতিমোহনের স্ত্রী কিরণবালাকে লিখেছিলেন; '...আমার এখানকার কাজের সীমা নেই। কেবলি ঘুরচি আর বক্তৃতা দিচ্চি। আমার জীবনে এত বকুনি কোনোদিন বকিনি। — এতদিন আমরা দলবল সবাই একত্র ছিলুম — দু তিন দিন থেকে বিচ্ছেদ হয়ে গেছে— মনে কোরোনা ঝগড়া করেচি। ... এরা পিকিনে আমার জন্মদিনের উৎসব করবে— সেইটে শেষ হয়ে গেলে ২৭শে বৈশাখ থেকে আমার বড় বক্তৃতাগুলো হবে। তার পরে জাপান যাবার কথা হচ্চে কিন্তু এখনো সম্পূর্ণ স্থির হয় নি। দেশে হয়ত ভাদ্র মাসের মাঝামাঝি কিম্বা শেষাশেষি ফিরব।'[২১] অবশ্য জাপান ছাড়া অন্য কোথাও তাদের যাওয়া হয়নি, রবীন্দ্রনাথ দেশে ফেরেন ১ শ্রাবণ [17 Jul] তারিখে।

4 May [রবি ২১ বৈশাখ] থিয়েটারের বক্তৃতার পরে 6 May [মঙ্গল ২৩ বৈশাখ] সকালে ড হু শি রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে প্রাতরাশে মিলিত হন। এইদিনই দুপুরে উত্তর চিনের ইংরেজি ভাষার শিক্ষকেরা ইয়েন চিঙ উইমেন'স্ কলেজে [Yen Ching Women's College] তাঁকে মধ্যাহ্নভোজনে আমন্ত্রণ করেন। আহারের পরে Dr. Joshua Bau ইয়েন চিঙের ছাত্রী ও শিক্ষিকাদের কাছে তাঁকে পরিচিত করিয়ে দিলে রবীন্দ্রনাথ যা বলেন সেটি *Talks in China* [1924]-র নবম ভাষণ 'To the English Teachers' Association, Peking' [*EWRT* 2/ 658–61] নামে সংকলিত হয়। রবীন্দ্রনাথের দ্বারা সংশোধিত ভাষণটির একটি টাইপ-করা পাণ্ডুলিপি রবীন্দ্রভবনে আছে [Ms. 304 (vii)]। প্রথমেই তিনি কলেজের ছাত্রীদের সঙ্গে পরিচিত হবার সুযোগ পেয়ে তাঁর আনন্দ ব্যক্ত করেন। তিনি বলেন, কোনো একজন একটি দেশকে চিনতে পারেন না যতদিন-না তিনি সেই দেশের মেয়েদের দ্বারা গৃহীত হন এবং এখানে চিনের মেয়েদের সংবর্ধনা তাঁর অন্যতম মধুর স্মৃতি হয়ে থাকবে। তিনি শিক্ষার প্রচলিত পদ্ধতির নিন্দা করতে গিয়ে নিজের বাল্যশিক্ষার করুণ অভিজ্ঞতার কথা বিবৃত করেন। ফলে তেরো বছর বয়সেই তাঁর প্রথাগত শিক্ষার অবসান ঘটে ও তার পরে তিনি আত্মশিক্ষার পথ বেছে নেন। দাদার আলমারি থেকে পাওয়া Charles Dickens-এর *Old Curosity Shop* গ্রন্থের একটি ছবি-ওয়ালা সংস্করণ নিজে নিজে পড়তে গিয়ে অনেক শব্দই তিনি বুঝতে পারেননি, কিন্তু অনুমানশক্তি ব্যবহার করে গল্পটির রস আহরণ করতে তাঁর অসুবিধা হয়নি। এই অভিজ্ঞতাই তিনি কাজে লাগিয়েছেন মাত্র পাঁচটি ছাত্র নিয়ে প্রতিষ্ঠিত নিজের বিদ্যালয়ে, যার পরিণতি ঘটেছে বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠায়। ভাষণটি তিনি শেষ করলেন বিশ্বভারতীর কার্যধারা ও আদর্শের বর্ণনা দিয়ে :

Our endeavour has been to include this ideal of unity in all the activities in our institution, some educational, some that comprise different kinds of artistic expression, some in the shape of service to our neighbours by way of helping the reconstruction of village life. As I wanted this institution to be inter-racial, I invited there great minds from the West. They cordially responded, and some have come permanently to join hands with us and build a place where men of all nations and countries may find their true home, without molestation from the prosperous who are always afraid of idealism, or from the politically powerful who are always suspicious of men who have the freedom of spirit.

তাঁর ভাষণের এই অংশটুকু শুনে বা পড়ে চিনের রবীন্দ্রবিরোধীদের বোঝা উচিত ছিল, তিনি একান্তভাবে পাশ্চাত্যবিরোধী ছিলেন না, তার ভালোটুকু নেওয়ার জন্য তাঁর মনের দ্বার সবসময়েই উন্মুক্ত ছিল— কিন্তু যাঁদের উদ্দেশ্যই ছিল তাঁর, বিশেষত তাঁর আমন্ত্রণকর্তাদের, বিরোধিতা করা— তাঁরা তাঁদের বোধবুদ্ধি বন্ধক রেখেছিলেন [যাঁদের মধ্যে বিখ্যাত চিনা সাহিত্যিক লু শুন (Lu Hsun, 1881–1936)-ও ছিলেন] একটি মতবাদের কাছে, সুতরাং রবীন্দ্রনাথের প্রতিটি বক্তব্য ও তার তাৎপর্য অনুধাবন করার চেষ্টাই ছিল না তাঁদের মধ্যে। তাই আবার তাঁরা রবীন্দ্রনাথের ভাষণের সময়ে প্রচারপত্র বিতরণ করেছেন, যার পরিণামে তিনি সফর অসম্পূর্ণ রেখে পিকিং ত্যাগ করেন।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথের বাণী বা ব্যক্তিগতভাবে তাঁকেই অনেকের ভালো লেগেছিল, এই কলেজের শ্রোত্রীদের মধ্যে তাঁদেরই একজন একটি চিঠিতে লিখেছেন : "We look on you as we look upon the summit of a mountain. We do not know how to express our admiration of it. In order to show our deep reverence we want to ask you to come to our College at the time of the setting sun or after the rising of the moon, when we have finished our classes. Thank you ever so much if you will kindly let us have the pleasure of meeting you. We wish 'peace in all your ways' with great respect."[২২]

আগেই বলা হয়েছে, ক্ষিতিমোহন সেন, নন্দলাল বসু ও কালিদাস নাগ নানা স্থান পরিভ্রমণে বেরিয়েছিলেন— 6 May তাঁরা ফিরতি পথের যাত্রা শুরু করেন; 7 May কালিদাস নাগ ডায়ারিতে লেখেন : 'সারাদিন trainএতে কবির জন্মদিনের জন্য এক কবিতা-অর্ঘ্য সাজান গেল— লিখে মনটা তৃপ্ত হল। বিকাল ৫টায় Peking পৌঁছে··· গুরুদেবের কাছে গিয়ে দেখা— আজ Chinese birthday উপলক্ষ্যে নাচ, গান, মস্করা পরে একত্র খাওয়া ও গল্প— Dr. Hu ছিলেন— খানিক কথাবার্তা হল পরে Chitra rehearsal হল'।[২৩]

২৫ বৈশাখ [বৃহ ৪ May] সকালে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীরা ঘরোয়াভাবে তাঁর জন্মদিন পালন করেন। নন্দলাল নিজের আঁকা একটি ছবি উপহার দেন, কালিদাস নাগ স্বরচিত কবিতা 'কবিপ্রশস্তি' পাঠ করেন ও ক্ষিতিমোহন পাঠ করেন একটি স্বরচিত সংস্কৃত শ্লোক।

সন্ধ্যায় সদ্যপ্রতিষ্ঠিত ক্রিসেন্ট মুন সোসাইটির উদ্যোগে পিকিং নর্মাল য়ুনিভার্সিটির অডিটোরিয়ামে প্রায় চারশো বিশিষ্ট অতিথির উপস্থিতিতে রবীন্দ্রনাথের চৌষট্টিতম জন্মোৎসব পালিত হল। ইংল্যান্ড বা আমেরিকায় শিক্ষিত প্রায় আশিজন বুদ্ধিজীবী সু সী-মো-র নেতৃত্বে সমিতিটি প্রতিষ্ঠা করেন। অনুষ্ঠানটিতে সভাপতিত্ব করেন ড হু শি। লিয়াঙ ছি-ছাও রবীন্দ্রনাথকে এক জোড়া সীল ও তিনটি চিনা অক্ষরে 'চু চেন তান' কথাগুলি খোদিত একটি মূল্যবান প্রস্তরখণ্ড উপহার দেন। 'চু' শব্দটি ভারতের একটি প্রাচীন চৈনিক নাম

রবীন্দ্রনাথের পদবীর প্রতিশব্দ হিসাবে ব্যবহৃত হয়, 'তান' শব্দটির অর্থ সূর্যোদয় বা রবি, 'চেন' বজ্র বা বজ্রদেবতা ইন্দ্র— অর্থাৎ পুরো শব্দটি 'রবীন্দ্র' শব্দের চৈনিক রূপান্তর— এর অন্য একটি অর্থ 'ভারতের মেঘমন্দ্রিত প্রভাত'। অতঃপর ক্ষিতিমোহন সেন দুটি সংস্কৃত শ্লোক আবৃত্তি করেন ও কালিদাস নাগ বলাকা-র 'পুরাতন বৎসরের জীর্ণ ক্লান্ত রাত্রি' কবিতাটি আবৃত্তি করে শোনান, নন্দলাল বসু উপহার দেন নিজের আঁকা ছবি। চিনা ভক্তেরা উপহার দেন পনেরো-ষোলোখানি উৎকৃষ্ট ছবি, একটি চিনেমাটির সহস্রপুষ্প পেয়ালা ও অন্যান্য সামগ্রী। রবীন্দ্রনাথ অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়েছিলেন ধুতিপাঞ্জাবি পরে বাঙালি পোশাকে সজ্জিত হয়ে।

সব শেষে ইংরেজি ভাষায় *Chitra* অভিনীত হয়। তার আগে অভিনন্দনের প্রত্যুত্তরে রবীন্দ্রনাথ প্রথমে চিনা ভাষায় তাঁর নূতন নামকরণের জন্য সকলকে ধন্যবাদ জানান ও আশা প্রকাশ করেন ঘটনাটি ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে থাকবে, যেমন তাঁর বহু পূর্বগামীর নাম চিন-ভারত সম্পর্কের ইতিহাসের অঙ্গীভূত হয়ে আছে। এর পরে তিনি নাটকটি রচনার ইতিবৃত্ত ও তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে শোনান। ক্রিসেন্ট মুন সোসাইটির তরুণ অপেশাদার অভিনেতা-অভিনেত্রীরা বিশুদ্ধ ইংরেজি উচ্চারণে নাটকটি অভিনয় করেন। নন্দলাল বসু তাঁদের পোশাক-পরিচ্ছদে ও রূপসজ্জায় সাহায্য করেন; তিনি লিখেছেন : 'চীনাদের ভারতীয় ড্রেস করে দিলুম আমি। ওদের ছোট চোখের জন্যে একটু অসুবিধে হয়েছিল। ওরা শেষে কিন্তু দেখতে হলো মনিপুরীদের মতন।'[২৪] অভিনয় ভালোই হয়েছিল; চিত্রার ভূমিকায় অভিনয় করেন Miss Phyllis W. Y. Lin, অর্জুনের ভূমিকায় Chang Hsin-hai, কামদেব মদন Hsu Tse-Mon, ঋতুদেবতা বসন্ত Lin Chang-min, গ্রামবাসী-বাসিনীদের ভূমিকায় Miss Monica Y. Wang, Mrs. C. Yang, Chiang Fang-cheng, Ting Sih-lin অবতীর্ণ হন।'[২৫]

পরের দিন 9 May [শুক্র ২৬ বৈশাখ] থেকে পিকিং লেকচার অ্যাসোসিয়েশনের আমন্ত্রণের সূত্রে আনুষ্ঠানিক বক্তৃতামালার সূচনা হল। পিকিঙের সবচেয়ে বড়ো ও সর্বাধুনিক প্রেক্ষাগৃহ চেন কুয়াঙ থিয়েটারে সকাল এগারোটার অব্যবহিত পরে রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রস্তাবিত ছ'টি লিখিত বক্তৃতার প্রথমটি প্রদান করেন। *Far Eastern Time*s [10 May] পত্রিকা লেখে : 'The pit of the Chen Kwang Theatre and a couple of score of seats in the gallery were filled with the audience that attended the first of Rabindranath Tagore's public lectures yesterday morning. It was a pity that the gathering was not much larger, for the utterance was a remarkably fine one, delivered with a rhetorical perfection that enhanced its acceptability, and made arresting by its quiet and indirect but eviscerating criticism of the accepted standards. ভাষণটির টাইপ-করা রবীন্দ্রনাথ-সংশোধিত পাণ্ডুলিপি [Ms. 304 (viii-B) রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত আছে এবং Talks in China [1924] গ্রন্থে 'To the Public at the Theatre in Peking' [*EWRT* 2/ 663–67] নামে মুদ্রিত হয়। রবীন্দ্রনাথ এই ভাষণে আক্রমণাত্মক ভূমিকা নিয়ে নিজের বিপ্লবী ভূমিকাকেই বড়ো করে দেখালেন। এই ভাষণে তিনি চিন ও ভারতের পুরোনো সংযোগ পুনঃসংস্থাপনের কথা বললেন না, এশিয়ার আত্মসন্ধানের বিষয়েও মৌন থাকলেন অর্থাৎ এখানে তিনি অনেকটা রক্ষণাত্মক, কিন্তু তাঁর সমালোচকদের বস্তুগত শক্তি ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের প্রতি অবিচল বিশ্বাসকে আঘাত করলেন তীব্রভাবে। কালিদাস নাগ ভাষণটির সারমর্ম ডায়ারিতে লিপিবদ্ধ করেছেন অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে :

বিদ্রোহ যদি মাত্র যা কিছু পুরান যা কিছু অতীত বা প্রবহমান তাকে ভাঙা হয়, তাহলে বিবর্তনে ও সভ্যতার অভিব্যক্তিতে স্থায়ী বলে ভিত্তি বলে কোন জিনিস টেকেনা— ভাঙার সঙ্গে গড়ার আদর্শও চাই এবং ভাঙাগড়ার চরম মাপ হবে সত্য দিয়ে। মিথ্যা গতানুগতিকের মধ্যেও যেমন, বিদ্রোহের মধ্যেও তেমনি থাকতে পারে— এই কথা বলে আসছি বলে আমায় একসময় একদল লোক বলেছে rebel আর আজ আবার একদল বললে reactionary! ফল কথা আমি মানি সত্যকে, chronologyকে নয়— সত্য চীন নূতন ও চির পুরাতন, modernism নাম করলেই modern হয়না— সেটাও জীর্ণ মৃত হতে পারে যদি প্রাণ থেকে না উঠে নকল থেকে জন্মায়— অনেক তথাকথিত modernistএর মধ্যে এই মেকীনকলের ছাপ পাই বলেই পুরান সত্যকে মনে করিয়ে দেওয়া কর্তব্য মনে করি। এই modernismএর আদর্শ হয়েছে material success and comfort ও efficiency—তাই তার কর্তব্য এসেছে inequity— vulgarity— brutality— warএর দরুণ সত্যি progressএর গোড়ায় কোপ দেওয়া হচ্ছে। অতি প্রাচীন বর্বর যুগে যেমন মাত্র অতিকায় হলেই প্রকাণ্ড হলেই টেঁকা যেত তেমনি মাত্র fleshএর উপর ঝোঁক পড়ছে কিন্তু ভুলে যেন না যাই যে সে অতিকায়রা লোপ পেল ক্ষীণকায় কিন্তু মনপ্রধান মানুষ এল বলেই। এইখানে দেখছি মাংসের বর্ম দূর করে আত্মার বর্ম জীব পরেছে এবং বড় হয়েছে। মানব সভ্যতায়ও তেমনি fleshএর যুগ দূর হলে spiritual potencyর যুগ আসবে— সেই বাণী নিয়ে কবি শিল্পী ভাস্কররা আসেন— আমাদের দেশে। আমি যখন 1861এ জন্মাই তখন এই spiritএর প্রাদুর্ভাব— ত্রিধারায় ছুটেছে— ১ আধ্যাত্মিক— রামমোহন থেকে— ২ সাহিত্যিক— বঙ্কিম থেকে— ৩ স্বাদেশিক— আত্মমর্যাদা থেকে— এই ত্রিধারা ভারতকে নবসভ্যতার দিকে নিয়ে চলেছে।[২৬]

কালিদাস নাগ জানিয়েছেন, বিকেলে কয়েকজন বৌদ্ধ রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করেন। তাঁরা প্রতিশ্রুতি দেন, কোনো ভারতীয় ছাত্র এখানে এলে তাঁরা সাহায্য করতে প্রস্তুত— 'এঁদের দল বেশ ভাবুক ও সবল— আধুনিক দল থেকে তফাৎ— এঁরা সত্যি শান্তি ও মৈত্রীর জন্য লড়তে প্রস্তুত।'

স্টিফেন হে লিখেছেন, রবীন্দ্রনাথের প্রথম বক্তৃতার আক্রমণাত্মক মনোভাবের মোকাবিলা করার জন্য রবীন্দ্রবিরোধীরা তাঁদের কর্মপদ্ধতি নিয়ে নিশ্চয়ই সেইদিন সন্ধ্যায় আলোচনায় বসেন এবং পরদিন বক্তৃতা শুরুর আগে কয়েকটি যুবক শ্রোতাদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর বক্তব্যের নিন্দামূলক ইস্তাহার বিতরণ করতে থাকেন। এই অপ্রীতিকর ঘটনা দেখে লিয়াঙ ছি-ছাও হু শি-কে সভাপতিত্ব করতে অনুরোধ করেন এবং হু অতিথির অবমাননা করার জন্য ছাত্রদের ধিক্কার দেন। রবীন্দ্রনাথও উপযুক্ত প্রত্যুত্তর দেবার প্রস্তুতি নিয়েই এসেছিলেন। তিনি বলেন, তিনি এদিনের বক্তৃতার জন্য দুটি প্রবন্ধকে মিলিয়ে একটি ভাষণ তৈরি করেছেন। প্রবন্ধ দুটি হল 'The Rule of the Giant' ও 'The Giant Killer'— যেগুলির সংশোধিত রূপ অনেক পরে 'The Rule of the Giant' নামে *Visva-Bharati Quarterly* [Jul 1926/ 99–112]-তে প্রকাশিত হয়। রবীন্দ্রভবনে 'The Rule of the Giant' [Ms. 324 (i–iv)] এবং 'The Giant Killer' [Ms. 324 (v–vi)] প্রবন্ধগুলির টাইপ-করা রবীন্দ্রনাথ-সংশোধিত পাণ্ডুলিপি রক্ষিত আছে, বস্তুত তাঁর ভাষণের সমকালীন পাঠের নমুনা সেখানেই পাওয়া যাবে। 'The Giant Killer' প্রবন্ধটি কোথাও ছাপা হয়নি। স্টিফেন হে লিখেছেন, রবীন্দ্রনাথের বক্তব্যের সার হল দৈত্যের শাসন আসলে আধুনিক সভ্যতার সামঞ্জস্যহীন অপ্রাণ যান্ত্রিক বৃদ্ধি ছাড়া আর কিছু নয়। শিল্পবিপ্লবের লৌহদৈত্য ও বাণিজ্যের ['cloven-footed commerce'] অপ্রতিহত বিস্তার এই সমস্যার মূলীভূত কারণ। এর জন্য আধুনিক গণতন্ত্রকেও তিনি অনেকটা দায়ি করেছেন, কারণ অগণিত প্রাণবলির বিনিময়ে পাওয়া এই গণতন্ত্রে ধনবলে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কিছু ব্যক্তি ছদ্মবেশে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে মানুষকে ব্যবহার করছে। চিনাদের মধ্যে যাঁরা তাঁকে প্রতিক্রিয়াশীল বা গোঁড়া রক্ষণশীল বলে আখ্যাত করছেন তাঁদের উদ্দেশে তিনি বললেন, 'There are those in the East who have slavishly come to believe that superstitions which are modern denote progress.' তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগগুলি অস্বীকার করে তিনি বললেন : 'Those who know me know that I have ever fought against obedience to the unmeaning, to traditions that are dead. ...I preach the freedom of man from the servitude

of the fetish of hugeness, the non-human. I refuse to be styled an enemy of enlightment because I do not stand on the side of the giant who swallows life, but on the side of Jack, the human, who defies the big, the gross, and wins victory at the end.'[২৭]

চিনা ভাষায় মুদ্রিত প্রচারপত্রগুলিতে কি লেখা আছে জানতে চাইলে তাঁর চৈনিক বন্ধুরা অস্বস্তিতে পড়ে যান। রবীন্দ্রনাথ কয়েকজন জাপানির সাহায্যে এগুলির বক্তব্য জানতে পারেন। শিশিরকুমার দাশ ও তান ওয়েনের প্রদত্ত বাংলা অনুবাদটি আমরা উদ্ধৃত করছি :

১. প্রাচীন চীনের সভ্যতার কাছে আমরা যথেষ্ট পেয়েছি, আর পেয়ে কাজ নেই। এই সভ্যতা মানুষকে শোষণ করে রাজাদের বড়ো করছে, মেয়েদের পদানত করেছে, পুরুষকে দিয়েছে সব অধিকার, তোষণ করেছে অভিজাত সামন্তদের। রবীন্দ্রনাথ আমাদের সেই সভ্যতার দিকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চান। তাই আমরা তাঁর বিরোধিতা করি।

২. আমাদের কৃষি চাষীর ক্ষুধা নিবারণে অক্ষম, আমাদের শিল্প কুটির শিল্প মাত্র, আমাদের নৌকা, আমাদের যান বাহন দিনে কয়েক মাইলের বেশি যেতে অসমর্থ, আমাদের ভাষা আমাদের লিখন পদ্ধতি এখনও আদিম, আমাদের পথঘাট আমাদের শৌচাগার আমাদের রন্ধনশালা পৃথিবীর চোখে হাস্যকর। অথচ রবীন্দ্রনাথ বস্তুসভ্যতার আধিক্যের জন্য আমাদের তিরস্কার করছেন। তাই আমরা তাঁর প্রতিবাদ করতে বাধ্য।

৩. রবীন্দ্রনাথ যাকে বলেন আত্মিক সভ্যতা তার ভয়াবহ রূপ আমরা প্রাচীন চীনে দেখেছি— অকারণ যুদ্ধ, লুণ্ঠন, ধর্ষণ, মিথ্যাচার, বঞ্চনা, লালসা, নির্লজ্জ বেশ্যাবৃত্তি, লুব্ধ ধনীর রক্ত পান, বাপ-মাকে খাওয়ানোর জন্য ধার্মিক সন্তানের নিজের শরীরের মাংস কেটে দেওয়া, পরাজিতের মাথার খুলিতে মদ্যপানের উল্লাস, পা বিকৃত করে মেয়েদের সুন্দরী বানাবার চেষ্টা। এই প্রাচীনের দিকে ফিরতে বলছেন রবীন্দ্রনাথ।

৪. চীনের বর্তমান দুর্দশার কারণ রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে নাগরিকদের ঔদাসীন্য। তার ফলেই জঙ্গি শাসক ও বিদেশী শক্তি আমাদের নিয়ে ছিনিমিনি খেলছে। আর রবীন্দ্রনাথ বলছেন আমরা নাকি ঐসব ব্যাপারে বড়ো বেশি বিব্রত। তার মানে জাতীয়তার দরকার নেই। সরকারের দরকার নেই। দরকার শুধু আত্মার সন্ধান।

৫. আমাদের দেশে ইন এবং ইয়াঙ্ তত্ত্ব ছিল, তাও ছিল, কনফুশিয়ান তত্ত্ব ছিল। এখন এসেছে 'হারমনিয়াস ভার্চু সোসাইটি' 'স্পিরিচ্যুাল কালচার অ্যাসোসিয়েশন', এবং খ্রীস্টতত্ত্ব। রবীন্দ্রনাথ বলছেন ব্রহ্মের কথা— আত্মার মুক্তির কথা। এই অকর্মণ্য তত্ত্বের বিরুদ্ধে আমাদের আপত্তি। আর যাঁরা রবীন্দ্রনাথকে আমন্ত্রণ করেছেন তাঁদের বিরুদ্ধে আমাদের আপত্তি।[২৮]

স্টিফেন হে-র গ্রন্থে শেষাংশটি আর-একটু বিস্তৃত : 'Therefore we protest, in the name of all the oppressed peoples, in the name of all the persecuted classes, against Mr. Tagore, who works to enslave them still more by preaching to them patience and apathy. We also protest against the semi-official literati who have invited Mr. Tagore to come to hypnotize and drug out Chinese youth in this way, these literati who use his talent to instill in Young China their conservative reactionary tendencies.'[২৯]

সমগ্র প্রচারপত্রটির উদ্দেশ্য এই শেষাংশে আছে, আমন্ত্রণকারীরাই ছিলেন প্রতিবাদীদের আক্রমণের মূল লক্ষ্য, রবীন্দ্রনাথ এখানে নিমিত্তমাত্র। তাই অভিযোগগুলির কথা জেনে তাঁর বিস্মিত হবারই কথা— কারণ আত্মিকতাকে কিঞ্চিৎ গুরুত্ব দিলেও নিজের দেশেও যে-রবীন্দ্রনাথ বিভিন্ন প্রসঙ্গে সামাজিক কুসংস্কারের বিরুদ্ধে বহুবার খড়্গহস্ত হয়েছেন, জনপ্রিয়তাকে বাজি রেখেও গান্ধীজির নানা অবাস্তব ও ক্ষতিকর ফতোয়ার বিরোধিতা করেছেন, তিনি অন্যদেশে গিয়ে একদল তথাকথিত প্রতিক্রিয়াশীল বুদ্ধিজীবীর প্রচারকার্যে লিপ্ত হয়ে চৈনিক সামাজিক কুপ্রথাগুলিকে সমর্থন করবেন, তাঁর বিরুদ্ধে এমন হাস্যকর অভিযোগ অন্য কোনো প্রসঙ্গে এমন-কি বাঙালিরাও করেনি! তাঁর চিনা সঙ্গীরা হয়তো তাঁকে জানিয়েছিলেন, নিরীশ্বরবাদী এই অভিযোক্তারা তাঁর ভাষণে ঈশ্বর ও আত্মার প্রসঙ্গ থাকায় আপত্তি করছিলেন। পরদিন রবিবার কোনো ভাষণ ছিল না, তাই রবীন্দ্রনাথ তাঁদের বললেন, এইসব মৌলিক প্রশ্নগুলি নিয়ে আলোচনার জন্য কয়েকজন

বিরোধীকে তাঁর বাসায় যেন ডেকে পাঠানো হয়। রাজি হয়েও হু-শি শেষপর্যন্ত তাঁকে লেখে জানান : 'Unfortunately I find it difficult to get enough atheist friends for this coming meeting. Some are away while others do not fully understand English. ...I do not deem it right that this rare pleasure you have promised me should be exclusively enjoyed by one or two persons.'[৩০] স্পষ্টতই এই চিঠির মধ্যে একটু এড়িয়ে যাবার ভাব আছে।

ঠিক হয়েছিল, রবীন্দ্রনাথ সোমবার থেকে বৃহস্পতিবার [12–15 May] প্রতিদিন সকালে একটি করে বক্তৃতা দেবেন; কিন্তু এই ঘটনার পরে তিনি ঘোষণা করলেন, সোমবারের পরে বাকি বক্তৃতাগুলি তিনি বাতিল করে দিচ্ছেন। ভাষণটি দেওয়া হবে অন্যান্য দিনের চেয়ে এক ঘণ্টা আগে, সকাল দশটার সময়ে।

খবরটি পিকিঙের ছাত্রছাত্রীদের কাছে পৌঁছলে পরদিন প্রায় দু'হাজার তরুণতরুণী থিয়েটার হলে উপস্থিত হন। সু সী-মো তাঁর প্রারম্ভিক ভাষণে শান্তভাবে রবীন্দ্রনাথের পক্ষ সমর্থন করেন; হু-শি অনুরোধ জানান অতিথির প্রতি যথোচিত সম্মানজনক আচরণ প্রদর্শন করতে। রবীন্দ্রনাথ যে-ভাষণটি দেন, সেটি 'Judgment' নামে *Visva-Bharati Quarterly* [Oct 1925/ 195–208; *EWRT* 2/ 549–58]-তে প্রকাশিত হয়। রচনাটির 'The Challenge of Judgement' নামে রবীন্দ্রনাথ-সংশোধিত টাইপ-করা পাণ্ডুলিপি [Ms. 325] রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত আছে। নামটি নিয়ে রবীন্দ্রনাথের কিছু দ্বিধা ছিল, টাইপ-করা 'Judgment' শব্দটি কেটে তিনি প্রথমে লিখেছিলেন 'We must judge', পরে সেটিকেও পরিবর্তিত করেন 'The Challenge of Judgment' নামে। পাণ্ডুলিপিতে রবীন্দ্রনাথ-কৃত সংশোধন, বর্জন ও সংযোজনের পরিমাণ কম নয়, কিন্তু মূল টাইপ-করা পাঠটিই পত্রিকাতে ছাপা হয়েছে।

ভাষণটি তিনি শুরুই করেছেন বক্রভঙ্গিতে :

The young generation of men in the East are everywhere attracted by what they imagine is modern. And they have convinced themselves that Western life is modern. They are seeking from its manners and mentality the magic formula of how to grow modern. They believe that what is called modern represents the principle of indefinite growth and freedom, — it is youth, it is life.'

কিন্তু তাই যদি হবে তাহলে জানা দরকার, আধুনিকতা কোনো বিশেষ কালে সীমাবদ্ধ নয়, তা নিহিত আছে এক বিশেষ সত্যে— যার অভাবে আধুনিকতম নকশা ও চাকচিক্য সত্ত্বেও তা প্রকৃতপক্ষে সেকেলে ও বিনষ্টির সম্মুখীন। কালের গতিকে বুঝতে না পেরে এই কারণেই অনেক জাতি ধ্বংস হয়েছে। 'Are we sure that the same thing has not happened to the West, and that the atmosphere of turmoil which we find there is not due to the conflict between, their present history, which is no longer modern, and the messenger of the future, which was come with its sovereign claim?'

পাশ্চাত্যের তথাকথিত আধুনিকতার পশ্চাদ্বর্তী স্বার্থপর যান্ত্রিকতার বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথ এখানে আরও আক্রমণাত্মক ভূমিকা গ্রহণ করেছেন। তিনি বললেন : 'All that is deeply human is never old. It has the perpetual freshness of imperishable life.' কিন্তু পশ্চিমি ক্ষুধার্ত জাতিগুলি গত এক শতাব্দী জুড়ে

পূর্ব গোলার্ধের দেশগুলির সম্পদ অপহরণ ও তাদের অপমান করেছে, কি করে বিশ্বাস করা যাবে তারাই জীবনরহস্যের অসীমতার সন্ধান লাভ করেছে। তারা এসেছে বাইরে থেকে এবং বাইরেই থেকে গেছে। 'The West has come to us like an engineer... with the primary object of making easy his work of exploitation.... The West, in its relationship with non-western peoples, has for its constatnt meditation-text: *They are radically and eternally different from ourselves.*' এই ধরনের কথা যে য়ুরোপীয় চিন্তাশীল ব্যক্তিরাও ভাবছেন, তার উদাহরণ হিসাবে রবীন্দ্রনাথ জনৈক লেখকের 'Christian Missions' প্রবন্ধ থেকে দীর্ঘ উদ্ধৃতি দিয়েছেন।

কিন্তু হয়তো গান্ধীজি ও তাঁর অনুগামীদের কথা স্মরণ করেই তিনি প্রবন্ধ-শেষে অন্ধ পাশ্চাত্যবিরোধিতা সম্পর্কেও সতর্ক করে দিয়েছেন : 'But we must guard against antipathy that produces blindness. We must not disable ourselves from receiving truth. For the West has appeared before the present-day world not only with her dynamite of passion and cargo of things but with her gift of truth. Until we fully accept it in a right spirit we shall never even discover what is true in our own civilization and make it generously fruitful by offering it to the world. The culture, the humanity of the West do not belong to the Nation but to the People.' যখন নেশনগুলি নিজেদের অধিকার বিস্তারের জন্য লড়াই করে, তখন জনসাধারণ নিজেদের সত্য সম্পদ বিনিময়ে উদ্‌গ্রীব। আর পাশ্চাত্যের সেইসব মানুষদের আন্তরিক সত্যপ্রিয়তা ও সক্রিয় মানবপ্রেম প্রভৃতি সর্বোৎকৃষ্ট গুণগুলি আমাদের আয়ত্ত করার চেষ্টা করতে হবে, কারণ তার ফলেই আমরা আমাদের জীবনে গতি ও আদর্শে সজীবতা আনতে সক্ষম হব।

এইদিনই রবীন্দ্রনাথ বিশ্রামের ঘোষিত উদ্দেশ্য নিয়ে পিকিঙের অদূরবর্তী পশ্চিমের পাহাড়ে চলে যান। স্টিফেন হে সংবাদপত্রের বিজ্ঞপ্তি উদ্ধৃত করেছেন : 'On the advice of his physician, Dr. Rabindranath Tagore has cancelled all his public and private engagements and after his last lecture at the Chen Kuang Theatre this morning, he left for the Western Hills. Because of his physical and mental fatigue, Dr. Tagore will remain in the Hills until next Sunday when he will return to Peking and leave the next morning.'[৩১]

কিন্তু শারীরিক ও মানসিক ক্লান্তির কথা নিছক অজুহাত, সেটি জানা যায় 13 May রথীন্দ্রনাথকে লেখা ক্ষিতিমোহনের পত্র থেকে :

…চীনের ছোকরাদের মধ্যে এসে পড়েছি— এরা ঘোরতর যন্ত্রনেশায় মত্ত। সবই এদের machine যন্ত্র— ও তারই পূজা করচে— এবং রাজনীতির ঘুরপাক থেকে উচ্চতর স্বর্গ এদের নেই।…

গুরুদেব গোটা ২।৩ লেকচের দিয়েই আজ West Hillএ— এখান হতে ২০ মাইল দূরে শান্ত জায়গায় চল্লেন। আগামী ১৮ই এখানে ফিরবেন। তারপর ২০শে Hankow হয়ে Yang Tse Kiang পথে Shanghai যাবেন। পথে বিখ্যাত General Wu-Pei-Fu সঙ্গে দেখা হবে।…

Mr. Elmhirstএর কথা হচ্চে জাপান হতে রেলপথে রুস যাবার। রুস কর্তৃপক্ষ এসেছিলেন গুরুদেবকে নিতে। গুরুদেব তাই তাঁকে পূর্ব্বে সেখানে সব প্রস্তুত করতে বল্‌চেন। গুরুদেব আগামী বৎসর সেখানে যেতে চাচ্ছেন।

এলম্‌হার্স্ট সাহেব ভবিষ্যতে চীনে এসে বিশ্বভারতীর প্রতিনিধিরূপে দীর্ঘকাল rural reconstructionএর কাজ করবেন— এমন ব্যবস্থা হচ্চে। … গুরুদেব ভালই আছেন। হঠাৎ বক্তৃতা বন্ধ করে দেওয়ায় কাগজে বেরিয়েছে তিনি অসুস্থ। এতে ভাবিত হবেন না।[৩২]

উক্ত পত্রে 'রুস কর্তৃপক্ষ এসেছিলেন গুরুদেবকে নিতে' কথাগুলির কিছুটা ব্যাখ্যা প্রয়োজন। লিও কারাখান [Leo Karakhan] নামক সোভিয়েত রাশিয়ার একজন সরকারি প্রতিনিধি তখন পিকিঙে ছিলেন, স্টিফেন হে জানিয়েছেন, চিনের আধুনিক মনোভাবাপন্ন যুবকদের সঙ্গে তাঁর যথেষ্ট ঘনিষ্ঠতা ছিল। রবীন্দ্রনাথের পিকিং ত্যাগের পূর্বে তাঁর সঙ্গে দেখা করেন। 13 May [মঙ্গল ৩০ বৈশাখ] বিকেলে তাঁদের সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা পূর্বেই নির্ধারিত হয়েছিল। *Japan Chronicle* [17 May] সংবাদটি পরিবেশন করে :

Mr. Rabindranath Tagore paid a visit to Mr. Karakhan yesterday and, it is understood, expressed a wish to visit Russia in order to study the conditions there and to further among the Russian people the study of the civilisation of India and the East.

The Russian representative is reported to have expressed himself in favour of the Indian poet's idea, and to have promised to convey Tagore's wish to his Government in Moscow...

During the conversation Mr. Karakhan, it is stated, urged the establishment of closer relations between Russia and India.

হে লিখেছেন, রবীন্দ্রনাথ কারাখানকে বলেন : 'Russian territory is mostly in the East, her traditional civilization is quite close to Eastern civilization, and Russia is completely different from the countries of Western Europe, who insistently advocate materialistic civilization. Therefore, I very much wish to visit Soviet Russia, both for siight-seeing and to plant there the spirit of Eastern civilization.' কারাখান প্রতিশ্রুতি দেন, তিনি রবীন্দ্রনাথের আগ্রহের কথা তাঁর সরকারকে জানাবেন। তিনি বলেন, রাজনৈতিক কারণে তাঁর দেশ বিশ্বের সমস্ত নিপীড়িত জাতিদের সাহায্য করতে আগ্রহী, কারণ পশ্চিমি বস্তুমূলক সভ্যতার হাতে রাশিয়া সাম্প্রতিক বৎসরগুলিতে যথেষ্ট ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। উনিশ শতকে টলস্টয় বস্তুসভ্যতাকে বর্জন করতে চেয়েছিলেন, সুতরাং রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য সেখানে উপযুক্ত ক্ষেত্র পাবে। তাঁর শিক্ষাদর্শও কারাখানের সহানুভূতি লাভ করে, তবে মস্কোর মতো শহরে গৃহীত প্রস্তাব রাশিয়ার সমস্ত গ্রামে অনুসৃত হবে এই নীতি রবীন্দ্রনাথের ভালো লাগেনি।[৩৩]

রাশিয়ায় যাওয়ার জন্য তিনি নিজে সাক্ষাৎকার প্রার্থনা করেছিলেন, তার কারণ হয়তো তিনি চাইছিলেন, চিনের ছাত্র-যুবকেরা সোভিয়েত রাশিয়ার কোন্ বৈশিষ্ট্যের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে এমন অন্ধ আগ্রহে তার দিকে ছুটে চলেছে সেই ব্যাপারটি বুঝে নিতে। কারাখান প্রতিশ্রুতি দেন, তিনি চেষ্টা করবেন যাতে রবীন্দ্রনাথ পরের বৎসরেই রাশিয়ায় যেতে পারেন। তিনি রাশিয়ায় গিয়েছিলেন, কিন্তু বেশ-কিছু বছর পরে 1930-তে।

পিকিঙের গোলমেলে আবহাওয়া থেকে পশ্চিম পর্বতের উষ্ণ প্রস্রবণের ধারে নবনির্মিত হোটেলে কয়েকদিনের বিশ্রাম রবীন্দ্রনাথের ক্লান্তি দূরীকরণে সহায়তা করেছিল। কিন্তু Lin Ch'ang-min ও লেকচার অ্যাসোসিয়েশনের অন্য কয়েকজন সদস্য তাঁর শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য সম্পর্কে উদ্বিগ্ন হয়ে সেখানে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যান। হোটেলে তাঁদের প্রদত্ত ডিনারে রবীন্দ্রনাথ ভারত ও চিনের গ্রামগুলির বিষয়ে আলোচনা ক'রে তাঁর গ্রাম-পুনর্গঠনের আদর্শ নিয়ে কথা বলেন। হে এল্‌ম্‌হার্স্টের ডায়ারি থেকে আলোচনার

কয়েকটি বাক্য উদ্ধৃত করেছেন : 'With a machine you can count your horsepower, but life is different.... It is life that we are after. Life, life, life! Here is your Jack that will kill the Giant!'[৩৪] ইংল্যান্ডের ডেভনশায়ারের ডার্টিংটন হলে রক্ষিত এই ডায়ারিগুলি মুদ্রিত হয়নি, রবীন্দ্রনাথের ভ্রমণসঙ্গী সেক্রেটারিদের মধ্যে তাঁর প্রাত্যহিক কর্মসূচি ও বিভিন্ন ব্যক্তির সঙ্গে আলোচনার বিবরণ এল্‌ম্‌হার্স্টের চেয়ে নিপুণভাবে আর-কেউ রক্ষা করেননি— বিশ্বভারতীর পক্ষ থেকে এগুলির প্রতিলিপি অবিলম্বে সংগ্রহ করা বাঞ্ছনীয়। অবশ্য রাণু অধিকারীকে কৌতুকের ভঙ্গিতে লেখা এল্‌ম্‌হার্স্টের 17 May-র পত্রে কিছু সংবাদ পাওয়া যায় :

...Gurudev is better now than I have ever known him before. He has delivered over twenty speeches & addresses & given countless interviews & at the moment when he seemed to be getting tired, we persuaded him to cut all the engagements, as he did that day at Benares, you remember & bolt for this little hotel in the country with its hot sulphur springs. They have done him a world of good & he no longer talks of leaving this existence at an early date, but of going to Italy & Russia & Heaven knows where. Most of his speeches I have taken down word by word & am slowly transcribing them. He quickly revises them & is thereby adding volumes to the comparatively small stock of authentic English works hitherto published. Mere translation always ruins them.[৩৫]

18 May [রবি ৪ জ্যৈষ্ঠ] রবীন্দ্রনাথের পিকিঙে ফেরার কথা ছিল। তার অনেক আগে সর্ব ধর্ম সমিতি [Committee of All Religions]-র সভাপতি Gilbert Reid 14 May তাঁকে আমন্ত্রণ জানিয়ে লেখেন :

Herewith the formal invitation which I mentioned to you early after your arrival.... We desire a message from you that will help on the moral and spiritual regeneration of China. From your wide experience you will be able to emphasize those great principles that belong to the whole human race. Then as your farewell message, you are free to point out what China needs along these religious lines.

...It is your presence that we all wish,... Our Committee will be ready to welcome you at any time before half past three in the room adjoining the theatre. Over 900 tickets have been applied for and distributed among these various organizations. I am sure you will have one of the most sympathetic and appreciative audiences you have ever had.[৩৬]

পূর্বঘোষণামতো রবীন্দ্রনাথ উক্ত 18 May সকালে পিকিঙে ফিরে আসেন। আকস্মিকভাবে পিকিং ন্যাশানাল বিশ্ববিদ্যালয়ের একদল ছাত্রছাত্রী তাঁর কাছে কিছু শোনার আবেদন জানান। এঁদেরই মতো কিছু তরুণতরুণীর অভব্যতায় বিরক্ত হয়ে রবীন্দ্রনাথ প্রস্তাবিত তিনটি বক্তৃতা বাতিল করে পিকিং ত্যাগ করেছিলেন। তাই বিস্ময়ের সঙ্গে তিনি এঁদের প্রশ্ন করেন : 'What do you want from me? Why do you

ask me to give you a speech?' তাঁর সারা জীবনের আচরণই প্রমাণ দেবে যে তিনি বক্তা নন। নির্জনে প্রকৃতির সান্নিধ্যে উদ্ভুত অনুভূতি ও চিন্তাকে রূপ দেওয়ার কাজেই তিনি জীবনের অধিকাংশ সময় ব্যয় করেছেন। 'I wish I could have come to you to-day in my true capacity as a poet, you would not then have asked me for a speech, but for something better, a poem.' তাঁদের ভাষা জানা থাকলে সেই ভাষার কবিতাতে তাঁর ভাব ব্যক্ত করা সহজ হত। কিন্তু কোনো কিছু শেখার সময় আর তাঁর নেই। বস্তুত সারা জীবন প্রথাগত উপায়ে তিনি কিছুই শেখেননি, মাত্র তেরো বছর বয়সে তিনি শিক্ষালয়ের গণ্ডি থেকে পলায়ন করেছিলেন। তিনি অঙ্ক, লজিক বা দর্শনশাস্ত্র কিছুই জানেন না, 'But one thing I have gained, a sensititivity of mind which has never been impaired, the touch of life and of nature, who spoke to me.' পণ্ডিতেরা তাঁদের চিন্তাকে পুস্তকে গ্রন্থিত করেন, তাদের মূল্য অসীম— কিন্তু অনুভূতিপ্রবণতাও একটি বিরাট প্রাপ্তি; আমরা জন্মেছি এক বিশাল বিশ্বে, সেখানে অনুভূতিকে অগ্রাহ্য করে বইয়ের স্তূপের নিচে চাপা পড়লে বিশ্বকেই হারাতে হয়। এই পৃথিবীতে তিনি কোনো সমাজ বা গোষ্ঠীর সদস্য হিসেবে নয়, ভবঘুরে রূপে বাস করেছেন— কিন্তু অনুভব করেছেন তার অস্তিত্বের রহস্য, তার হৃদয়, তার আত্মাকে। 'You may call me uneducated, uncultured, just a silly poet; you may grow great as scholars and philosophers; and yet I think I would have the right to laugh at your pedant scholarship.'

এই ভাষণে রবীন্দ্রনাথ যা বললেন, তার মধ্যে চিনা তরুণদের বস্তুতান্ত্রিকতার প্রতি তাঁর সূক্ষ্ম বিদ্রূপ প্রকাশ পেয়েছে। ভাষণটি রবীন্দ্রনাথ শেষ করলেন তাঁর জীবনের একটি গভীর সত্যের কথা উচ্চারণ করে, যা তাঁকে মৃত্যুর আগে পর্যন্ত সৃষ্টিশীল ও সক্রিয় রেখেছিল : 'I had kept the spirit of the child fresh within me; because of this I have found entry to my mother's chamber wherein a light burns in the dark, where some symphony of awakening light sang to me from the distant horizon, in response to which I also sang.' ভাষণটি 'To a Surprise Gathering of Students in the National University, Peking' নামে *Talks in China* [1924]-র চতুর্দশ রচনা হিসেবে মুদ্রিত হয়; 1925-সংস্করণে এটি 'To Students I' নামে ছাপা হয়েছিল।

বিকেলে পিকিং বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য চিয়াঙ মন-লিন ও অন্যান্য শিক্ষকদের চা-পান সভায় রবীন্দ্রনাথকে বিদায়-সংবর্ধনা জানানো হয়। রবীন্দ্রনাথ বললেন, তাঁর বিদায় নেবার সময় সন্নিকট হয়েছে; অনেক প্রীতি তিনি লাভ করেছেন, কিন্তু 'I feel to-day a discontent, as of something not accomplished, as of my mission not completed.' তবে এর জন্য তিনি দায়ি নন, বর্তমান যুগই সবচেয়ে বড়ো বাধা। তাঁর দেশের মানুষ যখন চিনের আমন্ত্রণের কথা শুনেছিলেন, তখন উভয় দেশের মধ্যে আত্মিক যোগাযোগের পথ পুনর্নির্মাণের সুযোগ এসেছে ভেবে তাঁরা খুশি হয়ে উঠেছিলেন। তাঁরা অত্যন্ত সরল বলেই বিশ্বব্যাপারের জটিলতা সম্পর্কে তাঁদের কোনো ধারণা নেই। তাঁরা ভেবেছিলেন চিনের লোককে ভারতের প্রীতির কথা বলা অন্তত তাঁর মতো মানুষের পক্ষে খুব সহজ, কিন্তু তাঁরা জানেন না এখন সময় খুব কঠিন বলেই দুর্লঙ্ঘ্য বাধার পাহাড় গড়ে উঠেছে।

এখন যোগাযোগ ব্যবস্থা সহজ হওয়ায় তাঁদের ভ্রমণ অনেকটা পিকনিকের মতো হয়েছে— তাঁরা পার্টিতে যোগ দেন, সকলে মিলে আনন্দ করেন, চা খান, বক্তৃতা দেন এবং তার পরে দেশে ফিরে যান। কিন্তু মূল্যবান জিনিসের জন্য মূল্য দিতে হয়। আমাদের পূর্বপুরুষদের জনসাধারণের মধ্যে আত্মিক সম্পর্ক স্থাপনের আদর্শ ছিল, কিন্তু সেই বার্তা বহন করে নিয়ে যাওয়ার পথ ছিল অত্যন্ত দুর্গম। তবু তাঁরা সেই পথ অতিক্রম করেছেন, কথা বলেছেন আপনাদের নিজের ভাষায়, তাই মতবিনিময়ও সহজ হয়েছিল। আর তিনি রেলগাড়িতে আরামে ভ্রমণ করেছেন, ফলে সহযাত্রীদের সঙ্গে কোনো যোগ গড়ে ওঠেনি; তাঁদের পক্ষে দুর্বোধ্য ইংরেজি ভাষায় পঁয়তাল্লিশ মিনিট ধরে শব্দবৃষ্টি করেছেন— ফলে স্মৃতিতে একটা আবছা দাগ পড়েছে, সংবাদপত্রে কয়েকটি অনুচ্ছেদ মুদ্রিত হয়েছে, কিন্তু বক্তা ও শ্রোতার মধ্যে কোনো হৃদয়সংযোগ গড়ে ওঠেনি। তিনি স্বীকার করেন যে, সেই উচ্চতর আদর্শে তাঁর বিশ্বাস আছে যার দ্বারা জীবনের মহত্তর উদ্দেশ্য সফল হতে পারে— কিন্তু এইসব কথা বলাই এখন অখ্যাতির কারণ।

এটি অন্তরঙ্গ বন্ধুদের সমাবেশ। তাই কেউ যেন না মনে করেন তাঁদের হৃদয়ে জায়গা না পেয়ে এইসব অভিযোগ করা হচ্ছে। এখানে তাঁর অবস্থান আনন্দজনক হয়েছিল, কিন্তু তাঁদের গুরুতর সমস্যাগুলি গভীরভাবে জানার সুযোগের সদ্ব্যবহার করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি বলে তাঁর মনে আক্ষেপ আছে। তবু মনে হয় পথ উন্মুক্ত হয়েছে, তাঁদের মধ্যে থেকে কেউ-কেউ ভারতে যাবেন। তাঁর প্রতিষ্ঠানে ভ্রাতৃত্ববোধের আদর্শকে অনুসরণ করা হয়, সেখানে বিভিন্ন দেশ ও ভাষার মানুষের কাছাকাছি আসার সুযোগ আছে। 'Do not merely discuss me as a guest, but as one who has come to ask your love, your sympathy and your faith in the following of a great cause. If I find even one among you who accepts it, I shall be happy.'

প্রতিভাষণে ড হু শি বলেন, তিনি নিশ্চিত তাঁদের অতিথির ভাষণে সকলেই মুগ্ধ হয়েছেন। তিনি সকলের পক্ষ থেকে বলতে পারেন, ড টেগোরের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়নি। এ কথা ঠিক যে, কিছু ভুল-বোঝাবুঝি হয়েছে, এমন-কি নির্বোধ বিরোধিতাও, কিন্তু এগুলি অনিবার্য ছিল। তাঁদের নিজেদের বক্তব্য বোঝাতে গিয়েও সমস্যা হয়, দেশের মানুষদের জন্য যাঁরা কোনো নূতন আদর্শ আনতে চান তাঁদেরও এমনই ভুল বোঝা হয়। কাজটা খুবই কঠিন, সত্যকে প্রচার করা, বহু শতাব্দী আগে যে-সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গেছে তাকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা সময়সাপেক্ষ। তবে বীজ বপন করা হয়েছে, তা অবশ্যই ফলপ্রসূ হবে। 'I sincerely hope that Dr. Tagore and his friends will return to India with the conviction that they succeeded nobly in the mission they set out to accomplish.' উভয়ের ভাষণ 'The National University, Peking' নামে *Talks in China* [1924]-র অষ্টাদশ ভাষণ হিসেবে মুদ্রিত হয়, 1925-সংস্করণে এর নাম 'Leave-Taking I' [*EWRT* 2/ 682–86, 615–18]।

পরের দিন 19 May [সোম ৫ জ্যৈষ্ঠ] রবীন্দ্রনাথ সদলবলে পিকিং ত্যাগ করেন। এইদিন মহাযান বৌদ্ধদের একদল প্রতিনিধি তাঁর সঙ্গে দেখা করলে তিনি হিন্দু ও বৌদ্ধধর্মের মৌলিক সাদৃশ্যগুলি নিয়ে কথা বলে আশা প্রকাশ করেন, আধ্যাত্মিক শিক্ষা ও জীবনযাত্রার সরল পদ্ধতি অনুসরণের মাধ্যমে চিন ও ভারত প্রাচ্য সভ্যতার বিকাশে একত্রে কাজ করতে পারে।[৩৭]

Dr. Gilbert Reid-আহূত সবধর্মসম্মেলনে তিনি রবীন্দ্রনাথকে আহ্বান করেন, সেই পত্রটি আমরা আগেই উদ্ধৃত করেছি। অনুষ্ঠানটি হয় চেন কুয়াং থিয়েটারে বিকেল তিনটের সময়ে, জাপান ক্রনিকেল লেখে, 'before a house that was crowded to the doors' মাদ্রাজের *New India* [27 Jun] *Peking Daily News*-কে উদ্ধৃত করে লেখে : 'The meeting lasted from three o'clock to six.... After the address of Dr. Tagore, listened to by over a thousand attentive listeners, there was an intermission of ten minutes, during which, as for half an hour before the meeting, music was rendered by a Chinese band of thirty persons rendering Western music. Then the address was ably translated by Mr. C.S. Chang of the Chinese Y.M.C.A., after which Prof. Sen spoke briefly on "Human Brotherhood" translated by Dr. George Wilder, and Prof. Nag spoke on "Religious Reformers of India", translated by Dr. Reid.' হিন্দু জরাথ্রুস্ট্রীয়, কনফুশিয়ান, তাওইস্ট, মহাযান বৌদ্ধ, লামা বৌদ্ধ, ক্রিশ্চান, প্রাচ্য গোঁড়া ক্রিশ্চান ও ইসলাম এই ন'টি ধর্মের প্রতিনিধি নিজ নিজ ধর্মীয় পোশাকে মঞ্চে উপবিষ্ট ছিলেন। ড রীড রবীন্দ্রনাথকে আধুনিক ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্মশিক্ষক বলে পরিচয় দেবার পরে, *The Modern Review* [Sep 1924/ 300] যদিও লেখে : Tagore gave his spiritual autobiography in his address "A Poet's Religion", কিন্তু তাঁর ভাষণটির নাম ছিল 'Religious Experience', *Talks in China* [1924]-র চতুর্দশ রচনা [দ্র *EWRT* 2/ 672–77] হিসেবে এটি মুদ্রিত হয়।

রবীন্দ্রনাথ বলেন, তিনি শুনেছেন চিন কখনও ধর্মের প্রয়োজন অনুভব করেনি। একথা বিশ্বাস করতে তাঁর কষ্ট হয়। অল্প সময়ে নানা কাজের মধ্যে চিনের হৃদয়কে তিনি বুঝে উঠতে পারেননি, সুতরাং এ বিষয়ে নির্দিষ্ট করে কিছু বলা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়।

তাঁর ধর্ম সম্পর্কে অনেকে জানতে চেয়েছেন। এ বিষয়ে কিছু বলতে তাঁর সংকোচ হয়, কারণ নির্দিষ্ট কোনো ধর্মমতের মধ্যে তিনি বড়ো হয়ে ওঠেননি। তাঁর পরিবার ঔপনিষদিক আদর্শে উদ্বুদ্ধ ছিল, কিন্তু স্বাধীনতার আবহাওয়ার মধ্যে তাঁর মন গড়ে উঠেছিল বলে সেই ধর্মমতকেও তিনি অবিকল গ্রহণ করতে পারেননি। তাঁর ধর্ম আসলে এক কবির ধর্ম। তাঁর সংগীতের মতো এর স্পর্শও তাঁর কাছে আসে অদেখা অজানা কোনো পথ বেয়ে। তাঁর কাব্যজীবনের মতো তাঁর ধর্মজীবনও রহস্যময়তায় আবৃত, যে-কোনো ভাবেই হোক তাদের মিলন ঘটেছে।

তিনি বলেন, বিস্ময় অনুভব করার সেই ক্ষমতা তিনি পেয়েছিলেন যার সাহায্যে একটি শিশু জগতরহস্যে প্রবেশের পথ পায়। তিনি নিয়মবদ্ধ পড়াশোনাকে অবহেলা করেছিলেন কারণ তারা বহির্প্রকৃতি থেকে তাঁকে সরিয়ে রাখত। এর থেকে হয়তো তাঁর ধর্মের অর্থটি বোঝা যাবে, যা তাঁর কাছে অত্যন্ত জীবন্ত। তাঁর চারপাশের জগৎ সম্পর্কে তিনি খুবই সচেতন। যা আমাদের নিছক সংবাদ দেয় তার মাপজোক সম্ভব, কিন্তু যা আমাদের আনন্দ দেয় তার হিসাবনিকাশ সহজ নয়। ভারতের বৈষ্ণবধর্ম প্রতীকের ধর্ম, সেখানে পরম প্রেমিকের হাতে বহু ছিদ্রযুক্ত একটি বাঁশি আছে যা আমাদের গণ্ডিবদ্ধ জীবন থেকে প্রেম ও সত্যের জগতে বেরিয়ে আসার আহ্বান জানায়। স্বার্থপর জীবনের কোলাহলে এই সুর আমরা শুনতে পাই না। ভাষণের শেষে রবীন্দ্রনাথ বললেন : 'I have already confessed to you that my religion is a poet's religion; all that I feel about it, is from vision and not from knowledge. ...I am sure that there have come

moments when my soul has touched the infinite and has become intensely conscious of it through the illumination of joy.'

এর পরে চিনের অন্যতম প্রধান অভিনেতা Mei Lan-fang রবীন্দ্রনাথের মনোরঞ্জনের জন্য বিখ্যাত চিনা নাটক *The Goddess of the Lo River* অভিনয়ের আয়োজন করেন। স্টিফেন হে লিখেছেন, চিনা প্রথানুযায়ী সংগীতাদি পরিবেশন করে অনেকটা সময় ব্যয় করে রাত্রি এগারোটার সময়ে মেই লান-ফাঙ যখন মঞ্চে অবতীর্ণ হন, তখন ক্লান্ত রবীন্দ্রনাথের শোবার সময় হয়ে গেছে। সেই কারণে অভিনয় কিছুদূর অগ্রসর হবার পরে রবীন্দ্রনাথ স্থানত্যাগে উদ্যত হলে উপস্থিত চিনারা এটিকে অপমানজনক বলে মনে করেন। কিছু কথাবার্তার পরে রবীন্দ্রনাথ অভিনয় শেষ না হওয়া পর্যন্ত সেখানে কাটান। পরদিন সকালে উভয়ের মধ্যে সাক্ষাতের ব্যবস্থা হয়েছিল, কিন্তু মেই লান-ফাঙ খবর পাঠান, অসুস্থতার জন্য তাঁর পক্ষে আসা সম্ভব হবে না। আরও আলোচনার পরে উভয়ের সাক্ষাৎ হয় এবং দুজনে ভারত ও চিনা অভিনয়কলা বিষয়ে মতবিনিময় করেন।[৩৮]

এইদিন 20 May [মঙ্গল ৬ জ্যৈষ্ঠ] রাত্রি এগারোটায় রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর সঙ্গীরা পিকিং ত্যাগ করে Shansi প্রদেশের রাজধানী Taiyuan-এর উদ্দেশে রওনা হন। ড রীড, ড হু শি, ড চ্যাং, লিয়াং ছি-ছাও, মি. লিন প্রভৃতি স্টেশনে তাঁদের বিদায় জানান।

শান্সি প্রভিনশ্যাল এডুকেশন অ্যাসোসিয়েশন আগেই রবীন্দ্রনাথকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিল : 'The people of Taiyuan are awaiting your memorable visit and long to see your personality as well as to hear your exalted ideas and accept your challenge to international brotherhood of mankind, both East and West alike.' 1911 থেকে শান্সি প্রদেশের সামরিক গবর্নর জেনারেল Yen Hsi-shan তাঁর সুশাসনের জন্য আদর্শ শাসক হিসেবে পরিচিত ছিলেন; তিনি প্রাচীন কনফুশিয়ান সামাজিক ব্যবস্থা অক্ষুণ্ণ রেখেও আধুনিকতা প্রবর্তন করতে চাইতেন, বড় শিল্প ও নগরের বিষয়ে তাঁর মনোভাব অনেকটা রবীন্দ্রনাথেরই সদৃশ ছিল। 22 May সকালে রবীন্দ্রনাথ তাঁর সঙ্গে দেখা করেন, তাঁদের আলোচনার বিবরণ বিশ্বভারতী কোয়ার্টার্লির Oct 1924 [pp. 289–95]-সংখ্যায় 'Conversation between Rabindranath Tagore and Governor Yen, of Shansi, China'নামে মুদ্রিত হয় [দ্র *Talks in China* [1999]/ 125–32]। কালিদাস নাগও উভয়ের কথাবার্তার সংক্ষিপ্তসার তাঁর ডায়ারিতে সুন্দরভাবে লিপিবদ্ধ করে রাখেন [দ্র কবির সঙ্গে একশো দিন। ৪৯–৫০]। রবীন্দ্রনাথের আদর্শের প্রতি শ্রদ্ধার নিদর্শনস্বরূপ গবর্নর এল্‌ম্‌হার্স্টের পরিচালনায় ভারতীয় ও চিনা স্বেচ্ছাসেবীদের সমবায় কৃষিখামার প্রতিষ্ঠার জন্য একটি সুন্দর ভূমিখণ্ড নির্দিষ্ট করে দেন। কিন্তু উক্ত প্রস্তাবিত কৃষিখামারের প্রস্তাব কোনোদিনই কার্যকর হয়নি।

বিকেল সাড়ে তিনটেয় প্রজাদের আত্মোন্নতির উদ্দেশ্যে গবর্নর-প্রতিষ্ঠিত কনফুশিয়াস হলে প্রায় তিন হাজার [কালিদাস নাগের হিসাবে আট হাজার] লোকের উপস্থিতিতে রবীন্দ্রনাথ 'City and Village' [*Visva-Bharati Quarterly*, Oct 1924/ 215–27; *EWRT* 3/ 510–18] প্রবন্ধটি পাঠ করেন। যখন মানুষের সঙ্গে পরিবেশের সম্পর্ক নিয়ে গুরুত্ব দিয়ে চিন্তা করার প্রয়োজনীয়তার কথাই অধিকাংশ ব্যক্তির মনে জাগ্রত হয়নি, তখন রবীন্দ্রনাথ এই প্রবন্ধে লিখলেন, তিনি প্রগতির বিরুদ্ধে নন, কিন্তু সেই তথাকথিত প্রগতির নামে সভ্যতা মানুষের আত্মাকে যখন বেচে দিতে প্রবৃত্ত হয় 'then I choose to remain primitive in my material

possessions, hoping to achieve my civilization in the Fealm of the spirit.' প্রসঙ্গটি তাঁর লেখায় এসেছিল শহর ও গ্রামের পারস্পরিক সম্পর্ক নিরূপণ করতে গিয়ে। তিনি লেখেন : 'Cities there must be in man's civilization, just as in higher organisms there must be organized centres of life, such as brain, heart, or stomach. ...But a tumour round which the blood is congested, is the enemy of the whole body upon which it feeds as it swells.' আমাদের আধুনিক শহরগুলি একই উপায়ে গ্রামের প্রাণশক্তিকে শোষণ করে সমৃদ্ধির প্রাসাদ গড়ে তুলছে, সেখানে পড়ে থাকছে কেবল ছোবড়া।

রবীন্দ্রনাথ প্রবন্ধটি শুরু করেছিলেন কিছুটা রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে। সাম্যবাদী দর্শনে সম্পত্তির অধিকারকে ধনতন্ত্রের উদ্ভবের অন্যতম কারণ বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ এই তত্ত্বকে স্বীকার করতে পারেননি। তাঁর মতে, সম্পত্তি আমাদের ব্যক্তিত্ব প্রকাশের মাধ্যম। অবশ্য এতে মানুষের মধ্যে বিভেদের উদ্ভব হয়, যা আত্যন্তিক হয়ে উঠলে তাকে স্বার্থপরতাও বলা যায়। কিন্তু এরই মাধ্যমে ব্যক্তি অপরের সঙ্গে যোগাযোগ করে, মানবেতিহাস এই ব্যক্তিত্ববিকাশেরই ইতিহাস। ব্যক্তি যেমন সমাজের একক, সম্পত্তি তেমনই সম্পদের একক। 'Our wisdom lies not in destroying separateness of units, but in maintaining the spirit of unity in its full strength.' জীবন যখন সরল ছিল সম্পদ তখন কোনো জটিলতা সৃষ্টি করেনি, বরং ব্যক্তিগত সম্পদ সমাজের হিতের কাজেই ব্যবহৃত হয়েছে। ভারতে আগে জলসরবরাহ, স্বাস্থ্যবিধান, শিক্ষা ও আমোদের আয়োজন সম্পদশালী ব্যক্তিরা স্বেচ্ছায় গ্রহণ করেছেন, অতিরিক্ত সম্পদ এইভাবে সামাজিক দায়িত্বপালনের পথ বেয়ে ব্যয়িত হয়েছে। কিন্তু বর্তমান কালে সম্পদ সংগ্রহের লোভ এই ব্যবস্থার পরিবর্তন ঘটিয়েছে। আমাদের পুরাণে ধনের দেবতা কুবেরের আকৃতি কুৎসিত উদরসর্বস্ব, কিন্তু সম্পদের দেবী লক্ষ্মী সুন্দরী, বিশ্বের হৃদয়পদ্মের উপরে অধিষ্ঠিতা। দুর্ভাগ্যের বিষয়, বর্তমান যুগে লক্ষ্মী তাঁর পদ্মাসন হারিয়েছেন, তাঁর জায়গায় কুবেরই পূজিত হচ্ছেন। আধুনিক শহরগুলি কুবেরের কুৎসিত ভুঁড়ির প্রতিরূপ, 'Its growth is not true progress; it is a disease which keeps the body swelling while it is being killed.'

তাঁর ভাষণের পরে তাইয়ুয়ান বিদেশি ভাষাশিক্ষা বিদ্যালয়ের ছাত্রেরা অতিথিদের মনোরঞ্জনের জন্য *Sannyasi* অভিনয় করেন। রাত্রে গবর্নরের প্রাসাদে প্রায় ৫০ জন গণ্যমান্য অতিথির সমাগমে রবীন্দ্রনাথকে সান্ধ্যভোজে আপ্যায়িত করা হয়।

পরের দিন 23 May [শুক্র ৯ জ্যৈষ্ঠ] সকাল ৯টায় দুদিনব্যাপী দক্ষিণমুখী ট্রেনযাত্রা শুরু হল। পথে রবীন্দ্রনাথ নানা প্রসঙ্গে অনেক আলোচনা করেন। কালিদাস নাগ ডায়ারিতে তার সারাংশ লিখে রাখেন [দ্র কবির সঙ্গে একশো দিন। ৫৫–৫৯]।

25 May [রবি ১১ জ্যৈষ্ঠ] সকালে ট্রেন হ্যাংকৌ পৌঁছিল, কালিদাস নাগ লিখেছেন : 'সকালে Hangkowতে পৌঁছান— Wagon lits হোটেলে ওঠা— এদিকটা একেবারে বিলাতী ছাঁচে গড়া— মানুষরাও তাই।' স্টিফেন হে বর্ণনা দিয়েছেন, 1911-এ মাঞ্চুসাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে বিপ্লবের উদ্ভবস্থল ইয়াংসি নদীর তীরে 'চিনের শিকাগো' নামে পরিচিত প্রায় সাত লক্ষ লোকের বাসস্থান Hankow, Hanyang ও Wuchang নগরত্রয়ী অতিরিক্ত রকমের প্রগতিশীল হয়ে উঠেছিল। আবার এখানেই 'T'ai Hsuর নেতৃত্বে বৌদ্ধ-পুনর্জাগরণ আন্দোলন শুরু হয়েছিল, 1922-তে য়ুচাঙে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল একটি বৌদ্ধ কলেজ ও হ্যাংকৌতে

ছিল Young Men's Buddhist Association-এর প্রধান কেন্দ্র। স্টিফেন হে লিখেছেন : 'With strong organizations of both leftists and Buddhists on the scene, the stage in Hankow-Wuchang was set for a final clash between Tagore and his fiercest antagonists in China.'[৩৯] বৌদ্ধ বুদ্ধিজীবীরা হ্যাংকৌর Supporting Virtue Middle School-এর মুক্তাঙ্গনে সকালে একটি বক্তৃতার আয়োজন করেন। প্রধানত যুবছাত্রদের এই সভায় রবীন্দ্রনাথ তাঁর চিনে আসার দুটি কারণ ব্যক্ত করেন— প্রথমত চিনের যুবকদের সঙ্গে পরিচিত হওয়া ও দ্বিতীয়ত ভারতীয় সংস্কৃতির সঙ্গে যোগ থাকার জন্য চিনের পুরোনো সভ্যতা সম্পর্কে অভিজ্ঞতা লাভ। এই দুটি সূত্রকে সম্মিলিত করে তিনি তাঁর তরুণ শ্রোতাদের আহ্বান জানান বিজ্ঞানের মাধ্যমে জীবনের পার্থিব উন্নতি ও আধ্যাত্মিক সভ্যতা-চর্চার সমন্বয় ঘটানোর জন্য। তিনি বলেন :

On your shoulders, my beloved young people, lies this responsibility. Like the dawning of the rising sun, you young people are full of promise. You have a great responsibility, and you should advance with determination. Do not let our Eastern civilization imitate whatever is done in Western civilization. I hope very much that more Chinese students will come to India to study the principles of Chinese and Indian culture, for these two cultures are intimately related. Young people, I urge you to exert yourselves.

রবীন্দ্রনাথের ভাষণ শেষ হওয়া মাত্রই শ্রোতাদের মধ্য থেকে একদল যুবক উঠে দাঁড়িয়ে চিনা ভাষায় চিৎকার করে বলে, 'পরাধীন দেশের দাস, ফিরে যাও', 'আমরা দর্শন চাই না, বস্তুবাদ চাই'— এর সঙ্গে তারা এই বাক্যগুলি লেখা প্ল্যাকার্ড নাড়াতে থাকে। কালিদাস নাগ বাক্যগুলির অর্থ অনুবাদ করিয়ে শঙ্কিত হয়ে পড়েন এই ভেবে যে, এই অভব্য যুবকগুলি রবীন্দ্রনাথকে আঘাতও করতে পারে! সৌভাগ্যবশত এমন ঘটনা ঘটেনি।[৪০] কালিদাস নাগ সমকালে লেখা ডায়ারিতে যুবকদের ধিক্কার দিয়েও প্রসঙ্গটি অন্যভাবে উপস্থাপিত করেছেন : 'যুবকরা এসে প্রশ্ন করে, Dr. Tagore, we can't understand your argument against science! নিরেট!'[৪১]

রবীন্দ্রনাথ অবশ্য এই বালখিল্য উত্তেজনাকে তুচ্ছজ্ঞান করেন। সেইদিন বিকেলেই তিনি পাশের শহর উছাঙে খেলার মাঠে প্রায় ৭০০ লোকের এক সভায় পিকিঙে পঠিত প্রথম ভাষণটিই ['First Public Talk in Peking'] পুনর্বার পড়ে শোনান, সাবধান করে দিয়ে বলেন, শক্তির উপর নির্ভরতা বর্বরতার লক্ষণ, আর যে সব জাতি কেবল এর উপরেই নির্ভর করেছে তারা হয় বিনষ্ট হয়েছে, নয় বর্বরই থেকে গেছে। কালিদাস নাগ লিখেছেন : 'গুরুদেব খুব জোর করে বললেন, "আমায় তোমরা অসময়ে ডেকেছিলে, তোমাদের মন এখন রয়েছে success— material prosperity at any costএর রাজ্যে, আমি বলছি, চিরদিন আমাদের মহাপুরুষেরা বলেছেন— যা চাইবে তা হয়তো পাবে— ভাল করেই পাবে তবু সমূলে বিনাশের হাত থেকে রক্ষা হয়ত পাবেনা— ধর্মের আত্মার অদম্য ভিত্তির উপর নির্ভর না-করলে কিছুই স্থায়ী হবেনা।" তেজোদীপ্ত মুখ থেকে ভবিষ্যদ্বাণী যেন আগুনের মতো বার হল— হয়ত চীন একদিন বুঝবে। এখন দেখছি যেন school boyএর মতো মাস্টারের চোখ এড়িয়ে যেতে চাচ্ছে।'

হ্যাংচৌ ছেড়ে রবীন্দ্রনাথ সেই রাত্রেই *Kut Woo* জাহাজে সাংহাই রওনা হন। কালিদাস নাগ লিখেছেন : 'রাতে হট্টগোলের এক dinner, কোনমতে নৈশভোজ সেরে —প্রায় ২০০ শিখ ও হিন্দুদের কাছে বিদায় নিয়ে জাহাজে ওঠা। রাত ৯ ॥ টায় জাহাজ ছাড়ল। শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত শিখরা দাঁড়িয়ে দেখতে লাগল।'

ইয়াংসি নদীতে তিনটি রাত্রি ও দুটি দিন কাটিয়ে রবীন্দ্রনাথ 28 May [বুধ ১৪ জ্যৈষ্ঠ] সকাল দশটা নাগাদ সাংহাই পৌঁছন। কালিদাস নাগ লিখেছেন : 'দুটো দিন গুরুদেবের সঙ্গে খুব আনন্দে কাটল। ··· কী গভীরতায় তলিয়ে আছেন, যত দেখছি যেন অবাক হয়ে যাচ্ছি। হঠাৎ মরণ ও পরকাল নিয়ে কথা উঠল। তখন নদীর উপর সূর্যাস্ত হচ্ছে। সেই দৃশ্যের সঙ্গে কবির গভীর কথাগুলি রঙে সুরে যেন এক হয়ে বেজে উঠল। প্রিয়তম পুত্র শমীর শেষ মুহূর্তের কথা শোনালেন··· বলছেন আর চোখ জ্বলে উঠছে, মুখ দীপ্ত— ভাষা প্রায় জোগায়না। এত বড় কবি নির্বাক! অসংলগ্নভাবে বলছেন— অক্ষরের স্তর ভেদ করে শব্দ ও অর্থের স্তরে উঠতেই সবটা যেরকম আমূল বদলে যায় তেমনি জীবন থেকে মরণের পরপার— সব সেই আছে, শুধু সব বদলে গেছে কথায় কী করে বোঝাব— সব যেন পূর্বের জ্যোতি নিয়ে এক মহানির্বাণের বুকে অচপল জ্যোতি জ্বলে উঠল।'[৪২]

সাংহাই পৌঁছে রবীন্দ্রনাথ ইতালিয়ান ব্যবসায়ী G.A. Bena-র বাড়িতে উঠলেন, অন্যেরা আশ্রয় নিলেন ভারতীয় ব্যবসাদার লালচাঁদের গৃহে। শ্রীমতী বেনা শিক্ষা বিষয়ে উৎসাহী ছিলেন, তাই সন্ধ্যায় তাঁর বসবার ঘরে কয়েকজন য়ুরোপীয় বন্ধুর সামনে রবীন্দ্রনাথকে এই প্রসঙ্গে কিছু বলতে অনুরোধ করেন। রবীন্দ্রনাথের ভাষণটি *Talks in China* [1924]-এ 'At Mrs. Bena's, Shanghai' নামক সপ্তদশ রচনা হিসেবে মুদ্রিত হয় [দ্র *EWRT*/ 678–81]। রবীন্দ্রনাথ এখানে তাঁর বিদ্যালয়-প্রতিষ্ঠার কারণ ও আদর্শ পুনরায় ব্যাখ্যা করলেন। তিনি বললেন : 'I believe that children should be surrounded with the things of Nature which have their own educational value. Their minds should be allowed to stumble on and be surprised at everything that happens in the life of to-day. The new to-morrow will stimulate their attention with new facts of life. This is the best method for the child.' নিজের স্কুলজীবনের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করে তিনি বললেন : 'I always had it in my mind to create an atmosphere. This I felt was more important than the teaching of the classroom.' এই পরিবেশই তিনি রচনা করেছেন নিজের গান, নাট্যাভিনয়, বিখ্যাত চিত্রশিল্পীদের শিক্ষকতার কাজে এনে তাঁদের সৃষ্টিকার্যের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার সাক্ষ্য ছাত্রদের সামনে উপস্থিত করে। কালিদাস নাগ ডায়ারিতে তাঁর ভাষণের সংক্ষিপ্তসার দিয়ে লিখেছেন : 'বক্তৃতার পরে জনকতক শ্রোতা English, Italian প্রশ্ন করলেন খুব তারিফ করে— বেশ জমল। কবি শেষে জানালেন যে তাঁর স্কুল বা বিদ্যালয়ের প্রচারকল্পে তিনি কিছু বলছেন এটা যেন ভাবা না-হয়। "আমি আজ আছি, কাল নেই— আমার অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠানও লোপ পেতে পারে, কিন্তু সত্য বা ideal যা আমি জেনেছি তা প্রকাশ করে যাচ্ছি— তা সকলের এবং সকলেই তাকে আপন বলে যেন নেয়।"'[৪৩]

পরের দিন 29 May [বৃহ ১৫ জ্যৈষ্ঠ] দুপুরে তাঁর সম্মানে অনুষ্ঠিত এক বিদায়সভায় যোগ দেবার জন্য রবীন্দ্রনাথ Haskell Road-এ একটি জাপানি বিদ্যালয়ে যান। এখানে তিনি 17 Apr প্রাচ্য সভ্যতা বিষয়ে বলতে গিয়ে তির্যক্‌ভাবে আমেরিকায় জাপানি ও অন্যান্য এশীয়দের আগমনে বাধা দেবার জন্য যে আইন প্রণয়নের বিষয়ে আলোচনা চলছিল তার উল্লেখ করেছিলেন। প্রস্তাবিত বিলটি ইতিমধ্যে আইনে পরিণত হয়

এবং জাপানিদের মনোভাব আমেরিকা ও পাশ্চাত্য-বিরোধী অবস্থান নেয়। এই আবহাওয়ায় জাপান রওনা হবার আগে জাপানি বিদ্যালয়ে ভাষণ দিতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ যা বললেন, কালিদাস নাগ তার সংক্ষিপ্তসার লিখে রাখেন তাঁর ডায়ারিতে। ছাত্রদের অভ্যর্থনার উত্তরে রবীন্দ্রনাথ বলেন, তিনি প্রথমবার যখন জাপানে যান তখন তিনি যে যত্ন পেয়েছিলেন তার কথা কখনও ভুলবেন না। জাপান জানে আতিথ্য কাকে বলে। সেখানে তাঁকে বাড়ির মধ্যে আত্মীয় করে নেওয়া হয়েছিল। 'তার ঘরের সেবা-যত্ন, তার পরিপাটিত্ব, তার সৌন্দর্যজ্ঞান — তুচ্ছ জিনিসকে অপূর্ব সুন্দর করার প্রতিভা— এই সবই জাপানীর নিজস্ব' তাঁকে মুগ্ধ করেছিল। জাপান একদিন ভারতের সঙ্গে অধ্যাত্মসম্বন্ধে যুক্ত হয়েছিল এবং সে কথা স্মরণ করে আজও তাঁরা গৌরব বোধ করছেন দেখে মনে হচ্ছে এ সম্বন্ধ সত্য এবং তা এখনও সত্য হয়ে রয়েছে। জাপানিদের জীবনে আজও যে বীরত্ব, আত্মত্যাগ, আত্মসম্মান ও আনুগত্য দেখছেন তার জন্য জাপানিরা হয়তো হিন্দু অধ্যাত্মসাধনা ও বৌদ্ধধর্মের কাছে ঋণী। এইসব গুণ যেন জাপানিদের কখনও পরিত্যাগ না করে। আজ বিষম পরীক্ষা জাপানের সামনে— সাফল্য ও কার্যকরিতার দর্শন ['success and efficiency cult]— পাশ্চাত্য শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে জাপানিদের মনে ঢুকেছে। কিন্তু যেসব মহৎ আদর্শের জন্য প্রাচীন জাপান প্রাণ দিয়েছে, সেই আদর্শকে যেন সে ভুলে না যায়— সেগুলি ছেলেবেলা থেকে অনুশীলন ও পরজীবনে প্রস্ফুট করে জগতের সামনে ধরলে প্রাচ্য আদর্শ জাপানের মধ্যে দিয়ে সার্থক হবে—এ আশা তিনি রাখেন, তাই জাপান তাঁর অতি প্রিয়। তরুণ জাপানের কাছে এ কথা বলতে তাঁর বিশেষ আনন্দ হচ্ছে— 'বীরের মতো সত্য ও আদর্শের জন্য প্রাণ দাও।'[৪৪]

হর্ষধ্বনি করে সকলে তাঁর ভাষণে সন্তোষ প্রকাশ করে। বক্তৃতার পরে মধ্যাহ্নভোজনে অনেক অধ্যাপক ও বিশিষ্ট ব্যক্তির কাছেও রবীন্দ্রনাথ কতকগুলি গুরুতর বিষয় উত্থাপন করেন। কালিদাস নাগ লিখেছেন— রবীন্দ্রনাথ বলেন, আদর্শকে একান্ত করে বহন করা এ যুগে অত্যন্ত কঠিন। এই অশান্তির যুগে শান্তি একটি বড়ো সমস্যা, কিন্তু এ ছাড়া গতিও নেই। মানুষ একদিন জবরদস্তি করে ধর্মান্তরিত করত, পুড়িয়ে মারত। 'রাজনীতির ক্ষেত্রে হিংসা এখনও রয়েছে। অন্যত্র গেছে— কিন্তু নেশনের ক্ষেত্র থেকেও তাকে তাড়াতে হবে। কারণ, সে মিথ্যা, সে বর্বরতা'। আজ বিশ্বের বহু জাতি এই সভ্য বর্বরতার কাছে আঘাত পেয়ে ভাবছে উপায় কী? এ ক্ষেত্রে ভারত সত্য পন্থা দেখিয়েছে- বলেছে, কোনো দায়ে পড়ে বলেনি— গভীর অনুভূতি থেকে প্রচার করেছে। তাই ভারতেরই এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার চিরন্তন অধিকার— যারা বাধ্য হয়ে অনুযোগ করছে তাদের নয়। সমস্ত সমস্যার গোড়ায় গিয়ে দেখতে হবে কোথায় আছে রোগের বীজ। বৃদ্ধ Asuto এ কথা শুনে বললেন, 'যে ভারত বুদ্ধকে ও তাঁর ধর্মকে আমাদের উপহার দিয়েছে, সেই দেশেরই আর এক অবতারের মধ্যে দিয়ে সেই শাশ্বত সত্য আবার আমাদের শোনাল। এর জন্য আমরা কৃতজ্ঞ ও ধন্য হয়েছি।'[৪৫]

বিকেলে কারসন চ্যাঙের বাগানবাড়িতে, যেখানে চিনে তাঁকে প্রথম সংবর্ধনা জানানো হয়েছিল, সেখানেই চিনা বুদ্ধিজীবীরা তাঁকে বিদায় জানাতে সমবেত হন। প্রত্যুত্তরে রবীন্দ্রনাথ যা বলেন, তার রবীন্দ্রনাথ-সংশোধিত এল্‌ম্‌হার্স্টের হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপিটি রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত আছে [Ms. 304 (ix)], 'Farewell Speech at Shanghai' নামে ভাষণটি *Talks in China* [1924]-এ ও 'Leave Taking II' নামে 1925-সংস্করণে মুদ্রিত হয় [দ্র *EWRT* 2/ 668–70, 615–18]। চিনা বুদ্ধিজীবীদের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ

রবীন্দ্রনাথের বক্তব্যকে প্রসন্নচিত্তে গ্রহণ করেননি, তরুণদের অনেকে তাঁকে প্রত্যাখ্যান ও অসম্মান করতেও কুণ্ঠিত হয়নি। তবু রবীন্দ্রনাথ তাঁর এই শেষ ভাষণে তির্যক্‌ভাবে কিছু প্রত্যাঘাত করলেও আপাত-স্থৈর্য প্রদর্শন করেন। তিনি বলেন, অনেকে তাঁর এই বিদায়দিনে চিনা জনসাধারণের সেই বিরোধী অংশের খোলাখুলি সমালোচনা করার জন্য তাঁকে অনুরোধ করেছিলেন, কিন্তু তিনি তা করবেন না এবং তাঁর অনুরোধ তাঁকেও যেন সমালোচনা না করা হয়। কারণ তিনি চিনে এসেছিলেন শতাব্দীপ্রাচীন বন্ধুত্বসম্পর্ক পুনরুদ্ধার করতে, দার্শনিক হিসেবে নিজেকে তুলে ধরা তাঁর লক্ষ্য ছিল না। নিজের জন্য কোনো পাদপীঠ তিনি তৈরি করেননি, সুতরাং সেখান থেকে তাঁকে টেনে নামাতে গিয়ে তাঁর মেরুদণ্ড ভাঙার চেষ্টা অন্যায্য হবে। অবশ্য ভাষণটি তিনি শেষ করলেন অত্যন্ত তিক্ততার সুরে : ‘Some of your patriots were afraid that, carrying from India spiritual contagion, I might weaken your vigorous faith in money and materialism. I assure those who thus feel nervous that I am entirely inoffensive; I am powerless to impair their career of progress, to hold them back from rushing to the market place to sell the soul in which they do not believe.’ তিনি তাঁদের আশ্বস্ত করতে পারেন, একজন অবিশ্বাসীকেও তিনি বোঝাতে পারেননি তাঁর আত্মা আছে বা বস্তুশক্তির চেয়ে নৈতিক সৌন্দর্যের মূল্য বেশি। তাঁর ধারণা এই সত্যটি যখন তাঁরা বুঝবেন তখন তাঁরা তাঁকে ক্ষমা করবেন। কালিদাস নাগও তাঁর ডায়ারিতে এই ভাষণের সংক্ষিপ্তসার লিখেছিলেন [দ্র কবির সঙ্গে একশো দিন। ৬৪–৬৫], সেটিও পাঠযোগ্য।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর ভাষণে চিনে তাঁর প্রায় সর্বক্ষণের সঙ্গী সু সী-মো-র যে-প্রতিক্রিয়া জানতে আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন, স্টিফেন হে সেটি উদ্ধার করে দিয়েছেন :

It seemed as though he could not express the pain in his heart. He seemed not to be able to speak freely about his feelings. His smile, unless my mind is too sensitive, was not a true smile. Sometimes we could see it was in the place of tears. “My evil fate follows me from my country to this distant land. It has not been all sunshine of sympathy for me.” He weighed these words before he spoke them. This was the only point he didn’t explain clearly or completely; these words contained unlimited bitter pain, unlimited resentment. At that time I felt very sorry for him,’[৪৬]

এরপরে সিন্ধি, পার্শি, মুসলিম প্রভৃতি ভারতীয়েরা রবীন্দ্রনাথকে বিদায় জানান। কালিদাস নাগ এর বিস্তৃত বর্ণনা দিয়েছেন; তিনি লিখেছেন, সিন্ধিদের রবীন্দ্রনাথ বললেন, ‘সিন্ধিদের সেবা, আতিথ্যে আমরা মুগ্ধ। ভারতের আদর্শ বজায় রেখে বিদেশে মানুষের হৃদয় অধিকার করতে চেষ্টা করা উচিত, শুধু অর্থোপার্জন নয়।’ পার্শি মেয়েরা মালা চন্দন দিয়ে ‘সেজ’ অনুষ্ঠান করে রবীন্দ্রনাথের দীর্ঘায়ু প্রার্থনা করে দু’হাজার টাকা তাঁকে নমস্কারী হিসেবে উপহার দিলেন। ‘কবি বললেন, পুণ্যস্মৃতি Zoroasterকে স্মরণ করে আজ আপনারা আমায় আদর করছেন— নতমস্তকে সেই মহাপ্রাণ সত্যাদর্শকে পূজা করি। অসত্যের জঞ্জাল দূর করে তিনি প্রথম এসিয়ায় সংস্কার যুগের প্রবর্তন করেন— তাঁরা সত্যদীপ্ত পুরুষ, আমি কি করে তাঁদের মতো করে সত্যকে জীবন্ত করব— আমার শক্তি অল্প, আমার কণ্ঠ ক্ষীণ তবু আজীবন সংগ্রাম করে আসছি। কত সঙ্কোচ কত

বাধা কত কুণ্ঠা তবু বলছি চারদিকে সুখভোগ নীচ স্বাচ্ছন্দ্য— respectablityর আদর্শ মানুষকে ক্রীতদাস করছে। মন অবসন্ন হয় তবু বলে যেতে হবে— সত্যের সেবায় জীবনে মানুষ একদিন সত্য গ্রহণ করবে— এই আশায়। পার্শী সমাজের কাছে আমার বিশেষ কৃতজ্ঞতা জানাতে হবে এই জন্যে যে আমার সর্ব প্রচেষ্টায় তাঁরা প্রথম থেকে সাহায্য ও সহানুভূতি জানিয়ে এসেছেন— আজ তাই বলে আমি বিদায় নিই।'[৪৭] এক বৃদ্ধ পার্শি নেতা বললেন, যদিও রবীন্দ্রনাথ বলছেন তাঁর কণ্ঠ ক্ষীণ তবু দেখা যাচ্ছে একমাত্র তাঁরই কণ্ঠ আজ সারা পৃথিবীকে পূর্ণ করেছে। এশিয়ার তিনি সার্থক সন্তান— এই পুণ্যভূমিতে জরথ্রুস্ট্র একদিন শিক্ষা দিয়েছেন যে ধর্মের পথই মানুষের একমাত্র পথ। সেই চিরন্তন বাণীই আজ তাঁর মুখ দিয়ে এশিয়ার কাছ থেকে সারা বিশ্ব শুনছে— এই জন্য তাঁরা ধন্য।

অতঃপর মুসলিম সমাজভুক্ত বোম্বাইয়ের মহাজন করিমভাই ও তাঁর বন্ধুগণ তাঁদের বাড়িতে রবীন্দ্রনাথকে অভ্যর্থনা করে বললেন : 'মহাত্মন, আপনি দেশের মুখোজ্জ্বল করেছেন— হিন্দু-মুসলমান দলাদলির উপরে উঠে আপনি Fatherhood of One God ও brotherhood of Man— যা আমাদের মহাপুরুষ মহম্মদ প্রাণ দিয়ে প্রচার করেছেন, তাই আপনি সর্বত্র প্রচার করে মাতৃভূমিকে গৌরবান্বিত করেছেন।' এই বলে সহানুভূতির নিদর্শনস্বরূপ তিনি ৫০০ টাকা উপহার দেন। রবীন্দ্রনাথ ধন্যবাদ দিয়ে বলেন : 'আমি রাজনীতিক নই, নেতা নই, আমি মাত্র কবি। তাই সমস্ত দলের উপরে উঠে সকলের মধ্যে মৈত্রী স্থাপনই আমার ব্রত। আমার বাঁশীর মধ্যে দিয়ে এই মিলনমন্ত্র আমিও নিয়ে যাচ্ছি। মহাত্মা মহম্মদ তাঁর ডাক সকল মানুষকে দিয়েছেন। আমার কাছেও কোন জাতিবর্ণ নেই। আমার বিশ্বভারতীর মধ্যে দিয়ে আমি সকলকেই ডাকছি— এক অধ্যাত্মমিলনের সূত্রে যেন বিশ্বমানব এক হয়— এই কাজটি আমার শেষ কাজ। আপনাদের সহানুভূতি ও সৌহার্দ্য আমায় যে গভীর আনন্দ ও প্রেরণা দিয়েছে তার জন্যে আমি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।'[৪৮]

কালিদাস নাগ লিখেছেন, 29 May রাত্রি দশটায় তাঁরা সকলে মালপত্র নিয়ে 'সাংহাই মারু' নামক একটি জাপানি জাহাজে ওঠেন— পরদিন 30 May [শুক্র ১৬ জ্যৈষ্ঠ] সকালে চিনা-জাপানি-ভারতীয় বন্ধুরা তাঁদের বিদায় জানাতে এসেছিলেন। সকাল সাড়ে আটটায় জাহাজ ছাড়ল। ড সরোজমোহন মিত্র লিখেছেন : 'সাংহাই-এর জাপানী বস্ত্রশিল্পের প্রধান সাংহাই মারু নামে এক বিশেষ জাহাজে করে কবিকে বিনাব্যয়ে জাপানে পৌঁছে দিলেন।'[৪৯] এই তথ্যের কোনো সূত্র তিনি নির্দেশ করেননি। কালিদাস নাগ জানিয়েছেন : 'জাপানীরা খুব উৎসাহ করে নিয়ে যাচ্ছে, জাহাজে special বন্দোবস্ত। জাপান থেকে একজন ভদ্রলোক এসেছেন— বিভিন্ন সম্প্রদায় নিমন্ত্রণ পাঠিয়েছে। ১৫ দিনের basisএ programme তৈরি হল।'[৫০] নন্দলাল বসুর স্মৃতিচারণে প্রসঙ্গটির বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায় : 'কোবে-টেগোর-সোসাইটি নিমন্ত্রণ করে কবিকে ও আমাদের নিয়ে গেলেন। খরচ-খরচার সব ব্যবস্থা তাঁরাই করলেন। নিয়ে গেলেন সংবর্ধনা করবার জন্যে। সোসাইটির পাণ্ডা হলেন বড়ো একজন জাপানী মার্চেন্ট— সিন্দা কোম্পানীর মিৎসুভূষণ। বেশি টাকা তুলে দিয়েছিলেন ইনিই। কোবের ভারতীয় সদাগরেরাও অনেক কন্‌ট্রিবিউট্ করলেন। এঁদের একজন হলেন গুজরাটী মুসলমান— বড়ো কারবারী— নাম হলো কাদেরী খোজা। তিনিও টাকা দিয়েছিলেন অনেক। —এইভাবে ফাণ্ড সংগ্রহ করে ওঁরা আমাদের জাপানে নিয়ে গেলেন।'[৫১]

রবীন্দ্রনাথকে সদলবলে জাপানে নিয়ে যাওয়ার উদ্যোগের আর-একটি বর্ণনা পাওয়া যায় সুচন্দ্রা বসুর 'আমরা যেথায় মরি ঘুরে' [দ্র দেশ, বিনোদন ১৩৮৩। ২৫–৪৮]-শীর্ষক স্মৃতিচারণ-মূলক রচনাটিতে— জাপানে গিয়ে তিনি রবীন্দ্রনাথের দোভাষী টোমিকো ওয়াডা [কোরা]-র সাক্ষাৎকার নিয়েছিলেন, প্রধানত তারই বিবরণ এই রচনাটি, তবে স্মৃতিমূলক বলেই তারিখাদি নিঃসন্দেহে গ্রহণযোগ্য নয়। টোমিকোর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের প্রথম আলাপ হয় কারুইজাওয়া পাহাড়ে জাপান নারী বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থিনী ছাত্রী হিসেবে। তার পরেও 1920–21-এ আমেরিকায় উভয়ের সাক্ষাৎ হয়েছিল, তাঁদের মধ্যে চিঠিপত্রের আদানপ্রদানও চলত। তিনি বলেছেন, তিনিই রবীন্দ্রনাথকে জাপানে আসার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়ে তাঁর ভ্রমণকালীন খরচের অর্থ সংগ্রহের জন্য চেষ্টা শুরু করেন। নাম-করা কন্ট্রাক্টর তাঁর বাবার বিশেষ বন্ধু ছিলেন আসাহি কাগজের ম্যানেজার। এঁদের চেষ্টায় পত্রিকার মালিকেরা খরচের দায়িত্ব নেন। রবীন্দ্রনাথ জাপানে আসতে রাজি হলে মিস ওয়াডা 15 May তাঁকে লেখেন : 'I will come to Kobe to welcome you and introduce you to Mr. Murayama who has fought for nearly fifty years for liberal opinions and pacific co-operation of the oriental people and who is the president of Asahi Press in Tokyo and Osaka. He has most valued your acceptance of speaking for Osaka people, which he hopes will be on the earliest date after your arrival.'[৫২]

রবীন্দ্রনাথের জাপানে পৌঁছনো বিষয়ে সুচন্দ্রা বসু লিখেছেন :

যদিও কোবেতে ওঁর অভ্যর্থনা করার কথা ছিল— কিন্তু কোরা আগেই নাগাসাকী বন্দরে গুরুদেবের জাহাজ পৌঁছামাত্র দেখা করলেন গুরুদেবের সঙ্গে। গুরুদেবকে অনুরোধ জানালেন, নাগাসাকীতেই জাহাজ ছেড়ে নেমে পড়বার জন্য। নাগাসাকীতে হোটেলে গুরুদেবের থাকবার সমস্ত ব্যবস্থাই ওঁরা করে রেখেছিলেন। ওখানকার গভর্নর নিজে গাড়ি পাঠিয়েছিলেন গুরুদেবকে নিয়ে যাবার জন্য। কাজেই কোবের বদলে নাগাসাকীতেই গুরুদেবকে নামতে হোল। ···

নাগাসাকী হোটেলে পৌঁছলে গুরুদেবের সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানের ওঁরা ওখানেই আয়োজন করেন। বহু গণ্যমান্য অতিথি ও গভর্নর উপস্থিত ছিলেন। সবাই গুরুদেবের ভাষণ শুনে ও ওঁকে নিজেদের মধ্যে পেয়ে খুবই আনন্দিত। ···

নাগাসাকী থেকে গুরুদেব গেলেন হাকার্তাতে। শ্রীমতী কোরার সঙ্গে যোগ দিলেন সানোসান্। ··· অনেকে মিলে সদলবলে ওঁরা গুরুদেবের সঙ্গে গেলেন মীয়াজীমার বিখ্যাত জাপানী বাগান দেখতে। ···

মীয়াজীমা থেকে একটি ভাল ট্রেনে ওঁরা সবাই রওনা হলেন ওসাকার পথে। ··· ওসাকাতে পৌঁছে এক বিখ্যাত শিল্পী য়োকোয়ামার বোকো পাহাড়ের ধারে সুন্দর বাড়ি ছিল। য়োকোয়ামা সাদরে গুরুদেবকে আমন্ত্রণ জানান ওঁদের অতিথি হয়ে কিছুদিন থাকবার জন্য। ওসাকাতে গুরুদেব য়োকোয়ামার আতিথ্য গ্রহণ করেন।[৫৩]

কালিদাস নাগের ডায়ারিতে বা নন্দলাল বসুর স্মৃতিচারণে এর অধিকাংশ তথ্যের কোনো সমর্থন পাওয়া যায়নি।

জাপান অভিমুখে যাত্রা ও সেখানে পৌঁছনোর বর্ণনা আছে কালিদাস নাগের ডায়ারিতে : 31 May [শনি ১৭ জ্যৈষ্ঠ] 'সকাল থেকেই জাপানের দ্বীপপুঞ্জ দেখা দিল। ১০টা থেকে Nagasakiর আশপাশ— চমৎকার সবুজে ঢাকা পাহাড় দেখতে দেখতে ১১টায় নামা। Miss [Tomiko] Wada ও জাপানী Commercial Collegeএর Political Economyর অধ্যাপক এসে আমাদের [নাগাসাকিতে] নামিয়ে নিয়ে গেলেন। প্রোগ্রাম বদল— জিনিসপত্র চীনা বন্ধুদের সঙ্গে জাহাজে করে Kobe গেল আর আমরা দুখানা motor carএ বেরলাম। ···৩ ॥ টে নাগাদ যাত্রা এবং ৬ ॥ টায় শেষ Unzen Sulpher Springএ এসে স্নান'।[৫৪] রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত একটি আলোকচিত্রে য়ুনজেনের Kyushu Hotel-এ রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর চার সঙ্গীর সঙ্গে মিস্ ওয়াডাকেও দেখা

যায়। নন্দলাল বলেছেন, শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রমের প্রাক্তন শিক্ষক দারুশিল্পী ও জুজুৎসুবিদ্ সানো-সান জাহাজে উঠেই তাঁদের সঙ্গে মিলিত হন ও অধিকাংশ সময়ে তাঁদের সঙ্গী ছিলেন। তিনি তখন 'গোরা' উপন্যাস মূল বাংলা থেকে জাপানি ভাষায় অনুবাদ করছেন।'[৫৫]

কালিদাস নাগের বিবরণানুযায়ী, পরদিন 1 Jun সকালে তাঁরা গাড়িতে যাত্রা করে দুপুর দুটোয় Solalo স্টেশনে ও মেঘলা আবহাওয়ায় বিকেল পাঁচটায় Hakota-তে এসে পৌঁছন। তাঁরা একটি জাপানি হোটেলে ওঠেন। হোটেলের সাজসজ্জা ও নারীকর্মীদের সেবার বিবরণ দিয়ে কালিদাস নাগ লিখেছেন : 'জনকতক বর্ষীয়সী women worker দেখা করতে এলেন— এঁরা নারী, কুমারী, শিশু, মজুর মেয়ে, গণিকা, রুগ্ন স্বামীস্ত্রী সমস্যা প্রভৃতি নিয়ে সমাজসেবায় যে কাজ করছেন শুনে অবাক হতে হয়। ভারতের মেয়েরা কত পিছিয়ে আছে। গুরুদেব এদের সঙ্গে খানিক কথা বলতে নিমন্ত্রণ করলেন— এঁরা খুবই খুশী।' রবীন্দ্রভবনের চিত্রসংগ্রহে একটি আলোকচিত্রে দেখা যায়, রবীন্দ্রনাথ 1 Jun Hakota, Fukuoka Cityর অতিথিশালার মালিককে একটি কবিতিকা লিখে দিয়েছেন— 'এসেছিনু সাথে লয়ে আশা / চলে গেনু রেখে ভালোবাসা ॥'

1–2 Jun পথে আসার সময়ে তাঁর আবির্ভাবকাল ও বাংলার সাংস্কৃতিক জীবনে তাঁর ঐতিহাসিক ভূমিকা নিয়ে কালিদাস নাগ রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দীর্ঘ আলোচনা করেন [দ্র কবির সঙ্গে একশো দিন। ৬৭–৭০]— অত্যন্ত মূল্যবান সেই আলোচনা। তিনি জানিয়েছেন, 'রাত ৯ ॥ টায় মহামিছিলের মধ্যে Kobe পৌঁছান গেল।' স্থানীয় *Japan Chronicle* [4 Jun] সংবাদ দেয়, রবীন্দ্রনাথ সোমবার [2 Jun : ১৯ জ্যৈষ্ঠ] সন্ধ্যায় সেখানে পৌঁছলে ভারতীয় অভ্যর্থনা সমিতি স্বাগত জানিয়ে তাঁকে Kitanocho-তে এন. এফ. আবদুলালি-র বাড়িতে নিয়ে যান। রবীন্দ্রনাথ বলেন, তাঁর শিক্ষামূলক কাজের জন্যই তিনি এই স্বল্পকালীন ভ্রমণে এসেছেন। তিনি আশা করেন তাঁকে বক্তৃতা দেওয়ার জন্য পীড়াপীড়ি করা হবে না, যদিও পরের দিনই তাঁকে ওসাকায় একটি ভাষণ দিতে হবে এবং টোকিয়োতেও তাঁর কর্মসূচি তৈরি করা হচ্ছে। এগুলি তাড়াতাড়ি মিটে গেলেই ভালো। তাঁর ইচ্ছা, Horyuji প্রভৃতি যে জায়গাগুলি আগের যাত্রায় তাঁর দেখা হয়নি এবারে সেগুলি দেখতে চেষ্টা করবেন। কালিদাস নাগ 3 Jun-এর বিবরণে লিখেছেন, সেদিন তাঁরা ইন্ডিয়া ক্লাবে গিয়ে কোবে-র ভারতীয়দের সঙ্গে দেখা করে বিকেলে বিদ্যুৎচালিত ট্রামে চড়ে ওসাকা যাত্রা করেন।

Japan Chronicle [5 Jun] 3 Jun-এর ভাষণের বর্ণনা দিয়ে Dr. Tagore at Osaka/ An Enthusiastic Audience/ Poet's Contempt for "Rulers of Men" শিরোনামে লেখে, রবীন্দ্রনাথ মঙ্গলবার সন্ধ্যায় Nakanoshima Hall-এ একটি বক্তৃতা দেন। রাজকীয় বিবাহের ধুমধামের মধ্যেও হাজার হাজার মানুষ উক্ত হলে একটু স্থান সংগ্রহের আশায় জড়ো হন— অনেকে পিছনে দাঁড়িয়ে থাকেন ও বহু ব্যক্তি সামনে মাটিতে বসে বক্তৃতা শোনেন। 'ওসাকা আসাহি' পত্রিকার প্রধান সম্পাদক মি. তাকাহারা সভাপতিত্ব করেন ও মিস্ টোমিকো ওয়াডা দোভাষীর ভূমিকা নেন। রবীন্দ্রনাথের ভাষণটি 'To the People of Japan' নামে *The Modern Review* [Jan 1925/ 4–7]-তে মুদ্রিত হয়। এখানে এল্‌ম্‌হার্স্ট-কৃত অনুলেখনটিই ছাপা হয়েছে, রবীন্দ্রনাথ তার উপরে পরবর্তীকালে যে-সংশোধন করেন, সেটি রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত পাণ্ডুলিপিতেই আবদ্ধ আছে। জাপানবাসীর সমাদরের জন্য ধন্যবাদ জানিয়ে তিনি বলেন, ভারতের পক্ষ থেকে জাপানের দুর্দৈবে সহানুভূতি জানাবার জন্য তিনি এই দেশে এসেছেন, এ ছাড়া আর কোনো উদ্দেশ্য তাঁর নেই। তাঁর দুর্ভাগ্য, বিদেশে তাঁকে সবাই বক্তা বলে জানে, তিনি আদৌ যা নন— 'My mind only speaks through silence

and in solitude.... I always have lived the life of a recluse in order to dive deep into the depth of my being and to seek for the voice that lies hidden there.' রবীন্দ্রনাথের ভাষণের পরে ওসাকার বিদেশি ভাষা শিক্ষালয়ের একজন ছাত্র হিন্দিতে তাঁর উদ্দেশে একটি অভিনন্দনপত্র পাঠ করেন। 'The meeting closed with "Banzai" for Tagore.'

গত বৎসর আশ্বিন মাসে [১৩৩০] ও পরে আরও একবার প্রবল ভূমিকম্পে টোকিয়ো ও য়োকাহামা শহর-সহ বিস্তীর্ণ অঞ্চল ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়; আগেই বলা হয়েছে, রবীন্দ্রনাথকে সম্পাদক করে জাপানকে সাহায্য করার জন্য তখন বিশ্বভারতীতে একটি সাহায্যভাণ্ডার খোলা হয়েছিল। জাপানবাসীও তাঁদের সমস্ত উদ্যম কাজে লাগিয়ে পুনর্গঠনে ব্রতী হন, যে-কাজ তখনও চলছিল এবং যা দেখে রবীন্দ্রনাথ খুবই মুগ্ধ হন। এর পরের আঘাত আসে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের কাছ থেকে। দ্রুত জনসংখ্যাবৃদ্ধির জন্য জাপানিরা বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়ছিলেন, আমেরিকাতেও তাঁরা গিয়েছিলেন বিপুল হারে, এশিয়ার অন্যান্য দেশ থেকেও অনেকে সেখানে গিয়ে বসতি স্থাপন করেন। এই স্রোত রুদ্ধ করার উদ্দেশ্যে মার্কিন সরকার বিভিন্ন ব্যবস্থা অবলম্বন করছিল, রবীন্দ্রনাথ জাপানে আসার কয়েকদিন আগে National Origins Act বিধিবদ্ধ হয় বিশেষভাবে এশীয়দের আগমনে বাধা দেবার জন্য। রবীন্দ্রনাথ তাঁর ভাষণে দুটি ঘটনাই সহানুভূতির সঙ্গে উল্লেখ করেন। শেষোক্ত ঘটনাটির জন্য তখন জাপানিরা আমেরিকার উপর অত্যন্ত ক্রুদ্ধ। রবীন্দ্রনাথ এই মনোভাবের জন্য ন্যাশনালিজম্‌কে দায়ি করে বলেন : 'I have come to warn you in Japan — the country where I wrote my first lectures against Nationalism at a time when people laughed my ideas to scorn. They thought that I did not know the meaning of the word, and accused me of having confused the word Nation with State. But I stuck to my conviction, and now after the war do you not hear everywhere the denunciation of this spirit of the Nation, this collective egoism of the people, which is universally hardening the hearts?' তিনি বললেন, তিনি আবার এই দেশে এসেছেন সেই কথা স্মরণ করিয়ে দিতে। তাঁর আশা, তিনি নিশ্চয়ই কিছু ব্যক্তির সাক্ষাৎ পাবেন যাঁদের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ গড়ার সাহস আছে। জাপান তার সত্যকার বোধ লাভ করুক যা কেবল অন্যের অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা পায় না, একটি নিজের জগৎও সৃষ্টি করতে পারে যা সমগ্র মানবতার প্রতি সদয় মনোভাব প্রকাশে সক্ষম। এশিয়াবাসীরা আপনাদের মহত্ত্বে গর্বিত হোক, যা শত্রুকে ভৃত্যে পরিণত করা বা নিজের ভোগের জন্য সংগৃহীত সম্পদের কারণে নয়— 'wealth which is not accepted by men for all time and is rejected by God.'

[জাপানে রবীন্দ্রনাথ অনেকগুলি বক্তৃতা করেন, যার মধ্যে কয়েকটি মডার্ন রিভিয়্যু ও বিশ্বভারতী কোয়ার্টার্লি-তে ছাপা হয়েছিল— যার মধ্যে মাত্র একটি ['International Relations'] নমুনা হিসেবে *Lectures and Addresses* [1928] গ্রন্থে সংকলিত হয়, অন্যান্যগুলি এতাবৎকাল কোনো বইতে ছাপা হয়নি। *Talks in China*-র মতো *Talks in Japan* গ্রন্থও যে বিশ্বভারতী থেকে ছাপানোর ব্যবস্থা হচ্ছিল, তার হদিশ পাওয়া যায় 7 Jun 1925 তারিখে প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশকে লেখা রবীন্দ্রনাথের চিঠিতে : DTalks in Japan কি অবস্থায়?'[৫৬] 15 Jun তিনি আবার তাঁর কাছেই বইটির প্রসঙ্গ উত্থাপন করেন। শেষপর্যন্ত গ্রন্থটি প্রকাশিত না

হলেও এর আয়োজন যে অনেকটাই এগিয়েছিল, তার প্রমাণ সম্প্রতি রবীন্দ্রভবনে পাওয়া গেছে এল্‌ম্‌হার্স্ট-অনুলিখিত ও রবীন্দ্রনাথ-সংশোধিত আটটি ভাষণের পাণ্ডুলিপি ও তাদের অনেকগুলির টাইপ-করা প্রতিলিপির সন্ধান পেয়ে। আশা করা যেতে পারে, পত্রিকায় মুদ্রিত ও পাণ্ডুলিপি থেকে সংগৃহীত এই ভাষণমালা শীঘ্রই পুস্তকাকারে সংকলিত হবে।]

কালিদাস নাগের ডায়ারি অনুসারে সকাল সাড়ে ন'টায় সকলে কোবে ত্যাগ করে দুপুর সাড়ে বারোটায় নারা শহরে পৌঁছন। 5 Jun [বৃহ ২২ জ্যৈষ্ঠ] সকালে তাঁরা একজন বৌদ্ধ পণ্ডিত Nagayamaর বন্ধুর বাড়ি tea ceremony-তে যোগ দেন। কালিদাস নাগ অনুষ্ঠানটির বিস্তৃত বর্ণনা দিয়েছেন— রবীন্দ্রনাথ 'জাপানযাত্রী' গ্রন্থেও এইরূপ একটি উৎসবের খুঁটিনাটি উল্লেখ করেছিলেন।

5 Jun [বৃহ ২২ জ্যৈষ্ঠ] রবীন্দ্রনাথ ওসাকায় মেয়েদের দুটি সভায় ভাষণ দেন। কালিদাস নাগ ডায়ারিতে লিখেছেন : 'বিকালে জাপানী মেয়েদের অভিভাষণ দিলেন কবি। পরে সকলে Mr. N.এর laboratory, beauty saloon, Woman's Welfare League দেখে Ladies Associationএ বক্তৃতা দিতে এলুম। কবি বললেন— শিব-পার্বতীর রূপক— আমি future of modern womenএর উপর'। রবীন্দ্রনাথ-কর্তৃক সংশোধিত এল্‌ম্‌হার্স্টের হাতের লেখায় ও টাইপ কপিতে এই দুটি ভাষণ পাণ্ডুলিপির আকারে পাওয়া যায়। '5 Jun Osaka/ Address to Women' শিরোনামের পাণ্ডুলিপিতে এল্‌ম্‌হার্স্টের মন্তব্য রয়েছে : 'a very keen & appreciative audience of working women & teachers'. রবীন্দ্রনাথ এই ভাষণে বলেন, শ্রোত্রীদের আগ্রহী মুখগুলি দেখে 1916-এর জাপান ভ্রমণের সময়ে নারী বিশ্ববিদ্যালয়ে অভ্যর্থনার ও কারুইজাওয়া পাহাড়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন ছাত্রীর সঙ্গে কাটানো দিনগুলির স্মৃতি তাঁর মনে পড়ে গেল। বক্তৃতাটির বৃহদংশ সেই মধুর স্মৃতিরই রোমন্থন ও জাপানি নারীচরিত্রের বিশ্লেষণে পূর্ণ। পরিশেষে তিনি বললেন, জাপানি পুরুষ যখন বস্তুর সাধনায় জীবনের মহৎ আদর্শগুলি থেকে মুখ ফিরিয়েছে, তখন মেয়েদেরই দায়িত্ব সেগুলিকে রক্ষা করা। 'As language flows from generation to generation through the life and the lips of the mother, the spirit of beauty and goodness and the spirit of the heroism and gentleness can only flow to generations through the hearts of women, the source of that simplicity which is the best cradle of truth, and love which knows how to win fulfilment from sufferings and life from death.'

Ladies Association-এর সভায় রবীন্দ্রনাথ কৌতুক করে বললেন, এই সভায় তাঁর কাছ থেকে যেন কোনো ভাষণ আশা না করা হয়। কারণ, বিকেলের সভাতে অনেক মেয়ে দেখে তিনি ভেবেছিলেন সেই সভাতে ভাষণ দেওয়ার জন্যই তাঁকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে— তাই মেয়েদের উদ্দেশে যা বলবেন ভেবে এসেছিলেন, তার সবই সেখানে বলে দিয়েছেন। তার পুনরাবৃত্তি করাতে তাঁর আগ্রহ নেই— কারণ বৃদ্ধসুলভ বাক্যবাগীশ অভিধা তিনি পেতে চান না। অতঃপর কুমারসম্ভব-এর কাহিনীটি সংক্ষেপে বিবৃত করে তিনি বলেন, এই কাহিনীর মধ্যে আমাদের ও সমস্ত নারীদের জন্য একটি চিরন্তন উপদেশ আছে। 'It is the mission of women through the purity of her life and the devotion of her love to win the Divine spirit of goodness and then only can the world be saved. But when she seeks her

power in her physical fascination she lowers herself and is rejected by the God Siva. Then the union of reality with goodness is left unaccomplished and the world remain in the power of the evil one.'

7 Jun [শনি ২৪ জ্যৈষ্ঠ] সকাল ন'টার ট্রেনে কোবে ত্যাগ করে সকলে রাত ন'টায় টোকিয়ো পৌঁছন। ওয়ালা বলেছেন : 'ওসাকা থেকে ট্রেনে টোকিও যাবার পথে একটি প্রাচীন ধর্মীয় শহর পড়ে, নাম ওকায়ামা। ··· পথে সেই ওকায়ামা স্টেশনে কয়েকজন বৌদ্ধ সন্ন্যাসী গুরুদেবকে দেখতে ও ওঁদের শ্রদ্ধাঞ্জলি দিতে আসেন। গুরুদেব খুবই বিহ্বল ও মুগ্ধ হয়েছিলেন ওই বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের দেখে। ওঁর মনে হয়েছিল— এতদিনে জাপানের ঐতিহ্যময় অন্তরটিকে গুরুদেব যেন এঁদের মধ্যে দিয়ে অনুভব করলেন।' য়োকোহামা স্টেশনে ট্রেনে উঠে অনেকে রবীন্দ্রনাথের সহযাত্রী হন। কালিদাস নাগ লিখেছেন, তাঁদের মধ্যে বিখ্যাত জাপানি কবি Yone Noguchi [1875–1947] ছিলেন। নন্দলাল বসু বলেন, জাপান-প্রবাসী বাঙালি বিপ্লবী রাসবিহারী বসুর [1885–1945] সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ট্রেনেতেই 'গভীরভাবে' আলোচনা করেন।[৫৭]

টোকিয়ো স্টেশনে এক বিরাট জনতা তাঁকে স্বাগত জানান, 'উৎসাহের চোটে মানুষরা কবিকে প্রায় পিষে মারে আর কি। এমন ovation রাজাও পায়না।' পূর্বপরিচিত শিল্পী কাম্পো আরাই ও সামামুরা খানজাম তাঁদের অভ্যর্থনা করেন। নন্দলাল বলেছেন : 'টোকিওতে নামবার পরে প্রেস-রিপোর্টাররা গুরুদেবকে আগ্রহভরে দেখতে দেখতে আর জিজ্ঞাসাবাদ করতে করতে ঠেলে ঠেলে নিয়ে চলে গেল অনেক দূর পর্যন্ত। এলম্‌হার্স্ট তাড়াতাড়ি গিয়ে ভিড়ের চাপ থেকে উদ্ধার করে নিয়ে এলেন তাঁকে যথাস্থানে। ··· জাপানী মার্চেন্ট মিৎসুভূষণের গ্রামের বাড়ি ছিল টোকিওর কাছাকাছি। তিনিই প্রধান উদ্যোক্তা হয়ে নিয়ে গেলেন আমাদের তাঁর গ্রামের বাড়িতে। ··· গুরুদেব ওখানে পৌঁছবার আগেই সেখানে পৌঁছে গেছেন রাসবিহারী বসু। তিনি ওখানে গুরুদেবকে অভ্যর্থনা করলেন মালাচন্দন দিয়ে।'[৫৮]

এখানেও সমীর রায়চৌধুরী-অনূদিত *Japan Advertiser* [8 Jun] পত্রিকার বর্ণনাটি ভিন্নতর :

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর গতকাল রাতে টোকিও এসে পৌঁছেছেন। কোবে থেকে ট্রেন যখন টোকিওতে পৌঁছয় তখন স্টেশনে ছিল দর্শনেচ্ছু মানুষের ভীড়। সবাই উঁকিঝুঁকি দিয়ে এই জনপ্রিয় কবি ও দার্শনিককে একবার দেখে নেবার চেষ্টা করছেন। ট্রেনের দরজার সামনে ধাক্কাধাক্কি করছেন হিন্দুস্তানী এসোসিয়েশনের সভ্য, কিছু বিদেশি এবং কিছু জাপানিরা। ··· হিন্দুস্তানী এসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট মিঃ আর. বি. বোস ট্রেনের দরজা খুলে জনতার দিকে হাত নাড়লেন। সঙ্গে সঙ্গে আওয়াজ উঠল বানজাই, বানজাই। মিঃ বোস ট্রেন থেকে নামলেন, তাঁর ঠিক পিছনেই ছিলেন বৃদ্ধ দার্শনিক, ডঃ টেগোরের দীর্ঘ দেহ দেখা দিল দরজা জুড়ে। তাঁর দীর্ঘ চুল খেলা করছিল কাঁধের কাছে। ··· একবার তিনি ভালো করে দেখলেন জনতার দিকে। হাতদুটো জোড়া হয়ে এলো বুকের কাছে। ···

তিনি নামলেন প্লাটফর্মে। লোকজন ঘিরে ধরেছে। গলদঘর্ম হচ্ছে পুলিশ। এরপর ধীরে ধীরে এগিয়ে চললেন ডঃ টেগোর। বারেবারেই তাঁকে থামতে হল সংবাদদাতা, ফটোগ্রাফার এবং অনুরাগীদের উৎপাতে। ··· ডঃ টেগোর গাড়িতে উঠে হাত নাড়লেন। আবার আওয়াজ উঠলো বানজাই। গাড়ি চলতে শুরু করল মিঃ তাজিমার বাড়ি ১০নং নাকা মেগুরুবোর দিকে। ···

আর. বি. বোস এবং কে. আর সাবরওয়াল, হিন্দুস্থানী এসোসিয়েশনের সেক্রেটারি কোজু স্টেশনে গিয়ে ডঃ টেগোরের সঙ্গে ঐ ট্রেনেই এসেছিলেন। অভ্যর্থনা সমিতির মধ্যে যাঁরা ছিলেন তাঁরা হলেন যথাক্রমে সর্বশ্রী এম. এম. উইরামরত্ন, জে. এ. লরেন্স, বি. ববি এবং ডব্লিউ পি. সমরশেখর।[৫৯]

কালিদাস নাগও গৃহকর্তার নাম করেছেন Mr. Tajima। তিনি ডায়ারিতে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আলোচনার যে বর্ণনা লিখে রেখেছেন তা অত্যন্ত মূল্যবান [দ্র কবির সঙ্গে একশো দিন। ৭৫–৭৭], তার থেকে শুধু মাইকেল মধুসূদন সম্পর্কে তাঁর মূল্যায়নটি উদ্ধার করছি : "মাইকেল creative genius নন। তিনি হলেন

eclectic— 'মধুকর'। Homer, Virgil, Milton, Byron অবধি কেউ বাদ যায়নি। তিনি মধু সংগ্রহ করে গেছেন তাতে সত্যেনের মত ভাষাকে সৃষ্টি করেছেন। 'দিলা' 'গেলা' প্রভৃতি form এনেছেন কিন্তু সত্যি সৃষ্টি কিছু রেখে যাননি। দেশ 'মেঘনাদ' নিলেনা— 'বীরাঙ্গনা', 'ব্রজাঙ্গনা'ও artificial, eclectic।"

তিনি লিখেছেন, 8 Jun [রবি ২৫ জ্যৈষ্ঠ] তাঁরা টোকিয়োর ইম্পিরিয়াল হোটেলে উঠে যান [নন্দলাল ওঠেন কাম্পো আরাইয়ের বাড়িতে]। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে ডেন্টাল হসপিটাল দেখে বিকেলে জাপানের সর্বশ্রেষ্ঠ চিত্রশিল্পী টাইকানের বাড়ি যাওয়া হল। টাইকান তাঁর আঁকা এক আশ্চর্য ছবি 'এক বিন্দু জলের ইতিহাস' তাঁদের দেখালেন— কালিদাস নাগের ভাষায়, 'কবি ও আমরা স্তব্ধ হয়ে দেখে মোহিত হয়ে এলাম।'

9 Jun [সোম ২৬ জ্যৈষ্ঠ] সকালে কাম্পো আরাই-এর বাড়িতে সকলের নিমন্ত্রণ ছিল। সেখান থেকে তাঁরা ইম্পিরিয়াল য়ুনিভার্সিটিতে এলেন রবীন্দ্রনাথের বক্তৃতার জন্য। 'Tagore Champions Oriental Culture/ Indian Philosopher Makes First Public Address At Tokyo Imperial University' শিরোনামে *Japan Advertiser* [11 Jun] অনুষ্ঠানটি বিবরণ দেয় :

Dr. Rabindranath Tagore emphasized the necessity of Japan championing Oriental culture and civilization as distinct from those of the West in an address delivered at Tokyo Imperial University yesterday noon. It was the first public appearance of the Indian poet-philosopher-educator since his arrival in this city from Kobe Saturday evening.

Following the lecture, Dr. Tagore was invited to a tea at the University social room in the University compund. Thousands of students followed him to the front of the club house. At the top of the steps the venerable philosopher again made a short speech to the eager students and bade them farewell.

রবীন্দ্রনাথের ভাষণের সংশোধিত অনুলিখন রবীন্দ্রভবনে 'Imperial University Tokyo, June 9. 1924' স্থান-কাল চিহ্নিত দুটি ভাষণের পাণ্ডুলিপিতে রক্ষিত আছে— তাদের মধ্যে একটিতে লেখা : intro[duction] to the lecture'— আমাদের অনুমান, উক্ত উদ্ধৃতিতে ছাত্রদের উদ্দেশে যে-সংক্ষিপ্ত বক্তৃতাটির উল্লেখ করা হয়েছে, এটি তারই অনুলিখন। এই ভাষণে রবীন্দ্রনাথ কোন্ লক্ষ্য সামনে রেখে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তার বর্ণনা আছে। তিনি তিনটি উদ্দেশ্যের কথা উল্লেখ করে বলেন, এদের মধ্যে প্রথমটি হল তিনি এমন একটি বিদ্যালয় তৈরি করতে চান যেখানে ছাত্ররা শিক্ষার ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করবে। দ্বিতীয়টি হল, তিনি এশিয়ার বিভিন্ন স্থানে বিক্ষিপ্ত সংস্কৃতিগুলিকে একটি জায়গায় সমন্বিত করে তাদের অন্তর্নিহিত প্রকৃতিটি বোঝবার চেষ্টা করবেন। এই উদ্দেশ্য নিয়েই তিনি সীমিত সামর্থ্য সত্ত্বেও প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের শ্রেষ্ঠ পণ্ডিতদের সেখানে আনবার প্রয়াস করেছেন।

আরও একটি উদ্দেশ্য তাঁর মনে ছিল। তাঁর মনে হচ্ছিল, না জেনে সমগ্র পৃথিবী আত্মহত্যার পথে এগিয়ে চলেছে, কারণ 'Present day civilisation has given rise to an unnatural congestion of life in cities where the life of the people is dranined into one lurid spot whilst the rest of the country is impoverished. Organisation of power and wealth to-day is not adding to the real wealth and

life of the country is depleting from the vast bulk of the resources of the whole people.... Only a century or two ago it became possible to give rise to big organisations which needed victims for their sacrifice. They have brought the wealth of homes for a sacrifice to the machine of concentrated wealth, and the effect is everywhere becoming evident' অর্থাৎ প্রকারান্তরে নাম না করে তিনি 'মুক্তধারা' ও 'রক্তকরবী' নাটক দুটির মর্মকথা ব্যক্ত করলেন। এর প্রতিকারের জন্যই তিনি সুরুলে পল্লীপুনর্গঠন কেন্দ্রটি স্থাপন করেছেন। 'We want a living stream of happy life and to flood the chasm of that dry bed cheerless and unhealthy, dull and dismal. We want once again our rural art, our literature, drama and song, all that went to make our village heart glad and active and for that I have started my work and I want you in China and Japan to help us to make the people live once again, to have their full measure of joy.' তাঁর বন্ধু এল্‌ম্‌হার্স্ট সেখানকার কাজ সম্বন্ধে আরও ভালো করে বোঝাতে পারেন। তিনি শ্রোতাদের বললেন, তাঁকে ও তাঁর কয়েকজন ছাত্রকে যদি জাপানিরা আমন্ত্রণ করে নিয়ে আসতে পারেন তা হলে তাঁরা একত্রে কাজ করে অনেক সমস্যার সমাধান করতে পারবেন।

ইম্পিরিয়াল য়ুনিভার্সিটিতে প্রদত্ত মূল বক্তৃতাটি আনুষ্ঠানিক হলেও প্রধানত ছাত্রদের উদ্দেশ করেই বলা। তিনি বলেন, জাপানে আসার অনেক আগে তিনি এই দেশের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন এখানকার একজন শ্রেষ্ঠ আদর্শবাদী মহান ব্যক্তি ওকাকুরা কাকুজো-র সঙ্গে পরিচিত হয়ে। তিনি এই শতাব্দীর শুরুতে ভারতে গিয়ে কিছুদিন তাঁদের বাড়িতে ছিলেন। তাঁরই উদ্যোগে কয়েকজন জাপানি শিল্পী ভারতে দীর্ঘকাল তাঁদের কাছে থাকেন, যাঁদের মধ্যে আধুনিক জাপানের অন্যতম প্রধান শিল্পী য়োকোয়ামা টাইকান একজন। অনেকটা তাঁরই প্রভাবে অবনীন্দ্রনাথের নেতৃত্বে নব্যবঙ্গ শিল্পরীতির উদ্ভব হয়েছিল। তখন থেকেই জাপানের সঙ্গে তিনি একধরনের আত্মীয়তা অনুভব করেছেন, তার আনন্দ ও দুঃখের অংশীদার হয়েছেন।

প্রাচ্যের আদর্শ সম্পর্কে তাঁর বিশ্বাস আছে ও তিনি চান সকলেই তা উপলব্ধি করুক। এশিয়ার সব দেশের মধ্যে একমাত্র জাপানই পূর্ণ জাগ্রত হয়েছে এবং সেইজন্যই তার কাছে তাঁর প্রত্যাশা অনেক বেশি। জাপান সবচেয়ে ধনী বা শক্তিমান হবে তাঁর আকাঙ্ক্ষা তার জন্য নয়, তার মাধ্যমে প্রাচ্যের বাণী সর্বত্র শোনা যাবে প্রত্যাশা সেই কারণে।

জাপানের উপরে বাইরে থেকে কোনো আঘাত এলে বা কোনো প্রাকৃতিক দুর্যোগে জাপান ক্ষতিগ্রস্ত হলে তিনি বেদনা পেয়েছেন, কিন্তু সর্বাপেক্ষা দুঃখিত হয়েছেন জাপান নিজেই যখন কোনো অন্যায় করে তার ভাবমূর্তিকে কালিমাময় করেছে [এখানে রবীন্দ্রনাথ স্পষ্ট করে বলেননি চিন ও কোরিয়ার প্রতি তার গর্হিত আচরণ তাঁর বক্তব্যের লক্ষ্য ছিল, কিন্তু অন্যত্র তিনি নিজের মনোভাব গোপন করেননি]। এশিয়ার আদর্শটি কী সেই বিষয়ে তিনি বলেছেন : 'I believe that through all the vicissitudes of history our mind has still kept its faith in moral and spiritual perfection and not merely in external success.' এরপরে তিনি একটি ঐতিহাসিক ও একটি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার বিবরণ দিয়ে তাঁর বক্তব্যটি বোঝাতে চেষ্টা করেছেন। পরিশেষে তিনি বললেন :

This is a spirit which we possess in various ways in the East, where men will rather die than violate their code of honour which they hold as sacred. This same spirit, this idealism I claim of you, by the name of Asia; by it all your conduct will be judged. If you merely echo sentiments that are borrowed from the West that is no cause for rejoicing. Let us expect from each other not grasping, not to be cruel and vulgar but to rise up above the circumstances of life, to hold up the dignity of the East, the dignity of soul even at the cost of profit, even to the point of death.

রবীন্দ্রনাথের দোভাষী টোমিকো ওয়াডা একটি স্মৃতিচারণে বলেন, রবীন্দ্রনাথ এইদিন তাঁর গৃহস্বামী মি. তাজিমা-কে রেশমি কাপড়ের উপর জাপানি তুলি দিয়ে 'ও অকূলের কূল' গানের কয়েকটি ছত্র লিখে দেন।[৬০]

কালিদাস নাগ রবীন্দ্রনাথের 10 Jun [মঙ্গল ২৭ জ্যৈষ্ঠ] তারিখের কার্যাবলির বিবরণ দিয়েছেন : 'বিকালে মেয়েদের meetingএ যাওয়া (১) National Women's Association (Mrs. Kaneko) এবং (২) Buddhist Young Women's Association (Mrs. Siodome Nobuko) : এঁরা কবিকে অভিনন্দন দিলেন। কবিও সুন্দর অভিভাষণ দিয়ে পরে Women's Universityতে এসে মেয়েদের হাতের রান্না পরিবেষণ খেয়ে তাঁদের বক্তৃতা সেরে বাসায় ফেরা।'

নারী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষণটির সংশোধিত অনুলিপি রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত আছে। রবীন্দ্রনাথ এখানে বলেন, বহু যুগ আগে ভারতবর্ষ তার আত্মমুক্তির ['self-emancipation'] আহ্বান নিয়ে চিনে এসেছিল ও সেই পথ ধরেই সেখানকার শ্রেষ্ঠ চিন্তাগুলি কোরিয়া হয়ে জাপানে এসে পৌঁছয়। পথটি এখনও রুদ্ধ হয়নি, তাই ভারতের এক কবি সেই একই বাণী বহন করে আজ এখানে আসতে পেরেছে। অবশ্য তার পরে বিজ্ঞানের সাহায্যে আরও পথ খোলা হয়েছে যাদের সাহায্যে বণিক, সৈন্যসামন্ত ও কৌতূহলী ভ্রমণার্থীরাও যাতায়াত করতে পারছে। কবিদের জন্য কোনো পথ খোলা হয়েছে কিনা তাঁর জানা নেই, কিন্তু অতীতের যে পথের কথা তিনি বলেছেন সেই পথে তাদের আসাযাওয়ার বাধা ছিল না, আর সেই অতীত দিনের স্মৃতি মনে করেই তিনি এখানে এসে দাঁড়াবার সাহস পেয়েছেন। পূর্বে আগত বৌদ্ধ শ্রমণেরা নিজেদের ভিক্ষু বা ভিখারি বলে অভিহিত করতেন, তিনি নিজেকে তাঁদের বংশধর বলে মনে করেন, '...come to beg for the wealth of your heart. For myself I have tried my best not merely through my muse but through some institution to give expression to this idea which once upon a time did spring from India, the idea of *Maitri,* sympathy for all beings, races and creatures. I have come to ask you as a Bhikshu to help me in building this abode of peace, for it has to be the creation of different races.'

11 Jun [বুধ ২৮ জ্যৈষ্ঠ] 'সকালে Dr. Jakakusu & Dr. Anesakeর সঙ্গে মিলে কবির কাছে বিশ্বভারতী প্রসঙ্গ হল। তারা খুব উৎসাহী, কিছু করতে পারে ফরাসী বন্ধুদের সঙ্গে। ··· Industrial Club meeting, এরপর dinnerএ যোগ দেওয়া— Viscount Shibusawa বেশ tribute দিলেন কবিকে।'

ইন্ডাস্ট্রিয়াল ক্লাবে রবীন্দ্রনাথ যে-ভাষণটি দিলেন, সেটি 'International Relations' নামে *Visva-Bharati Quarterly*, Jan 1925/ 307–16 [দ্র *Lectures and Addresses* [1928], *EWRT* 3/ 470–76]-তে মুদ্রিত হয়, এর বঙ্গানুবাদ 'জাতি ও জনসাধারণ' [দ্র প্রবাসী, বৈশাখ ১৩৩২। ৮৪–৮৫] শিরোনামে ছাপা হয়েছে। ভাষণটির রবীন্দ্রনাথ-সংশোধিত অনুলিপি রবীন্দ্রভবনে আছে।

তিনি প্রথমেই ভূমিকম্পজনিত দুর্দৈবের জন্য জাপানকে ভারতীয়দের সমবেদনা জানালেন— যাঁরা দেশত্যাগের প্রাক্কালে তাঁকে বিদায়-সংবর্ধনা জানানোর জন্য একটি সভায় সমবেত হন, তাঁরাই এই অনুরোধ তাঁকে করেছিলেন— 'They also requested me to ask you to rise above circumstances, favourable or unfavourable, and to prove the dignity of Eastern mind. They are all waiting to see a great Renaissance in Asia through Japan, where life is at its floodtide, and they wish she would wake up to the great responsibility she has, not only to her own people, but to the great continent to which she belongs.' জাপানে এসে তিনি নিজের চোখেই দেখেছেন কী সাহস ও সংকল্পের সঙ্গে জাপানিরা সেই দুর্ঘটনার মোকাবিলা করছেন। কিন্তু এর পরেই অন্য এক জাতির কাছ থেকে তাঁরা যে তীব্র আত্মিক আঘাত পেয়েছেন [অর্থাৎ আমেরিকায় জাপানিদের প্রবেশাধিকার-সম্পর্কিত নিষেধাজ্ঞা], সেই প্রসঙ্গে তাঁর আশা, 'to see among your people at this time of crisis is the same dignity of calm and patient fortitude.'

রবীন্দ্রনাথ বললেন, কিন্তু এ কথা মানতেই হবে জাপানও অন্যদর ক্ষেত্রে একই অপরাধে দোষী। 'I have a deep love and respect for you as a people, but when as a nation you have your dealings with other nations you also can be deceptive, cruel and efficient in handling those methods in which the Western nations show such mastery.' এর পরে নেশনের উদ্ভব, বিকাশ ও পরিণতি বিশ্লেষণ করে আমেরিকা ও জাপানের এই মনোভাবের জন্য তিনি ন্যাশনালিজ্‌ম্‌কেই দায়ি করেন।

কালিদাস নাগ লিখেছেন, 12 Jun 'সকালে ফরাসী কবি Paul Claudel [1868–1955]এর সঙ্গে কবির কাছে আলাপ হল। পরে Pan Pacific Clubএ বক্তৃতা জমান গেল। ··· বিকালে Viscount Shibusawa বাগানবাড়ীর মধ্যে জনকতক গণ্যমান্য লোকের কাছে গভীর প্রসঙ্গ হল ও বিশ্বভারতীর আদর্শ কবি দেখালেন।'

কোবের *The Herald* [13 Jun] পত্রিকা জানিয়েছে : 'Dr. Rabindranath Tagore addressed a special meeting of the Pan-Pacific Club at a tiffin in the Imperial Hotel, Tokio, yesterday.' এল্‌ম্‌হার্স্টের অনুলিখনে 'June 12, 1924' তারিখচিহ্নিত 'To Japanese Artists' নামে একটি ভাষণ রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত আছে। মনে হয়, এই ভাষণটি প্যান-প্যাসিফিক ক্লাবে প্রদত্ত হয়ে থাকতে পারে— কিন্তু বিশেষভাবে শিল্পীদের উদ্দেশে কথিত বলে আমরা খুব-একটা নিশ্চিত নই।

ভাষণটি রবীন্দ্রনাথ আরম্ভ করলেন এই বলে : 'My line of work has been on a different plane to yours, but since I am an artist in words I would like to speak of what I have observed of your life and of the probable influences which seem to be working in your life in Japan, influences which are different from those of any other country.' তাঁর মনে হয়েছে জাপানের মানুষ সর্বদাই

প্রকৃতির চাঞ্চল্যের মধ্যে বাস করেন, পক্ষান্তরে ভারতের প্রকৃতি প্রধানত সমতল ভূভাগে বিস্তৃত, গতিচাঞ্চল্য সেখানে তেমনভাবে অনুভূত হয় না। তাই আমরা সেখানে প্রকৃতির অচঞ্চল নীরব বিস্তারের মধ্যে বাস করে ধ্যান ও অন্তর্দৃষ্টিকেই মুখ্য করেছি। প্রকৃতির এই বৈচিত্র্য উভয় দেশের চিত্ররীতিতে পার্থক্য রচনা করেছে।

তাঁর দৃষ্টিতে জাপানি চিত্রকলা এক অদ্ভুত বৈশিষ্ট্যের নিদর্শন। এখানকার প্রকৃতিতে বৈচিত্র্য ও চাঞ্চল্য থাকলেও সর্বশ্রেণীর জাপানিদের চরিত্রে সংযমেরই প্রাধান্য। তাই,

> Just when your feeling is strongest, when I must expect an outburst of movement and passion, just then I find it suddenly comes to an end and leaves the rest to suggestion. That is the great strength and character of your art, the selfcontrol of creative genius which through space and emptiness gives the greatest amount of wealth. So in your great works of art, in Taikwan San's pictures you are not afraid of leaving great spaces which are not merely negative. This space speaks to your mind, it has a voice. It is not silence but music itself. When space is suggestive of form, the contrast makes space itself send out its voice into the heart of man. Such space is never emptiness.

কিন্তু অন্যদেশের ছবিতে খালি জায়গা নিতান্তই শূন্যতা, সেইজন্য শিল্পীরা সেই ফাঁকা জায়গা আকারের ভিড় দিয়ে ভরে দিতে চান। তাঁরা সৌন্দর্যকে মেয়েলি বলে মনে করেন, পৌরুষের বিপরীত। সেইজন্য রঙ, ছন্দ ও সংগীত বর্জন করে বীভৎসতার চর্চায় তাঁরা মগ্ন। আর আধুনিক ভারতের দুর্ভাগ্য সেখানকার শিল্পীরা এই পৌরুষের অনুকরণকেই আদর্শ করেছেন এবং 'we have begun to prefer language that is rude, dress that is rough and devoid of beauty, that is monotonously ugly.' তাঁদের ধারণা, এর মাধ্যমেই তাঁরা পৌরুষ অর্জন করবেন। এইখানেই জাপানের কাছে ভারতের শিক্ষালাভের প্রয়োজনীয়তা আছে। রবীন্দ্রনাথ নিজে একজন কবি ও সৌন্দর্যের পূজারী, আর তিনি যখন দেখেন জাপানের সব লোকেরাই সুন্দরের সাধক ও তাঁদের বীরতা সৌন্দর্যে মণ্ডিত, তখন জাপানবাসীদের জন্য শ্রদ্ধায় তাঁর অন্তর আপ্লুত হয়ে ওঠে। 'You have been able to appreciate the beauty of a flower as well as the beauty of death itself through great sacrifice. There is no real difference in these two, but no other nation has realised it.'

কালিদাস নাগ ভিসকাউন্ট শিবুসাওয়ার বাগানবাড়িতে বিশ্বভারতীর আদর্শ নিয়ে রবীন্দ্রনাথের একটি আলোচনার কথা উল্লেখ করেছেন। মডার্ন রিভিয়্যু-র May 1925 [pp. 499–501]-সংখ্যায় মুদ্রিত 'My School' ভাষণটি হয়তো এখানেই দেওয়া।

রবীন্দ্রনাথ বলেন, অনেকে তাঁর শিক্ষাদর্শের বিশেষত্বটি জানতে চেয়েছেন, কিন্তু সেটি বলা খুবই কঠিন— কারণ, গত চব্বিশ বৎসর ধরে সেটি ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছে। 'With it my own mind has grown and my own ideal of education has come to its fullness, so slowly and so naturally, that I find it difficult now to analyse and put it before you.' এর পরে তিনি নিজের বাল্যশিক্ষার বহুকথিত করুণ অভিজ্ঞতার বিবরণ দিয়ে বললেন, সেই দুঃখ থেকে মুক্তির উপায় হিসেবে তিনি শান্তিনিকেতনের নির্জন প্রকৃতির মধ্যে তাঁর বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি নিজে একটি বড়ো গাছের ছায়ায় বসে ছাত্রদের পাঠ দিতেন, তাদের সঙ্গে খেলা করতেন, সন্ধ্যাবেলায় প্রাচীন মহাকাব্য পাঠ বা স্বরচিত গান শোনাতেন। সহকর্মী শিক্ষকদের সঙ্গে প্রায়ই তাঁকে কলহ করতে হত 'who had been brought up in a different environment

to that of mine, who had no faith in freedom, who believed that it was impertinence for the boys to be boys.'

ছাত্রদের চারপাশে একটি সাংস্কৃতিক আবহাওয়া সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে তিনি খ্যাতিমান শিল্পীদের আহ্বান করে তাঁদের ইচ্ছামতো ছবি আঁকার সুযোগ দিয়ে ছাত্রছাত্রীদের অনুমতি দিয়েছেন তাঁদের কাজ দেখে অনুপ্রাণিত হওয়ার সুযোগ নিতে। তিনি নিজেও সর্বদাই গান বা কবিতা রচনা করে শিক্ষকদের আহ্বান জানান সেগুলি শোনা ও শেখার জন্য; ছাত্ররাও অনাহূত সমবেত হয় আড়াল থেকে শুনে স্বয়ং রচয়িতার কণ্ঠোৎসারিত রসগ্রহণের জন্য। 'This helped to create an atmosphere from which they could imbibe something impalpable, but life-giving.' সেখানকার উন্মুক্ত প্রকৃতির মধ্যে ঋতুপরিবর্তন ঘটে চোখের সামনে। 'When the kiss of rain thrilled the heart of the surrounding trees, if we had still behaved with undue propriety and paid all our attention to mathematics, it would have been positively wrong, impious.'

সেখানকার ছাত্ররা তাদের প্রতিবেশী জনগোষ্ঠীর সঙ্গে সর্বদা সংযোগ রক্ষা ক'রে তাদের সাহায্য করার চেষ্টা করে। তাদের আরও একটি স্বাধীনতার দিকে লক্ষ্য রাখা হয়, 'the freedom of sympathy with all humanity, a freedom from all racial and national prejudice.' এর প্রয়োজন এই কারণে যে, দীর্ঘদিনের পাশ্চাত্যশাসনের প্রতিক্রিয়ায় ভারতে পশ্চিমিদের প্রতি যে-ঘৃণা পোষণ করা হয়, বিদ্যালয়ে চেষ্টা করা হয়েছে সেই ভাবটি দূর করার— পশ্চিম থেকে আগত বন্ধুরা তাঁদের মানবিক সহানুভূতি ও প্রীতি দিয়ে তাতে সাহায্য করেছেন। তাঁর প্রতিষ্ঠানটি গড়ে উঠেছে সর্বজাতির আত্মিক মিলনের আদর্শকে ভিত্তি করে। 'I have in my mind not merely a University— that is only one of the aspects of our Visva-bharati,— but I hope this is going to be a great meeting place for individuals from all countries who believe in our spiritual unity.' জনগোষ্ঠীদের মধ্যে পার্থক্য থাকা স্বাভাবিক এবং তাকে রক্ষা করা ও সম্মান করাই দরকার, তাঁদের শিক্ষার লক্ষ্য এদের মধ্যে একটি সামঞ্জস্য সাধন করা। বিশ্বভারতীতে এই চেষ্টাই করা হচ্ছে। এই আদর্শকে শিক্ষা, শিল্প, গ্রামপুনর্গঠন প্রভৃতি বিভিন্ন কার্যক্রমের ভিতর ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। তাঁর প্রতিষ্ঠানকে আন্তর্জাতিক রূপ দিতে আগ্রহী হয়ে তিনি পাশ্চাত্যের কয়েকজন মনীষীকে আহ্বান জানিয়েছিলেন ও তাঁরাও তাতে সাড়া দেন এবং কয়েকজন স্থায়ীভাবে এই কাজে যুক্ত হয়েছেন।

13 Jun [শুক্র ৩০ জ্যৈষ্ঠ] শিল্পী য়োকোয়ামা টাইকানের বাড়িতে মধ্যাহ্নভোজনের আমন্ত্রণ ছিল। সকলের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবার উদ্দেশ্যে টাইকান জাপানের অধিকাংশ উল্লেখযোগ্য শিল্পীকে সেখানে নিমন্ত্রণ করেছিলেন। বস্তুত 'To Japanese Artists' ভাষণটি এখানেই দেওয়ার কথা।

শ্রীমতী ওয়াডা টোকিয়ো থেকে অন্য একটি শহরে গিয়ে রবীন্দ্রনাথের বক্তৃতার খবর দিয়েছেন, যার কোনো উল্লেখ আমরা অন্যত্র পাইনি। তিনি বলেছেন :

> একদিন হঠাৎ একদল জাপানী যুবক স্বদেশী পোশাকে জাঁকজমক করে সজ্জিত হয়ে এসে উপস্থিত শ্রীমতী কোরার কাছে। ওঁরা এসেছেন ইবারাকী প্রদেশ থেকে। শ্রীমতী কোরাকে জানালেন যে, ওঁরা জাপানের প্রাচীন সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে বাঁচিয়ে রাখবার ব্রত গ্রহণ করেছেন। গুরুদেবকে ওঁরা নিয়ে যেতে চান নিজেদের মধ্যে মীটো শহরে। গুরুদেবের কাছে ওঁরা সত্যের পথে চলবার প্রেরণা চান— গুরুদেবের জীবনদর্শন ওঁর মুখে শুনতে চান, ওঁদের ব্রত উদ্‌যাপনে নির্দেশ চান। শ্রীমতী কোরা যুবকদলকে বলেন যে, গুরুদেবের শরীর অত্যধিক ঘোরাঘুরিতে ক্লান্ত—

ওঁর পক্ষে হয়ত যাওয়া সম্ভব হবে না। যুবকদলের প্রতিনিধি এই শুনে ভেঙে পড়লেন। বার বার বললেন যে, ওঁরা বহুদুর থেকে অনেক প্রত্যাশা নিয়ে এসেছেন— গুরুদেবকে যদি নিয়ে না যেতে পারেন তাহলে উনি এই হোটেলেই আত্মহত্যা করবেন— 'হারাকিরী' প্রথায় নিজের পেট চিরে। ··· শেষে উপায় না বার করতে পেরে স্বয়ং গুরুদেবের শরণাপন্ন হলেন ওঁরা। গুরুদেবের তখন শরীর ভাল ছিল না তবু ওই যুবকদলের ভক্তি ও গুরুদেবের কাছে ওঁদের গভীর প্রত্যাশার কথা শুনে উনি রাজী হলেন। ১৭ই মে [তারিখটি অবশ্যই ভুল] টোকিও থেকে ৩০ মাইল দূরে মীটোতে গুরুদেব গেলেন ভাষণ দেবার জন্য।[৬১]

14 Jun [শনি ৩১ জ্যৈষ্ঠ] রবীন্দ্রনাথ ট্রেনে টোকিয়ো ত্যাগ করে কিয়োটো শহরের উদ্দেশে রওনা হন। জাপানি দার্শনিক বিশ্বকোষে [Encyclopedic Dictionary of Philosophy] রবীন্দ্রনাথের দর্শন নিয়ে আলোচনা করার জন্য কালিদাস নাগকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। সেইজন্য ট্রেনে তিনি সেই প্রসঙ্গের অবতারণা করলেন, প্রত্যুত্তরে রবীন্দ্রনাথ যা বলেন [দ্র কবির সঙ্গে একশো দিন। ৮০–৮১], তা খুবই মূল্যবান।

অস্ট্রেলিয়ার ব্রিসবেনের *Daily Mail* [16 Jun] লেখে, আগের দিন রবিবার প্রেসবিটেরিয়ান মিশন স্কুলে Maoji Gakuin-এর উদ্দেশে রবীন্দ্রনাথের বক্তৃতা করার কথা ছিল, কিন্তু কোনো ঘোষণা ছাড়াই তিনি সেটি বাতিল করেন। একটি বিরাট জনতা তাঁর ভাষণ শোনার জন্য সমবেত হয়েছিল। উদ্যোক্তারা রবীন্দ্রনাথকে ডেকে আনার জন্য জাপান-ইন্ডিয়া সোসাইটির কেন্দ্রীয় অফিসে গেলে দ্বাররক্ষী বৌদ্ধ পুরোহিত তাঁদের বাধা দেন, যার কোনো কারণ জানানো হয়নি। এই সংবাদের সমর্থক অন্য-কোনো তথ্য পাওয়া যায়নি। তবে অনেক সময়ে রবীন্দ্রনাথের অনুমতি ছাড়াই এইরূপ সভার আয়োজন করা হত, যেগুলি বাতিল করা ছাড়া উপায় থাকত না।

কালিদাস নাগ লিখেছেন, 16 Jun [সোম ২ আষাঢ়] 'বিকালে Town Hallএ মস্ত প্রসঙ্গ করলেন কবি, "বিজ্ঞানকে পশ্চিম আবিষ্কার করেছে, বাড়িয়েছে কিন্তু devilএর সেবায় নামিয়েছে। একে spiritualized করবে কে? প্রাচ্য খণ্ডে একমাত্র জাপানই এর সাধনে পাশ্চাত্যের সমকক্ষ কিন্তু এখানে না-থেমে প্রথম জাপান যেন দেখায় spiritualized science কত বড় boon for humanity— এই গৌরবে সারা এসিয়ার গৌরব।" 'The Place of Science' নামে রবীন্দ্রনাথের একটি প্রবন্ধ মডার্ন রিভিয়্যু-র Apr 1925 [pp. 377–80]-সংখ্যায় মুদ্রিত হয়, এই ভাষণটিই এখানে প্রদত্ত হয়েছিল, যদিও ভাষণটি সেখানে 'Farewell lecture in Japan' অভিধা নিয়ে প্রকাশিত হয়েছে যেটি সঠিক নয়। রবীন্দ্রনাথ এর পরেও জাপানে কয়েকটি বক্তৃতা করেছিলেন।

বর্তমান ভাষণে তিনি প্রাচীনকালের ভারতীয় অভিযাত্রীদের প্রসঙ্গ উল্লেখ করে বললেন, তাঁরা বহু দুর্গম পথ অতিক্রম করে এসে এদেশের হৃদয়ে স্থান লাভ করেছিলেন। তিনিও তাই চান। কিন্তু তাঁর সেই প্রতিভা নেই, সময়েরও পরিবর্তন হয়েছে, আদর্শবাদকে আজ প্রগতির বিরোধী বলে মনে করা হয়।

প্রকৃতপক্ষে ধর্মপ্রচারকেরা সশ্রদ্ধভাবে না এলে দেশবাসীরা তাঁদের আপন বলে গ্রহণ করেন না, কারণ জাতিত্বের গর্ব, দান করার মনোভাব নিয়ে এলে আত্মীয় হওয়া সম্ভব হয় না। পৃথিবীর সর্বত্র থেকে মিশনারিরা আজও আসেন, কিন্তু তাঁদের মধ্যে সেই শ্রদ্ধার ভাব নেই। তাঁরা অন্যের ধর্ম, আচারব্যবহারের নিন্দা করেন ও নিজেদের ধর্মের মহত্ব ঘোষণা করে ভিক্ষা দেওয়ার মনোবৃত্তি নিয়ে প্রচারকার্য চালান। কিন্তু পূর্বে যাঁরা এসেছিলেন তাঁরা এমন ভাবেননি, 'Never having any insolence of race pride it was as natural for them to communicate truth as it is for the breeze to spread the smell of the lotus.'

জাপানে আসার সময়ে তাঁর মনেও এই মনোভাবই ছিল, জাপানিদের মানসিক উন্নতি ঘটাবেন এমন দুরাশা নিয়ে তিনি এখানে আসেননি, 'I wanted simply to come to seek my home among others of the human race. I came with a hunger in my heart to find your sympathy and to offer you mine' এবং তাঁর বিদায়ের সময় যখন সন্নিকট তিনি তখন অকপটেই বলতে পারেন যে, তাঁর বাসনা পূর্ণ হয়েছে।

কিন্তু একটি দুর্ভাবনাও তাঁর মনে আছে। তিনি বলেন, বিদেশ থেকে ধার-করা আদর্শ ও সামগ্রী দিয়ে জাপানের চিরন্তন প্রকৃতি যেন পরিবর্তিত না হয়। বিজ্ঞান অবশ্যই মূল্যবান— কিন্তু যে-মন কোনো বিশেষ উদ্দেশ্যে তাকে ব্যবহার করতে চায় সেটি অনুকরণীয় নয়। একটি প্রদীপ থেকে আর-একটি প্রদীপ জ্বালানোকে অনুকরণ বলে না, কিন্তু সেই আগুনকে লুটপাটের কাজে ব্যবহার করলে সে তার পবিত্রতা হারায় 'Let science be used to bring out the greatness you have and not the baser passions of greed and race hatred.'

বিজ্ঞান মানবসমাজে এসেছে আশীর্বাদের মতো, কিন্তু শয়তান সঙ্গে সঙ্গেই তাকে অধিকার করেছে। সে তাকে ব্যবহার করে ধ্বংসাত্মক অস্ত্র, বিষাক্ত গ্যাস ও শোষণের হাতিয়ার হিসেবে। জাপানিরা তাঁদের স্বাভাবিক বুদ্ধিতে বিজ্ঞানের শক্তিকে অল্প সময়ের মধ্যেই আয়ত্ত করেছেন এবং কোনো-কোনো পরিস্থিতিতে তাকে ব্যবহার করেছেন পশ্চিমিদের চেয়েও অধিকতর দক্ষতায়। 'Therefore it rests with you, through the moral power that you have inherited from your forefathers, the spirit of *bushido,* to take up this truth that you have received from the West and restore it to its purity of greatness. It is you who can do it, because you have this western intelligence, this energy, this efficiency of workmanship, and at the same time your western nature, which has its respect for ideals, its love of honour, the eastern mind which sets more value on the spirit of man and its fulfilment than on any external success.' তিনি বলেন, তাঁর দেশে এমন অনেকে আছেন যাঁরা বিজ্ঞানকে ভয় করেন। কারণ তাঁরা মনে করেন, বিজ্ঞান শক্তি দেয় আর তাঁরা শক্তিকেই ভয় পান। তাই মানুষকে প্রলোভন থেকে মুক্তি দিতে তাঁরা বিজ্ঞানকেই বর্জন করতে চান। এ যেন শরীরকে রোগমুক্ত রাখার জন্য আত্মহত্যার মাহাত্ম্য প্রচার।

তিনি বললেন, পৃথিবীতে অনেকদিন কোনো মহাপুরুষের আবির্ভাব হয়নি, কিন্তু আদর্শের বীজ বাতাসে ভেসে বেড়াচ্ছে। জাপানকে উদীয়মান সূর্যের দেশ বলা হয়, ভোরের আলোর তাজা ভাবটিকে যেন তাঁরা রক্ষা করেন।

এই ভাষণের পরে আরও কর্মসূচি ছিল— 'সন্ধ্যায় E. Honguranji sectএর মধ্যে ভোজ— চমৎকার বাগানে, পুকুরের ধারে হাঁস ও চাঁদ দেখতে দেখতে পরে কিওটোর বিখ্যাত Theatreএ No drama মেশান এক play চমৎকার ও modern domestic tragedy এক দেখে আসা।' পরের দিনের ভাষণে রবীন্দ্রনাথ এই নাট্যাভিনয়ের অনুপম বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করেছেন।

17 Jun [মঙ্গল ৩ আষাঢ়] কালিদাস নাগ লিখেছেন : 'Otani Universityতে lunch ও বক্তৃতা। পরে Women's Collegeএ সাক্ষাৎ, পরে মেয়েদের address করে উপহার'।

ওটানি বিশ্ববিদ্যালয়ে রবীন্দ্রনাথ কোন্ বক্তৃতাটি করেছিলেন তা আমরা জানতে পারিনি, তবে 'To the Child' নামে কিয়োটো গার্লস' কলেজে প্রদত্ত একটি ভাষণ মডার্ন রিভিয়্যু-র May 1925 [pp. 499–501] সংখ্যায় মুদ্রিত হয়, যার সংশোধিত পাণ্ডুলিপি 'The Child World/ Kyoto High School for Girls' নামাঙ্কিত হয়ে রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত আছে— এই বক্তৃতাটির কথাই কালিদাস নাগ দিনলিপিতে উল্লেখ করেছেন।

এখানে বক্তৃতাসভার সভাপতি বা সভানেত্রী হয়তো তাঁর মতো মহান দার্শনিকের পরিচয় দেওয়া বাহুল্য ইত্যাদি মন্তব্য করায় রবীন্দ্রনাথ বলেন, তাঁকে দার্শনিক বা ঋষি বলা নেহাৎই অমূলক গুজব, তবে তাঁকে কবি বলে পরিচিত করলে সত্যের অনেকটা কাছাকাছি যাওয়া যায়। কবির সবচেয়ে বড়ো গুণ তাঁর অনন্ত যৌবন, তিনি কখনোই বুড়ো হন না— দার্শনিকেরা বৃদ্ধ হন, কিন্তু কবি একশো বছর বয়সে মারা গেলেও বলতে হবে তাঁর অকালমৃত্যু ঘটেছে। এইজন্যই পদ্মার নির্জন চরের ধারে হাউসবোটে লেখালেখিতে নিমগ্ন থাকার সময়ে যখন তিনি মনের মধ্যে তরুণ কণ্ঠের আর্তনাদ শুনলেন নিপীড়নকারী শিক্ষকদের হাত থেকে মুক্তির আহ্বান জানিয়ে, তিনি তাকে উপেক্ষা করতে পারেননি। এই আমন্ত্রণে তিনি স্বভাবতই অবাক হলেন, কারণ ছোটোবেলা থেকে এই কারণেই তিনি স্কুল-পলাতক। তবু তিনি ঐ ডাকে সাড়া দিয়ে স্কুলশিক্ষকের ছদ্মবেশ গ্রহণ করলেন, শান্তিনিকেতনের সুন্দর প্রাকৃতিক পরিবেশে একটি বিদ্যালয় স্থাপন করলেন, 'which was a camouflage of a school'। সেখানে দীর্ঘ শালতরুর শ্রেণী, ছায়ানিবিড় আম্রকুঞ্জ ও কয়েকটি অন্যান্য গাছ কোনোমতে অরণ্যের আভাস দেয়। সেই দৃশ্যের সঙ্গে চিনা ও জাপানি শিল্পীদের আঁকা চিত্রাবলির আশ্চর্য সাদৃশ্য তিনি অনুভব করেছেন— 'One thing I have found in the character of these artists and painters,— they are not afraid of open spaces. It has often struck me that in their pictures they wanted to make us realise the great space itself, with the help of just the slight outline of a mountain or of a pine-tree top, which, like the index finger, pointed out that which could not be seen but be felt. In their paintings a few touches of a crooked branch or the flying wings of a bird represent that shock to the immensity in response to which it breaks out in a great silent cry.'

আগের রাত্রে যে-নাটকটির অভিনয় হয়েছিল, তার মধ্যেও তিনি একই বিশেষত্ব লক্ষ্য করেছেন। সেখানে প্রধান অভিনেতা যখন অভিনয় করছিলেন, তখন অন্য সকলে ছবির মতো মূক ও নিশ্চল হয়ে ছিলেন— যেন তাঁরা উক্ত অভিনেতার পশ্চাৎপটের ভূমিকা নিয়েছেন। য়ুরোপীয় অভিনয়ে সেক্ষেত্রে দেখা যায়, প্রত্যেকেই কিছু-না-কিছু করছেন। প্রাচীন জাপানি নাটকে অভিনয় হয় নীরবতার পটভূমিকায়, পশ্চিমি নাটকে ও জীবনধারায় তার বিপরীত চিত্রটিই দেখা যায়।

শান্তিনিকেতনে অল্পসংখ্যক বালককে তিনি শহরের জনতা থেকে নিয়ে এলেন প্রকৃতির বুকে। তাদের সঙ্গে খেলা করতে গিয়ে তিনি তাদেরই বয়সি হয়ে যান। সাধারণ বিদ্যালয়ে ছাত্ররা ভুলে যায় তাদের প্রকৃত বয়সকে, বয়সোচিত স্বাভাবিক চাপল্যকে। তাঁর বিদ্যালয়ের ছাত্ররা চৌদ্দ-পনেরো বছর বয়স পর্যন্ত নিজেদের বালক বলেই মনে করে। প্রাচ্যের ভালো ছবিতে শূন্য স্থানের প্রাধান্য দেখা যায়, সেইরূপই মানুষের ও বিশেষভাবে শিশুদের জীবনের চারিদিকে অনেকটা ফাঁকা জায়গার দরকার। তিনি নিজে তাঁর কাজের

অভিজ্ঞতায় দেখেছেন, স্বাধীনতা দিলে স্বাধীনতা পাওয়া যায়। 'The taskmaster is as much a slave as his victim.' এখানে তিনি যে মুক্তির আয়োজন করলেন, তার ফলে তিনি নিজেই চল্লিশ বছর বয়সে যৌবনের আস্বাদ পেয়ে ক্রমেই বেড়ে উঠতে শুরু করেছেন। নব নব বিস্ময়, নব নব প্রকাশের আনন্দে সেই বৃদ্ধি এখনও চলেছে। এখানে তিনি তাঁর শিক্ষাদর্শ বর্ণনা করতে আসেননি, তাঁর বলার কথা এই যে, তিনি ছোটোদের ভালোবাসেন এবং তাঁর পাকা দাড়ি দেখেও তারা ভয় পায় না। তিনি নিশ্চিত জানেন, একটু বেশি সময় এই মেয়েদের বিদ্যালয়ে থাকতে পারলে এখানকার ছাত্রীরা সকলেই তাঁর প্রেমে পড়ে যেত।

18 Jun রবীন্দ্রনাথ কিয়োটো থেকে কোবে-তে আসেন। এখানকার The Educational Association of Hyogo Prefecture in Japan প্রতিষ্ঠানের প্রধান S. Hirota-র একটি চিঠি থেকে জানা যায়, রবীন্দ্রনাথ এইদিন কোবে ও সন্নিহিত অঞ্চলের বুদ্ধিজীবী ও শিক্ষা বিষয়ে উৎসাহী ব্যক্তিদের উদ্দেশে একটি ভাষণ দেন। কৃতজ্ঞতাস্বরূপ প্রতিষ্ঠানটি তাঁর বিদ্যালয়কে একশত ইয়েন উপহার দেয়। সম্ভবত এই ভাষণটি এল্‌ম্‌হার্স্ট 'The Schoolmaster' নামে অনুলিখন করেন ও রবীন্দ্রনাথের দ্বারা সংশোধিত এর পাণ্ডুলিপিটি রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত আছে।

রবীন্দ্রনাথ বক্তৃতার শুরুতেই কৌতুক করে বললেন, পঞ্চাশ বছর আগে কোনো মহাপুরুষ যদি তাঁর কাছে ভবিষ্যদ্বাণী করতেন যে, একদিন তিনি জাপানের শিক্ষকদের কাছে তাঁর শিক্ষাদর্শ বিষয়ে ভাষণ দেবেন তাতে তাঁর মতো কবির কল্পনাশক্তিও চমকিত হত। শ্রোতাদের মধ্যে অনেকেই হয়তো জানেন যে, তেরো বছর বয়সের পরে তিনি আজ পর্যন্ত আর-কোনো বিদ্যালয়ের অভ্যন্তরে যাননি, তাই তিনি যখন শিশুদের জন্য একটি বিদ্যালয় স্থাপনের তাগিদ অনুভব করলেন তাতে এই সুবিধা হল যে, তাঁকে কোনো বিশেষ শিক্ষাপদ্ধতি অনুসরণ করতে হয়নি— নিজের বিদ্যালয়জীবনের করুণ অভিজ্ঞতা এবং পরীক্ষা ও ভ্রমসংশোধনের পথ ধরেই তাঁর শিক্ষাদর্শ গড়ে উঠেছে। অবশ্য এই ধরনের বক্তব্য তিনি বহু ভাষণে ও প্রবন্ধে ব্যক্ত করেছেন।

কালিদাস নাগ লিখেছেন, পরদিন 19 Jun [বৃহ ৫ আষাঢ়] 'সকালে Peru Consul সব ঠিক করে গেল South America যাত্রার। কবি আমায় ও EImhirstকে নিয়ে যাবেন। University থেকে ছুটির বন্দোবস্ত করবেন তিনি ঠিক হল।'

পেরু দক্ষিণ আমেরিকা মহাদেশের উত্তর-পশ্চিম দিকে প্রশান্ত মহাসাগরের তীরবর্তী একটি স্বাধীন রাজ্য, ষোড়শ শতাব্দীর চতুর্থ দশক থেকে স্পেনীয় সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত থাকার পর দীর্ঘ আন্দোলনের ফলস্বরূপ Simon Bolivar [1783–1830]-এর নেতৃত্বে 9 Dec 1824 স্বাধীনতা অর্জন করে। বর্তমান বৎসরের ডিসেম্বর মাসে দেশটি তাদের স্বাধীনতা লাভের শতবার্ষিকী পালনের উদ্দেশ্যে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের গুণীদের সম্মিলিত করার আয়োজন করছিল, রবীন্দ্রনাথের আমন্ত্রণ সেই প্রয়াসের অন্তর্গত। এই প্রসঙ্গে 24 Jun এল্‌ম্‌হার্স্ট রথীন্দ্রনাথকে যে-চিঠিটি লেখেন তাতে পেরুর প্রস্তাব ও প্রাথমিক পরিকল্পনার একটি চিত্র পাওয়া যায় :

The Peruvian minister says he thinks he can guarantee $50,000 on the S. American trip without the poet's having to ask for anything,— but don't mention this to anyone. At all events he's promised to finance a party of four from Calcutta to Marseilles & from Barcelona to Peru, leaving Colombo Sept. 7. The Peruvian representative in Calcutta is the man who

will I think give you final word,— they are booking berths on the N.Y.K steamer leaving Colombo.

I urged their paying from Calcutta in order to make sure that neither Italy nor Spain would keep him over a fortnight apiece. It really is vital that Gurudev should be in Peru by Dec 7–10,— for in celebration of their independence they are going to try & stimulate all the Republics to forget their petty jealousies. They say that Gurudev is the one man who can do it.[৬২]

এই চিঠি থেকে দেখা যাচ্ছে, দুর্বল শরীরে পেরু যাওয়ার প্রস্তাব গ্রহণের পিছনে রবীন্দ্রনাথের ভ্রমণাকাঙ্ক্ষা [নিজেকে দেখিয়ে বেড়ানোর ইচ্ছা] চরিতার্থতার চেয়েও বিশ্বভারতীর জন্য অর্থসংগ্রহের সুযোগ নেওয়াই মুখ্য ছিল।

19 Jun বিকেলে রবীন্দ্রনাথ কোবে উইমেন'স ক্লাবে তাঁর কবিতা পাঠ করে শোনান। *Japan Chronicle* [20 Jun] অনুষ্ঠানটির বর্ণনায় লেখে : 'At the Tor Hotel yesterday evening Dr. Tagore gave a reading to the Kobe Women's Club. There was a large assembly of members and friends present. The President, Mrs. M. Young, introduced Dr. Tagore, who gave a selection of the poems from *The Crescent Moon*, and also several from a volume as yet unpublished, on the same lines, but some of them of a deeper trend and greater length.... Prolonged applause followed the reading. The President expressed the thanks of the Club, and the meeting came to an end.'

20 Jun [শুক্র ৬ আষাঢ়] বিকেলে ওরিয়েন্টাল হোটেলে স্থানীয় ভারতীয়দের পক্ষ থেকে রবীন্দ্রনাথকে সংবর্ধনা জানানো হয়। কালিদাস নাগ লিখেছেন : 'আজ বিকালে Oriental Hotelএ Indian Community at Home জাপানী, আমেরিকান, স্পেনীয়, South American প্রভৃতি নানাজাতীয় প্রতিনিধি সব ছিলেন। কবি তাঁর বক্তব্য চমৎকার করে বললেন— একটা জাতের প্রাণের মধ্যে গিয়ে তবে তাকে বিচার করা উচিৎ তবেই তার সত্য প্রাণের সন্ধান মিলবে। বাইরে থেকে সমালোচনা করতে গেলে সত্যকেই হারাতে হয়— মানুষকেও মেলেনা। ভারতবাসীদের এ কথা মনে রেখে আত্মসম্মান ও সহানুভূতি সমানভাবে জাগ্রত রেখে বিশ্বমানবের যজ্ঞে নামতে হবে।'[৬৩] *Japan Chronicle* [21 Jun] লেখে :

Yesterday afternoon there was a reception at the Oriental Hotel given by the Indian community in honour of Dr. Rabindranath Tagore. H.E. Governor Hiratsuka, members of the Consular Body and other guests were present.

Dr Tagore gave a lengthy address, on the lines of his published discourse on Nationalism. He repeatedly warned his fellow-countrymen in Japan against generalising from instances, especially in forming a critical judgement of the people among whom they live, and he gave a

number of instances that had come under his notice from which he deduced a conception of the Japanese character.

'Notes and Comments (An address to the Indian Community in Japan)' নামে বিশ্বভারতী কোয়ার্টার্লি-র Apr-Jun 1925 [pp. 71—75]-সংখ্যায় ভাষণটির কিয়দংশ প্রকাশিত হয়। এখানে সিল্কের কাপড়ের উপর ইংরেজিতে ছাপা 'Indian residents of Kobe and Osaka' 'Your admiring countrymen'-এর পক্ষ থেকে J. Rehman -প্রমুখ বহু লোকের স্বাক্ষরিত যে তারিখ-হীন মানপত্রটি রবীন্দ্রনাথকে দেওয়া হয়, সেটি রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত আছে।

এই ভাষণে রবীন্দ্রনাথ জাপান-প্রবাসী ভারতীয়দের উদ্দেশে কিছু কঠিন সতর্কবাণী উচ্চারণ করলেন। তিনি বললেন, যে-কোনো কারণেই হোক তাঁরা জাপানে এসে একটি গোষ্ঠী তৈরি করেছেন। তাঁদের মাধ্যমেই ভারত জাপানের মানুষের কাছে পরিচিত হচ্ছে, সুতরাং সেই পরিচয় যেন গৌরবময় হয় তারই চেষ্টা করা উচিত। তা যদি না হয়, তাহলে তাঁরা মোটা অঙ্কের টাকার থলি নিয়ে একদিন দেশে ফিরে যাবেন, কিন্তু পিছনে রেখে যাবেন দুস্তর শূন্যতা।

তিনি তাঁদের মধ্যে এমন-কিছু মানুষকে দেখেছেন, জাপানিদের প্রতি আচরণের ক্ষেত্রে তাঁরা ভব্য বা সহানুভূতিশীল নন। জাপানিদের চরিত্রের কিছু অন্ধকার দিক বর্ণনা করে আনন্দ পান এমন ভারতীয়েরও অভাব নেই। এতে তাঁদের কোনো লাভ নেই, বরং তাঁরা দেশে ফিরে স্বজাতির দোষত্রুটি সংশোধনে ব্রতী হলে লাভবান হবেন। মিশনারিরা আমাদের দেশে এসে কিভাবে আমাদের সমালোচনা করে তা সকলেরই জানা আছে। এঁরা নিজের দেশের মানুষকে বিচার করার বেলায় দেশকালের পরিপ্রেক্ষিতে সমগ্র মানুষটিকেই পর্যালোচনা করে, কিন্তু অপরের দেশে এসে ইংরেজি উচ্চারণের ভুল, বিদেশি পোশাক পরিধানের বিচ্যুতি নিয়ে ব্যঙ্গ করে। 'I hope you will not cultivate such insularity of judgment and imagine yourselves to be superior to the people amongst whom you live, only because you are different from them.'

তিনি নিজেও জাপানি চরিত্রের মহত্ত্ব আবিষ্কার করার লক্ষ্যে এখানে এসেছেন। কিন্তু তিনি তাঁদের ত্রুটির বিষয়ে অন্ধ নন। বস্তুত প্রথম মহাযুদ্ধের সময়ে জাপানে এসে 'I first saw the Nation, in all its naked ugliness, whose spirit we Orientals have borrowed from the West.' তখন তিনি একদিকে বুশিদো অর্থাৎ সামাজিক ব্যবহার এবং আত্মমর্যাদার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন যেমন জাপানিদের মধ্যে দেখেছেন, তেমনি অন্যদিকে দেখেছেন আত্মগর্বে স্ফীত নেশনের বিকৃত প্রকাশকে। এই অভিজ্ঞতার পরিণতি ন্যাশনালিজ্‌ম্ প্রবন্ধাবলি, যেগুলি তিনি আমেরিকায় গিয়ে বিভিন্ন সভায় পাঠ করেছিলেন। এর জন্য তিনি বিশেষভাবে জাপানকে অপরাধী বলে মনে করেন না। বিভিন্ন দেশেই এই ভালো ও মন্দের সহাবস্থান দেখা যায়। তাই তিনি আশা রাখেন,

Japan must prove to the world that the present utilitarian spirit may be wedded to beauty. If Science and Art, necessity and joy, the machine and life, are once united, that will be a great day. At present, Science is shamelessly dissociated from Art. She is a barbarian, boastful of her immense muscle and superficial nature. But has she not come at last to the gate of the truth, which gives us the mystery of the beautiful? Has she not proved that it is Rhythm itself which is in the heart of Reality? She has suddenly stumbled upon the dance-music of creation. It has been revealed to her, that every atom is a ring-

dance of lights round a luminous centre. Only a difference in their dance measure is responsible for the difference in the elements. It is through the chain of these varied dances which are the cadence of beauty, that this universe of Reality has its play in the courtyard of time and space. Any torture of the chain of beauty, any break in it, is evil; because it hurts the very spirit of reality, which is one in its physical appearance and in its moral and spiritual meaning. By killing the best expression of reality, we enfeeble its soul which is moral and spiritual.

উদ্ধৃতিটি একটু দীর্ঘ হয়ে গেল, কিন্তু ভারতীয়দের উদ্দেশে রবীন্দ্রনাথের উপদেশ ছাড়াও বিজ্ঞানের আধুনিকতম আবিষ্কারের সঙ্গে তাঁর গভীর পরিচয় ও তাকে দার্শনিক তত্ত্বের সঙ্গে অনায়াসে মিশিয়ে দেওয়ার এই নিদর্শনটি পাঠকদের কাছে তুলে ধরার লোভ সংবরণ করা গেল না।

এই অনুষ্ঠানের পরে সেইদিনই সন্ধ্যায় রবীন্দ্রনাথ কোবে-র বিশিষ্ট ভারতীয় ব্যবসায়ী এন. এফ. আবদুলালি-র বাড়িতে আর-একটি সংবর্ধনা সভায় যোগ দেন।

21 Jun [শনি ৭ আষাঢ়] বিকেলে জাপানের বিখ্যাত দৈনিক সংবাদপত্র *Osaka Ashahi*-র স্বত্বাধিকারী Mr. Muriyama-র বাড়ির প্রাচীন ধরনের চা-উৎসবে তিনি যোগ দেন, কালিদাস নাগ অনুষ্ঠানটির দীর্ঘ বর্ণনা লিখে রেখেছেন তাঁর ডায়ারিতে [দ্র কবির সঙ্গে একশো দিন। ৮৫–৮৭]।

22 Jun [রবি ৮ আষাঢ়] রবীন্দ্রনাথ, ক্ষিতিমোহন সেন, নন্দলাল বসু ও কালিদাস নাগ কোবে থেকে সুয়ামারু জাহাজে জাপান ত্যাগ করে চিনের পথে স্বদেশাভিমুখে রওনা হন, এল্‌ম্‌হার্স্ট কিছুদূর পর্যন্ত জাহাজে তাঁদের সঙ্গ নিয়ে একটি বন্দরে নেমে গিয়ে আপাতত জাপানেই থেকে যান বিশ্বভারতীর কিছু আরব্ধ কাজ সমাধা করার জন্য। কালিদাস নাগ খুব সংক্ষেপে বিদায়-অনুষ্ঠানটির বর্ণনা করেছেন : 'Touching farewell — কাগজের শিকলে কবির জাহাজ বাঁধতে এসেছে হাজার হাজার নরনারী'। হয়তো যাবার আগে রবীন্দ্রনাথ টোমিকো ওয়াডাকে দু'ছত্রের একটি কবিতা ও তার ইংরেজি অনুবাদ লিখে দেন :

'বিরহ আগুনে জ্বলুক দিবস রাতি
মিলন স্মৃতির নির্বাণহীন বাতি।

Thou hast left thy memory as a flame/ to my lonely lamp of separation.[৬৪]

জাহাজটি মালবাহী জাহাজ বা কার্গো বোট, তবু বিশ্বভারতীর দলবল ছাড়াও তাতে প্রাক্তন গবর্নর Tago Kazutami ও তাঁর পত্নীর মতো কিছু বিশিষ্ট যাত্রীও ছিলেন, রবীন্দ্রনাথ তাঁদের অনুরোধে 'The Soul of the East'-শীর্ষক একটি দীর্ঘ ভাষণ দেন, যেটি বিশ্বভারতী কোয়ার্টার্লি-র Apr–Jun 1925 [pp. 85–88]-সংখ্যায় 'An address to the Japanese passengers on board the S.S. Swamaru' টীকা-সহ প্রকাশিত হয়।

জাপানে যে সাদর অভ্যর্থনা তিনি লাভ করেছেন তার জন্য ধন্যবাদ জানিয়ে তিনি বলেন, জাপানকে তিনি দেখেছেন একজন প্রাচ্যবাসীর দৃষ্টিকোণ থেকে, যাকে একজন পশ্চিমি পর্যটক দেখতেন অন্য এক রূপে। তিনি বলেন :

I think that we, in the East, have more faith in personality, in human relationship. All our attachments are keenly personal, human. Science deals with the impersonal, the non-human, the mechanical, the things that can be weighed and measured and tabulated. These are useful things, no doubt. Through them we can organise our forces better in certain respects than through mere personal ways, producing accurate, standardised articles by the million, every one of them monotonously the same. That makes you think you have got the exact thing and feel that you are not cheated.

কিন্তু প্রাচ্যের মানুষেরা বাইরের জিনিসকে এত খুঁটিয়ে দেখতে অভ্যস্ত নয়, ফলে গোলমাল ঘটিয়ে পশ্চিমিদের কাছে হাস্যাস্পদ হয় এবং তারা ভাবে আমরা তাদের যন্ত্রতন্ত্র আয়ত্ত করতে পারব না। কিন্তু একটি কথা ভেবে দেখা দরকার যে, পৃথিবীর প্রাচীনতম ও দীর্ঘজীবী সভ্যতাগুলি প্রাচ্যদেশীয়— অপরপক্ষে গ্রিস ও রোমের মহান সভ্যতা অল্পদিনের মধ্যেই লুপ্ত হয়েছিল, আধুনিক য়ুরোপীয় সভ্যদেশগুলিতেও অবক্ষয়ের লক্ষণ দেখা দিচ্ছে।

চিনের দিকে দেখলে মনে হবে তার কেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থা ভয়াবহভাবে দুর্বল, কিন্তু চিনের সাধারণ মানুষ সজীব, সভ্য, শান্তিপ্রিয়, প্রাচীন সামাজিক রীতি অনুসরণ করে তারা আজও প্রতিবেশীদের সঙ্গে স্বাভাবিক সম্পর্ক রক্ষা করে চলেছে। তাদের ত্রুটিগুলিও সজীবতার পরিচয় দিচ্ছে, রাজনৈতিক ভ্রান্তনীতি, আর্থিক দুর্নীতি ও কুশাসন সত্ত্বেও দেশটি সম্পূর্ণ ভেঙে পড়েনি।

জাপানে এসেও তাঁর মনে প্রশ্ন জেগেছিল, এখানকার মানুষেরা কি সত্যিই মানবিক, না পশ্চিমিদের মতো নিছক দক্ষ শ্রমজীবী, তাদের ধার-করা পালকের নিচে কি হৃদয়ের স্পন্দন অনুভব করা যায়? একজন পশ্চিমি পর্যটকের ভ্রমণকাহিনিতে তিনি পড়েছেন, ঐ পালকগুলি দেখে তাঁর অপূর্ব মনে হয়েছিল, কিন্তু প্রাণের কোনো স্পন্দন তিনি শুনতে পাননি। রবীন্দ্রনাথের ধারণা, তিনি সেটি শুনতে পেয়েছেন। "I found your soul. That which is external,— your science, your organisation,— that you got from your schoolmasters. But that is not you. It is the 'human' element, that is you. It is the 'human' touch that gives life." এটা ঠিক, জাপানে তিনি দেখেছেন যে, পশ্চিমের ছায়া সেখানে ক্রমশই দীর্ঘতর হচ্ছে, তাদের সৌন্দর্যবোধ পশ্চিমি আদর্শ গ্রাস করছে, 'প্রগতি'র সংজ্ঞা সেখানে ধার করা হয়েছে য়ুরোপ থেকে। কিন্তু ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে এসে তাঁর মনে হয়েছে, এগুলি নিতান্তই বাহ্যিক, মানবিক সম্পর্কের উত্তাপ তিনি যথেষ্টই অনুভব করেছেন। 'It is a creative spirit that you have. For it is in this human element that creation lies. The machine is not creative.'

জাপানে দুজন ভারতীয় বিপ্লবীর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের যোগাযোগ ঘটে— তাঁদের মধ্যে একজন রাসবিহারী বসু ও অপরজন কেশোরাম সবেরওয়াল [K. R. Saberwal, 1894-?]। 1916-এ তিনি যখন জাপানে এসেছিলেন, তখন রাসবিহারীও সেখানে নবাগত— তিনি সেই সময়ে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করেছিলেন কিনা জানার মতো কোনো নিশ্চিত তথ্য নেই। কিন্তু এখন তিনি জাপানি নাগরিক, জাপানি মেয়ে বিয়ে করে সংসার পেতে বসেছেন— নন্দলাল বসু বলেছেন, রবীন্দ্রনাথ জাপানে পদার্পণ করার পর যখন তিনি কোবে-তে ভারতীয় ব্যবসায়ী খোজা কাদেরী-র বাড়িতে অবস্থান করছেন তখনই রাসবিহারী সেখানে গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করেন ও তারপর বহুবার উভয়ের দেখাসাক্ষাৎ হয়। নন্দলালের সঙ্গেও তাঁর ঘনিষ্ঠতা হয়, রাসবিহারীর অনুরোধে তিনি রবীন্দ্রনাথের ব্যবহৃত একটি জোব্বা, একজোড়া জুতো ও একটি টুপি তাঁকে স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে রেখে দেবার জন্য সংগ্রহ করে দেন।[৬৫] তিনি নন্দলালকে বলেন, প্রতি বৎসর দুটি ছেলেকে জাপান দেশটি দেখার ও কিছু শিখে যাবার জন্য পাঠিয়ে দিতে। এইভাবে কলাভবনের বেশ-কিছু ছাত্র জাপানে গেছেন। পরে রাসবিহারী এঁদের থাকার জন্য টোকিয়োতে India House নামে বাসস্থান তৈরি করে দেন।

আমরা আগেই জানিয়েছি, *Japan Advertiser* [8 Jun] পত্রিকার বিবরণানুসারে রবীন্দ্রনাথের টোকিয়ো যাবার ট্রেনেই আর.বি. বোস এবং কে.আর. সবেরওয়াল তাঁর সঙ্গী হয়েছিলেন। সুতরাং ধরে নেওয়া যায়, পেশোয়ার-জাত বিপ্লবী কেশোরাম সবেরওয়ালের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের আলাপের সূত্রপাত এই ট্রেনেই রাসবিহারীর দৌত্যে। অল্প বয়সেই বিপ্লব আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত থাকার অভিযোগে সবেরওয়াল একবার গ্রেপ্তার হন, কিন্তু তাঁর নামে গুরুতর কোনো অভিযোগ না থাকায় অচিরে মুক্তি পান। তবুও কেন তিনি দেশত্যাগ করেছিলেন জানা যায় না, হয়তো পুলিশের হয়রানির ভয়ে তিনি জাপানে চলে যান। যদিও ব্রিটিশ গোয়েন্দারা পরে তাঁর নামে সানফ্রান্সিস্কো ষড়যন্ত্র মামলায় জড়িত থাকার অভিযোগ এনেছিল, কিন্তু কোনো সরকারি কাগজপত্রে তাঁর নাম নেই। হয়তো রাসবিহারীর সঙ্গে তাঁর যোগ ছিল, কিন্তু তিনি তাঁকে কোনো বিপ্লবী কাজকর্মে যুক্ত করেছিলেন কি না তাও জানা নেই।

সবেরওয়াল জাপানে থাকার সময়ে জাপানি ভাষা ছাড়াও ফরাসি ভাষা শিক্ষা করেছিলেন, টাইপ শর্টহ্যান্ড প্রভৃতি সেক্রেটারিয়াল বিদ্যাও তাঁর আয়ত্তে ছিল। দেশে ফিরে আসার আকাঙ্ক্ষায় তিনি রবীন্দ্রনাথের কাছে একটি কর্মলাভের আবেদন জানান, এল্‌ম্‌হার্স্টও তাঁর যোগ্যতা সম্পর্কে নিঃসন্দেহ হয়ে তাঁর আবেদন মঞ্জুর করার সুপারিশ করেন। এর ফলে রবীন্দ্রনাথ জাপান ত্যাগের আগের দিন 21 Jun সবেরওয়ালকে একটি নিয়োগপত্র দেন :

In reference to our conversation of June 15th, I would like you to come and take up a post on the staff of my University in India at your earliest convenience. Now that connections are being established between my institution and the French speaking world, as well as the country of Japan, the qualifications you possess fit you for the work both as my personal assistant and in the Executive Department of Visva Bharati.[৬৬]

24 Jun এল্‌ম্‌হার্স্ট রথীন্দ্রনাথকে এই বিষয়ে জানান : 'As for Sabarwal himself I think we should do well to get him & I think you would find him extremely useful in managing the International end of Visva-Bharati possibly with his office in Calcutta.... I have had excellent accounts of his work here both as a teacher at the Foreign Language School & in other ways. He knows Japanese well— itself a great advantage in our future development, he knows French. He is a hard worker devoted to Gurudev & willing to struggle along on a minimum salary of he can lodge his sister at Santiniketan, she is I think a widow & would be glad to take up work of some kind. He is willing either to act as Gurudev's secretary, & he knows shorthand & typing or to set to work on literary or office jobs.' কিন্তু ইংরেজ গোয়েন্দাদের বানানো রিপোর্টের ফলে সবেরওয়ালকে ভারতে আসার অনুমতি দেওয়া হয়নি, সুতরাং এই যোগাযোগের অকালসমাপ্তি ঘটে।

26 Jun [বৃহ ১২ আষাঢ়] 'সুয়ামারু' জাহাজ সাংহাই বন্দরে পৌঁছয়। রবীন্দ্রনাথ জাহাজ থেকেই এল্‌ম্‌হার্স্টকে লেখেন : 'I am glad to say there is no sign of Kadoori or of Shastri. Our Indian friends came and took away Kshiti Babu and company to their house. They wrestled with me for some

time and then gave up. I am the sole monarch in that cabin of mine'[৬৭] কিন্তু তিনিও জাহাজে অচল হয়ে থাকতে পারেননি, ইহুদি ব্যবসায়ী E.S. Kadoorie তাঁকে নিজের বাড়ি মার্বেল হলে নিয়ে যান। সন্ধ্যায় সেখানে ইহুদি-সঙ্ঘ World Zionist Organisation তাঁর সম্মানে একটি ভোজসভার আয়োজন করে। ইহুদিদের উপর রবীন্দ্রনাথের প্রভাব বর্ণনা করে উক্ত প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি Dr. Bension বলেন : 'It was no uncommon sight to see many of the Hebrew pioneers in Palestine who broke stones in the streets, drained the marshes, built bridges and constructed houses during the day, retire after sunset and read either of our poet Bialik or the songs of Tagore.'[৬৮] লন্ডনের *The Jewish Chronicle* [8 Aug] লেখে : 'A banquet was given by Mr. E.S. Kadoorie, at his residence, Marble Hall, Shanghai, on June 26th, in honour of the great Indin poet, Sir Rabindranath Tagore, Mr. Kadoorie welcomed the guest of Shanghai, and spoke of the value of his writings.' *Shanghai Times* [29 Jun]-এ ছাপা চিত্রপরিচিতি থেকে জানা যায়, শুক্রবার অর্থাৎ 27 Jun সন্ধ্যাতেও এখানে রবীন্দ্রনাথকে সংবর্ধনা জানানো হয়। ইহুদিদের পিতৃভূমি ও আত্মানুসন্ধানের প্রচেষ্টায় রবীন্দ্রনাথের সহানুভূতি ছিল এবং তিনি তা গোপনও করতেন না। পশ্চিম এশিয়ায় প্যালেস্টাইনীয়দের মধ্যে এইসব কথাবার্তার রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধে তিনি কতটা সচেতন ছিলেন তা জানা যায় না, তবে তখন তাঁদের মধ্যেও এই সচেতনতার জাগরণ ঘটেনি। মি. কাদুরি শান্তিনিকেতনে জলসরবরাহ করার জন্য টিউবওয়েল বসানোর উদ্দেশ্যে ৮০০০ টাকা দান করেন।

28 Jun [শনি ১৪ আষাঢ়] সুয়ামারু সাংহাই ছেড়ে হংকঙের উদ্দেশে রওনা হয়ে 1 Jul [মঙ্গল ১৭ আষাঢ়] সেখানে পৌঁছয়। রবীন্দ্রনাথের এই দিনের কার্যাবলির বিবরণ দিয়ে পরের দিনের *Shanghai Mercury* লেখে : 'Dr. Rabindranath Tagore was given an enthusiastic reception on his arrival here to-day by the Indian community who presented him with a eulogistic address and 9,000 rupees. This evening Dr. Tagore addressed a large gathering, including the Vice-Chancellor of the University of Hongkong, at the Confucian Club. Dr. Tagore will leave for Singapore to-morrow.' রবীন্দ্রনাথের ভাষণটি *Shanghai Times* পত্রিকা সম্পূর্ণ মুদ্রিত করে। উল্লিখিত অভিনন্দনপত্রটি রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত আছে।

আমরা আগেই বলেছি, রবীন্দ্রনাথের প্রাথমিক পরিকল্পনা ছিল তিনি এই যাত্রায় চিন ও জাপানের সঙ্গে বৌদ্ধ ও হিন্দু সভ্যতার ঐতিহ্যবাহী জাভা, বালি, শ্যাম প্রভৃতি দেশও পরিদর্শন করবেন। কিন্তু ক্লান্তি বা অন্য-কোনো অঘোষিত কারণে [কালিদাস নাগ রলাঁকে লিখেছেন, 'প্রস্তুত হবার জন্যে ভারতবর্ষে ফিরে যেতে রবীন্দ্রনাথ তাড়াহুড়ো করছেন।'] তিনি সেই যাত্রা বাতিল করে দেশে ফিরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। কিন্তু এইসব দেশ পরিভ্রমণ করে তার মূল্যায়ন করবেন এই শর্তেই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কালিদাস নাগকে ছুটি ও ভ্রমণের ব্যয় মঞ্জুর করেছিল। হংকঙে এসে তাঁদের সঙ্গে অ্যান্ডরুজের সাক্ষাৎ হয় ও তাঁরই মুখে তাঁরা জানতে পারেন স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় আকস্মিকভাবে 25 May [১১ জ্যৈষ্ঠ] তারিখে পরলোকগমন করেছেন। কালিদাস নাগ আগেই ঠিক করেছিলেন, তিনি রবীন্দ্রনাথের সহযাত্রী না হয়ে ফরাসি-ইন্দোচিনে গিয়ে কম্বোজ, আঙ্কোরভাট প্রভৃতি পরিদর্শন করবেন। এইজন্য 'কবির সঙ্গে একশো দিন' গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত তাঁর ডায়ারির শেষ

অনুচ্ছেদে 2 Jul [বুধ ২০ আষাঢ়] লেখেন : 'কবিকে প্রণাম করে সকলের কাছে বিদায়— দিনটা রতনজীর কাছে কাটিয়ে রাতে Indo-Chinaর জাহাজে Song Boতে এসে ঘুমান।'[৬৯]

রবীন্দ্রনাথ হংকঙে Repulse Bay হোটেলে উঠেছিলেন। এখান থেকে তারিখ ও স্বাক্ষর-হীন 'In haste'-এ এল্‌ম্‌হার্স্টকে লেখা একটি চিঠি পাওয়া যায় [দ্র *Purabi*/ 85, No. 23], তাতে তিনি সুরুলের বিভিন্ন সমস্যার উল্লেখ ছাড়াও লেখেন : 'I cannot think of South America for you in [the] immediate future. I wish I could see you before I leave for my tour. That may be possible if you come to see me in Spain sometime in October. We are going [to] start from Colombo about the end of September.' একটি ভ্রমণ শেষ না করেই আর-একটি ভ্রমণের পরিকল্পনায় তিনি ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন! নূতনের আহ্বানে এইরূপ ব্যাকুলতার পরিচয় তাঁর জীবনে পরেও দেখা যাবে।

হংকং থেকে তাঁরা কবে রওনা হন, তার সঠিক তারিখ পাওয়া যায়নি [*Shanghai Mercury*-র প্রতিবেদনে তারিখটি উল্লেখ করা হয়েছিল 3 Jul বৃহ ১৯ আষাঢ়]। এই সময়ে সেক্রেটারি এল্‌ম্‌হার্স্ট বা কালিদাস নাগ কেউই রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে নেই। ক্ষিতিমোহন সেন তাঁর চিরাভ্যস্ত দিনলিপিতে যাত্রাপথের বিবরণ রক্ষা করতেন কি না আমরা জানতে পারিনি, নন্দলাল বসুর এইরূপ অভ্যাস ছিল বলে জানা যায় না। রাণুকে দেওয়া প্রতিশ্রুতি অনুসারে চিনের উদ্দেশে যাত্রার বিবরণ রবীন্দ্রনাথ তাঁকে নিয়মিত লিখে পাঠিয়েছেন — কিন্তু পিকিঙে পৌঁছনোর পরে তাঁকে লেখা আর-কোনো চিঠি পাওয়া যায়নি, ফেরার পথে কাউকে লেখা তাঁর কোনো চিঠিই এতাবৎ আমাদের হাতে পৌঁছয়নি, সংবাদপত্রের বিবরণও রক্ষিত হয়নি। কেবল আনন্দবাজার পত্রিকা 10 Jul সংবাদ দিয়েছে : 'কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ তাঁহার সহকর্ম্মীগণকে লইয়া বিগত ৯ই তারিখে পিনাং-এ জাহাজে চড়িয়াছেন।'[৭০] নন্দলাল বলেছেন, সিঙ্গাপুরের কাছে এসে জাহাজ প্রচণ্ড টাইফুন ঝড়ের মুখে পড়ে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত কোনো ক্ষতি হয়নি। সিঙ্গাপুর থেকে কলকাতায় পাঠানো একটি টেলিগ্রামে জানানো হয় : 'Arrived safe All well Poet Governors guest'। নন্দলাল বলেন : 'ঠিক্ হলো, মালয়ের ভেতর দিয়ে আমরা মোটরে করে আসবো। একটা পোর্টে আমাদের নামিয়ে দিয়ে আর একটা পোর্টে তুলে নেবে। মালয়ের একটা পোর্টে নামলুম আমরা। মালয়ের ভেতর দিয়ে মোটরে চলি। মাঝ রাস্তায় ভীষণ জঙ্গল। দেখতে দেখতে এলুম। ··· আমরা তখনও কুয়ালালামপুরে পৌঁছইনি। ওখানেই আমরা আবার আমাদের জাহাজে উঠবো। কিন্তু কারগো বোটটি আমাদের পৌঁছবার আগেই ওখানে পৌঁছে গেছে। পৌঁছে আমাদের জন্যে অপেক্ষা করছে। এতে ওদের খুবই ক্ষতি হয়। সে সত্ত্বেও গুরুদেবের খাতিরে ওরা দু-একদিন অপেক্ষা করে রইলো। কুয়ালামপুরে পৌঁছবার পরে আবার আমাদের তুলে নিলে।'[৭১]

বিভিন্ন বন্দর ছুঁয়ে সুয়ামারু রেঙ্গুনে পৌঁছয় 12 Jul [শনি ২৮ আষাঢ়]। 15 Jul আনন্দবাজার পত্রিকা লেখে :

কলিকাতায় আসিবার পথে শ্রীযুত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর গত ১২ই জুলাই রেঙ্গুনে অবতরণ করিয়াছিলেন। এসোসিয়েটেড প্রেসের জনৈক প্রতিনিধিকে কবি বলিয়াছেন যে, "যেনাহং নামৃতা স্যাম্ তেনাহং কিংকুর্য্যাম্"— মৈত্রেয়ীর এই বাক্যে এশিয়ার যে অমরবাণী প্রকাশ লাভ করিয়াছিল, এশিয়া যাহাতে ঐ আপন বাণীকে পুনরায় লাভ করিতে পারে, তাহার সহায়তা করাই কবির প্রাচ্য দেশসমূহে ভ্রমণের উদ্দেশ্য। তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস এই যে, চীনে এবং বিশেষভাবে জাপানে এই বাণী সাড়া পাইয়াছে এবং এই দুই দেশ ও ভারতবর্ষের মধ্যে আদর্শের আদান-প্রদানের পথ উন্মুক্ত হইয়াছে। তিনি বহুবারই বলিয়াছেন যে, পাশ্চাত্যের আধুনিক বৈষয়িক আদর্শ হইতে এশিয়ার আদর্শ সম্পূর্ণ বিভিন্ন। বর্ত্তমানে চীন ও জাপানে ভ্রমণের অভিজ্ঞতা হইতে নিশ্চিতরূপে বুঝিয়াছেন যে, এখনো এশিয়ার আধ্যাত্মিক অনুভূতি নষ্ট হইয়া যায় নাই। এশিয়ার সর্ব্বত্রই এই

চেতনা সঞ্চারিত হইয়াছে যে, এশিয়া অদূর ভবিষ্যতে বহুকালের আড়ষ্টতা হইতে জাগ্রত হইয়া প্রাণ দেওয়ার নয়,— প্রাণ নেওয়ার সত্য আদর্শকে কর্ম্মজীবনে পরিণত করিবে এবং এশিয়ার বিভিন্ন সভ্যতা ও জাতিসমূহ সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া বিশ্বমানবকে কল্যাণের পথে অগ্রসর করিয়া দিবে।

তাঁহার ভবিষ্যৎ কর্ম্মপদ্ধতি সম্বন্ধে প্রশ্ন করায় রবীন্দ্রনাথ বলেন যে, শান্তিনিকেতনে সপ্তাহ ছয়েক থাকিয়া তিনি স্পেনে যাইবেন এবং সেখান হইতে দক্ষিণ আমেরিকায় যাইবেন। ইটালীতেও যাইতে পারেন এবং নিমন্ত্রিত হইলে অন্যান্য দেশেও যাইতে পারেন, কিন্তু সে সম্বন্ধে কোন নিশ্চয়তা নাই।[৭২]

রেঙ্গুন থেকে রবীন্দ্রনাথ ঠিক কবে কলকাতায় পৌঁছবেন এই নিয়ে সংবাদপত্রে পরস্পরবিরোধী সংবাদ প্রকাশিত হয়। শেষ পর্যন্ত 17 Jul [বৃহ ১ শ্রাবণ] বিকেল পাঁচটার সময়ে সুয়ামারু জাহাজ ৩নং এসপ্লানেড জেটিতে পৌঁছয়। বিরাট এক জনতা রবীন্দ্রনাথকে অভ্যর্থনা করার জন্য বহু পূর্ব থেকে সেখানে উপস্থিত ছিল, ডাঃ নীলরতন সরকার, প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ, সমরেন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ, কুমুদিনী বসু প্রভৃতি বিশিষ্ট ব্যক্তিরাও তাঁদের মধ্যে ছিলেন। আনন্দবাজার লেখে : 'রবীন্দ্রনাথ জাহাজ হইতে বতরণ করিবার সময় তাঁহার ফটো গ্রহণ করা হয় এবং তাঁহাকে মাল্যবিভূষিত করিয়া মোটর গাড়ীতে করিয়া বাড়ীতে লইয়া যাওয়া হয়। ··· এসোসিয়েটেড্ প্রেসের জনৈক প্রতিনিধির নিকট রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন যে, এতদিন পর্য্যন্ত এশিয়া চুপ করিয়াছিল, এখন তাহাকে মুখ খুলিতে হইবে। পাশ্চাত্য সভ্যতা, বিজ্ঞানের উন্নতিবিধান করিয়াছে, কিন্তু তাহারা আত্মার শান্তি প্রদান করিতে পারে না। পাশ্চাত্য সভ্যতা ক্রমশঃ ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে। এখন এশিয়াকে জাগিয়া উঠিতে হইবে এবং সমাজকে রক্ষা করিতে হইবে। রবীন্দ্রনাথ আরও বলেন যে, জাপান এ বিষয়ে জাগিয়া উঠিতেছে। তাহারাই প্রথমে এশিয়ার ফেডারেশন আন্দোলন আরম্ভ করিবে।'[৭৩]

চিনের যাত্রাপথে রাণুকে লেখা রবীন্দ্রনাথের বেশ-কিছু চিঠি থেকে যাত্রার বিবরণ আমরা সংকলন করে দিয়েছিলাম। কিন্তু পিকিঙে পৌঁছবার পরে আর-কোনো চিঠির সন্ধান আমরা পাইনি। দেশে ফিরে পরের দিন [২ শ্রাবণ] তিনি রাণুকে লিখলেন :

স্টীমার পৌঁছতে একদিন দেরি হয়ে গেল। তাই কাল ১৭ই এসেচি।

তোমাকে কথা দিয়ে গিয়েছিলুম যে ঘাটে ঘাটে তোমাকে চিঠি লিখব। তাই লিখেও ছিলুম। তার পরে পিকিনে গিয়ে যখন তোমার কোনো চিঠি পেলুম না, তখন আমার আর লেখবার দায়িত্ব রইল না। এবার এত ব্যস্ত ছিলুম যে দেশে দুই একখানা ছাড়া কাউকে চিঠি লিখিই নি। কোনোমতে সময় করে তোমাকে লিখেছিলুম— এত অজস্র চিঠি পেয়ে তোমার বোধ হয় চিঠি পাবার ক্ষিদে মরে গিয়েছিল[৭৪]

রবীন্দ্রনাথ চিনে থাকার সময়ে 25 May [রবি ১১ জ্যৈষ্ঠ] কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ভাইস-চ্যান্সেলার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মাত্র ৬০ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করেন। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ ও পারস্পরিক শ্রদ্ধার সম্পর্ক ছিল। সুতরাং তাঁর মতো হিতৈষীর অকালপ্রয়াণে রবীন্দ্রনাথ যে শোকাহত হবেন তা খুবই স্বাভাবিক। তাঁর মনোবেদনা প্রকাশ পেল একটি ইংরেজি রচনায়, 'Ashutosh Mukherji' শিরোনামে সেটি বিশ্বভারতী কোয়ার্টার্লি-র Jul 1924 [pp. 196–97]-সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। এটি কবে লেখা আমাদের জানা নেই, তবে রচনাটি জুলাই সংখ্যায় ছাপা হয়েছিল বলে অনুমান করা চলে সেটি বর্তমান সময়েই লেখা — মনে রাখতে হবে, খবরটি অ্যান্ডরুজ-মারফৎ 1 Jul হংকঙে তাঁর কাছে পৌঁছেছিল।

আশুতোষের স্মৃতির উদ্দেশে শ্রদ্ধা নিবেদন করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ লিখলেন :

Men are always rare in all countries through whom the aspiration of their people can hope to find its fulfilment, who have the thundering voice to say that what is needed shall be done; and Ashutosh had that magic voice of assurance. He had the courage to dream because he had

the power to fight and the confidence to win,— this will itself was the path to the goal.... My admiration was attracted to him where he revealed the freedom of mind needed for work of creation....

...Ashutosh heroically fought against heavy odds for winning freedom for our education. We, who in our own way, have been working for the same cause, who deserve to be treated as outlaws by the upholders of law and order in the realm of the dead, had the honour of receiving from him the extended hand of comradeship, for which we shall ever remember him....

Ashutosh Mukherji touched the Calcutta University with the magic wand of his creative genius, in order to transform it into a living organism belonging to the life of the Bengali people.

৫ শ্রাবণ [সোম 21 Jul] সন্ধ্যা সাড়ে ছ'টায় বিশ্বভারতী সম্মিলনীর উদ্যোগে রবীন্দ্রনাথ য়ুনিভার্সিটি ইনস্টিট্যুট হলে তাঁর চিন ও জাপান সফরের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেন। একটি সংবাদপত্র লেখে : 'The hall was packed to suffocation, and the poet had once or twice to stop speaking becuse of the perhaps unavoidable noise from one or other corner.' সজনীকান্ত দাস স্মৃতিচারণে লিখেছেন, এই সভাতে তিনি রবীন্দ্রনাথের ভাষণের অনুলেখন নেবার জন্য আহূত হয়েছিলেন। 'মহাচীন কর্তৃক সম্মানার্ঘ স্বরূপ প্রদত্ত স্বর্ণ-পীত-ক্ষৌম-বহির্বাস-পরিহিত কবি সেদিন রবির উজ্জ্বল দীপ্তিতেই প্রতিভাত হইয়াছিলেন। সভার শেষে অনুলিখিত ভাষণটি লইয়া তাঁহার নিকট হাজির হইলাম। তিনি কিঞ্চিৎ সংশোধন ও পরিবর্তন করিয়া সেইটিকেই বহাল রাখিয়া আমাকে সম্মানিত করিলেন।[৭৫] কিন্তু রবীন্দ্রনাথের দীর্ঘ মৌখিক ভাষণের 'শ্রীযুক্ত ইন্দ্রকুমার চৌধুরীর অনুলেখনের সংশোধিত সংস্করণ' 'চীন ও জাপানে ভ্রমণবিবরণ' শিরোনামে কার্তিক-সংখ্যা [পৃ ৮৯—১০১] প্রবাসী-তে মুদ্রিত হয়।

তখন অনেক রাজনৈতিক নেতা নিখিল-এশিয়া সংহতির [Pan-Asiatic Federation] স্বপ্ন দেখছিলেন, রবীন্দ্রনাথ নিজেও কলকাতায় ফিরে সাংবাদিকদের কাছে তার সম্ভাবনার কথা উল্লেখ করেন, কিন্তু এখানে তিনি বললেন, এমন কোনো উদ্দেশ্য নিয়ে তিনি চিন ও জাপানে যাননি, 'প্যান্-এসিয়াটিক্ মিলনের দুঃস্বপ্ন আমি দেখিনে, ওটা নাইট-মেয়ার, প্যান্-শব্দকে আমি ভয় করি, এটা অবাস্তব কথা, তা'তে সত্যিকার মিলন হবে না।' চিনবাসীরা তাঁকে বহুবার বলেছেন, দুই দেশের মধ্যে পূর্বাপর যে-মিলন ও ধর্মগত ঐক্য আছে তাকে সঞ্জীবিত করবেন। রবীন্দ্রনাথও তা-ই চেয়েছেন, কিন্তু পোলিটিক্যাল শক্তি লাভের জন্য নয়, তাতে তাঁর বিশ্বাস নেই— তিনি চান পরস্পরের মধ্যে আদানপ্রদানের মাধ্যমে উভয়ের সত্য সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠা করতে। চিনে তিনি যে আন্তরিক অভ্যর্থনা পেয়েছেন তা আমেরিকা বা অন্য পশ্চিমি দেশে পাননি। কিন্তু "নিছক সম্মান পাওয়ার সৌভাগ্য আমার হয়নি। সেখানেও এক-দল লোক আছে, তা'ও বলি তাদের দল খুব ভারী নয়, তা'রা বলে, 'এ-লোকটি ভারতবর্ষ থেকে এসেছে আমাদের মাথা খারাপ করতে, আমরা এখন এই সমস্ত কথা, ভারতবর্ষের বাণী, বৌদ্ধ-ধর্ম্ম যা দিয়েছে, শুনতে পারিনে। তা'তে ক্ষতি হয়েছে, গায়ের জোর কমিয়ে দিয়েছে, হিংসা

প্রভৃতি খর্ব করেছে। এ লোকটি একে কবি, তা'তে ভারতবাসী, এ আমাদের মাথা খারাপ কর্‌তে পারে।' ··· আমাকে কেউ অসম্মান-সূচক কিছু বলেনি··· যদিও বক্তৃতার ফলাফল লক্ষ্য ক'রে তা'রা বিচলিত হয়েছে।"

মালয়, চিন প্রভৃতি দেশের শ্রমজীবীদের সমস্যাও তাঁর ভাষণে স্থান পেয়েছিল।

এই ভাষণের পরের দিন ৬ শ্রাবণ [মঙ্গল 22 Jul] বিকেলে রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে প্রত্যাবর্তন করলে আশ্রমবাসীরা তাঁকে সাড়ম্বর অভ্যর্থনা জানান; আষাঢ়-সংখ্যা শান্তিনিকেতন-এ [পৃ ১১৫] লেখা হয় :

গত ৬ই শ্রাবণ বিকালবেলা পূজনীয় গুরুদেব দীর্ঘ প্রবাসের পর আশ্রমে শুভাগমন করিয়াছেন। তাঁহার অভ্যর্থনার বিশেষ ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। সকাল হইতেই রসুনচৌকির রাগিণীতে উৎসবের দিন নির্দ্দেশ করিয়া দিতেছিল। আশ্রমের প্রবেশপথ তোরণ ও মঙ্গল-কলসীতে সুসজ্জিত হইয়াছিল; আশ্রমের ছাত্রীগণ পীতবসনে তাঁহার মস্তকে লাজ বর্ষণ করিয়াছিল— ছাত্রগণ তাঁহার চারিপার্শ্বে ধ্বজা, ছত্র প্রভৃতি ধারণ করিয়াছিল— কেহ কেহ শঙ্খ বাজাইতেছিল। তাঁহাকে অভ্যর্থনার জন্য শিশুবিভাগের দালানটি সুচারুরূপে সজ্জিত হইয়াছিল।

পূজনীয় গুরুদেব আসন গ্রহণ করিলে শাস্ত্রীমহাশয় তাঁহাকে মাল্যচন্দনে সজ্জিত করেন। তৎপরে বেদগান হয় ও শাস্ত্রীমহাশয় তাঁহাকে সংস্কৃত ভাষায় ['তাত, ইতশ্চীনান্ প্রাপ্য' ইত্যাদি দ্র শান্তিনিকেতন, ভাদ্র। ১৫০] আশ্রমবাসিগণের পক্ষে ভক্তিজ্ঞাপন করেন। তদুত্তরে গুরুদেব নিজের বক্তব্য প্রকাশ করেন।

ক্ষিতিমোহনও তাঁর সঙ্গে আশ্রমে আসেন। তাঁকেও সভাস্থলে মাল্যচন্দনে অভিনন্দিত করা হয়। এর কয়েকদিন আগে নন্দলাল ফিরে আসেন; তাঁকে অভ্যর্থনার জন্য বিধুশেখর ও নেপালচন্দ্র রায় স্টেশনে গিয়েছিলেন।

৬ শ্রাবণ শান্তিনিকেতনে ফিরে রবীন্দ্রনাথ ২৪ শ্রাবণ পর্যন্ত সেখানে ছিলেন। এই সময়ে তাঁর কার্যাবলির মধ্যে জানা যায়, 'চীন হইতে প্রত্যাগমন করিয়া পূজনীয় গুরুদেব একদিন আর্ট সম্বন্ধে বক্তৃতা করিয়াছিলেন। তাহা পরে প্রকাশিত হইবে।' কিন্তু এই প্রতিশ্রুতি রক্ষিত হয়নি। তাছাড়া কবি রাধারাণী দেবী ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের অধ্যাপক রমেশচন্দ্র মজুমদারকে লেখা তাঁর দুটি পত্র পাওয়া যায়; যামিনীকান্ত সেন উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলার অধ্যাপক পদে প্রার্থী হয়েছেন, তাঁর আনুকূল্য করার জন্য তিনি রমেশচন্দ্রকে অনুরোধ করেন।[৭৬]

অপর একটি তারিখহীন [?২২ শ্রাবণ] পত্রে তিনি রাণুকে লিখেছেন : 'আসচে শনিবারে কলকাতায় যাব সেই খবরটা দেবার জন্যে তোমাকে এই চিঠি লিখচি। আজ আমাদের এখানে একটা চা-সভা স্থাপন হবে তার অনুষ্ঠানে ব্যস্ত আছি। চীন দেশ থেকে চায়ের সরঞ্জাম এবং চা ও নানা রকম খাবার তারা এইজন্যে দিয়েচে তাই আমার এক চীনবন্ধুর নামে এই সভার প্রতিষ্ঠা হবে। সময় প্রায় হয়ে এল— একটা গান তৈরি করেচি সেটা এই উপলক্ষে গাইতে হবে।'[৭৭] প্রসঙ্গটির বিস্তীর্ণ বর্ণনা পাওয়া যায় শ্রাবণ-সংখ্যা শান্তিনিকেতন-এ [পৃ ১২৯–৩০] মুদ্রিত 'সুসীম চা-চক্র প্রবর্ত্তনা'-শীর্ষক প্রতিবেদনে। চিনে তাঁর দোভাষী কবি-বন্ধু সু সী-মো-র নামানুসারে চা-চক্রের এই নামকরণ হয়।

নন্দলাল বলেছেন, চা-চক্র প্রথমে বসত দিনেন্দ্রনাথের দেহলির এক তলার বাসস্থানে, পরে তাঁর সুরপুরীর আবাসে। এর পর সেটি উঠে যায় লাইব্রেরির [বর্তমান পাঠভবন অফিস] উপরতলায়। একতলায় তখন বিদ্যাভবনের একটি লম্বা হলঘর ছিল, বিদ্যাভবনের কাজে লাগত না বলে তখন কলাভবন স্থানটিকে ব্যবহার করত। রবীন্দ্রনাথ সুসীম চা-চক্রের উদ্বোধন করেন এই হলঘরে।[৭৮] তিনি এই উপলক্ষে 'হায় হায় হায় দিন চলে চলি যায়। / চা-স্পৃহ চঞ্চল চাতকদল চল' চল' চল' হে' গানটি রচনা করেন [দ্র গীত ২। ৫৯৮–৯৯;

স্বর'১৩], দিনেন্দ্রনাথের নেতৃত্বে গানটি সমবেত কণ্ঠে এই অনুষ্ঠানে গীত হয়। বর্ষাঋতুর জন্য চা-চক্রের 'চক্রবর্তী' নির্বাচিত হন দিনেন্দ্রনাথ। শান্তিনিকেতন-এ লিখিত হয় :

পূজনীয় গুরুদেব চীন হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া একটি চা-বৈঠকের প্রবর্ত্তন করিয়াছেন— ইহার নাম সুসীম চা-চক্র। সু-সুমো নামে বিশ্বভারতীর একজন বিশিষ্ট চীনীয় বন্ধু আশ্রমে একটি চা বৈঠক স্থাপনের জন্য প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। তাঁহারই নামে ইহার নামকরণ করা হইয়াছে।

পূজনীয় গুরুদেব প্রথমে এই চক্রের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করেন। প্রথমত, ইহা আশ্রমের কর্ম্মী ও অধ্যাপকগণের অবসরসময়ে একটি মিলনের ক্ষেত্রের মতো হইবে— যেখানে সকলে একত্র হইয়া আলাপ-আলোচনায় পরস্পরের যোগসূত্র দৃঢ় করিতে পারিবেন।

দ্বিতীয়ত, চীনদেশে চা-পান একটি আর্টের মধ্যে গণ্য। সেখানে ইহা আমাদের দেশের মতো যেমন-তেমন ভাবে সম্পন্ন হয় না। তিনি আশা করেন, চীনের এই দৃষ্টান্ত আমাদের ব্যবহারের মধ্যে একটি সৌষ্ঠব ও সুসঙ্গতি দান করিবে।

বর্ষাঋতুর জন্য শ্রীযুত দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় চা-চক্রের চক্রবর্তী পদে অভিষিক্ত হইলেন। তৎ পরে সমাগত নিমন্ত্রিতগণ চীন হইতে আনীত খাদ্য আনন্দের সহিত ভোজন করিলেন।

রাণুকে লেখা চিঠি অনুসারে রবীন্দ্রনাথ ২৪ শ্রাবণ [শনি 9 Aug] কলকাতায় যান। এর পরে সেখানে তাঁর বেশ-কিছুদিন কাটে। কলকাতায় এই সময়ে তাঁর নিয়মিত বসবাস ছিল না বলে এখানে অবস্থানকালে তাঁর 'আহার্যব্যয়' অভিধায় একটি নূতন হিসাব ক্যাশবহিতে যুক্ত হল যা থেকে তাঁর জোড়াসাঁকোর বাড়িতে থাকার প্রমাণ সংগ্রহ করা যায়। এইরূপ ব্যয়ের উল্লেখ তাঁর এই যাত্রায় আছে ১৫ ভাদ্র [রবি 31 Aug] পর্যন্ত।

এখানে থাকার সময়ে তিনি অনেকগুলি অনুষ্ঠানে যোগ দেন। ২৮ শ্রাবণ [বুধ 13 Aug] আনন্দবাজার পত্রিকা-য় লেখা হয় : 'বিশ্বভারতী সম্মিলনী :— অদ্য বুধবার অপরাহ্ন ৬ ॥ ঘটিকার সময় রামমোহন লাইব্রেরী গৃহে শ্রীযুত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পাঠ ও বক্তৃতা করিবেন। বিশ্বভারতী কার্য্যালয়ে ও সভাস্থলে দ্বারদেশে দর্শকদের জন্য পরিমিত সংখ্যক চারি আনা মূল্যের টিকেট পাওয়া যাইবে।'[৭৯]

পরদিন ২৯ শ্রাবণ [বৃহ 14 Aug] বিকেল পাঁচটার সময়ে সিনেট হলে আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের স্মৃতিসভায় রবীন্দ্রনাথের সভাপতিত্ব করার কথা ছিল। বেলা তিনটের মধ্যেই হলটি ভর্তি হয়ে গেলে ডাঃ নীলরতন সরকার, হেরম্বচন্দ্র মৈত্র প্রভৃতি বিশিষ্ট ব্যক্তিরাও প্রবেশ করতে না পেরে ফিরে যান। আনন্দবাজার পত্রিকা [৩০ শ্রাবণ] লিখেছে : 'বেলা ৫টার সময় সভার কার্য্য আরম্ভ হয়। রবীন্দ্রনাথ সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। রবীন্দ্রনাথ বক্তৃতা দিতে উঠিলে গণ্ডগোল এত বেশী হয় যে, তাঁহার গলার স্বর শোনা যায় নাই, তখন রবীন্দ্রনাথ শ্রীযুত চিত্তরঞ্জন দাসকে সভাপতির আসন গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিয়া সভা পরিত্যাগ করেন। তার পর শ্রীযুত বিপিনচন্দ্র পাল আশুতোষের চরিত্রের মহিমা কীর্ত্তন করিয়া ছাত্রদিগের ভক্তিজ্ঞাপন করিয়া একটি প্রস্তাব উত্থাপন করেন। ছেলেরা সকলে নানাপ্রকার ব্যঙ্গোক্তি করিয়া গণ্ডগোল করিতে থাকে। বিপিনবাবু সভাস্থল পরিত্যাগ করেন। তারপর শ্রীযুত চিত্তরঞ্জন দাশ সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। তিনি সকলকে থামিতে অনুরোধ করেন। কিন্তু তাহাতে কোন ফল হইল না। শ্রীযুত সুভাষচন্দ্র বসু বক্তৃতা দিতে উঠিলে সকলে "লজ্জা লজ্জা" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠে। আরও দুই একজন বক্তৃতা দিবার পর ডাঃ প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সভাপতিকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিয়া সভা ভঙ্গ করেন।'[৮০] পরদিন পত্রিকাটি এই ঘটনা সম্পর্কে মন্তব্য করে : "ফরওয়ার্ডে" প্রকাশিত বিবরণে দেখা যায় যে, শ্রীযুত সুভাষচন্দ্র বসু বক্তৃতা করিতে উঠিলে শ্রোতৃবর্গ স্তব্ধ হইয়া তাঁহার কথা শুনিয়াছেন। দেশবন্ধু দাশের বক্তৃতার সময়েও কোন গোলমাল বা চীৎকার হয় নাই।'[৮১] দুটি সংবাদপত্রের এই দুই বিপরীত প্রতিবেদন আমাদের বিভ্রান্ত করে। বস্তুত ছাত্র ও জনসাধারণের মধ্যে গোষ্ঠী-রাজনীতির অনুপ্রবেশ ও বিকাশ ঘটার সূত্রপাত এই সময় থেকেই এবং এ ব্যাপারে

সর্বাধিক অনুপ্রেরণা ও উদ্যম দেখা গেছে উক্ত দুই দেশবরেণ্য নেতার কার্যকলাপে— যার বিষময় ফল এখন আমরা তীব্র যন্ত্রণার সঙ্গে আস্বাদন করছি!

মেট্রোপলিটান [বর্তমান বিদ্যাসাগর] কলেজের সুবিখ্যাত ইংরেজির অধ্যাপক শিশিরকুমার ভাদুড়ী [1889–1959] নাট্যাভিনয়ের নেশায় অধ্যাপনা ত্যাগ করে পেশাদারি রঙ্গমঞ্চে যোগ দেন। পরে মনোমোহন থিয়েটার ইজারা নিয়ে শিশিরকুমার নাট্যমন্দির নামে নিজের পরিচালনা ও পরিকল্পনায় নাট্যাভিনয়ের আয়োজন করেন, যার উদ্বোধন হল 6 Aug 1924 [বুধ ২১ শ্রাবণ] তারিখে যোগেশ চৌধুরী-রচিত 'সীতা' নাটকের অভিনয় দিয়ে। শিশিরকুমার অনেকগুলি অভিনবত্বের প্রবর্তন করেন এই প্রযোজনায়— কনসার্টের বদলে রশনচৌকি, বসার আসনে বাংলা অক্ষর, প্রবেশপথে আলপনা ও পূর্ণকলস, পাদপ্রদীপের পরিবর্তে আলোকসম্পাত, সীনের পরিবর্তে বক্সসেট ইত্যাদি। গীতরচনা, নৃত্য, দৃশ্যপট ও সাজসজ্জার পরিকল্পনায় ছিলেন হেমেন্দ্রকুমার রায়, মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় ও চারুচন্দ্র রায়, ঐতিহাসিক বিষয়ে পরামর্শ দেন রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়। এঁদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন রবীন্দ্রনাথের কাছের মানুষ। আমরা আগেই বলেছি, চলচ্চিত্রায়ণের জন্য শিশিরকুমার 'রাজর্ষি' উপন্যাসের স্বত্ব ক্রয় করেছিলেন। এইসবের ফলস্বরূপ তাঁর আমন্ত্রণে রবীন্দ্রনাথ রঙ্গালয়ে এলেন উদ্বোধনের মাত্র কয়েকদিন পরে ১ ভাদ্র [রবি 17 Aug]। তাঁর আগমনের সংবাদ দিয়ে 'নাচঘর' [৬ ভাদ্র] সাপ্তাহিক লেখে : 'গত রবিবার মনোমোহন নাট্যমন্দিরের পক্ষে একটি স্মরণীয় দিন। কারণ 'সীতা'-র অভিনয়ে সে রাত্রে পৃথিবীর বর্তমান যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি রবীন্দ্রনাথের শুভাগমন হয়েছিল। অভিনয়ের শেষ পর্যন্ত না দেখে তিনি আসন ত্যাগ করেন নি। অভিনয় যে তাঁর ভালো লেগেছিল, রবীন্দ্রনাথ নিজেই তা প্রকাশ ক'রে গেছেন। রবীন্দ্রনাথের প্রশংসা লাভ করা বাঙালী অভিনেতার ভাগ্যে এই প্রথম।'[৮২]

কিন্তু শিশিরকুমারের একটি বিরোধী নাট্যগোষ্ঠী তাঁর অপপ্রচারে ব্রতী ছিল। অমল মিত্র লিখেছেন : 'শিশিরকুমার ও তাঁর সম্প্রদায়ের অভিনয়কে দর্শকের চোখে হেয় করার উদ্দেশ্যে কাগজের মারফৎ নাট্যমন্দিরের বিরুদ্ধে তাঁরা অভিযান চালালেন। শুধু তাই নয়, বহু গুণীজন প্রশংসিত সীতা-র অভিনয় ও শিল্পীবৃন্দকে ব্যঙ্গবিদ্রূপ করে অশ্লীল ভাষায় লেখা এক পুস্তিকা বেরুল। নাম 'রামায়ণে আর্ট'। লেখক বা প্রকাশকের নাম ছিল না তাতে, ছাপাখানার নামও ছিল না। বিনিপয়সায় শহরে সেটি বিলি করা হয়। ··· কাগজের মারফৎ রচনা প্রকাশ পেল, সীতার অভিনয় রবীন্দ্রনাথের একেবারেই ভাল লাগেনি।'[৮৩]

এই অপপ্রচারের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য শিশিরকুমারের বন্ধু অবনীন্দ্রনাথের জামাতা মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় রবীন্দ্রনাথকে অনুরোধ করেন নাট্যাভিনয় সম্পর্কে কিছু লেখার জন্য। তিনি প্রত্যুত্তরে ১২ ভাদ্র [বৃহ 28 Aug] মণিলালকে লেখেন :

> কাগজে নিজের জবানীতে অভিনয় সম্বন্ধে কিছু লেখা আমার পক্ষে সম্ভবপর নয়। তুমি লিখে দিতে পার যে শিশির ভাদুড়ির প্রয়োগনৈপুণ্য সম্বন্ধে আমার বিশেষ শ্রদ্ধা আছে সেই কারণেই ইচ্ছাপূর্বক আমার দুই একটা নাটক অভিনয়ের ভার তাঁর হাতে দিয়েছি। সীতা বইটিকে আমি একটুও পছন্দ করি নে— ওটা নাটকই নয়— এইজন্যই এ নাটক অবলম্বন করে অভিনয়ের উৎকর্ষ দেখানো কঠিন— তৎসত্ত্বেও শিশিরবাবু নিজের ক্ষমতার জোরে এ-বইটিকেও চালিয়ে দিতে পেরেছেন। তুমি আমার কাছ থেকে এ সব কথা শুনেছ বলে লিখতে পার।[৮৪]

মণিলাল ২০ ভাদ্র নাচঘর-এ উক্ত অপপ্রচারের জবাব দিতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথের পত্রের কয়েকটি বাক্য উদ্ধৃত করলে প্রতিপক্ষ চিঠিটিকে জাল বলে ইঙ্গিত করে, এমন-কি রবীন্দ্রনাথকেও আক্রমণ ক'রে তাঁর ব্যঙ্গচিত্র ছাপায়। নাচঘর-সম্পাদক ঘোষণা করেন, রবীন্দ্রনাথের চিঠি জাল প্রমাণ করতে পারলে তিনি হাজার টাকা পুরস্কার দেবেন। এইসব সংবাদ জানতে পেরে রবীন্দ্রনাথ 13 Sep [শনি ২৮ ভাদ্র] মণিলালকে আবার লেখেন :

আমি শুনে অত্যন্ত দুঃখিত হলুম যে, সীতা অভিনয়ের পর আমার নাম নিয়ে কোনো কোনো লোক শিশির ভাদুড়ীর নিন্দা রটনা করছে। যদি প্রয়োজন হয় তুমি জানাতে পার যে তাদের কারো সঙ্গে আমার কোনো প্রকার আলাপ মাত্রই হয়নি— এবং শিশিরকে আমি ক্ষমতাশালী লোক বলেই জানি।

আমি শীঘ্রই বিদেশ যাচ্ছি— আশঙ্কা হচ্ছে আমার অনুপস্থিতিকালে এইরূপ মিথ্যা রটনা প্রশ্রয় পাবে। তোমার উপর ভার রইল তুমি এদের মিথ্যাচরণের প্রতিবাদ করবে।[৮৫]

নাচঘর-সম্পাদকের চ্যালেঞ্জের জবাবে প্রতিপক্ষের কেউ এগিয়ে আসেনি, সুতরাং বিতর্কটির এখানেই অবসান ঘটে।

এই সময়ে রবীন্দ্রনাথ নিজেই একটি বিতর্কে জড়িয়ে পড়লেন। বাংলার গবর্নর লর্ড লিটন ঢাকার পুলিশ প্যারেডে পুলিশের কাজের প্রশংসা করতে গিয়ে বলেন : 'The thing that has disturbed me more than anything else since I came to India is to find that mere hatred of authority can drive Indian men to induce Indian women to invent offences against their own honour merely to bring discredit upon Indian policemen.' তখন ফরিদপুর জেলার চরমনাই গ্রামে মহিলাদের উপর পুলিশি অত্যাচার সম্পর্কে একটি মামলা বিচারাধীন ছিল। লিটনের ভাষণ সম্পর্কে অভিযোগ ওঠে যে, তিনি তাঁর উক্তির দ্বারা উক্ত মামলাকে প্রভাবিত করার চেষ্টা ও ভারতীয় নারীদের চরম অসম্মান করেছেন। কলকাতার টাউন হলে এক বিরাট সভায় সরোজিনী নাইডু ও বিভিন্ন নেতারা লিটনকে ধিক্কার জানান। তখনকার দিনে সংবাদপত্রে প্রকাশিত বা কোনো সভায় আলোচিত প্রস্তাব সম্পর্কে প্রকাশ্যে মন্তব্য করা গবর্নরের মতো রাজপুরুষদের ক্ষেত্রে রীতিবিরুদ্ধ ছিল। কিন্তু 'ব্যক্তি' লিটন এই সমালোচনায় বিব্রত হয়ে এর উত্তর দিতে আগ্রহী হন। কিন্তু উত্তর দেওয়ার জন্য তাঁর একটি উপলক্ষের প্রয়োজন ছিল, যেটি রবীন্দ্রনাথ তাঁকে সরবরাহ করলেন 22 Aug [শুক্র ৬ ভাদ্র] একটি পত্র লিখে তাঁর উক্তির তাৎপর্য ব্যাখ্যা করার আহ্বান জানিয়ে :

I am being urged by my countrymen to assist them in giving expression to their sense of indignation at the remark made by Your Excellency in referring to the complaint regarding police outrages on Indian woman.

There can be no room for doubt that the great majority of my countrymen who have come across Your Excellency's reported words have been profoundly hurt by what they have taken them to mean— a meaning so far as I am aware which has upto now have not been authoritatively stated to have been wrongly attributed to those words.

At the same time knowing what I do of Your Excellency personally and of the traditions of chivalry which are your inheritance, I find it extremely difficult to believe that it could have been Your Excellency's intention to cast aspersions on the fair names of women of our country or even to hurt the feelings of my countrymen.

So I feel that I owe it to Your Excellency, no less than to myself, frankly to write and ask what Your Excellency's real meaning was, before saying anything further about the matter.

Trusting Your Excellency will excuse any liberty which I may have unknowingly taken.

লিটন এই সুযোগ ত্যাগ করেননি, তিনি পরদিনই তাঁর বক্তব্য ব্যাখ্যা করে রবীন্দ্রনাথকে একটি চিঠি পাঠিয়ে লেখেন, তিনি যে-সব কথা ব্যবহার করেছেন তাদের কয়েকটির ইংরেজি ভাষায় একরূপ অর্থ হয় ও বাংলা ভাষায় তাদের অর্থ অন্যরূপ। তিনি শুনেছেন, Indian men কিংবা Indian women এবং men of India কিংবা women of India এই ইংরেজি কথাগুলির বাংলা অর্থ একই, কিন্তু ইংরেজি ভাষায় শেষোক্ত কথাগুলিতে ভারতবর্ষের পুরুষ ও নারীগণ বোঝালেও পূর্বের কথাগুলির অর্থ কতকগুলি ভারতীয় পুরুষ অথবা স্ত্রীলোক। তিনি তাঁর বন্ধুদের জানাতে চান, তিনি জাতি-দেশ-নির্বিশেষে নারীদের সম্মানের চোখে দেখেন— তাঁর পক্ষে নিজের দেশের নারীদের অপমান করা যেমন অসম্ভব, ভারতীয় নারীদের ক্ষেত্রেও তাই। 'আমি ঢাকায় বলিয়াছি যে, বাঙ্গলায় কোন কোন লোক অথবা কোন কোন দল রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে তাহাদের স্ত্রীলোকদিগকে নিজেদের সম্মানহানিকর অভিযোগ মিথ্যা করিয়া পুলিশের নামে আনয়ন করিতে উদ্বুদ্ধ করিয়াছে দেখিয়া আমি অত্যন্ত মর্ম্মাহত হইয়াছি। ... এই কথা বলিয়া আমি ভারতীয় স্ত্রীলোকদিগের এবং ভারতীয় পুরুষদিগের প্রতি কোনরূপ অসম্মান প্রদর্শন করি নাই অথবা কোন বিচারাধীন মামলার কথাও বলি নাই [আনন্দবাজার পত্রিকা-র অনুবাদ]।'[৮৬]

স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠল, রবীন্দ্রনাথ হঠাৎ লর্ড লিটনকে নিজে থেকে এমন একটা চিঠি লিখলেন কেন ও তাঁর চিঠি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই লিটনের উত্তর পাঠাবার কারণ কী? আনন্দবাজার লেখে [28 Aug] :

...আমাদের বিশ্বস্ত সংবাদদাতা 'নন্দীভৃঙ্গী' [আনন্দবাজার-সম্পাদক সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার] এ সম্বন্ধে বহু অনুসন্ধান করিয়া যাহা জানিতে পারিয়াছেন, তাহা 'আনন্দবাজারের' পাঠকবর্গের কৌতূহল তৃপ্তির জন্য আমরা নিম্নে লিখিলাম :—

"লর্ড লিটনের "ক্ষমা প্রার্থনা সূচক" পত্রখানি ২রা বা ৩রা আগস্ট তারিখে সেক্রেটারীয়েটের কারখানায় রচিত (Drafted) হয় এবং উহার ৫/৬খানি টাইপ করা নকল কয়েকজন বিশিষ্ট রাজভক্ত ব্যক্তিকে দেখানো হয়। তাঁহারা উহা অনুমোদন করেন। কিন্তু কি উপলক্ষ্য করিয়া বা কাহার পত্রের উত্তর স্বরূপ লর্ড লিটনের এই ক্ষমা প্রার্থনাসূচক পত্রখানি প্রকাশ করা হইবে, তাহা লইয়া বড় বড় সেক্রেটারী ও সচিবেরা মাথা ঘামাইতেছিলেন। প্রথম ঠিক হয় যে, স্যার দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারিকে দিয়া লর্ড লিটনকে একটা চিঠি লেখাইয়া, তাহার উত্তর স্বরূপ লর্ড লিটনের পত্রখানি বাহির করা হইবে। কিন্তু কেহ কেহ জানিতে পারেন যে, স্যার দেবপ্রসাদ এইরূপ কার্য্যে রাজী হইবেন না তখন নূতন সচিব নদীয়া ভূষণ মহারাজা ক্ষৌণীশচন্দ্র রবীন্দ্রনাথের নাম করেন। নামটি অনেকের মনঃপূত হয় এবং রবিবাবুকে লাট প্রাসাদে আহ্বানও করা হয়। কিন্তু রবিবাবু দুইবার নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করেন। শেষে জন্মাষ্টমীর দিন [22 Aug] স্বয়ং মন্ত্রী ফজলুল হক, রবিবাবুর বাড়ীতে যান এবং অনেক বলিয়া কহিয়া তাঁহাকে লাট ভবনে লইতে সমর্থ হন। লর্ড লিটনের সঙ্গে কথাবার্ত্তার ফলে রবীন্দ্রনাথ তাঁহাকে চিঠি লিখিতে স্বীকৃত হন, সেইদিনই রবীন্দ্রনাথ ও তাহার উত্তর স্বরূপ লর্ড লিটনের পত্র, সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইবার জন্য পাঠানো হয়।"[৮৭]

বক্তব্যটি সত্য, তার প্রমাণ দিয়েছেন রবীন্দ্রভবনের প্রাক্তন অবেক্ষক প্রয়াত সনৎকুমার বাগচী, তিনি লিখেছেন : 'গভর্নরের একান্ত সচিবের লেখা ২২ আগস্ট [১৯২৪]-এর চিঠি এবং সেই চিঠির উপরেই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মন্তব্য থেকে জানা যায় ২২ আগস্ট দুপুর তিনটে নাগাদ লাটভবনে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ

লিটনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। তাঁদের মধ্যে আলোচনার পরে ঠিক হয় রবীন্দ্রনাথ লিটনকে একটি চিঠি লিখে ঢাকায় প্রদত্ত ভাষণের বিতর্কিত কথাগুলি বিশ্লেষণ করার জন্য তাঁকে (লিটনকে) অনুরোধ করবেন। রবীন্দ্রনাথের মন্তব্য সহ একান্ত সচিবের চিঠিটি বিশ্বভারতী রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত আছে।'[৮৮] লিটনের চিঠি প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ 31 Aug [রবি ১৫ ভাদ্র] তাঁকে আর-একটি চিঠিতে লিখলেন, গবর্নরের চিঠিতে সকলে খুশি হননি, সুতরাং তাঁর বক্তব্য আরও খোলাখুলি লেখার প্রয়োজন আছে। তিনি লেখেন :

…যে সময় চরমনাইর মামলায় লোকের মন বিশেষ চঞ্চল, সে সময় সেরূপ ঘটনাকে বড় করিয়া তোলায় আমার দেশের লোক আপনার কথাগুলি ঐ মামলা সম্বন্ধে বলিয়াই মনে করিতে বাধ্য হইয়াছে। সেই জন্য আপনার ঐরূপ মন্তব্যে— অসময়ে, পুলিশ বিভাগের উপর আস্থা স্থাপনে ও পুলিশ কর্ম্মচারীদের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশে যে সকল ব্যক্তি হৃদয়ে সত্যই আঘাত পাইয়াছেন, তাঁহারা আপনার গবর্ণমেন্টকে কথিত অভিযোগের বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ উপস্থিত করিতে বলিতে প্রস্তুত :— সরকারী কর্ম্মচারীদের বিরুদ্ধে ঐরূপ বিশিষ্ট প্রকারের ষড়যন্ত্র বিরল বলিয়া আপনি যাহা বলিতে চাহেন, তাহারও প্রমাণ তাহারা চাহেন।[৮৯]

লিটন এই চিঠির উত্তর দেন 3 Sep দার্জিলিং থেকে, কিন্তু তাতেও তিনি কোনো প্রমাণ দেননি। যাই হোক, বিতর্কটির এখানেই অবসান ঘটে।

লর্ড লিটনের সঙ্গে সাক্ষাতের পরেও রবীন্দ্রনাথ কয়েকদিন কলকাতায় থাকেন। ১২ ভাদ্র [বৃহ 28 Aug] তিনি অমিয় চক্রবর্তীকে লেখেন : 'বঙ্গবাণী আজও পাইনি বলে' তথ্য ও সত্য বক্তৃতাটা পড়তে পারিনি। যা হোক তুমি যদি ওটা তর্জ্জমা করতে চাও ত রাজি আছি। আমি অভিনয়ব্যাপারে ব্যস্ত আছি।'[৯০] 'অভিনয়ব্যাপার'টি হল 'অরূপ রতন' নাটকটির আবৃত্তি-অভিনয় যাতে রাণু সুদর্শনার ভূমিকায় অভিনয় করেন। রবীন্দ্রনাথ এই কারণেই সম্ভবত এই দিনই রাণুকে লেখেন : 'বীরেনকে [সেন] যদি পাঠাই তোমাকে আনবার জন্যে তাহলে কি আস্‌তে পারবে? আমি বোধ হয় শীঘ্রই অর্থাৎ শনি রবিবারের মধ্যেই শান্তিনিকেতনে যাব। যদি আসতে পার তাহলে সেখানেই তোমাকে নিয়ে আস্‌বে। … যদি লোক পাঠালে তোমার আসা সম্ভব হয় তাহলে মাকে বোলো টেলিগ্রাফ করে দিতে। আজ বৃহস্পতি— কাল শুক্রবারে চিঠি পাবে। আমি বোধ হয় রবিবারে বোলপুরে যাব।'[৯১] রবীন্দ্রনাথ রবিবারেই [১৫ ভাদ্র : 31 Aug] শান্তিনিকেতনে ফিরে আসেন।

তাঁর পেরু রওনা হওয়ার দিন ঘনিয়ে আসছিল। এই উপলক্ষে ১৭ ভাদ্র [মঙ্গল 2 Sep] আশ্রম থেকে বিদায়ের আগের দিন সায়াহ্নে আশ্রমবাসীগণ একটি সভায় মিলিত হয়ে তাঁকে অভিনন্দিত করেন। বিধুশেখর শাস্ত্রী সকলের হয়ে তাঁকে শ্বেতপদ্মের অর্ঘ্য দান করেন। অতঃপর রবীন্দ্রনাথ আশ্রমবাসীদের উদ্দেশ করে যে ভাষণ দেন, সেটি 'যাত্রার পূর্ব্বকথা' নামে কার্তিক-সংখ্যা প্রবাসী-তে [পৃ ১—৩] মুদ্রিত হয় [দ্র বিশ্বভারতী ২৭। ৩৮৫—৮৮, ১১-সংখ্যক]। বিদ্যালয়ের উদ্ভব ও বিকাশের ইতিহাস আলোচনা করে তিনি বললেন : 'চিরদিন অল্প আয়োজন এবং অল্প শক্তিতেই আমরা একান্তে কাজ করেছি। তবু আমাদের এই প্রতিষ্ঠান যেন নিজেরই অন্তর্গূঢ় স্বভাব অনুসরণ করে বিশ্বের ক্ষেত্রে নিজেকে ব্যক্ত করেছে। … বিদেশে যখন যাই তখন সর্বমানুষের সম্বন্ধে আমাদের দেশে চৈতন্যের যে ক্ষীণতা আছে তা ভুলে যাই, ভারতের যজ্ঞক্ষেত্রে সকলকে আহ্বান করি। ফিরে এসে দেখি, এখানে সে বৃহৎ জগতের মাঝখানে যে আমরা আছি সে দৃষ্টি কোথায়। … আমার নিজের চিত্তের তেজ যদি বিশুদ্ধ ও উজ্জ্বল থাকত তা হলে আমি গুরুর আসন থেকে এই দাবি করতুম। কিন্তু আমি আপনাদের সঙ্গে এক পথের পথিক মাত্র; আমি চালনা করতে পারি নে, চাই নে।

আপনারা জানেন, আমার যা দেবার তা দিয়েছি, কৃপণতা করি নি। তাই আপনাদের কাছ থেকে ভিক্ষা করবার অধিকার আমার আজ হয়েছে।'

পরদিন ১৮ ভাদ্র [বুধ 3 Sep] প্রাতে মন্দিরে উপাসনা করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ এই যাত্রার কথাই বললেন, সেটি 'দক্ষিণ আমেরিকা যাত্রার পূর্ব্ব দিন' শিরোনামে অগ্র-সংখ্যা প্রবাসী-তে [পৃ ১৪৫–৪৭] মুদ্রিত হয়। 'বিশ্বসাথে যোগে যেথায় বিহারো' গানটি দিয়ে উপাসনা আরম্ভ করে রবীন্দ্রনাথ বললেন, মানুষ ঘর-ছাড়া জীব, মানুষ চিরপথিক। পশ্চিম মহাদেশ জানার পথে মুক্তির অন্বেষণ করে তাদের পাওয়ার পথকে জলে স্থলে আকাশে বিস্তৃত করেছে— সেই পথে সে জ্ঞানমাহাত্ম্য লাভ করেছে। কিন্তু সেই জ্ঞানকে সে ব্যবহার করছে বিষয়সংগ্রহে, তারই লুব্ধতায় সে দেশবিদেশকে বাঁধছে পরাধীনতার নিগড়ে। 'যে-জ্ঞান সকলের জন্যে উৎসর্গ-করা সেই জ্ঞানই জ্ঞান, যে মুক্তি সকলের বন্ধন মোচন করে, সেই মুক্তিই মুক্তি। মুক্তির নামে যে-শক্তি পরকে দাসত্বে বাঁধে সে-মুক্তি দাসত্বের জন্মভূমি— তা'তে কারো কোন কল্যাণ হ'তেই পারে না। পৃথিবীতে অনেক বড়-বড় সাম্রাজ্য ও ঐশ্বর্য্য এই ছদ্মবেশী দাসত্বের কাঁধে ভর দিয়ে রসাতলে নেমে গিয়েচে।'

বিকেলে রবীন্দ্রনাথ অ্যান্ডরুজ, রথীন্দ্রনাথ, প্রতিমা দেবী ও নন্দিনী-সহ কলকাতা রওনা হন। "আশ্রমের অধ্যাপক মহাশয়গণ ও ছাত্রছাত্রীরা তাঁহার সঙ্গে ষ্টেশনে গিয়াছিলেন। সকলের ভক্তিপূর্ণ অভিবাদন লইয়া তিনি গাড়ীতে চড়িলে 'শান্তিনিকেতন' গানের মধ্যে গাড়ী ছাড়িয়া দেয়।"

কলকাতায় গিয়ে রবীন্দ্রনাথ 'অরূপরতন'-এর গান ও অভিনয় নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। এর মধ্যে ইন্দিরা দেবী ২৮ ভাদ্র [শনি 13 Sep] কোনো একটি অনুষ্ঠানে তাঁকে কিছু লিখে পাঠ করার অনুরোধ জানালে তিনি *10 Sep [বুধ ২৫ ভাদ্র] লেখেন : 'কখন লিখ্ব বব্? আমি সমস্ত দিন এক মুহূর্ত্ত ফাঁক পাইনে। তার উপরে আবার আগামী সোমবারে অরূপ রতন অভিনয় করতে হবে— তার উপরে কলেজের ছাত্ররা টানাটানি বাধিয়ে দিয়েচে। তবে যদি ইচ্ছে করিস শনিবারে মুখে মুখে অল্প কিছু বল্‌তে পারব। ভালো করে ভেবে বলবারও সময় নেই।'[৯২] অনুষ্ঠানটি কী ও তাতে তিনি যোগ দিয়েছিলেন কি না জানা যায়নি।

এইদিন ২৫ ভাদ্র সুদীর্ঘকালের জন্য বিদেশযাত্রার পূর্বে তাঁর কাছ থেকে কিছু শোনার আকাঙ্ক্ষায় প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্ররা বিকেল সাড়ে চারটায় রবীন্দ্রনাথকে আহ্বান করে নিয়ে আসে। বক্তৃতাগৃহে তিলধারণের জায়গা ছিল না। যথারীতি তাঁকে মাল্যভূষিত করার পরে 'বন্দেমাতরম্' গান গীত হলে রবীন্দ্রনাথ বক্তৃতা আরম্ভ করেন। তিনি যৌবনের জয়গান করে বলেন, পশ্চিমের সর্বত্র— স্ট্রাসবুর্গ, ডেনমার্ক, সুইডেন প্রভৃতি সব বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রেরা তাঁকে সাদর অভ্যর্থনা করেছে— সর্বত্রই তরুণদের সঙ্গে তাঁর চিত্তের যোগ দেখে তিনি আনন্দ অনুভব করেছেন। যখন তিনি অপেক্ষাকৃত অল্পবয়স্ক ছিলেন তখন কলকাতার ছাত্রমণ্ডলির সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল, কিন্তু মাঝখানে [অসহযোগ আন্দোলনের যুগে] একটি বিচ্ছেদ ঘটে যায়— এক সময়ে তিনি বেদনার সঙ্গে অনুভব করেছিলেন, তিনি যে সুরে যৌবনের জয়গান করতে চান সে সুরে বাংলার তরুণেরা সায় দিতে চায় না। তিনি ভেবেছিলেন, ছাত্রদের সঙ্গে তাঁর আদর্শ মিলবে না, তাই তিনি সরে দাঁড়াতে চেয়েছিলেন। কিন্তু এ ভয় এখন তাঁর অনেক কেটেছে, তরুণের দল আবার তাঁর হৃদয় আকর্ষণ করেছে। বাংলার ছাত্রের মাঝে একবার বর্তমানের জয়গান ভুলে গিয়েছিল— একবার তারা বলেছিল, তারা বর্তমান চায় না বা নূতন চায় না, পুরোনো যা আছে তাই নিয়ে তারা থাকবে। কিন্তু এ কথা বেশিদিন চলল না, চলতে পারল না। বাংলাদেশ পলিমাটির দেশ— এ দেশে প্রতি বছর নূতন শস্য মাটি ভেদ করে ওঠে।

বাংলাদেশে আমরা নূতন ভাবকে গ্রহণ করি— শুধু গ্রহণ করি না, গ্রহণ করবার শক্তি ও সাহস বাংলার আছে। বাংলায় যত ধর্মবিপ্লব হয়েছে, তাদের মধ্যে একটি বৈশিষ্ট্য ও মাহাত্ম্য আছে। তাঁর মনে হয়, বাংলাদেশে জড় অভ্যাসের বাধা অন্যান্য প্রদেশের চেয়ে কম। আমাদের ছন্দে, ভাষায়, গানে সর্বত্র একটা সাহসিকতার আভাস আছে— প্রচলিত আচার পদ্ধতি সব ভেঙেচুরে বাংলাদেশ চলেছে।

এরপর তিনি তাঁর বিদেশযাত্রার উদ্দেশ্য সম্পর্কে কিছু বলেন। চিন দেশের লোকেরা তাঁর কাছে শুনতে চেয়েছিল, ভারতবর্ষ এমন কিছু দেবে যা বিশ্বজনীন, যা কোনো দেশ বা জাতির নিজস্ব নয়। তিনি বলেন, "'যখন আমি যাই, তখন অনেকে হাসিয়াছিলেন, বলিয়াছিলেন 'ইনি বিশ্ব'। বিশ্ব কথাটা উচ্চারণ আমার দায় হইয়া উঠিয়াছে— 'ভূমা' কথাটা শুনিয়া সবাই হাসে, কিন্তু Humanity বা infinite বল্লে কেউ হাসে না।" চীন, জাপান শ্রদ্ধালু চিত্তে তাঁহার কণ্ঠে ভারতের চিরন্তন বাণীই শুনিয়াছে। পশ্চিমও তাঁহার কথা— ভারতের কথা মুগ্ধ হইয়া শুনিয়াছে— মানুষের সঙ্গে মানুষের সত্য সম্বন্ধের স্থাপনে তাঁরাও সহানুভূতি দেখাইয়াছেন কিন্তু ভারতবর্ষ সে কথা শুনিয়া আজ হাসিতে শিখিয়াছে।' মানুষে মানুষে অনৈক্য, বিবাদ, কোলাহল আজ পৃথিবীকে পীড়িত করছে। এই পীড়া, এই দুঃখ দূর করা চাই। সেই বিশ্বমৈত্রীর বাণী শোনাবার জন্যই তিনি বিদেশে যাচ্ছেন। পরিশেষে তিনি বলেন, বাংলাদেশের অনেক দুর্বলতা আছে, অনেক দৈন্য আছে— কিন্তু অর্থের দারিদ্র্য, রাষ্ট্রীয় অধীনতা তার সবচেয়ে বড়ো দুঃখ নয়, তার সবচেয়ে বড়ো দুঃখ হচ্ছে চিত্তের দীনতা যা দূর করতে হবে, বিদেশের সঙ্গে তার চিত্তের যোগসাধন করতে হবে।[৯৩]

২৮ ভাদ্র [বৃহ 11 Sep] কলকাতাস্থিত পেরুর রাজদূতাবাসে রবীন্দ্রনাথকে অভ্যর্থনা জানানো হয়। পরদিন আনন্দবাজার পত্রিকা লেখে : 'কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ আগামী ১৭ই সেপ্টেম্বর তারিখে পেরু যাইবার পথে ইউরোপ গমন করিবেন। পেরুভিয়ান গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে তথায় যাইবার জন্য নিমন্ত্রণ করিয়াছেন। গতকল্য বৃহস্পতিবার তিনি কলিকাতায় পেরুভিয়ান গবর্ণমেন্টের রাজদূতাবাসে অভ্যর্থিত হইয়াছিলেন।'[৯৪]

২৯ ভাদ্র [শুক্র 12 Sep] সন্ধ্যা সাড়ে ছ'টায় ইডেন হিন্দু হোস্টেলের ছাত্রদের মিলনোৎসবে রবীন্দ্রনাথ সভাপতিত্ব করেন। হোস্টেলের ভূতপূর্ব ছাত্র ও অনেক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিও আমন্ত্রিত হয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ যথাসময়ে এলেও আলোর ব্যবস্থা ভালো না থাকায় কিছুক্ষণ সভার কাজ শুরু করা যায়নি। তাঁকে মাল্যভূষিত করবার পরে ৬-৪৫ মিনিটে কার্যারম্ভ হয়। প্রাক্তন ছাত্র দিলীপকুমার রায় দুটি গান করেন ও বিখ্যাত এসরাজি চণ্ডিকাপ্রসাদ এসরাজ বাজিয়ে শোনান। মিলনোৎসবের সম্পাদক তাঁর বিভাগের প্রতিবেদন উপস্থাপিত করার পরে খেলাধূলার পুরস্কার বিতরণ করা হয়। রবীন্দ্রনাথ সভাপতির ভাষণে বলেন, এই সভায় সর্বাপেক্ষা বলশালী পুরস্কার নিয়ে গেলেন, আর সবচেয়ে দুর্বলের উপর ভার পড়েছে মন্তব্য প্রকাশ করার। তিনি দুর্বল, তরুণদের মিলনোৎসবে মন্তব্য করবার সামর্থ্য তাঁর নেই। এরকম উৎসব উপলক্ষে কোনো প্রবীণকে বাচালতা প্রকাশের সুযোগ দেওয়া উচিত নয়। সকলেই জানেন, অধিক বয়সে বেশি বলার একটা প্রবণতা দেখা যায়, অন্যান্য সমস্ত শক্তি দেহ থেকে চলে যাবার পরে রসনার পথে যাতায়াতের চেষ্টা করে। এজন্য কর্মের শক্তি বাক্যে প্রয়োগের একটা প্রলোভন দেখা দেওয়া প্রবীণের পক্ষে স্বাভাবিক, কিন্তু তাতে উৎসবের রসভঙ্গ হয়। বিদেশ থেকে আমদানি করা এইসব জঞ্জাল এখন দূর করবার সময় উপস্থিত হয়েছে। পশ্চিমে তিনি মাঝে মাঝে আহারে আমন্ত্রিত হয়েছেন, সেখানে তাঁর সবচেয়ে দুশ্চিন্তার বিষয় ছিল আহারের পরে বক্তৃতা। অত্যন্ত বর্বর দেশে নিয়ম আছে পশুকে মারবার আগে তাকে ভালো করে খাইয়ে গলায় ফুলের মালা দিয়ে সাজিয়ে

তারপর বলি দেওয়া হয়। বলিদান আজকাল অনেক সভ্যসমাজে অপ্রচলিত— তার বদলে বক্তৃতার ব্যবস্থা হয়েছে। প্রাচীনকালে আমাদের দেশে যখন বৈঠকে সকলে মিলে আনন্দ উপভোগ করতেন, তখন প্রবীণদের এইভাবে পীড়িত করার নিয়ম ছিল না। আজ এখানে সকলে আনন্দ করছেন, তাঁর ইচ্ছা ছিল কোনো দুশ্চিন্তা না নিয়ে দিনটা উপভোগ করার— কিন্তু তিনি নিজে একটা অভিনয়কার্যে ব্যস্ত আছেন, অনতিকাল পরেই সর্বসাধারণের সমক্ষে তার পরীক্ষা দিতে হবে। আজ ছাত্রেরা তাঁরই একটি নাটক অভিনয় করবেন, এই অভিনয়ে কোনো দোষত্রুটি হলে তিনি ক্ষমা করতেন— কিন্তু তাঁর অভিনয়ে কোনো দোষত্রুটি হলে কেউ তাঁকে ক্ষমা করবেন না, এ কথা তিনি জানেন। তাঁর কর্ম তাঁর জন্য অপেক্ষা করছে, সুতরাং তাঁকে যেন ক্ষমা করে বিদায় দেওয়া হয়।

তিনি বিদায় নেওয়ার পরে ছাত্রেরা 'অচলায়তন' অভিনয় করে।[৯৫]

মালাবার অঞ্চলের বন্যাপীড়িত জনসাধারণ ও বিশ্বভারতীর সাহায্যার্থে আলফ্রেড থিয়েটারে বিশ্বভারতী সম্মিলনীর উদ্যোগে 'অরূপ-রতন' অভিনীত হয় ৩০ ভাদ্র [সোম 15 Sep] সন্ধ্যা সাড়ে ছ'টায়। রুদ্রপ্রসাদ চক্রবর্তী *The Statesma*n [12, 13, 14 Sep] থেকে অভিনয়ের বিজ্ঞাপনটি উদ্ধার করেছেন :

VISVA-BHARATI/ SAMMILANI/ (In aid of Malabar Flood Relief Work and Visva-Bharati)/ A NEW DRAMA/ ARUP-RATAN/ READINGS BY/ RABINDRA NATH TAGORE/ with/ SONG/ ACCOMPANIMENT/ AT THE/ ALFRED THEATRE, ON/ MONDAY 15th. SEPTEMBER—6.30 P.M./PLAN AT CARR & MAHALANOBIS 1–2 Chowringhee.

Forward [16 Sep] 'Rabindranath on the Stage' শিরোনামে নাট্যাভিনয়টির একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করে :

An interesting and enjoyable dramatic performance was given by Dr. Rabindranath Tagore last evening at the Alfred Theatre when the poet recited selected portions of his allegorical drama 'Arup Ratan' at the inauguration of the Visva-Bharati Musical School. The spacious auditorium of the theatre was packed with audience which included a large number of ladies.

The musical portion of the drama was conducted by a choir of lady singers led by Sj. Dinendranath Tagore. Prominent among the singers were Srimati Sahana Devi, Sms. Rama Majumdar, Kanak Lata Das, Kanika Thakur, Malati Sen, Priti Adhikari, Rekha Majumdar, Reba Mahalanobis, Amita Chakrabarty, Basanti Majumdar, Amita Sen (1), Latika Roy, Mamata Sen, Phulla Rani Sinha, Kundanandini Sinha, Amita Sen (2), Gouri . Basu and Surupa Thakur. The choir included a number of small girls.

The poet appeared on the stage in a bright silken cloak and the lady musicians were dressed in clothes of various colours.

The recitation of the poet was supplemented at frequent intervals by pantomimes representing the prevailing sentiments.

In his introductory remarks the poet gave a brief account of the proposed Musical School and then proceeded to explain briefly the allegory contained in the drama.... The function was splendid success from start to finish.[৯৬]

সাহানা দেবী লিখেছেন :

একবার 'অরূপ রতন' কলকাতায় হয়— আমাকে সুরঙ্গমার গানগুলি কবি গাইয়েছিলেন— 'আমি জ্বালব না মোর বাতায়নে', 'আমি রূপে তোমায় ভোলাব না', 'আমি তোমার প্রেমে হব সবার কলঙ্কভাগী', 'এখনো গেল না আঁধার', 'বাহিরে ভুল হানবে যখন', 'ওগো আমার প্রাণের ঠাকুর', 'কোথা বাইরে দূরে যায় রে উড়ে'। সেবারে 'সুদর্শনা' হয়েছিল রানু (এখন লেডি রাণু মুখার্জি)। 'অরূপ রতনে'র কথা বিশেষ কিছু মনে নেই আমার। তার মধ্যে আমার জীবনে যা অবিস্মরণীয় তা এই যে এই 'অরূপ রতনে' রবীন্দ্রনাথ আমায় অভিনয় করতে শিখিয়েছিলেন। সামান্য অভিনয়ই আমার ছিল। বিশেষ করে মনে আছে, একটি মালা হাতে করে, হাতের কবজিটি সামান্য ঘুরিয়ে কেমন করে রাখতে হবে একটি থালায়, তা উনি কি সুন্দর করে দেখিয়ে দিয়েছিলেন। হাতটিকে ধরে ধরে দেখিয়ে দিচ্ছিলেন, বলছিলেন, 'হাতটা এমন শক্ত করে টেনে রাখো কেন, বেশ স্বচ্ছন্দে সহজভাবে ভালো করে বার করে মেলে দাও।' উনি হাতটিকে বার করতেন কি সুন্দর করে, না দেখলে বুঝতেই পারতাম না, তারপর সেই কবজি ঘুরিয়ে মালাটি রাখবার দৃশ্য— সে যে কি সুন্দর। দেখবার মত! এই একটা সামান্য ব্যাপারকে যে কত সুন্দর করে করা যায় তা প্রথম উপলব্ধি করেছিলাম তাঁর কাছে এই শিক্ষার মধ্যে দিয়ে।[৯৭]

রাণু মুখোপাধ্যায় স্মৃতিচারণ করে বলেছেন : "বিসর্জনের পরের বছর 'অরূপরতনে' আমি রাণীর ভূমিকায় অভিনয় করি। কিন্তু আমার ছিল মূকাভিনয়ের পার্ট। রবীন্দ্রনাথই আমাকে এই মূকাভিনয় শিখিয়ে ছিলেন। স্টেজের অন্তরাল থেকে গান করতেন সাহানাদেবী। ব্যাক স্টেজে পর্দা থাকত। হাতে প্রদীপ নিয়ে তিনি গাইতে গাইতে স্টেজের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত পর্যন্ত চলে যেতেন। রিহার্সাল হত অবনীন্দ্রনাথের জোড়াসাঁকোর বাড়ীর হল ঘরে।"[৯৮]

16 Sep [৩১ ভাদ্র] রবীন্দ্রনাথ রাণুর পিতা ফণীন্দ্রনাথ অধিকারীকে লিখলেন : 'কাল অরূপরতন অভিনয় হয়ে গেল, রাণু তাতে সুদর্শনা সেজেছিল সবাই তার নৈপুণ্যে ও সৌন্দর্য্যে বিস্মিত হয়েছে।'[৯৯]

শান্তিদেব ঘোষ লিখেছেন : "গানগুলিকে মূকাভিনয়ে রূপ দেওয়া হয়। দেহভঙ্গিতে কোথাও কোথাও যে একটু নাচের আমেজ দেখা না গিয়েছিল তা নয়। ··· এই সময় থেকেই মেয়েদের মধ্যে সামান্য একটু নাচের চর্চা শুরু হয়েছিল কাথিয়াবাড় ও গুজরাতের লোকনৃত্যের আদর্শে। তার সঙ্গে ছিল একটুখানি 'ভাও-বাৎলানো' নৃত্যপদ্ধতি। শান্তিনিকেতনে গুজরাতের গরবা নাচের প্রথম প্রবর্তন করেন বিশ্বভারতীর ইংরিজিভাষার অধ্যাপক শ্রীযুক্ত [জাহাঙ্গীর] ভকিলের পত্নী। এঁরা এখানে আসেন ১৯২৪ সালে। ··· এই যুগে ভকিল-পত্নী ১৫। ১৬ জন ছাত্রীকে গরবা নাচ শেখান। গুরুদেবের যে ক'টি গানের সঙ্গে নাচ শেখানোর কথা আজও মনে পড়ে সেই গান ক'টি হল—'যদি বারণ কর তবে গাহিব না', 'মোর বীণা ওঠে' ও 'কালের মন্দিরা যে সদাই বাজে'।"[১০০] নন্দলাল বসু কলকাতার এই অভিনয়ে মঞ্চসজ্জা করেন।

'রাজা' নাটকটির 'নূতন করিয়া পুনর্লিখিত' 'অভিনয়যোগ্য সংক্ষিপ্ত সংস্করণ' 'অরূপ রতন' রবীন্দ্রনাথ রচনা করেন মাঘ ১৩২৬-এ, তখন তিনি এটি অভিনয়ের কথাও ভেবেছিলেন, কিন্তু কোনো কারণে তা সম্ভব হয়নি [দ্র রবিজীবনী ৭। ৪৫৭–৫৯]। বর্তমানে যে নাটিকাটি তিনি পাঠ বা অভিনয় করেছিলেন, তার কোনো পাণ্ডুলিপি পাওয়া যায়নি; কিন্তু ১৩২৬-এ মুদ্রিত পাঠের, অন্তত গানের ক্ষেত্রে, পরিবর্তন করা হয়েছিল তার

প্রমাণ পাওয়া যায় সাহানা দেবীর দেওয়া গানের তালিকায়— 'ওগো আমার প্রাণের ঠাকুর' গানটি নূতন লেখা না হলেও নূতন সংযোজন। অন্য কোনো গ্রহণ-বর্জনের কথা আমাদের জানা নেই।

এখানে একটি তথ্য উল্লেখযোগ্য। প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ 3 Apr 1920 [২১ চৈত্র ১৩২৬] 'অরূপ রতন' প্রকাশ সম্পর্কে তাঁর ভাবী পত্নী রাণী মৈত্রকে লিখেছিলেন : '"অরূপ রতন" ··· ফাল্গুন মাসের শেষে অভিনয় হবার কথা ছিল কিন্তু এবার আর হয়ে উঠ্‌ল না; অভিনয় হ'লে "অরূপরতন" এখন publish করা হত। অভিনয় এখন হবে না বলে বইখানাও এখন publish হবে না, আমি proof copy নিয়ে এসেচি'।[১০১] বর্তমানে অভিনয় উপলক্ষে গ্রন্থটি প্রথম প্রকাশিত হল কি না বলার মতো তথ্য আমাদের হাতে নেই।

ফরওয়ার্ড-এর প্রতিবেদনে যে বিশ্বভারতী সংগীত বিদ্যালয়ের কথা আছে, তার ভাবনাটি অনেক পুরোনো। রবীন্দ্রনাথের গান ধীরে ধীরে শান্তিনিকেতনের বাইরে, বিশেষত কলকাতায়, অন্তত এক শ্রেণীর মানুষের কাছে জনপ্রিয় হয়ে উঠছিল তার কথা ও সুরের জন্য— 'রবিবাবুর গান' সঠিক সুরে শেখার জন্য আগ্রহও বাড়ছিল। এটা ঠিক দিনেন্দ্রনাথ বা নির্ভরযোগ্য কোনো ব্যক্তির করা তাঁর গানের স্বরলিপি তখন প্রায় নিয়মিত বিভিন্ন সাময়িকপত্রে মুদ্রিত হত, স্বরলিপি-সংবলিত গ্রন্থের সংখ্যাও তখন ক্রমবর্ধমান। দূরের মানুষদের পক্ষে এগুলির উপর নির্ভর করা ছাড়া গত্যন্তর ছিল না, কিন্তু কলকাতার অনেক প্রাগ্রসর পরিবারই তখন চাইছিলেন গানগুলি যথার্থ অধিকারীদের কাছ থেকে শিখে নিতে। এই কারণেই প্রস্তাব উঠেছিল, কেবল রবীন্দ্রনাথের গান শেখানোর জন্যই কলকাতায় একটা কেন্দ্র গড়ে তোলার। এই প্রস্তাব উপলক্ষেই রবীন্দ্রনাথ ২ আশ্বিন ১৩৩০ [19 Sep 1923] প্রশান্তচন্দ্রকে লিখেছিলেন : 'একটা অত্যাবশ্যক কাজ আছে সে হচ্চে সম্মিলনীতে আমার গান শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা করা— অনেকদিন থেকে শুনে আসচি ব্যবস্থা হবে কিন্তু হয়নি— এবার গিয়ে যথোচিত উপায় যদি অবলম্বন করতে পারি তাহলেই যাব।'[১০২] 27 Nov [বৃহ ১২ অগ্র] প্রশান্তচন্দ্র রথীন্দ্রনাথকে লেখেন : 'গত মঙ্গলবার সঙ্গীত বিদ্যালয়ের কাজ আরম্ভ হল।'

৩১ ভাদ্র [মঙ্গল 16 Sep] সন্ধ্যা ৬টায় দ্বারকানাথ ঠাকুর লেনে রবীন্দ্রনাথের সভাপতিত্বে বিশ্বভারতী সংসদের একটি অধিবেশন হয়। কর্মসচিব জানান, 18 Sep আচার্যের কলকাতা ত্যাগ করার সম্ভাবনা আছে। রবীন্দ্রনাথ সংসদকে সম্বোধন করে তাঁর প্রস্তাবিত দক্ষিণ আমেরিকা সফর ও বিশ্বভারতীর কাজ সম্পর্কে কিছু বলে অ্যান্ডরুজের উপর সভাপতিত্বের দায়িত্ব দিয়ে সভাস্থল ত্যাগ করেন।

রবীন্দ্রনাথের এবারের বিদেশযাত্রা নানা অনিশ্চয়তায় পূর্ণ। *The Englishman* [17 Sep] লেখে : 'Dr. Rabindranath Tagore is expected to leave Calcutta for Colombo to-day (Wednesday) by the Madras Mail. He will take the boat from there and proceed to Spain.' পরদিন আনন্দবাজার জানায় : 'রবীন্দ্রনাথ গতকল্য (বুধবার) স্পেন যাইবার জন্য যাত্রা করিবেন স্থির ছিল। তিনি গতকল্য যান নাই— অদ্য যাত্রা করিবেন।' কিন্তু তিনি যাত্রা শুরু করেন 19 Sep [শুক্র ৩ আশ্বিন]। কার্তিক-সংখ্যা শান্তিনিকেতন-এ এর কারণ হিসেবে জানানো হয় : 'পূজনীয় গুরুদেবের ১৭ই সেপ্টেম্বর কলিকাতা হইতে রওনা হইবার কথা ছিল, কিন্তু হঠাৎ তাঁহার শরীর অসুস্থ হওয়াতে তিনি সেদিন রওনা হইতে পারেন নাই। ১৯শে সেপ্টেম্বর তিনি কলকাতা ত্যাগ করিয়াছেন।'

আমরা জানি, বিদ্যালয়ের সংস্কৃত-শিক্ষক হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ১৩১২ বঙ্গাব্দে রবীন্দ্রনাথেরই নির্দেশে বাংলা ভাষার একটি পূর্ণাঙ্গ অভিধান রচনায় ব্রতী হন ও তাঁরই অনুরোধে কাশিমবাজারের বিদ্যোৎসাহী

মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী দীর্ঘ তেরো বৎসর তাঁকে মাসিক ৫০। ৬০ টাকা বৃত্তি দান করে বিদ্যালয়ের নিত্যকর্মের বোঝা থেকে তাঁর মুক্তির ব্যবস্থা করে দেন। রবীন্দ্রনাথ বিদেশযাত্রার প্রাক্কালে 17 Sep [১ আশ্বিন] একটি 'বিজ্ঞপ্তি' প্রচার করেন : 'শ্রীযুক্ত হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় গত বিশ বছর ধরিয়া বাংলা অভিধান রচনায় নিযুক্ত আছেন। সম্প্রতি তাঁহার কার্য্য সমাপ্ত হইয়াছে। এরূপ সর্ব্বাঙ্গসম্পূর্ণ অভিধান বাংলায় নাই। এই পুস্তক বিশ্বভারতী হইতে আমরা প্রকাশ করিবার উদ্যোগ করিতেছি। এই বৃহৎকর্ম্ম সুসম্পূর্ণ করিবার জন্য প্রকাশসমিতি স্থাপিত হইয়াছে। বাংলাদেশের পাঠকসাধারণ এই কার্য্যে আনুকূল্য করিয়া বাংলা সাহিত্যের গৌরববৃদ্ধি করিবেন একান্তমনে ইহাই কামনা করি।'[১০৩] কিন্তু বিশ্বভারতী অর্থাভাবহেতু এতবড়ো একটি কাজের দায়িত্বগ্রহণে অপারগ হলে হরিচরণ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারস্থ হন। তারাও অসমর্থ হলে হরিচরণ নিজব্যয়েই খণ্ডাকারে গ্রন্থটি প্রকাশ করতে মনস্থ করেন ও সেইভাবেই সমগ্র অভিধানটি মুদ্রণে সমর্থ হন।

বিশ্বভারতী সম্মিলনীর এক অধিবেশনে অ্যান্ডরুজ রবীন্দ্রনাথের একটি ভ্রমণসূচি দেন, তার থেকে পরিকল্পনা ও রূপায়ণের পার্থক্যটি আরও প্রকট হয়ে ওঠে। তিনি বলেন, রবীন্দ্রনাথ 18 Sep কলকাতা থেকে রওনা হয়ে পিঠাপুরমে যাবেন। সেখানে দু'একদিন থেকে 'নিপ্পন ইউসেন কাইসা' কোম্পানির 'হারুনামারু' জাহাজে মার্সেলিস অভিমুখে যাত্রা করবেন। সেখানে এল্‌ম্‌হার্স্ট তাঁর সঙ্গে যোগ দেবেন ও তাঁরা প্যারিসে যাবেন। প্যারিস থেকে রবীন্দ্রনাথ স্পেনে যাবেন ও সেখানকার ভিগো বন্দর থেকে নভেম্বরের প্রথম ভাগে রওয়ানা হয়ে ঐ মাসের শেষভাগে কেলায়োতে [Callao, Peru] পৌঁছবেন। জাহাজ পথে কিউবা ও হাভানায় থামবে ও পানামা খালের ভিতর দিয়ে গিয়ে দক্ষিণ আমেরিকার পশ্চিম উপকূলের পাশে পাশে চলে কেলায়োতে পৌঁছবে। এই বন্দরটি পেরুর রাজধানী লিমার খুব কাছে অবস্থিত। পেরুর শতবার্ষিক উৎসবের পূর্বেই রবীন্দ্রনাথকে সেখানে পৌঁছতে হবে। দক্ষিণ আমেরিকার সবগুলি রাষ্ট্রই তাদের শতবার্ষিক উৎসব সমাধা করেছে। প্রথম রাষ্ট্রের উৎসব 1910-এ হয়েছিল, পেরুতে হবে সর্বশেষ উৎসব। 9 Dec 1824 মুক্তিলাভের জন্য তাদের শেষ চেষ্টা সফল হয়। লিমা থেকে তিনি চিলি যাবেন। সেখান থেকে আর্জেন্টিনা এবং তার পরে যতদূর সম্ভব মেক্সিকো হয়ে তিনি ইতালি দেশে ফিরবেন। [এই পথ অনুসরণ করলে অস্বাস্থ্য সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথের পক্ষে পেরু পৌঁছনো সম্ভব হত, কিন্তু সম্ভবত উপযুক্ত জাহাজ না পেয়ে গতিপথ পরিবর্তিত হয় — যার ফলে তাঁর প্রস্তাবিত সফর পরিত্যক্ত হয়]।

যাই হোক, কয়েকবার দিনবদলের পরে রবীন্দ্রনাথ সদলবলে 19 Sep [শুক্র ৩ আশ্বিন] সকালে [আনন্দবাজার পত্রিকা-র প্রতিবেদনে 'অপরাহ্নে'] মাদ্রাজ মেলে হাওড়া স্টেশন থেকে রওনা হন— তাঁর সঙ্গীদের মধ্যে ছিলেন রথীন্দ্রনাথ, প্রতিমা দেবী, নন্দিনী, সুরেন্দ্রনাথ কর, গিরিজাপতি ভট্টাচার্য ও বিজয় বাসু [ডাঃ পশুপতি ভট্টাচার্যের ভ্রাতা গিরিজাপতি লিখেছেন : 'যখন শুনলেন সুগন্ধি তৈরি বিদ্যায় হাত পাকাতে ফ্রান্সে যাবার সঙ্কল্প করেছি, তখন আমায় বললেন তাঁর সহযাত্রী হতে। কবি বললেন, বিজয় বাসুকে বিশ্বভারতীর তরফ থেকে মনোনীত করা হয়েছে ফ্রান্সে শিল্পশিক্ষার জন্য; আমাকেও তিনি মনোনীত করলেন বিশ্বভারতীর নির্বাচিত রূপে, গন্ধশিল্প শেখবার জন্য'[১০৪]] (এঁরা অবশ্য নিজেদের খরচে যাচ্ছিলেন)।

৫ আশ্বিন [রবি 21 Sep] প্রাতঃকালে ট্রেন মাদ্রাজে পৌঁছল। তার আগে ভিল্লাপুরম স্টেশনে একদল স্কাউট ঘুম ভাঙিয়ে তাঁকে বিদায়-অভিনন্দন জানায়। একটি অনামা পত্রিকার কর্তিকায় পাই :

The "Sivaji Rovers" of Villapuram, with their Scout Master, Mr. K.R.R. Sastry M.A. waited at the Villapuram Railway Station on 21-9-24 to read an address of *bon voyage* to Dr. Rabindranath Tagore. Dr. Tagore was fast asleep in his carriage when Scouter K.R.R. Sastry gently woke him up. Though all too weary, he was full of gracious smiles when he saw many eager Scouts rounded him. The Poet was garlanded and an address was read by Mr. Sastry and presented to him. Dr. Tagore replying, said that Scouts in India should not be content with the stereotyped types of drills and games which found favor in the West.... The Poet appreciated the fact that songs of the Tamil saints were sung daily by the Rovers. The Poet gave an account of the good work done by his Scouts in villages by way of removing the marshes and cleansing wells.

মাদ্রাজে পৌঁছে 20 [21] Sep রবীন্দ্রনাথ রাণুকে লিখলেন : 'এই মাত্র মাদ্রাজে এসে পৌঁচেছি। আজ রাত্রে কলম্বো রওনা হব। ইনফ্লুয়েঞ্জা ও নানা ঘূর্ণিপাকের আঘাতে দেহমন ভেঙে ছিঁড়ে বেঁকে চুরে গিয়েছিল, ক্লান্তি ও অবসাদের বোঝা ঘাড়ে নিয়ে এসে বেরিয়েছিলুম। ··· একদিন আমার বয়স অল্প ছিল— আমি ছিলুম বিশ্বপ্রকৃতির বুকের মাঝখানে— ···কল্পকালের অমরাবতীতে আমি দেবশিশুর মতই' আমার বাঁশি হাতে বিহার করতুম। সেই শিশু সেই কবি আজ ক্লিষ্ট হয়েচে। ··· আজ জীবনের সন্ধ্যাবেলায় সে আর একবার বিশ্বপ্রকৃতির আঙিনায় দাঁড়িয়ে আকাশের তারার সঙ্গে মিলিয়ে শেষ বাঁশি বাজিয়ে যেতে চায়। যে রহস্যলোক থেকে এই মর্ত্ত্যলোকে একদিন সে এসেছিল সেখানে ফিরে যাবার আগে শান্তিসরোবরে ডুব দিয়ে স্নান করতে চায়। তেমন করে ডুব দিতে যদি পারে তাহলে তার জীর্ণতা তার ম্লানতা সমস্ত ঘুচে যাবে। আবার তার মধ্যে থেকে সেই চিরশিশু বাহির হয়ে আসবে।'[১০৫]

ঐদিন সন্ধ্যাবেলা তিনি জাহাজে করে কলম্বো রওনা হন। তিনি সেখানে পৌঁছন ৭ আশ্বিন [মঙ্গল 23 Dec] *Ceylon Observer* লেখে : 'Dr. Rabindranath Tagore arrived in Colombo this morning by the Talaimanner route and proceeded to "Sravasti", Cinamon Gardens, the residence of Dr. W.A. de Silva, where he remained during his stay in Colombo. ... He leaves for Europe to-morrow by the N.Y.K. "Haruna Maru".'

এইদিনও তিনি রাণুকে একটি চিঠি লেখেন। রাণুর বয়স তখন আঠারো, তবু তাঁর মনের পরিণতি আসেনি। যে অপরিণত মন নিয়ে তিনি বিভিন্ন যুবকের সঙ্গে অস্বস্তিকর সম্পর্ক গড়ে তুলেছিলেন, সেই একই মনে রবীন্দ্রনাথের রসিকতাকে সত্য ভেবে জটিলতা সৃষ্টি করছিলেন। তাঁর এই সময়ের একটিমাত্র চিঠি আমরা পেয়েছি কৃষ্ণ দত্তের সৌজন্যে ডার্টিংটনের এল্‌ম্‌হার্স্ট সংগ্রহশালা থেকে। তারিখহীন চিঠিটি আর-একটু পরবর্তীকালের, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের উল্লিখিত পত্রের পটভূমিকা বোঝার পক্ষে খুবই মূল্যবান। রাণু লিখেছেন :

অনেকদিন আপনার কোনো চিঠি পাইনি— একমাসের উপর হল। আপনি সিলোন থেকে একখানা চিঠি দিয়েছিলেন, মনে আছে কি ভানুদাদা? তাতে লিখেছিলেন যে আমাকে চিঠি লেখা বোধহয় আপনার পক্ষে আর সম্ভবপর হবে না। সেইজন্যেই বোধহয় চিঠি পাইনি। ··· ভানুদাদা, দয়া করেও কি এক লাইন লেখা যায় না? ··· আপনিই ত বলেছেন যে আমাদের সত্যিকারের বিয়ে হয়ে গেছে। তবে আপনি কি বলে আমাকে এমনভাবে অপমান করেছেন?··· আমি আপনাকে কি বল্‌ব, আমি সেই সময়গুলো সেই দুপুরবেলা সেই সন্ধ্যে সকাল, রাত্রি, সেই আপনার একেবারে কাছে বসে যখন গল্প করতুম, সেই সময়গুলো ভাবতে পারি না। বুক টন্‌টন্ করতে থাকে— এত কষ্ট হয় কিন্তু তবু বারবার ভাবতে ইচ্ছে করে। ভানুদাদা, সে সব হয়ত আপনার জীবনের একটী খেলার পালা কিন্তু আমার তা নয়। ··· আমি কাউকেই বিয়ে করব না— আপনার সঙ্গে ত বিয়ে হয়ে গেছে। ভানুদাদা, আপনি হয়ত মানবেন না কিন্তু আমি মানি। আপনি আমাকে নাই ভালবাসলেন। আপনি আমাকে নাই চিঠি দিলেন কিন্তু আমি ত মনে মনে জানব যে একদিন আমি ভানুদাদার সমস্ত আদর পেয়েছি। আমার সমস্ত শরীর ছেয়ে সে আদর আমার মনকে ভরে

দিয়েছিল সে ভাবনাটুকু কেড়ে নেবার সাধ্য এ পৃথিবীতে কারুর নেই ভানুদাদা আপনারও না। নাই বা আপনি চিঠি দিলেন, আমি ত জানব মনে মনে, যে একটা secret আছে যা আমি আর তার ভানুদাদা ছাড়া এ পৃথিবীতে আর কেউ জানে না। সেই secretটুকুতে ত কারুর অধিকার নেই। ভানুদাদা, আপনাকে কত লোক ভালবাসে, কত লোক আপনাকে চায়, কত শত শত লোক একটীবার আপনাকে চোখের দেখা। দেখবার জন্যে দূর দূর দেশ থেকে আসে— আমি তাদের মাঝখানে কে ভানুদাদা? আমার এমন কোনো গুণ নেই যার জন্যে আপনার ভালবাসার যোগ্য হতে পারি। এমন রূপও নেই ভানুদাদা যে আপনাকে মুগ্ধ করতে পারি। ভানুদাদা, আমার চেয়ে কত শত শত সুন্দরী মেয়ে আপনার ভালবাসা চায় তবু ভানুদাদা আপনি আমাকে ভালবাসেননি। এখন যদি না ভালবাসেন তবে আমি কি বলব ভানুদাদা?…[১০৬]

রবীন্দ্রনাথের বন্ধনভীরু মনের প্রধান ভয় ছিল এইটাই। সেইজন্যই তাঁদের পত্রালাপের সূচনা থেকে যখনই রাণুর মনে অধিকারবোধ প্রবল হয়ে ওঠবার লক্ষণ প্রকাশ পেয়েছে, তখনই তিনি তাঁকে সাবধান করে দিয়েছেন। ১১ ভাদ্র ১৩২৫ [28 Aug 1918] তারিখেই লিখেছিলেন : 'যেমন বাঁশির ফাঁকের ভিতর দিয়ে সুর বেরয়, তেমনি আমার কুঁড়েমির ভিতর থেকেই আমার যেটি আসল কাজ সেইটি জেগে ওঠে। আমার সেই আসল কাজই হচ্ছে বাণীর কাজ। সময়টাকে কর্তব্য দিয়ে ভরাট করে একেবারে নিরেট করে দিলে বাণী চাপা পড়ে যায়। সেইজন্যেই আমাকে কেবল কাজ থেকে নয়, সংসারের নানা জটিল বন্ধন থেকে যথাসম্ভব মুক্ত থাকতে হয়। কাজই হোক, আর মানুষই হোক, আমাকে একেবারে চাপা দিলে বা বেঁধে ফেললে আমার জীবন ব্যর্থ হতে থাকে। আমার মন ওড়বার জন্যে শূন্যকে চায়। তাকে খাঁচায় বাঁধবার আয়োজন যতবার হয়েছে, সেই আয়োজনের শিকল ছিন্ন হয়ে পড়ে গেছে।'[১০৭] এই চিঠি লেখার সময় হয়তো বর্তমান উপলক্ষ ছিল না, কিন্তু সেই বাঁধন ছেঁড়ার কথা মাথায় রেখেই তিনি 4 Feb 1924 [২১ মাঘ ১৩৩০]-এর চিঠিটি [আগের অধ্যায়ে উদ্ধৃত] রাণুকে লিখেছিলেন। এখন কলম্বো পৌঁছে 23 Sep [মঙ্গল ৭ আশ্বিন] তাঁকে লিখলেন :

ছেলেবেলায় যখন আমি পদ্মার কোলে বাস করতুম তখন পাশাপাশি আমার দুইরকম বাসাই ছিল। একদিকে ছিল আমার নৌকার ছোট ঘরটি, আর একদিকে ছিল দিগন্ত প্রসারিত বালুর চর। ঘরের মধ্যে আমার অন্তরাত্মার নিঃশ্বাস, আর চরের মধ্যে তার প্রশ্বাস। একদিকে তার অন্দরের দরজা, আর একদিকে তার সদরের দরজা। তোমার জীবনে রাণু, যদি আমার মধ্যে সেই সদর দরজাটা খুঁজে পেতে, তাহলে খোলা আকাশের স্বাদ পেয়ে হয়ত খুসি হতে। তোমার অন্দরের দরজার অধিকার দাবী আমার ত চলবে না— এমন কি, সেখানকার চাবিটা তোমার হাতেও নেই, যার হাতে আছে সে আপনি এসে প্রবেশ করবে কেউ বাধা দিতে পারবে না। আমি যা দিতে পারি তুমি যদি তা চাইতে পারতে তাহলে বড় দরজাটা খোলা ছিল। কোনো মেয়েই আজ পর্য্যন্ত সেই সত্যকার আমাকে সত্য করে চায় নি— যদি চাইত তাহলে আমি নিজে ধন্য হতুম; কেন না মেয়েদের চাওয়া পুরুষদের পক্ষে একটা শক্তি। সেই চাওয়ার বেগেই পুরুষ নিজের গূঢ় সম্পদকে আবিষ্কার করে… কতকাল থেকে উৎসুক হয়ে আমি ইচ্ছা করেচি কোনো মেয়ে আমার সম্পূর্ণ আমাকে প্রার্থনা করুক, আমার খণ্ডিত আমাকে নয়। আজো তা হল না— সেই জন্যেই আমার সম্পূর্ণ উদ্বোধন হয় নি। কি জানি আমার উমা কোন্ দেশে কোথায় আছে? হয়ত আর জন্মে সেই তপস্বিনীর দেখা পাব।[১০৮]

কলম্বোতে পৌঁছে রবীন্দ্রনাথ আমাদের পূর্বপরিচিত বালিকা নলিনী মৈত্রের [তালুকদার, 'শিলংয়ের চিঠি' যাঁকে লেখা] একটি চিঠি পেয়ে এইদিনই তাঁকে লিখলেন : 'কলম্বোতে এসে যাত্রার আগের দিনেই তোমার সুন্দর চিঠিখানি পেয়ে বড়ো খুশি হয়েছি। আজ সকালে এসে পৌঁছলুম। তখন থেকে আকাশ মেঘে অন্ধকার। ক্ষণে ক্ষণে বৃষ্টি পড়ছে, আঁর বাদলা হাওয়া খামকা হা-হুতাশ করে উঠছে। যাত্রার পূর্বে এরকম দুর্যোগে মনের উৎসাহ কমে যায়— সূর্যকিরণ না পেলে মনে হয় যেন আকাশের দৈববাণী থেকে বঞ্চিত হলুম।'[১০৯] এই মেয়েটিই তাঁকে যাত্রাপথের বিবরণ ডায়ারিতে রক্ষা করতে অনুরোধ করেছিলেন। তার উত্তরে রবীন্দ্রনাথ লেখেন : 'কিন্তু যাই বল, আমি ডায়ারি লিখতে পারব না। আমি ভারি কুঁড়ে। চিঠি লেখার, ডায়ারি লেখারও একটা বয়স আছে; সে বয়স আমার কেটে গেছে। কিন্তু, অল্প বয়সেও আমি ডায়ারি লিখি নি। যে-সব কথা ভুলে যাবার সে-সব কথা জমিয়ে রাখবার চেষ্টাই করি নি; যে-সব কথা না ভোলবার সে-সব তো মনে আপনিই আঁকা থাকে।'

কিন্তু ডায়ারি লিখবেন না বলে ঘোষণা করলেও বালিকার অনুরোধ রক্ষা করার জন্যই হোক, বা আত্মপ্রকাশের তাগিদেই হোক, রবীন্দ্রনাথ জাহাজে উঠেই ডায়ারি লিখেছেন— যাওয়া ও আসার পথে, কিন্তু সমস্ত পথের বিবরণ সেখানে নেই। রবীন্দ্রনাথ তাঁর অধিকাংশ বিদেশভ্রমণের পথে হয় ডায়ারিতে, না হয় বিভিন্ন ব্যক্তিকে লেখা পত্রে তাঁর ভ্রমণের পদচিহ্ন রক্ষা করেছেন— অবশ্য সেখানে তথ্য যতটা আছে, তার চেয়ে বেশি আছে তাঁর মানসভ্রমণের ইতিবৃত্ত; কিন্তু এর আগে কোনো ভ্রমণেই কবিতা লেখার প্রেরণা তিনি বিশেষ অনুভব করেননি, পক্ষান্তরে এবারে আসাযাওয়ার পথে তিনি অনেকগুলি কবিতা লিখেছেন, যা একটি ব্যতিক্রম বলে গণ্য হতে পারে।

ডায়ারি লিখব না ঘোষণা করেও লেখার সিদ্ধান্তের কারণটি রবীন্দ্রনাথ ব্যাখ্যা করেছেন 29 Sep [সোম ১৩ আশ্বিন]-এ লেখা ডায়ারিতে : 'মুখ দিয়ে একটা কথা বেরিয়ে গেছে ব'লেই যে সেই কথাটা অটল সত্যের গৌরব লাভ করবে এতবড়ো অহংকার, আমার নেই। ··· যখন দেখলুম দুর্দৈবের ধাক্কায় মনটা হার মানবার উপক্রম করছে তখন তেড়ে উঠে বললুম, "না, ডায়ারি লিখবই।" কিন্তু, লেখবার আছে কী। কিছুই না, যা-তা লিখতে হবে। সকল লেখার সেরা হচ্ছে যা-তা লেখা। যথেচ্ছাচারের অধিকার রাজার অধিকার।'

ভ্রমণবিবরণ রক্ষা করবার একটি পদ্ধতি রবীন্দ্রনাথ আগে-পরে প্রায়শই ব্যবহার করেছেন, সেটি হল কোনো ব্যক্তিবিশেষকে চিঠি লেখার মাধ্যমে। কিছুদিন আগেই তিনি রাণুকে চিঠি লিখে চিনভ্রমণের যাত্রাপথের বিবরণ দিয়েছিলেন। এবারেও হয়তো তাঁকেই লেখা স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু রাণু তাঁকে ঘিরে নিজের মনের মধ্যে যে জটিল আবর্ত রচনা করছিলেন, রবীন্দ্রনাথ হয়তো তাকে প্রশ্রয় দেওয়া বাঞ্ছনীয় মনে করেননি; ডায়ারিতে লিখেছেন :

> বিশেষ কোনো-একজনকে চিঠি লেখবার একটা প্রচ্ছন্ন বীথিকা যদি সামনে পাওয়া যেত তাহলে তারই নিভৃতছায়ার ভিতর দিয়ে আমার নিরুদ্দেশ বাণীকে অভিসারে পাঠাতুম। কিন্তু সে-বীথিকা আজ নেই। তাই অপরিচিত ক্যাবিনে আলো জ্বেলে নিজের কাছেই নিজে বকতে বসলুম। আলাপের এই অদ্বৈতরূপ আমার পছন্দসই নয়। সংসারে যখন মনের মতো দ্বৈত দুর্লভ হয়ে ওঠে তখনই মানুষ অদ্বৈতসাধনায় মনকে ভুলিয়ে রাখতে চায়। কারণ, সকলের চেয়ে দুর্বিপাক হচ্ছে অ-মনের মতো দ্বৈত।

রবীন্দ্রভবনে 'পশ্চিমযাত্রীর ডায়ারি' গ্রন্থটির তিনটি পাণ্ডুলিপি আছে— Ms. 109 (i), Ms. 109 (ii), Ms. 109 (iii), যাদের বাঁধানোর পরবর্তী আয়তন 24.5 × 19.3 cm., 26.8 × 24 cm., 29.7 × 16.5 cm., লিখিত পৃষ্ঠাসংখ্যা ৮৩, ৩১ ও ২৭— শেষোক্তটি শান্তা দেবীর কাছে প্রাপ্ত পাণ্ডুলিপির ফটোকপি; শান্তা দেবী তখন প্রবাসী-সম্পাদনায় সাহায্য করতেন ও প্রবাসী-তে প্রেরিত রবীন্দ্র-পাণ্ডুলিপির কিয়দংশ তিনি নিজেই রেখে দিতেন, এই ব্যাপারে বিশ্বভারতীর কর্মসচিব ও প্রকাশনার ভারপ্রাপ্ত প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশের সঙ্গে তাঁর মনোমালিন্যের দৃষ্টান্ত দুর্লভ নয়— কিন্তু রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত সবগুলি পাণ্ডুলিপিই অসম্পূর্ণ। এদের মধ্যে প্রথম দুটি প্রাথমিক রচনা— যাদের মধ্যে পূরবী-র কয়েকটি কবিতার প্রথম খসড়াও আছে— পরে বহুলপরিমাণে সুসংস্কৃত ও পুনর্লিখিত হয়ে সেগুলি প্রবাসী-তে প্রকাশের জন্য প্রেরিত হয়।

সিলোনে একটি দিন কাটিয়ে রবীন্দ্রনাথ সদলবলে 24 Sep [বুধ ৮ আশ্বিন] সকাল আটটায় জাপানি জাহাজ 'হারুনা-মারু'তে আরোহণ করেন। কিন্তু এটি মালবাহী জাহাজ বলে প্রায় সারাদিনই লাগিয়ে দেয় মাল বোঝাই করতে। তারপরে দিনটিও ছিল দুর্যোগপূর্ণ, 'আকাশে ঘন মেঘ, দিগন্ত বৃষ্টিতে ঝাপসা, বাদলার হাওয়া খুঁতখুঁতে ছেলের মতো কিছুতেই শান্ত হতে চাচ্ছে না। ··· যাত্রার মুখে এইরকম দুর্যোগকে কুলক্ষণ বলে মনটা

ম্লান হয়ে যায়।' আকাশের এই অপ্রসন্নতা রবীন্দ্রনাথের মনকেও বিষণ্ণ করে তুলেছে; তিনি লিখেছেন : 'অনেকবার দূরদেশে যাত্রা করেছি, মনের নোঙরটা তুলতে খুব বেশি টানাটানি করতে হয় নি। এবার সে কিছু যেন জোরে ডাঙা আঁকড়ে আছে। তার থেকে বোধ হচ্ছে, এতদিন পরে আমার বয়স হয়েছে। না-চলতে চাওয়া প্রাণের কৃপণতা, সঞ্চয় কম হলে খরচ করতে সংকোচ হয়।' গিরিজাপতি ভট্টাচার্য লিখেছেন, জাহাজ ছাড়ে প্রায় বিকেল চারটের সময়ে, অন্যেরা সময় নির্দেশ করেছেন সন্ধ্যা বা রাত্রি।

জাপানি জাহাজে রবীন্দ্রনাথের খাতির ছিল রাজকীয়। গিরিজাপতি তাঁর কেবিনের বর্ণনায় লিখেছেন : 'কবির কেবিন ছিল state cabin : বৈঠকখানা, লেখাপড়ার ছোট একটি ঘর ও বড় সোনার গিলটি করা পালঙ্ক পাতা; মোটা গালচে বিছানো।' রবীন্দ্রনাথ এই ঘরে 24 Sep তাঁর ডায়ারির যে প্রথম কিস্তিটি রচনা করেছেন, তার শেষাংশ যেন কিছুকাল আগে 'বিজলী' সাপ্তাহিকে মুদ্রিত তাঁর 'কৈফিয়ৎ' প্রবন্ধটিরই সুসংস্কৃত রূপান্তর [প্রথম পাণ্ডুলিপিতে অনুপস্থিত]।

মেঘাচ্ছন্ন আবহাওয়ায় যাত্রা শুরু করেছিলেন, তাই তাঁর মনের কপাট ছিল রুদ্ধ— সেই বেদনারই প্রকাশ আছে ডায়ারির প্রথম তিনটি কিস্তিতে। তৃতীয় দিন লেখেন : 'আজ ক্ষণে ক্ষণে রৌদ্র উঁকি মারছে, কিন্তু সে যেন তার গারদের গরাদের ভিতর থেকে। তার সংকোচ এখনো ঘুচল না। ··· আচ্ছন্ন সূর্যের আলোয় আমার চৈতন্যের স্রোতস্বিনীতে যেন ভাঁটা পড়ে গেছে। জোয়ার আসবে রৌদ্রের সঙ্গে সঙ্গে।' কিন্তু তার আগেই 25 Sep [বৃহ ৮ আশ্বিন] বিকেলে লিখতে শুরু করলেন সূর্যবন্দনার কবিতা 'সাবিত্রী' ['ঘন অশ্রুবাষ্পে ভরা মেঘের দুর্যোগে খড়্গ হানি' দ্র পূরবী ১৪। ৪৩–৪৫]— পরদিন [26 Sep শুক্র ১০ আশ্বিন] কবিতাটির শেষ কয়েকটি স্তবক রচনা করে ডায়ারির পাণ্ডুলিপিতে লিখলেন : 'কাল অপরাহ্নে মেঘাচ্ছন্ন সূর্য্যের দিকে লক্ষ্য করে একটা কবিতা আরম্ভ করেচি আজ সকালে সেটা শেষ হল।' 'পূরবী' কাব্যগ্রন্থটিতে [১৩৩২] তিনটি অংশ ছিল— 'পূরবী', 'পথিক' ও 'সঞ্চিতা'; 'পূরবী' অংশে ১৩২৪–৩০ সালে লিখিত কবিতাগুলি, 'পথিক' অংশে ১৩৩১ সালে য়ুরোপ ও দক্ষিণ-আমেরিকা ভ্রমণকালে লিখিত কবিতাবলি ও 'সঞ্চিতা' অংশে এতাবৎ গ্রন্থে অসংকলিত কিছু কবিতা অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল— 'সাবিত্রী' কবিতা দিয়ে 'পথিক' অংশের সূচনা হল।

সুরেন্দ্রনাথ কর এই যাত্রায় রবীন্দ্রনাথের সঙ্গী হয়েছিলেন। তিনি যে-ভ্রমণবৃত্তান্ত আশ্রমে লিখে পাঠিয়েছিলেন, সেটি 'জাহাজের চিঠি' নামে অগ্র-সংখ্যা শান্তিনিকেতন-এ [পৃ ২১৩–১৫] মুদ্রিত হয়। বৃষ্টিবাদলা সত্ত্বেও সমুদ্র মোটামুটি শান্ত ছিল, তবু প্রতিমা দেবী, গিরিজাপতি ভট্টাচার্য ও বিজয় বাসু সমুদ্রপীড়ায় আক্রান্ত হয়েছিলেন। সুরেন্দ্রনাথ লিখেছেন : '৩য় দিনে বাদলা কেটে গিয়ে বেশ রোদ্দুর উঠল। ওঁরাও ক্রমশঃ সুস্থ হলেন। আজ সুয়ামারুর কাপ্তান wireless করে গুরুদেবকে তাঁহাদের শুভকামনা জানিয়েছে, তাকে ধন্যবাদ দিয়ে wireless করা হল, সে বিলাত হতে এসেছে, এখন ১৫০ মাইল দূরে আছে। কাল দেখা হবে।' সাক্ষাৎকারের বিবরণে তিনি জানান : 'সুয়ামারু খুব কাছ দিয়ে গেল। সমস্ত জাহাজ শুদ্ধ লোক গুরুদেবকে cheer করল।'

কবি-সাহিত্যিক এবং বুদ্ধদেব, টলস্টয় প্রভৃতি মহাপুরুষদের তথ্যনির্ভর জীবনচরিত রচনার ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথের আপত্তি ছিল। বহুকাল আগে ১৩০৮ সালে লেখা তাঁর 'কবিজীবনী' প্রবন্ধ এবং 'কবিচরিত' বা 'কবির বিজ্ঞান' কবিতাতেই তিনি ঘোষণা করেছিলেন 'কবিরে পাবে না তাহার জীবনচরিতে'। এখানে তিনি সেই বক্তব্য আবার উত্থাপন করলেন 27 Sep [শনি ১১ আশ্বিন]-এ লেখা ডায়ারিতে। তিনি লিখেছেন : 'যারা

জীবনচরিত লেখে তারা সমসাময়িক খাতাপত্র থেকে অতিবিশ্বাসযোগ্য তথ্য সংগ্রহ করে লেখে; সেই অচল সংবাদগুলো নিজেকে না কমাতে না বাড়াতে পারে। অথচ, আমাদের প্রাণপুরুষ তার তথ্যগুলোকে পদে পদে বাড়িয়ে-কমিয়েই এগিয়ে চলেছে। অতিবিশ্বাসযোগ্য তথ্য স্তূপাকার করে তা দিয়ে স্মরণস্তম্ভ হতে পারে, কিন্তু জীবনচরিত হবে কী করে। জীবনচরিত থেকে যদি বিস্মরণধর্মী জীবনটাই বাদ পড়ে তাহলে মৃতচরিতের কবরটাকে নিয়ে হবে কী।' বিষয়টিকে রবীন্দ্রনাথ সবিস্তারে লিখেছিলেন পাণ্ডুলিপির বর্জিত অংশে, যা 'পরিশিষ্ট' অভিধায় গ্রন্থশেষে সংকলিত হয়েছে [দ্র যাত্রী ১৯। ৪৩৯–৪১]। তিনি লিখেছেন, বুদ্ধদেবের সময়ে যদি সিনেমাওয়ালা বা খবরের কাগজের রিপোর্টারের চলন থাকত, তাহলে 'তাঁর চেহারা, চালচলন, তাঁর মেজাজ, তাঁর ছোটোখাটো ব্যক্তিগত অভ্যাস, তাঁর রোগ তাপ ক্লান্তি ভ্রান্তি সব নিয়ে আমাদের অনেকের সঙ্গে মিল দেখতুম।' কিন্তু এইসব প্রমাণকে গুরুত্ব দিলে পরিপ্রেক্ষিতের ভুল হত— সেই ক্ষণকালের বুদ্ধ সত্যকারের বুদ্ধ নন। ম্যাক্সিম গোর্কি টলস্টয়ের একটি জীবনচরিত লিখেছেন। এই গ্রন্থটি সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ মন্তব্য করেছেন :

> বর্তমানকালের প্রখরবুদ্ধি পাঠকেরা বাহবা দিয়ে বলছেন, এ-লেখাটা আর্টিস্টের যোগ্য লেখা বটে। অর্থাৎ, টলস্টয় দোষে গুণে ঠিক যেমনটি সেই ছবিতে তীক্ষ্ণ রেখায় তেমনটি আঁকা হয়েছে। এর মধ্যে দয়ামায়া ভক্তিশ্রদ্ধার কোনো কুয়াশা নেই। পড়লে মনে হয়, টলস্টয় যে সর্বসাধারণের চেয়ে বিশেষ কিছু বড়ো তা নয়, এমন-কি, অনেক বিষয়ে হেয়। এখানে আবার সেই কথাটাই আসছে। টলস্টয়ের কিছুই মন্দ ছিল না, এ কথা বলাই চলে না; খুঁটিনাটি বিচার করলে তিনি-যে নানা বিষয়ে তাদের চেয়েও দুর্বল, এ কথা স্বীকার করা যেতে পারে। কিন্তু, যে-সত্যের গুণে টলস্টয় বহুলোকের এবং বহুকালের, তাঁর ক্ষণিকমূর্তি যদি সেই সত্যকে আমাদের কাছ থেকে, আচ্ছন্ন করে থাকে তা হলে এই আর্টিস্টের আশ্চর্য ছবি নিয়ে আমার লাভ হবে কী। ··· ক্ষণকালের মায়ার দ্বারা চিরকালের স্বরূপকে প্রচ্ছন্ন করে দেখাই আর্টিস্টের দেখা, এ কথা মানতে পারি নে। তা ছাড়া, গোর্কির আর্টিস্ট-চিত্ত তো বৈজ্ঞানিক হিসাবে নির্বিকার নয়। তাঁর চিত্তে টলস্টয়ের যে-ছায়া পড়েছে সেটা একটা ছবি হতে পারে, কিন্তু বৈজ্ঞানিক হিসাবেও সেটা-যে সত্য তা কেমন করে বলব। গোর্কির টলস্টয়ই কি টলস্টয়? বহুকালের ও বহুলোকের চিত্তকে যদি গোর্কি নিজের চিত্তের মধ্যে সংহত করতে পারতেন তা হলেই তাঁর দ্বারা বহুকালের ও বহুলোকের টলস্টয়ের ছবি আঁকা সম্ভবপর হত। তার মধ্যে অনেক ভোলবার সামগ্রী ভুলে যাওয়া হত; আর তবেই যা না-ভোলবার তা বড়ো হয়ে, সম্পূর্ণ হয়ে, দেখা দিত।

কিন্তু তথ্যনির্ভর জীবনচরিতের সমালোচনা করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ-যে নিজেই পরিপ্রেক্ষিতের ভুল করে ফেলেছেন সেই বিষয়ে তিনি আদৌ সচেতন ছিলেন না। বুদ্ধদেবের জীবনের ঐতিহাসিক তথ্য একেবারেই নেই, তাঁর জীবনের কাঠামো নির্মিত হয়েছে নিছক লোককথার ভিত্তিতে— অপেক্ষাকৃত আধুনিককালের চৈতন্যদেবের অন্তত চারখানি প্রায়- সমকালীন জীবনী কতটা নির্ভরযোগ্য সে কথা আমাদের জানা আছে। শ্রীরামকৃষ্ণ বা বিবেকানন্দের জীবনচরিতে অলৌকিকতা অনুপ্রবিষ্ট করে দেওয়ার দৃষ্টান্ত তো রবীন্দ্রনাথ নিজেই প্রত্যক্ষ করেছেন। গোর্কি মার্ক্সবাদে দীক্ষিত হয়েছিলেন, সুতরাং বড়োমাপের লেখক হয়েও থিসিস-অ্যান্টিথিসিসের বাঁধি গতে টলস্টয়ের জীবনকে ঢালাই করতে গিয়ে তিনি যদি বিভ্রান্তির শিকার হন তাতে অবাক হবার কিছু নেই— কিন্তু এই জীবনী পড়ার পরেও টলস্টয়ের রচনার সঙ্গে পরিচিত পাঠকের কোনো ক্ষতিবৃদ্ধি হয়েছে বলে মনে হয় না। রবীন্দ্রনাথের জীবন ও রচনা সম্পর্কে প্রায় অজ্ঞ চিনের কম্যুনিস্ট যুবক ও বুদ্ধিজীবীদের প্রতিক্রিয়ার কথা তিনি এত দ্রুত ভুলে গেলেন কী করে! দলিল-নির্ভর জীবনীর প্রয়োজন এইখানেই, কবির অন্তর্জীবনের পরিচয় পাওয়ার জন্য তাঁর রচনাবলি অন্তত আজকের দিনে দুর্লভ হবার নয়।

ডায়ারির অনেকগুলিতেই নারীপুরুষের প্রেমের প্রকৃতি বিশ্লেষণ করা হয়েছে। তার সাধারণ উপলক্ষ ছিল ডায়ারি লেখার পশ্চাৎপটে নলিনী তালুকদারের অনুরোধ। কিন্তু আমাদের তো মনে হয়, রাণুও এর পটভূমিকায় থাকতে পারেন। অপরিণতিবুদ্ধি ও আবেগপ্রবণতায় রাণু তাঁকে যেভাবে চাইছিলেন তাকে প্রশ্রয়

দেওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না, কিন্তু নারীর প্রেমকে অসম্মান করাও তাঁর স্বভাববিরুদ্ধ ছিল। এই জটিল পরিস্থিতি তাঁর মনকে অধিকার করে ছিল, হয়তো তারই প্রকাশ ঘটেছে ডায়ারির বিশ্লেষণধর্মী আলোচনায় ও বেশ-কিছু কবিতায়।

মেঘ কেটে যাওয়ার পরে রবীন্দ্রনাথ ভেবেছিলেন ডায়ারি লেখা বন্ধ করে দেবেন। 29 Sep [১৩ আশ্বিন] পাণ্ডুলিপিতে লিখেছিলেন : 'কিন্তু আর বেশি দিন নয়। ডায়ারি বন্ধ করার সময় এল। মেঘ গেছে কেটে; উপরের স্থির নীলিমার কাছ থেকে আলোকের বাণী আস্‌চে। স্বর্গমর্ত্যের এই দ্বৈত আলাপের সভায় আমি কথা বন্ধ করে দিন কাটাতে চাই।' কিন্তু কথার যে-স্রোত বাইরের তাগিদে উন্মুক্ত হয়েছিল, তাকে রুদ্ধ করা তাঁর পক্ষেও সম্ভব ছিল না। তাই ধারাবাহিকভাবে না হলেও সমগ্র যাত্রাপথে তাঁর আত্মপ্রকাশের এই মাধ্যমটিকে তিনি ত্যাগ করেননি।

রবীন্দ্রনাথ ডায়ারিতে আত্মগত ভাবনার যে-পদচিহ্ন এঁকে যাচ্ছিলেন, বোঝা যায়, সহযাত্রীদের কাছে তিনি সেগুলি পড়ে শোনাতেন এবং তা নিয়ে আলোচনাও হত। যেমন, 30 Sep তিনি লিখেছেন : 'আমার ডায়ারিতে মেয়ে-পুরুষের কথা নিয়ে যে-আলোচনা ছিল সে সম্বন্ধে প্রশ্ন উঠেছে এই যে, "আচ্ছা, বোঝা গেল যে, প্রাণের টানে মেয়ে আটকা পড়েছে আর পুরুষ ছুটেছে মনের তাড়ায়। তারপরে, তারা যে-প্রেমে মেলে সেটা কি ঠিক একজাতের।" এই দিনের ডায়ারির লেখাটি এই প্রশ্নেরই দীর্ঘ বিশ্লেষণ। এর পরের দিন 1 Oct [বুধ ১৫ আশ্বিন] তিনি দুটি কবিতা লিখলেন 'পূর্ণতা' [দ্র পূরবী ১৪। ৪৬–৪৮] ও 'আহ্বান' [ঐ ১৪। ৪৮–৫২]— এইদিন ডায়ারি লেখা হয়নি, আগের দিনের বিশ্লেষণী মন্তব্য কাব্যরচনায় ব্যাপৃত থেকেছে।

2 Oct [বৃহ ১৬ আশ্বিন] রবীন্দ্রনাথ নিজের লেখা ডায়ারির লক্ষণ বিচার করে লিখেছেন :

> মন চলেছিল আপন রাস্তায়, এক ভাবনা থেকে আর-এক ভাবনায়। চলেছিল বললে বেশি বলা হয়। উট যেমন বোঝা পিঠে নিয়ে মরুর মধ্যে পথ আন্দাজ করে চলে এ তেমন চলা নয়; এ যেন পথের খেয়াল না রেখে ভেসে যাওয়া, কোনো বিশেষ ঘাটের কাছে বায়না না নিয়ে শুধু-শুধু বেরিয়ে পড়া, কথাগুলোকে নিজের চেষ্টায় চালনা না ক'রে দিকের হিসাব না রেখে তাদের আপনার ঝোঁকে চলতে দেওয়া। তার সুবিধা হচ্ছে এই যে, কথাগুলো নিজেরাই হয় বক্তা, আর মনটা হয় শ্রোতা। ··· মনের ভূগোলে অনাবিষ্কৃতের আর অন্ত নেই। সে-সব জায়গায় পৌঁছে দেবার পথগুলো সবই নদীর মতো··· তারই স্রোতে মন আপনাকে ভাসিয়ে দিতে পারলে নিজের মধ্যে অপরিচিতের পরিচয় পেতে থাকে। ··· যে মানুষের মনের মাঝখান দিয়ে চলতি নদী থাকে সে-মানুষ আপনার কাছ থেকে আপনি শিক্ষা করবার সুযোগ পায়। আমার মনে সেই নদীটা আছে। তারই ডাকে ছেলেবেলায় আমি ইস্কুল পালিয়েছিলুম। যে-সব জ্ঞান শিখে শিখতে হয় তার বিস্তর অভাব রয়ে গেল কিন্তু অন্যদিকে ক্ষতিপূরণ হয়েছে। সেজন্যে আমার মনের ভিতরকার ভাগীরথীকে আমি প্রণাম করি।

সেইদিনই সন্ধ্যায় 'অল্প কয়েকটি রেখা, অল্প কিছু উপকরণ'-এ আঁকা 'জনশূন্য সমুদ্র ও আকাশের সঙ্গমস্থলে পশ্চিমদিগন্তে একখানি ছবি' দেখে রবীন্দ্রনাথ লিখলেন 'ছবি' [দ্র পূরবী ১৪। ৫৩] নামের একটি কবিতা। তিনি লিখেছেন : 'এখানে চারিদিকের এই বিপুল রিক্ততার মাঝখানে এই ছবিটি এমন একান্ত হয়ে উঠে আমার কাছে প্রকাশ পেলে। একে সম্পূর্ণ করে দেখবার জন্যে এতবড়ো আকাশ এবং এত গভীর স্তব্ধতার দরকার ছিল।' যা দেখে তাঁর মনে পড়ে গেছে জাপানের আসবাবহীন ঘরের মধ্যে একখানি ছবির জ্যোতির্ময় প্রকাশের কথা।

3 Oct [শুক্র ১৭ আশ্বিন] রথীন্দ্রনাথ পোর্ট সৈয়দ বন্দরের কাছাকাছি এসে প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশকে একটি দীর্ঘ পত্র লেখেন; পত্রটি বিবিধ মূল্যবান সংবাদে পূর্ণ। কাজকর্মের পরিধি বেড়ে যাওয়ায় দেশবিদেশের চিঠিপত্রের উত্তর দেওয়া ও অন্যান্য কাজের জন্য রবীন্দ্রনাথের একজন সহকারীর প্রয়োজন ছিল। অ্যান্ডরুজ বা এল্‌ম্‌হার্স্ট যতদিন কাছে ছিলেন, তাঁরা এইসব দায়িত্ব মোটামুটি পালন করেছেন। কিন্তু সদা-ভ্রাম্যমান

অ্যান্ডরুজ ও দেশে প্রত্যাবর্তন-মুখী এল্‌ম্‌হার্স্টের উপর নির্ভর করার দিন ফুরিয়ে আসছিল, তাই জাপানে তিনি কেশোরাম সবেরওয়ালকে নিয়োগপত্র দিয়েছিলেন— কিন্তু জানতেন, তাঁকে পাওয়ার সম্ভাবনা অল্প। এমতাবস্থায় তিনি এইসময়ে ক্ষিতিমোহন সেনের ভ্রাতুস্পুত্র ধীরেন্দ্রমোহন সেনের [1902–87] কথা ভাবেন, কিন্তু রথীন্দ্রনাথ লিখেছেন : 'ধীরেন সম্বন্ধে বাবা হঠাৎ সম্পূর্ণ মত বদলে ফেল্লেন এবং আমাকে সে কথা জাহাজে এসে বল্লেন। উনি অনেকদিন থেকে লোকের কথা বলছিলেন তাই আমি (কাজটা rash হলেও) তাড়াতাড়ি ঠিক করে ফেল্লুম— তখন জানতুম না এত শীঘ্র বাবা মত বদলে ফেলবেন। এখন বলছেন যে আমি বুঝেছি আমার নিজের কাছে মাঝারি গোছের লোক রাখা চলবে না— হয় চাকর না হয় ত খুব উঁচু দরের intellectual companion— mediocre লোকের সঙ্গ আমি বেশিদিন সইতে পারব না। তার চেয়ে না রাখাই ভাল।' কিছুদিন পরে রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য-সহকারী পদে কবি অমিয়চন্দ্র চক্রবর্তী [1901–86] নিযুক্ত হন।

এর পরে তিনি লেখেন : 'বাবা জাহাজে চড়ে অবধি লেখার moodএ রয়েছেন। একটা diaryর মত সুরু করেছেন— জানি না কতদূর চলবে। সেইসঙ্গে মাঝে মাঝে কবিতাও লিখছেন। যতটা লেখা হয়েছে Port Said থেকে রেজেষ্ট্রি করে পাঠাব··· এর কপি থাকছে না— কাজেই প্রেস থেকে mss. ফেরৎ আনিয়ে তোমার কাছে রেখে দিও।' এই বিষয়ে তিনি নানাবিধ নির্দেশও জানান, কিন্তু প্রবাসী-তে পাঠালে রামানন্দ-কন্যা শান্তা দেবী পাণ্ডুলিপিটি নিজের অধিকারে রাখার আগ্রহে অনুলিপি করে প্রেসে পাঠাতেন— ফলে কপির ত্রুটিতে মুদ্রণপ্রমাদ ঘটলে রবীন্দ্রনাথ ক্ষুব্ধ হতেন, যার জন্য নানাবিধ অশান্তি ঘটত। এইভাবে বহু পাণ্ডুলিপি পরহস্তগত হওয়ায় এখন গবেষকরা প্রচণ্ড অসুবিধায় পড়েন।

আশ্বিন ১৩৩১-সংখ্যা প্রবাসী-তে 'রক্তকরবী' নাটকটি সম্পূর্ণ মুদ্রিত হয়েছিল— এই মুদ্রণের বিভিন্ন প্রমাদ নিয়ে রবীন্দ্রনাথ বিরক্তি প্রকাশ করেন। এই বিষয়ে রথীন্দ্রনাথ লেখেন :

> "রক্তকরবী"র একটা corrected কপি তোমার কাছে পাঠাচ্ছি— এটা তোমারই কাছে carefully রেখে দিও। যখন বই ছাপান হবে তখন দরকার হবে। ···
>
> "রক্তকরবী"তে মাঝে একজায়গায় কথাবার্ত্তার উলোটপালট কিছু হয়ে গেছে। বাবা বল্লেন তাঁর কাছে mss. নেই বলে correction করতে পারলেন না। ইংরেজি "Red Oleanders"এর ২১ ও ২২ পাতায় যে কথাবার্ত্তা আছে সেইটাই ঠিক— বাংলাটা তার সঙ্গে তুলনা করে দেখে রেখো।

যাত্রার পরিকল্পনায় কিছু পরিবর্তন আনার কথা ভাবা হচ্ছিল, রথীন্দ্রনাথ লিখেছেন : 'Red Seaতে যেতে ২ একটা নতুন প্ল্যান মাথায় এসেছে। Port Saidএ এই জাহাজটা ছেড়ে দিয়ে Palestine ও Egypt (বাবার এমন কি Turkeyও ইচ্ছে আছে) ঘুরে সেরে রাখা যেতে পারে। ১৫ দিন পরে N.Y.K.র অন্য জাহাজটা ধরা চলবে। আমি পর্শু Jerusalemএ cable করে দিয়েছি— তাদের কাছ থেকে যদি favourable জবাব আসে তবে journey break করাই ঠিক করব। বাবার আশঙ্কা ফেরবার পথে এ সব দেশে দেরি করতে ইচ্ছে করবে না।' কিন্তু 6 Oct পোর্ট সৈয়দে পৌঁছে জেনোয়া থেকে কেব্‌ল পাওয়া গেল 22 Oct-এর মধ্যে য়ুরোপে না পৌঁছলে দক্ষিণ আমেরিকার জাহাজ পাওয়া যাবে না। অতএব উক্ত পরিকল্পনা ত্যাগ করে 7 Oct পোর্ট সৈয়দ থেকে রওনা হয়ে 12 Oct [রবি ২৬ আশ্বিন] মার্সেলিস বন্দরে পৌঁছে প্যারিসে কানের অতিথিনিবাসে আশ্রয় নেওয়া হয়।

এর আগে যথারীতি ডায়ারি ও কবিতা লেখাও চলছিল। 3 Oct সূর্যোদয়ের পূর্বে রবীন্দ্রনাথের মুখে ছন্দে-গাঁথা কয়েকটি কথা ভেসে উঠল— 'হে ধরণী, কেন প্রতিদিন/ তৃপ্তিহীন/ একই লিপি পড় বারে বারে।' 'বুঝতে পারলুম আমার কোনো-একটি আগন্তুক কবিতা মনের মধ্যে এসে পৌঁছবার আগেই তার ধুয়োটা এসে পৌঁচেছে।' 'লিপি' কবিতাটি শেষ হয় পরের দিন। হারুনা-মারু জাহাজে ভূমধ্যসাগরে 6–7 Oct দু'দিনে শেষ দুটি কবিতা লেখা হয় 'ক্ষণিকা' ও 'খেলা' নামে। এই পর্বে ডায়ারির শেষ কিস্তিটিও লেখা হয়েছে 7 Oct [মঙ্গল ২১ আশ্বিন]। এখানে রবীন্দ্রনাথ অনেক কথার সঙ্গে তাঁর সমকালীন রচনা সম্পর্কে একটি বিশেষ তথ্যের উল্লেখ করেন। তিনি লেখেন, গত পনেরো-ষোলো বছর ধরে তিনি এত গান লিখেছেন যে সংখ্যার হিসাবে তিনি প্রথম শ্রেণীর পুরস্কার লাভ করতে পারেন। এগুলি লোকরঞ্জনের জন্য নয়, ক্ষমতা দেখাবার জন্যও নয়, কেন-না দশ-বারো লাইনের গানের মধ্যে ক্ষমতার কায়দা দেখাবার জায়গাই নেই। তবু যে লিখেছেন তার কারণ, 'গান লিখতে যেমন আমার নিবিড় আনন্দ হয় এমন আর কিছুতে হয় না। এমন নেশায় ধরে যে, তখন গুরুতর কাজের গুরুত্ব একেবারে চলে যায়, বড়ো বড়ো দায়িত্বের ভারাকর্ষণটা হঠাৎ লোপ পায়, কর্তব্যের দাবিগুলোকে মন এক-ধার থেকে নামঞ্জুর করে দেয়।' একই ধরনের আর-একটি উপকরণের তিনি উল্লেখ করেছেন কৌতুকের সঙ্গে : 'একটি ছোট্টো মেয়ে কোথা থেকে আমার যাত্রাপথে জুটে গেছে। তার বয়স আড়াই বছর। তার মধ্যে প্রাণের আনন্দ টলমল করে ওঠে, কত মধুর প্রলাপে, কত মন-ভোলানো ভঙ্গীতে; আমার মন বলে, "মস্ত একটা পাওনা আমি পেলুম।" কী-যে পেলুম তাকে হিসাবের অঙ্কে ছ'কে নেবার জো নেই। আর-কিছু নয়, একটি বিশেষ হয়ে-ওঠাকেই আমি চরম করে দেখলুম।' এই মেয়েটি তাঁর পালিতা নাতনি নন্দিনী বা পুপে— যিনি আর কিছুদিন পরেই 'তিন বছরের প্রিয়া' আখ্যায় কবিতার বিষয়ীভূতা হবেন।

শিশু ভোলানাথ কাব্য প্রকাশের আগে ও পরে লেখা রবীন্দ্রনাথের কিছু কবিতা জমে উঠছিল, সেগুলিকে গ্রন্থাকারে সংকলনের ভাবনা চলার সময়ে তিনি 11 Oct প্রশান্তচন্দ্রকে লিখলেন : "হালের কবিতাগুলো নিয়ে যদি বই ছাপাও নাম দিয়ো 'বৈকালী'। সমুদ্রে যেগুলো লিখেচি তার গদ্য অংশ সুদ্ধ যেন ছাপানো হয়, সেটা নিয়মবিরুদ্ধ হতে পারে কিন্তু নীতিবিরুদ্ধ নয়— কারণ, কথাই আছে, দেবতা যাদের একত্র করেছেন মানুষ তাদের যেন না পৃথক করে।"[১১০] 'বৈকালী' নামে একটি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছিল, কিন্তু সেটি উক্ত কবিতাগুলি নিয়ে নয়, উল্লিখিত কবিতাসংগ্রহ 'পূরবী' নামে মুদ্রিত হয়— অবশ্য গদ্যাংশ তাতে ছাপা হয়নি।

কয়েকদিন আগে রথীন্দ্রনাথও প্রশান্তচন্দ্রকে বৈকালী-র কথা লিখেছিলেন, এ ছাড়াও লেখেন : '"স্ফুলিঙ্গ" জন্য design করাচ্ছ? নন্দবাবুর এটাতে উৎসাহ নিশ্চয়ই হবে।' 'স্ফুলিঙ্গ' অবশ্য রবীন্দ্রনাথের জীবৎকালে মুদ্রিত হয়নি, এর প্রথম প্রকাশের তারিখ ২৫ বৈশাখ ১৩৫২। তবে এরই সগোত্র গ্রন্থ 'লেখন' ১৩৩৪ সালে প্রকাশিত হয়, যার নাম আগে 'স্ফুলিঙ্গ' রাখা হবে বলে ঠিক হয়েছিল। এই বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ উক্ত পত্রে প্রশান্তচন্দ্রকে লেখেন :

সেই চীন-জাপানী পাখায় লেখবার উপলক্ষে যে সব কবিতার কণা জমেছিল তোমাকে দিয়ে এসেচি। তার মধ্যে গোটা কুড়িক অন্য সময়ে লেখা দ্বিপদী ছিল— কোন একসময়ে Modern Reviewতে তার ইংরেজি তর্জমা বের করা হয়েছিল বলে মনে হচ্চে। এই সব কবিতা ভাবের সঙ্গতি অনুসারে শ্রেণীবদ্ধ কোরো না— কেবল প্রথম গোটাকতক একটু সাজানো থাকলে ক্ষতি নেই। বাকি সমস্ত খুব কষে ভেস্তে দিয়ো। এই স্ফুলিঙ্গের গোটাকতক তোমাকে লিখে দিয়ে আসতে ভুল হয়ে গেচে— তাছাড়া এ জাহাজের কাপ্তেনের জন্যে এখানে এসে নতুন একটা লিখতে হয়েচে

এগুলো তোমাকে পাঠিয়ে দিচ্চি। আমার বক্তব্য এ নয় যে, স্ফুলিঙ্গ এখনি ছাপতে হবে। যখন ছাপতে ইচ্ছা কর তখনকার জন্যে গুছিয়ে রেখো। অথবা এগুলো গ্রন্থাকারে না ছাপলেও চলে।

—অবশ্য উক্ত গ্রন্থ প্রকাশে তাঁর আগ্রহও গোপন থাকেনি, তবে তাঁর বহু ইচ্ছা ভারপ্রাপ্তদের অবহেলায় সার্থক রূপ লাভ করেনি।

12 Oct [রবি ২৬ আশ্বিন] হারুনা-মারু জাহাজ ফ্রান্সের মার্সেলিস বন্দরে পৌঁছলে রবীন্দ্রনাথ সদলবলে সেখানে অবতরণ করেন। এর পর সকলে প্যারিসে গিয়ে কানের অতিথিশালায় আশ্রয় নেন। এল্‌ম্‌হার্স্ট এখানে এসে তাঁর সঙ্গে মিলিত হন।

সুরেন্দ্রনাথ করের 'স্মৃতিচারণ'-এ উক্ত অতিথিশালার বিস্তৃত বর্ণনা থাকলেও [দ্র রবীন্দ্রপরিকর সুরেন্দ্রনাথ কর। ১৭–১৮] রবীন্দ্রনাথের গতিবিধির পরিচয় সেখানে বিশেষ নেই। রথীন্দ্রনাথের ডায়ারিতে [Ms. 275 (c)] সূত্রাকারে কয়েকটি কার্যসূচির উল্লেখ পাওয়া যায়। তিনি সাধারণত ডায়ারিতে পিতার প্রসঙ্গই বেশি উল্লেখ করেছিলেন বলে মনে হয়, এই কার্যসূচি রবীন্দ্রনাথেরই। '14 Oct Monday' [মঙ্গল ২৮ আশ্বিন] তিনি লিখেছেন, এইদিন সকালে আমেরিকান এক্সপ্রেসের অফিসে গিয়ে তিনি পেরু যাবার জাহাজের টিকিটের ব্যবস্থাদি করে আসেন। সকাল সাড়ে এগারোটায় পেরুর কোনো মন্ত্রীর সঙ্গে দেখা হয়। দুপুর সাড়ে বারোটায় সিলভ্যাঁ লেভির সঙ্গে মধ্যাহ্নভোজন করা হয়। সম্ভবত রবীন্দ্রনাথকে আপ্যায়িত করার জন্যই এই আয়োজন।

'16 Oct Wednesday' [বৃহ ৩০ আশ্বিন] সকাল সাড়ে ন'টায় অধ্যাপক গেডেসের ব্যবস্থাপনায় St. Cloud-এ মি. উইলসনের স্টুডিও পরিদর্শন করা হয়। দুপুর সাড়ে বারোটায় মাদাম Tulmein-এর সঙ্গে মধ্যাহ্নভোজন সেরে 40 Ave Charles Floquet-এ মাদাম রানা-র সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছিল। পরের দিন দুপুরে সিলভ্যাঁ লেভির সঙ্গে মধ্যাহ্নভোজনের প্রস্তাব ছিল, কিন্তু সেটি বাতিল করা হয়।

18 Oct [শনি ১ কার্তিক] সকাল সাড়ে দশটায় এল্‌ম্‌হার্স্টের সঙ্গে শেরবুর্গ বন্দর থেকে রবীন্দ্রনাথ 'আন্ডেস' [S. S. Andes] জাহাজে দক্ষিণ আমেরিকার উদ্দেশে রওনা হন। এই যাত্রায় তিনি ডায়ারি লেখেননি, য়ুরোপ থেকে ফেরার পথে 14 Feb 1925 [২ ফাল্গুন] 'ক্রাকোভিয়া' জাহাজে ডায়ারিতে আন্ডেসের বর্ণনায় লেখেন : 'লম্বায় চওড়ায় জাহাজটা খুব মস্ত কিন্তু আমার শরীরের বর্তমান অবস্থায় আরামের যে-সব সুবিধার প্রয়োজন ছিল, তা পাওয়া গেল না। জাপানি জাহাজে আতিথ্যের প্রচুর দাক্ষিণ্যে আমার অভ্যাসটাও কিছু খারাপ করে দিয়েছিল। সেইজন্যে এখানে ক্যাবিনে প্রবেশ করেই মনটা অপ্রসন্ন হল। কিন্তু, যেটা অনিবার্য নিজের গরজেই মন তার সঙ্গে যত শীঘ্র পারে রফা করে নিতে চায়।'[১১১] সেই রফাটাই হল কবিতা লেখার মাধ্যমে। এইদিনই তিনি জাহাজে লেখেন 'পথ' ['অপরিচিতা' দ্র পূরবী ১৪। ৬২–৬৩] ও 'আন্মনা' [দ্র ঐ ১৪। ৬৪–৬৫] নামের দুটি কবিতা। এগুলি লেখা হয় Ms. 102-পরিগ্রহণ সংখ্যা-চিহ্নিত একটি পাণ্ডুলিপিতে, তাতে দেখা যায় কবিতাগুলি কাটাকুটির মাধ্যমে অলংকৃত হয়ে উঠছে। এই অলংকরণের বর্ণনা দিয়েছেন শিল্পী-লেখক সুশোভন অধিকারী :

১৮ অক্টোবর তারিখে লেখা "অপরিচিতা" (পাণ্ডুলিপিতে নাম ছিল "পথ") কবিতাটির কাটাকুটিতে দেখা যাবে গাঢ় কালো মোটা মোটা রেখা দিয়ে প্রায় সমগ্র পাতা জুড়ে স্থাপত্যের আকার, তার সঙ্গে মিশে আছে জন্তুর ছুঁচালো মুখ। একটার পিঠে আরেকটা যেন বসানো আছে। সেই জ্যামিতিক ফর্মের ফাঁকফোকর থেকে উঁকি দিচ্ছে কবিতার লাইনগুলি। এই আঁকিবুকির ছবিতে সরু রেখার কাজ প্রায় নেই, পুরোটাই মোটা কালো রেখা আর সাদার মধ্যে বিভাজিত।

পরের কবিতা "আন্‌মনা"ও ১৮ অক্টোবর তারিখেই লেখা। সমস্ত পাতা জুড়ে মোটা মোটা কালো রেখার জ্যামিতিক বিন্যাস। একটিই মূল ফর্ম, তার উপরে ছোট জান্তব মাথা, চোখ অত্যন্ত স্পষ্ট। ছোট ছোট জানলা দিয়ে কবিতা বেরোচ্ছে, জানলাগুলোর উপরেও সরু সরু রেখার জাল— মাকড়সার জালের মতো। যেন কিউবিস্টিক ভঙ্গিতে আঁকা স্ফটিকের টুকরোর ভিতর দিয়ে বিচ্ছুরিত হচ্ছে কবিতাটি।[১১২]

আমাদের জ্ঞাতসারে, একেই রবীন্দ্রনাথের ছবি-আঁকার সূত্রপাত বলা যায়। এর আগেও কয়েকটি রচনার পাণ্ডুলিপিতে শব্দ গ্রহণ-বর্জনের কাটাকুটিগুলিকে আলংকারিকভাবে কেটে ও জুড়ে রবীন্দ্রনাথ নকশার আকার দিয়েছেন, কিন্তু সেখানে ছবি আঁকার কোনো সচেতন প্রয়াস সম্ভবত কাজ করেনি। তবে এখনকার প্রয়াসগুলি এত সরল ছিল না বলেই মনে হয়। 1920–21-এর য়ুরোপপ্রবাসে তিনি অনেক আধুনিক য়ুরোপীয় চিত্রের সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন, দেশবিদেশের প্রিমিটিভ ছবির অনেক মুদ্রিত প্রতিরূপ দেখেছিলেন। জাপানে গিয়ে সেখানকার ছবির সারল্যে মুগ্ধতা প্রকাশ করলেও মনের গভীরে তিনি হয়তো উল্লিখিত চিত্ররীতির প্রতিই অপ্রতিরোধ্য আকর্ষণ অনুভব করেছেন। তারই প্রকাশ দেখা যায় এই প্রায় ধারাবাহিক কাটাকুটির চিত্র রচনায়। এগুলির শিল্পসম্মত বর্ণনার জন্য পাঠক সুশোভন অধিকারীর উক্ত রচনাটি [দ্র 'ছবির দিকে : ৮, রঙের রবীন্দ্রনাথ। ৪৩৪–৪৬] পড়লে উপকৃত হবেন।

সুশোভন লিখেছেন :

Ms. 102-নামাঙ্কিত এই খাতাটির মধ্যে লুকিয়ে আছে স্রষ্টা রবীন্দ্রনাথের মানসবিশ্বের এমন এক পর্যায়, যার পরিচয় অনেকেরই অজানা। বিভিন্ন জান্তব আকার, কোনোটা প্রাগৈতিহাসিক শ্বাপদ-সরীসৃপ-সদৃশ, কোনো পাখীর মতো, কোথাও বা কুমিরের হাঁ-করা মুখের মতো তীক্ষ্ণ দাঁতের সারি, স্থাপত্য বা কারুনির্মিত পাত্র বা কাঠের মূর্তির ফর্ম— এরা পাণ্ডুলিপির কাটাকুটির মধ্য থেকে কেবল ফুটে ওঠে না, নিজেদের অস্তিত্বকে দৃঢ়ভাবেই ঘোষণা করে। ··· পরস্পরসংলগ্ন অন্যোন্যপ্রবিষ্ট ফর্মগুলি অসংখ্য রেখার জটিল জালে বিন্যস্ত; কখনও একটি প্রধান ফর্মের মধ্যে অনেকগুলি ক্ষুদ্রতর আকারের পকেট— কৌণিক অথবা বক্ররেখ। জালের কাজ কখনও ঝাঁজরির মতো, কখনও বা জাফরির ছাঁদে। ফাঁকে ফোকরে কবিতার অনুমোদিত পঙ্‌ক্তিরা দাঁড়িয়ে থাকে ভয়ে ভয়ে— এই বুঝি তাদের উপরেও নামলো সৃষ্টিকর্তার কলমের কঠিন আঁচড়, এই বুঝি তারা প'ড়ে গেলো বাতিলের দলে। কোথাও বা বর্জিত শব্দগুলিকে নিয়ে খেলতে খেলতে পাতাজোড়া জ্যামিতিক আকারের এমন বিস্তার নির্মিত হয়েছে যে মনে হয় চিত্রিত ডিজাইনের নির্মাণই স্রষ্টার মুখ্য উদ্দেশ্য, কবিতা লেখা হয়তো বা ছলমাত্র। কখনও মনে হতে পারে, আলংকারিক নকশাটিই আগে যত্ন ক'রে এঁকে নেওয়া হয়েছে, তার পর ফাঁকে ফোকরে কবিতার শব্দগুলিকে সুকৌশলে সাজিয়ে দেওয়া হয়েছে— এই পর্বের রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে এতটাই মনোযোগ আদায় করেছে এই নির্মাণকর্ম।[১১৩]

আগেই বলেছি, আন্ডেস জাহাজে ডায়ারি লেখা বন্ধ থেকেছে, লিখিত হয়েছে শুধু কবিতা। 26 Oct [রবি ৯ কার্তিক] রবীন্দ্রনাথ প্রশান্তচন্দ্রকে লিখেছেন : 'ভেসে চলেচি। দুই এক দিনের মধ্যে ব্রেজিলের একটা বন্দরে পৌঁছব। সেখান থেকে আর্জেন্টিনায় পৌঁছতে আরো কিছুদিন— শুনচি ৬ই নবেম্বরে। এবারে বক্তৃতার দুশ্চিন্তা নেই বলে কবিতা লিখতে মন দিয়েচি। ভারতবর্ষ থেকে বেরিয়ে এসে এত কবিতা আমার জীবনে আর কখনো লিখিনি। ভারত মহাসাগরে গদ্যের সঙ্গে মিশোল দিয়ে কবিতা লিখেচি— এ জাহাজে একেবারে নির্জলা পদ্য। সাত দিনে বারোটা কবিতা স্বদেশের আবহাওয়াতেও সহজ নয়। ··· ডায়ারির ছল করে আরো নানা কথা বকে যেতে পারতুম, কিন্তু কি জানি, গদ্য লিখ্‌তে বস্‌তে মন সরে না। এই কবিতাগুলো সব বৈকালীতে ছাপতে পারবে।'[১১৪] কবিতাগুলি হল :

18 Oct [শনি ১ কার্তিক] 'অপরিচিতা' ['পথ বাকি আর নাই তো আমার, চলে এলাম একা'] দ্র পূরবী ১৪। ৬২–৬৩

18 Oct 'আনমনা' ['আনমনা গো, আনমনা'] দ্র ঐ ১৪। ৬৪–৬৫

19 Oct [রবি ২ কার্তিক] 'বিস্মরণ' ['মনে আছে কার দেওয়া সেই ফুল'] দ্র ঐ ১৪। ৬৫–৬৬

19 Oct ‘আশা’ [‘মস্ত যে-সব কাণ্ড করি, শক্ত তেমন নয়’] দ্র ঐ ১৪। ৬৭–৭০

20 Oct [রবি ৩ কার্তিক] ‘বাতাস’ [‘গোলাপ বলে, ওগো বাতাস, প্রলাপ তোমার বুঝতে কে বা পারে’] দ্র পূরবী ১৪। ৭০–৭১

20 Oct ‘স্বপ্ন’ [‘তোমায় আমি দেখি নাকো, শুধু তোমার স্বপ্ন দেখি’] দ্র পূরবী ১৪। ৭১–৭৩

21 Oct [মঙ্গল ৪ কার্তিক] ‘সমুদ্র’ [‘হে সমুদ্র, স্তব্ধচিত্তে শুনেছিনু গর্জন তোমার’] দ্র পূরবী ১৪। ৭৩

২ ‘হে সমুদ্র, একা আমি মধ্যরাতে নিদ্রাহীন চোখে’ দ্র ঐ ১৪। ৭৩–৭৪

৩ ‘হে সমুদ্র, চাহিলাম আপন গহন চিত্তপানে’ দ্র ঐ ১৪। ৭৪

22 Oct [বুধ ৫ কার্তিক] ‘মুক্তি’ [‘মুক্তি নানা মূর্তি ধরি দেখা দিতে আসে নানা জনে’] দ্র ঐ ১৪। ৭৫–৭৬

24 Oct [শুক্র ৭ কার্তিক] ‘ঝড়’ [‘অন্ধ কেবিন আলোয় আঁধার গোলা’] দ্র ঐ ১৪। ৭৭–৮১

৭ পৌষ [সোম 22 Dec] কালিদাস নাগকে রবীন্দ্রনাথ একটি চিঠিতে লেখেন : ‘শরীর মন যখন পীড়িত হয় তখন আমি কবিতা লিখি। জলকে পীড়া দিলে তবে সঙ্কীর্ণ ছিদ্র দিয়ে ফোয়ারা ছোটে। ··· ২৪ অক্‌টোবরে “ঝড়” বলে যে কবিতা লিখেছিলুম তার থেকে স্পষ্ট বুঝতে পার্‌চি যে, সেই সময়ে হাওয়া বেয়ে একটা নিবিড় ব্যথা আমার মনকে প্রবল ঝাপটা দিয়ে গিয়েছিল। তার ইংরেজিটা তোমাকে পাঠাচ্চি।[১১৪ক] ‘ইংরেজি’টা হল : ‘Half asleep on the shore you dreaded’ [দ্র *Poems* (1970)/ 105–07, No. 71]।

24 Oct ‘পদধ্বনি’ [‘আঁধারে প্রচ্ছন্ন ঘন বনে’] দ্র ঐ ১৪। ৮১–৮৪

26 Oct [রবি ৯ কার্তিক] ‘প্রকাশ’ [‘খুঁজতে যখন এলাম সেদিন কোথায় তোমার গোপন অশ্রুজল’] দ্র ঐ ১৪। ৮৪–৮৫

28 Oct [মঙ্গল ১১ কার্তিক] ‘দোসর’ [‘দোসর আমার, দোসর ওগো, কোথা থেকে’] দ্র ঐ ১৪। ৮৭–৮৯

29 Oct [বুধ ১২ কার্তিক] ‘শেষ’ [‘হে অশেষ, তব হাতে শেষ’] দ্র ঐ ১৪। ৮৬–৮৭; স্থানকালের সঙ্গে কবিতাটিতে এই তথ্যও রয়েছে : ‘Equator পার হয়ে দক্ষিণমেরুর মুখে’।

এই সময়ের বিবরণ রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন য়ুরোপ থেকে ফেরার পথে ‘ক্রাকোভিয়া’ জাহাজে :

বিষুবরেখা পার হয়ে চলেছি, এমন সময় হঠাৎ কখন শরীর গেল বিগড়ে; বিছানা ছাড়া গতি রইল না। ··· শান্তিহীন দিন আর নিদ্রাহীন রাত আমাকে পিঠমোড়া করে শিকল কষতে লাগল। বিদ্রোহের চেষ্টা করতে গেলে শাসনের পরিমাণ বাড়তেই থাকে। রোগ-গারদের দারোগা আমার বুকের উপর দুর্বলতার বিষম একটা বোঝা চাপিয়ে রেখে দিলে; মাঝে মাঝে মনে হত, এটা স্বয়ং যমরাজের পায়ের চাপ। দুঃখের অত্যাচার যখন অতিমাত্রায় চ'ড়ে ওঠে তখন তাকে পরাভূত করতে পারি নে; কিন্তু, তাকে অবজ্ঞা করবার অধিকার তো কেউ কাড়তে পারে না— আমার হাতে তার একটা উপায় আছে, সে হচ্ছে কবিতা-লেখা। ···

আমি সেই কাজে লাগলুম, বিছানায় পড়ে পড়ে কবিতা লেখা চলল। ব্যাধিটা-যে ঠিক কী তা নিশ্চিত বলতে পারি নে, কেবল এই জানি, সে একটা অনির্বচনীয় পীড়া। ···

এমনতরো অসুখের সময় স্বভাবতই দেশের জন্যে ব্যাকুলতা জন্মে। ক্যাবিনের জঠরের মধ্যে দিবারাত্রি জীর্ণ হতে হতে আমারও মন ভারতবর্ষের আকাশের উদ্দেশে উৎসুক হয়ে উঠল। কিন্তু, অন্ধ উত্তাপের পরিমাণ বেড়ে বেড়ে ক্রমে যেমন তা আলোকিত হয়, দুঃখের তেমনি পরিমাণভেদে প্রকাশভেদ হয়ে থাকে। যে-দুঃখ প্রথমে কারাগারের মতো বিশ্ব থেকে পৃথক করে মনকে কেবলমাত্র নিজের ব্যথার মধ্যেই বদ্ধ করে, সেই দুঃখেরই বেগ বাড়তে বাড়তে অবশেষে অবরোধ ভেঙে পড়ে এবং বিশ্বের দুঃখসমুদ্রের কোটালের বানকে অন্তরে প্রবেশ করবার পথ ছেড়ে দেয়। ···

কয়দিন রুদ্ধকক্ষে সংকীর্ণ শয্যায় পড়ে পড়ে মৃত্যুকে খুব কাছে দেখতে পেয়েছিলাম, মনে হয়েছিল প্রাণকে বহন করবার যোগ্য শক্তি আমার শেষ হয়ে গেছে। এই অবস্থায় প্রথম ইচ্ছার ধাক্কাটা ছিল দেশের আকাশে প্রাণটাকে মুক্ত করে দেওয়া। ক্রমে সেই ইচ্ছার বন্ধন শিথিল হয়ে এল। তখন মৃত্যুর পূর্বেই ঘরের বাইরে নিয়ে যাবার যে-প্রথা আমাদের দেশে আছে, তার অর্থটা মনে জেগে উঠল। ঘরের ভিতরকার সমস্ত অভ্যস্ত

জিনিস হচ্ছে প্রাণের বন্ধনজাল। তারা সকলে মিলে মৃত্যুকে তীব্রভাবে প্রতিবাদ করতে থাকে। জীবনের শেষ ক্ষণে মনের মধ্যে এই দ্বন্দ্বের কোলাহল যদি জেগে ওঠে তবে তাতেই বেসুর কর্কশ হয়; মৃত্যুর সম্পূর্ণ সংগীত শুনতে পাই নে, মৃত্যুকে সত্য বলে স্বীকার করে নেবার আনন্দ চলে যায়। ··· মৃত্যু বাঁধন ছিন্ন করে দেবে, এইটেই কুৎসিত। আপনি বাঁধন আলগা করে দিয়ে সম্পূর্ণ বিশ্বাসের সঙ্গে তার হাত ধরব, এইটেই সুন্দর।[১১৫]

উল্লেখ্য, এই যাত্রাতেও এল্‌ম্‌হার্স্ট রবীন্দ্রনাথের সেক্রেটারি রূপে সঙ্গী হয়ে এসেছিলেন; কিন্তু চিন-জাপানে ভ্রমণের সময়ে তিনি যেমন তাঁর গতিবিধি ও কার্যকলাপের বিস্তৃত বিবরণ রথীন্দ্রনাথকে লিখে পাঠাতেন, এবারে সেইরকম কোনো চিঠি আমরা পাইনি। অবশ্য কৃষ্ণ দত্ত ও অ্যান্ড্রু রবিনসনের সৌজন্যে প্রাপ্ত এল্‌ম্‌হার্স্টের ভাবী পত্নী ডরোথিকে লেখা কিছু চিঠির অংশবিশেষ আমরা দেখেছি, তাতে রবীন্দ্রনাথ-সংক্রান্ত কিছু সংবাদও পাওয়া যায়। তবে এই অসুস্থতার খবর সেখানে বিশেষ নেই। শুধু ৪ Nov তাঁকে লেখেন : 'The poet caught a chill on the boat, it developed into "flu", he prepared to die after some hesitation and promptly got well, never ceasing to turn his imagination into poetry even at his worst.'

এই সময়ে লেখা কবিতাগুলি হল :

30 Oct [বৃহ ১৩ কার্তিক] 'অবসান' ['পারের ঘাটা পাঠাল তরী ছায়ার পাল তুলে'] দ্র ঐ ১৪। ৮৯–৯০

1 Nov [শনি ১৫ কার্তিক] 'তারা' ['আকাশভরা তারার মাঝে আমার তারা কই'] দ্র ঐ ১৪। ৯০–৯১

2 Nov [রবি ১৬ কার্তিক] 'কৃতজ্ঞ' ['বলেছিনু "ভুলিব না", যবে তব ছল-ছল আঁখি'] দ্র ঐ ১৪। ৯২–৯৩

3 Nov [সোম ১৭ কার্তিক] 'মৃত্যুর আহ্বান' ['জন্ম হয়েছিল তোর সকলের কোলে'] দ্র ঐ ১৪। ৯৪–৯৫

3 Nov 'দান' ['কাঁকনজোড়া এনে দিলেম যবে'] দ্র ঐ ১৪। ৯৫–৯৬

4 Nov [মঙ্গল ১৮ কার্তিক] 'দুঃখ-সম্পদ' ['দুঃখ, তব যন্ত্রণায় যে-দুর্দিনে চিত্ত উঠে ভরি'] দ্র ঐ ১৪। ৯৩–৯৪

সম্ভবত এইদিনই রবীন্দ্রনাথ প্রশান্তচন্দ্রকে লেখেন : 'ক'দিন শরীর বেশ রীতিমত খারাপ চলছিল, বুকে ব্যথা, দুর্ব্বলতা ইত্যাদি। তাই রাত্রে শুয়ে শুয়ে বারবার মৃত্যুর কথা মনে আসছিল। মৃত্যুর কবিতাটা তার থেকেই জনশূন্য সঙ্কীর্ণ ক্যাবিনে রোগযন্ত্রণায় নিজেকে সান্ত্বনা দেবার জন্যে। প্রথম দুই একদিন খুব ইচ্ছা হচ্ছিল দেশে ফিরে যাই— তার পরে মনে হল দেশ ত জন্মের জন্যে, মৃত্যুর জন্যে পথ। পর্শুদিন Buenos Ayres পৌঁছব— একজন ডাক্তারকে দিয়ে দেহটাকে যাচাই করে নেব। দীর্ঘপথের শেষভাগে পথিকের যে রকম একান্ত ক্লান্তি আসে আমার ঠিক তাই হয়েছে। সেই জন্যেই আমি যা তা কবিতা লিখে স্বপ্নলোক সৃষ্টি করচি।'[১১৬] তাঁর উল্লিখিত 'মৃত্যুর কবিতা'টি হল 'মৃত্যুর আহ্বান'।

পাণ্ডুলিপিতে দেখা যায়, 2 Nov 'কৃতজ্ঞ' কবিতাটি ব্রাজিলের বন্দর রিও-ডি-জেনিরো-তে লেখা [রবীন্দ্রনাথ এখানে মধ্যাহ্নভোজন ও পায়চারি করার জন্য জাহাজ থেকে অবতরণ করেছিলেন], আন্ডেস জাহাজ আর্জেন্টিনার বুয়েনোস আইরেস বন্দরে পৌঁছয় 6 Noy [বৃহ ২০ কার্তিক] রাত্রি আটটায়। তার আগে নিম্নলিখিত কবিতাগুলিও আন্ডেস জাহাজে লেখা :

5 Nov [বুধ ১৯ কার্তিক] 'সমাপন' ['এবারের মতো করো শেষ'] দ্র পূরবী ১৪। ৯৬–৯৭

6 Nov [বৃহ ২০ কার্তিক] 'ভাবীকাল' ['ক্ষমা ক'রো, যদি গর্বভরে'] দ্র ঐ ১৪। ৯৭–৯৮

কিন্তু রবীন্দ্রনাথ যদিও 6 Nov তারিখেই বুয়েনোস আইরেসে পৌঁছে গেছেন, তবু 'অতীত কাল' ['সেই ভালো, প্রতি যুগ আনে না আপন অবসান'] ও 'বেদনার লীলা' ['গানগুলি বেদনার খেলা যে আমার'] কবিতা দুটির রচনা-স্থান ও কাল পাণ্ডুলিপিতে 'আণ্ডেস জাহাজ' ও 7 Nov বলে চিহ্নিত আছে। হয়তো জাহাজেই কবিতাগুলির সূচনা হয়, শেষ হয় বন্দরে নেমে 7 Nov তারিখে। 'ভাবীকাল' ['Pardon me, if in my pride'] ও 'অতীত কাল' ['It is well that ages pass away before they have spent all their song'] কবিতাদ্বয়ের রবীন্দ্রনাথ-কৃত ইংরেজি অনুবাদ পাণ্ডুলিপিতে পাশাপাশি পৃষ্ঠায় পাওয়া যায়।

আন্ডেস জাহাজ 6 Nov [বৃহ ২০ কার্তিক] রাত্রি আটটায় বুয়েনোস আইরেসে পৌঁছলে রবীন্দ্রনাথকে বিরাট সংবর্ধনা জানানো হয়। আর্জেন্টিনার *The Standard* [7 Nov] পত্রিকা সংবাদ দেয়, উক্ত জাহাজে রবীন্দ্রনাথ ছাড়া রাষ্ট্রদূতের ভারপ্রাপ্ত ব্রিটিশ মন্ত্রী Sir Beilby Alston ও তাঁর স্ত্রী-কন্যা, Sir Ralph Gore ও তাঁর পত্নী, Madame Martinez de Hoz প্রভৃতি আরও বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি ছিলেন। কিন্তু সংবর্ধনার আয়োজন ছিল বিশেষভাবে তাঁরই জন্য। বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ Ricardo Rojas-এর নেতৃত্বে একটি ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে আরও অনেক সংবর্ধনা সমিতি আগেই গঠন করা হয়েছিল :

The famous Hindu poet who arrived on the Andes last evening is only en route to Peru, where he has been invited to attend the celebration of the Centenary of the Battle of Ayacucho, which takes place at Lima on the 9th of next month....

Last evening a delegation from the Syrian-Libanyan Society in Argentina paid homage to the great poet. Mr. Simon Muse presenting the following: J.M. Nastif, J.J. Bruse, Dr. George Soana, Mohamed Murad, F. Homad, Mr. Orfali, F. Hadad, H. Kharinallah : while the Japanese Association were presented by the Vice-President and Secretary Messrs G. Yashio Shinya and Y. Amano respectively.

The Faculty of Philosophy and Letters under Dr. Coriolano Alberini, with Doctors A. Rojas, C. Ricci, E. Ravighani, F.E. Outes, also paid their respects to the great poet.

Among the many organisations connected with the reception of the great poet in Argentina are associated the following: Facultad de Filosofia Y Letras, el Circulo de la Preusa, el Ateneo Hispano Americano, la Asociacion Wagneriana, la Masoneria Argentina, Sociedad pro Cultura Musical, Ateneo Universitario, Escuela Normal numero 6, Centro de Estudiantes de Filosofia Y Letras.

After graciously receiving the various delegations, Sir Rabindranath Tagore, accompanied by his Secretary Mr. L.W. Elmhurst (sic), left the Andes for the Plaza Hotel, where he will stay during his brief visit to Buenos Aires.

*7 Nov [শুক্র ২১ কার্তিক] রবীন্দ্রনাথ প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশকে লিখলেন :

কাল এসে ডাঙায় পৌঁছেছি। বুঝতে পারচি আমাকে ইনফ্লুয়েঞ্জায় ধরেছিল। ভারি কষ্ট দিয়েছিল— নইলে এতগুলো কবিতা কখনই আমি লিখতুম না। এখনো খুব দুর্ব্বল আছি। আজ সকালে ডাক্তার এসে বল্‌লে আমার শরীরের যন্ত্রগুলো সমস্তই ঠিক আছে কেবল বাজে খরচ হয়েচে বড় বেশি। ঠিক নীলরতন বাবু যা বলেছিলেন সেই একই কথা। যাই হোক্ এখানে আমার সমাদরের অন্ত নেই— আমি ত অবাক হয়ে গেছি। এখানে আমাদের স্থান যত প্রশস্ত এমন বোধ হয় আর কোথাও নেই। এখানকার খুব বড় আর্টক্লাবওয়ালারা আমাদের ছবি একজিবিশনের। সমস্ত খরচ বহন করতে রাজি আছে। রথী যদি এখানে আস্‌ত তাহলে অনেক কাজ করতে পারত। কিন্তু সে রয়ে গেল লণ্ডনে, ধীরেনকে পেরুতে রওনা করে দিয়েচে। … এবারে যাত্রা আরম্ভ থেকেই আমার মন বিগ্‌ড়েচে, সব কেমন উল্টোপাল্টা হয়ে গেচে। প্রথমত, কালিদাস হল ফেরার— অথচ এখানে মেক্সিকো থেকে চিঠি পাচ্চি সেই Great Professorএর জন্যে তারা সবাই উৎসুক হয়ে আছে। কালিদাস এলনা এটা তার পক্ষে কতবড় শাস্তি তা সে ঠিক বুঝতেই পারবেনা। এলে তার আর্থিক পরমার্থিক কোনো ক্ষতিই হত না।

আমার কাছ থেকে চিঠিপত্র আশা কোরো না। এল্‌মহর্স্ট হয় ত খবর দেবে, হয় ত দেবেনা— কিন্তু News Agencyর কাজ আমার নয়। সমস্ত কর্ত্তব্য ফাঁকি দিয়ে সমস্ত খ্যাতিপ্রতিপত্তি পায়ে ঠেলে ফেলে জগতে কোথাও যদি একটুখানি বিশ্রাম করবার জায়গা পেতুম তাহলে এই মুহূর্ত্তে সেইখানে হাজির হতুম— কিন্তু ভূগোল বিবরণে আজ পর্য্যন্ত তার খবর পাওয়া যায় নি।[১১৭]

—এইরূপ আক্ষেপ তিনি প্রায়ই প্রকাশ করেছেন ও করবেন, কিন্তু কোনো আহ্বান পেলেই বিশ্রাম ত্যাগ করে ছুটতেও তাঁর দেরি হবে না! বস্তুত নিত্যনূতনের আমন্ত্রণে সাড়া দিতে তাঁর সজীব মন কখনই বিলম্ব করত না, কিন্তু তখন মনে থাকত না যে, তাঁর দেহে বয়সের ভার ও ক্লান্তি জমা হয়েছে— ফলে দেহ প্রায়ই তার প্রতিশোধ গ্রহণ করেছে।

রবীন্দ্রনাথের আর্জেন্টিনা সফরের বিবরণ প্রধানত সেখানকার ভিক্টোরিয়া ওকাম্পো-সংগ্রহশালায় ও ইংল্যান্ডের ডেভনশায়ারে টটনেসের ডার্টিংটন হলে এল্‌ম্‌হার্স্ট-অবেক্ষণাগারে আবদ্ধ হয়ে রয়েছে। ড কেতকী কুশারী ডাইসন উভয় সংগ্রহশালাতেই ব্যক্তিগতভাবে কাগজপত্র দেখে *In Your Blossoming Flower-Garden* [1988] গ্রন্থে সেই ইতিহাস পুনর্গঠন করেছেন। অ্যান্ড্রু রবিনসন পাঠিয়ে দিয়েছেন এল্‌ম্‌হার্স্ট-ডরোথি পত্রালাপের প্রাসঙ্গিক অংশগুলি ও রবীন্দ্রভবনে পাওয়া যায় বিভিন্ন সংবাদপত্রের কিছু কর্তিকা। শঙ্খ ঘোষ আর্জেন্টিনায় রবীন্দ্রনাথের আশ্রয়দাত্রী ভিক্টোরিয়া ওকাম্পোর স্প্যানিশ ভাষায় লেখা *Tagore en las barrancas de San Isidro* [1961] গ্রন্থটির সটীক বাংলা অনুবাদ করেছেন 'ওকাম্পোর রবীন্দ্রনাথ' [১৩৮০, ৬ষ্ঠ সংস্করণ ১৪০৫] গ্রন্থে। বর্তমান গ্রন্থে সংকলিত রবীন্দ্রনাথের আর্জেন্টিনা-ভ্রমণের ইতিবৃত্ত প্রধানত এই উপকরণগুলির উপর নির্ভরশীল।

কেতকী লিখেছেন, এল্‌ম্‌হার্স্ট আর্জেন্টিনায় থাকার সময়ে অনিয়মিতভাবে ডায়ারি রাখতেন— সেটি অবলম্বনে তিনি আর-একটি খাতায় তার অংশবিশেষ কপি করে সেটির নাম দেন 'The Argentine Adventure', এতাবৎ গ্রন্থাকারে অপ্রকাশিত এই পাণ্ডুলিপি এল্‌ম্‌হার্স্ট-সংগ্রহশালায় রক্ষিত আছে। এটিতে তিনি জানিয়েছেন, আর্জেন্টিনায় পৌঁছে তিনি জেনে অবাক হন যে, সেখানকার পেরু দূতাবাস রবীন্দ্রনাথের ভ্রমণ সম্পর্কে তাদের গবর্মেন্টের পাঠানো কোনো বার্তাই পায়নি।

La Nacion [8 Nov] দৈনিক লেখে, পূর্বদিন শুক্রবার অজস্র নরনারী রবীন্দ্রনাথকে শ্রদ্ধা জানাবার জন্য প্লাজা হোটেলে সমবেত হন, কিন্তু সকলকেই ব্যর্থমনোরথ হয়ে ফিরতে হয়। দুই চিকিৎসক Dr. Castex ও Dr. Beretervide তাঁকে পরীক্ষা করে বলেন, জাহাজে ইনফ্লুয়েঞ্জায় আক্রান্ত হওয়ার জন্যই রবীন্দ্রনাথ এত দুর্বল হয়ে পড়েছেন— তাঁরা পরামর্শ দেন, আগামী সোমবার পর্যন্ত তিনি যেন কোনো দর্শনার্থীর সঙ্গে দেখা না করেন, তার পরে নিষেধ কিছু শিথিল করা যেতে পারে ও তিনি অল্পস্বল্প ভ্রমণে বের হতে পারেন। রবীন্দ্রনাথ আশা করেন, তিনি আগামী সপ্তাহটি আর্জেন্টিনার রাজধানীতে থেকে এখানকার বিশ্ববিদ্যালয়ে ভাষণ দিতে পারবেন।

তবে এল্‌ম্‌হার্স্টের লিখিত নোট অনুসারে, চিকিৎসকেরা 9 Nov তাঁকে পরীক্ষা করে অপেক্ষাকৃত সুস্থ বলে মত প্রকাশ করেন ও বাইরে যাওয়ার অনুমতি দেন; তখন তাঁরা গাড়িতে করে Palermo বাগানে ঘুরে আসেন।

রবীন্দ্রনাথের আর্জেন্টিনা-পর্বের প্রধান চরিত্র তিনটি— একটি তিনি স্বয়ং, দ্বিতীয় এল্‌ম্‌হার্স্ট এবং তৃতীয় ও অন্যতম উল্লেখযোগ্য চরিত্রের নাম ভিক্টোরিয়া ওকাম্পো [Victoria Ocampo, 1890–1979], আর্জেন্টিনার এক ধনী ও বনেদি গোঁড়া ক্যাথলিক পরিবারের কন্যা। রবীন্দ্রনাথের চেয়েও এক ধাপ এগিয়ে তিনি কোনোদিন কোনো বিদ্যালয়েই যাননি, তাঁর শিক্ষালাভ হয় ফরাসি ও ইংরেজ গবর্নেসের কাছে— ফলে ঐ দুটি ভাষায় তিনি যতটা পারঙ্গম ছিলেন, মাতৃভাষা স্প্যানিশে প্রথমজীবনে ততটা দক্ষ ছিলেন না। যথারীতি সমাজস্বীকৃত কোর্টশিপের পর 1912-এ তাঁর বিবাহ হয় লুইস বের্নার্দো দে এস্ত্রাদা নামক এক সম্ভ্রান্তবংশীয় আর্জেন্টাইন যুবকের সঙ্গে, কিন্তু য়ুরোপে মধুচন্দ্রিমার সময়েই স্বামীর প্রাচীনপন্থী মনোভাবের পরিচয় পেয়ে তাঁদের সম্পর্কে ফাটল ধরে, ভিক্টোরিয়া স্বামীর এক সম্পর্কিত ভাই জুলিয়ান মার্টিনেজ-এর প্রতি অনুরক্ত হন ও উভয়ের মধ্যে একটি দীর্ঘস্থায়ী গোপন সম্পর্ক গড়ে ওঠে। আর্জেন্টিনায় ফিরে ভিক্টোরিয়া স্বামীগৃহে থেকেও তাঁর সঙ্গে সর্ববিধ সম্পর্ক ত্যাগ করেন। সেখানে তখন বিবাহবিচ্ছেদ স্বীকৃত ছিল না, তাই 1922-তে 'legal separation'-এর পরে তিনি স্বামীগৃহ ছেড়ে নিজস্ব ফ্ল্যাটে উঠে যান। প্রেমিকের সঙ্গে আগাগোড়াই তাঁর সম্পর্ক ছিল, কিন্তু সবটাই ছিল গোপনীয়তার আবরণে ঢাকা। এই পরিস্থিতিতে 1924-এ ভিক্টোরিয়ার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের দেখা হয়, একজনের বয়স তখন ৩৪ ও অপরজনের ৬৩— যিনি তাঁর বাবার চেয়ে মাত্র এক বছরের ছোটো।

ভিক্টোরিয়া 1914-এ *Gitanjali* পড়েন আঁদ্রে জিদের ফরাসি অনুবাদে, অসুখী বিবাহ ও গোপন প্রেমের দ্বন্দ্বে ক্ষতবিক্ষত ভিক্টোরিয়ার কাছে এই বই এক গভীর সান্ত্বনা বহন করে নিয়ে আসে। এর পরে ফরাসি, ইংরেজি বা স্প্যানিশ অনুবাদে যে-সব রবীন্দ্ররচনা তিনি পেয়েছেন তা পড়ে এর রচয়িতার প্রতি গভীর আকর্ষণ অনুভব করেছেন। তাই যখন শুনলেন সেই রবীন্দ্রনাথ পেরু যাওয়ার পথে আর্জেন্টিনায় আসছেন, তখন থেকেই শুরু হয়েছে এক অধীর প্রতীক্ষা। ভিক্টোরিয়া নিজেই লিখেছেন : '১৯২৪ সালের সেপ্টেম্বরে শোনা গেল, বুয়েনস আইরেস হয়ে লিমা যাচ্ছেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তাঁর নিজের ইংরেজি থেকে অথবা জিদের ফরাসি অনুবাদ থেকে আমরা যারা জানতাম তাঁর রচনা, আমাদের তখন শুরু হলো প্রতীক্ষা! এখানে তাঁর আবির্ভাব সে-বছরের সব-সেরা ব্যাপার। আর আমার পক্ষে তো এটা জীবনেরই সবচেয়ে বড়ো ঘটনা।'[১১৮] এর কিছুদিন আগে ভিক্টোরিয়া লেখালিখি শুরু করেছেন, *La Nacion* পত্রিকায় ছাপা হয়েছে দান্তে, রাস্কিন ও গান্ধী বিষয়ে তিনটি প্রবন্ধ, 2 Nov লিখলেন তাঁর চতুর্থ প্রবন্ধ 'La algeria de leer a Rabindranath Tagore' [=The joy of reading Rabindranath Tagore], 9 Nov উক্ত পত্রিকাতেই মুদ্রিত হল রচনাটি। স্বাভাবিকভাবেই রবীন্দ্রনাথ বুয়েনোস আইরেসে পৌঁছলে ভিক্টোরিয়া বান্ধবী Adelia Acevedoকে সঙ্গে নিয়ে প্লাজা হোটেলে পৌঁছে যান সম্ভবত 7 Nov [শুক্র ২১ কার্তিক] সন্ধ্যায় [কেতকী শনিবার 8 Nov তারিখটি অধিকতর গ্রহণযোগ্য মনে করেন, কিন্তু শনিবারে লেখা ভিক্টোরিয়ার চিঠি থেকেই বোঝা যায় তার আগেই তিনি রবীন্দ্রনাথের কাছে গিয়ে সংকোচে কোনো কথা বলতে পারেননি]। সেখানে এল্‌ম্‌হার্স্ট তাঁদের নিচের হলে বসিয়ে তাঁর উদ্বেগের কথা জানালেন। ডাক্তাররা বলেছেন, রোগীর হৃদ্‌যন্ত্রের অবস্থা আন্দেস পর্বত

পেরিয়ে লিমা যাওয়ার পক্ষে অনুকূল নয়। তাই পেরুর প্রেসিডেন্টকে জানিয়ে দেওয়া দরকার তাঁর অতিথি সেখানে পৌঁছতে পারছেন না। আবার জাহাজে ওঠার আগে তাঁকে কোনো গ্রামাঞ্চলে বিশ্রাম নিতে হবে। এই কথা শুনে ভিক্টোরিয়া হঠাৎ প্রস্তাব করলেন, সেক্ষেত্রে তাঁরা দুজন সান ইসিদ্রোতে এসে থাকুন, একটি পুরো বাড়ি ছেড়ে দেওয়া যাবে তাঁদের থাকার জন্য। কিন্তু সেখানে তাঁর নিজের কোনো বাড়ি ছিল না, জানতেন না তাঁর বাবা-মা নিজেদের বাড়ি ভিলা ওকাম্পো তাঁদের ব্যবহার করতে দেবেন কিনা। ভিক্টোরিয়া লিখেছেন, 'কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তাঁর আরোগ্যের জন্য একটা পছন্দসই শান্তির নিবাস যাতে পান, তার জন্য স্বর্গমর্ত্য তোলপাড় করতে তৈরি ছিলাম আমি।'

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর প্রথম সাক্ষাতের বিবরণ তাঁর নিজের বর্ণনাতেই শঙ্খ ঘোষের অনুবাদে উদ্ধৃত করছি :

শ্রীযুক্ত এল্‌ম্‌হার্স্টের সঙ্গে প্রাথমিক এই কথাবার্তার পর আমরা পৌঁছলাম রবীন্দ্রনাথের ঘরে। সেখানে আমাদের একলা রেখে চলে গেলেন সেক্রেটারি। ভয়ে ভয়ে আমি ভাবছি, কী লাভ এই দেখাশোনার? একটা কথাও বলছি না। ভীরু মানুষেরা সমস্ত জীবন ভরে সবচেয়ে বেশি করে যা চায়, ভাগ্য তাকে প্রায় আয়ত্তের মধ্যে এনে দিলে ভয় পেয়ে যায় তারা। আমাকেও চেপে ধরল সেই ভয়, ইচ্ছে হলো পালিয়ে যাই।

আমার এত আকুলতার যিনি কারণ, এই অস্বস্তিজনক প্রতীক্ষার দ্রুত অবসান ঘটালেন তিনি। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ঘরে এলেন; নীরব, সুদূর, তুলনাহীন বিনীত। ⋯ তেষট্টি বছর বয়স, প্রায় আমার বাবার বয়সী, অথচ কপালে একটিও রেখা নেই, যেন কোনো দায়িত্বভারই নষ্ট করতে পারে না তাঁর সোনালি শরীরের স্নিগ্ধতা। সুগোল সমর্থ গ্রীবা পর্যন্ত নেমে এসেছে উছলে-ওঠা ঢেউ-তোলা শাদা চুলের রাশি। শ্মশ্রুমণ্ডলে মুখের নীচের দিকটা আড়াল, আর তারই ফলে ওপরের অংশ হয়ে উঠছে আরো দীপ্যমান। মসৃণ ত্বকের অন্তরালে তাঁর সমগ্র মুখাবয়বের গড়ন এক অবিশ্বাস্য সৌন্দর্য রচনা করেছে, তেমনি সুন্দর তাঁর কালো চোখ, নিখুঁত টানা ভারী পল্লব। শুভ্র কেশদাম আর স্নিগ্ধ শ্মশ্রু, এর বৈপরীত্যে জ্বলে উঠছে তাঁর চোখের সজীবতা। দীর্ঘ দেহ, শোভন চলন। তাঁর প্রকাশময় দুটি অতুলনীয় শুদ্ধ হাতের সুধীর সুষমা যেন অবাক করে দেয়, মনে হয় যেন এদের নিজেদেরই কোনো ভাষা আছে। ⋯

কিন্তু যা ভেবেছিলাম, আমার হৃদয়ের এত কাছাকাছি এই মানুষটির সত্যি আবির্ভাবের সামনে সমস্ত শরীর অবশ হয়ে এল। কয়েক মিনিটের মধ্যেই উঠে পড়লাম আমি, বিদায় নিলাম। এইটুকু দেখা হবার স্বপ্ন কত যে দেখেছি তা জানত আমার বন্ধুটি, সে তাই খুব থতমত হয়ে গেল আমার এই ব্যবহারে।[১১৯]

তাঁর এই অদ্ভুত আচরণের জন্য ক্ষমা চেয়ে একগুচ্ছ ফুল ও একটি চিঠি পরের দিন পাঠালেন ভিক্টোরিয়া, এইটিই তাঁর প্রথম চিঠি : 'I can't help coming to beg your pardon. I felt so dreadfully shy and awkward, when I was seating in your room, that I said things I did not want to say and forgot all about the things I have been waiting so eagerly to tell you.... Please forgive my shyness, my awkwardness. I was so glad to see you, and I was so grateful too. My heart is aching because I have not found a single word to thank you.'[১২০]

কিন্তু ভিক্টোরিয়ার বাবা-মা সান ইসিদ্রোর বাড়িটি ছেড়ে দিতে রাজি হলেন না। সেই সময়ে তাঁর এক আত্মীয় Ricardo de Lafuente Machain এক সপ্তাহের জন্য তাঁর নবনির্মিত Miralrio [=Riverview] নামক বাড়িটি ব্যবহার করতে দিতে রাজি হলেন, যেটি তাঁর পিতৃগৃহ 'ভিলা ওকাম্পো' থেকে সামান্যই দূরে অবস্থিত। ভিক্টোরিয়া তখনই হোটেলে গিয়ে এল্‌ম্‌হার্স্টকে এই সুখবরটি জানালেন।

11 Nov [মঙ্গল ২৫ কার্তিক] রবীন্দ্রনাথের অন্যতম চিকিৎসক Dr. Mariano R. Castex তাঁর সম্মানার্থে একটি মধ্যাহ্নভোজনের আয়োজন করেছিলেন। তার পরে ভিক্টোরিয়া তাঁদের সান ইসিদ্রোর 'মিরালরিও' বাড়িতে নিয়ে এলেন। যদিও তিনি তাঁর রচনায় তারিখটি 12 Nov বলে উল্লেখ করেছেন, কিন্তু সেটি অবশ্যই ভুল, কারণ ঐ তারিখেই *La Nacion* জানায়, গতকাল ডঃ ক্যাসটেক্সের বাড়িতে মধ্যাহ্নভোজনের পরে

রবীন্দ্রনাথ চিকিৎসকের পরামর্শে রাজধানীর বাইরে একটি নিরিবিলি অঞ্চলে আশ্রয় নিয়েছেন, যেখানে তিনি আগামী বুধবার 19 Nov পর্যন্ত থাকতে পারেন। ভিক্টোরিয়া এই স্থানান্তরের বর্ণনাটি লিখেছেন প্রায় কবিতার ভাষায় :

বিকেল তিনটেয় গেলাম ওঁকে ফিরিয়ে আনতে। সমুদ্রবাতাসের প্রচণ্ড ঝাপটায় কালাও স্ট্রিট তখন বিপর্যস্ত। গাছের নতুন পাতা উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে, পথের ধার থেকে উড়িয়ে আনছে শুকনো ধুলো আর ছেঁড়া কাগজের রাশি। আকাশ কোনোখানে হলুদ, কোথাও-বা সীসার মতো ধূসর। ··· কিন্তু যখন এসে পৌঁছলাম সান ইসিদ্রোতে, সমস্ত দৃশ্য যেন পালটে গেল এই বাড়িটির সামনে, সব কেমন ঠাণ্ডা ছিমছাম। ··· বাইরের গাছে বাতাসের দাপাদাপি, তারই ফলে আরো ঘন হয়ে উঠছে ভিতরের নীরবতা। যেন শঙ্খের মধ্যে শুনছে কেউ সমুদ্রধ্বনি। ···

সেই বিকেলে আকাশ ক্রমেই আরো হলুদ হয়ে আসছিল, আর বিশাল ঘন কালো মেঘ। এমন ভয়ংকর গুরু মেঘ, অথচ এমন তীব্র ভাস্বর— কখনো এমন দেখিনি। ··· উর্ধ্ব-আকাশে যা ঘটছিল, জলের মধ্যে তাই ফলিয়ে তুলছিল নদী। কবির ঘরের বারান্দা থেকে দেখছিলাম এই আকাশ, এই নদী, বসন্তের সাজে ভরা এই প্রান্তর। ···

ঘরে ঢুকতেই ওঁকে নিয়ে এলাম অলিন্দে, বললাম : নদীটি দেখতেই হবে। সমস্ত প্রকৃতি যেন আমার সঙ্গে ষড়যন্ত্রে মেতে উঠে দৃশ্যটাকে করে তুলল পরম রমণীয়। আলোর পাড়ে বোনা প্রবল মেঘপুঞ্জের অন্তরালে কে যেন এক প্রতিফলক সাজিয়ে ধরেছে আকাশে।[১২১]

প্রথম দিন ভিক্টোরিয়া সংকোচে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে কথা বলতে পারেননি, তাঁদের দ্বিতীয় সাক্ষাতে প্রকৃতি যেন সেই ব্যবধান অনেকটা ভেঙে দিল!

পরের দিন রবীন্দ্রনাথ এই বাড়িতে আসা ও অন্যান্য খবর দিয়ে প্রশান্তচন্দ্রকে লিখলেন : 'কাল থেকে হোটেল ছেড়ে শহরের বাইরে একটি বাড়িতে এসে আছি। নদীর ধারে বাগানের মধ্যে খুব সুন্দর জায়গা। আমি ছাড়া এ বাড়িতে আর কেউ নেই। সমস্ত দিন নির্জনতার মধ্যে নিমগ্ন হয়ে আছি। বুকের মধ্যে সেই একটা দুর্বলতার বোধ এখনো যায়নি। ডাক্তারের আদেশক্রমে পেরুতে আমার যাওয়া নিষেধ। দীর্ঘ রেলপথে আসে পেরবার মত শক্তি আমার নেই। পেরু গবর্মেন্টের কাছে এই খবর কাল গেছে। আর্জেন্টাইনের কর্তৃপক্ষ পেরুর সমস্ত ঋণ আমার তরফ থেকে শোধ করে দিয়ে আমাকে নিষ্কৃতি দিতে প্রস্তুত আছেন। তা ছাড়া আমার দেশে ফিরে যাবার পাথেয় এখান থেকেই পাওয়া যাবে। আমি এদের কাছ থেকে যে ভালোবাসা পেয়েছি তা যে কত অকৃত্রিম ও গভীর তা অনুভব করে আমি বিস্মিত হই। আমি যাতে আরামে থাকি সুস্থ থাকি তার সমস্ত দায়িত্ব যেন এদের সকলেরই।'[১২২] এই শেষ বাক্যটি সম্ভবত ভিক্টোরিয়ার প্রযত্নের প্রথম স্বীকৃতি— অথচ বিস্ময়ের ব্যাপার রবীন্দ্রনাথ বা এল্‌ম্‌হার্স্ট কেউই এখান থেকে স্বদেশে লেখা চিঠিপত্রে তাঁর নামোল্লেখ পর্যন্ত করেননি!

কিন্তু রবীন্দ্রনাথ যেভাবে লিখেছেন, সেভাবে পেরু যাত্রা বাতিল করে আর্জেন্টিনা সরকারের আর্থিক দায়িত্বে তাঁর দেশে ফেরার ব্যবস্থা ইতিমধ্যে হয়ে গেছে বলে মনে হয় না।

অসুস্থ অবস্থাতেও রবীন্দ্রনাথের কবিতা লেখায় কোনো বিরাম ছিল না। আমরা আগেই বলেছি, সম্ভবত জাহাজে শুরু করা 'অতীত কাল' ও 'বেদনার লীলা' কবিতাগুলি তিনি 7 Nov [শুক্র ২১ কার্তিক] প্লাজা হোটেলে সম্পূর্ণ করেন।

এর পরে প্লাজা হোটেলে থাকার সময়ে তিনি তিনটি কবিতা রচনা করেন :

10 Nov [সোম ২৪ কার্তিক] 'শীত' ['শীতের হাওয়া হঠাৎ ছুটে এল'] দ্র পূরবী ১৪। ৯৯–১০১;

11 Nov 'কিশোর প্রেম' ['অনেক দিনের কথা সে যে অনেক দিনের কথা'] দ্র ঐ ১৪। ১০১–০২;

11 Nov 'প্রভাত' ['স্বর্ণসুধা-ঢালা এই প্রভাতের বুকে'] দ্র ঐ ১৪। ১০৩।

এই দিনই তিনি এসে পৌঁছলেন সান ইসিদ্রোর পুষ্পশোভিত 'মিরালরিও' বাড়িটিতে, আর পরের দিন লিখলেন পূরবী-র অন্যতম পরিচিত কবিতা 'বিদেশী ফুল' ['হে বিদেশী ফুল, যবে আমি পুছিলাম'] দ্র পূরবী ১৪ ১০৪—০৫। কেউ যদি এই কবিতায় তাঁর আতিথ্যদাত্রী ভিক্টোরিয়ার অনুষঙ্গ খুঁজে পান তাঁকে দোষ দেওয়া যাবে না।

পেরু না-যাওয়ার ব্যাপারে যাতে কোনো মনোমালিন্য না দেখা দেয়, তার জন্য এল্‌ম্‌হার্স্টকে খুব সতর্ক হয়ে কাজ করতে হয়েছে। তিনি 12 Nov-এর বিবরণীতে লিখেছেন, ভিক্টোরিয়া, তাঁর ভগ্নী অ্যাঞ্জেলিকা ও বান্ধবী আদেলিয়া আসেভেদোকে নিয়ে তিনি ডঃ ক্যাসটেক্সের কাছে গিয়ে অসুস্থতার জন্য পেরু যাওয়া রবীন্দ্রনাথের স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর এইরূপ একটি লিখিত বিবৃতি সংগ্রহ করে আর্জেন্টিনার অভ্যর্থনা সমিতির প্রধান Ricardo Rojas-এর সঙ্গে দেখা করেন। তখন পেরুর সঙ্গে চিলির সম্পর্ক ভালো ছিল না এবং পেরু সেই ব্যাপারে আর্জেন্টিনার হস্তক্ষেপ চাইছিল। তাই নূতন কোনো কলহের কারণ যাতে না দেখা দেয় আর্জেন্টিনা সে ক্ষেত্রে যথেষ্ট সতর্ক ছিল, তাই রোজাসও সাবধানে কথাবার্তা আরম্ভ করেন। 13 Nov বৃহস্পতিবার এল্‌ম্‌হার্স্টে ও ভিক্টোরিয়া আবার শহরে গিয়ে বিভিন্ন ব্যক্তির সঙ্গে পরামর্শ করে পেরুর জনৈক মন্ত্রীর সঙ্গে এই বিষয়ে আলোচনা করেন— তিনি টাকা ফেরৎ দেওয়ার প্রসঙ্গটি উড়িয়ে দেন। 14 Nov *La Nacion* এল্‌ম্‌হার্স্টের একটি বিবৃতি প্রকাশ করে :

The secretary of Rabindranath Tagore has sent us the following communication.

Rabindranath Tagore announces with profound regret that because of the categorical orders of Dr. Mariano Castex he is unavoidably obliged to postpone his visit to Peru for an indefinite time.

At present he is resting in a villa in San Isidro, courteously made available to him by Mr. Ricardo de Lafuente Machain.

In consequence, and by doctor's orders, he will not be able to receive visits or attend any public functions until his health improves.[১২৩]

পরের দিন এল্‌ম্‌হার্স্ট পেরুকে পাঠানোর জন্য একটি কেব্‌লের খসড়া রচনা করেন এবং স্পেনীয় মন্ত্রী Danvila ও ভিক্টোরিয়া কর্তৃক তার কূটনৈতিক ও সাহিত্যিক ভাষান্তর ঘটানোর পর সেটি পেরুর উদ্দেশে প্রেরিত হয়। রবীন্দ্রনাথ কিন্তু তখনই পেরু যাওয়ার পরিকল্পনা সম্পূর্ণ ত্যাগ না করে আপাতত স্থগিত রাখেন। আর্জেন্টিনা সরকারও সম্ভাব্য রাজনৈতিক জটিলতা এড়াবার জন্য একটি যুদ্ধজাহাজের ব্যবস্থা করেন, যেটি আন্দেস পর্বত পেরোনোর পরিবর্তে কেপ হর্ন অন্তরীপ ঘুরে রবীন্দ্রনাথকে পেরুতে পৌঁছে দিতে পারে, 22 Nov তিনি প্রশান্তচন্দ্রকে লিখেছিলেন : 'পেরু আমাকে ছাড়তে চাচ্চে না। রেলপথে পর্ব্বত পার হতে ডাক্তারের নিষেধ ছিল তাই আর্জেন্টাইন রাজসরকারের যুদ্ধজাহাজে চড়ে কাল রওনা হবার ব্যবস্থা হয়েচে। দক্ষিণ আমেরিকার পুচ্ছদেশ প্রদক্ষিণ করে' আটলান্টিক থেকে প্যাসিফিকে উত্তীর্ণ হয়ে সমুদ্রপথে পেরুতে

যেতে হবে। দুই সপ্তাহ লাগ্‌বে। পেরুতে যখন যাচ্চি তখন মেক্সিকো যাওয়াও স্থির। তারপরে কপালে যা থাকে।'[১২৪] *15 Dec-এর চিঠির বক্তব্যও প্রায় এক : '২৬শে ডিসেম্বরে জাহাজ পাওয়া যাবে।'[১২৫] অর্থাৎ কর্তব্যবুদ্ধি ও ভ্রমণের আগ্রহ উভয় তাগিদেই এই সুযোগ থেকে বঞ্চিত হতে তাঁর আপত্তি ছিল। ভ্রমণের খরচ ও বিশ্বভারতীর জন্য প্রস্তাবিত পঞ্চাশ হাজার ডলার পাওয়ার কথাও তাঁর মাথায় ছিল। কিন্তু চিকিৎসকদের বাধায় উক্ত পরিকল্পনাও কার্যকর হয়নি।

পেরুর তৎকালীন শাসকদের স্বৈরতন্ত্রী মনোভাব ও কার্যকলাপ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ আদৌ অবহিত ছিলেন না, তাই তিনি সেখানে যাচ্ছেন কালিদাস নাগের চিঠিতে সেই খবর পেয়ে রম্যাঁ রলাঁ July মাসেই 'দিনপঞ্জী'তে লিখেছিলেন : 'তাড়াতাড়ি কালিদাস নাগের চিঠির উত্তর দিলাম; আর প্রথমে লিখলাম জোসে বাস্‌কোন্‌থেলোস্‌কে (মেক্সিকো),— দ্বিতীয় কার্লোস আমেরিকো আমাইয়া, লা প্লাতার (আর্জেনটিন) 'বালোরাথিওনেস্‌' পত্রিকার সম্পাদককে— আমেরিকায় রবীন্দ্রনাথের আগমন সম্পর্কে তাঁদের সতর্ক ক'রে দিতে। কারণ আমার ভয়, ইউরোপের মতো, রক্ষণশীল শক্তিরা রবীন্দ্রনাথকে না কুক্ষিগত করে এবং তাঁর নাম ভাঙায়; আমি প্রগতিশীল গোষ্ঠীদের সনির্বন্ধ অনুরোধ জানালাম অবিলম্বে তাঁর সঙ্গে সংযোগ ক'রে আগ বাড়িয়ে যেতে।'[১২৬] কিন্তু কালিদাস নাগ রবীন্দ্রনাথকে সতর্ক করেছিলেন কিনা আমাদের জানা নেই, অবশ্য তিনি তাঁর ভ্রমণসঙ্গী হননি। রলাঁ ভেবেছিলেন, রবীন্দ্রনাথ সেখানে রওনা হবার আগে য়ুরোপে তাঁর সঙ্গে দেখা হলে তিনি তাঁকে সাবধান করে দেবেন; কিন্তু 17 Oct রলাঁকে একটি চিঠি লিখে রবীন্দ্রনাথ দ্রুত প্রস্থান করাতে তিনি তা করতে পারেননি। রলাঁ লিখেছেন :

> সুখের বিষয় প্রাচ্যের উদ্বেগহীনতাকে আমি অবিশ্বাস করেছিলাম; এবং আট দিন আগে আমি পারীর ভারতীয় এস. আর. রানার কাছে রেজিষ্ট্রি করা খামে বাস্‌কোন্‌থেলোস্‌, আয়া দেলিয়া তোরেস এবং লা প্লাজার ছাত্রদের চিঠিগুলো রবীন্দ্রনাথের জন্যে পাঠিয়ে দিয়েছি; সঙ্গে দিয়েছি একটি চিঠি আমার কথা বুঝিয়ে, তাঁকে ভার দিয়েছি সেটা রবীন্দ্রনাথকে পৌঁছিয়ে দিতে।
>
> কিন্তু রবীন্দ্রনাথের সহজ বিশ্বাসে গ্রহণ-করা পেরুর সরকারী আমন্ত্রণের আপোসসুলভ চরিত্র সম্পর্কে আগেভাগেই যা পড়া গেছে, তার পরে — (এবং এখন আর রবীন্দ্রনাথ না জেনে পারেন না)— আমার সম্পর্কে খোঁজ নেবার সামান্যতম চেষ্টা না ক'রেই এই তড়িঘড়ি প্রস্থান যে একটা বড় রকমের লঘুতা, তা স্বীকার করতেই হবে।[১২৭]

রানা রলাঁর চিঠিগুলি আর্জেন্টিনায় পৌঁছে দিয়েছিলেন। অ্যান্ডরুজও লিখেছিলেন তাঁকে। এল্‌ম্‌হার্স্ট লেখেন : 'Letters from Romain Rolland and Andrews reached him and warned him to beware of all kinds of possible dangers and political complications in Peru.'[১২৮] কিন্তু এই বিষয়ে তিনি পূর্বাহ্নে কিছু জানতেন ও রবীন্দ্রনাথকে তদনুযায়ী সতর্ক করেছিলেন বলে মনে হয় না, তবে এই চিঠিগুলি পাওয়ায় এবং আর্জেন্টিনায় ভিক্টোরিয়া ও অন্যান্য ওয়াকিবহাল ব্যক্তিদের কাছ থেকে পেরু-সরকারের প্রকৃত চরিত্র জানার পরে তিনি সম্ভবত রবীন্দ্রনাথের অজ্ঞাতসারে তাঁর পেরু-যাত্রা বন্ধ করার জন্য যথাসাধ্য করেছেন। 16 Nov তিনি ডরোথিকে লেখেন : '...the tyrant in power was apparently hoping to use our visit... to establish himself, whilst most of the intelligent people there are either dead, in prison, or banished. Chile is probably pleased,— for she is not on good terms with Peru. The Argentine folk are delighted, and have played the game, given him real consideration at the time of his illness and insisted that it is enough if he will settle in the country and be amongst

them for a little, without fulfilling any public engagements. … I've had to go into town every day with our hostess to settle Ministers, newspapers, ambassadors and others, but at last that's done'.[১২৯] কিন্তু বিশ্বভারতীর আর্থিক অবস্থা তিনি জানতেন, তাই ইতিমধ্যে ব্যয়িত অর্থের দায় ও সফর বাতিলের রাজনৈতিক ও অন্যান্য প্রতিক্রিয়া নিয়ে তাঁর দ্বিধা ছিল। সেইজন্য তিনি চাইছিলেন রথীন্দ্রনাথ পেরু বা আর্জেন্টিনায় এসে পিতার দায়িত্ব গ্রহণ করুন। কিন্তু রথীন্দ্রনাথ প্রতিশ্রুতি দিয়েও তা রক্ষা করেননি।

আমরা আগেই বলেছি, সান ইসিদ্রো-র 'মিরালরিও' বাড়িটিতে গিয়ে 12 Nov [২৬ কার্তিক] রবীন্দ্রনাথ 'বিদেশী ফুল' কবিতাটি লেখেন। এর পরে 4 Jan 1925 [২০ পৌষ] বুয়েনোস আইরেস ত্যাগের আগে পর্যন্ত তাঁর রচিত কবিতার সংখ্যা ২২টি— যাদের মধ্যে চাপাড মালাল-এ লেখা দুটি কবিতা ছাড়া বাকি কুড়িটি মিরালরিও-তে লিখিত।

1914-এ এক উদ্বেল মানসিক অবস্থায় *Gitanjali*-র ফরাসি অনুবাদ পড়ার পর থেকেই ভিক্টোরিয়া রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে আকর্ষণ অনুভব করতে শুরু করেন। তার পরে প্রায় দশ বছর ফরাসি ও ইংরেজি অনুবাদে তিনি রবীন্দ্রনাথের অন্যান্য রচনা পাঠ করে তাঁর প্রতিভার বৈশিষ্ট্য বোঝবার চেষ্টা করেছেন। আর সেই রবীন্দ্রনাথ যখন পেরু যাওয়ার পথে অসুস্থ শরীরে আর্জেন্টিনায় এসে ডাক্তারের নির্দেশে যাত্রাবিরতি ঘটাতে বাধ্য হলেন, তখন তিনি প্রথম সুযোগেই তাঁকে নিজের অধিকারে এনে সান ইসিদ্রো-র 'মিরালরিও' ভিলায় তুলেছেন, তাঁর সেবার জন্য নিজের অধিকাংশ দাসদাসীকে সেখানে পাঠিয়ে দিয়েছেন, তাঁর অবস্থানকালকে দীর্ঘ করার বাসনায় অর্থসংগ্রহের জন্য নিজের বহুমূল্য অলংকার হিরের টায়রাটি বিক্রয় করতে বাধ্য হয়েছেন। তাঁর আকাঙ্ক্ষা ছিল অনুক্ষণ রবীন্দ্রনাথের সান্নিধ্য লাভ করার, কিন্তু মিরালরিও-তে অন্তত রাত্রে থাকতেন না তিনি, ঘুমোতে যেতেন ভিলা ওকাম্পো-তে বাবা-মার কাছে। নিজেই লিখেছেন তিনি : 'আমি চেয়েছিলাম উনি যেন যতটা সম্ভব নিজের বাড়িতে আছেন বলেই ভাবতে পারেন। তাই ভয় হতো যে সবসময়ে আমি ওখানে থাকলে হয়তো ওঁর অসুবিধেই হতে পারে। কখনো তাই দূরেই থাকতাম, যেতাম না ওঁকে দেখতে। ওঁর কাছে ভালো হবার জন্য নিজেকে আমি সরিয়ে নিতেও তৈরি ছিলাম।'[১৩০] এই নিয়ে মান-অভিমানের নাটকও ঘটত অনেক— সমাধানের জন্য এল্‌ম্‌হার্স্টের সহায়তা আবশ্যক 'হত ভিক্টোরিয়ার; রবীন্দ্রনাথের দৈনন্দিন জীবনের খুঁটিনাটি প্রয়োজন, তাঁর ভালোমন্দ লাগার প্রকৃতি বুঝে নিতেও তিনি শরণাপন্ন হতেন এই ইংরেজ সেক্রেটারির। এই সূত্রে এল্‌ম্‌হার্স্টের সঙ্গে তাঁর আকর্ষণ-বিকর্ষণের বয়ঃসন্ধিসুলভ এক জটিল সম্পর্ক গড়ে ওঠে, যার বিস্তৃত বিবরণ রচনা করতে কেতকী কুশারী ডাইসন বহু পরিশ্রম ও *In Your Blossoming Flower-Garden : Rabindranath Tagore and Victoria Ocampo* গ্রন্থের অনেকগুলি পৃষ্ঠা ব্যয় করেছেন, যে-কারণে বইটির উপনামটি স্বচ্ছন্দে Leonard K, Elmhirst and Victoria Ocampo হতে পারত— রবীন্দ্রনাথের জীবনী রচনার ক্ষেত্রে আমরা যে-আলোচনাটি অনায়াসে অবান্তর বলে বাদ দিতে পারি। তবে মিরালরিও-তে রবীন্দ্রনাথের অবস্থান সম্পর্কে ভিক্টোরিয়ার এই মন্তব্যটি অবশ্যই উদ্ধারযোগ্য :

Nevertheless, every moment I spent away from Miralrio seemed to me irremediably wasted. I had had incredible good luck, but I dared not take full advantage of it.

Split between shyness and avidity, scruples and eagerness not to lose a single crumb of this 'presence', I often had— to console myself for not daring to importune Tagore— long talks in the kitchen, with the cook, or in the pantry with Jose, the butler, and his wife, Filomena. They were happy people who lived at Miralrio and spent their whole time at the Poet's service. I envied them....

Thus I came, little by little, to know Tagore and his moods. Little by little he partially tamed the young animal, by turns wild and docile, who did not sleep, dog-like, on the floor outside his door, simply because it was not done.[১৩১]

মিরালরিও-তে আসার পরে 'বিদেশী ফুল' কবিতা লেখার পরে রবীন্দ্রনাথ সম্ভবত 14 Nov [শুক্র ২৮ কার্তিক] ভিক্টোরিয়ার উদ্দেশে তাঁর প্রথম পত্রটি রচনা করেন। এই পত্রে তিনি এমন-কিছু কথা লিখলেন, যা তাঁর মতো মানুষের পক্ষে এত স্বল্প পরিচয়ে লেখা একটু অস্বাভাবিক মনে হয়। তিনি লেখেন :

Last night when I offered you my thanks for what is ordinarily termed as hospitality I hoped that you could feel that what I said was much less than what I had meant.

It will be difficult for you fully to realise what an immense burden of loneliness I carry about me, the burden that has specially been imposed upon my life by my sudden and extraordinary fame.... My market price has risen high and my personal value has been obscured. This value I seek to realise with an aching desire which constantly pursues me. This can be had only from a woman's love and I have been hoping for a long time that I do deserve it.

I feel today this precious gift has come to me from you and that you are able to prize me for what I am and not for what I contain.[১৩২]

মোটামুটি এই কথাগুলিই তিনি কবিতার ভাষায় রচনা করলেন 15 Nov 'অতিথি' ['প্রবাসের দিন মোর পরিপূর্ণ করি দিলে নারী' দ্র পূরবী ১৪। ১০৫–০৬] কবিতায়, যার একটি ইংরেজি অনুবাদও তিনি প্রস্তুত করেন ভিক্টোরিয়াকে দেবার জন্য— 'Woman, thou hast made my days of exile tender with beauty'। ভিক্টোরিয়া উক্ত পত্র ও কবিতা পেয়ে সম্ভবত 16 Nov তাঁকে লেখেন :

It is not for you to thank me. Whatever I do, it will always be for me to be thankful. You have given me so much, so much, without even knowing it, that I will never be able to acquit myself.... I did not try to thank you for your poem, tonight. How could I manage to put into words... sentiments that are not made for words?... Of all men, how could I speak to you? I only can look into you, listen to your voice and understand silently all that you are, understand it so deeply that it makes me wonderfully happy to know that *I* am so near you,

and utterly unhappy to know that y*ou* can't be near me, because I am— and perhaps shall always remain— a stranger to you.

But what does that suffering matter. All I received from you has made me so rich in love that the more I spend, the more I have to give. And all I give comes from you… so I feel I am *giving* nothing.[১৩৩]

—চিঠির শেষ বাক্যটি থেকে মনে হয়, ভিক্টোরিয়া যেন 'শেষের কবিতা' উপন্যাসের 'হে ঐশ্বর্যবান, / তোমারে যা দিয়েছিনু সে তোমারি দান; / গ্রহণ করেছ যত ঋণী তত করেছ আমায়' ছত্রগুলি আগেই পড়ে নিয়েছিলেন। তাঁর অবস্থা হয়েছিল রসশাস্ত্রে বর্ণিত সেই নায়িকার মতো— যে প্রেমিকের সান্নিধ্যে এসে বেপথুমতী, লজ্জায় বাক্যহারা; সেকথা তিনি নিজেই লিখেছেন অন্য একটি পত্রে : 'I am longing to speak to you of many things. But those things are sunken in the depth of my heart and I cannot bring them to the surface easily. Your mere presence disturbs me, because my shyness is paralysing. And I am so shy, with you, because the idea of displeasing you freezes my thoughts'.[১৩৪]

এল্‌ম্‌হার্স্ট লিখেছেন, 16 Nov [রবি ১ অগ্র] সকালে রবীন্দ্রনাথ ও তিনি ভিক্টোরিয়ার পিতৃগৃহ ভিলা ওকাম্পো-র গোলাপবাগানে বসে সেক্সপিয়র ও হ্যামলেট নিয়ে আলোচনা করেন। এইদিনই রবীন্দ্রনাথ লেখেন 'অন্তর্হিতা' ['প্রদীপ যখন নিবেছিল' দ্র পূরবী ১৪ ১০৬–০৮] নামক কবিতাটি— যার অন্তরালে ভিক্টোরিয়ার সলজ্জ উপস্থিতি অনুভব করা যায়। উল্লেখ্য, পাণ্ডুলিপিতে দেখা যায়, প্রথম তিনটি স্তবক লিখে শেষ চারটি স্তবক রবীন্দ্রনাথ পরে সংযোজন করেছেন।

17 Nov [সোম ২ অগ্র] রবীন্দ্রনাথ লিখলেন 'আশঙ্কা' ['ভালোবাসার মূল্য আমায় দু হাত ভরে' দ্র পূরবী ১৪। ১০৯–১০] কবিতাটি; 20 Nov রবীন্দ্রনাথ এর ইংরেজি অনুবাদ রচনা করেন : 'Tempt me not to load my boat/ with debt'। এল্‌ম্‌হার্স্ট উক্ত 17 Nov ডায়ারিতে লিখেছেন, Reeves নামক একজন ব্যক্তি দক্ষিণ আমেরিকার প্রাচীন অধিবাসী ইন্‌কাদের সভ্যতা বিষয়ে একটি বই নিয়ে এসে চা-পানের আসরে তাঁদের সঙ্গে যোগ দেন এবং তার পরে মোটরে করে ভিক্টোরিয়ার পরিকল্পিত গৃহটি দেখতে যাওয়া হয়।

শরীর ভালো থাকলে 19 Nov [বুধ ৪ অগ্র] চিলি হয়ে রবীন্দ্রনাথের পেরু রওনা হওয়ার কথা ছিল। এল্‌ম্‌হার্স্ট লিখেছেন, সকাল ন'টায় ভিক্টোরিয়া এসে সর্বশেষ সিদ্ধান্ত সম্পর্কে জানতে চাইলে তিনি বললেন, রবীন্দ্রনাথ পেরু যাওয়ার সংকল্প ত্যাগ করতে প্রস্তুত নন— খুব জোর যাত্রাটি পিছোতে পারে মাসের শেষ পর্যন্ত। ভিক্টোরিয়া চাইছিলেন তাঁকে সান ইসিদ্রো-তেই আটকে রাখতে, তাই তাঁরা যখন বুয়েনোস আইরেসে উরুগুয়ের শিল্পী Pedro Figari [1861–1938]-র চিত্রপ্রদর্শনী দেখতে যাচ্ছেন, তখন ভিক্টোরিয়া আগাগোড়াই বিষণ্ণহৃদয়ে চুপ করে থাকেন। এল্‌ম্‌হার্স্ট লিখেছেন : 'Victoria had asked how much money would be needed for a refuge for Gurudev in Europe, & had visualised some selling up of her resources. I said that the price of his freedom from the feeling he had of his own

responsibility for raising funds for his institution would be not less than $500,000.'[১৩৪] স্বাভাবিকভাবেই এত টাকার বিনিময়ে রবীন্দ্রনাথের জন্য মুক্তি ক্রয় করা ভিক্টোরিয়ার সাধ্যাতীত ছিল!

20 Nov *The Standard* ও অন্যান্য পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথের স্বাস্থ্য-সংক্রান্ত সংবাদ দিয়ে মন্তব্য করা হয় : 'Sir Rabindranath sent a cable to his son yesterday asking him to sail direct to Buenos Aires whence they will return to India since the condition of the poet's health will not allow of his projected journey to Peru,' হয়তো এই সংবাদের কথা মনে রেখেই 21 Nov [শুক্র ৬ অগ্র] রবীন্দ্রনাথ লেখেন পূরবী-র অন্যতম শ্রেষ্ঠ একটি কবিতা 'শেষ বসন্ত' ['আজিকার দিন না ফুরাতে', দ্র পূরবী ১৪। ১১০–১২]— যা আমাদের ব্রাউনিঙের 'The Last Ride Together' কবিতাটির কথা মনে করিয়ে দেয়।

উল্লেখ্য, এর আগের দিন এল্‌ম্‌হার্স্টের ডায়ারি 'The Argentine Adventure' আকস্মিকভাবে শেষ হয়ে গেছে।

সংবাদপত্রের বিবৃতি অনুযায়ী রবীন্দ্রনাথের পেরু-যাত্রা বাতিল ঘোষিত হলেও তিনি নিজে সেখানে যেতে আগ্রহী ছিলেন, প্রতিশ্রুতি রক্ষার তাগিদও তাঁর মনে ছিল— আর্জেন্টিনা-সরকারও রাজনৈতিক জটিলতা এড়াতে তাঁর নিরাপত্তা অক্ষুণ্ণ রেখে তাঁকে পেরুতে পাঠাতে চাইছিল— এইসব প্রসঙ্গ আমরা আগেই আলোচনা করেছি [দ্র টীকা ১২৪ ও ১২৫]। প্রস্তাবটি কার্যকর হয়নি, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তাতে প্রসন্ন হননি। 26 Oct তিনি প্রশান্তচন্দ্রকে লিখেছিলেন : 'ভাবে বোধ হচ্ছে দক্ষিণ আমেরিকার সর্বত্র খুব সমাদর পাওয়া যাবে — হয়তো তার চেয়ে যার Specific gravity বেশী, এমন সামগ্রীও দুর্লভ না হতে পারে। যদি তোমাদের হাতে এই উপলক্ষে যথেষ্ট টাকা দিতে পারি তাহলে আমি ছুটি নিতে চাই।'[১৩৫] 3 Dec মীরা দেবীকে লিখলেন : 'আমার যে ঘুরে বেড়াবার উৎসাহ বেশি আছে [তা নয়] কিন্তু এখানে আসবার খরচ বাবদ পেরু গবর্মেন্টের বিস্তর টাকা খরচ হয়ে গেছে। তার উপরে যদি না যাওয়া হয় তাহলে ভারি অন্যায় হবে।'[১৩৬] এইদিনই বিকেলে তাঁর ডাক্তারি পরীক্ষার কথা ছিল, আশা ছিল ডাক্তার সুস্থ ঘোষণা করলে এই মাসের শেষে পেরুতে রওনা হবেন। কিন্তু পরের দিনই প্রতিমা দেবীকে লিখতে হল : 'দ্বিতীয় বার পেরু যাবার আয়োজন যখন পাকা করেছি এমন সময়ে ডাক্তার এসে আবার আমাকে পরীক্ষা করে বললেন, আমার কিছুতেই যাওয়া চলবে না, না সমুদ্রপথে, না শৈল পথে। তাতে হঠাৎ বিপদ ঘট্‌তে পারে— আমার যথাসম্ভব সম্পূর্ণ বিশ্রাম দরকার। তাই এখানকার আশা ছেড়ে দিয়ে য়ুরোপে পাড়ি দেবার ব্যবস্থা করা গেল। জানুয়ারির ৩রা তারিখে। ইটালিয়ান জাহাজ, নাম Giulio Cesare। জেনোয়া বন্দরে পৌঁছব, জানুয়ারির শেষ সপ্তাহে।'[১৩৭] বোঝা যায়, পেরু যাওয়ার সংকল্প সম্পূর্ণ পরিত্যক্ত হয়েছে।

কবিতা লেখা অবশ্য চলছিল; 22 Nov [শনি ৭ অগ্র] লিখলেন 'বিপাশা' ['মায়ামৃগী, নাই বা তুমি' দ্র পূরবী ১৪। ১১২–১৪] কবিতাটি। এর পরে কয়েকদিন বাদ দিয়ে 26 Nov [বুধ ১১ অগ্র] লিখিত হল 'চাবি' ['বিধাতা যেদিন মোর মন' দ্র পূরবী ১৪। ১১৫–১৬]। এটির ইংরেজি অনুবাদ হয়েছিল কিনা জানা নেই, কিন্তু এর মধ্যে ভিক্টোরিয়ার উদ্দেশে একটি সতর্কবাণী উচ্চারিত হয়েছে বলে মনে হয়। এই সতর্কবাণীই রবীন্দ্রনাথ লিখে পাঠিয়েছিলেন রাণুকে লেখা 23 Sep 1924-এর চিঠিতে, যা আমরা আগেই উদ্ধৃত করেছি। প্রায় সেই কথাগুলিই তিনি ভিক্টোরিয়াকে লিখেছেন জাহাজ থেকে 13 Jan 1925 [মঙ্গল ২৯ পৌষ] তারিখে :

...One thing most of my friends fail to know [is] that where I am real I am profoundly serious. Our reality is like treasure, it is not left exposed in the outer chamber of our personal self. It waits to be explored and only in our serious moments it can be [*sic*] approached. You have often found me homesick,— it was not so much for India, it was for that freedom. It becomes totally obscured when for some reason or other my attention is too much directed upon my own personal self. My true home is there where from my surroundings comes the call to me to bring out the best that I have, for that inevitably leads me to the touch with the universal. My mind must have a nest to which the voice of the sky can descend freely, the sky that has no other allurements but light and freedom. Whenever there is the least sign of the nest becoming a jealous rival of the sky[,] my mind, like a migrant bird, tries to take its flight to a distant shore. When my freedom of light is obstructed for some length of time I feel as if I am bearing the burden of a disguise, like the morning in its disguise of a mist. I do not see myself— and this obscurity, like a nightmare, seems to suffocate me with its heavy emptiness. I have often said to you that I am not to free to give up my freedom— for this freedom is claimed by my Master for his own service. There have been times when I *did* forget this and allowed myself to drift into some easeful captivity— but everytime it ended in catastrophe and I was driven by an angry power to the open, across broken walls.

I tell you all this because I know you love me. I trust my Providence. I feel certain— and I say this in all humility— that he has chosen me for some special mission of his own and not merely for the purpose of linking the endless chain of generation. Therefore I believe that your love may, in some way, help me in my fulfilment. It will sound egoistic, only because the voice of our ego has in it the same masterful cry of insistence as the voice of that which infinitely surpasses it. I assure you, that through me a claim comes that is not mine....

Your friendship has come to me unexpectedly. It will grow to its fulness of truth when you know and accept my real being and see clearly the deeper meaning of my life. I have lost most of my friends because they asked me for themselves, and when I said I was not free to offer away myself— they thought I was proud. I have deeply suffered from this over and over again— and therefore I always feel nervous whenever a new gift of friendship comes in my way. But I accept my destiny and if you also have the courage fully to accept it we shall ever remain friends.[১৩৮]

রবীন্দ্রনাথ ভিক্টোরিয়াকে তাঁর প্রথম চিঠিতেই লিখেছিলেন, তাঁর নিঃসঙ্গতা দূর করার জন্য নারীর ভালোবাসার আবশ্যকতা আছে তাঁর জীবনে— কিন্তু তা অন্যান্য সাধারণ পুরুষের মতো কামনাক্লিন্ন কোনো

স্থূল অর্থে নয়, তাঁর কাজে সেই প্রেম প্রেরণা ও মাধুর্যের সঞ্চার করে। কিন্তু কোনো নারী যদি তার প্রেম দিয়ে তাঁকে একান্ত নিজের বলে গ্রাস করার প্রত্যাশা করে, তাঁর বন্ধনভীরু মন তাকে প্রত্যাখ্যান করতেও দ্বিধা করে না। রাণুর ভালোবাসা বালিকা বয়স থেকে যৌবনোদগমের কাল পর্যন্ত তাঁকে একান্ত নিজের করে পেতে চেয়েছে, আর রবীন্দ্রনাথ তাঁকে নানাভাবে বোঝাতে চেয়েছেন তার বহু নিদর্শন আমরা তাঁর পত্রাবলি থেকে আহরণ করে দিয়েছি— রবীন্দ্রনাথ ও ভিক্টোরিয়ার 'ভালোবাসা'কে এই পটভূমিকাতেই বিচার করা উচিত।

'চাবি' কবিতাটির পরে বুয়েনোস আইরেসে লেখা রবীন্দ্রনাথের কবিতার তালিকাটি এইরূপ :

27 Nov [বৃহ ১২ অগ্র] 'বৈতরণী' ['ওগো বৈতরণী'] দ্র পূরবী ১৪। ১১৬–১৭

1 Dec [সোম ১৬ অগ্র] 'প্রভাতী' ['চপল ভ্রমর, হে কালো কাজল আঁখি'] দ্র পূরবী ১৪। ১১৮–১৯

4 Dec [বৃহ ১৯ অগ্র] 'মধু' ['মৌমাছির মতো আমি চাহি না ভাণ্ডার ভরিবারে'] দ্র পূরবী ১৪। ১১৯–২০

4 Dec 'তৃতীয়া' ['কাছের থেকে দেয় না ধরা, দূরের থেকে ডাকে'] দ্র পূরবী ১৪। ১২০–২২

শেষোক্ত কবিতাটি তিন বছরের পালিতা-নাতিনী নন্দিনীর উদ্দেশে লেখা। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ পুত্রবধূ প্রতিমা দেবীকে এইদিন লিখেছেন :

পুপের চিঠি পেলুম। ভাগ্যি তোমরা ব্যাখ্যা করে দিয়েচ তাই ভাবার্থটা বোঝা গেল। কিন্তু ভাবার্থটা ওর আসল অর্থই নয়, ওটা বাজে কথা। ওর নাচ যেমন নিরর্থক, ওর লেখাও তেমনি, হিজিবিজির নৃত্য। এই হিজিবিজি বিদ্যায় আমারও সখ আছে, তোমরা জান। এই জন্যে ওর চিঠির ঠিকমত উত্তর আজ সকালে বসে বসে লিখেছি। আমরা যাঁর অতিথি আমার টেবিলে হঠাৎ এটা দেখে অবাক্। পাছে ভাঁজ করতে গিয়ে এটা নষ্ট হয়ে যায় সেইজন্যে তিনি এর জন্যে একটা বড় লেফাফা আনবার ব্যবস্থা করচেন। এলে পাঠিয়ে দেব। কিন্তু এর একটু ব্যাখ্যা করাও দরকার। গোড়ায় আমি কাগজটার উপর ওর যত আদরের নাম সব লিখ্‌লুম, পুপে, পুপু, পুপসি, মাডাম পাভ্‌লোভা দি সেকেণ্ড, রূপসী, উর্ব্বশী, রম্ভা, মেনকা, তিলোত্তমা ইত্যাদি ইত্যাদি, তার পরে যেমন করে আমার লেখার ভুলগুলোকে চাপা দিই তেমনি করে নানা আঁকা জোকা দিয়ে ওগুলো সম্পূর্ণ চাপা দিয়েচি। এর মর্ম্ম হচ্চে এই, ঐ আদরের নামগুলো সমস্তই ভুল, আমার মন থেকে এর সমস্তই আমি সরিয়ে ফেলার চেষ্টায় আছি। ওর সম্বন্ধে আরো একটু আমি আলোচনা করেচি, সেটা কবিতায়— সেটাও তোমাদের কপি করে পাঠাব।[১৩৯]

পরের দিন রবীন্দ্রনাথ পুরো কবিতাটি কপি করে মীরা দেবীকে লেখেন : 'আমার সঙ্গে পুপের ভাব কতটা জমেচে নীচের কবিতা থেকে কতকটা আভাস পাবি। গদ্যে সব কথা খুলে বলা যায় না।'[১৪০] দীর্ঘ কবিতাটির কৌতুকের সুর গদ্যে অবশ্যই লঘু হয়ে যেত।

7 Dec [রবি ২২ অগ্র] 'অদেখা' ['আসিবে সে, আছি সেই আশাতে'] দ্র পূরবী ১৪। ১২২–২৪; কবিতাটির একটি ইংরেজি অনুবাদও রবীন্দ্রনাথ করেছিলেন : 'She will come, I wait for that hope'.

10 Dec [বুধ ২৫ অগ্র] 'চঞ্চল' ['হায় রে তোরে রাখব ধরে'] দ্র পূরবী ১৪। ১২৪–২৫

11 Dec [বৃহ ২৬ অগ্র] 'প্রবাহিণী' ['দুর্গম দূর শৈলশিরের'] দ্র পূরবী ১৪। ১২৬–২৭

সান ইসিদ্রো-তে থাকার সময়ে রবীন্দ্রনাথের প্রাত্যহিক জীবনযাত্রার একটি চিত্র এঁকেছেন ভিক্টোরিয়া :

মিরালরিওতে থাকবার সময়ে সকালের দিকে রবীন্দ্রনাথ লিখতেন, নিজের বাগানে বেড়াতেন, নয়তো আমার বাগানে চলে আসতেন। ওঁর অলিন্দ থেকে ধ্যানমগ্ন তন্ময়তায় দেখতেন ফুল বা পাখি। পড়তেন হাডসনের লেখা। বিকেলের দিকে শুরু হতো অভ্যাগতের স্রোত। প্রায়ই নদীর ধারে এক উইলো গাছের নীচে গিয়ে বসতেন আর অতিথিরা তাঁকে ঘিরে বসতেন অর্ধবৃত্তে। তাঁদের সঙ্গে কথা বলতেন ইংরেজিতে। দরকার হতে অনুবাদ করবার। সে কাজটা সচরাচর করতেন শ্রীযুক্ত বারোস, আর কখনো-বা আমি। কখনো-কখনো কোনো অপ্রত্যাশিত অতিথির দেখা মিলত, আসতেন থিওসফিতে উৎসাহী অনেকে। একদিন সকালে এল এক তরুণী (দিনের পর দিন যেসব লোক আসতেন তাঁদের খুব কমই চিনতাম আমি), এসেই জোর করতে লাগল যে এক্ষুনি তাকে দেখা করতে দেওয়া হোক। কবিকে বাঁচাবার জন্যে আমরা যে সতর্ক প্রহরা তৈরি করেছিলাম তা নিয়ে একটু ঠাট্টা করে উনি তো ওই ভোরবেলায় ডেকে নিলেন মেয়েটিকে। পরে শুনলাম, মেয়েটি কাল রাত্রে যে স্বপ্ন দেখেছে তার মানে বলে দেবার জন্য ধরেছিল ওঁকে। স্বপ্ন দেখেছিল হাতির। ভারতবর্ষে হাতি-টাতি পাওয়া যায়, তাই এই হাতির স্বপ্নের মানে তো রবীন্দ্রনাথের বলতে

পারাই উচিত! এল্‌ম্‌হার্স্ট আর আমার মধ্যে চকিতে দৃষ্টিবিনিময় হলো : আমাদের রোগীটিকে কোনোরকমে সামলে নেবার এই হচ্ছে সময়। একবার যদি এরা ওঁকে আর-পাঁচজন গণকারের মতো ঠাউরে নেয় তাহলে আর এ-বাড়িতে এক মুহূর্তের শান্তি মিলবে না। পাগলামি একেবারে! ভারতবর্ষে তো গোরু বানর সাপ পাখি কত কিছুই পাওয়া যায়। অন্য কোনো জন্তুর স্বপ্ন দেখতে পারেন— কেনই বা দেখবেন না— আর অম্‌নি তাঁরা সকালবেলায় সে-স্বপ্নের মানে বুঝবার জন্যে যদি হাজির হন মিরালরিওতে, এই হাতির মেয়েটির মতো?

সত্যি বলতে, দর্শনার্থী এইসব উমেদারের জন্য আমি একটু আতঙ্কিত হয়ে পড়েছিলাম, কিন্তু কবির ভালোমানুষির আর সীমা নেই। ওঁকে ভোলানোর চেষ্টায় বৃথাই আমরা সময় নষ্ট করতাম। ওঁর ধরণধারণ উনি পালটাবেন না।[১৪০]

William Henry Hudson [1841–1922] রবীন্দ্রনাথের প্রিয় লেখকদের অন্তর্গত ছিলেন— তাঁর *Green Mansions, The Naturalist in La Plata, Idle Days in Patagonia, Far Away and Long Ago* প্রভৃতি আর্জেন্টিনার প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের উপরে লিখিত গ্রন্থাবলি তাঁকে খুবই মুগ্ধ করেছিল। কিন্তু তৎকালীন ধনী-হয়ে-ওঠা আর্জেন্টিনার সঙ্গে হাডসনের দেখা আর্জেন্টিনার পার্থক্য এতটাই ঘটেছিল যে রবীন্দ্রনাথ তাতে দুঃখ অনুভব করতেন।

ভিক্টোরিয়া আর্জেন্টিনার নির্ভরযোগ্য প্রতিভূদের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথকে মেশবার সুযোগও করে দিয়েছিলেন। তিনি লিখেছেন, সেখানকার উল্লেখযোগ্য ঔপন্যাসিক Ricardo Guiraldes [1886–1927]-এর সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়েছিল। একদিন সন্ধ্যায় তাঁর ইচ্ছা হল আধুনিক য়ুরোপীয় সংগীত শুনবেন। 'অমনি ফোন করে ডেকে পাঠালাম হুয়ান হোসে আর মারিয়া কাস্ত্রোকে, এঁরা তখন একটা কোয়ার্টেট গড়ে তুলেছিলেন। বেহালা চেলো ইত্যাদি নিয়ে পুরো দলটি তো চলে এল। দেশ থেকে একটি চিঠি পেয়ে সে-রাত্রে কবি ছিলেন একটু মনমরা। হলঘরের মাঝখানে শিল্পীরা তাঁদের সাজসরঞ্জাম গুছিয়ে নিয়ে দাঁড়ালেন। কিন্তু আমার অতিথি রইলেন তাঁর শোবার ঘরে, দরজাটা ঈষৎ খোলা। হলের সংলগ্ন এক গ্যালারি থেকে উঠে গিয়েছে তাঁর ঘর। আমি আর কী করব, শিল্পী বন্ধুদের কেবল আঙুল তুলে বুঝিয়ে দিলাম রবীন্দ্রনাথ কোথায় আছেন; 'উনি ওই ঘরে, দয়া করে ওঁকে মার্জনা কোরো, ওঁর শরীর ভালো নেই।'[১৪১] কৌতুকের সঙ্গে ভিক্টোরিয়ার মনে পড়ে গেল জীবনস্মৃতি-র একটি কাহিনী। ফরাসি সংগীতকার Claude Achille Debussy [1862–1918] ও Joseph Maurice Ravel [1875–1937]-এর চেয়ে রুশ Alexander Profirevich Borodin [1834–87] তাঁর কাছে কম দুর্বোধ্য ও জটিল মনে হয়েছিল। ভিক্টোরিয়া লিখেছেন : 'আমাদের পশ্চিমি সংগীত ওঁর কাছে যতটা জড়ানো আর বিন্যাসবিহীন লেগেছিল, প্রথমবার ওঁর মুখে বাংলা গান শুনে আমারও মনে হয়েছিল ঠিক ততটাই অসহ্য একঘেয়ে। এর থেকে বোঝা যাবে যে যতটা ভাবা যায় সংগীতের ভাষা ঠিক ততটা সর্বজনীন নয়। পরে কিন্তু আমি বাংলা গানের বেশ ভক্তই হয়ে পড়ি।'[১৪২] রোজাস রিকার্ডো তাঁর গিটারে স্থানীয় লোকগীতি শুনিয়ে তাঁকে শতকরা একশো ভাগ জাতীয় খাবার পরিবেশন করেন।

রবীন্দ্রনাথের এই অদ্ভুত আচরণের একটি সুন্দর ব্যাখ্যা দিয়েছেন ভিক্টোরিয়া : 'তাঁর প্রীতিভাজন ইংরেজ সখা সি. এফ. আণ্ডরুজের কাছে রবীন্দ্রনাথ একবার লিখেছিলেন 'কবির দেখাশোনা করবার দায়িত্ব কী ভয়াবহ!' এই ভয়ের অভিজ্ঞতা আমার খানিকটা ঘটেছিল বটে! মাঝে মাঝেই উনি ব্যবহার করতেন শিশুর মতো, কবিরা যেন শৈশবের কোনো কোনো লক্ষণ পুরোটাই বাঁচিয়ে রাখেন তাঁদের আচরণে। মহাপুরুষদের মহিমার একটা দিক কিন্তু তাঁদের এই শিশুসুলভ ধরণ, অন্য সবার মতো তো নন তাঁরা। যদি কেবলই ছিমছাম বিজ্ঞ বা প্রমাদহীন হতেন তাঁরা, তাহলে আমরা শ্রদ্ধা করতাম আরো বেশি, ভালোবাসতাম কম।'[১৪৩] অন্যত্র

তিনিই লিখেছেন : 'I discovered in myself a strong *maternal* sense of duty towards this man, my father's contemporary, whom I could not help myself treating at times like a child.'[১৪৪]

রবীন্দ্রনাথ আর্জেন্টিনায় এসে প্রথমে শীতের বিষয়ে অভিযোগ করছিলেন, ডিসেম্বরের শুরুতেই মীরা দেবীকে লিখলেন : 'এখন বসন্তকাল কেটে গিয়ে পুরো গরম আসবার উপক্রম করচে।' এইজন্য ভিক্টোরিয়া তাঁর বন্ধু Martinez de Hoz-কে অনুরোধ করেন, আটলান্টিক থেকে মাত্র কুড়ি কিলোমিটার দূরবর্তী চাপাদমালালে তাঁদের বাড়িতে কয়েকদিন কাটিয়ে আসার সুযোগ লাভের জন্য। অনুমতি পাওয়াতে রবীন্দ্রনাথ, এল্‌ম্‌হার্স্ট, ভিক্টোরিয়া ও তাঁর বন্ধু আদেলিয়া আচেভেদো ট্রেনে বুয়েনোস আইরেস থেকে চারশো কিলোমিটার দূরে তাঁদের গন্তব্যস্থলের উদ্দেশে রওনা হন মধ্য-ডিসেম্বরের কোনো-এক দিনে, 16 Dec [মঙ্গল ১ পৌষ] তারিখে লেখা 'আকন্দ' ['সন্ধ্যা-আলোর সোনার খেয়া পাড়ি যখন দিল গগন-পারে' দ্র পূরবী ১৪। ১২৭–৩০] কবিতার সাক্ষ্যে বোঝা যায় তাঁরা এইদিন বা তার অব্যবহিত আগে চাপাদমালালে পৌঁছে গেছেন।

চাপাদমালালে লিখিত অপর কবিতাটি হল 'কঙ্কাল' ['পশুর কঙ্কাল ওই মাঠের পথের এক পাশে' দ্র পূরবী ১৪। ১৩০–৩১]— 17 Dec [বুধ ২ পৌষ] তারিখে রচিত, পরের দিন রবীন্দ্রনাথ 'A Skeleton' [A beast's bony frame lies bleaching on the grass'] নামে এর একটি ইংরেজি অনুবাদ করেন। এই অনুবাদটি নিয়ে ভিক্টোরিয়ার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের একটি সংঘর্ষ হয়েছিল যেটি তাঁর ইংরেজি অনুবাদের প্রকৃতি বোঝার পক্ষে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ভিক্টোরিয়া লিখেছেন :

> প্রাচ্যের মনোভাব আমরা কতটুকু ধরতে পারি, এ নিয়ে বেশ খানিকটা সন্দেহ ছিল রবীন্দ্রনাথের। চাপাদমালালে, একদিন বিকেলে ওঁর ঘরে ঢুকেছি, ঠিক তখনই একটা কবিতা লেখা শেষ করেছেন উনি। ··· বললাম, 'চায়ের সময় হলো! কিন্তু নেমে আসবার আগে টেবিলের ওই কবিতাটি আমায় অনুবাদ করে দিতে হবে।' পাতাটার দিকে তাকিয়েছিলাম, দেখছিলাম খুঁটিয়ে, কিছুই ধরতে পারছিলাম না বাংলা অক্ষরের ওই সুচারু ছাঁদ। ··· উনি অনুবাদ করতে শুরু করলেন প্রতিটি শব্দ ধরে ধরে, কখনো-বা ইতস্তত করে। একটা জগৎ খুলে গেল আমার সামনে। বললাম, পরে যেন এটি লিখে রাখেন। একেবারে হঠাৎ, যেন দৈবে, সরাসরি স্পর্শ পাওয়া গেল ওঁর কবি-প্রকৃতির, তাকে ধরতে হলো না অনুবাদের দস্তানাঘেরা হাতে। আলগা আঙুলে শব্দগুলিকে ছুঁতে পাবার আনন্দ যেন নষ্ট হয়ে যায় অনুবাদ-কবিতায়। স্পর্শাতীত আর স্পর্শযোগ্যতাকে, স্পর্শাতীত কবিতার সত্য আর স্পর্শযোগ্য দৈনন্দিন অসত্যকে ক্ষীণ সেতুতে বেঁধে দেয় যে শব্দ, একজন কবিই তো জানেন তার বুনুনি।
>
> পরদিন সকালবেলা সেই কবিতাটি তিনি দিলেন আমায়, তাঁর স্পষ্ট পরিমিত ইংরেজি অক্ষরে লেখা। সঙ্গে সঙ্গেই পড়ে নিলাম, কিন্তু লুকোতে পারলাম না আমার মনোভঙ্গ। বকেই উঠলাম, বললাম : 'কাল যা পড়েছিলেন তার অনেকটাই তো দেখছি নেই এর মধ্যে। এমন-সব ব্যাপার ছেড়ে দিয়েছেন যা ছিল কবিতাটির প্রাণ!' উত্তরে জানলাম যে ওঁর মনে হয়েছে সেসব অংশ পশ্চিমবাসীদের ভালো লাগবে না হয়তো। এক ঝলক রক্ত উঠে এল আমার মুখে, কেউ যেন মেরেছে আমাকে। কবি অবশ্য আন্তরিকভাবেই জবাব দিয়েছিলেন, আমাকে নিশ্চয় অপমান করতে চাননি। এর আগে কখনোই উত্তেজিত হইনি ওঁর সামনে, কিন্তু আজ খানিকটা তীব্র স্বরেই বলতে হলো যে একটা সর্বনেশে ভুল করেছেন উনি।[১৪৫]

এখানেই আর-একটি মতপার্থক্যের ঘটনা ঘটেছিল তাঁদের মধ্যে। একদিন বিকেলে ভিক্টোরিয়া ফরাসি কবি Baudelaire-এর *Less Flerars du Mal* কাব্যের 'L'Invitation au Voyage' কবিতাটি রবীন্দ্রনাথকে তর্জমা করে শোনাচ্ছিলেন। এক জায়গায় তিনি তাঁকে বাধা দিয়ে বললেন, 'ভিক্টোরিয়া, তোমার এই আসবাবের কবিকে আমার ভালো লাগছে না।' এই অভিজ্ঞতার প্রতিক্রিয়ায় ভিক্টোরিয়া লিখেছেন : 'হা! মস্ত এই ফরাসি কবিকে শেষে কি না আমি আর্জেন্টিনার এক নিলামদারের ভূমিকায় দাঁড় করিয়েছি, যেন তিনি আমদানিকরা ভালো কিছু আসবাবের নিলেম ডাকছেন।' বিষয়টি পরবর্তীকালে উভয়ের মধ্যে এক কৌতুকের উপকরণে পরিণত হয়েছিল।

ব্রিটিশ স্থপতির দ্বারা নির্মিত ও বিলিতি আসবাবে সজ্জিত বাড়িটি দেখে রবীন্দ্রনাথ মন্তব্য করেন যে, সেটি অপ্রয়োজনীয় জিনিসে ভর্তি। ভিক্টোরিয়া তাঁর সঙ্গে একমত পোষণ করতে পারেননি। আসলে রবীন্দ্রনাথ হাডসনের বর্ণিত পুরোনো আর্জেন্টিনাকে দেখতে চাইছিলেন, কিন্তু তার অস্তিত্বই তখন লুপ্ত হয়ে গেছে।
17 Dec দেশীয় রাজনীতির খবর নিয়ে একটি চিঠি পেয়ে রবীন্দ্রনাথ খুবই বিচলিত হন। তার প্রতিক্রিয়ায় তিনি যা বলেন, এল্‌ম্‌হার্স্ট তার অনুলেখন রক্ষা করেন ও বহু পরে 'The Importance of the Individual in the History of India' নামে বিশ্বভারতী কোয়ার্টার্লি [Vol. 28, No. 2, pp. 97–100] প্রকাশ করেন।

রবীন্দ্রনাথের আর্জেন্টিনা ভ্রমণের একটি অন্যতম ফসল তাঁর চিত্রশিল্পের সূচনা। কবিতার কাটাকুটিকে জুড়ে একটি আলংকারিক রূপদানের নমুনা তাঁর অনেক পাণ্ডুলিপিতে বহু পূর্ব থেকেই দেখা গেছে। দক্ষিণ আমেরিকা যাত্রার সূচনা, বিশেষত আন্ডেস জাহাজে, রবীন্দ্রনাথ যে-কবিতাগুলি লিখছিলেন তাদের মধ্যেই অলংকরণের বাহুল্য লক্ষিত হচ্ছিল। রবীন্দ্রনাথ ভ্রমণকাহিনি পড়তে ভালোবাসতেন। আর কোনো নূতন দেশে যাবার আগে তিনি সেই দেশটির পরিচয় সংগ্রহের জন্য যথাসাধ্য পড়াশোনা করে নিতেন। সুশোভন অধিকারী জানাচ্ছেন। 'এ প্রসঙ্গে একটি বইয়ের কথা বিশেষভাবেই উল্লেখ করা দরকার। কলাভবন গ্রন্থাগারের পুরোনো বইয়ের সংগ্রহে আছে এই বইটি : *The Art of Old Peru*, under the editorship of Walter Lehmann, Director of the Ethnological Institute of the Berlin Ethnographical Museum, assisted by Heinrich Doering, London, Ernest Benn Limited. 1924 (publication of the Ethnological Institute of the Ethnographical Museum, Berlin)। বইটি জান্তব আকারের ফর্মে নির্মিত কারুসামগ্রীর নিদর্শনে, ট্যাপস্ট্রি, পটারি ও মাথায় পরবার টুপির নমুনায় ঠাসা। গ্রোটেস্ক মুখেদের পার্শ্বচিত্র, দাঁতওয়ালা জন্তু, মাছের মোটিফ-সহ থালা— কোনো কিছুর অভাব নেই। বইটা যেহেতু ১৯২৪-এরই প্রকাশন, তাই এটা হতেই পারে যে ঐ বছরের অক্টোবরে আন্দেস্ জাহাজে এই বই রবীন্দ্রনাথের ভ্রমণসঙ্গী হয়েছিলো। এমনও হতে পারে যে স্বয়ং এল্‌ম্‌হার্স্ট শেরবুর্গে জাহাজ ধরবার আগে নবপ্রকাশিত বইটি লন্ডন থেকে কিনে এনেছিলেন— হয়তো রবীন্দ্রনাথের অনুরোধমতোই কিনে এনেছিলেন। তাই কি আন্দেস্ জাহাজে রওনা হওয়ামাত্র এমন দুর্বারভাবে আরম্ভ হয়ে গেলো কবির আঁকিবুকি?'[১৪৬] তিনি আরও জানিয়েছেন, বিশ্বভারতীর কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারে রক্ষিত একদা রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত সংগ্রহের অন্তর্ভুক্ত Friedrich Ratzel-এর *The History of Mankind* গ্রন্থের তিনটি খণ্ডে 'পৃথিবীর নানা দেশের আদিবাসীদের ধর্ম, আচারব্যবহার, আর্থসামাজিক অবস্থা, শিল্পকলা প্রভৃতি বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা তো আছেই, তা ছাড়াও আছে সাদা-কালো এন্‌গ্রেভিঙে অজস্র ছবি, কিছু রঙিন ছবিও।' ইতিপূর্বে বিভিন্ন চিত্রশালায় দেখা প্রিমিটিভ আর্টের বহু নমুনা ও এইসব বই নাড়াচাড়ার অভিঘাতে রবীন্দ্রনাথের পাণ্ডুলিপির কাটাকুটি একটি বিশিষ্ট আকার নিচ্ছিল, এমন অনুমান কষ্টকল্পনা না-ও হতে পারে। ভিক্টোরিয়া পাণ্ডুলিপির এই কাটাকুটিগুলি সম্পর্কে লিখেছেন :

> এই খাতা আমায় বিস্মিত করল, মুগ্ধ করল। লেখার নানা কাটাকুটিকে একত্র জুড়ে দিয়ে তার ওপর কলমের আঁচড় কাটতে যেন মজা পেতেন কবি। এই আঁকিবুকি থেকে বেরিয়ে আসত সব রকমের মুখ, প্রাগৈতিহাসিক দানব, সরীসৃপ অথবা নানা আবোলতাবোল। সমস্ত ভুল, সমস্ত বাতিল করা লাইন, কবিতা থেকে বহিষ্কৃত সব শব্দ এমনি করে পুনর্জীবিত হতো এক রূপের জগতে, আমাদের দিকে তাকিয়ে যেন স্নিগ্ধ কৌতুকে হাসত তারা, নয়তো তাকিয়ে থাকত একটু বাঁকা মুখে, মেলে ধরত যেন কোনো অজানা প্রাণীর ভয়ংকর দৃষ্টি। কাকুতি করে বললাম, এর কয়েকটি পৃষ্ঠার ছবি তুলতে দিতে হবে আমায়। আমাকে খুশি করবার জন্যে উনি রাজিও হলেন। এই ছোটো খাতাটিই হলো শিল্পী রবীন্দ্রনাথের সূচনাপর্ব। কবিতার

মধ্যে শব্দ খোঁজা ব্যাপারটাকে রেখায় রূপান্তর দেওয়া থেকেই এই শিল্পের জন্ম! তাঁর এই আঁকিবুকিতে (যখন অন্য কিছু ভাবছি বা কোনো উৎকণ্ঠায় আছি তখন যেসব কাটাকুটি করি, ইংরেজরা তাকে বলে doodles) আমি তো মেতে গেলাম। ব্যাপারটায় ওঁকে উশকে দিলাম।[১৪৭]

—যেটি ছিল খেলার ছলে নিজেরই মনের কোনো গহন বাসনাকে রূপ দেবার পদ্ধতিকে আয়ত্ত করার শিক্ষানবিশী, তা-ই কয়েকবছরের মধ্যে প্রকৃত ছবিতে পরিণত হয়েছিল— আর তাকে বিদগ্ধ রসিকসমাজের সামনে উপস্থিত করার অন্যতম কৃতিত্ব ভিক্টোরিয়াও দাবি করতে পারেন।

রবীন্দ্রনাথ চাপাদমালালে ক'দিন কাটিয়েছিলেন, নির্দিষ্ট করে বলার উপায় নেই। তবে 20 Dec [শনি ৫ পৌষ] তারিখে বুয়েনোস আইরেসে লেখা দুটি কবিতা থেকে জানা যায়, ইতিমধ্যে তিনি সদলবলে সেখানে ফিরে এসেছেন। উক্ত কবিতাগুলি হল :

'চিঠি' ['দূর প্রবাসে সন্ধ্যাবেলায় বাসায় ফিরে এনু'] দ্র পূরবী ১৪। ১৩২–৩৭

'বিরহিণী' ['তিন বছরের বিরহিণী জানলাখানি ধরে'] দ্র পূরবী ১৪। ১৩৬–৩৭

পাণ্ডুলিপি থেকে জানা যায়, 'চিঠি' কবিতার 'শ্রীমান দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর কল্যাণীয়েষু' পত্র কবিতাটি মূল কবিতা 'স্বপ্নসম পরবাসে এলি পাশে কোথা হতে তুই'-এর পরে লেখা। সুদূর আর্জেন্টিনায় দেশের অতিপরিচিত ফুল জুঁইকে দেখে আসল কবিতাটি লেখা হয়েছিল, তার পরে দেশ থেকে আসা দিনেন্দ্রনাথ বা আর-কারোর চিঠিতে বা সংবাদপত্রে বাংলাদেশে ব্রিটিশ সরকারের চণ্ডনীতির খবর পড়ে 'মেশিন-গানের সম্মুখে গাই জুঁই ফুলের এই গান' সংযোজিত করে দিয়েছেন তিনি।

অপর কবিতা 'বিরহিণী' তিন বছরের নাতনি নন্দিনীর উদ্দেশে লেখা। লক্ষণীয়, এই পালিতা পৌত্রীটি রবীন্দ্রনাথের জীবনে ও রচনায় যতটা স্থান অধিকার করেছেন, রক্তসম্পর্কের দৌহিত্রী নন্দিতা ততটা গুরুত্ব লাভ করেননি— অথচ তাঁর নৃত্যনাট্যের অভিনয় ও সেবাশুশ্রূষায় নন্দিতার ভূমিকা অনেক সক্রিয়!

সান ইসিদ্রো-তে থাকার সময় ক্রমশ সংক্ষিপ্ত হয়ে আসছিল। এই সময়ের মধ্যেও তিনি পাঁচটি কবিতা লেখেন :

24 Dec [বুধ ৯ পৌষ] 'না-পাওয়া' ['ওগো মোর না-পাওয়া গো, ভোরের অরুণ-আভাসনে'] দ্র পূরবী ১৪। ১৩৭–৩৮

25 Dec [বৃহ ১০ পৌষ] 'সৃষ্টিকর্তা' ['জানি আমি মোর কাব্য ভালোবেসেছেন মোর বিধি'] দ্র পূরবী ১৪। ১৩৯

27 Dec [শনি ১২ পৌষ] 'বীণাহারা' ['যবে এসে নাড়া দিলে দ্বার'] দ্র পূরবী ১৪। ১৪০–৪২

28 Dec [রবি ১৩ পৌষ] 'বনস্পতি' ['পূর্ণতার সাধনায় বনস্পতি চাহে ঊর্ধ্বপানে'] দ্র পূরবী ১৪। ১৪২–৪৪

29 Dec [সোম ১৪ পৌষ] 'পথ' ['আমি পথ, দূরে দূরে দেশে দেশে ফিরে ফিরে শেষে' দ্র পূরবী ১৪। ১৪৪–৪৬

এর পরে রবীন্দ্রনাথ চারটি কবিতা লিখেছেন 'জুলিয়ো চেজারে' জাহাজে য়ুরোপ যাত্রার পথে, যার কথা পরে উত্থাপিত হবে।

21 Dec ও ৭ পৌষ [সোম 22 Dec] রবীন্দ্রনাথ অ্যান্ডরুজ ও কালিদাস নাগকে দুটি চিঠি পাঠান। অ্যান্ডরুজকে লেখেন : 'Tomorrow comes 7th Paus. You can not imagine how my heart aches to be with you all. These days are very precious to me— all the more so, because my store of them is fast coming to its final exhaustion. However, tomorrow I shall join your festival from a distance and try to fill my heart with my yearly provision of *Shanti*.'[১৪৮]

কালিদাস নাগকে লেখা চিঠির সঙ্গে এইসময়ে লেখা কয়েকটি কবিতা পাঠিয়ে লিখেছেন : 'এবারকার কবিতাগুলো যেন স্বপ্নে লেখা— ভালো কি মন্দ তা বুঝতেই পারি নে— যখন খুসি তখন, যেমন খুসি তেমন করে লিখেই গেছি। আমার কবিত্বশক্তির মাপকাঠিহাতে যারা গম্ভীর হয়ে বসে থাকে তারা যে এই বিশ্বের কোনোখানে আছে তা একেবারেই মনে ছিল না। মাঝখানে দীর্ঘ কিছুকাল ভোলবার সময় না দিলে এ কবিতাগুলো সম্বন্ধে আমি নিজেই বিচার করতে পারব না।'[১৪৯] 'অস্বাস্থ্যের ক্লান্তিতে হিজিবিজিলেখার মেজাজে' যে-ধরনের কবিতা লিখছেন তার একটি কৌতুকপূর্ণ নমুনাও লিখে পাঠিয়েছেন তাঁকে :

অস্তিত্বের বোঝা
বহন করা ত নয় সোজা।
পাঠশালে কতকাল পুঁথিদানবের সাথে যোঝা।
ছেঁড়া ছাতা কক্ষে নিয়ে অহোরাত্র পথে পথে খোঁজা
কোনো মাসে জোটে রুজি, কোনো মাসে রুটিশূন্য রোজা।...
একদিন নাড়ী ক্ষীণ বালিসে আলসে মাথা গোঁজা,
ভিটেমাটি বাঁধা রেখে বহু দুঃখে ডেকে আনা ওঝা,—
তহবিল ফুঁকি bill-এ সবশেষে শেষ চক্ষু বোজা॥

9 Jan [শুক্র ২৫ পৌষ] তাঁকেই জাহাজ থেকে লিখেছেন :

শিখা যখন ম্লান হয়, যখন সামনের পথের দিকে মন চল্‌তে চায় না তখন সুদূর পিছনের কথাই মনকে প্রদোষের ছায়ায় ঘনিয়ে ধরে। মৃত্যুর কালো পটের উপর দূরস্মৃতির ছবি স্পষ্ট করে ফুটে ওঠে। তাই আজকাল আমার মনে আমার কিশোরের সেই সব কালের কথা ঘুরে বেড়াচ্চে যে সব কাল দিগন্তের সম্পূর্ণ আড়ালে পড়ে গেছে। সামনের দিকে তাদের কোথাও আর খুঁজে পাওয়া যাবে না। তাই আমার কবিতার মধ্যে তাদের আশ্রয়ের জন্যে স্বপ্নলোক বানিয়েছি। এ খেলার ঠিক মানে তোমরা অনেকে বুঝতে পারবে না... এ কবিতাগুলো এখন ছাপবার দরকার নেই, আমার মৃত্যুর পরে ছাপিয়ো।[১৫০]

তাঁর এই নির্দেশ অবশ্য সম্পাদক ও প্রকাশকেরা মানেননি।

৭ পৌষ উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথ এল্‌ম্‌হার্স্টকে যা বলেন, তিনি তার একটি অনুলেখন প্রস্তুত করেছিলেন। তাঁর জীবনে পিতার দীক্ষাদিনের গুরুত্ব তিনি শান্তিনিকেতন-ভাষণমালা ও অন্যত্র বহুবার বিশদ করে বলেছেন, সুতরাং এখানে তিনি নূতন কথা বিশেষ-কিছু বলেননি। এমন দিনে সেখানে উপস্থিত থাকতে না পারার জন্য আক্ষেপ জানিয়ে তিনি বলেন : 'Our people at Santiniketan are not sceptics. When Christmas comes they feel no great need to kill turkeys, to drink champagne or to take refuge only in dissipation. Their faces beam with a genuine delight as though they had, by the act of all

coming together, plunged into an ocean of joy, and had thereby won a realisation of the true meaning of life.'[১৫১]

24 Dec [বুধ ৯ পৌষ] ভিক্টোরিয়া রবীন্দ্রনাথকে প্রশ্ন করেন তিনি কবি হয়েও কেন ছোটোদের জন্য বিদ্যালয় স্থাপন ও পরিচালনার গুরুভার গ্রহণ করলেন। এল্‌ম্‌হার্স্ট আলোচনাটির অনুলেখন নেন ও সেটি 'Schooling' নামে বিশ্বভারতী কোয়ার্টার্লি-তে [Vol. 29, No.4, pp. 273–79] প্রকাশিত হয়। 20 Nov 1919 রবীন্দ্রনাথ প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশকে ব্রহ্মচর্যাশ্রমের অন্তর্গত একটি পর্যটন-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব দিয়েছিলেন, যেটি কার্যকর করা সম্ভব হয়নি। শিশুকাল থেকে অত্যধিক বই পড়ার নিন্দা করে তিনি প্রায় পুরোনো প্রস্তাবটিরই পুনরাবৃত্তি করে ভিক্টোরিয়াকে বললেন : 'Look at this country of yours, Argentina, with its many varying kinds of climate, of dialect, of manners, its gaucho life still surviving! What is better for boys than to travel, to record facts as they travel, to collect objects for their private museums and thereby to teach themselves.' যথেষ্ট অভিজ্ঞতা ছাড়া তরুণ মন ঠিক বই পড়ার উপযুক্ত হয় না, বই মনকে অনেকটা অলস করে দেয়। ইন্‌কাদের উদাহরণ দিয়ে তিনি বললেন, তাদের কোনো বই ছিল না, এমন-কি তাদের কোনো লিপিই ছিল না— তবুও তাদের বিজ্ঞান, কৃষি, শিল্প ও স্থাপত্যজ্ঞান কিছু কম ছিল না। দেশকে জানার কোনো চেষ্টা না করেই আর্জেন্টিনার শিক্ষিতসম্প্রদায় তাদের সন্তানদের শিক্ষার জন্য য়ুরোপে পাঠিয়ে দেয়। সেক্ষেত্রে তারা দেশের মানুষদের কথা কী করে জানবে! বারো বছর বয়স পর্যন্ত তাদের দেশভ্রমণের ব্যবস্থা থাকা উচিত। 'How can your young people be truly Argentinians until they have travelled over their own land and in each of three years have visited, for a period, one of the three distinct parts of your country? In the season of the year most suitable for walking, let them explore and discover for themselves what a paradise it is.... Must you build so many cages for your young people? Cages in which you stuff them with all kinds of unnatural food? Take them out into the great world where they can collaborate with Nature and with their teachers. Then you will have discovered the perfect way to educate them.' ভিক্টোরিয়া এই সময়ে বলেন, কলম্বিয়ার শিক্ষার্থীরা গত কিছুকাল ধরে এইধরনের শিক্ষা লাভ করছে। কেতকী লিখেছেন, ভিক্টোরিয়া তাঁর পরিণত জীবনে আর্জেন্টিয়ান জাতীয়তার শিকড়সন্ধানে অনুরূপ শিক্ষার পোষকতা করেছেন।[১৫২] এল্‌ম্‌হার্স্ট রবীন্দ্রনাথের বক্তব্যটি 'Schooling' নামে লিখে রাখেন।

পরের দিন 25 Dec [বৃহ ১০ পৌষ] খ্রিষ্টোৎসব উপলক্ষে এল্‌ম্‌হার্স্ট রবীন্দ্রনাথকে এই দিনের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করতে বললে তিনি যা বলেন সেটি লিখে রাখেন, যার সংশোধিত রূপ 'Notes and Comments' নামে ও 'From notes taken in South America of a discourse in response to a request to the Poet to speak on Christmas morning just as he would have spoken, had he been at Santiniketan Asram, on the significance of the Christmas Anniversary' টীকা-সহ বিশ্বভারতী কোয়ার্টার্লি-তে [Jul 1925/ 172–80] মুদ্রিত হয়। এইদিন ভিলা ওকাম্পো-তে পারিবারিক সম্মিলনে ব্যস্ত থাকার জন্য ভিক্টোরিয়া এই আসরে উপস্থিত থাকতে পারেননি।

মনে হয়, মিরালরিও-তে প্রায় কর্মহীন জীবনযাপন করতে বাধ্য হওয়ায় কাঙ্ক্ষিত বিশ্রাম পেলেও রবীন্দ্রনাথ ভিতরে-ভিতরে ক্লান্ত হয়ে পড়ছিলেন। তাই এল্ম্হার্স্টের অনুরোধে খ্রিষ্টোৎসব বিষয়ে বলতে গিয়ে তিনি কিছু কঠিন মন্তব্যও করেছেন। তিনি বললেন, সারা বছর ধরে তিনি ব্যক্তিগত দাবির খুঁটিনাটির মধ্যে আবদ্ধ ছিলেন— সেই কারণেই খ্রিষ্টোৎসবের মতো একটি বড়ো বিষয়ের প্রতি মনকে প্রসারিত করা তাঁর পক্ষে কঠিন হয়ে পড়েছে। এল্ম্হার্স্ট জানেন, শান্তিনিকেতনে তিনি প্রায় প্রতি বৎসর ছাত্র ও সহকর্মীদের কাছে এই বিষয়ে বলেছেন। এর জন্য তাঁর বিশেষ কোনো প্রয়াসের প্রয়োজন হত না। কারণ সাতই পৌষের উৎসবের সময় থেকেই তাঁর মন আধ্যাত্মিকতার এমন এক উচ্চস্তরে আরোহণ করে যে, এই বিশেষ দিনের জন্য তাঁর কোনো প্রস্তুতিরও আবশ্যকতা থাকে না। কিন্তু এখানকার পরিস্থিতি ভিন্ন ধরনের। ...'in this country the very suggestion of the Infinite is, each day, smothered by the surface quality of its enjoyment, or by its pride in wealth and by those customs which go to make up what in the West is called civilisation.' এর ফলে তাঁর মনের উপর এতটা চাপ পড়েছে যে, এখানে অমৃতকে অনুভব করা তাঁর পক্ষে খুবই কঠিন। অনেক লোক আছে যারা যে-কোনো অবস্থার সঙ্গে মানিয়ে নিতে পারে, জীবনের আধ্যাত্মিক অংশের অভাব তারা অনুভব করে না। কাজেই রবীন্দ্রনাথের ঘরমুখো মনের জন্য সহানুভূতি অনুভব করা তাঁদের পক্ষে সম্ভব নয়— কারণ সেই ঘর তো কোনো ভৌগোলিক ঘর নয়, তাঁর চাই শান্তিনিকেতনের মতো জায়গা যেখানে অনন্তের মুখোমুখি দাঁড়ানো অন্তত তাঁর পক্ষে সহজতর। কেতকী সম্ভবত ঠিকই অনুমান করেছেন, ঘরোয়া পারিবারিক উৎসব হলেও রবীন্দ্রনাথ-এল্ম্হার্স্টের মতো সম্মানিত অতিথিদের সেখানে আমন্ত্রণ না-জানানো হয়তো রবীন্দ্রনাথের ভালো লাগেনি, যেখানে শান্তিনিকেতনে ও ভারতের অন্যত্রও উৎসবে আমন্ত্রিত ও অনাহূতের উপস্থিতির ক্ষেত্রে কোনো নিষেধ নেই— আর সেইজন্যই তাঁর বক্তব্যের মধ্যে এতটা অম্লরসের সঞ্চার ঘটেছে।[১৫৩] কিন্তু তৎকালীন আর্জেন্টিনার রক্ষণশীল স্প্যানিশ সাংস্কৃতিক পরিবেশ এবং ওকাম্পো-পরিবারের ততোধিক গোঁড়া বনেদিয়ানার গণ্ডি অস্বীকার করা ভিক্টোরিয়ার মতো স্বাধীনচেতা নারীর পক্ষেও তখন সম্ভব ছিল না তার বহু উদাহরণ আমরা ইতিমধ্যেই লক্ষ্য করেছি!

এইদিন এল্ম্হার্স্ট শান্তিনিকেতনে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়কে একটি দীর্ঘ চিঠি লেখেন— তিনি তখন সেখানেই বাস করছেন। পত্রটি নানা কারণেই মূল্যবান। এল্ম্হার্স্ট রবীন্দ্রনাথের তকালীন মানসিক অবস্থার বর্ণনা দিয়ে লিখলেন :

Gurudev is longing to get back, a number of unfortunate circumstances have combined to make him feel a prisoner here, and the plentiful supply of flies and mosquitoes does not help matters. He is counting the hours until he can board the steamer on 3 Jan.

We have met many interesting people but very few who are at all interested in his international ideals or in his attitude to world problems, ideals and ideas. This country is so rich in material and natural resources that everyone seems bent upon gathering what they can in order to build a more complicated and magnificent prison house for themselves than they have already.

...I watch so many people come within range of Gurudev, some expecting to be able to label him and to pigeonhole him in the collection of their acquaintances, as a poet, a philosopher, or an educationist.

If he begins to show any of those aspects of his nature for which they are not prepared they are surprised, shocked or disgusted— the eternal child in him, the lover, the singer, the actor, the international statesman, or the standard bearer of humanity. It is so with Visva-Bharati. Men expect it to be this or that, to fit some ready-made conception, to run according to some set of rules of which they already have experience, they want it to run in some special groove & forget that because it is Visva, no need, no problem, no joy or suffering of humanity can be shut out beyond its ken....

Gurudev is well but complains rather more frequently that I like about his tired feeling. I only hope that Italy will not be too cold— his reception there will I think give him the kind of warming he most needs and he recognizes now that he must take more care of himself.[১৫৪]

পেরু সরকারের প্রতিশ্রুতি ছিল, তাদের উৎসবে যোগ দিলে বিশ্বভারতী প্রচুর আর্থিক সাহায্য লাভ করবে — কিন্তু যাত্রা বাতিল করে রবীন্দ্রনাথ আর্জেন্টিনাতেই থেকে যাওয়ায় সেই সুযোগ পাওয়া যায়নি। চিকিৎসকদের নিষেধাজ্ঞা মান্য করে তিনি বুয়েনোস আইরেসে কোনো সভায় ভাষণ দেননি বটে, কিন্তু মিরালরিও-র টিপা গাছের ছায়ায় তিনি বহু আর্জেন্টিনাবাসীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন— সেখানে বিশ্বভারতী সম্পর্কে নিশ্চয়ই আলোচনা হয়েছিল, কিন্তু সেখানকার কোনো ধনী বিশ্বভারতীর সাহায্যে এগিয়ে এসেছেন বলে জানা যায়নি। প্রায় তিনমাস রবীন্দ্রনাথকে নিরিবিলিতে বিশ্রামে রাখার খরচ একা ভিক্টোরিয়া বহন করেছেন নিজের হিরের টায়রা বিক্রি করেও। তাঁর অনুরোধেই ইতালীয় জাহাজ-কোম্পানির আর্জেন্টিয়ান প্রেসিডেন্ট রবীন্দ্রনাথ ও এল্‌ম্‌হার্স্টের জন্য বিনামূল্যে *Giulio Cesar*e জাহাজে ক্যাবিনের ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। সুতরাং আর্জেন্টিনায় বসবাসের এই শেষ লগ্নে এই দেশ ও দেশবাসীর সম্পর্কে ক্ষোভ অনুভব করা রবীন্দ্রনাথের পক্ষে অস্বাভাবিক নয়।

30 Dec [মঙ্গল ১৫ পৌষ] বিকেলে আর্জেন্টিনার প্রেসিডেন্ট অলবিয়ার রবীন্দ্রনাথকে বিদায় জানান। পরের দিনের *The Standard* লেখে : 'Sir Rabindranath Tagore, who sails for Europe, on Jan. 3rd, called at Government House yesterday afternoon to take leave of His Excellency the President of the Republic. The visitor who was accompanied by his Secretary and by Sra. Victoria Ocampo de Estrada, conversed for a long while with Dr. Alvear and withdrew from Government House at 10 o'clock.' এল্‌ম্‌হার্স্ট এই কথাবার্তার কোনো বিবরণ রক্ষা করেছিলেন কি না জানা যায়নি।

La Nacion [3 Jan] থেকে জানা যায়, 2 Jan 1925 [শুক্র ১৮ পৌষ] আর্জেন্টিনা বিশ্ববিদ্যালয় বিশিষ্ট অতিথিদের উপস্থিতিতে রবীন্দ্রনাথকে বিদায়-সংবর্ধনা জ্ঞাপন করে। তিনি অনেকের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন।

একজন *The Post Office* সম্পর্কে প্রশ্ন করলে রবীন্দ্রনাথ নাটকটির মর্মকথা বুঝিয়ে বলেন। একজন রুডিয়ার্ড কিপলিঙের সাহিত্য সম্পর্কে তাঁর মতামত জানতে চাইলে রবীন্দ্রনাথ প্রশ্নটি এড়িয়ে যান, তিনি বলেন, একজন সাহিত্যিকের অপর একজনের সম্পর্কে মন্তব্য করা উচিত নয়। তিনি আবার আর্জেন্টিনায় আসবেন কিনা জানতে চাইলে তিনি বলেন, এটি বলা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়, অন্যত্রও তাঁর বহু কাজ আছে। 'And so saying, he took his leave, erect, with priest-like solemnity, going down the University staircase with the unbelievably springy gait of a young man.'[১৫৫]

The Nacion [4 Jan]-এর মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথ আর্জেন্টিনার উদ্দেশে তাঁর বিদায়বার্তা প্রচার করেন। তিনি বলেন, আর্জেন্টিনার মর্মসত্যটি তাঁর কাছে পৌঁছেছে প্রধানত এখানকার দেশীয় সংগীতের মধ্যবর্তিতায়। অনেকের গিটারবাদন শুনে তিনি আর্জেন্টিনা ও ভারতের লোকসংগীতের মধ্যে আশ্চর্য সাদৃশ্য লক্ষ্য করে মুগ্ধ হয়েছেন। অধ্যাপক সারাভিয়া ও Senorita de Anido-র বাজনা শুনেও তাঁর বাল্যস্মৃতি মনে পড়ে গেছে। আসলে বিভিন্ন দেশের লোকশিল্পের মধ্যে এক অন্তর্লীন সাম্য আছে, পার্থক্য রচিত হয়েছে উচ্চাঙ্গ শিল্পের রূপায়ণে। ইন্‌কাদের শিল্প বিষয়ে তাঁর প্রগাঢ় আগ্রহ ও তাদের প্রায় সার্বিক বিনষ্টিতে তাঁর বেদনার কথাও তিনি ব্যক্ত করেন। কিছু মূক নমুনা ছাড়া সেই প্রাচীন মানবসভ্যতার প্রায় কিছুই অবশিষ্ট নেই, Senor Barreto-র সংগ্রহে রক্ষিত কেচুয়া [Quechua] মূর্তি ও বস্ত্রশিল্পের নিদর্শন দেখে তিনি মুগ্ধ হয়েছেন।[১৫৬]

3 Jan [শনি ১৮ পৌষ] তিনি ও এল্‌ম্‌হার্স্ট ইতালিয়ান জাহাজ জুলিয়ো সিজারে-তে য়ুরোপের উদ্দেশে রওনা হন। ভিক্টোরিয়া রবীন্দ্রনাথের আরামের জন্য মিরালরিও-তে তাঁর ব্যবহৃত সোফাটি জাহাজে তুলে দেওয়ার দাবি তোলেন। ক্যাবিনের দরজা দিয়ে সেটি ঢুকছিল না বলে দরজার কব্‌জা খুলে তাকে ঢোকানো হয়। অনেক পথ ঘুরে সেটি শান্তিনিকেতনে পৌঁছয় ও রবীন্দ্রনাথ সারাজীবন সোফাটি ব্যবহার করেছেন ও মৃত্যুর কিছুকাল আগে তার উদ্দেশে দুটি কবিতা লেখেন— 'শূন্য চৌকির পানে চাহি, / সেথায় সান্ত্বনালেশ নাহি' [শেষলেখা ২৬। ৪১, 26 Mar 1941] ও 'বিদেশের ভালোবাসা দিয়ে / যে প্রেয়সী পেতেছে আসন / চিরদিন রাখিবে বাঁধিয়া / কানে কানে তাহারি ভাষণ' [ঐ। ৪২, 6 Apr 1941]।

রবীন্দ্রনাথের আর্জেন্টিনা ত্যাগের বিবরণ প্রকাশ করেছে একাধিক সংবাদপত্র। *The Standard* [4 Jan]-এর বিবরণটি এইরূপ :

Sir Rabindranath Tagore, the distinguished Indian poet, who has spent a couple of months in Argentina, left yesterday morning for Europe by the Italian liner Giulio Cesare.

Sir Rabindranath arrived at the Docks about 10 o'clock, accompanied by Sra. Victoria Ocampo de Estrada and by his Secretary, Mr. L.K. Elm[h]irst. His arrival was greeted with curiosity by the numerous persons who had assembled, to bid adieu to their friends, most of whom had never before beheld the austere and mystic figure of the distinguished poet.

এইদিনের তারিখে পরের দিনে পৌঁছনো রবীন্দ্রনাথের উদ্দেশে প্রেরিত ভিক্টোরিয়ার একটি রেডিয়ো-টেলিগ্রাম প্রশান্তচন্দ্র-নির্মলকুমারী মহলানবিশ-সংগ্রহে পাওয়া গেছে, তাতে লেখা : 'TOMAKE BHALO BASI - VIJAYA'।

ভিক্টোরিয়ার একদিকে সেবাযত্ন ও অন্যদিকে মানঅভিমানের বন্ধন থেকে মুক্তি পেয়ে রবীন্দ্রনাথ ও এল্‌ম্‌হার্স্ট দুজনেই স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছেন। এই মনোভাবটি সর্বাধিক স্পষ্টভাবে প্রকাশিত হয়েছে ভাবী পত্নী ডরোথিকে লেখা এল্‌ম্‌হার্স্টের 6 Jan-এর পত্রে; তিনি লেখেন : 'I can't say I was sorry to depart... Our hostess was quite— next to the poet himself— the most difficult person I have ever come across,— I felt now and then as if I was in charge of a madhouse.' ভিক্টোরিয়ার প্রকৃতি ও রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের রূপটি তিনি নিপুণভাবে চিত্রিত করে লিখেছেন :

Besides having a keen intellectual understanding of his books, she was in love with him — but instead of being content to build a friendship on the basis of intellect, she was in a hurry to establish that kind of proprietary right over him which he absolutely would not brook. The more she strove and suffered, the further away she seemed to be. She seemed so completely lacking in just those womanly capacities with which she might have given a service that would have been welcome, and in fact she was a bundle of prides, intellectual, aristrocratic and physical, against which, and their ferocious hold upon her nature, she was constantly at war. For her, then, I was either bridge or barrier, obstacle or convenience as occasion turned out. Being her guests didn't make matters easier, nor the fact that at a time when he was ill and needed just the refuge that she was able and delighted to give.[১৫৭]

ওকাম্পোকে লেখা রবীন্দ্রনাথের 5 Jan-এর পত্রের মধ্যে অবশ্য মিরালরিও-র বিতর্কের সুরটি বর্তমান। তিনি প্রথমেই লিখেছেন, ভিক্টোরিয়ার দেওয়া আরামকেদারার আশ্রয়ে দিনরাত্রির অধিকাংশ সময় কাটিয়ে বোদলেয়ারের আসবাবের কবিতার লিরিক্যাল তাৎপর্য তিনি বুঝতে পেরেছেন। এখান থেকে তিনি চলে গিয়েছেন নারীপুরুষের দ্বন্দ্ব-বিতর্কে। কিন্তু আসল মনের ভাব ব্যক্ত করলেন 6 Jan [মঙ্গল ২২ পৌষ] রাণু অধিকারীকে লেখা চিঠিতে। রবীন্দ্রনাথের 22 Sep 1924-এর পত্র-প্রসঙ্গে আমরা রাণুর একটি তারিখহীন দীর্ঘ পত্র থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছিলাম; ডার্টিংটন-সংগ্রহশালায় রক্ষিত মূল পত্রটির প্রতি পৃষ্ঠায় সম্ভবত পত্রপ্রাপ্তির যন্ত্রমুদ্রিত তারিখ লেখা আছে '23 DIC 1924'। যদি তা-ই হয়, পত্রটি রবীন্দ্রনাথের তৎকালীন মানসিক বিক্ষোভে আরও ইন্ধন জুগিয়ে থাকতে পারে, আর তা হলে বর্তমান চিঠিটির অন্তরালবর্তী একটি বক্র মনোভঙ্গির তাৎপর্য বোঝা সহজ হয়। এই পত্রে তিনি রাণুর উক্ত চিঠির চিত্তক্ষোভ বিষয়ে একটি বাক্যও ব্যয় করেননি, কিন্তু অভিযোগ করেছেন রাণুরই মতো অপরিণতবুদ্ধি, কিন্তু পরিণতবয়স্ক এক নারীর অবুঝ আসক্তির প্রতি। প্রাথমিকভাবে সমসাময়িক বিভিন্ন ঘটনার বিবরণ দিয়ে তিনি লিখেছেন :

দক্ষিণ আমেরিকার বন্ধন কাটিয়ে বেরিয়ে পড়েচি। জাহাজ এখনো তারই কূলে কূলে চলেছে। আজ সকালে ব্রেজিলের এক সহরের সামনে আমাদের জাহাজ এসে দাঁড়িয়েচে। আজ অর্দ্ধরাত্রে পৌঁছবে রিয়ো ডি জেনৈরোতে। তার পরে মাডেবা দ্বীপে, তার পরে বার্সেলোনা, তার পরে জেনোয়া। দেশ থেকে বহু দূরে ছিলুম, ডাক পৌঁছতে দেড় মাস লাগ্‌ত। এখন দেশের দিকে চলেচি বলে মন খুসি আছে। বুয়েনোস আইরেস থেকে বেরিয়ে পড়বার জন্যে খুব চেষ্টা করেছিলুম, কিন্তু নানা চক্রান্তে কোনোমতেই ঘটে উঠল না। ··· ডাক্তার বল্লে,··· পাহাড় পেরোতে গেলে হাঁপিয়ে মরব আর সমুদ্র পেরোতে গেলে কাঁপুনি ধরিয়ে মারবে। দুটোর মধ্যে কোনটাই স্পৃহনীয় নয়। অতএব পলায়ন ছাড়া গতি নেই। জাহাজের সংবাদ নিয়ে জানা গেল, পর বৎসরে তৃতীয় জানুয়ারিতে আটলান্টিক পাড়ি দেবার জাহাজ পাওয়া যাবে। আমার বিশ্বাস এর মধ্যে কিছু ষড়যন্ত্র ছিল। জাহাজ শীঘ্র পাওয়া গেলে আমাকে ধরে রাখবার মৎলব ব্যর্থ হত। ··· অতএব সুদীর্ঘকাল বিনা প্রয়োজনে আমি বন্দী হয়ে রইলুম। পাখীর খাঁচা

যদি খুব করে ঢাকা দেওয়া যায়, তাহলে অবিরাম গান গেয়ে সে আত্মবিনোদন করে। আমিও প্রতিদিন পায়ের শিকল নাড়া দিয়ে সেই তালে কবিতা লিখতে লাগলুম। অক্টোবর নবেম্বর ডিসেম্বর এই তিন মাসে আমি বোধহয় ৬০ খানা কবিতা লিখেছি। শুধু কলম চলেছিল তাও নয়, মুখও বন্ধ ছিল না। যদিও প্রকাশ্য সভায় বক্তৃতা দেওয়া ডাক্তারের নিষেধ ছিল তবু দলে দলে যারা আমার বাড়িতে আস্ত, তারা বক্তৃতা আদায় করে যেত। একটা আশ্চর্যের বিষয় এই যে, এই সুদূর দেশে আমাকে প্রায় সকলেই জানে, সকলেই ভালোবাসে। আমার লেখার এত বিবিধ তর্জমা ও আলোচনা আর কোথাও হয়েছে কিনা জানি নে। এখানে আমি সকলের ঘরের লোকের মত ছিলুম। আমাকে ভালো করে দেখবার অবকাশ এরা পায় নি, কিন্তু এদের দেশে আমি যে ছিলুম এতেই এরা খুসি। বিদেশের কাছে আমি যে রকম প্রচুর আদর পেয়েছি এমন আমি দেশের লোকের কাছে পাই নি।[১৫৮]

এই দিনেই প্রোষিতভর্তৃকা ভিক্টোরিয়া রবীন্দ্রনাথকে লেখেন, তিনি গতকাল তাঁর বাড়ি মিরালরিও-তে গিয়েছিলেন, তিনি স্বীকার করেন সেটা খুব বুদ্ধির কাজ হয়নি। গোধূলির আলো সোপান বেয়ে নেমে এসেছে, তাঁর শূন্য ঘরেও সে-ই অপেক্ষমাণ। জুলিয়ো চেজারে-তে তাঁকে বিদায় দেওয়ার পরে যে ভয়ানক শূন্যতা তাঁকে গ্রাস করেছে, ভেবেছিলেন ঐ বসবাসের স্মৃতিবিজড়িত বাড়িটিতে ঘুরে বেড়ালে হয়তো একটু সান্ত্বনা পাওয়া যাবে। But *things* can't comfort. They only make everything worse. There arose in my heart such a terrible longing for you, such a yearning (that could not be quieted) for all that I had had and all that I had lost, that I could not bear it. The emptiness in my heart repeated itself in the walls, in the trees, in the river, in the sky. There was no life anywhere.'[১৫৯] 'things' শব্দটি নিম্নরেখাঙ্কিত, সম্ভবত বোদলেয়ারের আসবাবের কবিতা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের সমালোচনা মনে করিয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্যে। পত্রাংশটি আমাদের বিদ্যাপতির মাথুর-কবিতার 'সূন ভেল মন্দির সূন ভেল নগরী। / সূন ভেল দস দিস সূন ভেল সগরী' ইত্যাদি ছত্রগুলি স্মরণ করিয়ে দেয়।

রবীন্দ্রনাথ 13 Jan [মঙ্গল ২৯ পৌষ] তাঁকে লেখেন, যতই তিনি দূর থেকে দূরান্তরে যাচ্ছেন ততই বিচ্ছেদের পটভূমিকায় সান ইসিদ্রোর ছবিটি তাঁর কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠছে। 'For me the spirit of Latin America will ever dwell in my memory incarnated in your person.'[১৬০] ভিক্টোরিয়ার বদান্যতায় তিনি অভ্যর্থনা সমিতির সাজানো আতিথ্যের পরিবর্তে তাঁর ব্যক্তিগত সান্নিধ্যের মাধ্যমে দেশটিকে চেনার সুযোগ পেয়েছেন। তবে ভাষার ব্যবধানে ভিক্টোরিয়া যেমন তাঁর গভীর চিন্তাগুলিকে যথাযথ অভিব্যক্ত করতে পারেননি, তিনি নিজেও বুঝতে পারেননি তাঁর মনের ঐশ্বর্যকে। যতদিন তাঁরা কাছাকাছি ছিলেন তাঁরা কেবল কথা নিয়ে খেলা করেছেন এবং পরস্পরকে বোঝার সুযোগগুলি হাসাহাসি করে উড়ে যেতে দিয়েছেন। এর পরে তিনি যা লেখেন সেই অংশটি আমরা ইতিপূর্বে 'চাবি' কবিতার প্রসঙ্গে উদ্ধৃত করেছি।

আগেই বলা হয়েছে, পত্রটি আমাদের সুনিশ্চিতভাবে রাণুকে লেখা পূর্বোদ্ধৃত চিঠিটির কথা মনে করিয়ে দেয়। তবে ভিক্টোরিয়ার মধ্যে বীরপূজার একটি প্রবৃত্তি খুবই সক্রিয় ছিল। তাই রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সাক্ষাৎকারে অধিকার-অনধিকারের দ্বন্দ্বে তিনি যতই পীড়িত হন-না-কেন, কাউন্ট হারমান কাইজারলিঙ প্রভৃতি বিখ্যাত ব্যক্তিদের সান্নিধ্য লাভের সুযোগ পেয়ে তাঁর রবীন্দ্রনাথের প্রতি টান স্বতই এই মাত্রায় আর থাকেনি— ফলে তাঁরা আজীবন বন্ধুই থাকতে পেরেছেন। মাঝে 1930-তে ফ্রান্সে আবার একবার তাঁদের দেখা হয়েছিল, তখন পুনর্জাগরিত আকর্ষণে রবীন্দ্রনাথের আঁকা ছবির প্রদর্শনীর আয়োজন করতে তিনি আরও-একবার 'স্বর্গমর্ত্য তোলপাড়' করেছিলেন! কিন্তু সে অন্য-এক কাহিনি, যা যথাস্থানে বর্ণিত হবে।

উপরে উল্লিখিত পত্রটিতে 17 Jan [শনি ৪ মাঘ] তারিখে লেখা একটি সংযোজন আছে, যাতে রবীন্দ্রনাথ ভিক্টোরিয়াকে জানান : 'Tomorrow we shall reach Barcelona and the day after Genoa. I am about to leave my easy chair in my cabin. That chair has been my real nest for these two weeks giving me rest and privacy and a feeling that my happiness is of value to somebody.'[১৬১] আরামকেদারাটি অবশ্য শান্তিনিকেতনেও তাঁর আরামের উপকরণ হিসাবে আমৃত্যু ব্যবহৃত হয়েছিল। উল্লেখ্য, উক্ত তারিখে রবীন্দ্রনাথ 'জুলিয়ো চেজারে' জাহাজে তাঁর শেষ কবিতাটি লেখেন— যেটি ভিক্টোরিয়ার সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের একটি কৌতুকে ভরা প্রকাশ বলে গণ্য হতে পারে :

'বদল' ['হাসির কুসুম আনিল সে, ডালি ভরি'] দ্র পূরবী ১৪। ১৫২–৫৩; 'কত রঙে রং করা / মোর সাথে ছিল দুখবাদলের ভার' প্রভৃতি পাঠান্তরের মধ্য দিয়ে এর কাব্যরূপটি গড়ে উঠেছিল। জ্যৈষ্ঠ ১৩৩২-এ এই পাণ্ডুলিপিতেই [Ms. 464] কবিতাটি গীতিরূপ লাভ করে : 'তার হাতে ছিল হাসির ফুলের হার' দ্র গীত ২। ৩৬৯; স্বর ৩১। এই রূপটি আমাদের অধিকতর পরিচিত।

'জুলিয়ো চেজারে' জাহাজে এর আগে রবীন্দ্রনাথ আরও তিনটি কবিতা রচনা করেন :

9 Jan [শুক্র ২৫ পৌষ] 'মিলন' ['জীবন-মরণের স্রোতের ধারা'] দ্র পূরবী ১৪। ১৪৬–৪৮

10 Jan [শনি ২৬ পৌষ] 'অন্ধকার' ['উদয়াস্ত দুই তটে অবিচ্ছিন্ন আসন তোমার'] দ্র পূরবী ১৪। ১৪৮–৫০

16 Jan [শুক্র ৩ মাঘ] 'প্রাণগঙ্গা' ['প্রতিদিন নদীস্রোতে পুষ্পপত্র করি অর্ঘ্য দান'] দ্র পূরবী ১৪। ১৫১–৫২

18 Jan [রবি ৫ মাঘ] জুলিয়ো চেজারে জাহাজ স্পেনের বার্সিলোনা বন্দরে পৌঁছলে রবীন্দ্রনাথ ও এল্‌ম্‌হার্স্ট সেখানে অবতরণ করেন [এইদিন এল্‌ম্‌হার্স্ট ওকাম্পোকে লিখেছেন : '...by chance in Barcelona today we met a Madame Chauvet— she's Italian. Chauvet her maiden name,— & she translated a number of G's books into her native language— she married the manager of the Lycee (Barcelona)— & took us round the city.') এবং জানান, ইতালিতে রবীন্দ্রনাথের অভ্যর্থনার জন্য বিরাট আয়োজন করা হয়েছে।[১৬২]

রবীন্দ্রজীবনী-কার লিখেছেন : 'কবি ও এল্‌ম্‌হার্স্ট জেনোয়া পৌঁছিলেন ২১ জানুয়ারি— জাহাজে ১৮ দিন কাটে।' তাঁর মতে, 4 Jan তাঁরা বুয়েনোস আইরেস ত্যাগ করে য়ুরোপ যাত্রা করেন।[১৬২], দুটি তথ্যই ঠিক নয়। আমরা আগেই জেনেছি, যাত্রা শুরুর তারিখ 3 Jan, ওকাম্পোকে লেখা এল্‌ম্‌হার্স্টের চিঠি থেকে জানা যায় তাঁরা বার্সিলোনা পৌঁছন 18 Jan [রবি ৫ মাঘ]। ইতালির জেনোয়া বন্দরে পৌঁছনোর তারিখ 19 Jan [সোম ৬ মাঘ], রথীন্দ্রনাথ তাঁর ডায়ারি [Ms. 275 (B)]-তে লিখেছেন, এইদিন সেখানে তাঁদের পিতার সঙ্গে দেখা হয় [সুপ্রিয়া রায় উল্লিখিত পাণ্ডুলিপি ও Ms. 275 (F) পাণ্ডুলিপিটি অবলম্বনে রথীন্দ্রনাথের 'ডায়ারি'র শেষাংশটি টীকা-সহ প্রকাশ করেছেন রবীন্দ্রবীক্ষা-র ৩৭তম সংকলনে (২২ শ্রাবণ ১৪০৭। ৭৯–৮৮)। এ ছাড়া রোম বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃতের অধ্যাপক Carlo Formichi-রচিত ইতালিয়ান ভাষায় লেখা *'India e Indiani' [1929]* গ্রন্থের রবীন্দ্রনাথ-সম্পর্কিত অংশের Mario Prayer-অনূদিত ইংরেজি অনুবাদ 'On Tagore'

রবীন্দ্রবীক্ষা ৩৯ সংকলন (২২ শ্রাবণ ১৪০৮, পৃ৩১—৫০)-এ মুদ্রিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের এবারের ইতালি ভ্রমণের ইতিবৃত্ত প্রধানত এই দুটি রচনার সাহায্যে বর্ণিত হয়েছে।] রথীন্দ্রনাথ লিখেছেন :

19th January 1925/ Father arrived from Buenos Aires this morning at 11 a.m. by the Italian boat *Giulio Cesare.* We had arrived at Genoa the previous night. Prof. Formichi from Rome and Mr. and Mrs. Hogman (Andree) from Paris had also come at the same time and we all met next morning and went down to the wharf. With great difficulty permission was obtained to go on board and then we all rushed to meet Father. The boat was one of the largest on this service and very luxuriously fitted up. Father looked just a little tired—otherwise he seemed to have recovered from his last illness and was very glad to see us all again. Poupee delighted his heart. She began to prattle as soon as she saw him.[১৬৩]

তিনি লিখেছেন, অধ্যাপক ফর্মিকি চেষ্টা করেছেন যাতে রবীন্দ্রনাথের আগমন-সংবাদ যথেষ্ট প্রচারিত না হয়, তাহলে তিনি নিশ্চিন্তে দু'একদিন জেনোয়ায় বিশ্রাম নিয়ে তার পরে আনুষ্ঠানিক আমন্ত্রণ গ্রহণ ক'রে ইতালি সফর শুরু করতে পারেন। লোকেরা যখনই তাঁর আসার খবর জানতে পারবে তখনই টেলিগ্রাম ও চিঠিতে তিনি ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠবেন ও বিভিন্ন শহরে অভ্যর্থনা সমিতি গড়ে তাঁকে নিমন্ত্রণ করা আরম্ভ হবে। পিতার স্বাস্থ্যের অবস্থা বিষয়ে উদ্বিগ্ন ছিলেন বলে রথীন্দ্রনাথ লন্ডন থেকে ড ফর্মিকিকে জানিয়েছিলেন, তাঁর সফরসূচি যেন খুব পাকাপাকি ভাবে তৈরি না করা হয়। অবশ্য রবীন্দ্রনাথ বেশি দেরি না করে তাড়াতাড়ি সফর শুরু করতে চাইছিলেন। মিলানের ডিউক গ্যালারত্তি স্কটি [Gallaratti Scotti] তাঁর প্রতিনিধি ডাঃ জানুসিকে [Dr. Zanussi] পাঠিয়ে দেন এবং রবীন্দ্রনাথ, ফর্মিকি, এল্‌ম্‌হার্স্ট ও রথীন্দ্রনাথ পরামর্শ করে একটি বিস্তৃত সূচি তৈরি করে তাঁকে জানিয়ে দেন। ফর্মিকি লিখেছেন : 'Dr. Alberto Poggi, a strong-willed young physician and a passionate student of Indology, did his best to help me accord a worthy reception to the Poet, and make his short stay in Genoa agreeable.' এরপর তাঁদের শহর ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চল ঘুরিয়ে আনা হয়। ফিরে আসার পরে রবীন্দ্রনাথ আর্জেন্টিনার জনসাধারণের উদ্দেশে কৃতজ্ঞতাসূচক একটি বার্তা লিখে সংবাদপত্রে প্রকাশের জন্য পাঠিয়ে দেন।

ফর্মিকি যদিও জেনোয়ায় রবীন্দ্রনাথের আগমনের খবর গোপন রাখতে চাইছিলেন, তবু কোনোভাবে সংবাদ পেয়ে সন্ধ্যাবেলা স্থানীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেসিডেন্ট ও কয়েকজন এসে মাৎসিনির শহরে তাঁকে স্বাগত জানান। যেহেতু তাঁদের কেউই ইংরেজি জানতেন না তাই সাক্ষাৎকারটি ক্ষণস্থায়ী হয়।

এটা আগেই ঠিক হয়েছিল যে, 20 Jan সকালবেলা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিল্পকলার অধ্যাপক এসে তাঁদের সকলকে শহরের শিল্পবস্তুগুলি দেখিয়ে আনবেন। একজনের পরিবর্তে তিনজন আসেন ও একটি বড়ো গাড়িতে করে শহরের প্রাচীন অঞ্চলগুলি দেখা হয়। আমেরিকান ভ্রমণকারীদের মতো এইরকম ঘুরে বেড়ানো রবীন্দ্রনাথের ভালো লাগেনি। সন্ধ্যাবেলা দর্শনার্থীদের ভিড়ে তিনি অস্থির হয়ে ওঠেন। কয়েকজন তাঁর কবিতায় সুর দিয়ে শোনাতে আসেন। তিনি একজনের গান শোনেন, কিন্তু কবিতার অর্থ না বুঝে দেওয়া অদ্ভুত সুর তাঁকে খুশি করতে পারেনি।

রথীন্দ্রনাথ লিখেছেন : 'Prof. Formichi suggested that a message of a few words for Father on his arrival in Italy would be much appreciated so father wrote a few words and handed it over to him. He was very pleased and said the message should be published in English without being translated— as that would spoil it.' রবীন্দ্রনাথের সেই বাণীটি ফর্মিকি তাঁর রচনায় উদ্ধৃত করেছেন : 'In far away East, where I have always lived, I knew since my early youth how beautiful Italy was, the beloved country of the poets. It had always been my dream to be able one day to come to her door and offer my homage. Finally I have reached there, and I am sure that I shall go back to my country with my heart filled by her sun and her love. I am here to have the honour to be acknowledged by her as one of the poets who love her, and to whom she has granted the favour of a gracious smile.'

21 Jan [বুধ ৮ মাঘ] সকাল সাড়ে ন'টার ট্রেনে সকলে মিলানের উদ্দেশে রওনা হয়ে দুপুর দুটোয় সেখানে পৌঁছন। তার আগে রবীন্দ্রনাথ এইদিন ভিক্টোরিয়াকে একটি টেলিগ্রাম পাঠান : 'I was your guest on board Cesare I felt there your ministration of lovel Rabindranaths'[১৬৪] এইদিন জেনোয়া থেকে তাঁর রোটেনস্টাইনকে লেখা [দ্র *Imperfect Encounter*/ 311–12, No. 155] ও শান্তা দেবীকে লেখা [দ্র চিঠিপত্র ১২। ২৪৮–৪৯, পত্র ২] দুটি পত্র পাওয়া গেছে। দুটি পত্রেই পেরুযাত্রা ও তার পরিণতির বিবরণ দিয়ে রবীন্দ্রনাথ জানিয়েছেন, আগামী 15 Feb [৩ ফাল্গুন] তিনি ভারতের উদ্দেশে রওনা হবেন, 'আশা করি কোনো কারণে আর তারিখ বদল হবে না।' কিন্তু আবার অসুস্থতার জন্য তারিখ পরিবর্তন করতে হয় ও 'ক্রাকোভিয়া' জাহাজে 4 Feb [২২ মাঘ] তিনি স্বদেশাভিমুখে রওনা হন।

রবীন্দ্রনাথ বিভিন্ন প্রসঙ্গে বারবার উল্লেখ করেছেন যে, ইতালিবাসীর বিশেষ আমন্ত্রণেই তিনি দেশে ফেরার পথে সেখানে কিছুদিন কাটাতে মনস্থ করেছিলেন, রোটেনস্টাইনকে লেখেন : 'If I were not tied by my promise I should have straight gone back to India.' মনে হয়, এই আমন্ত্রণের সূচনা হয়েছিল 1923-তে শান্তিনিকেতনে— P.A. Waring ও Melvin L. Brorby নামক দুজন ব্যক্তি সেখানে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করেন ও তাঁকে ইতালিতে নিয়ে যাবার জন্য সচেষ্ট হন। এঁরা 1 Sep তাঁকে জানান : 'Since talking with you we have written to Doctor Roberto Assagioli of Florence [a student of psychotherapy and practicing doctor] of whom we spoke to you, and he now writes what he has been able to do to further our plan. He has been to Rome where he has talked to Prof. Formichi, Prof. of Sanskrit at the University, and found him most enthusiastic. Both then made further investigations and now they believe that financial aid is forthcoming from the Italian government.... The men in Florence and in Rome of whom we spoke to you probably represent the best undercurrent of fine spirit in Italy today. It is these men who look forward to your coming to their country in 1924.'[১৬৫] অবশ্য শেষ পর্যন্ত তাঁর প্রতিশ্রুতি রক্ষিত হল Jan 1925-এ।

অবশ্য এর পাশাপাশি ফর্মিকিও আলাদাভাবে রবীন্দ্রনাথকে ইতালিতে আনার চেষ্টা করছিলেন। সংস্কৃত ও ভারতবিদ্যার ছাত্র হিসাবে তিনি স্বপ্ন দেখতেন ভারতে আসার। অর্থাভাবে তখনই সেই স্বপ্নপূরণ না হলেও তিনি লন্ডনে স্বামী বিবেকানন্দ, ইতালির বোলোনে প্রভু দত্ত স্বামী, রোমে আইনজ্ঞ ডি.জে. ইরানি, কালিদাস নাগ প্রভৃতির সঙ্গে আলাপপরিচয় করেন। শেষোক্ত দুজন, বিশেষত কালিদাস নাগের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠতার সুবাদে সেই পরিচয়টিই কার্যকর হয়। তিনি জাপান থেকে প্রত্যাবর্তনের পথে সুয়ামারু জাহাজ থেকে ফর্মিকিকে জানান, দক্ষিণ আমেরিকা থেকে আমন্ত্রণ পেয়ে যাত্রাপথে আগামী অক্টোবর মাসে রবীন্দ্রনাথ স্পেন ও ইতালিতে যেতে পারেন, তাঁরও যাত্রাসঙ্গী হওয়ার কথা। উৎসাহিত ফর্মিকি শিক্ষামন্ত্রী অধ্যাপক-বন্ধু Uberto Pestalozza-র কাছে দরবার করেন রবীন্দ্রনাথের জন্য সরকারি আমন্ত্রণ সংগ্রহের জন্য, কিন্তু তাঁকে ব্যর্থ হতে হয়। সেই সময়ে মিলানের এক সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক Guido Cagnola সাহায্যার্থে এগিয়ে আসেন। তাঁদের আহ্বানে সম্মতি জানিয়ে 20 Aug 1924 রবীন্দ্রনাথের টেলিগ্রাম পৌঁছয়: 'Shall visit Italy on my way back from South America next winter— Tagore'.

জেনোয়া থেকে ট্রেনে মিলানে আসার পথে রবীন্দ্রনাথ ফর্মিকির কাছে ইতালির রাজনৈতিক পরিস্থিতি বিষয়ে জানতে চান। ফর্মিকি বলেন, প্রথম মহাযুদ্ধের পরে ইতালিতে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিশৃঙ্খলা দেখা দিলে Benito Mussolini [1883–1945]-র নেতৃত্বে প্রায় এক রক্তপাতহীন বিপ্লবে ও রাজকীয় সম্মতিতে তাঁর দল ক্ষমতা দখল করে ও জনসাধারণের সহযোগিতায় দেশে শান্তি ও শৃঙ্খলা ফিরে আসে। 'One should feel the anguish of an impending anarchy in order to fully realize the Italian people's gratitude to Fascism, and the necessity to pardon the inevitable use of violence involved in bridling a bolting horse.'
—এই রাজনৈতিক বিশ্লেষণ থেকে অনুমান করা যায়, ফর্মিকি যদি ফ্যাসিস্ট দল-ভুক্ত না-ও হন, তিনি মুসোলিনির কার্যকলাপের সমর্থক ছিলেন।

ট্রেনটি মিলান স্টেশনে পৌঁছলে একটি বিরাট জনতা রবীন্দ্রনাথের নামে জয়ধ্বনি দেয়। ডিউক স্কত্তি ও তাঁর পত্নী, অভ্যর্থনা সমিতির অন্যতম প্রধান সদস্য Nobile Guido Cagnola, Circolo Filologico-র সভ্যবৃন্দ ও সাংবাদিকেরা, মিলান ও ক্যাথলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃতের অধ্যাপকদ্বয় Pizzagalli ও Ballini এবং বহু অনুরাগী সেখানে পুষ্পস্তবক দিয়ে তাঁকে স্বাগত জানান। অতঃপর তাঁদের Hotel Cavour-এ নিয়ে যাওয়া হয়। বিকেল পাঁচটায় ডিউকের প্রাসাদে রবীন্দ্রনাথকে সংবর্ধনা জানানো হল। মিলানের প্রতিনিধিস্থানীয় ব্যক্তিরা সকলেই সেখানে উপস্থিত ছিলেন। অভিনন্দনের উত্তরে রবীন্দ্রনাথ সংক্ষেপে কিছু বলেন 'which were listened to with real devotion.'

এর পরে সকলকে স্কালা থিয়েটারে নিয়ে যাওয়া হয়, যেখানে বিখ্যাত ইতালীয় সুরকার Verdi [1813–1901]-র রচিত অপেরা *La Traviata* 'was performed, the orchestra being under the direction of the famous conductor Toscanini [1867–1957], who felt it a privilege to offer to the poet his homage by directing the music that evening. The poet entered the box of Duke G. Scotti and as soon as the people in the theatre saw him a shout was raised and they all clapped their

hands. We were told that this was quite against the aristocratic custom of the Milanese in such a hall and it was done only for Kings and Emperors.'

পরদিন 22 Jan [বৃহ ৯ মাঘ] সকালে হোটেলে N. Guido Cagnola, Parda, Prof. Ballini, Editor Mondadori, Dr Alberto Poggi, Prof. Formichi ও স্থানীয় অভ্যর্থনা সমিতির অনেকের উপস্থিতিতে বিশ্বভারতীকে সাহায্যদানের বিষয়ে আলোচনা হয়। স্থির হয়, শান্তিনিকেতনে দু'বছরের জন্য ইতালীয় সাহিত্য পড়াবার একজন অধ্যাপক পাঠানোর ব্যয়নির্বাহের জন্য অর্থসংগ্রহের চেষ্টা করা হবে ও প্রতিদানে বিশ্বভারতী ইতালীয় সাহিত্য অধ্যাপনার একটি পদ সৃষ্টি করবে। শান্তিনিকেতন লাইব্রেরির জন্য শিল্প, সাহিত্য, বিজ্ঞান ও ইতিহাসের গ্রন্থ পাঠানোর জন্য সমস্ত প্রতিষ্ঠানকে অনুরোধ জানানোর সিদ্ধান্তও গ্রহণ করা হয়। তাছাড়া ভারতীয় ছাত্রদের ইতালিতে পড়তে আসার ও ইতালিয়ান ছাত্রদের বিশ্বভারতীতে পড়াশোনার সুবিধা করে দেওয়ার ব্যবস্থা নেওয়ার পরিকল্পনা গৃহীত হয়। Mondadori রবীন্দ্রনাথের যে-সব বইয়ের ইংরেজি অনুবাদ নেই সেগুলির ইতালিয়ান অনুবাদ প্রকাশের দায়িত্ব নিতে চান, তাছাড়া তিনি অনুরূপ চুক্তিগুলি বিশ্বভারতী ও Societa Olegli Artori-র অনুমোদন-সাপেক্ষ করার প্রস্তাব করেন, যে প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য প্রকাশকদের অতিরিক্ত লোভ থেকে লেখকদের রক্ষা করা। এক্ষেত্রে প্রধান সমস্যা হল রবীন্দ্রনাথের বাংলা রচনাগুলি ইতালিয়ান অনুবাদকদের পরিচিত কোনো য়ুরোপীয় ভাষায় অনুবাদের ব্যবস্থা করা।

বিকেল পাঁচটার সময়ে ডিউক স্কত্তি রবীন্দ্রনাথকে লেকচার অ্যাসোসিয়েশনের [Circolo Filologico Milanese] হলে নিয়ে যান। সভাস্থল জনাকীর্ণ ছিল। ডিউক যখন হোটেলে এসেছিলেন তখন রবীন্দ্রনাথ তাঁর সঙ্গে সংগীত বিষয়ে আলোচনায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন— সুতরাং তাঁকে মনে করিয়ে দরকার ছিল যে, হোটেলের আলোচনার পরিবর্তে তাঁকে জনসভায় বক্তৃতা করতে হবে। অধ্যাপক ফর্মিকির সংক্ষিপ্ত স্বাগতভাষণের [দ্র *VBQ*, April 1925/1–2] পরে রবীন্দ্রনাথ একটি দীর্ঘ ভাষণ দেন, যেটি 'The Voice of Humanity' [vide *EWRT* 3/ 519–23] নামে বিশ্বভারতী কোয়ার্টার্লি-র উক্ত সংখ্যায় [pp. 3–10] মুদ্রিত হয়েছিল 'মনুষ্যত্বের জাগরণ' নামে ভাষণটির একটি বাংলা রূপান্তর শ্রাবণ ১৩৩২-সংখ্যা [পৃ ৫০৬–০৮] প্রবাসী-তে ছাপা হয়। তিনি প্রথমে বলেন, যখন অধ্যাপক ফর্মিকি তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন আজ কোন্ বিষয়ে তিনি বলবেন, তখন তাঁকে বলতে হয়েছিল যে সেটি তাঁর জানা নেই। কারণ তিনি কবি মাত্র, বক্তা নন, 'When I speak, I speak *with* my surroundings and not *to* my surroundings.' তাই এখন যখন তাঁর শ্রোতাদের নীরব স্নেহার্দ মুখগুলি তাঁর চোখে পড়ছে, তাঁদের হৃদয়ের ভাষা তাঁর কণ্ঠেও ধ্বনিত হচ্ছে। তিনি 1878-এ সতেরো বছর বয়সে ইতালির ব্রিন্দিসি বন্দরে অবতরণ ক'রে য়ুরোপের সঙ্গে প্রথম পরিচয়ের স্মৃতিচারণ প্রসঙ্গে সেখানকার ফলবাগানে একজন ইতালীয় সুন্দরীর সঙ্গে সাক্ষাতের কথা বলেন। এর পরে তিনি আবার য়ুরোপে আসেন মানবতার কণ্ঠস্বর শোনার আশায়। তিনি বলেন, য়ুরোপীয়েরা তাদের দেশকে ভালোবাসে স্বাদেশিকতা ও জাতীয়তার জন্য অর্থাৎ যা-কিছু নিজের সঙ্গে সম্পৃক্ত কেবল তাদের প্রতিই তার অনুরাগ। কিন্তু বিজ্ঞানের উন্নতিতে বিশ্ব যখন কাছাকাছি চলে এসেছে তখন সমস্যার প্রকৃতিও পরিবর্তিত হয়েছে। সেই সমস্যার যথার্থ সমাধানের উপর কোনো দেশের ভাগ্য নির্ভর করছে। মানবতার উপর তাঁর বিশ্বাস আছে— তিনি মনে করেন, মেঘ সূর্যকে আবৃত করলেও নিভিয়ে দিতে পারে না। তাই ভাষণের শেষে তিনি বললেন : 'I have come to your door seeking the voice of humanity, which must sound its solemn challenge and

overcome the clamour of the greedy crowd of slave-drivers. Perhaps it is already being uttered in whispers behind closed doors, and will grow in volume till it bursts forth in a thundering cry of judgment, and the vulgar shout of brute force is silenced in awe.'

রবীন্দ্রনাথের ভাষণের পরে অধ্যাপক ফর্মিকি তার মর্ম ইতালীয় ভাষায় শ্রোতাদের বুঝিয়ে দেন।

তৎকালীন রাজনৈতিক পরিবেশে রবীন্দ্রনাথের বক্তৃতার বিষয়বস্তুর জন্য ফর্মিকি বিব্রত বোধ করেন। তাঁর মতে, রবীন্দ্রনাথ যদি পূর্বাহ্নে তাঁর বক্তব্যের আভাস তাঁকে জানাতেন— তিনি তাঁকে অনুরোধ করতেন বিষয় পরিবর্তনের জন্য। তিনি লিখেছেন : 'After the lecture at Milan's Philology Circle, the scene changed completely. The enthusiastic approval which had surrounded the poetn in the beginning was replaced by harsh criticism, angry debates and the stirring up of suspicion and hate.' সন্দেহ নেই, এগুলি গোঁড়া ফ্যাসিস্ট মতাদর্শী ইতালীবাসীর প্রতিক্রিয়ার আংশিক চিত্র মাত্র, কারণ ফর্মিকির পরবর্তী বর্ণনাতেই পাওয়া যায় : 'In the meantime I was being stormed with telegrams from Turin, Florence and Rome, where a worthy reception had been prepared for the Poet... The *Compagnia degli Illusi* [The Dreamers' Company] of Naples, the People's University and the Academy of Sciences, Humanities and Arts of Udine, the Minerva Society of Trieste, the Cultural Circle of Bologna, and the Venetian University of Venice also contacted me in the hope that I might procure to their respective cities the honour of hosting one of Tagore's conferences.'

23 Jan [শুক্র ১০ মাঘ] পিপল্‌স্‌ থিয়েটারে চার হাজার বালকবালিকার উপস্থিতিতে রবীন্দ্রনাথের সংবর্ধনার আয়োজন করা হয়, যাদের গাওয়া গানের মধ্যে তিনি উপস্থিত হ'লে তারা সমবেতভাবে তাঁকে অভিনন্দিত করে। অভিভূত রবীন্দ্রনাথ মিলানের অধিবাসীদের কাছে বিদায়বাণীতে ['Rabindranath's Farewell to Milan' : *VBQ*, Apr 1925/ 80] বলেন, এই দেশে আতিথ্যের অভ্যর্থনা তিনি প্রথম মিলানের কাছেই লাভ করেছেন; যদিও মাত্র কয়েকদিন তিনি তাঁদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, তবু তাঁদের আন্তরিকতার স্পর্শে ইতালি তাঁর হৃদয়ের অনেক নিকটবর্তী হয়েছে। 'It is a rare privilege for a stranger to find the heart of a great country open to him, without having wearily to wait and repeatedly to knock at the gate. How I have deserved this honour I know not, but I know how to appreciate it and cherish it in my memory.' তিনি অচিরে তাঁদের মধ্যে পুনরায় আসার প্রতিশ্রুতি দিয়ে বিদায় গ্রহণ করেন। ভাষণটি অতঃপর ইতালীয় ভাষায় অনুবাদিত হয়।

বিকেলে রবীন্দ্রনাথ ডিউকের প্রাসাদে বিখ্যাত শিল্পী Rietti-র মডেল হিসেবে প্রায় এক ঘণ্টা বসে থাকেন। কিন্তু এর পর থেকেই তিনি অসুস্থ বোধ করতে থাকায় তাঁর সম্মানার্থে আয়োজিত *The Post Office* নাটকের অভিনয় দেখতে যাওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি। তাঁর সাক্ষাৎপ্রার্থীদেরও হতাশ হয়ে ফিরে যেতে হয়।

24 Jan [শনি ১১ মাঘ] রবীন্দ্রনাথ পুনরায় ইনফ্লুয়েঞ্জার আক্রমণে শয্যাগত হয়ে পড়েন। বিখ্যাত চিকিৎসক Achille Aliprandi ও Giuseppe Betti তাঁকে পরীক্ষা করে অভিমত প্রকাশ করেন, বর্তমান অবস্থায় তাঁর পক্ষে ইতালি ভ্রমণ স্থগিত রাখাই ভালো, অন্তত আগামীকাল তুরিন যাওয়ার যে প্রস্তাব আছে

সেটি ত্যাগ করাই বাঞ্ছনীয়। তুরিন থেকে Pro Cultural Femminile ও Stampa Subalpina নামক দুটি সংস্থার আমন্ত্রণ ছিল। ফর্মিকি টেলিগ্রাম পাঠিয়ে তাঁদের আয়োজন স্থগিত রাখতে বলেন।

এইদিনই [১১ মাঘ : 24 Jan] রবীন্দ্রনাথ ইতালির উদ্দেশে 'ইটালিয়া' ['কহিলাম, "ওগো রানী,' দ্র পূরবী ১৪। ১৫৩–৫৪] নামে একটি কবিতা লিখে ইতালি থেকে বিদায় গ্রহণ ও পুনরায় আগমনের প্রতিশ্রুতি দান করেন। এটি ইতালিতে লিখিত একমাত্র ও 'পূরবী' কাব্যগ্রন্থের শেষ কবিতা। 26 Jan রথীন্দ্রনাথ ডায়ারিতে লিখেছেন : 'He translated word by word to Prof. Formichi, who rendered it into Italian and this was transmitted to the Italian press and all newspapers reproduced it next morning.' রবীন্দ্রনাথের ইংরেজি অনুবাদটি 'To Italia' ['I said to thee : "O Queen'] নামে [*VBQ*, Apr 1925/11] মুদ্রিত হয়।

ফর্মিকি লিখেছেন, এই কবিতাটি নিয়েও ইতালিতে গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের প্রকাশ ঘটে; তাঁর বর্ণনায় :

This poem inspired our major and minor poets; some translated it in verse, some composed a new poem containing Italy's reply to her lover.

Some other saw in Tagore's verses, purely and simply idilliac though they were, a malignant reference to the elections which were then supposed to be held in the spring, which the parties opposed to Fascism hoped would be unfavourable to the Government.

—যদিও ফর্মিকিই জানিয়েছেন, ইতালির আসন্ন নির্বাচন সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ কিছুই জানতেন না!

25 Jan [রবি ১২ মাঘ] সকাল সাড়ে ন'টায় রবীন্দ্রনাথের তুরিনের উদ্দেশে যাত্রা করার কথা ছিল, কিন্তু তার পরিবর্তে তিনি সারাটি দিন শয্যা আশ্রয় করে থাকতে বাধ্য হন। ডিউক স্কত্তি বা তাঁর পত্নী প্রভৃতি ঘনিষ্ঠ ব্যক্তিরা ছাড়া আর-কেউ তাঁর সাক্ষাৎ পাননি। রবীন্দ্রনাথের আলোচনার অনুলেখন নেন এল্‌ম্‌হার্স্ট ও সেগুলি বিশ্বভারতী কোয়ার্টার্লি-র Vol. 28, No. 2, pp. 101–05 ও Vol. 29, No. 4, pp. 284–88-তে মুদ্রিত হয়েছে।

26 Jan [সোম ১৩ মাঘ] চিকিৎসক রবীন্দ্রনাথকে পুনরায় পরীক্ষা করে বলেন, তাঁর হৃদ্‌যন্ত্র দুর্বল ও শারীরিক অবস্থা এমনই যে, তাঁর ইতালি সফর বাতিল করে দেশে ফিরে যাওয়াই উচিত। এই খবর শুনে সেখানে যথেষ্ট হতাশা দেখা দেয়। প্রথমে তাঁর তুরিনে যাওয়ার কথা ছিল, সেখান থেকে যেতেন ফ্লোরেন্স ও রোমে। কিন্তু মিলানের ভাষণের পরে উদিন, ভেনিস, বোলোনা, ত্রিয়েস্তে, জেনোয়া, নেপ্‌ল্‌স্‌ প্রভৃতি স্থান থেকে তাঁকে আমন্ত্রণ জানিয়ে চিঠি ও টেলিগ্রাম ফর্মিকির কাছে আসতে শুরু করেছিল।

27 Jan চিকিৎসকদের নিষেধ অমান্য করে রবীন্দ্রনাথ বন্ধুদের কাছে নির্বাণ বিষয়ে আলোচনা করেন। এইদিন তিনি রোটেনস্টাইনকে একটি চিঠি লিখে রয়্যাল কলেজ অব্‌ আর্ট-এ বিশেষ ছাত্রীরূপে প্রতিমা দেবীকে মৃৎশিল্প শেখার ব্যবস্থা করে দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ জানিয়ে তাঁর বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে লেখেন :

What I did fear has happened. I have fallen ill. I almost feel guilty that it should have been so— for I have been met with such an outburst of welcome that it grieves my heart not to be able to respond to it in an adequate manner. Twice I have been able to appear before

the public and the enthusiasm of the people has made me humble— I only wish I could do something to them to deserve this. But I have not even the strength to leave my bed and appear before them to say how grateful I am. I am sailing back to India on the next Monday [2 Feb]. But I am sure to come back to Italy either next autumn or in the following spring.[১৬৬]

সম্ভবত এই সময়ে ভিক্টোরিয়াকে লেখা একটি চিঠিতে অনুরূপ সংবাদই আছে। অতিরিক্ত খবর আছে ইতালিতে প্রস্তাবিত বাসস্থান বিষয়ে : 'Leonard is working with our friends here to find a suitable place for me. I shall be very happy indeed to have my European nest in this delightful country which is so friendly to me.'[১৬৭]

28 Jan [বুধ ১৫ মাঘ] রবীন্দ্রনাথ শয্যাত্যাগ করতে সমর্থ হন ও তাঁর সম্মানার্থে আগত মিলানের অভ্যর্থনা সমিতির সদস্যদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। বিকেলে তুরিনের Pro Cultural Femminile-এর পক্ষ থেকে তিনজন মহিলা এসে তাঁকে দান্তের কাব্যগ্রন্থের একটি সুন্দর সংকলন উপহার দিয়ে একটি সুন্দর প্রশস্তিপত্র পাঠ করে বলেন, রবীন্দ্রনাথ তুরিনে যেতে না পারায় তাঁরা কত দুঃখিত হয়েছেন। একই কারণে অনেকে তাঁকে চিঠি লেখেন, তাদের মধ্যে Olga Lorenza নামক প্রাথমিক বালিকা বিদ্যালয়ের এক শিক্ষিকার 16 Feb-এর পত্রটি আমরা উদ্ধৃত করছি :

Now that you have reached your own land, and that the mildness of its climate has laid its healing touch on you, let a word of homage reach you from this city of Turin, whose vibrating expectation you disappointed.... A class of six-years-old girls is my field of labour, in the Santorre Santarola School, which your were to visit.... They too were expecting you. I had told them about your loving kindness towards all beings, and especially towards children....

Then, after the news of your sudden return to India was fully confirmed, I showed them in a magic lantern view the likeness of yourself that you sent me two years ago— you must have forgotten. Do you know what they said when they saw your profile on the sheet? "It is the Lord!" they cried, and stared with wondering eyes. My six-years-old girls are just learning to spell,— yet they read your gaze like an open book.

They will remember you. Some day, when your writings will give light and warmth to their hearts they shall know (for I shall tell them) that the mighty Poet, the loving friend of little children, once upon a time passed not far from where they were.

But you are coming back. You promised you would come back. Come while the schools are open, come among the little ones of Turin as you went among those of Milan. The souls of children are the fertile ground in which the food seed can sprout. For years now you have been sowing such seed, and far and wide the harvest promises well.

Forgive me for daring to write to you. I have known you, loved you, reverenced you, for years and years.

One day I wrote to you, calling you my Master, and my father. And now, as then, that is what you still are to me.[১৬৮]

29 Jan [বৃহ ১৬ মাঘ] রবীন্দ্রনাথ মিলান ত্যাগ করে ভেনিসের উদ্দেশে রওনা হবেন জেনে দলে দলে লোক হোটেলে আসেন তাঁর ছবি তোলা, স্বাক্ষর সংগ্রহ করা বা একবার দর্শন করার সুযোগ পাবার জন্য। এঁদের হাত থেকে তাঁকে রক্ষা করার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা নিতে হয়।

দুপুর দুটোয় ট্রেনে ভেনিস রওনা হবার সময়ে বৃদ্ধ ল্যাটিন শিক্ষক Felice Roemorino রবীন্দ্রনাথকে ল্যাটিন ভাষায় লেখা একটি বিদায় অভিনন্দনপত্র উপহার দেন। রবীন্দ্রনাথের একটি ফটোগ্রাফ ইতালির প্রধানমন্ত্রী মুসোলিনিকে দেওয়ার জন্য ফ্যাসিস্ত সেনাবাহিনী [Militia Fascista] ফর্মিকির অনুমতি গ্রহণ করে।

জেনোয়ার দিনগুলি ও মিলানের প্রথম দুদিনের আবহাওয়া চমৎকার ছিল, কিন্তু তার পরেই ঠাণ্ডা ও কুয়াশায় রবীন্দ্রনাথ অসুস্থ হয়ে পড়েন, কিন্তু মিলান ত্যাগের পরেই তিনি ক্রমশ সুস্থ হয়ে উঠতে থাকেন।

ট্রেনটি Vicenza স্টেশনে পৌঁছলে একদল ছাত্র 'ভারতের কবি দীর্ঘজীবী হোন, রবীন্দ্রনাথ দীর্ঘজীবী হোন' বলে ধ্বনি করতে থাকে। একটি তরুণী তাঁকে একটি পুষ্পস্তবক উপহার দেয়, একজন তাঁর কবিতা অবলম্বনে রচিত সংগীতের স্বরলিপি নিয়ে আসে, কয়েকজন তাঁর স্বাক্ষর প্রার্থনা করে— একজন ধ্বনি তোলে 'প্রেম ও শান্তির কবি দীর্ঘজীবী হোন'। ট্রেনটি চলতে শুরু করলেও তারা 'কবি দীর্ঘজীবী হোন' ধ্বনি-সহ পাশে পাশে চলতে থাকে।

পাদুয়া স্টেশনে গাড়ি থামলে একদল ছাত্র তাঁর কামরায় উঠে ভেনিস পর্যন্ত যায় ও তাঁর কাছ থেকে স্বাক্ষর সংগ্রহ করে।

ভেনিস স্টেশনে পৌঁছলে R. Commissario, লর্ড মেয়রের মতো ক্ষমতাপ্রাপ্ত Signor Fornaciari প্রভৃতি স্থানীয় অভ্যর্থনা সমিতির সদস্যেরা তাঁকে স্বাগত জানান ও একটি বোটে সকলকে চড়িয়ে প্রধান খালের পথ দিয়ে গ্র্যান্ড হোটেলে নিয়ে যান। ভেনিসে এসে রবীন্দ্রনাথ অনেক সুস্থ বোধ করছিলেন।

30 Jan [শুক্র ১৭ মাঘ] সকালে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি প্রখ্যাত চিকিৎসক অধ্যাপক জোনা [Prof. Jona] তাঁকে দেখতে আসেন ও পরীক্ষা করে পরামর্শ দেন বক্তৃতাদি না করে বিশ্রাম গ্রহণের জন্য। বিকেলে পুরসভার মোটরবোটে গ্র্যান্ড ক্যানাল, লেগুন ও ভেনিসের ছোটো খালগুলি তাঁকে দেখানো হয়। ভেনিসের প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখে তিনি মুগ্ধ হন। হোটেলে ফিরে আসার পরে R. Commissario-র পত্নী ও Countess Pia di Valmarana S. Vio তাঁর সঙ্গে দেখা করেন।

31 Jan [শনি ১৮ মাঘ] রবীন্দ্রনাথ কয়েকজন অতিথির সঙ্গে 'People' ও 'Nation' শব্দদুটির পার্থক্য নিয়ে আলোচনা করেন।

বিকেলে একটি মোটরবোটে করে তাঁকে আর্মেনিয়ান ভ্রাতৃসঙ্ঘ দ্বীপে [Isle of the Armenian Friars] নিয়ে গেলে তাঁকে হার্দিক সংবর্ধনা জানানো হয়। তাঁরা একটি সুন্দর প্রশস্তিপত্র পাঠ করেন, ফর্মিকি সেটিকে ইংরেজিতে অনুবাদ করে শোনান, ইতালীয় ভাষায় লেখা একটি ছোটো প্রশস্তি তিনি রূপান্তরিত করেন সংস্কৃত

ভাষায়। তারপর তাঁকে ভেনিসের বিখ্যাত কাঁচ ও লেস শিল্পের কারখানায় নিয়ে যাওয়া হয়। ভেনিসের প্রাচীন পরিবারগুলির অন্যতম প্রতিনিধি Count Marcello নন্দিনীর জন্য একটি মূল্যবান লেসের খণ্ড উপহার দেন। কয়েকজন শ্রমজীবী মহিলা রবীন্দ্রনাথকে পুষ্পগুচ্ছ উপহার দিয়ে লেসের বিভিন্ন নমুনা প্রদর্শন করেন।

অনেক দেরিতে হোটেলে ফিরে রবীন্দ্রনাথ দেখেন বিরাট সংখ্যক দর্শনার্থী অপেক্ষা করছেন। Countess Brandolin ও ভেনিসের অভিজাত পরিবারের কয়েকজন মহিলার সঙ্গে তিনি সৌজন্যসূচক কথাবার্তা বলেন।

1 Feb [রবি ১৯ মাঘ] রবীন্দ্রনাথ গণ্ডোলায় চড়ে S. Marco Piazza ও গির্জা ঘুরে দেখেন। কিন্তু ঈষৎ অসুস্থ বোধ করাতে হোটেলে ফিরে আসেন ও বিকেলে অধ্যাপক জোনা তাঁকে পরীক্ষা করে বিদায়সংবর্ধনা গ্রহণ করতে নিষেধ করেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ জনসাধারণকে হতাশ করতে চাননি। বিশেষত ফ্লোরেন্সের অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি Angiolo Orvieto এবং তাঁর স্ত্রী-কন্যা অনেক দূর থেকে এসেছেন বলে তিনি তাঁদের নিরাশ করেননি। ওরভিয়েতো নিজেই একজন কবি, তিনি রবীন্দ্রনাথের ইতালির উদ্দেশে লিখিত কবিতার একটি চমৎকার ইতালিয়ান প্রত্যুত্তর পাঠ করে শোনান; তাছাড়া লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চির একটি সচিত্র জীবনী তাঁকে উপহার দেন। এরপরে অভ্যর্থনা সমিতির সদস্যেরা ঘরে প্রবেশ করেন, তাঁরা ভাবতেই পারেননি রবীন্দ্রনাথ তাঁদের কিছু বলবেন। কিন্তু তিনি প্রায় এক ঘণ্টা কথা বলেন। ফর্মিকি জানিয়েছেন, ভাষণটির ইংরেজি অনুলেখন ও তার ইতালিয়ান অনুবাদ *Rivista dell' Ateneo Veneto* [The Venetian University Review, Jan-June 1925]-তে মুদ্রিত হয়।

1 Feb ভেনিস থেকে রবীন্দ্রনাথ ভিক্টোরিয়াকে একটি চিঠি লিখে জানান, তিনি আগামীকালই ভারতাভিমুখে রওনা হচ্ছেন। এইরূপ কথা তিনি অনেককেই লিখেছেন—হয়তো অনুরূপ ব্যবস্থাই হয়েছিল — কিন্তু কোনো কারণে যাত্রা বিলম্বিত হয়। এর পরে তিনি লেখেন : 'Leonard will arrange with our friends here some quiet place where I may spend some part of my year. I remember, you wished to come to Europe some time next autumn, therefore I have decided to meet you here about the middle of September, remaining here till the third week of October.... Italy has been very gracious to me and I feel that the Italian sun and the warmth of the Italian heart will do me good.'[১৬৯]

পরবর্তী দুদিনের বিবরণ ডায়ারিতে নেই। রবীন্দ্রভবনে Ms. 275 (C) সংখ্যা-চিহ্নিত 'Appointments' নামক একটি নোটবই আছে। এটি আসলে পিয়র্সনের, তিনি 1916-এ রবীন্দ্রনাথের আমেরিকা-ভ্রমণের যোগাযোগের বিবরণ লেখার জন্য এটি ব্যবহার করেছিলেন। এবারে রথীন্দ্রনাথ সেটি কাজে লাগান তাঁর ইতালি ভ্রমণের কর্মসূচি লিখে রাখার উদ্দেশ্যে। কিন্তু বোঝা যায়, তিনি পূর্বাহ্ণেই ভ্রমণসূচি লিখে রেখেছিলেন, যা পরিবর্তিত পরিস্থিতির জন্য কার্যত অনুসৃত হয়নি। এখানেই দেখা যায়, 30 Jan তুরিন ত্যাগ করে সুইজারল্যান্ডের ভিলন্যভে গিয়ে রম্যাঁ রলাঁর সঙ্গে তাঁর সাক্ষাতের ব্যবস্থা হয়েছিল, দুদিন সেখানে থেকে ফিরে আসার কথা ছিল 1 Feb, যা রবীন্দ্রনাথের অসুস্থতার জন্য কার্যকর হয়নি। পরিবর্তে 29 Jan তিনি মিলান থেকে রলাঁকে একটি চিঠি লিখে ক্ষমা ভিক্ষা করেন। য়ুরোপে শীঘ্রই ফিরে আসার সংকল্প ঘোষণা করে তিনি লেখেন :

...I have a longing to see you and to have an intimate talk with you about things that are near to my heart. The glimpse that I have had of South America is not satisfying. The people there have become enormously prosperous all of a sudden and they have not had the time to discover their soul. It is pitiful to see their utter dependence on Europe for their thoughts which must come readymade to them. They are not ashamed of being proud of some mannerism which they borrow or culture which they buy from this continent. A time will come when they will exhaust their source of wealth, and then their barrenness of mind will lie exposed in its utter poverty bereft of all hired decorations.[১৭০]

—ভিক্টোরিয়া এই চিঠি পড়লে নিশ্চয়ই খুশি হতেন না! আর্জেন্টিনায় বসে বোদলেয়ারের আসবাবের কবিতা রবীন্দ্রনাথের ভালো লাগেনি, হয়তো সেখানকার আসবাবপত্রে য়ুরোপীয় অনুকরণের পরিবর্তে কোনো দেশীয় বিশেষত্ব দেখতে না পেয়ে। 'কবির অভিপ্রায়' বোঝা সত্যই খুব কঠিন!

ভেনিস থেকে স্টিমারে সকলে ব্রিন্দিসি পৌঁছন 4 Feb [বুধ ২২ মাঘ] খুব সকালে। স্টিমারটি জেটিতে পৌঁছলে একদল লোক সেখানে উপস্থিত হন। কয়েকটি মেয়ে ফুল নিয়ে আসে, আর একটি মেয়ে এক ঝুড়ি কমলালেবু ও পাতিলেবু নিয়ে এসে রবীন্দ্রনাথকে বলে, অনেক অনেক বছর আগে তিনি য়ুরোপে এসে প্রথম যে বাগানে গিয়েছিলেন ফলগুলি সেই বাগানের— বোঝা যায়, মেয়েটি তাঁর মিলানের বক্তৃতা পড়ে তৈরি হয়ে এসেছিল। এর কিছুক্ষণ পরে নৌবাহিনীর একজন কম্যান্ডার কয়েকজন অফিসার-সহ এসে রবীন্দ্রনাথকে বলেন মোটরে করে তাঁকে শহর ও দুর্গ ঘুরিয়ে আনবেন। কিন্তু এতগুলি সরকারি কর্মচারীর সঙ্গে শহর ঘুরে বেড়ানোর প্রস্তাব তাঁর ভালো লাগেনি, সুতরাং তাঁদের ধন্যবাদ জানিয়ে তিনি প্রস্তাবটি সবিনয়ে প্রত্যাখ্যান করেন। অবশ্য তার পরেই একটি ঘোড়ার গাড়ি ডেকে ভ্রমণে বেরোন, চালককে বলে দেওয়া হয় দু'এক ঘণ্টা ধীর গতিতে গাড়ি চালিয়ে সে যেন শহরটি ঘুরিয়ে দেখায়। কিন্তু চতুর লোকটি তার গাড়িটি স্থানীয় ম্যুজিয়মের সামনে দাঁড় করায় যেখানে একজন ফটোগ্রাফার ক্যামেরা নিয়ে প্রস্তুত ছিল। রবীন্দ্রনাথের ম্যুজিয়মে আসার খবর পেয়ে তার কিউরেটার একজন পাদ্রি ও কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তি দ্রুত সেখানে উপস্থিত হন। এক বর্ণ ইংরেজি-না-জানা অত্যুৎসাহী পাদ্রিটি হাত-পা নেড়েই সব-কিছু বোঝাতে থাকেন। তিনি প্রথমেই পুরাতাত্ত্বিক রোমান মাটির পাত্রে পুরোনো মদ ঢেলে সকলকে পরিবেশন করেন। তার পরে কয়েকটি পুরাতাত্ত্বিক সামগ্রী কর্তৃপক্ষের বিনা অনুমতিতেই তিনি রবীন্দ্রনাথকে উপহার দেন। ব্রিন্দিসি থেকে পাওয়া রোমান ফুলদানি এখনও রবীন্দ্রভবন সংগ্রহশালায় রক্ষিত আছে।

ব্রিন্দিসি থেকে ক্রাকোভিয়া জাহাজে রবীন্দ্রনাথ সপরিবারে সুরেন্দ্রনাথ কর-সহ এইদিন 4 Feb 1925 [বুধ ১২ মাঘ] ভারতাভিমুখে রওনা হন। এল্‌ম্‌হার্স্ট য়ুরোপেই থেকে যান।

মডার্ন রিভিয়্যু-র Aug 1925 [pp. 251–53]-সংখ্যায় A.C. [রামানন্দ-পুত্র অশোক চট্টোপাধ্যায়-রচিত] 'Notes' থেকে জানা যায়, রবীন্দ্রনাথের ইতালি সফর নিয়ে একটি অকারণ বিতর্ক তৈরি করা হয়েছিল। আমরা উপরের বর্ণনা থেকেই জেনেছি, ইতালীয়রা তাঁকে কতখানি প্রীতি ও শ্রদ্ধা-সহ স্বাগত জানিয়েছিল এবং তাঁর আকস্মিক অসুস্থতার জন্য সফর বাতিল করাতে বিভিন্ন শহরের জনসাধারণ কতটা ব্যথিত হয়। তাঁর সফরের সঙ্গে তখনকার ফ্যাসিস্ট সরকারের কোনো যোগ ছিল না— ফ্যাসিস্টদের প্রতি সহানুভূতিশীল হলেও অধ্যাপক ফর্মিকি এবারে দোভাষীর দায়িত্ব নিয়েছিলেন প্রধানত নিজেরই আগ্রহে একজন সংস্কৃত ভারততত্ত্ববিদ্ রূপে, 1926-এর সফরের মতো মুসোলিনির অনুগত সরকারি প্রতিনিধি হিসেবে নয়। একথা ঠিক যে, রবীন্দ্রনাথের মানবতা-বিষয়ক বক্তব্য কিছু ফ্যাসিস্ট সংবাদপত্রে সমালোচিত হয়েছিল— কিন্তু

সরকার অন্তত এবারে তাঁর কথাবার্তা বা চলাচলের উপর কোনো বাধানিষেধ আরোপ করেনি। সুতরাং আমেরিকার সুধীন্দ্র বসু যখন *Forward* পত্রিকায় মন্তব্য করেন যে, ইতালীয় সংবাদপত্রের সমালোচনার জন্য রবীন্দ্রনাথকে ইতালি সফর সংক্ষিপ্ত করে চলে আসতে হয়, তখন বোঝা যায় তিনি আংশিক তথ্যের ভিত্তিতেই তাঁর বক্তব্য প্রকাশ করেছিলেন। কাজেই অশোক চট্টোপাধ্যায় সংগত কারণেই একই সময়ে ইতালি-ভ্রমণরত সুধীরকুমার লাহিড়ীর অন্যবিধ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে রচিত প্রতিবাদপত্রকে গুরুত্ব দিয়েছেন।

কিন্তু বহুদিন পরে 1962–63-তে বিশ্বভারতী কোয়ার্টার্লি-র Vol.28, No.2 [pp.101–05]-সংখ্যায় 'Rabindranath Tagore and Il Duca Gallarati Scotti An Interview in Milan' নামক এতাবৎ-অপ্রকাশিত একটি অনুলেখন প্রকাশ করতে গিয়ে এল্‌ম্‌হার্স্ট তার সূচনায় এমন-কিছু মন্তব্য করেছেন, যা উক্ত বিতর্ককে আবার খুঁচিয়ে তুলতে পারে। তিনি লিখেছেন, রবীন্দ্রনাথ ও তিনি ইতালিতে পৌঁছবার পরেই 'were met by an official delegation from the Italian Government, then in the hands of a Facist Dictatorship. The plan of this delegation was apparently to make the maximum of capital for Fascist State out of Tagore's visit, by the customary manipulation of press interviews and the mis-reporting of speeches and discussions.... This time, however, as soon as we reached Milan, Tagore began to feel that he was not going to be allowed to have his own by the government's emissaries and his heart began to react, as it so often did, against any kind of undue pressure. Fortunately for us il Duca Gallarati Scotti, who was acting as our host, came to our rescue. He brought in skilled physicians who recommended exactly the course that Tagore most wished to follow, and an immediate retum to India by boat from Venice without further public meetings. The Duke, being himself not only a celebrated Italian playwright and author but also a man of deep feeling and sensibility, came to Tagore, just before he was leaving Milan and told him quietly of the various sorts of pressures that were already being put upon authors, artists and professors generally by the new Facist government.'
—অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের অসুস্থতা, চিকিৎসকের পরামর্শে সমস্ত কর্মসূচি স্থগিত রেখে দেশে ফিরে আসা সবই অভিনয় এবং ইতালির আতিথ্যের প্রশংসা করে দেশে ফেরার দু'মাসের মধ্যেই আবার ইতালিতে যাবার ইচ্ছা প্রকাশ সবটাই বানানো নাটক! এল্‌ম্‌হার্স্টের মতো লোক একথা লিখলেও তা মেনে নেওয়া শক্ত। রথীন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত ডায়ারিতেও অনুরূপ কোনো-কিছুর ইঙ্গিতমাত্রও নেই। তাই মনে হয়, ঘটনার দীর্ঘকাল পরে 1962–63-তে তার স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে এল্‌ম্‌হার্স্ট 1926-এর ঘটনার প্রক্ষেপ ঘটিয়েছেন তার আগের বছরের বিবরণে; সেই বছরেও তিনি ইতালিতে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে ছিলেন। ইতিহাসে এইভাবেই তথ্যের ছদ্মবেশে বিভ্রান্তির অনুপ্রবেশ ঘটে।

রবীন্দ্রনাথ ভারত থেকে য়ুরোপ যাওয়ার পথে ডায়ারির আকারে গদ্য ও কবিতা লিখেছিলেন; দক্ষিণ আমেরিকার পথে গদ্য বন্ধ ছিল, লেখা হচ্ছিল কেবল কবিতা, য়ুরোপে আসার পথেও তাই— কিন্তু য়ুরোপ ছাড়ার পরেই আবার ডায়ারি লেখার দিকে মন গেছে তাঁর, অবশ্য এইবারে সেগুলি লিখিত হয় নোটের আকারে, পরে সজনীকান্ত দাসকে মুখে-মুখে বলে রবীন্দ্রনাথ তার ভাষারূপ রচনা করেন। শেষ ডায়ারি লেখা

হয়েছিল 7 Oct 1924 আবার শুরু হল ঠিক চার মাস পরে 7 Feb 1925 পোর্ট সৈয়দ বন্দরে বা তার কাছাকাছি জায়গায়। এত দিন পরে 'তিন বছরের প্রিয়া' নন্দিনীর সান্নিধ্যে এসে আবার কি নলিনী মৈত্রকে [তালুকদার] দেওয়া প্রতিশ্রুতি তাঁর মনে পড়ে গেল?

ডায়ারি [দ্র যাত্রী ১৯। ৪০৫–০৮] আরম্ভ হল পুরোনো কথার অবতারণা করে— মার্সেলেস বন্দরে নেমে রেলযাত্রার পথে বিপুল ভোজ্যবস্তুর বর্ণনায় এবং তারই সূত্র ধরে য়ুরোপ-আমেরিকার যুদ্ধোত্তর রাজনীতির ব্যাখ্যা দিয়ে। এই ব্যাখ্যার পরিণতি ঘটল লক্ষ্যহীন অতিশয়তার নিন্দামূলক একটি কবিতায় : 'রথীরে কহিল গৃহী উৎকণ্ঠায় উর্ধ্বস্বরে ডাকি', যেটি অন্তর্ভুক্ত হয় 'লক্ষ্যশূন্য' নামে 'পরিশেষ' [১৩৩৯] কাব্যের সংযোজন অংশে [দ্র ১৫। ২৯২–৯৩]।

এইদিন তিনি লেনার্ড ও তাঁর ভাবী পত্নী ডরোথির উদ্দেশে দুটি চিঠি পাঠান। এল্‌ম্‌হার্স্টকে লেখেন : 'Bon Voyage to the blessed shore of love's infinite mystery and life's music of fulness[১৭১] ডরোথিকে লিখলেন : 'Leonard has a natural wisdom which makes it easy for him to find friends wherever he goes and I also belong to that crowd of admirers to whom he has made himself very dear.... Feeling certain that he has been born with a true mission I cannot help believing that his Providence has called you inevitably to him and that your love will give him the wealth of life for which his heart has been in need so long. Opportunities will come him which will lead him to his fulfilment and I love to think that your union with him is one such with its possibilities of delight and greatness.'[১৭২] তাঁদের দুজনের বিবাহ হয় 3 Apr 1925 [শুক্র ২০ চৈত্র]।

আগেই বলা হয়েছে, 'ক্রাকোভিয়া' জাহাজ 7 Feb [শনি ২৫ মাঘ] পোর্ট সৈয়দ বন্দরে পৌঁছয়। রথীন্দ্রনাথ তাঁর ডায়ারির শেষ বিবরণ লিখেছেন এখানে; তিনি লেখেন, কয়েকটি কেব্‌ল পাঠানোর ও চিঠি ডাকে দেওয়ার জন্য তিনি ও সুরেন্দ্রনাথ কর ডাঙায় নামেন। সেই সময়ে এই শহরের কয়েকজন ইতালিয়ান অধিবাসী এসে রবীন্দ্রনাথের উদ্দেশে একটি অভিনন্দনপত্র পাঠ করেন ও তাঁকে কিছু ফুল উপহার দেন।

রবীন্দ্রনাথ ডায়ারির পরবর্তী অংশ লিখলেন লোহিত সাগর দিয়ে যাওয়ার সময়ে 9 Feb [সোম ২৭ মাঘ]। এটিতে তিনি বিভিন্ন ভাবকে ভাষারূপ দিয়েছেন, তাই এটি 'ক' 'খ' ও 'গ' তিনটি ভাগে বিভক্ত। এর 'খ' অংশ প্রধানত রাজনৈতিক আলোচনায় পূর্ণ— ভারত, বিশেষত বাংলায় পুলিশি উৎপীড়নের যে ইঙ্গিত দ্বিনেন্দ্রনাথের উদ্দেশে লেখা 'চিঠি' কবিতায় ছিল, এখানে তারই কারণ বিশ্লেষণ করেছেন রবীন্দ্রনাথ। তিনি লিখেছেন :

> ইংরেজের লোভ যে-ভারতবর্ষকে পেয়েছে ইংরেজের আত্মা সেই ভারতবর্ষকে হারিয়েছে। ··· এইজন্যে ভারতবর্ষকে স্বাস্থ্য দেওয়া, শিক্ষা দেওয়া, মুক্তি দেওয়া সম্বন্ধে ইংরেজের ত্যাগ দুঃসাধ্য কিন্তু শাস্তি দেওয়া সম্বন্ধে ইংরেজের ক্রোধ অত্যন্ত সহজ। ইংরেজ-ধনী বাংলাদেশের রক্ত-নেংড়ানো পাটের বাজারে শতকরা চার-পাঁচশো টাকা মুনফা শুষে নিয়েও যে দেশের সুখস্বাচ্ছন্দ্যের জন্যে এক পয়সাও ফিরিয়ে দেয় না, তার দুর্ভিক্ষে বন্যায় মারী-মরকে যার কড়ে আঙুলের প্রান্তও বিচলিত হয় না, যখন সেই শিক্ষাহীন স্বাস্থ্যহীন উপবাসক্লিষ্ট বাংলাদেশের বুকের উপর পুলিসের জাঁতা বসিয়ে রক্তচক্ষু কর্তৃপক্ষ কড়া আইন পাস করেন তখন সেই বিলাসী ধনী স্ফীত মুনফার উপর আরামের আসন পেতে বাহবা দিতে থাকে··· কেননা, ওই ধনী বাংলাদেশকে একেবারেই দেখতে পায় নি, তার মোটা মুনফার ওপারে বাংলাদেশ আড়ালে পড়ে গেছে। বাংলাদেশের প্রাণের নিকেতনে যেখানে ক্ষুধাতৃষ্ণার কান্না, বাংলাদেশের হৃদয়ের মাঝখানে যেখানে তার সুখদুঃখের বাসা, সেখানে মানুষের প্রতি মানুষের মৈত্রীর একটা বড়ো রাস্তা আছে, সেখানে ধর্মবুদ্ধির বড়ো দাবি বিষয়বুদ্ধির গরজের চেয়ে বেশি, এ কথা জানবার ও ভাববার মতো তার সময়ও নেই

শ্রদ্ধাও নেই। তাই যখনই দেখে দরোয়ানির ব্যবস্থা কঠোরতর করা হচ্ছে তখনই মুনফা-বৎসলেরা পুলকিত হয়ে ওঠে। ল অ্যাণ্ড্ অর্ডার রক্ষা হচ্ছে দরোয়ানিতন্ত্র, পালোয়ানের পালা; সিম্প্যাথি অ্যাণ্ড্ রেস্পেক্ট্ হচ্ছে ধর্মতন্ত্র, মানুষের রীতি।[১৭৩]

এই আলোচনাটি তিনি শেষ করেছেন বিশ্বরাজনীতির পটভূমিকায় : 'যে-দুঃখের কথাটা বলছি এটা জগৎ জুড়ে আজ ছড়িয়ে পড়েছে; আজ মুনফার আড়ালে মানুষের জ্যোতির্ময় সত্য রাহুগ্রস্ত। এই জন্যেই মানুষের প্রতি কঠিন ব্যবহার করা, তাকে বঞ্চনা করা, এত সহজ হল। তাই পাশ্চাত্যে পলিটিক্সই মানুষের সকল চেষ্টার চূড়া দখল করে বসেছে। ··· সর্বভুক্ পেটুকতার এমন বিস্তৃত আয়োজন পৃথিবীর ইতিহাসে আর কোনো দিন এমন কুৎসিত আকারে দেখা দেয় নি।'

এর পরে 11 Feb থেকে 15 Feb পর্যন্ত পাঁচদিন তিনি রোজই ডায়ারি লিখে ভাবনার বিচিত্র লীলার ভাষারূপ প্রদান করেছেন। এদের মধ্যে শেষ দিনের ডায়ারিটি বিশেষ কারণে উল্লেখযোগ্য। ইদানীং পালিতা পৌত্রী নন্দিনীর প্রসঙ্গ প্রায়ই তাঁর রচনায় দেখা দিচ্ছে। 11 Feb তারিখেই তিনি লিখেছিলেন : 'পৃথিবীতে আমার প্রেয়সীদের মধ্যে যিনি সর্বকনিষ্ঠ তাঁর বয়স তিন। ইনিয়ে বিনিয়ে কথা বলে যেতে তাঁর এক মুহূর্ত বিরাম নেই।' এঁরই কথা দিয়ে শুরু হয়েছে 15 Feb [রবি ৩ ফাল্গুন]-এর দিনলিপির বর্ণনা : 'নন্দিনী তার নাম, তিন বছর তার বয়স। আধুনিক নবেল পড়বার সময় তার এখনো হয় নি। ঘুম-পাড়াবার আগে তাকে গল্প শোনাবার লোক চাই। তাই, যে-আমি এতকাল জনসাধারণকে ঘুম পাড়াবার বায়না নিয়েছিলুম, দায়ে পড়ে সেই-আমার পদবৃদ্ধি হল। আজকাল এই ক্ষুদ্র মহারানীর শয্যাপার্শ্বে আমার তলব হচ্ছে।' নন্দিনীর বাঘের গল্প শোনার ফরমাশ তামিল করতে গিয়ে তিনি ছড়ায় একটি বাঘের অবতারণা করেছিলেন যার 'সর্বাঙ্গীন কলঙ্কমোচনের জন্যে সাবান-অন্বেষণের দুঃসাধ্য অধ্যবসায়ে ঝগড়ু-নামধারী বেহারার যাত্রা' শুরু করিয়ে শেষ পর্যন্ত হাল ছেড়ে দিয়ে গদ্যের আশ্রয় নিতে বাধ্য হন। এই সাবানসন্ধানী বাঘের কথা এর পরেও রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন রচনায় ঘুরে ঘুরে এসেছে। *The Religion of Man* [1939] বক্তৃতামালার নবম অধ্যায় 'The Artist'-এ তিনি বলেন : 'A child comes to me and commands me to tell her a story. I tell her of a tiger which is disgusted with the black stripes on its body and comes to my frightened servant demanding a piece of soap. The story gives my little audience immense pleasure, the pleasure of a vision, and her mind cries out, "It is here, for I see!" She knows a tiger in the book of natural history, but she can see the tiger in the story of mine.' এই বাঘকে আবার দেখা গেছে 'সাহিত্যতত্ত্ব' প্রবন্ধে ও 'সে' কল্পকাহিনীতে, যেটি পুপেদিদি ও সে-নামক এক কাল্পনিক মানুষকে কেন্দ্র করেই রচিত।

March 1925-সংখ্যা মডার্ন রিভিয়্যু-র 'Notes' [p.371]-এ উল্লেখ করা হয়েছে, রবীন্দ্রনাথ 18 Feb [বুধ ৬ ফাল্গুন] বোম্বাইতে ও সেখানে কয়েকদিন কাটিয়ে এলাহাবাদের পথে কলকাতায় পৌঁছন 23 Feb [সোম ১১ ফাল্গুন] তারিখে।

রাণুর ভবিষ্যৎ নিয়ে রবীন্দ্রনাথ খুবই বিব্রত ছিলেন। তিনি বিদেশে রওনা হবার আগেই রাণুর বিভিন্ন প্রণয়ীর দলে দলে কাশী ভ্রমণে বিরক্ত ও চঞ্চল হয়ে ফণিভূষণ যখন রাণুর বিবাহ দিয়ে সমস্যা থেকে মুক্ত হবার প্রস্তাব তাঁর কাছে করেছিলেন তখন রবীন্দ্রনাথ তাঁকে লেখেন : 'শীঘ্রই রাণুর বিবাহ দিয়ে সমস্যা

সমাধানের যে চিন্তা করচ আমার কাছে সেটা ভালো বলে ত ঠেকচে না, তাতে সামাজিক সমস্যার মীমাংসা হতেও পারে, কিন্তু রাণুর নিজের পক্ষে সেটা সুখকর কিম্বা কল্যাণকর হবে কিনা সেটাই বিশেষ করে ভাববার কথা। ··· আমার ত মনে হয় আরো কিছুদিন পড়াশোনার ভিতর দিয়ে নিয়ে গিয়ে বর্ত্তমান এই সমস্ত জঞ্জালের চিহ্ন মুছে ফেলা সর্ব্বপ্রথমে দরকার। তারপরে অপেক্ষাকৃত সুস্থ শান্ত হলে ওর সম্বন্ধে সুব্যবস্থা সহজ হবে।'[১৭৪] কিন্তু বুয়েনোস আইরেসে 23 Dec রাণুর চিঠি পেয়ে তিনিও সম্ভবত ভয় পেয়ে যান। এর মধ্যে লেখিকা অনুরূপা দেবীর দৌত্যে শিল্পপতি স্যার রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের পুত্র বীরেন্দ্রনাথের সঙ্গে রাণুর বিবাহের প্রস্তাব উভয়পক্ষের সম্মতিতে পাকা হয়ে যায়। তাই দেশে ফিরেই বোম্বাইতে ফণিভূষণের চিঠিতে এই সংবাদ পেয়ে তিনি হয়তো স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে লিখলেন :

কাল বোম্বাই এসে পৌঁচেছি। রাণুর বিবারে সম্বন্ধের খবর পেয়ে অত্যন্ত নিশ্চিন্ত হলুম। তার জন্যে আমার মনে বিশেষ উদ্বেগ ছিল। নিশ্চয়ই পাত্রটি ভালই এবং তাকে যখন রাণুর পছন্দ হয়েছে তখন কোনো কথাই নেই। যতগুলি সম্ভাবনা ঘটেছিল তার মধ্যে এইটেই যে সব চেয়ে ভালো তা নিঃসন্দেহ। ওরা দুজনে সুখী হোক এবং সর্ব্বতোভাবে ওদের কল্যাণ হোক্ এই আমার কামনা। ··· জুন মাসে যদি রাণুম বিবাহ হয় তাহলে উপস্থিত থাক্‌তে পারব না— কিন্তু আমার অন্তরের আশীর্ব্বাদ তাকে বেষ্টন করে থাক্‌বে।

রবিবার বোম্বাই মেলে শান্তিনিকেতনে যাত্রা করব। রাত্রি তিনটের সময় কুড়ি মিনিটের জন্যে কাশী থেকে মোগলসরাইয়ে আসবার দুঃখ দিতে চাই নে।[১৭৫]

কিন্তু এই নিষেধ না মেনে রাণু তাঁর বড়োদিদি আশার সঙ্গে মোগলসরাই স্টেশনে এসে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করেন। তিনি তাতে আদৌ দুঃখিত হননি, সে কথা জানা যায় সম্ভবত 7/8 Apr [২৪/২৫ চৈত্র] ফণিভূষণকে লেখা চিঠিতে : 'অনেক দিন পরে মোগলসরাইয়ে আশা ও রাণুর সঙ্গে দেখা হয়ে খুব খুসি হলুম। রাণুর অনুরোধ, তার বিবাহের পূর্ব্বে যেন য়ুরোপে না যাই। তার অনুরোধ এড়ানো কঠিন। কিন্তু বিবাহের দিন পরিবর্ত্তন কি অসম্ভব? শুনেছি পাত্রের ইচ্ছা ছিল নভেম্বরে বিবাহ হয়। যদি তদনুসারে দিন স্থির কর তাহলে আমি তার পূর্ব্বেই ফিরে আসতে পারি।'[১৭৬] এই সময়ে 4 Apr [শনি ২১ চৈত্র] তিনি রাণুকেও একটি চিঠিতে লেখেন :

তুমি যে দুঃখ পেয়েছ তাতে তোমার কোনো ক্ষতি হবে না— ভালোই হবে; এর আঘাত একদিন কাটিয়ে উঠে সুস্থ হয়ে সুন্দর হ'য়ে তোমার সংসারের মধ্যে ঠিক আসনটি পেতে পারবে। তোমার নূতন জীবনের জন্যে তোমার বিধাতা কঠিন দুঃখের দাবী করেচেন। ···

ইতিমধ্যে বীরেন এসেছিল। যতবার তার সঙ্গে আমার আলাপ হচ্চে ততবারই আমি খুসি হচ্চি। তার ক্ষমা তার প্রেম তোমার পক্ষে অমূল্য সম্পদ। নিজের মধ্যে একদিকে যেমন তুমি দৈন্যের গ্লানি ভোগ করেচ বাইরে থেকে আর একদিকে তেমনি দুর্লভ ঐশ্বর্য লাভ করতে পেরেচ— এমন সার্থকতা তো সকলের ভাগ্যে ঘটে না। কেবল দুঃখই তো পেতে পারতে, কিন্তু তার চেয়ে আরো আক্ষেপের বিষয় হ'ত, যদি যা পাচ্চ তার মূল্য বোঝবার সুযোগ না পেতে। যদি আত্মাভিমান নিয়ে বিধাতার দানকে খর্ব্ব করতে।

বীরেনরা আরো দুটো চিঠি পেয়েছে। তাতে অপরপক্ষ ওদের অনেক শাসিয়ে লিখেছে। কিন্তু তাতে কেবল তারা নিজেদেরই উত্তরোত্তর বেশি করে ঘৃণ্য করে তুল্‌চে। তোমার উপরে ওদের করুণা এবং স্নেহ আরো বেড়েই চলেচে।[১৭৭]

এইবার একটু পিছিয়ে যাওয়া দরকার। 18 Feb [বুধ ৬ ফাল্গুন] ভারতবর্ষে বোম্বাই বন্দরে পৌঁছে পরদিন 19 Feb ভিক্টোরিয়া ওকাম্পোকে একটি চিঠি লিখে রবীন্দ্রনাথ তাঁর দেশে ফেরার সংবাদ জানিয়ে লেখেন, তাঁর দুর্বলতা এখনও রয়েছে। ভেনিসের ডাক্তারও তাঁকে বলেছেন, তাঁর জীবনীশক্তির অবশিষ্ট অংশটুকু সাবধানে খরচ করতে, কিন্তু 'I already feel that India is sure to make an extravagant claim upon it and exhaust my resources sooner than it could be helped.' সেই কারণেই তিনি ভাবছেন, এপ্রিলেই তিনি

য়ুরোপের উদ্দেশে রওনা হবেন ও গরমের মাসগুলো সেখানেই কাটাবেন। অবশ্য এল্‌ম্‌হার্স্টের মতো উপযুক্ত সেক্রেটারি আর পাবার আশা তাঁর নেই। তবে য়ুরোপে পৌঁছেই তিনি ভিক্টোরিয়াকে খবর দেবেন।

এর পরে *The Nacion* পত্রিকায় মুদ্রিত তাঁর রচনার স্প্যানিশ অনুবাদের মূল্য সরাসরি তাঁর কাছে পাঠিয়ে দেবার জন্য তাঁকে অনুরোধ জানিয়েছেন, কারণ য়ুরোপে যাওয়ার ব্যয় নির্বাহের জন্যই টাকাটা তাঁর দরকার। কেতকীর দেওয়া তালিকানুযায়ী ইতিমধ্যে রবীন্দ্ররচনার দশটি অনুবাদ উক্ত পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। চিঠিটি তিনি শেষ করেছেন এই লিখে : 'Though you may not get letters from me too often be sure that I remember you with my *bhalobasa*.'[১৭৮] এর কয়েকদিন পরে সম্ভবত 25 Feb ভিক্টোরিয়া রবীন্দ্রনাথকে লেখেন : 'Dear Gurudev—/ Days are endless since you went away.' আর্জেন্টিনায় শরৎকাল এসেছে এবং চলেও যাবে, 'But I am afraid I will never learn patience.' পত্রের শেষে তাঁর সংযোজন : 'Fany nearly cries when she speaks of you.'[১৭৯] মনে হয়, তাঁর নিজের অবস্থাও এঁর চেয়ে কিছু উন্নততর ছিল না।

রবীন্দ্রনাথ যখন বোম্বাইতে ছিলেন তখন ফ্রি প্রেস-এর একজন প্রতিনিধি তাঁর ভ্রমণের উদ্দেশ্য ও অন্যান্য বিষয়ে তাঁকে কিছু প্রশ্ন করেন, তাঁর প্রতিবেদন মডার্ন রিভিয়্যু-র Apr 1925 [pp. 483–85]-সংখ্যায় 'Rabindranath Tagore on His Mission' নামে উদ্ধৃত হয়। বিভিন্ন দেশের সঙ্গে সাংস্কৃতিক সমন্বয়ের উদ্দেশ্য ও পদ্ধতি বিষয়ে প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, সমস্ত বিশ্বের সঙ্গে যোগ স্থাপনই তাঁর লক্ষ্য। তাঁর মতে, ভারতবর্ষের আর অজ্ঞাতবাসে থাকা উচিত নয়, সভ্যতার পুনর্গঠনে তাকে আবার সম্মানিত ভূমিকা নিতে হবে। 'I hope the movement of Visvabharati will help to bring India out from her spiritual and intellectual segregation into contact with the West.' ঘটনাচক্রে তিনি নিজে বিশ্ববাসীর অন্তরে স্থান পেয়েছেন ও সেই সুযোগটি কাজে লাগিয়েই তিনি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সঙ্গে ভারতের যোগাযোগের পথ উন্মুক্ত করতে চান। আগে যখন ভৌগোলিক বাধা বর্তমান ছিল তখন ব্যক্তিবিশেষ অন্যদেশে গিয়ে সংযোগ স্থাপন করতেন, এখন বিজ্ঞানের উন্নতিতে বিভিন্ন জাতির মধ্যে আদানপ্রদানের পথ প্রশস্ত হয়েছে। বিশ্বের সব জাতি যতদিন-না তাদের আত্মিক ঐক্যকে অনুভব করতে পারবে ততদিন স্থায়ী শান্তির আশা নেই। তিনি বললেন : 'Through Visvabharati I endeavour to give expression to the truth of the indivisible entity of the human race. This institution is going to be my last gift to my country. I hope it will be accepted. I also hope India may have reason to be proud of the fact that this message of world-unity first took shape on her soil. It is this expression of truth and nothing more, the expression of faith in the ideal of human oneness and the divinity in man that the "Visvabharati" seeks to achieve.'

এই আশাবাদের কথা বললেও রবীন্দ্রনাথ বুঝতে পারছিলেন দেশের তৎকালীন রাজনৈতিক পরিবেশে তাঁর বাণী দেশবাসীর কাছে গ্রহণযোগ্য বলে মনে হবে না। সেই বেদনারই প্রকাশ ঘটেছে 25 Feb [বুধ ১৩ ফাল্গুন] রম্যাঁ রলাঁকে লেখা তাঁর চিঠিতে, যেটি তিনি কালিদাস নাগকে মুখে-মুখে বলে লিখিয়েছিলেন; রলাঁ তাঁর দিনপঞ্জী-তে তার ফরাসি অনুবাদ লিখে রেখেছিলেন :

আমি ভগ্ন ও নিঃশেষ হয়ে ফিরেছি। আমি ফিরেছি সেই দেশে যে-দেশ মেতে আছে অনেক কিছু নিয়ে, যে-দেশের অন্তত আমার সম্পর্কে বা আমার আদর্শ সম্পর্কে ভাবার স্বাধীনতা নেই। আমি অনুভব করি এখানে, অন্তত এই মুহূর্তে, আমি প্রয়োজনীয় নই। আমার ভয় হয়, আমার আন্তর্জাতিক মৈত্রীর আদর্শকে অসময়োচিত ব'লে, অধিকন্তু, এক কাব্যিক বিলাস— যাতে গা ঢেলে দেবার ঝুঁকি আমাদের যুগ নিতে পারে না ব'লে, আমার দেশের লোক না ভাবতে শুরু করে।

কিন্তু আমি একই সময়ে অনুভব করি যে, আমার জন্যে এক দেশ আছে, আমার জন্যে এক বন্ধু আছেন, আর আছেন আমার আদর্শের জন্যে আমার সহযোগীরা, আছেন সহায়করা। তাঁদের সবাইকে আমি আবিষ্কার করি আপনার মাধ্যমে, আপনার গভীর বন্ধুত্বের মাধ্যমে একজনের মধ্যে। এই আবিষ্কার আমাকে শক্তি দেয়, বিশ্বাস এনে দেয়। এবং আমার জীবনের সন্ধ্যার এই ভাঁটার মুহূর্তে এনে দেয় সর্বশেষ আনন্দ।[১৮০]

27 Feb তিনি ভিক্টোরিয়া ওকাম্পোকেও একটি চিঠি লিখলেন, অবশ্য তাঁকে খুশি করার জন্য লিখলেন নিজের হস্তাক্ষরে। মিরালরিও-র সোফাটি ইতিমধ্যে শান্তিনিকেতনে পৌঁছেছিল, তাঁর অধিকাংশ সময় কাটছিল এরই কোমল আশ্রয়ে। তিনি জানালেন, ক্রাকোভিয়া জাহাজেই 1 May তাঁর জন্য ক্যাবিনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। 'I hope that by that time I shall have strength enough to carry out my plan and sail for the shore where the people are expecting me with all their wealth of welcome.' চিঠিটিতে কিছু কাজের কথাও আছে। Alexandra David Neel [1868–1969] নামক একজন ফরাসি পরিব্রাজিকা ও লেখিকার সঙ্গে আমাদের আগেই পরিচয় হয়েছে [দ্র রবিজীবনী ৬। ২৭৯–৮০], এই সময়ে তিব্বত ভ্রমণের শেষে তিনি কলকাতায় এসে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করেন। *La Nacion* পত্রিকাটির সম্পাদক তাঁকে সেখানে লেখার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন বলে তিনি রবীন্দ্রনাথের অভিমত জানতে চান, উত্তরে 'I have assured her the respectability of the paper and have referred her to you. You are likely to receive a letter from her.'

কিন্তু 4 Mar [বুধ ২০ ফাল্গুন] তিনি ভিক্টোরিয়াকে জানালেন, তাঁর য়ুরোপ যাত্রা অগাস্ট মাসের আগে হবে না। একই দিনে এল্‌ম্‌হার্স্টকে লিখলেন প্রধানত তাঁরই সম্বন্ধে : 'I have just received a letter from Vijaya which makes me feel sad. I know love is precious in this world and yet helplessly to allow it to be wasted hurts me deeply. Now that I am away from Vijaya the pressure of her gift no longer oppresses my mind— I only feel the beauty of it, and the intense cry of her pain from across our endless separation seems to burn like a star. I do hope her offering which finds no adequate value in return may not be an unmixed loss for her and that this divine music of love's suffering may modulate her nature into a harmony which has its own eternal worth.'[১৮১] পত্রটিতে এল্‌ম্‌হার্স্টের বিবাহ উপলক্ষে শুভকামনা জানিয়ে লিখেছেন, 'it will cause me the loss of a companionship which will never be compensated [for] in the short span of life that still remains to me.' এই উপলক্ষেই তিনি 6 Mar [শুক্র ২২ ফাল্গুন] অসিতকুমার হালদারকে লিখলেন : 'তোকে একটা ছবির বিষয় দিচ্চি, এঁকে শীঘ্র পাঠিয়ে দিস্‌। অন্ধকার পথ— একটি মেয়ে চল্‌ছিল, বিপরীত দিক থেকে মশাল হাতে পুরুষ এসে তার সামনে দাঁড়িয়েচে— মেয়েটি তার অবগুণ্ঠন দুই হাতে তুলে ধরেচে— পুরুষ মশালের আলোয় তার মুখের দিকে তাকিয়ে। আকাশে ধ্রুবতারা। ভাল করে এঁকে দিস্‌— দরকার আছে। দাম চাস, দাম দেব। ··· ছবিটার নাম "পরিচয়" Recognition।'[১৮২] পরে ফরমায়েশটি ঈষৎ সংশোধনও করেন : 'সেদিন চিঠিতে যে বর্ণনা করেছিলুম সেই অনুসারে আঁকতে পারিস কিম্বা পথের মধ্যে

রাত্রি শেষ হয়ে যেতেই মেয়েটির পিছনে সূর্য্য উঠ্‌ল, আর পুরুষ পথিক তার মশালটা ফেলে দিলে, এমনও করতে পারিস্’।[১৮৩] উল্লেখ্য, এর কিছুদিন আগেই অসিতকুমার লখনৌ গবর্মেন্ট আর্ট কলেজের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন।

রবীন্দ্রনাথ যখন শান্তিনিকেতনে এলেন তখন সেখানে তাঁর আদর্শবাদ অনেকটা আড়ালে পড়ে গেছে— রবীন্দ্রজীবনী-কারের ভাষায় : 'শান্তিনিকেতনেই ৯০ খানা চরকা-তক্‌লি চলিতেছে— বিধুশেখর শাস্ত্রী নন্দলাল বসু প্রমুখ অনেকেই চরকা কাটিতেছেন! রবীন্দ্রনাথ সমস্ত দেখিলেন, শুনিলেন— কোনো মতামত প্রকাশ করিলেন না। কাটুনীদের চরকার সুতায় তৈরি একটি উত্তরীয় কবিকে উপহার দেওয়া হয়।'[১৮৪]

তখন বসন্তকাল, সুতরাং রবীন্দ্রনাথ বসন্তবন্দনার জন্য প্রস্তুত হলেন। ২৬ ফাল্গুন [মঙ্গল 10 Mar] সন্ধ্যায় আম্রকুঞ্জে 'সুন্দর' অভিনয়ের আয়োজন করা হয়। এই উপলক্ষে একটি অভিনয়পত্রী মুদ্রিত হয়; চার ভাঁজ-করা আট পৃষ্ঠার একটি বড়ো কাগজের প্রথমে ছাপা : 'সুন্দর / (বসন্তোৎসব) / [লিনোকাট ছবি] / শান্তিনিকেতন / ২৬শে ফালুন, ১৩৩১'; ভিতরে আছে ১২টি গান : ১ / আজ কি তাহার বারতা পেলরে ২ / তোমায় চেয়ে আছি বসে পথের ধারে ৩ / নাই যদি বা এলে তুমি এড়িয়ে যাবে তাই বলে? ৪ / ফিরে ফিরে ডাক দেখিরে পরাণ খুলে, ৫ / ফাগুন হাওয়ায় রঙে রঙে ৬ / একি মায়া! লুকাও কায়া জীর্ণ শীতের সাজে? ৭ / মোরা ভাঙব, তাপস, ভাঙব তোমার ৮ / ওহে সুন্দর মরি মরি ৯ / লহ লহ তুলে লহ নীরব বীণাখানি ১০ / ওকি এল, ওকি এল না ১১ / কুসুমে কুসুমে চরণ চিহ্ন ১২ / যে কেবল পালিয়ে বেড়ায়, দৃষ্টি এড়ায়। এদের মধ্যে ১, ১১, ১০ ও ৯-সংখ্যক গানের মূল খসড়া রমা মজুমদার [কর]-কে ২৯ বৈশাখ ১৩৩৩ তারিখে উপহার দেওয়া পাণ্ডুলিপিতে [Ms. 464] উল্লিখিত ক্রমে পাওয়া যায়; ৩, ৭, ৬, ৪ ও ২-সংখ্যক গানের খসড়া রয়েছে উক্ত পাণ্ডুলিপিরই প্রথমাংশে, সম্ভবত আগে রচিত— 'ওকি এল ও কি এল না' গানটিতে তারিখ আছে 8 Mar 1925 [রবি ২৪ ফাল্গুন]।

কিন্তু অনুষ্ঠানটি শেষপর্যন্ত হতে পারেনি— চৈত্র-সংখ্যা [পৃ ৭২] শান্তিনিকেতন-এর 'আশ্রম সংবাদ'-এ প্রমথনাথ বিশী লিখেছেন :

> বিগত দোলপূর্ণিমা উপলক্ষ্যে 'সুন্দর' নামে ছোট একটি গীতি-ভূমিকা অভিনয় হইবার কথা ছিল।
>
> স্বয়ং গুরুদেব ছাত্রছাত্রীদের ইহার গানগুলি শিখাইয়াছিলেন। আম্রকুঞ্জে অভিনয় স্থলটি শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ করের তত্ত্বাবধানে সুচারুরূপে সজ্জিত হইয়াছিল। অভিনয়ের দল ও অভিনয়ের স্থল যখন প্রস্তুত এমন সময় সন্ধ্যাকালে আকাশ মেঘে ভরিয়া উঠিল এবং দেখিতে দেখিতে বান-ডাকানো বৃষ্টিতে অনভিনীত উৎসবের উপরে অকস্মাৎ জল-যবনিকা টানিয়া দিল।

সেই ঝড়ের মধ্যেই রবীন্দ্রনাথ একটি নূতন গান লিখলেন : 'রুদ্রবেশে কেমন খেলা কালো মেঘের ভ্রূকুটি' দ্র গীত ২। ২১১; স্বর ২। ঝড়বৃষ্টি থেমে যাবার পরে তৎকালীন গ্রন্থাগারের [বর্তমান পাঠভবন দপ্তর] উপরের তলায় অবস্থিত কলাভবনের প্রশস্ত হলঘরে গানের আসর বসে, রবীন্দ্রনাথ সেখানেই এই সদ্যোরচিত গানটি গেয়ে শোনান। অবশ্য বর্ষশেষের রাত্রে 'সুন্দর' সাড়ম্বরে অভিনীত হয়। পরিবর্তিত আকারে 'সুন্দর' জোড়াসাঁকোয় পুনরভিনীত হয় ১৩ ও ১৫ মাঘ ১৩৩৫ [26, 28 Jan 1929] তারিখে। যথাস্থানে আমরা এই অভিনয়গুলি নিয়ে আলোচনা করব।

এর অব্যবহিত পরে সম্ভবত ২৮ ফাল্গুন [বৃহ 12 Mar] রবীন্দ্রনাথ কলকাতায় রওনা হন—ক্যাশবহিতে '২৮ ফাল্গুন শ্রীযুত কর্ত্তামহাশয়ের কলিকাতা গমন সময়ে কুলী খরচ' হিসাব থেকে তারিখটি জানা যায়। তিনি

আলিপুর অবজারভেটরিতে প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশের সরকারি বাসভবনে আশ্রয় গ্রহণ করে প্রায় এক মাস পরে ২৬ চৈত্র [বৃহ 9 Apr] শান্তিনিকেতনে ফিরে আসেন— এই তারিখটিও '২৬ চৈত্র শ্রীযুক্ত কর্ত্তাবাবু মহাশয়ের কলিকাতা হইতে বোলপুর আগমন' হিসাব থেকে অনুমিত।

কলকাতায় গিয়ে রবীন্দ্রনাথকে নানাবিধ ব্যস্ততার মধ্যে দিন কাটাতে হয়। আমরা আগেই বলেছি, তাঁর বিদেশে অবস্থানকালের মধ্যেই রাণুর বিবাহ স্থির হয়ে যায় বিশিষ্ট শিল্পপতি স্যার রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের পুত্র বীরেন্দ্রনাথের [1899–1982] সঙ্গে। মীরা দেবী বিদেশে অধ্যয়নরত পুত্র নীতীন্দ্রনাথকে 11 Feb [২৯ মাঘ] এই বিষয়ে অনেক খবর দিয়ে লিখেছিলেন : 'আমি কয়েকদিন আগে পাঁচ ছ দিনের জন্যে কলকাতায় বেড়াতে গিয়েছিলুম। সেখানে তখন কাশীর রাণুরা এসেছিল। মা ও বাবা রাণুকে নিয়ে প্রশান্তদের বাড়ীতে উঠেছিলেন। Sir R. N. Mukherjee-র ছেলের সঙ্গে রাণুর বিয়ের ঠিক্ হয়েছে তার আশীর্ব্বাদ দিতে কলকাতায় এসেছিলেন। রাণুকে ওঁরা ২ হাজার টাকা দামের একটা হীরের নেক্‌লেস দিয়েছেন। আষাঢ় মাসে বিয়ে হবে। ··· R. N. Mukherjeeদের বাড়ীর মেয়েরা কাশীতে বেড়াতে গিয়েছিলেন সেখানে রাণুকে দেখে ওঁদের পছন্দ হয় ও অল্প কয়েক দিনের মধ্যে কথাবার্ত্তা ঠিক হয়ে যায়।'[১৮৫] কিন্তু তৎসত্ত্বেও রাণুর প্রাক্তন প্রণয়ীরা হাল ছাড়েননি। তাঁরা অধিকারী ও মুখোপাধ্যায় পরিবারের উদ্দেশে বেনামি পত্র লিখে বিয়ে ভেঙে দেবার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ কোনো সূত্রে খবর পান যে, এঁদের মধ্যে পাথুরিয়াঘাটা ঠাকুরপরিবারের প্রফুল্লনাথ ঠাকুরের পুত্র পূর্ণেন্দ্রনাথও [বুড়ো] আছেন। রাণুর মা সরযূবালা এইরূপ কয়েকটি চিঠি তাঁকে পাঠিয়ে দেন। আলিপুরে থাকার সময়ে চিঠিগুলি দেখিয়ে রবীন্দ্রনাথ পূর্ণেন্দ্রনাথকে বকাবকি করেন। রবীন্দ্রভবন-সংগ্রহে দেখা যায়, প্রত্যুত্তরে পূর্ণেন্দ্রনাথ তাঁকে ইংরেজিতে কয়েকটি কঠিন চিঠি লেখেন। 13 Apr [সোম ৩০ চৈত্র]-এর পত্র থেকে কয়েকটি বাক্য উদ্ধৃত করছি : 'For the past fourteen months you have made me the target of vile calumnies directed by an implacable hatred which knows neither conscience nor honour. You know that impertinent slanders deliberately aimed at my integrity and character and not at mine alone, you have allowed to travel from Calcutta to Benares, impressed with the high authority of your name.' 20 Apr [৭ বৈশাখ ১৩৩২]-এর চিঠি থেকে জানা যায়, রবীন্দ্রনাথের আহ্বানে পূর্ণেন্দ্রনাথ, তাঁর পিতা প্রফুল্লনাথ ও অন্য একজন ভদ্রলোক 24 Mar [মঙ্গল ১০ চৈত্র] আলিপুর অবজারভেটরিতে গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করেন। পূর্ণেন্দ্রনাথের ভাষায়, সেদিন তাঁর আচরণটি ছিল এইরকম : 'Your rude and inhospitable behaviour I had to endure in silence but not without pained surprise at the uncontrollable physical vehemence with which you throw out words of insult not only at me but also to your other guests.' রথীন্দ্রনাথ পরে এইরূপ তিনটি পত্রের প্রতিলিপি প্রফুল্লনাথের কাছে পাঠিয়ে দিলে তিনি যথোচিত 'ভর্ৎসনা' করে ঘটনাটির পরিসমাপ্তি ঘটান।

রবীন্দ্রনাথ য়ুরোপ যাওয়ার পথে হারুনা-মারু জাহাজে যে-ডায়ারি লেখেন, সেগুলি 'যাত্রারম্ভ' ও 'পশ্চিম যাত্রীর ডায়ারি' নামে প্রবাসী-র অগ্র, পৌষ ও মাঘ ১৩৩১-সংখ্যায় মুদ্রিত হয়েছিল। দক্ষিণ আমেরিকার পথে তিনি কোনো ডায়ারি লেখেননি, কিন্তু ভারতে ফেরার পথে 'ক্রাকোভিয়া' জাহাজে তিনি যে-ডায়ারি লেখেন তার কপি না পেয়ে প্রবাসী-কর্তৃপক্ষ চঞ্চল হয়ে ওঠেন। সজনীকান্ত দাস লিখেছেন : 'তিনি বলিয়া পাঠাইলেন, লেখা বীজাকারে তাঁহার নোট-বইয়ে রহিয়াছে, নিজের হাতে তাহাকে প্রকাশযোগ্য রূপ দিবার উৎসাহ তাঁহার

নাই; তবে উপযুক্ত লেখক পাইলে মুখে মুখে বলিয়া যাইতে রাজী আছেন।' প্রবাসী-র পক্ষ থেকে সজনীকান্ত এই কাজে নিযুক্ত হলেন। তিনি লিখেছেন :

রবীন্দ্রনাথের অধিষ্ঠান তখন সাময়িকভাবে আলিপুরের হাওয়া-আপিসেই অধ্যক্ষ প্রশান্তচন্দ্রের অতিথি-রূপে। আমাকেও সাময়িকভাবে সেখানে ডেরা বাঁধিতে হইল। ··· দিনরাত্রি সর্বদা কয়েকদিন একসঙ্গে থাকিতে হইয়াছিল, এক টেবিলে আহার করিতাম, এক ঘরে শয়ন করিতাম [?]। খেয়াল হইলেই তিনি আরাম-কেদারায় হেলান দিয়া নোট-বইটি চোখের সামনে মেলিয়া ধরিয়া মুখে মুখে ডায়ারি রচনা করিয়া চলিতেন, আর আমি লিখিয়া যাইতাম। ৭ই ফেব্রুয়ারি, ১৯২৫ তারিখ হইতে শেষ পর্যন্ত আমার অনুলিখন। মাঝে মাঝে হঠাৎ থামিয়া গিয়া সুষ্ঠু শব্দ হাতড়াইতেন, আমি সাধ্যমত কথা যোগাইতাম, অনেক শব্দ এবং কিছু কিছু বাক্য যে আমার রচনা নয় তাহা হলফ করিয়া বলিতে পারিব না।[১৮৬]

—ডায়ারির এই অবশিষ্টাংশ বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ ১৩৩২-সংখ্যা প্রবাসী-তে মুদ্রিত হয়।

এই সময়ে রবীন্দ্রনাথের উপর আর-একটি নূতন দায়িত্ব এসে পড়ল। আর্ট থিয়েটার লিমিটেড বিশ্বভারতীর কর্মসমিতির কাছে 25 Mar [১১ চৈত্র] আবেদন করে, তারা দু'বছরের জন্য 'চিরকুমার সভা'র অভিনয়-স্বত্ব চাইছে, পাণ্ডুলিপি পাওয়ার ছ'মাসের মধ্যে তারা নাটকটি অভিনয় করবে এবং প্রতিটি অভিনয়ের জন্য ৩০ টাকা করে রয়্যালটি দেবে, টিকিট বিক্রি ১৫০০ টাকা অতিক্রম করলে যার পরিমাণ হবে ৫০ টাকা, অন্তত ৩০০ টাকা রয়্যালটি দেওয়ার জন্য তারা প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে। 27 Mar কর্মসমিতির বৈঠকে প্রস্তাবটি গৃহীত হয়।

এর কাহিনিটি রবীন্দ্রনাথ 'চিরকুমার সভা' নামেই লিখেছিলেন 'ভারতী' পত্রিকার জন্য ও সেটি বৈশাখ ১৩০৭ থেকে জ্যৈষ্ঠ ১৩০৮-সংখ্যায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। এই নামেই উপন্যাসটি ১৩১১ সালে হিতবাদীর রবীন্দ্র গ্রন্থাবলী-র অন্তর্ভুক্ত হয়। কিঞ্চিৎ পরিবর্তিত আকারে ফাল্গুন ১৩১৪-তে গদ্যগ্রন্থাবলী ৮ম খণ্ড রূপে প্রকাশের সময়ে এর নাম হয় 'প্রজাপতির নির্বন্ধ'। এখন প্রশ্ন হল, রবীন্দ্রনাথ উপন্যাসটির নাট্যরূপ কার জন্য ও কবে দিয়েছিলেন। শিশিরকুমার ভাদুড়ী বলেছেন : 'ঐ বইটাও কিন্তু উনি আমাকেই লিখে দিয়েছিলেন। তার প্রথম এডিশনের কাটা বই-এ কাগজ মেরে রবিবাবুর হাতে লেখা কারেকশন, এতকাল আমার কাছেই ছিল, এখন এই নতুন বাড়ি বদলাতে গিয়ে হারিয়ে গেল। ··· চিরকুমার সভা স্টার থিয়েটারে অভিনীত হবারও একটা কাহিনী আছে। বইটা পাবার পর আমি অন্য বই অভিনয় করছি, সেই সময় প্রবোধচন্দ্র গিয়ে ওঁকে বললে— এই তো শিশিরবাবু এতদিন রেখে দিয়েছেন, এখন আবার অন্য বই করছেন। উনি করবেন না। কান পাতলা লোক ছিলেন তো, তখনি ওকে দিয়ে দিলেন।[১৮৭] হেমেন্দ্রকুমার রায় কোনো তারিখ ও সালের উল্লেখ না করেই লিখেছেন :

আমি যতদূর জানি, রবীন্দ্রভক্ত শ্রীশিশিরকুমার ভাদুড়ীর আগ্রহাতিশয় দেখে কবি "চিরকুমার সভা"কে নাটকাকারে গেঁথে প্রথমে তাঁরই হাতে সমর্পণ করেন— তখন মনোমোহন নাট্যমন্দিরে "সীতা" চলেছে মহাসমারোহে। সেই সময়ে মৎসম্পাদিত "নাচঘর" পত্রিকায় মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়কে লিখিত রবীন্দ্রনাথের এই পত্রাংশ প্রকাশিত হয়েছিল : "শিশির ভাদুড়ির প্রয়োগনৈপুণ্য সম্বন্ধে আমার বিশেষ শ্রদ্ধা আছে, সেই কারণেই ইচ্ছাপূর্বক আমার দুই একটা নাটক অভিনয়ের ভার তাঁর হাতে দিয়েছি।" ঐ 'দুই-একটা নাটকের মধ্যে একখানি হচ্ছে "চিরকুমার সভা"। কবির নিজের মুখে তার পাঠ শোনবার এবং তার পাণ্ডুলিপি স্বচক্ষে দেখবার সুযোগ ও সৌভাগ্য আমার হয়েছে। মনোমোহন নাট্যমন্দিরে "চিরকুমার সভা"র মহলাও শুরু হয়। কিন্তু শিশিরকুমারের দুর্ভাগ্যক্রমে একসঙ্গে ভালো গান গাইতে ও ভালো অভিনয় করতে পারেন, অক্ষয়ের ভূমিকার উপযোগী এমন অভিনেতা পাওয়া গেল না, কাজেই তখনকার মত মহলা বন্ধ হ'ল। সেই সুযোগে ষ্টার থিয়েটারের কর্তৃপক্ষ "সীতা"র মত "চিরকুমার সভা" থেকেও শিশিরকুমারকে বঞ্চিত ক'রে (তাঁর অজ্ঞাতসারেই) হস্তগত করেন। এই সব থিয়েটারি কূটনীতি রবীন্দ্রনাথের জানবার কথা নয়; খুব সম্ভব তাঁকে বোঝানো হয়েছিল যে, শিশিরকুমার এই নাটিকা মঞ্চস্থ করতে প্রস্তুত নন।[১৮৮]

হেমেন্দ্রকুমার যে-সময়কাল নির্দেশ করেছেন, সেটি হল ১২ ভাদ্র ১৩৩১ [28 Aug 1924] তারিখের কাছাকাছি, কারণ উক্ত তারিখেই রবীন্দ্রনাথ 'দুই একটা নাটক অভিনয়ের ভার' শিশিরকুমারকে দেবার কথা মণিলালকে লিখেছিলেন। কিন্তু যদিও 'প্রজাপতির নির্বন্ধ' বা 'চিরকুমার সভা' উপন্যাসে অক্ষয়ের মুখে অনেকগুলি গান আছে, কিন্তু 'চিরকুমার সভা' নাটকের মতো অভিনেতা-অভিনেত্রীদের জন্য অতিরিক্ত কোনো গান লেখার সুযোগ সেই সময়ে তিনি পাননি ও তার কোনো পাণ্ডুলিপিও পাওয়া যায় না অর্থাৎ তখন বা তার আগে রবীন্দ্রনাথ শুধু 'প্রজাপতির নির্বন্ধ' উপন্যাসের একটি মুদ্রিত কপিতে কাটাকুটি বা সংযোজন করে নাট্যরূপটি শিশিরকুমারকে দিয়েছিলেন, এই অনুমানটিই কেবল স্বীকার করা যেতে পারে।

রবীন্দ্রনাথ সম্ভবত বৈশাখ ১৩৩২-এর মধ্যেই স্টার কর্তৃপক্ষকে নাট্যরূপটি হস্তান্তরিত করেছিলেন [আমরা পরে এই বিষয়ে আলোচনা করব], তবে ছ'মাসের শর্ত মেনে আর্ট থিয়েটার নাটকটি প্রথম অভিনয় করে 18 Jul 1925 [শনি ২ শ্রাবণ ১৩৩২] তারিখে, রবীন্দ্রনাথ পরের সপ্তাহে ৯ শ্রাবণ অভিনয়টি প্রত্যক্ষ করেন। কিন্তু সেটি পরবর্তী অধ্যায়ের আলোচ্য।

আলিপুরে থাকার সময়ে কবি-নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের পুত্র দিলীপকুমারের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সংগীত বিষয়ে 29 Mar [রবি ১৫ চৈত্র] ও 8 Apr (বুধ ২৫ চৈত্র] দু'বার আলোচনা হয়, দিলীপকুমার তার অনুলেখন 'রবীন্দ্রনাথ, সাহিত্য ও সঙ্গীত / (কথোপকথন)' নামে জ্যৈষ্ঠ ১৩৩২-সংখ্যা বঙ্গবাণী-তে [পৃ ৪৬৯–৮৩] প্রকাশ করেন ['আলাপ-আলোচনা' দ্র সংগীতচিন্তা ২৮। ৭৭১–৮৪, ৭৮৪–৮৬], যাদের মধ্যে অন্তত প্রথমটির বক্তব্য বিশ্বভারতীর স্বত্বমুক্ত রবীন্দ্রসংগীতের সুরবিশুদ্ধি-সংক্রান্ত বিতর্কের পটভূমিকায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। দিলীপকুমার বলেন : 'আমি··· আপনার গানের সুরে একটা অনড় রূপ বজায় রাখার বিরোধী। আমি বলি গায়ককে আপনার গানের সুরের variation করবার স্বাধীনতা দিতে হবে।' তাঁর যুক্তি হল, 'আপনার কবিতা বা গানের মধ্য দিয়ে ভিন্ন ভিন্ন লোকে কী রকম ভিন্ন ভিন্ন রস সঞ্চয় করে। ··· [তাই] যদি একজন যথার্থ শিল্পী আপনার গানকে সম্পূর্ণ নতুন সুরে গেয়ে আনন্দ পান ও পাঁচজনকে আনন্দ দেন, এমন-কি তা হলেও আপনার তাতে দুঃখ না পেয়ে আনন্দই পাওয়া উচিত বলে আমি মনে করি।' তিনি ভবিষ্যদ্বাণী করেন, 'আপনার শত আশঙ্কা ও সতর্কতা সত্ত্বেও আপনার গানকে আপনি তার মৌলিক সুরের গণ্ডির মধ্যে টেনে রাখতে পারবেন বলে আমার মনে হয় না।' রবীন্দ্রনাথ ম্লান হেসে দিলীপকুমারের এই আশঙ্কা স্বীকার করে বলেন : 'আমার গানের বিকার প্রতিদিন আমি এত শুনেছি যে আমারও ভয় হয়েছে যে, আমার গানকে তার স্বকীয় রসে প্রতিষ্ঠিত রাখা হয়তো সম্ভব হবে না। গান নানা লোকের কণ্ঠের ভিতর দিয়ে প্রবাহিত হয় বলেই গায়কের নিজের দোষগুণের বিশেষত্ব গানকে নিয়তই কিছু না-কিছু রূপান্তরিত না করেই পারে না। ··· নিজের গানের বিকৃতি নিয়ে প্রতিদিন দুঃখ পেয়েছি বলেই সে দুঃখকে চিরস্থায়ী করতে ইচ্ছা করে না।' আর সেইজন্যই তিনি দিলীপকুমারের দাবি প্রত্যাখ্যান করে বলেন : 'তুমি কি বলতে চাও যে, আমার গান যার যেমন ইচ্ছা সে তেমনিভাবে গাইবে? আমি তো নিজের রচনাকে সেরকম ভাবে খণ্ডবিখণ্ড করতে অনুমতি দেই নি। ··· যে রূপসৃষ্টিতে বাহিরের লোকের হাত চালাবার পথ আছে তার এক নিয়ম, আর যার পথ নেই তার অন্য নিয়ম। ··· হিন্দুস্থানী সংগীতকার, তাঁদের সুরের মধ্যকার ফাঁক গায়ক ভরিয়ে দেবে এটা যে চেয়েছিলেন। ··· কিন্তু আমার গানে তো আমি সেরকম ফাঁক রাখি নি যে, সেটা অপরে ভরিয়ে দেওয়াতে

আমি কৃতজ্ঞ হয়ে উঠব।' অবশ্য আলোচনাটির সূত্রপাত হয়েছিল বাংলা ও হিন্দুস্থানি গানের পার্থক্য নিয়ে, যেখানে রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রথমজীবনের সংগীতশিক্ষক বাঙালি গুণী যদুভট্টের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন, 'গান যাঁর অন্তরের সিংহাসনে রাজমর্যাদায় ছিল— কাষ্ঠের দেউড়িতে ভোজপুরী দরোয়ানের মতো তাল-ঠোকাঠুকি করত না'।

দ্বিতীয় আলোচনাটি ছিল সংগীতের ভাষার বিশ্বজনীনতা নিয়ে। রবীন্দ্রনাথ বলেন : 'গানের ভিতরকার রসটি সর্বজাতির কিন্তু ভাষা, অর্থাৎ তার বাহিরের ঠাটখানা, বিশেষ বিশেষ জাতির। সেই পাত্রটি যথার্থ রীতিতে ব্যবহারের অভ্যাস যদি না থাকে তবে ভোজ ব্যর্থ হয়ে যায়।' তিনি নিজে এইসময়ে ছবির জগতে শিক্ষানবিশি করছেন, তাই স্বতই এই আলোচনায় এসে গেছে ছবির কথাও : 'কাব্যের ও গানের ভাষা সম্বন্ধে বিশেষ দেশকালের যেমন বিশেষত্ব আছে, ছবির ভাষায় তেমন নেই; কারণ, ছবির উপকরণ হচ্ছে দৃশ্য পদার্থ — অন্য ভাষার মতন সে তো একটা সংকেত নয় বা প্রতীক নয়। গাছ শব্দটা একটা সংকেত, তার প্রত্যক্ষ পরিচয় শব্দটার মধ্যেই নেই, কিন্তু গাছের রূপরেখা আপন পরিচয় আপনি বহন করে। তৎসত্ত্বেও চিত্রকলার idiom যতক্ষণ না সুপরিচিত হয় ততক্ষণ তার রসবোধে বাধা ঘটে।'

নির্মলকুমারী [রানী] মহলানবিশ সম্পর্কে দিলীপকুমারের [মন্টু] মাসি ছিলেন। ৯ বৈশাখ ১৩৩২ [বুধ 22 Apr] রবীন্দ্রনাথ এই সাক্ষাৎকার বিষয়ে তাঁকে লেখেন : 'মন্টুর সঙ্গে কথোপকথন সূত্রে সঙ্গীত সম্বন্ধে যে আলোচনা করেছি অন্য কোনো আকারে তা সম্ভবপর হত না। প্রকাশের প্রত্যেক প্রণালীরই একটি বিশেষত্ব আছে— তার দ্বারা বিশেষ ফললাভ করা যায়। অতএব মন্টুকে বোলো এই তর্কটিকে তার স্বকীয়রূপেই প্রকাশ করে যেন। কিন্তু সাপ্তাহিকে নৈব নৈবচ। এবং একবার যেন আমার কাছে প্রুফ আসে। বলাবাহুল্য আমি কেবল নিজের কথিত অংশেরই দায়িত্ব নেব।'[১৮৯] এই কারণেই দিলীপকুমার পত্রিকায় প্রকাশকালে টীকায় লিখেছিলেন : 'কবিবর তাঁর অসুস্থতাসত্ত্বেও নিজের বক্তব্যটুকু প্রায় সমস্তটাই আদ্যন্ত লিখে দিয়েছেন।'

রাণুর বিয়ের ব্যাপার নিয়ে যে-গোলমাল ঘনিয়ে উঠেছিল, রবীন্দ্রনাথ তার জন্য তাঁর প্রতি গভীর মমত্ব অনুভব করছিলেন, ফলে তাঁর সম্বোধনের ভাষাই 'তুমি' থেকে 'তুই'-তে বদলে গেছে ২১ [২২] চৈত্র তারিখের চিঠিতে : 'তুই মনে করিস্‌নে তোকে কেউ আমার স্নেহ থেকে বঞ্চিত করতে পারে— বিশেষত যখন তোকে অপমান আর দুঃখ এমন করে আক্রমণ করেচে। এই সব নিয়ে আমার এই ভাঙা শরীরে আমি কি কম বেদনা পেয়েছি— এই সব ব্যাপারে কিছুতে আমাকে সুস্থ হতে দিচ্চে না। সব চুকে গেলে তবে বিশ্রাম এবং শান্তি পাব। যদি স্নেহ মনে না থাক্ত তাহলে ভর্ৎসনাও করতুম না।'[১৯০] আগের দিনে 4 Apr লিখেছিলেন :

> তুমি যে-দুঃখ পেয়েছ তাতে তোমার কোনো ক্ষতি হবে না— ভালোই হবে; এর আঘাত একদিন কাটিয়ে উঠে সুস্থ হয়ে সুন্দর হয়ে তোমার সংসারের মধ্যে ঠিক আসনটি পেতে পারবে। তোমার নূতন জীবনের জন্যে তোমার বিধাতা কঠিন দুঃখের দাবী করেছেন। সেই মূল্য চুকিয়ে দিয়ে যা লাভ করবে তাই তোমার পক্ষে খুব বড় জিনিষ হবে। তোমার মস্ত সৌভাগ্য এই যে, তোমাকে তিনি যা দিচ্চেন তা শস্তায় দিচ্চেন না। মূল্যবান জিনিষ শস্তায় পেলে তার ঋণ থেকেই যায়। তাতে ঠিক পাওয়া হয় না। তোমার মধ্যে যা অসত্য ছিল তাই আজ এমন করে অপমানিত হল— এই ত ভালো হল। আজ অগ্নিস্নানে পবিত্র হয়ে তুমি বিশুদ্ধ নির্ম্মলস্বরূপে তোমার সংসারে আত্মোৎসর্গের বেদী রচনা কর'।[১৯১]

পত্রটি তিনি শেষ করেছেন কয়েকটি সংবাদ দিয়ে : 'আমি আগামী বুধবারে শান্তিনিকেতনে যাব। সেখানে নববর্ষের উৎসব হবে— তার পর ২৫শে বৈশাখে আমার জন্মোৎসব। আমার নূতন বাড়িও তৈরি শেষ হয়েচে।

তোমরা যখন আস্‌বে তখন আমার সমস্ত চিঠি সঙ্গে করে এনো। সকলের ইচ্ছা সে চিঠিগুলি রক্ষা করা হয় — এখানে যত্ন করেই রাখা হবে।'

'নূতন বাড়ি'টি ঠিক নুতুন নয়, 1918-এ 'উত্তরায়ণ' নামে যে খড়ের চাল-দেওয়া মাটির বাড়ি তৈরি হয়েছিল, সেইটিই নূতন নকশায় পাকা করে নির্মিত হয়, নামকরণ হয় 'কোণার্ক'! রাণু মূল চিঠিগুলির পরিবর্তে তাদের প্রতিলিপি প্রস্তুত করে রবীন্দ্রনাথকে দেন, মূল পত্রগুলি তিনি অনেক পরে অ্যাকাডেমি অব্ ফাইন আর্ট্‌স্-কে দান করেন।

দ্বিতীয় চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন : 'আজ শান্তা ও কালিদাসের এখানে নিমন্ত্রণ আছে তারই উদ্যোগে ব্যস্ত আছি তাছাড়া শরীরও শ্রান্ত।' রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের কন্যা শান্তার সঙ্গে কালিদাস নাগের বিবাহ স্থির হয়েছিল ৯ বৈশাখ ১৩৩৯ [বুধ 22 Apr] তারিখে, রবীন্দ্রনাথ সেই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকতে পারবেন না বলে ক্ষতিপূরণ স্বরূপ এই ভোজের আয়োজন করেন।

রবীন্দ্রনাথের বুধবারে [২৫ চৈত্র : 8 Apr] শান্তিনিকেতনে যাবার কথা ছিল, কিন্তু '২৬শে চৈত্র শ্রীযুক্ত কর্ত্তাবাবু মহাশয়ের কলিকাতা হইতে বোলপুর আগমন'-এর হিসাব থেকে জানা যায় কোনো কারণে তিনি পরের দিনে সেখানে প্রত্যাবর্তন করেন। স্থির হয়েছিল, আকস্মিক দুর্যোগের জন্য স্থগিত 'সুন্দর' গীতাভিনয় ৩০ চৈত্র [সোম 13 Apr 1925] সন্ধ্যায় বর্ষশেষের উপাসনার পরে অনুষ্ঠিত হবে। ফলে রাণী মহলানবিশও তাঁর সঙ্গে আসেন। বিশ্বভারতী সংসদের অনেক সদস্যও এই উপলক্ষে তখন শান্তিনিকেতনে উপস্থিত ছিলেন। তাই সেই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে ২৮ চৈত্র [শনি 11 Apr] বিশ্বভারতী সংসদের একটি অধিবেশন আহূত হয়। যথারীতি অন্যতম কর্মসচিব প্রশান্তচন্দ্রও এই উপলক্ষে শান্তিনিকেতনে আসেন। কিন্তু তার আগেই কৌতুকপ্রিয় রবীন্দ্রনাথ স্বামীবিরহিণী নির্মলকুমারীর উদ্দেশে একটি কবিতা লিখে প্রচার করেন [দ্র Ms. 464] :

চৈত্ররজনী সুফলা।
বিরহিণী একাকিনী   হতজ্ঞান করে ধ্যান
পয়ে র ফলা।
বিশ্বভারতী হায়
তার কোথায় সারথি
সেই দুরন্ত চিন্তা কারে করে চপলা।
পরিষদ সংসদ কমিটি
যে জনা জমালো তার জমিটি
তারি নামাক্ষর কণ্টকিত অবলা॥

৩০ চৈত্র বর্ষশেষের সন্ধ্যায় রবীন্দ্রনাথ মন্দিরে উপাসনা করেন, কিন্তু তাঁর প্রদত্ত ভাষণটি কোথাও প্রকাশিত হয়েছিল কিনা জানতে পারিনি। বৈশাখ ১৩৩২-সংখ্যা শান্তিনিকেতন-এর 'আশ্রম সংবাদ'-এ প্রমথনাথ বিশী লেখেন :

বর্ষশেষের দিন রাত্রে উত্তরায়ণে [কোণার্ক] গুরুদেবের বাড়ীতে "সুন্দর" নামক একটি গীতিনাট্য অভিনয় করা হয়। সবশুদ্ধ তেরটি গান অভিনয় করিয়া গাওয়া হইয়াছিল। তার মধ্যে এগারোটি গানই সম্পূর্ণ নূতন ছিল। আশ্রমবাসী ছাত্রছাত্রীগণ অভিনয়ে যোগদান করিয়াছিল। শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসু এবং শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ কর মহাশয়ের তত্ত্বাবধানে কলাভবনের ছাত্রছাত্রীগণ আলপনা দ্বারা এবং নানা প্রকার রঙীন কাপড় ও ফুল দ্বারা অভিনয় স্থলটি অতি সুন্দর ভাবে সাজাইয়াছিলেন ··· অভিনয় এবং গান বেশ ভাল হইয়াছিল।

'সুন্দর' অভিনয়পত্রীতে বারোটি গান ছিল, অনুমান করা যায় 'রুদ্রবেশে কেমন খেলা' গানটি বর্তমান অনুষ্ঠানে সংযোজিত হয়।

উল্লেখ্য, উপরে উদ্ধৃত 'চৈত্ররজনী সুফলা' কৌতুক-কবিতার পূর্বে সমসাময়িক পাণ্ডুলিপি Ms. 464-এ আরও কতগুলি নূতন গানের খসড়া পাওয়া যায়, অনুমান করা যায় যে, এগুলিও সমসাময়িক রচনা, যাদের মধ্যে চারটি গান 'চিরকুমার সভা' নাটকের জন্য লিখিত :

'যদি হল যাবার ক্ষণ' দ্র গীত ২। ৩৩৯; স্বর ২

'কেন আমায় পাগল করে যাস' দ্র ঐ ২। ৩৩৯; ঐ ২

'না বলে যায় পাছে সে' দ্র ঐ ২। ৩২৯; ঐ ১

'না, না গো না, কোরো না ভাবনা' দ্র ঐ ২। ৩১২; ঐ ৩০

'জ্বলে নি আলো অন্ধকারে' দ্র ঐ ২। ৩৭৫;ঐ ২

'ও আমার ধ্যানেরি ধন' দ্র ঐ ২। ৩৪৪; ঐ ২

'বেদনায় ভরে গিয়েছে পেয়ালা' দ্র ঐ ২। ৩০৬; ঐ ১

'এবার উজাড় করে লও হে আমার' দ্র ঐ ২। ২৯৬; ঐ ২; প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় কোনো-এক পাণ্ডুলিপি-দৃষ্টে গানটির সুনির্দিষ্ট রচনা-তারিখ উল্লেখ করেছেন ৩০ চৈত্র। দ্র গীতবিতান কালানুক্রমিক সূচী [১৩৯৯]। ২৭৫।

প্রায় সারাটি বছর রবীন্দ্রনাথ ভ্রমণে ব্যস্ত ছিলেন বলে সাময়িকপত্রে তাঁর রচনার প্রকাশসূচি তাঁর রচনার ধারাবাহিকতা বিষয়ে কোনো স্পষ্ট ধারণা সৃষ্টিতে অক্ষম এই বিবেচনায় আমরা তালিকাটি অধ্যায়ের শেষে প্রদান করছি:

ভারতী, বৈশাখ ১৩৩১ [৪৮। ১] :

১৫–১৬ 'কবির দীপিকা'

প্রবাসী, বৈশাখ ১৩৩১ [২৪। ১। ১] :

১–২ 'লীলাসঙ্গিনী' দ্র পূরবী ১৪। ৩৫–৩৮

শান্তিনিকেতন, বৈশাখ ১৩৩১ [৫। ৪] :

৬১–৬৩ 'মন্দির / ১লা ফাল্গুন, ১৩৩০'

৭৫–৭৬ 'গান' ['যখন ভাঙল মিলনমেলী'] দ্র গীত ২। ৩৮৩–৮৪; স্বর ৩০

স্বরলিপিকার অনাদিকুমার দস্তিদার।

কল্লোল, বৈশাখ ১৩৩১ [২। ১] :

'শেষ অর্ঘ্য' ['যে তারা মহেন্দ্রক্ষণে প্রত্যুষবেলায়'] দ্র পূরবী ১৪। ৩৮

The Visva-Bharati Quarterly, April 1924 [VOL I, No. 1] :

1–14 'What Then?'

51–52 'I've loved This World' ['I've loved this world's face splendour-gift']

85–91 'Notes/ The First Anniversary of Sriniketan/ President's Opening Address'

95–98 'The Guest-House of India'

'What Then' রচনাটি 'ততঃ কিম্' প্রবন্ধটির রবীন্দ্রনাথ-কৃত স্বাধীন অনুবাদ। 'I've Loved This World' ক্ষিতীশচন্দ্র সেনের করা বলাকা-র 'আমি যে বেসেছি ভালো এই জগতেরে' কবিতাটির ইংরেজি অনুবাদ। তৃতীয় রচনাটি 6 Feb [২৩ মাঘ ১৩৩০] তারিখে সুরুলে পল্লীপুনর্গঠন কেন্দ্রের দ্বিতীয় [প্রথম নয়] সাংবৎসরিক উৎসবে প্রদত্ত রবীন্দ্রনাথের ভাষণ— এর কোনো বাংলা পাঠ এখনও পাওয়া যায়নি, কিন্তু অনুমান করা যায়, মূল বক্তৃতাটি বাংলা ভাষাতেই দেওয়া হয়েছিল। 9 Dec 1923 [২৩ অগ্র ১৩৩০] বোম্বাইয়ের সান্তাক্রুজে সারস্বত কলোনির সংবর্ধনার প্রত্যুত্তরে রবীন্দ্রনাথ শেষোক্ত ভাষণটি প্রদান করেন।

প্রবাসী, জ্যৈষ্ঠ ১৩৩১ [২৪ / ১ / ২]

১৫৩–৫৪ 'বকুল-বনের পাখী ['শোনো শোনো ওগো বকুল-বনের পাখী'] দ্র পূরবী ১৪। ৪০–৪২

শান্তিনিকেতন, জ্যৈষ্ঠ ১৩৩১ [৫ / ৫] :

৮২–৮৪ 'মন্দির'

সন্তোষচন্দ্র মজুমদার-অনুলিখিত তারিখহীন রবীন্দ্রনাথের এই মন্দির-ভাষণটি 'এই যে তোমার প্রেম ওগো' গানটি অবলম্বনে প্রদত্ত হয়েছিল।

প্রবাসী, আষাঢ় ১৩৩১ [২৪ / ১ / ৩]

২৯৭ 'বেঠিক পথের পথিক' ['বেঠিক পথের পথিক আমার'] দ্র পূরবী ১৪। ৩৯–৪০

শান্তিনিকেতন, আষাঢ় ১৩৩১ [৫ / ৬] :

৯৯–১০০ 'মন্দির / বুধবার— ৮ই ফাল্গুন ১৩৩০'

১১১–১২ 'একখানি পত্র'

১১৩–১৪ 'গান' ['আজ কিছুতেই যায় না মনের ভার'] দ্র গীত ২। ৪৪৬; স্বর ৩০

স্বরলিপিকার দিনেন্দ্রনাথ।

শান্তিনিকেতন, শ্রাবণ ১৩৩১ [৫ / ৭] :

১২৭–২৮ 'গান' ['শ্রাবণ বরিষণ পার হয়ে'] দ্র গীত ২। ৪৪৫–৪৬; গীত ৩০; গানটির স্বরলিপি করেছিলেন দিনেন্দ্রনাথ।

১২৯–৩০ 'সুসীম চা-চক্র প্রবর্ত্তনা / ১ হায় হায় হায়' দ্র গীত ২। ৫৯৮–৯৯; স্বর ১৩

The Visva-Bharati Quarterly, July 1924 [Vol. II, No. 2]:

196–97 'Ashutosh Mukherji'

198–200 'Visva-Bharati Bulletin/ I Rabindranath to Chinese Students' দ্র *EWRT* 2/ 641–42

The Modern Review, August 1924 [Vol. XXXVI, No. 8] :

129–35 'The Fourfold Way of India' দ্র *EWRT* 3/ 495–503

প্রবাসী, ভাদ্র ১৩৩১ [২৪ / ১ / ৫] :

৫৭৭ 'বধূমঙ্গল' ['ওগো বধূ সুন্দরী'] দ্র গীত ২। ৫০৫–০৬; স্বর ১

৫৭৮ 'গান' ['নাই যদি বা এলে তুমি'] দ্র গীত ২। ৩৭৭; স্বর ৩০

শান্তিনিকেতন, ভাদ্র ১৩৩১ [৫। ৮]:

১৩৭–৩৯ 'মন্দির / বুধবার (য) ৫ই চৈত্র, ১৩৩০। / (চীনযাত্রার পুর্ব্বদিন)

১৪৫–৪৬ 'গান' ['ধরণীর গগনের মিলনের ছন্দে' দ্র গীত ২। ৪৫৯–৬০; স্বর ৩০

স্বরলিপিকার অনাদিকুমার দস্তিদার।

বঙ্গবাণী, ভাদ্র ১৩৩১ [৩। ২।১]:

১–১০ 'তথ্য ও সত্য' দ্র সাহিত্যের পথে ২৩। ৩৮২–৯২

'গত ১৯শে ফাল্গুন, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত সাহিত্য-বিষয়ক দ্বিতীয় বক্তৃতা।'

শান্তিনিকেতন, আশ্বিন ১৩৩১ [৫। ৯]:

১৫৭ 'গান' ['মাটির বুকের মাঝে বন্দী যে জল'] দ্র গীত ২ ৫৮৬; স্বর ২

১৬৪ 'গান' ['পথিক পরাণ চল্ চল্ সে পথে তুই'] দ্র গীত ২। ৩৯৩; স্বর ৩১

ভূমিলক্ষ্মী, আশ্বিন ১৩৩১ [১। ১] :

এই ত্রৈমাসিক পত্রিকাটি 'বিশ্বভারতীর কৃষিবিভাগের মুখপত্র' হিসাবে নব পর্যায়ে প্রকাশ শুরু করলে রবীন্দ্রনাথ 'ভূমিলক্ষ্মী' নামেই তার জন্য একটি ভূমিকা লিখে দেন। তিনি লেখেন :

মানুষের সভ্যতা প্রকৃতির প্রাণপূর্ণ সঙ্গ থেকে যতই দূরে চলে যাবে ততই তার মরণদশা ঘনিয়ে আস্‌বে, এ সম্বন্ধে সন্দেহ নেই। মানুষ এতকাল বুদ্ধির জোরে ও ব্যবহারের নৈপুণ্যে যে লোকালয় গড়ে তুলেছিল তার সঙ্গে প্রকৃতির একান্ত বিচ্ছেদ ঘটেনি; তাদের পরস্পরের মধ্যে সহযোগিতাই ছিল, প্রতিযোগিতা ছিল না। কিন্তু আধুনিক কালে কলের রাজত্ব প্রবল ও জটিল হয়ে উঠ্‌চে, তাতে মানুষ আর প্রকৃতির মধ্যে কেবল ভেদ নয় বিরুদ্ধতা বেড়ে চলেচে। এর সাংঘাতিক ফল আমাদের অন্তরে বাহিরে ক্রমশ সমস্ত পৃথিবী জুড়ে প্রকাশ পাবেই। এই যন্ত্র-রাজক সভ্যতার প্রধান দুর্গ হচ্ছে একালের সহর। যে পল্লী প্রকৃতির সন্তান তারি প্রাণ শোষণ করে' সহরগুলো স্ফীত হয়ে উঠ্‌চে। এই শোষণ-ব্যাপার মানুষের আত্মঘাতের প্রক্রিয়া।

মানুষ বিনাশ হতে রক্ষা পেতে যায় যদি তবে তা'কে আবার সেবাকুশলা ভূমির আতিথ্য গ্রহণ করতে হবে। সেইখানেই তার স্বাস্থ্য সুখ শান্তি সৌন্দর্য্য। কিন্তু এতকাল এই ভূমিলক্ষ্মীর সদাব্রত যেখানে ছিল সেই তাঁর অতিথিশালা আজ ভেঙে পড়েচে। বাংলা দেশে যে সাধকেরা তাকে গড়ে তোলবার ভার নিয়েছেন ভূমিলক্ষ্মী পত্রিকায় তাঁদের বাণী সার্থক হোক্।

The Visva-Bharati Quarterly, Aswin 1331 B.S. September 1924 Special Sharadiya (Autumn) Number

1–87 'Red Oleanders' দ্র *EWRT* 2/ 211–53

গগনেন্দ্রনাথ-অঙ্কিত চিত্রশোভিত পত্রিকার এই বিশেষ সংস্করণটি L K. Elmhirst-কে উৎসর্গ করা হয়েছে, অবশ্য গ্রন্থাকারে প্রকাশিত সংস্করণটিতে এই উৎসর্গপত্রটি নেই কেন বোঝ শক্ত। পত্রিকাটির বিক্রয়লব্ধ অর্থ হাসপাতাল তহবিলে দেওয়া হবে বলে ঘোষিত হয়।

The Modern Review, October 1924 [Vol. XXXVI, No. 10] :

369–73 'The Schoolmaster' দ্র *EWRT* 3/ 504–09

প্রবাসী, কার্তিক ১৩৩১ [২৪। ২। ১] :

১–৩ 'যাত্রার পূর্ব্বকথা'

৮৯–১০১ 'চীন ও জাপানে ভ্রমণবিবরণ'

এদের মধ্যে প্রথম রচনাটি দক্ষিণ আমেরিকা রওনা হবার পূর্বরাত্রে [১৭ ভাদ্র] শান্তিনিকেতন আশ্রমে কথিত ও দ্বিতীয় রচনাটি চিন ও জাপান থেকে ফেরার পরে কলকাতার য়ুনিভার্সিটি ইনস্টিট্যুট হলে ৫ শ্রাবণে প্রদত্ত ভাষণের ইন্দ্রকুমার চৌধুরী-কৃত অনুলেখনের সংশোধিত সংস্করণ।

শান্তিনিকেতন, কার্তিক ১৩৩১ [৫। ১০] :

২০০–০১ 'গান' ['আমার এ পথ তোমার পথের থেকে'] দ্র গীত ২। ৩৮৪; স্বর ৩০

গানটির স্বরলিপি করেন অনাদিকুমার দস্তিদার।

বঙ্গবাণী, কার্তিক ১৩৩১ [৩। ২। ৩] :

২৬৫–৭২ 'সৃষ্টি' দ্র সাহিত্যের পথে ২৩। ৩৯২–৪০০

এটি 'গত ২০শে ফাল্গুন [১৩৩০] তারিখে কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত তৃতীয় বক্তৃতা'।

The Visva-Bharati Quarterly, October 1924, Kartic 1331 B.S. [Vol II, No. 3] :

215–27 'City and Village' দ্র *EWRT* 3/ 510–18

262 'The Magnificence of Death' ['As the tender twilight covers in its fold of dusk-veil'] দ্র *Poems* 29, *EWRT* 1/ 339

279–88 'Notes and Comments'

289–98 Visva-Bharati Bulletin

I 'Conversation between Rabindranath and Governor Yen, of Shansi, China' দ্র *Talks in China* [1999]/ 125–32

II 'Rabindranath's Answers to Questions by the Students of Tsing Hua College' দ্র Ibid/132–35

প্রবাসী, অগ্র ১৩৩১ [২৪। ২। ২] :

১৪৫–৪৭ 'দক্ষিণ আমেরিকা যাত্রার পূর্ব্ব দিন'

১৯৮–৯৯ 'পূর্ণতা' ['স্তব্ধরাতে একদিন'] দ্র পূরবী ১৪। ৪৬–৪৮

১৯৯–২০৯ 'যাত্রারম্ভ' দ্র পশ্চিমযাত্রীর ডায়ারি ১৯। ৩৬৫–৮২

২০৩–০৫ 'ঘন অশ্রুবাষ্পে ভরা মেঘের দুর্য্যোগে খড়্গ হানি' দ্র পূরবী ১৪। ৪৩–৪৫ ['সাবিত্রী']

২৩৭ 'কষ্টি পাথর' / ''উপায়''-পত্রিকার প্রস্তাবনা

ক্ষণজীবী 'উপায়' পত্রিকার প্রকাশ-উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথ এই ভূমিকা লিখে দেন। প্রবাসী-র এই সংকলন রবীন্দ্রনাথের দুষ্প্রাপ্য রচনাটিকে বিলুপ্তির হাত থেকে রক্ষা করেছে দ্র বারিদবরণ ঘোষ-সম্পাদিত 'রবীন্দ্র-রচিত ভূমিকা' [১৪০৯]। ১৫২। রবীন্দ্রনাথ এই ক্ষুদ্র রচনায় লিখেছেন :

> …আসল উপায় পথে নয়, পথে যে-মানুষ চলবে তার নিজের মধ্যে। যে-মানুষ চলতেই পারে না, পথ তাকে চালায় না। আমাদের দেশে যত-কিছু দুর্গতি আছে তার মূলগত কারণ হচ্ছে এখানে মানুষ মানুষের সঙ্গে মিলতে পারে না। রাস্তায় ওপারে আগুন লাগলে এপারের লোক যে দেশে ঘড়া লুকিয়ে রাখতে ব্যস্ত হয়, পাছে সে ঘড়া নিয়ে টানাটানি করে, সে দেশের আগুন বাহিরের উপায়ে নিব্‌বে না, কেননা তার কপালে আগুন। …

দেশের সকল অভাব সকল অপমানের মূল প্রতিকার হচ্ছে পরস্পরের ঘনিষ্ঠভাবে মিলিত হওয়া। আমাদের সমাজসেবার মধ্যেই পরস্পরের ব্যবধানকে চিরন্তন ক'রে রাখা হয়েছে। এমন-কি, সেই ব্যবধানগুলিকে আমরা ধর্মানুশাসন ব'লেই গণ্য করি। এই কারণেই একদিকে যখন আমরা বলি আমরা সনাতন ধর্ম মানি, তখন অন্যদিকে উপায়ের বেলা বলতে হয় চরকা চালাও। কিন্তু চরকার সুতোয় মানুষকে মেলাবে না। মানুষ না মিললে কোনো বাহ্য উপায়ে কোনো মহাবিপদ থেকে মানুষ ত্রাণ পাবে না। মানুষের সত্য হচ্ছে মানুষের মিলনে— যে-দেশে মানুষের বিচ্ছেদকেই ধর্ম ব'লে স্বীকার করে, সে দেশকে দুর্গতি থেকে কোনো উপায়ে কেউ রক্ষা করতে পারবে না।

শান্তিনিকেতন, অগ্র ১৩৩১ [৫। ১১]:

২০৩ 'গান' ['এ কি মায়া লুকাও কায়া জীর্ণ-শীতের সাজে?' দ্র গীত ২। ৪৯৮; স্বর ৩০

২১৮ 'গান' ['যায় নিয়ে যায় আমায় আপন গানের টানে'] দ্র গীত ২। ২৭৬; স্বর ৩০

২২০ 'ডায়ারির এক পাতা' দ্র পশ্চিমযাত্রীর ডায়ারি ১৯। ৩৯০–৯৭

২২১ 'ছবি' ['ক্ষুব্ধ চিহ্ন [যে] এঁকে দিয়ে শান্ত সিন্ধুবুকে' দ্র পূরবী ১৪। ৫৩

প্রবাসী, পৌষ ১৩৩১ [২৪। ২। ৩] :

২৮৯–৯৩ 'আহ্বান' ['আমারে যে ডাক দেবে, এ জীবনে তারে বারম্বার'] দ্র পূরবী ১৪। ৪৮–৫২

২৯৪–৩০২ 'পশ্চিমযাত্রীর ডায়ারি' দ্র পশ্চিমযাত্রীর ডায়ারি ১৯। ৩৮২–৪৫

৩০২–০৩ 'ছবি' ['ক্ষুব্ধ চিহ্ন এঁকে দিয়ে শান্ত সিন্ধুবুকে'] দ্র পূরবী ১৪। ৫৩

৩৮৩ 'গান' ['গানের ঝর্‌না-তলায় তুমি সাঁঝের বেলায়'] দ্র গীত ১। ১৭, স্বর ৩১

৩৮৩–৮৪ পৃষ্ঠায় অনাদিকুমার দস্তিদার-কৃত গানটির স্বরলিপি মুদ্রিত হয়।

শান্তিনিকেতন, পৌষ ১৩৩১ [৫। ১২]:

২২৩ 'সিন্ধু-শকুন'

২২৪–২৬ 'আচার্য রবীন্দ্রনাথের হিন্দী বক্তৃতা'

২৩২–৩৪ 'গান' ['নাই যদি বা এলে তুমি এড়িয়ে যাবে তাই বলে?'] দ্র গীত। ৩৭৭, স্বর ৩০
গানটির স্বরলিপি করেছেন অনাদিকুমার দস্তিদার।

The Visva-Bharati Quarterly, Magh 1331, January 1925 [Vol. II, No. 4]:

307–16 'International Relations' দ্র *EWRT* 3/ 470–76

326 'When All My Doors Are Open' ['Once when we were both together, Spring came to our cottage']

359 'The Song Bird' ['When the evening steals on western waters']

The Modern Review, January 1925 [Vol. XXXVII, No. 1]:

4–7 'To the People of Japan'

প্রবাসী, মাঘ ১৩৩১ [২৪। ২। ৪]:

৪২৯–৪১ 'পশ্চিম যাত্রীর ডায়ারি' দ্র পশ্চিমযাত্রীর ডায়ারি ১৯। ৩৯৪–৪০৫

৪৩০–৩৪ 'লিপি' ['হে ধরণী, কেন প্রতিদিন'] দ্র পূরবী ১৪। ৫৪–৫৭

৪৩৬–৩৭ 'খোলো, খোলো, হে আকাশ, স্তব্ধ তব নীল যবনিকা'] দ্র পূরবী ১৪। ৫৭–৫৯ ['ক্ষণিকা']

৪৪২–৪৪ ‘খেলা’ [‘সন্ধ্যেবেলায় এ কোন্ খেলায় করলে নিমন্ত্রণ’] দ্র পূরবী ১৪। ৫৯–৬১

শান্তিনিকেতন, মাঘ ১৩৩১ [৬। ১]:

১০ ‘গান’ [‘সাধন কি মোর আসন নেবে’] দ্র গীত ১। ২৬৭; স্বর নেই।

১৭–১৯ ‘গান’ [‘এ কি মায়া লুকাও কায়া’] দ্র গীত ২। ৪৯৮; স্বর ৩০

স্বরলিপিটি অনাদিকুমার দস্তিদারের করা।

প্রবাসী, ফাল্গুন ১৩৩১ [২৪। ২। ৫] :

৫৭৩ ‘ভাবী কাল’ [‘ক্ষমা কোরো, যদি গর্ব্বভরে’] দ্র পূরবী ১৪। ৯৭–৯৮

৫৭৪–৭৫ ‘অপরিচিতা’ [‘পথ বাকি আর নাই ত আমার চলে এলাম একা’] দ্র পূরবী ১৪। ৬২–৬৩

৬৩৫–৩৬ ‘কথা ও সুর’ [‘আজ কিছুতে যায় না মনের ভার’] দ্র গীত ২। ৪৪৬; স্বর ৩০

৬৮৩–৮৭ ‘চিঠি’ [‘দূর প্রবাসে সন্ধ্যা বেলায় বাসায় ফিরে এনু’] দ্র পূরবী ১৪। ১৩২–৩৪

গানটির স্বরলিপি করেছেন সাহানা বসু।

শান্তিনিকেতন, ফাল্গুন ১৩৩১ [৬। ২] :

২৬–২৭ ‘চিঠি’ [আশ্রমের জনৈক প্রাক্তন ছাত্রকে লেখা ২২ ভাদ্র ১৩১৭]

৩৮–৪০ ‘আকন্দ’ [‘সন্ধ্যা-আলোর সোনার খেয়া পাড়ি যখন দিল গগন-পারে’] দ্র পূরবী ১৪। ১২৭–৩০

৪৩–৪৫ ‘গান’ [‘মোরা ভাঙব তাপস’] দ্র গীত ২। ৪৯৮–৯৯; স্বর ৩০

গানটির স্বরলিপি করেছেন অনাদিকুমার দস্তিদার।

The Modern Review, March 1925 [Vol. XXXVII, No. 3]:

358 ‘Tempest’ [‘Half asleep on the shore you dreaded’] দ্র *Poems 71, EWRT* 1/ 356–58

প্রবাসী, চৈত্র ১৩৩১ [২৪। ২। ৬] :

৭১৩–১৫ ‘ঝড়’ [‘সুপ্তির জড়িমা-ঘোরে’] দ্র পূরবী ১৪। ৭৮–৮১

৭৭৫–৭৭ ‘আকন্দ’ [‘সন্ধ্যা আলোর সোনার খেয়া পাড়ি যখন দিল গগনপারে’] দ্র পূরবী ১৪। ১২৭–৩০

৭৭৮–৭৯ ‘কঙ্কাল’ [‘পশুর কঙ্কাল ওই মাঠের পথের এক পাশে’] দ্র পূরবী ১৪। ১৩০–৩১

শান্তিনিকেতন, চৈত্র ১৩৩১ [৬। ৩] :

৬৩–৬৪ ‘গান’ [‘আজ কি তাহার বারতা পেল রে’] দ্র গীত ২। ৫১৯; স্বর ৩০

স্বরলিপিকার অনাদিকুমার দস্তিদার।

The Modern Review, April 1925 [Vol. XXXVII, No. 4] :

377–80 ‘The Place of Science’

প্রাসঙ্গিক তথ্য : ১

প্রতিমা দেবীর মাতা গুণেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জ্যেষ্ঠা কন্যা বিনয়িনী দেবীর জীবনাবসান হয় বর্তমান বৎসরের গোড়াতেই। রবীন্দ্রনাথের কাছে সংবাদটি পৌঁছয় তিনি যখন পিকিঙে। 20 May 1924 [মঙ্গল ৬ জ্যৈষ্ঠ] তিনি পুত্রবধূকে সান্ত্বনা জানিয়ে লেখেন :

তোমার মায়ের মৃত্যু সংবাদ পেয়ে মনে আঘাত পেয়েচি। সেদিন তোমার মা যখন শান্তিনিকেতনে এসেছিলেন তখন তাঁর মধ্যে এমন একটি গভীরতা দেখেছিলুম, সাধনার এমন একটি সহজ রূপ তাঁর মধ্যে প্রকাশ পেয়েছিল যে আমি আশ্চর্য্য হয়েছিলুম। মৃত্যুর পূর্ব্বে তাঁর এই যে ভাবটি দেখতে পেয়েছিলুম এই কথাটি মনে করে আমার ভারি ভাল লাগ্‌চে। এইবার এই দিক থেকে বিনয়িনী আমার হৃদয়ের খুব কাছে এসেছিলেন। এক একদিন আমার কাছে এসে তিনি যখন তাঁর প্রাণের গভীর কথাগুলি বল্‌তেন আমার ভারি তৃপ্তি হত। অন্তরে তিনি এমন একটি মুক্তি পেয়েছিলেন যে, মৃত্যু তাঁর কাছে কিছুই নয়। ভিতরে ভিতরে তিনি সংসার পার হয়ে গিয়েছিলেন। একদিন তিনি বলছিলেন, এবার শান্তিনিকেতনে আসবার সময় রেলগাড়িতে ভেদিয়ার কাছে যখন মাঠের উপর অপরাহ্ণের সূর্য্যালোক দেখ্‌লেন তখন তিনি এক মুহূর্ত্তে তাঁর ঠাকুরকে প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করতে পেলেন। বল্লেন, এর আগে একদিনের জন্যেও পূজানুষ্ঠানে ব্যাঘাত হলে তিনি দুঃখ পেতেন, কিন্তু এবার শান্তিনিকেতনে এসে তাঁর কাছে বাহ্য অনুষ্ঠান সব মিথ্যে হয়ে গেছে— আর দরকার নেই। তিনি যে একান্ত উপলব্ধির মধ্যে নিয়ত নিমগ্ন হয়ে ছিলেন তাই দেখে আমার নিজের মনের মধ্যে ভারি শান্তি বোধ হত। আমার কেমন মনে হয় যে, জীবন বন্ধনের শেষ সূত্রগুলি ছিন্ন করবার জন্যেই এবার তিনি শান্তিনিকেতনে এসেছিলেন— সংসারের দায়িত্ব থেকে নিজেকে কিছুকালের জন্যেও বিচ্ছিন্ন করে যেন তিনি শেষ বিচ্ছেদের ভূমিকা রচনা করেছিলেন। অন্তরের মধ্যে গভীর শান্তি লাভ করে তবে তিনি যে সুখ দুঃখের পারে চলে গেলেন এ কম সৌভাগ্যের কথা নয়।[১৯২]

চিত্রা দেব জানিয়েছেন, বিনয়িনী 'কাহিনী' নামে তাঁর এক আত্মজীবনী লিখেছিলেন। তিনি লিখেছেন : 'নিয়মিত লেখাপড়ার চর্চা না থাকলেও বিনয়িনীর সাদামাটা ধরণের লেখার হাতটি ভালো— কৃত্রিমতার স্পর্শ নেই। যেন আপন মনে আয়নায় নিজের মুখ দেখা। ··· অনেক তথ্য আছে তবে সব ছাপিয়ে বড়ো হয়ে উঠেছে তাঁর ধর্মপরায়ণা ভক্তিনত রূপটি।'[১৯৩] স্মৃতিকথাটি অবশ্যই প্রকাশিত হওয়া উচিত। মহর্ষিপরিবারের অনেক মেয়ের আত্মকাহিনী আমরা পড়েছি, কিন্তু পাশাপাশি হিন্দু ঐতিহ্যে বড়ো হওয়া বৈঠকখানা বাড়ির মেয়েদের অন্দরমহলের কথা জানতে পারলে আপাতবিরোধী দুটি সমাজের অন্তরঙ্গ রূপটি তাৎপর্যময় হয়ে উঠতে পারে।

4 Mar 1924 [বুধ ২০ ফাল্গুন] রাঁচিতে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনাবসান হয় ৭৬ বৎসর বয়সে। ইন্দিরা দেবী লিখেছেন :

জ্যোতিকাকামশার শেষ সময়ে আমরাই কাছে ছিলুম। সুরেন কাজের হিড়িকে থাকতে পারেন নি, চলে গিয়েছিলেন। মা যদিও কাছে ছিলেন, কিন্তু ব্যামো যে কত গুরুতর হয়েছে তা বোধহয় হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন নি, নিয়মমতো ঘরকন্নার কাজ ক'রে যাচ্ছেন। জ্যোতিকামশায় বরং এক-আধবার বলতেন— 'মেজবোঠান আমার কাছে একটু বসেন না কেন।'···

জ্যোতিকামশায় যে কতদিন হার্নিয়ায় ভুগছেন, সে জিনিসটা যে কী তা পর্যন্ত মা জানেন না। ··· আর তিনিও ঐ রোগ নিয়ে বছরের পর বছর কী ক'রে যে একলা ঐ পাহাড়ের উপর কাটিয়ে গেলেন— একটা চাকর ডাকবার দরকার হলেও পাহাড়ের মাঝরাস্তার ছোটো বাড়ি থেকে ঘণ্টা বাজিয়ে তবে তাকে আনতে হত। এও আর-এক আশ্চর্য ব্যাপার। অথচ ঐ অন্ত্র বেরিয়ে পড়লে যে কত শীঘ্র কত সাংঘাতিক অবস্থা হ'তে পারে তা কি আর তিনি বুঝতেন না?— অথচ একলা থাকতে তো কোনো ভয়ডর ছিল না। যে-ঘণ্টা জাপান থেকে রবিকা এনে দিয়েছিলেন, তার চেহারা এখনো চোখে ভাসছে, আর শেষদিন বেলা পাঁচটা পর্যন্তও সেই ঘণ্টা নিজের হাতে বাজিয়েছেন, তার আওয়াজ এখনো কানে বাজছে— অথচ ছ'টার সময় সব শেষ হয়ে গেল।

বুকে কাশি বসেছিল— চিরদিনই তো ওঁদের হাঁপানি কাশির ধাত। ভালো সাহেব-ডাক্তারই দেখেছিল, কিন্তু কিছু করতে পারলে না। আমাদের দুজন অনুগত লোক রাতদিন কাছে থেকে যথেষ্ট সেবা করেছিল। আর সেই শেষ পর্যন্ত রোগশয্যায় ব'সেও উপাসনায় যোগ দিয়েছেন, যেমন ওঁদের ভাইদের ধাত ছিল। ··· নতুন কাকিমার একটি নিজ হাতে আঁকা পেন্সিলের ছবিই সেই ঘরের একমাত্র সজ্জা ছিল।···

জ্যোতিকামশায়ের উইলে গগনদাদাকে তাঁর সব আঁকবার খাতা দিয়ে যান; সেগুলি আমিই বাক্সতে গুছিয়ে তাঁদের পাঠিয়ে দিই। অবশ্য তাঁর অবর্তমানে অনেক নষ্টও হয়েছে, অবশেষে বিশ্বভারতী [রবীন্দ্রভারতী সোসাইটি] কিনে নিয়েছে। সমস্ত বাদ্যযন্ত্র ও বাজনার বই আমাকে দিয়ে যান। আমিও নানা ভাগ্যবিপর্যয়ে তার যথোচিত যত্ন করতে পারি নি।

তবে তিনি যে জমিটুকু মোরাবাদীর রাস্তার উপরে কুয়ো খোঁড়াবার জন্য কিনেছিলেন ও বড়ি তৈরি করতে আরম্ভ করেছিলেন, তাঁর শেষ ইচ্ছাপত্র অনুসারে তাঁরই ব্যাঙ্কে জমা টাকা দিয়ে সে-বাড়ি শেষ করে তাঁরই নির্দেশমতো ঐ অঞ্চলের গরীব আদিবাসীদের হোমিওপ্যাথি ঔষধ

বিতরণার্থে ‘সেবাধাম’ নাম দিয়ে রামকৃষ্ণ মিশনের হাতে দিয়ে দেওয়া হয়েছে।[১৯৪]

চৈত্র-সংখ্যা শান্তিনিকেতন-এ লেখা হয় : ‘শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের মৃত্যু উপলক্ষ্যে আশ্রমে একদিন অনধ্যায় ছিল। এতদুপলক্ষ্যে প্রাতঃকালে মন্দিরে উপাসনা হয় এবং সন্ধ্যায় একটি সভা হয়। তাহাতে শ্রদ্ধেয় রামানন্দ বাবু, নেপালবাবু ও এণ্ডরুজ সাহেব জ্যোতিরিন্দ্র বাবুর জীবনী সম্বন্ধে আলোচনা করেন। কিন্তু এই প্রিয় দাদার মৃত্যু উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথ এইসব প্রকাশ্য সভায় যোগ দিয়েছিলেন বলে জানা যায় না।

প্রাসঙ্গিক তথ্য : ২

আগের অধ্যায়ে বলা হয়েছে, অ্যাপেন্ডিক্স অপারেশনের অব্যবহিত পরেই 4 Feb 1924 [২১ মাঘ ১৩৩০] সরকার গান্ধীজিকে ছয় বৎসর কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা সত্ত্বেও দু'বছর মেয়াদপূর্তির আগেই তাঁর নিঃশর্ত মুক্তি ঘোষণা করলে স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য কিছুদিন বিশ্রাম করে তিনি আবার রাজনীতিক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন। দলে দলে কংগ্রেসি ও স্বরাজ্য দলের নেতারা বিবিধ পরামর্শ ও মতানৈক্যের অবসানের জন্য তাঁর সঙ্গে গিয়ে দেখা করেন। কিন্তু দেখা গেল, অবান্তর কারণে অবাস্তব গঠনমূলক কাজের [অর্থাৎ চরকায় সুতো-কাটা, খদ্দরপ্রচার ও অস্পৃশ্যতানিবারণ) ফতোয়া জারি করে অসহযোগ ও আইন-অমান্য আন্দোলনের সমাপ্তি ঘোষণার জন্য তাঁর মনে কোনো অনুশোচনা দেখা দেয়নি; কিংবা কেবল মুসলমানদের সহানুভূতি আদায়ের জন্য ভারতের স্বরাজসাধনার পক্ষে অনাবশ্যক খিলাফতের দাবি— যা মুস্তাফা কামালের কার্যকলাপের ফলে ইতিমধ্যে ইতিহাসের আঁস্তাকুড়ে নিক্ষিপ্ত হয়েছে অথচ তারই জন্য ভারতে মুসলিম মৌলবাদী মোল্লাদের বাড়বাড়ন্ত দেখা দেয়— তার জন্যও গান্ধীজি কোনো আত্মানুসন্ধানের আবশ্যকতা অনুভব করেননি। বরং তিনি ঘোষণা করলেন, স্বরাজ্যদলের কাউন্সিলে প্রবেশ তাঁর অসহযোগ কর্মসূচির পরিপন্থী অর্থাৎ সরকারে অংশগ্রহণেরই শামিল ও আইন প্রণয়নে বাধাদান হিংসারই নামান্তর। এবং 18 May 1924 জুহুতে বুদ্ধজয়ন্তী উপলক্ষে সমবেত জনসভায় তিনি যথারীতি এইসব নির্দেশের পিছনে ঐশ্বরিক উপলব্ধির দাবি উত্থাপন করেন।

এর পরে তিনি জুন মাসের শেষে আমেদাবাদে অনুষ্ঠেয় কংগ্রেস অধিবেশনে স্বরাজ্যদলকে কংগ্রেস থেকে বহিষ্কারের উদ্দেশ্যে চার দফা প্রস্তাব উত্থাপনের কথা ঘোষণা করেন— তাদের মধ্যে প্রথমটি হল, বার্ষিক চার আনা-চাঁদা দেওয়া কংগ্রেস সদস্যের পরিবর্তে প্রতিটি কংগ্রেসকে নির্দিষ্ট পরিমাণ চরকায়-কাটা সুতো জমা দিতে হবে অন্যথায় তাঁরা দল থেকে বহিষ্কৃত হবেন, শেষটি গোপীনাথ সাহার কাজের নিন্দাবাদ। 27 Jun আমেদাবাদে কংগ্রেসের অধিবেশনে গান্ধীজি প্রস্তাবগুলি পেশ করলে স্বরাজ্যদলের প্রতিনিধিরা তীব্র প্রতিরোধ রচনা করেন। মোতিলাল নেহরু প্রথম প্রস্তাবটিকে গঠনতন্ত্র-বিরোধী বলে ঘোষণা করেন। তাঁর ও চিত্তরঞ্জনের জ্বালাময়ী ভাষণের পরে গান্ধীজির প্রস্তাব প্রত্যাখ্যাত হলে তিনি কান্নায় ভেঙে পড়েন, তার প্রতিক্রিয়ায় অবস্থার পরিবর্তন হয়।

পরদিন বিকেলে একটি ঘরোয়া অধিবেশনে বিষয়টি পুনরালোচিত হয়। গান্ধীজি বাধ্যতামূলক সুতো-কাটার প্রস্তাব পুনরায় উত্থাপন করলে মোতিলাল প্রবল প্রতিবাদ করে জানান, এই খামখেয়ালি প্রস্তাব সমস্ত

গণতান্ত্রিক রীতিনীতির বিরোধী। গান্ধীজি বলেন, তিনি সদস্যদের অধিকার খর্ব না ক'রে কয়েকটি গঠনমূলক ও ভারতবাসীর ঐক্যবিধায়ক কাজ করার জন্য তাঁদের অনুরোধ করছেন মাত্র। হয়তো তাঁর পূর্বদিনের কান্নার কথা স্মরণ করেই প্রস্তাবটি ৮৩–৬৯ ভোটে গৃহীত হয়।

গান্ধীজি পরের দিন বলেন, তিনি প্রস্তাবগুলি এনে সংবিধানবিরোধী কাজ করেছেন, কিন্তু সংবিধান তো লোককে সাহায্য করার জন্য, স্বরাজ আনার জন্য প্রয়োজন হলে তাকে লঙ্ঘনও করতে হবে। মোতিলাল গান্ধীজির যুক্তি খণ্ডন করে বলেন, কেবল চরকা কখনই স্বাধীনতা আনতে পারবে না— বাধ্যতা আরোপ করলে তিনি এক ইঞ্চি সুতোও কাটবেন না। গান্ধীভক্তদের উদ্দেশে তিনি বলেন, তাঁরা বুকে হাত দিয়ে বলুন গান্ধীজি কারাগারে থাকার সময়ে কে কতটা সুতো কেটেছেন। শান্তিস্থাপনের উদ্দেশ্যে স্বরাজীরা গান্ধীজিকে অতিরিক্ত ক্ষমতা দিতেও প্রস্তুত, কিন্তু তিনি তাঁদের বহিষ্কার চান বলে তাঁদেরও লড়াই চালাতে হবে। তাঁরা এখন স্থানত্যাগ করছেন, কিন্তু ফিরে আসবেন আরও শক্তিসঞ্চয় করে। এরপর সকলকে বিস্মিত করে দিয়ে শ্রীনিবাস আয়েঙ্গারের নেতৃত্বে স্বরাজ্যদলের সদস্যরা সভাস্থল ত্যাগ করেন।

এর প্রতিক্রিয়া হল বিস্ময়কর। অতঃপর গান্ধীজির ঘনিষ্ঠ অনুগামীদের মধ্যে অনেকে একের-পর-এক উঠে দাঁড়িয়ে তাঁর প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন, 'some of them going to the length of warning him that he was bringing ruin on the Congress'— এঁদের মধ্যে ডাঃ ছোটিরাম, মৌলানা আবুল কালাম আজাদের মতো আরও অনেকে ছিলেন। এতেও গান্ধীজির চৈতন্যোদয় হয়নি, সুতো না কাটলে শাস্তি-মকুবের সংশোধনী প্রস্তাব ৬৭–৩৭ ভোটে অগ্রাহ্য হয়, মূল প্রস্তাবটি ৮২–২৫ ভোটে গৃহীত হয়। কিন্তু যেখানে বিরোধীদের মধ্যে প্রায় কেউই উপস্থিত নেই, সেখানে ৩৭টি ভোট তাঁর বিরুদ্ধে প্রযুক্ত হয়েছে দেখে জয়ী হওয়া সত্ত্বেও এতক্ষণে গান্ধীজির কাণ্ডজ্ঞান জাগ্রত হল। তিনি শাস্তিমূলক প্রস্তাবটি প্রত্যাহার করলে সকলে স্বস্তিলাভ করেন।

29 Jun অধিবেশনের তৃতীয় দিনে দুই পক্ষ আবার পরস্পরের মুখোমুখি হলেন। আপত্তিকর প্রথম প্রস্তাবটি স্বয়ং গান্ধীজির দ্বারাই এতটা পরিবর্তিত হয়েছিল যা নিয়ে বিতর্ক করার আবশ্যকতা ছিল না। তৃতীয় প্রস্তাবে যাঁরা কাউন্সিলে প্রবেশ করেছেন তাঁদের বহিষ্কারের ধারাও পরিত্যক্ত হয়।

সেইদিন বিকেলে গোপীনাথ সাহার কাজের নিন্দা করে গান্ধীজি যে চতুর্থ প্রস্তাবটি উত্থাপন করেছিলেন, 1 Jun সিরাজগঞ্জে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস সম্মেলনে গৃহীত সিদ্ধান্তটি উল্লেখ করে চিত্তরঞ্জন সেই বিষয়ে একটি সংশোধনী প্রস্তাব এনে বলেন, বাংলায় তাঁদের মাথার উপরে সরকার যেভাবে শাস্তির খড়্গ ঝুলিয়ে রেখেছেন সেটি বিবেচনা ক'রে সংশোধনীটি গ্রহণ করা আবশ্যক, বিশেষত মূল প্রস্তাব ও সংশোধনীর মধ্যে যখন বিশেষ কোনো পার্থক্য নেই। চিত্তরঞ্জনের প্রস্তাব সমর্থন করে মহারাষ্ট্রের ডাঃ পরাঞ্জপে বলেন : 'Gandhi's reading of history was different from his or of those of his way of thinking. Gandhi thought that India was lost because of violence. There was a conflict of philosophy of Tilak and Gandhi since the later entered politics, and the Maharashtra leaders being all of the Tilak School was of opinion that under certain circumstances, as a matter of justice, a tooth for a tooth was the right policy; while Gandhi stood for a kiss for a kick on all occasions.... In India preaching of non-violence was not a novel thing as fifty lacs of Sadhus preached it!' অবশ্য চিত্তরঞ্জনের আনা সংশোধনীটি গৃহীত হয়নি ও তিনিও এটি নিয়ে আরও বিতর্কে যাননি।

গান্ধীজির ডিক্টেটর-সুলভ স্বেচ্ছাচার এইভাবে বিতর্কের সম্মুখীন হয়ে তাঁকে নতি স্বীকার করতে বাধ্য করায় তাঁর কাণ্ডজ্ঞান কিঞ্চিৎ উন্মোষিত হল। অবশ্য এই জিনিসই তিনি প্রায় বিনা বাধায় জীবনের শেষ পর্যন্ত চালিয়ে গেছেন, কিন্তু আরও সতর্কতার সঙ্গে পূর্বাহ্ণেই নিজের সমর্থকদের সংহত ক'রে নিয়ে। আর সেটি তাঁর পক্ষে সহজ হয়েছিল ভারতের মতো ধর্মধ্বজী দেশে অর্ধনগ্ন ফকিরের সুচিন্তিত সাধুসুলভ পোশাকটি অঙ্গে ধারণ করে, যার মোহ থেকে রবীন্দ্রনাথের মতো গান্ধীজির প্রায় প্রতিটি মতাদর্শের বিরোধী মানুষও অব্যাহতি পাননি!

গান্ধীজি এই বিতর্কের জবাব দিতে গিয়ে কতটা বিচলিত হয়ে পড়েন, তার বর্ণনা আমরা *Indian Annual Register*, 1924, Vol.I থেকে উদ্ধৃত করে দিচ্ছি :

Gandhi was moved to the depths of his heart by the deplorable lack of principles among his followers. He lost his voice when he commenced to speak.... He confessed that he was deeply pained to see that his estimation of the efficacy of his programme proved wrong. He expected overwhelming support to him but he saw that he was opposed inch by inch.... Tears flowed from his eyes. Men around him began to sob. His immediate followers began to weep. Moulana Mahomed Ali took his handkerchief to his eyes. The ladics burst out sobbing audibly. Gandhi in tears! and what would not they give to stop it? The scene cannot be described in cold print. The frail Mahatma recovered in a minute or two and concluded his speech with the remark that he was thinking of retiring from the Congress. Abul Kalam Azad requested the members to assure Gandhi of their support. Twenty-five members rushed to assure him solemnly that they would stand by him through thick or thin. Mahomed Ali rose and with eyes full of tears took off his cap and knelt down before Gandhi and asked him to forgive him and forgive others. Gandhi raised him in his arms and begged of them to give him time for consideration.

এইভাবে মেয়েলি কান্নার মেলোড্রামাটিক অভিনয়ের মধ্য দিয়ে কংগ্রেসের একটি ঐতিহাসিক অধিবেশনের সমাপ্তি ঘোষিত হল! কিছুদিন পরে 1924-এর বেলগাঁও কংগ্রেসের জন্য গান্ধীজি সভাপতি নির্বাচিত হন!

আগেই বলা হয়েছে, গান্ধীজির কারাবাসের ফলে অসহযোগ আন্দোলন পরিত্যক্ত হওয়ায় ও তুরস্কে খিলাফতের উচ্ছেদে আর-কোনো কাজের অভাবে নবজাগ্রত মৌলবাদী মুসলিম মোল্লারা নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রাখার জন্য তুচ্ছ কারণে হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা বাধাবার জন্য অশিক্ষিত, অর্ধশিক্ষিত বা কুশিক্ষিত মুসলিম সম্প্রদায়কে প্ররোচিত করতে থাকে। ফলে বিশেষত পাঞ্জাবে ও উত্তর ভারতের একাধিক স্থানে ভয়াবহ দাঙ্গা দেখা দেয়। হিন্দু মহাসভা, হিন্দু সংগঠন, আর্যসমাজীদের শুদ্ধিযজ্ঞ এই আগুনে ঘৃতাহুতি দেয়। গত বছরের মতো বর্তমান বৎসরেও এইরূপ দাঙ্গার দৃষ্টান্তের অভাব দেখা যায়নি, যদিও হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের সর্বপ্রধান প্রবক্তা গান্ধীজি তখন রাজনীতির অঙ্গনে আবার ফিরে এসেছেন।

অসংখ্য ঘটনার মধ্যে প্রধান কয়েকটির উল্লেখ করা যাচ্ছে। 11 Jul 1924 দিল্লিতে একটি মুসলিম ছেলে ও কয়েকজন কাহার হিন্দুর ঝগড়ার পরিণতিতে তিনদিনব্যাপী এক দাঙ্গায় তিনজন হিন্দু নিহত ও ৫০ জন আহত হয়। এর কয়েকদিন পরে 15 Jul বকর্-ইদ উপলক্ষে এখানেই আরও মারাত্মক দাঙ্গা আরম্ভ হয়, যদিও মাত্র এক সপ্তাহ আগে মহম্মদ আলি, আজমল খান ও বিশিষ্ট মুসলিম নেতারা এই উপলক্ষে শান্তি বজায় রাখার আহ্বান জানিয়েছিলেন। দাঙ্গার কারণ হল, এইদিন সকালে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ একটি হিন্দুপ্রধান এলাকার মধ্য দিয়ে মুসলিমদের বলির জন্য নির্দিষ্ট গোরু নিয়ে শোভাযাত্রা নিষিদ্ধ করে বিজ্ঞপ্তি প্রচার করেছিল, কিন্তু কয়েকজন এই নিষেধ অমান্য করায় ভয়াবহ দাঙ্গা শুরু হয়, পুলিশ ও মিলিটারি অনেক কষ্টে দাঙ্গা দমন করে, ১২ জন হিন্দু নিহত ও শতাধিক আহত হয়। এইদিন নাগপুর, জব্বলপুর প্রভৃতি বেশ-কিছু শহরে এই একই কারণে অশান্তি সৃষ্টি হয়। নিজাম-শাসিত হায়দ্রাবাদে গুলবর্গা শহরের দাঙ্গা অনেককে বিস্মিত করে। মহরমের [12 Aug] সময়ে অনুষ্ঠিত এই দাঙ্গায় প্রায় ৫০টি হিন্দু মন্দির দেবমূর্তি-সহ ভাঙচুর করা হয়। 9–10 Sep উত্তরপশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের কোহাটে আর-একটি ভয়াবহ সংঘর্ষে সংখ্যালঘু হিন্দুরা ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। গান্ধীজি ও মৌলানা সৌকত আলি কোহাট সংঘর্ষের কারণ ও সমাধানের পন্থা অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হন; কিন্তু সেখানকার মুসলিম নেতারা তাঁদের সাহায্য করতে অস্বীকৃত হন। সংগৃহীত তথ্য বিশ্লেষণ করে গান্ধীজি ও মৌলানা পৃথক সিদ্ধান্তে উপনীত হন। তাঁরা 1921 থেকে একযোগে কাজ করেছিলেন, কিন্তু এখনকার পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে তাঁদের মতভেদ প্রকাশিত হলে পরিস্থিতির আরও অবনতি ঘটতে পারে এই আশঙ্কায় হাকিম আজমল খান, মোতিলাল নেহরু প্রভৃতি নেতারা উভয়ের বিবৃতি প্রকাশ না করাই বাঞ্ছিত বলে মত প্রকাশ করেন। কিন্তু গান্ধীজি তাঁর ব্যাখ্যা-সহ বিবৃতিটি 19 Mar 1925 সংবাদপত্রে প্রকাশ করে দেন।

তিনি কারাগারে থাকার সময়ে দেশে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির যে অবনতি ঘটে সেই বিষয়ে তাঁর মতামত 'Hindu-Muslim Tension: Its Cause and Cure' [*Young India*, 29 May 1924, *CWMG* 24/ 136–54] রচনায় তিনি প্রকাশ করেছিলেন। তিনি লিখেছেন, অনেকে তাঁকে চিঠি লিখে মোপলাদের অত্যাচার-সহ যে-সব দাঙ্গায় হিন্দুরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন, তার জন্য তাঁকেই দায়ি করেছেন; গান্ধীজির ভাষায়, তাঁদের যুক্তি অনেকটা এইরকম : 'You asked the Hindus to make common cause with the Mussalmans in the Khilafat question. Your being identified with it gave it an importance it would never have otherwise received. It unified and awakened the Mussalmans. It gave a prestige to the Maulavis which they never had before. And now that the Khilafat question is over, the awakened Mussalmans have proclaimed a kind of jehad against us Hindus.' তিনি লিখেছেন, এর মধ্যে কয়েকটি চিঠি ছাপার অযোগ্য ভাষায় লিখিত। একজন মুসলমানও তাঁকে অভিযুক্ত করে অনুরূপ চিঠি দিয়েছেন। কিন্তু তিনি এর জন্য দায়ি নন এবং এই বিষয়ে তাঁর কোনো অনুশোচনাও নেই। তিনি যদি ভবিষ্যদ্দ্রষ্টা হতেন ও বর্তমান পরিস্থিতি পূর্বেই দেখতে পেতেন তাহলেও তিনি আজও খিলাফত আন্দোলনে যোগ দিতেন— কারণ দুটি সম্প্রদায়ের বর্তমান উত্তেজক সম্পর্ক সত্ত্বেও এর ফলে তারা লাভবান হয়েছে, জনজাগরণও রাজনৈতিক শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয়। তিনি সাধারণকে আবার ঘুমিয়ে পড়তে দিতে রাজি নন, শুধু এই জাগরণকে সঠিক পথে চালিত করা দরকার। আত্মবিশ্বাস থাকলে বোঝা যাবে বর্তমান পরিস্থিতি দুঃখজনক হলেও হতাশাজনক নয়।

তবে কিছুদিনের মধ্যেই তিনি আত্মশুদ্ধির জন্য একুশ দিন অনশনের প্রয়োজন অনুভব ক'রে দিল্লিতে মৌলানা মহম্মদ আলির বাড়িতে 17 Sep 1924 [১ আশ্বিন] অনশন শুরু করেন। এই অবস্থায় মোতিলাল নেহরুর নেতৃত্বে দিল্লিতে হিন্দু ও মুসলমানেরা ঐক্য-সম্মেলন বা Unity Conference-এ এইসব দাঙ্গাকে বর্বরতা ও ধর্মবিরোধী আখ্যা দিয়ে বিরোধের কারণ দূর করার ও সংখ্যালঘুদের অধিকার রক্ষার উদ্দেশ্যে একটি সালিশি পরিষদ গঠন করার প্রস্তাব করে। এই সম্মেলন গান্ধীজিকে অনশন ত্যাগের জন্য অনুরোধ জানালে তিনি সেই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে বলেন, 'the fast was a matter between God and himself'। ৪ Oct [২২ আশ্বিন] দুপুরে তিনি অনশন ভঙ্গ করেন, রবীন্দ্রনাথ তখন ফ্রান্সের পথে সমুদ্রপথে ভূমধ্যসাগরে অবস্থান করছেন।

এরই মধ্যে মুখ্যত স্বরাজ্য দলের শক্তিহরণের জন্য সন্ত্রাসবাদীদের দমনের নামে 25 Oct 1924 [৮ কার্তিক] বাংলা গবর্মেন্ট একটি অর্ডিন্যান্স জারি করে ও পরে 7 Jan 1925 [২৩ পৌষ] এর মেয়াদ ৫ বছর বাড়িয়ে The Bengal Criminal Law Amendment Act নামে আইনে পরিণত হয়— যার প্রধান তিনটি ধারায় (১) সাধারণ বিচারালয়ের পরিবর্তে তিনজন সদস্য নিয়ে গঠিত কমিশনের হাতে বিচারের ভার প্রদত্ত হয়, (২) কেবলমাত্র সন্দেহের বশেই যে-কোনো ব্যক্তির গতায়াত ও বাসস্থান নিয়ন্ত্রিত করার ও কারাগারে আটক রাখার ক্ষমতা সরকারকে দেওয়া হল এবং (৩) ওয়ারেন্ট ব্যতীতই যে-কোনো বাড়িতে তল্লাসি ও যে-কোনো ব্যক্তিকে বিনাবিচারে কারারুদ্ধ করে রাখার ক্ষমতা সরকার গ্রহণ করল। অথচ ব্যবস্থাপক সভায় বিলটি ৬৬–৫৭ ভোটে অগ্রাহ্য হয়েছিল, অসুস্থ চিত্তরঞ্জনকে চেয়ারে বসিয়ে সভায় আনা হয়; কিন্তু গবর্নরের নিজস্ব ক্ষমতায় বিলটি আইনে পরিণত হয়। অর্ডিন্যান্স জারির সঙ্গে সঙ্গেই সুভাষচন্দ্র বসু-সহ শত শত ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হয়। সংবাদটি বুয়েনোস আইরেসে রবীন্দ্রনাথের কাছে পৌঁছলে তিনি 20 Dec [৫ পৌষ] দিনেন্দ্রনাথের উদ্দেশে 'চিঠি' কবিতায় লেখেন :

> প্রতাপ যখন চেঁচিয়ে করে দুঃখ দেবার বড়াই,
> জেনো মনে, তখন তাহার বিধির সঙ্গে লড়াই।
> দুঃখ সহার তপস্যাতেই হ'ক বাঙালির জয়,
> ভয়কে যারা মানে তারাই জাগিয়ে রাখে ভয়।
> মৃত্যুকে যে এড়িয়ে চলে মৃত্যু তারেই টানে,
> মৃত্যু যারা বুক পেতে লয় বাঁচতে তারাই জানে।

কিন্তু এই দমনমূলক আইন গান্ধীজি ও স্বরাজিদের অনেকটা কাছাকাছি নিয়ে এল। একটি সুশৃঙ্খল দল হিসেবে ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম পরিচালনার লক্ষ্য নিয়ে গান্ধীজি স্বরাজিদের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসবাদের অপবাদকে প্রত্যাখ্যান করলেন ও কলকাতায় এসে 6 Nov তাঁদের সঙ্গে একটি চুক্তিতে আবদ্ধ হয়ে স্বরাজ্য দলের কাউন্সিলে প্রবেশের নীতি মেনে নিলেন, পক্ষান্তরে স্বরাজিরাও প্রাত্যহিক সুতো-কাটার কর্মসূচিকে কংগ্রেসের সদস্য হওয়ার আবশ্যিক শর্ত হিসেবে গ্রহণ করলেন। অন্যান্য দলকেও পাশে পাওয়ার জন্য গান্ধীজি অসহযোগ আন্দোলনের বয়কট কর্মসূচি স্থগিত ঘোষণা করলেন। এই চুক্তি রূপায়ণের জন্য 21–22 Nov বোম্বাইতে একটি সর্বদলীয় সম্মেলন আহ্বান করে বাংলায় সরকারের দমনমূলক আচরণের বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্য ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের আবশ্যকতা ঘোষিত হল।

গান্ধীজি Dec 1924-এ অনুষ্ঠেয় কংগ্রেসের ৪০তম বার্ষিক অধিবেশনের সভাপতি পদে নির্বাচিত হলেন ও তিনি অনেক দ্বিধার পরে তাতে সম্মতি জানালেন। সেখানেও তিনি সভাপতির ভাষণে স্বরাজ্য দলের কাউন্সিলে প্রবেশ ও সেখানে তাঁদের কার্যকলাপের প্রশংসা করে চরকা ও কংগ্রেসের গঠনমূলক কার্যাবলির সঙ্গে স্বরাজিদের সহাবস্থান মেনে নিয়ে বললেন : '...the Swaraj party represents a strong and growing minority in the Congress... [it] cannot be expected to surrender the advantage it possesses. After all it wants the advantage not for itself but for service of the country.'

বর্তমান বৎসরে একটি আন্তর্জাতিক আন্দোলনের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধীজি উভয়েই যুক্ত হয়েছিলেন, সেইজন্য প্রসঙ্গটির উল্লেখ করা প্রয়োজন। অহিফেন বা আফিম বিশেষ কিছু ধরনের ব্যথানিবারক ঔষধের উপকরণ হিসেবে ব্যবহৃত হলেও নেশার জন্যও তার ব্যাপক ব্যবহার প্রচলিত আছে। আফগানিস্থান থেকে ব্রহ্মদেশ [মায়নামার] পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চল অহিফেন চাষের পক্ষে উপযোগী হওয়ায় ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদী শাসকগণ রাজস্ব ও বাণিজ্যিক লাভের প্রত্যাশায় এই ক্ষতিকর চাষে উৎসাহ দিত ও চিনের মতো দেশে অহিফেন রপ্তানি করে পুরো দেশটিকে এই নেশায় আসক্ত করে তোলে। চিনারা তাতে বাধা দিলে তারা যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয় ও বলপ্রয়োগে রপ্তানির অধিকার বজায় রাখে। জার্মান ভাষা থেকে ইংরেজিতে অনূদিত 'The Indo-British Opium Trade' প্রবন্ধটি পড়ে কুড়ি বছর বয়স্ক রবীন্দ্রনাথ 'চীনে মরণের ব্যবসায়' [ভারতী, জ্যৈষ্ঠ ১২৮১; সমাজ ৩০। ১২৭–৩৩] নামে একটি রচনা লেখেন। আমাদের আলোচ্য সময়ে জাতিসঙ্ঘের উদ্যোগে জেনিভায় Nov 1924-এ একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলনে ঔষধ ছাড়া অন্যান্য কারণে অহিফেনের ব্যবহার নিষিদ্ধ করার প্রস্তাব গ্রহণের কথা ছিল। অ্যান্ডরুজ এই সম্মেলনের বিষয়ে উৎসাহী ছিলেন। তিনিই কাউকে দিয়ে রবীন্দ্রনাথের তরুণ বয়সে লেখা প্রবন্ধটি 'The Death Traffic' নামে ইংরেজিতে অনুবাদ করিয়ে *Modern Review*, May 1925 [pp. 504–07]-তে নিজের টীকা-সহ প্রকাশ করেন। তার আগে সম্ভবত তাঁরই আগ্রহে রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধীজির স্বাক্ষরিত একটি বাণী *Young India* [2 Oct]-তে মুদ্রিত হয় :

The undersigned, viewing the growing addiction to narcotic drugs to be a deadly menace to individuals and to nations, and also insidious, rapidly spreading poisoning of the human race, which can be overcome only by co-operation among nations, respectfully petition the Intemational Opium Conference assembling in November, 1924 to adopt measures adequate for total extirpation of the plants from which these drugs originate, except as found necessary for medicine and science in the judgment of the best medical opinion of the world.[১৯৫]

প্রাসঙ্গিক তথ্য : ৩

১৩৩১ বঙ্গাব্দের ১ বৈশাখ [সোম 14 Apr 1924] রবীন্দ্রনাথ ছিলেন সাংহাইতে বিশ্বভারতীর কিছু অধ্যাপকের সঙ্গে, তিনি হয়তো এঁদের নিয়েই নববর্ষের উপাসনা করেছিলেন, কিন্তু তার কোনো বিবরণ রক্ষিত হয়নি।

শান্তিনিকেতন আশ্রমে নিশ্চয়ই আনুষ্ঠানিক উপাসনা হয়েছিল, তার বিবরণও পাওয়া যায়নি।

এই বছর বীরভূম জেলায় প্রচণ্ড গরমে অধিকাংশ কুয়ো শুকিয়ে জলাভাব দেখা দেয়, তাই বিশ্বভারতীতে উত্তরবিভাগে ২৮ চৈত্র ১৩৩০ ও পূর্ববিভাগে ৪ বৈশাখ ১৩৩১ গ্রীষ্মবকাশ ঘোষিত হয়, ৬ আষাঢ় দুটি বিভাগই খোলার কথা ছিল, কিন্তু অনাবৃষ্টির জন্য ছুটি বাড়িয়ে দেওয়া হয়— 'দীর্ঘ গ্রীষ্ম অবকাশের পর গত ১৭ই আষাঢ় আশ্রমের কার্য্য পুনরায় আরম্ভ হইয়াছে। … এখন বৃষ্টি হইয়া চারিদিক শীতল ও সবুজ হইয়া উঠিয়াছে।'[১৯৬]

কিন্তু তার আগে গ্রীষ্মের মধ্যে আশপাশের গ্রামে কলেরা দেখা দিলে কালীমোহন ঘোষ ও ধীরানন্দ রায়ের নেতৃত্বে সুরুলের কর্মীরা সেবাকার্যে আত্মনিয়োগ করেন— 'এইরকম প্রায় ৩। ৪টি স্থানে কলেরা-ফৌজ নিযুক্ত হইয়াছে'। প্রাক্তন ছাত্র সুধাকান্ত রায়চৌধুরী হোমিয়োপ্যাথি চিকিৎসা বিদ্যা আয়ত্ত করেছিলেন, জেলা বোর্ড তাঁকে কলেরা চিকিৎসার কাজে নিযুক্ত করে।

আষাঢ়-সংখ্যা শান্তিনিকেতন-এ প্রাক্তন ছাত্র প্রকাশচন্দ্র শেঠী ও বর্তমান ছাত্রী বীণাপাণি সেনের মৃত্যুসংবাদ দিয়ে জানানো হয় : 'আশ্রম খুলিলে স্বর্গীয় আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের মৃত্যু উপলক্ষ্যে বিদ্যালয়ে এক দিবস অনধ্যায় ছিল। মুখোপাধ্যায় মহাশয় বিশ্বভারতীর সদস্য ও হিতাকাঙ্ক্ষী ছিলেন। তাঁহার অভাব আমরা সকলেই একান্তভাবে অনুভব করিতেছি।'

ছুটির মধ্যে টাটা ট্রাস্টের প্রদত্ত অনুদানে রতনকুঠি নির্মাণের কাজ শেষ হয়; ৪ ভাদ্র সংসদের সভায় জানানো হয়, লেডি টাটা এই কুঠির আসবাবপত্রের জন্য আরও পাঁচ হাজার টাকা দিয়েছেন, সুরেন্দ্রনাথ করের উপর আসবাব-পরিকল্পনার দায়িত্ব অর্পিত হয়।

চিন-জাপান ভ্রমণের পরে রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে ফিরে আসেন ৬ শ্রাবণ [মঙ্গল 22 Jul] বিকেলবেলায়। ছাত্রছাত্রী ও অধ্যাপকগণ শিশুবিভাগের সুসজ্জিত বারান্দায় তাঁকে যথোচিত সংবর্ধনা জানান। নন্দলাল বসু ও ক্ষিতিমোহন সেনকেও সাদর অভ্যর্থনা জানানো হয়েছিল।

চিন থেকে ফিরে রবীন্দ্রনাথ একদিন আর্ট সম্বন্ধে বক্তৃতা করেছিলেন, শান্তিনিকেতন পত্রিকায় সেটি প্রকাশের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হলেও তা রক্ষিত হয়নি। ক্ষিতিমোহন সেন তাঁদের চিনভ্রমণের গল্প পাঁচদিন ধরে ধারাবাহিকভাবে বলছিলেন— 'বক্তৃতাতে তিনি দেশবিদেশে গুরুদেবের অভ্যর্থনা, ব্রহ্মনাচ, রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম, চীনদেশের ভাস্কর্য, মন্দির, নৃত্যগীত, রাজনৈতিক সামাজিক আচারব্যবহার ও অন্যান্য অনেক বিষয় বলেন'— সেগুলিও মুদ্রিত হয়নি। ক্ষিতিমোহন অবশ্য পরে একবার গুজরাতে বন্ধুদের কাছে হিন্দিতে এই ভ্রমণকাহিনি বিবৃত করেন, কিকুভাই রতনজি দেশাই-কৃত তার গুজরাতি অনুবাদ 'চীন জাপানী যাত্রা' নামে 1934-এ প্রকাশিত হয়।

গ্রীষ্মাবকাশের পরে আশ্রমস্থ বিশ্বভারতী সম্মেলনীর [সম্মিলনী] কাজ পূর্ণোদ্যমে আরম্ভ হয়, কিন্তু হস্তলিখিত প্রতিবেদনের অভাবে এই বিষয়ে আমাদের শান্তিনিকেতন-এ উল্লিখিত বিবরণের উপরে নির্ভর করতে হবে। ছুটির অব্যবহিত পূর্বে হিরজিভাই মরিসের সভাপতিত্বে অধ্যাপক আশানন্দ নাগ ব্রিটিশ ম্যুজিয়ম সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। ছুটির পরে প্রথম অধিবেশনে মৌলানা জিয়াউদ্দিন আলেকজান্দ্রিয়ার লাইব্রেরি বিষয়ে প্রবন্ধ পাঠ করেন। দ্বিতীয় সভায় অধ্যাপক বেনোয়ার সভাপতিত্বে বাচুভাই শুক্ল প্রস্তাব উত্থাপন করেন যে, আধুনিক বিজ্ঞান মানুষের উন্নতিতে সাহায্য করছে, গোখলে ও রেবা মহলানবিশ তাঁকে সমর্থন করেন।

বলবীর, রামচন্দ্র ও সৈয়দ মুজতবা আলি তাঁর বক্তব্যের বিরোধিতা করেন। বিদ্যাসাগর ও টিলকের মৃত্যুতিথিতে দুদিন সভা হয়, বিদ্যালয় ও বিশ্বভারতীর ছাত্ররা আলোচনায় যোগ দিয়েছিলেন। লোকমান্য টিলকের মৃত্যুবাসর উপলক্ষে আহূত বিশেষ সভায় নেপালচন্দ্র রায়ের সভাপতিত্বে বিশ্বভারতীর মারাঠি ছাত্র গোখলে, ফণীন্দ্রনাথ বসু, রামচন্দ্র প্রবন্ধ পাঠ করেন। 'সভাপতি মহাশয় লোমান্য ও তাঁহার পূর্বতন কালের প্রায় সকল দেশনেতার কার্যকলাপের সঙ্গে তাঁহার কার্যকলাপ ও রাজনৈতিক অভিমতের আলোচনা করেন।' অ্যান্ডরুজ মাঝে একবার আশ্রমে এসে চিন, মালয়, ব্রহ্মদেশ প্রভৃতি স্থানে তাঁর ভ্রমণের অভিজ্ঞতা বিশ্লেষণ করেন। বিশ্বভারতী সম্মেলনীর কার্যনির্বাহক সভায় এর কর্মক্ষেত্রকে বর্ধিত করা হয়; সৈয়দ মুজতবা আলি হন সম্পাদক, খেলা আমোদপ্রমাদ ও ভ্রমণ বিভাগের দায়িত্বভার বিনায়ক শিবরাম মাসোজির উপর অর্পিত হয়, চিত্রবীরভদ্র রাও বাচুভাই শুক্ল ও সুজিত মুখোপাধ্যায় চা মজলিশের ভারপ্রাপ্ত হন। চন্দ্রগ্রহণের ছুটি উপলক্ষে নেপালচন্দ্র রায়, জাহাঙ্গির ভকিল ও আশানন্দ নাগের নেতৃত্বে সম্মেলনীর সদস্যগণ চণ্ডিদাসের বাসস্থান নানুর ভ্রমণ করে আসেন। শ্রাবণ মাসে সাহিত্যসভার দুটি অধিবেশনে কবিতা ও গল্প পঠিত হয়।

প্রবাসী-সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় পত্রিকা-পরিচালনার দায়িত্ব পুত্রকন্যাদের উপরে ছেড়ে দিয়ে ১ ভাদ্র [17 Aug] শান্তিনিকেতনে এসে বসবাস করতে থাকেন। সদা-ভ্রাম্যমান অ্যান্ডরুজের উপর রবীন্দ্রনাথ আর ভরসা রাখতে পারছিলেন না, তাই রামানন্দ শান্তিনিকেতনে আসায় রবীন্দ্রনাথ বিশ্বভারতীর কলেজ বিভাগের দায়িত্ব তাঁর উপরে অর্পণ করেন, অবশ্য সেটি কার্যকর হয় কিছুকাল পরে।

আশুতোষ মুখোপাধ্যায় ও তাঁর পুত্র শ্যামাপ্রসাদের সহযোগিতায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে বিশ্বভারতীর সম্পর্ক ক্রমশই ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠছিল। রবীন্দ্রনাথ 1920–21-এ যখন আমেরিকায় ছিলেন, তখন প্রধানত অ্যান্ডরুজের কৌশলে অসহযোগ আন্দোলনের অঙ্গ হিসেবে বিদ্যালয় থেকে প্রাইভেট ছাত্ররূপে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা তুলে দেওয়া হয়। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের প্রত্যাবর্তনের কিছুদিন পরেই উক্ত আন্দোলন মুখ থুবড়ে পড়ায় প্রায় নিঃশব্দে পরীক্ষা-ব্যবস্থা পুনঃপ্রবর্তিত হয়। শুধু তাই নয়, ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ যে-সব ছাত্রছাত্রী বিশ্বভারতীতে পড়াশুনো করতে চাইছিলেন তাঁদের জন্য এখানে কলেজ বিভাগও খোলা হয়।

বিশ্বভারতী বুলেটিনের ৪ নং খণ্ডে এই নূতন শিক্ষাপদ্ধতির বিস্তৃত বিবরণ প্রকাশিত হয়, তার একটি সংক্ষিপ্তসার এখানে দেওয়া হল :

বিশ্বভারতী বিদ্যায়তন তিনটি ভাগে বিভক্ত হয়— পাঠভবন, শিক্ষাভবন ও বিদ্যাভবন— এদের মধ্যে প্রথমটি স্কুল, দ্বিতীয়টি কলেজ ও তৃতীয়টিকে গবেষণা বিভাগ বলা যেতে পারে। এ ছাড়া হাতের কাজ, চিত্রকলা ও সংগীত শেখানোর বিশেষ ব্যবস্থাও থাকে। সুরুলের শ্রীনিকেতন পল্লিসংস্কার বিভাগের ছাত্ররা চারপাশের গ্রাম্য জীবনযাত্রা পর্যবেক্ষণ করার সুযোগ পায়। ছাত্র ও অধ্যাপকের মধ্যে পরিচয়ের নিবিড়ত্ব এই নবপ্রবর্তিত শিক্ষার বিশেষত্ব; প্রত্যেক ছাত্র একজন শিক্ষকের অধীনে থেকে কাজ করার সুযোগ পায়। সাধারণত বাংলাভাষাই এখানকার শিক্ষার মাধ্যম, কিন্তু প্রয়োজন দেখা দিলে অন্য ভাষার সাহায্যও নেওয়া হয়।

প্রত্যেক বিভাগের পাঠান্তে ছাত্ররা তুষ্টিপত্র [certificate] পায়, তাতে পরীক্ষার ফল ও শিক্ষকের অভিমত লেখা থাকে। শিক্ষকের মন্তব্যে ছাত্রের সমগ্র পাঠ্যজীবনের উন্নতিবিবরণ লিখিত হয়। বিশিষ্টীকৃত পাঠ্যবিষয়ে

মৌখিক ও লিখিত পরীক্ষার ব্যবস্থা আছে। প্রত্যেক ছাত্রের পাঠ্যবিষয় সমগ্রভাবে বিচার করা হয়, যাতে কোনো এক অংশের সামান্য ত্রুটি অন্য অংশের উন্নতির পক্ষে বাধাস্বরূপ না হয়।

পাঠভবন দুই ভাগে বিভক্ত। আদ্য বিভাগ ছয় থেকে চৌদ্দ বৎসরের বালক-বালিকাদের জন্য, পাঠার্থীদের ভর্তির বয়স ছয় থেকে নয়— কিন্তু মেয়েদের ক্ষেত্রে এই বাধ্যবাধকতা নেই। পরীক্ষার্থ নয় এমন পাঠ্য বিষয় প্রকৃতিবীক্ষণ, প্রাথমিক বিজ্ঞান, চিত্রকলা, সংগীত ও হাতের কাজ; পরীক্ষার্থ বিষয় সংস্কৃত, বাংলা, ইংরেজি, অঙ্ক, ভূগোল ও ইতিহাস; ঐচ্ছিক বিষয় হিন্দি, গুজরাটি, উর্দু, ফারসি ও ফরাসি— এতদ্ব্যতীত অন্য ভাষা শেখারও ব্যবস্থা আছে। অপেক্ষাকৃত বয়স্ক ছাত্রদের বিভাগটির নাম মধ্য বিভাগ। যে-সব ছাত্ররা কলকাতা বা অন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশিকা পরীক্ষা দিতে চায় তাদের শেষ দুটি বৎসরে উক্ত পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত করে দেওয়া হয়। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষ অনুমতি অনুসারে ছাত্রদের আগের মতো বিভাগীয় বিদ্যালয়-পরিদর্শকদের অধীনে নির্বাচনী পরীক্ষা দিতে হয় না।

আদ্যবিভাগের তুষ্টিপত্র পেয়ে যারা বিশ্বভারতীতেই পড়তে চায় তাদের সামনে তিনটি পথ আছে— উপার্জনমূলক কোনো শিক্ষা, সাহিত্য বা অন্য-কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা। মধ্যবিভাগের দুটি উদ্দেশ্য— যারা সাহিত্যচর্চা বা গবেষণাদি করবে তাদের প্রস্তুত করে দেওয়া এবং যারা ব্যবসা বা কৃষিবিদ্যা দ্বারা জীবিকার্জন করতে চায় তাদের জ্ঞানের সাধারণ একটা আবহাওয়ার মধ্যে পরিবর্ধিত করা। উপার্জনমূলক শিক্ষার জন্য তাদের কলাভবনে [এখানে চিত্রবিদ্যা ও হাতের কাজ শেখানো হয়] কিংবা শ্রীনিকেতনের পল্লীসংস্কার বিভাগে— এখানে গোশালা, বিভিন্ন কার্যশালা, ব্রতীবালক বা স্কাউটিং শিক্ষার ব্যবস্থা, পল্লীসংস্কারের জন্য ডাক্তারখানা প্রভৃতি আছে। 'শ্রীনিকেতনের একমাত্র উদ্দেশ্য কৃষিকাজে ও হাতের কাজে নিপুণ ছাত্র প্রস্তুত নহে; যাহাতে বৈজ্ঞানিক প্রণালীগুলিতে বিচক্ষণ বিশেষজ্ঞ গড়িয়া উঠে তাহাও এই বিভাগের একটি উদ্দেশ্য।'

যে-সব ছাত্র সাহিত্যচর্চা ও জ্ঞানমূলক শিক্ষা নিয়ে থাকতে চায় তাদের এর পরে আরও চার বৎসর পড়তে হবে। এই সময়ের শেষে উপযুক্ত বিবেচিত হলে তাদের মধ্যবিভাগের তুষ্টিপত্র দেওয়া হবে।

এই বৎসর বিশ্বভারতীর বিভিন্ন বিভাগে বেশ-কয়েকজন নূতন শিক্ষক নিযুক্ত হন, যদিও তাঁরা সকলে স্থায়ী হননি। সমাজশাস্ত্র ও অর্থনীতির বিশিষ্ট অধ্যাপক রজনীকান্ত দাস অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হন— 'তিনি এক্ষণে আশ্রমের পাশ্ববর্তী গ্রামসমূহে ভ্রমণ করিয়া স্বচক্ষে গ্রামবাসীদের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করিতেছেন।' সুরুলের চিকিৎসা-কেন্দ্রের মিস গ্রিন দেশে ফিরে গেলে তাঁর স্থলে ডাঃ রাইডার নামক একজন মহিলা চিকিৎসক নিযুক্ত হন। ননীবালা রায় মেয়েদের চিকিৎসায় মিস গ্রিনকে সাহায্য করতেন, তাঁকে ধাত্রীবিদ্যা শিক্ষার জন্য কলকাতায় পাঠানো হয়েছিল, পৌষ-সংখ্যা শান্তিনিকেতন-এ জানানো হয়েছে তিনি শিক্ষা সমাপ্ত করে সুরুলের কাজে যোগ দিয়েছেন— সকালে হাসপাতালের কাজ ছাড়াও তিনি দুপুরে শ্রীনিকেতন বালিকা বিদ্যালয়ে পড়াবার কাজও করছেন।

আষাঢ়-সংখ্যায় লেখা হয়, সন্তোষচন্দ্র মজুমদার সুরুলে কয়েকটি অনাথ বালকের শিক্ষার সম্পূর্ণ ভার গ্রহণ করেছেন। 'যাহাতে তাহারা শিশুকাল হইতে হাতের কাজ করিতে শেখে এবং দেশের সমস্যাগুলির উপযুক্ত হইয়া উঠিতে পারে তাহারই চেষ্টা এখানে করা হইবে।' এই প্রয়াসটিই কিছুদিন আগে *The Modern*

Review [Mar 1924, pp. 370–71]-তে "Siksha-Satra"/ (Home School for orphans) নামে আলোচিত হয়। এটি প্রথমে পাঁচটি অনাথ বালিকা ও পাঁচটি বালকের বিশেষায়িত শিক্ষার জন্য পরিকল্পিত হয় :

...freed from all traditional restrictions, who can, by co-ordination of hand and brain and by co-operative life, work out their own destiny from experience, without either help or drag of the existing machinery, and who may take their place, as they develop, in the various practical fields now being opened at Santiniketan, and in the rural life of the neighbourhood....

Nothing will be done for these children that they can do for themselves and everything they do shall be regarded from the view-point of educational value, whether it be the milking of cows and cleaning the byres, or manuring the gardens, or cleaning their own gardens or preparing food. In the early stages, handicraft of definite utility and economic value, farm and garden projects and local excursions, will largely replace classroom at all, but only a workshop; no schoolmaster, but rather a superintendent of the workshop.

The ideas which are behind this training have developed, in part, from the various experiments carried on in the past at Santiniketan, and also from the experience already gained in practical work at Sriniketan.

It is not the aim of the founders to sacrifice education to economic production by child labour, but rather to free the children's imagination and point to evenness of all kinds along which his own imagination can find its fullest expression.

—দুঃখের বিষয়, রবীন্দ্র-আদর্শের সঙ্গে অপরিচিত কর্মকর্তাদের ক্রমিক অবহেলায় এই প্রতিষ্ঠানটি শান্তিনিকেতন পাঠভবনের একটি নিকৃষ্টতর সংস্করণে পরিণত হয়েছে!

পেরু যাত্রার উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথ আশ্রম ত্যাগ করেন ১৮ ভাদ্র [বুধ 3 Sep] বিকেলবেলা; তার আগের দিন সায়াহ্নে আশ্রমবাসিরা তাঁকে বিদায় জানান। যাত্রার দিন সকালে তিনি মন্দিরে উপাসনা করেন। রথীন্দ্রনাথ, প্রতিমা দেবী, নন্দিনী ও সুরেন্দ্রনাথ কর তাঁর সহযাত্রী হন।

কলকাতায় বিশ্বভারতী সম্মিলনীর উদ্যোগে ৩০ ভাদ্র [সোম 15 Sep] সন্ধ্যায় মালাবারের বন্যাপীড়িত জনসাধারণ ও বিশ্বভারতীর সংগীত বিদ্যালয়ের সাহায্যার্থে আলফ্রেড রঙ্গমঞ্চে রবীন্দ্রনাথ বিশ্বভারতীর কয়েকজন ছাত্রী ও কলকাতার কয়েকজন গায়িকার সংগীত-সহযোগে 'অরূপরতন' নাটিকাটি পাঠ করে শোনান— রাণু অধিকারী রানী সুদর্শনার ভূমিকা গ্রহণ করেন। 27 Nov প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ রথীন্দ্রনাথকে লিখেছেন : 'গত মঙ্গলবার [25 Nov] সঙ্গীত বিদ্যালয়ের কাজ আরম্ভ হল।'

'অরূপরতন' অভিনয়ের পরে রবীন্দ্রনাথ সদলবলে 19 Sep [শুক্র ৩ আশ্বিন] হাওড়া স্টেশন থেকে মাদ্রাজ মেলে রওনা হন, এখানে ডাঃ পশুপতি ভট্টাচার্যের ভ্রাতা গিরিজাপতি ও প্রাক্তন ছাত্র বিজয় বাসু

তাঁদের সঙ্গে যোগ দেন।

এবারে অস্বাভাবিক গরমের জন্য দীর্ঘ গ্রীষ্মাবকাশ দেওয়া হয়েছিল, সেইজন্য পুজোর ছুটি কমিয়ে ১৪ আশ্বিন [মঙ্গল 30 Sep] থেকে ৩ কার্তিক [রবি 20 Oct] পর্যন্ত ধার্য হয়। ছুটির আগে ১০ আশ্বিন আনন্দবাজার অনুষ্ঠিত হয়েছিল, দারুণ গ্রীষ্মের জন্য বিদ্যালয় ছুটি হয়ে যাওয়ায় অন্যান্য বারের মতো এবারে মেলাটি বৈশাখ মাসে অনুষ্ঠিত হয়নি। ছুটির আগে শিশুবিভাগের ছাত্ররা সম্ভবত 'মুকুট' নাটিকাটি অভিনয় করে; 'আশ্রমের সকলে মিলিয়া একটি যাত্রা অভিনয়ের উদ্যোগ করিতেছেন। ইহা আশ্রমের লেখকদেরই লেখা।'

তার আগে 24 Sep আশ্রমে পিয়র্সনের স্মৃতিসভায় তাঁর অকালবিয়োগকে দুঃখের সঙ্গে স্মরণ করা হয়।

গত বৎসর 17 Sep 1923 [৩১ ভাদ্র ১৩৩০] বিদেশি অতিথি-অধ্যাপক মরিজ ভিন্টারনিৎসের বিদায়গ্রহণের পরে এই পদটি এতদিন শূন্য ছিল। 1921-এ য়ুরোপ ভ্রমণের সময়ে আমন্ত্রণ সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথের পক্ষে নরওয়েতে যাওয়া সম্ভব হয়নি, কিন্তু সেখানকার ক্রিশ্চিয়ানা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃতজ্ঞ প্রাচ্যবিদ অধ্যাপক স্টেন কোনো-র [Sten Konow, 1867-?] সঙ্গে চিঠিতে তাঁর যোগাযোগ ঘটে, এরই সূত্রে রবীন্দ্রনাথ প্রথম শ্রেণীর জাহাজভাড়া ও মাসিক ৫০০ টাকা সম্মানীর প্রতিশ্রুতি দিয়ে 25 Apr 1923 [১২ বৈশাখ ১৩৩০] তাঁকে লিখেছিলেন; 'I feel sure you will be able to help us in the realisation of our ideal if you can visit our *asrama* even for a short time.' 1 Jun স্টেন কোনো এই প্রস্তাব গ্রহণ করে তাঁকে লেখেন : 'I shall be free to go to India in September or October 1924,' সংসদের 19 Dec 1924 তারিখের অধিবেশনে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় : 'Appointment of Sten Konow as visiting Professor for 1924–25 and Rs.3000 be sanctioned out of Ahmedabad donation.' কিন্তু কার্যত তাঁর আনুষ্ঠানিক নিয়োগপত্র নিশ্চয়ই অনেক আগে তাঁকে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল। 6 Nov [২০ কার্তিক] প্রশান্তচন্দ্র রথীন্দ্রনাথকে লেখেন : 'Prof. Sten Konow ভারতবর্ষে পৌঁছেছেন। ১৩ই নভেম্বর [২৭ কার্তিক] শান্তিনিকেতনে আসবেন— কাল চিঠি পেয়েছি।' এই বিষয়ে অগ্র-সংখ্যা শান্তিনিকেতন-এ সংবাদ দেওয়া হয়, ইনি নিম্নোল্লিখিত বিষয়গুলি অবলম্বনে অধ্যাপনা করবেন— (ক) প্রাচীন খোটানিজ ভাষায় বজ্রচ্ছেদিক প্রভৃতি অন্যান্য পুস্তকের পাঠোদ্ধার (সপ্তাহে একদিন শনিবার প্রাতে ৮টা থেকে); (খ) ভারতীয় ধর্মশাস্ত্র— আর্যগণের ভারতাগমনের সময় থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত ভারতীয় ধর্মের পরিণতি বিষয়ে (শনিবারে সন্ধ্যা সাড়ে ৬টা থেকে); (গ) খরোষ্টি ধর্মপদের ভাষাতত্ত্ব বিষয়ক ও ঐতিহাসিক অবতারণা (রবিবারে প্রাতে ৮টা থেকে)। 'ইঁহার নিকট হইতে পাঠ লইবার জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডাক্তার কালিদাস নাগ ও শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় প্রতি শনি-রবিবারে এখানে আসিয়া থাকেন।' বস্তুত বিশ্বভারতীতে তাঁর প্রাত্যহিক পাঠদান ছাড়া বিশেষ বক্তৃতাগুলি শনি-রবিবারে আয়োজিত হত এঁদের মতো বহিরাগতদের জন্য। কালিদাস নাগ এঁর সম্পর্কে একটি প্রবন্ধও লেখেন [দ্র 'Dr. Sten Konow and the Visva-Bharati', *The Modern Review*, Dec 1924/ 721–22]। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় লিখেছেন : 'বিশ্বভারতীতে ইনি মধ্য এশিয়ার লুপ্ত ভাষা ও সভ্যতা সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন; এ ছাড়া প্রাকৃত ভাষা পড়ান। স্টেন কোনোর গবেষণার ধারা এখানে কেহই ধারণ করিয়া রাখেন নাই; অথবা এমন অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করা হয় নাই যাহাতে করিয়া এই গবেষণাধারা এখানে চালু থাকিতে

পারে। একমাত্র মনোমোহন ঘোষ কিছুটা ধরিয়া রাখেন। ··· তিনি আশ্রম ত্যাগের পর এম. এ. পাস করিয়া প্রাকৃতের উপর গবেষণা করিয়া 'ডক্টর' হন। তাঁহার এই শিক্ষার বুনিয়াদ বিশ্বভারতীতে স্টেন কোনোর নিকট হইতে প্রাপ্ত।'[১৯৭] সস্ত্রীক তিনি শান্তিনিকেতনে এলে তাঁদের দেশীয় নামকরণ করা হয় ভট্ট শ্রী শৈল কন্ব ও শ্রীমতী সাবিত্রী দেবী। যদিও তিনি মাত্র তিন মাসের জন্য বিশ্বভারতীতে এসেছিলেন, তবু দ্বিজেন্দ্রনাথ, ক্ষিতিমোহন প্রভৃতি আশ্রমবাসী অনেকের সঙ্গেই তাঁর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। দ্বিজেন্দ্রনাথ তাঁর উদ্দেশে ইংরেজিতে একটি কবিতা লিখে দেন।[১৯৮] তাঁর সভাপতিত্বে কলকাতা ও আশ্রমের বহু বিশিষ্ট ব্যক্তির উপস্থিতিতে 23 Nov [৮ অগ্র] 'বিদ্যাভবন গবেষণা সমিতি'র উদ্বোধন হয়। এখানে বিধুশেখর শাস্ত্রী 'Aryadeva's Catusataka : A Restoration in Sanskrit from Tibetan' ও ড কলিন্স 'Octaval System of Reckoning in India' নামক দুটি গবেষণামূলক প্রবন্ধ পাঠ করেন। তিনি ৯ পৌষ বিশ্বভারতী পরিষদের অধিবেশনে ও ৬ মাঘ মহর্ষি স্মরণসভাতেও ভাষণ দেন।

Feb 1925-সংখ্যা মডার্ন রিভিয়্যু-তে স্টেন কোনোর বিদায়-সংবর্ধনার বিবরণ পড়ে মনে হয়, তিনি সম্ভবত আগের মাসের শেষদিকে কোনো সময়ে শান্তিনিকেতন থেকে বিদায় গ্রহণ করেন। ফাল্গুন-সংখ্যা শান্তিনিকেতনে লেখা হয় :

আচার্য ষ্টেন কোনোর বিদায় উপলক্ষ্যে বিশ্বভারতীর ছাত্র ও অধ্যাপকগণ আচার্যকে একদিন বিকালে জলযোগের নিমন্ত্রণ করেন। তদুপলক্ষ্যে সন্ধ্যায় গান গরবা নৃত্য হইয়াছি। বিশ্বভারতীর ছাত্ররাও আচার্যদেবকে একদিন জলযোগে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। কিন্তু বিদ্যালয়ের ছাত্ররা যে বিদায় সভার উদ্যোগ করিয়াছিলেন সেইটিই সর্বশ্রেষ্ঠ হইয়াছিল। এই সভায় আচার্য আচার্যপত্নী এবং আশ্রমবাসী সকলেই নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। সভায় বিশেষ জলযোগের ব্যবস্থা ছিল। আম্রকুঞ্জে এই সভার অধিবেশন হয়। সর্বশেষে কয়েকটি গান ও "সাতভাই চাঁপা" নামে একটি নাটক অভিনীত হয়।

আচার্যদেবের আশ্রমত্যাগের পূর্বরাত্রে কলাভবনে একটি সভার অধিবেশন হয়। ইহাতে বিদায় উপলক্ষ্যে, আচার্য ও তদীয় পত্নীকে বিশ্বভারতীর পক্ষ হইতে পূজনীয় শাস্ত্রী মহাশয় কিছু বলেন ও আচার্যকে স্বর্ণাঙ্গুরীয় পট্টবস্ত্র এবং তদীয় পত্নীকে পট্টশাড়ী উপঢৌকন দেওয়া হয়। আচার্য ষ্টেন কোনো তাঁহার বক্তব্য প্রকাশ করিলে বেদমন্ত্র ও শান্তিমন্ত্র উচ্চারণ করিয়া সভা ভঙ্গ হয়।

সম্ভবত এর পরেই তিনি বিশ্বভারতী ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোগে 'ভারতে সাইথিয়াগণের রাজত্ব' বিষয়ে 26, 27, 28 Jan ও 2 Feb ভাষণ দেন।

রবীন্দ্রনাথ দেশে ফিরে আসার পরে আলিপুর অবজারভেটরিতে তাঁর সভাপতিত্বে 7 Apr [মঙ্গল ২৪ চৈত্র] স্টেন কোনো-কে আনুষ্ঠানিক বিদায় জানানো হয়। আনন্দবাজার পত্রিকা [২৮ চৈত্র] লেখে : 'কার্য্যারম্ভ হইলে সর্বপ্রথমে প্রফেসর স্টেন এবং তাঁহার পত্নীকে বৈদিক মন্ত্রে সাদর সম্ভাষণ জ্ঞাপন করা হয়। তার পর শ্রীযুত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর একটি ক্ষুদ্র বক্তৃতা করিয়া তালপত্রে লিখিত একখানা অভিনন্দন পত্র প্রদান করেন। তাহার পর প্রফেসার স্টেন কোনোকে বিশ্বভারতীর চিহ্নাঙ্কিত একটি আংটি প্রদান করেন। প্রফেসার স্টেন্ বৃহস্পতিবার [২৬ চৈত্র] কলিকাতা পরিত্যাগ করিয়া নরওয়ে যাত্রা করিবেন।'[১৯৯]

এবারে ৭ই পৌষের [সোম 22 Dec] উৎসব হয় রবীন্দ্রনাথের অনুপস্থিতিতে। বিভিন্ন কাজের জন্য কয়েকটি সমিতি গড়ে দায়িত্ব ভাগ করে দেওয়া হয়। বৈদ্যুতিক আলোর পর্যাপ্ত ব্যবস্থা ছিল, পানীয় জলের ব্যবস্থাও হয়েছিল যথাযথ। শৃঙ্খলারক্ষার দায়িত্ব নিয়েছিল ব্রতীবালকেরা, মেলাক্ষেত্র পরিষ্কার রাখার ভার ছিল বয়স্ক ছাত্রদের উপর। মেলায় আগত প্রায় ৬০টি দোকান [খাবার, কাপড়, বাসন, গালার খেলনা, মনোহারি এবং

কলাভবনের চিত্রিত পোস্টকার্ড ও ছবির দোকান] পথের দুই পাশে বিন্যস্ত করে লোকের চলাফেরার সুবন্দোবস্ত করা হয়। ৭ই দ্বিপ্রহরে আদিত্যপুর গ্রামের যাত্রাদল জহ্নুমুনি গীতাভিনয় করে। অপরাহ্নে ক্রীড়া প্রদর্শনী, রাত্রে বাজি পোড়ানো জনসাধারণের মনোরঞ্জন করে। দ্বিতীয় দিনেও মল্লক্রীড়া, বায়োস্কোপ, বাজি পোড়ানো, যাত্রাগান ইত্যাদি মনোরঞ্জনের আয়োজন ছিল।

৭ই পৌষ প্রত্যুষে বৈতালিক গান ও রসুনচৌকির রাগিণীতে অতিথি ও আশ্রমবাসীদের ঘুম ভাঙে। মন্দিরে সংগীত-সহ উপাসনা করেন রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়। ৮ই পৌষ আম্রকুঞ্জে সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে প্রাক্তন ছাত্রদের সভা হয়। কার্যকরী সমিতির নির্বাচনে সন্তোষচন্দ্র মজুমদার সম্পাদক, সরোজরঞ্জন চৌধুরী ধনাধ্যক্ষ, অমিয়কুমার ভট্টাচার্য সংসদের সদস্য, প্রমথনাথ বিশী শান্তিনিকেতন পত্রিকার সম্পাদক ও শশধর সিংহ কার্যাধ্যক্ষ নির্বাচিত হন। সন্ধ্যায় নাট্যঘরে গানের মজলিশে আশ্রমের ওস্তাদ ও ছাত্রছাত্রীরা নানারূপ গানবাজনা পরিবেশন করেন।

৯ পৌষ সকালে আম্রকুঞ্জে বিশ্বভারতী পরিষদের অধিবেশনে স্টেন কোনো, অ্যান্ডরুজ, বিধুশেখর শাস্ত্রী প্রভৃতি ভাষণ দেন। দুপুরবেলায় কলাভবনে অনুষ্ঠিত অধিবেশনে নানা কাজের কথা আলোচিত হয়। রাত্রে আশ্রমের যাত্রাদল 'বীরভূমবিজয়' অভিনয় করে।

পৌষোৎসবের পরবর্তী সপ্তাহকালীন ছুটিতে অধ্যাপক ও ছাত্রছাত্রীরা বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে দিগ্বিজয়ে বহির্গত হন।

বর্তমান বৎসরের জন্য জগদানন্দ রায় ছাত্রপরিচালক এবং প্রমথনাথ বিশা ও তারকনাথ লাহিড়ী সম্পাদক [ছাত্রসচিব] নিযুক্ত হন। সাহিত্যসভার সম্পাদক হন কানাইলাল সরকার, জগদীশ চট্টোপাধ্যায় ও অমিতা চক্রবর্তী। ছাত্রসম্মিলনীর সম্পাদক হন রামচন্দ্র ও ইভা বসু, পত্রিকাধ্যক্ষ সুজিতকুমার মুখোপাধ্যায়।

আশ্রম লাইব্রেরির পুস্তকসংখ্যা গত বৎসরের ২১ হাজার থেকে বর্তমান বৎসরে ৩০ হাজারে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়েছে।

এই বৎসর বিদ্যালয়ে ছাত্রসংখ্যা ১৪০ ও ছাত্রী ২৫ জন এবং কলেজ বিভাগে ছাত্র ১৪ ও ছাত্রী ৬ জন, ছাত্রীরা সকলেই কলাভবনে যোগ দিয়েছিলেন, সেখানে ছাত্র ছিলেন ৮ জন।

২৬ ফাল্গুন[মঙ্গল 10 Mar] দোলপূর্ণিমা উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথের শিক্ষায় 'সুন্দর' নামে একটি গীতিভূমিকা অভিনয়ের আয়োজন করা হয়েছিল, আম্রকুঞ্জে অভিনয়স্থলটি সুরেন্দ্রনাথ করের তত্ত্বাবধানে সুচারুরূপে সজ্জিত হয়েছিল, কিন্তু অভিনয়ের পূর্বেই প্রবল বৃষ্টিতে সমস্ত আয়োজন পণ্ড হয়।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনাবসান হয় ২০ ফাল্গুন [বুধ 4 Mar]; এই উপলক্ষে আশ্রমে একদিন অনধ্যায় ঘোষিত হয়। 'এতদুপলক্ষ্যে প্রাতঃকালে মন্দিরে উপাসনা হয় এবং সন্ধ্যায় একটি সভা হয়। তাহাতে শ্রদ্ধেয় রামানন্দবাবু, নেপালবাবু ও এণ্ডরুজ সাহেব জ্যোতিরিন্দ্রবাবুর জীবনী সম্বন্ধে আলোচনা করেন।'

নবপ্রতিষ্ঠিত বিশ্বভারতী গবেষণা সমিতির একটি অধিবেশনে ক্ষিতিমোহন সেন মধ্যযুগের হিন্দি কবি 'দাদূ' সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। ড কলিন্স পাঠ করেন 'Suggested Iranian Influence on Punjabi Sanskrit' নামক একটি গবেষণামূলক নিবন্ধ।

৩০ চৈত্র [সোম 13 Apr] রবীন্দ্রনাথ মন্দিরে বর্ষশেষের উপাসনা করেন। রাত্রে কোণার্ক বাড়ির বারান্দায় দোলপূর্ণিমার সন্ধ্যায় অভিনেয় স্থগিত 'সুন্দর' গীতিভূমিকাটি অভিনীত হয়।

এই বৎসরও ‘শান্তিনিকেতন’ পত্রিকায় কখনও স্বতন্ত্রভাবে ও কখনও অন্য সংবাদের সঙ্গে ‘শ্রীনিকেতন সংবাদ’ বিস্তৃত আকারে মুদ্রিত হয়। আষাঢ়-সংখ্যায় জানানো হয়েছে, সুরুলে একটি টিউবওয়েল বসানো হয়েছে ও সেটি থেকে জল পাওয়া যাচ্ছে।

আগের বছর কৃষিবিভাগের জমিগুলি শৃঙ্খলাবদ্ধ না থাকায় জলনিষ্কাশন ও সেচের অসুবিধা ভোগ করতে হয়েছিল; এবারে আলগুলি অপসারণ করে জমিগুলিকে বৃহত্তর আকার দেওয়া হয়েছে, ফলে সমস্ত কৃষিক্ষেত্রটি এমন সুচারুভাবে পয়ঃপ্রণালীর দ্বারা বিন্যস্ত হয়েছে যে বর্ষার অতিরিক্ত জল ক্ষেত্রের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত জমিগুলিকে সিক্ত করে পুনরুদ্ধার-করা বড়ো পুকুরটিতে জমবে। এই কারণে রবিফসলের সময়েও জলসেচের অসুবিধা হবে না। প্রচলিত ও অপ্রচলিত চাষের আয়োজন করা হয়— তরকারির মধ্যে মুলো, ঝিঙে, পুঁই, কুমড়ো, লাউ, পাটশাক, ডাঁটা, বরবটি, উচ্ছে, শসা, লঙ্কা, ঢ্যাঁড়স, বেগুন ও কচু, শস্যের মধ্যে শন, আখ, আলু, হলুদ, পাট, ধান ও তুলো, ফলের মধ্যে আনারস, কলা ও পেঁপে গোখাদ্যের মধ্যে জোয়ার, বরবটি, ভুট্টা, Impea নামক একপ্রকার জোয়ার ও সয়াবীন। এই অঞ্চলে আদার চাষ করা হত না, কিন্তু এখানে অনেকটা জমিতে আদা লাগিয়ে পরীক্ষা করা হচ্ছে, ‘ফসলের আশা বিশেষ আশাপ্রদ’। আনারস চাষও এখানে প্রচলিত ছিল না, এখানকার ক্ষেত্রটিকে দু’ভাগে বিভক্ত করে ছায়ায় ও খোলা জমিতে চাষ করা হচ্ছে, আমেরিকার আধুনিক প্রণালি অনুসারে খোলা জমির চারাগুলির গোড়ায় একপ্রকার কাগজ দিয়ে বর্ষার পরে ঢেকে দেওয়া হবে।

বীরভূম জেলাবোর্ডের সভাপতি গ্রীষ্মের ছুটিতে এই জেলার দশটি মধ্য-ইংরেজি স্কুলের প্রধান শিক্ষকদের পল্লিসেবাবিভাগের কার্যপ্রণালি শিক্ষা করার জন্য শ্রীনিকেতনে পাঠান। তাঁরা স্কাউটিং, স্বাস্থ্যবিধি, বয়নবিদ্যা ও গ্রামপুনর্গঠন বিষয়ে শিক্ষা অর্জন করে নিজেদের গ্রামে ফিরে পল্লিসেবার কাজ শুরু করে দেন। সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর নিজের জমিদারি থেকে দুটি ছাত্রকে এখানে পাঠিয়ে স্কাউটিং শিখিয়ে নিয়ে যান, তারা নিজেদের গ্রামে ফিরে ৬টি সহায়কদল গঠন করেন, কালীমোহন ঘোষ ও ধীরানন্দ রায় সেখানে গিয়ে তাদের কাজ দেখে খুশি হয়েছেন।

স্থানীয় ১০টি গ্রামে পল্লিসেবা বিভাগের পক্ষ থেকে ম্যালেরিয়া নিবারণের কাজ চলছে। সেখানকার গ্রামবাসীরা সমিতি গড়ে সহায়কদলের সহায়তায় ম্যালেরিয়া দূরীকরণে ব্রতী হয়েছেন।

এই বছরে মোট ৪৪ জন ছাত্র সুরুলে এসে বয়নবিভাগে নানারূপ কাজ শিখেছেন, তাঁদের মধ্যে জেলার ১০টি মধ্য-ইংরেজি বিদ্যালয়ের শিক্ষকেরাও ছিলেন। তাঁরা এখন নিজেদের বিদ্যালয়ে এই শিক্ষা প্রয়োগ করছেন। গত 1 Jun থেকে বোলপুর গুরু ট্রেনিং স্কুলের ১৫ জন ছাত্র রোজ বিকেলে ৩ ঘন্টা করে এই বিভাগে কাজ শিখছেন। সুরুলের পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলির তাঁতিরা যাতে মহাজনের কবলে না পড়ে নিজেদের সংসার স্বচ্ছন্দে নির্বাহ করতে পারে সেই জন্য তাদের সুতো সরবরাহ করে উপযুক্ত পারিশ্রমিক দিয়ে তাদের প্রস্তুত বস্ত্রাদি কিনে নেওয়া হয়। গৃহশিল্পগুলি পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করাই এ বিভাগের মুখ্য উদ্দেশ্য। এই বিভাগের পরিচালনায় এখন সুতি, রেশম, কম্বল, কার্পেট বোনা, উদ্ভিজ্জ রাসায়নিকের সাহায্যে কাপড় রাঙানো ও ক্যালিকো ছাপার কাজ চলছে।

গ্রীষ্মের ছুটির পরে চামড়ার কাজ আবার শুরু হয়েছে। গত বৎসর ক্রোম ট্যানিং বিশেষ লাভজনক না হওয়ায় এবারে bark tanning করা হচ্ছে। পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলির মুচিদের মধ্যে জাতিগত ব্যবসা পুনঃপ্রতিষ্ঠা

করা এই বিভাগের উদ্দেশ্য। এখন গ্রাম থেকে ৩ জন মুচিকে আনিয়ে তাদের শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে। ইতিমধ্যে মাহিদাপুরের একটি মুচি পরিবার এখানকার কার্যপ্রণালি অনুসারে নিজের বাড়িতেও এই ব্যবসা শুরু করেছে। 'আশা করা যায় ক্রমে অন্যান্য সকল মুচিরাই তাদের জাতিগত ব্যবসা পুনরায় আরম্ভ করিয়া এই শিল্পের উন্নতি বিধান করিবে।'

আষাঢ় মাসে চিকিৎসালয়ের কাজ সন্তোষজনক, দৈনিক গড়ে ২৬ জন রোগী ঔষধ নিয়ে গেছেন। প্রায় ১৮০ টাকার যন্ত্রাদি ও ২০০ টাকার ঔষধাদি কেনা হয়েছে। গ্রামের উন্নতিবিধানের জন্য কয়েকটি নিয়ম প্রবর্তন করা হয়েছে : (১) যে-সব গ্রামবাসী নিজেদের গ্রামে ম্যালেরিয়া নিবারণী সমিতি তৈরি করে তার সভ্য হয়েছেন তাঁরা ঔষধের মূল্যবাবদ এক আনা দিলে ঔষধ পাবেন। তাঁদের বাড়িতে রোগী দেখাতে হলে নিজ গ্রামের সমিতির ফান্ডে ১ টাকা চাঁদা দিলে সুরুলের স্থানীয় এম.বি. ডাক্তার রোগীর বাড়িতে গিয়ে চিকিৎসা করে আসবেন। (২) অত্যন্ত গরীব সভ্যরা যাঁরা সমিতির ফান্ডে চাঁদা দিতে অক্ষম তাঁদের মাসে অন্তত একদিন গ্রামের উন্নতির জন্য শারীরিক পরিশ্রম করতে হবে। এঁদের চিকিৎসালয়ের টিকিট দেওয়া হবে যাতে তাঁরা বিনামূল্যে ও বিনা ভিজিটে ঔষধ ও চিকিৎসকের পরামর্শ পাবেন। (৩) যে-সব গ্রামবাসী সমিতির সভ্য হবেন না তাঁদের ঔষধের দাম ও ডাক্তারের ভিজিট ৪ টাকা চিকিৎসালয়ের তহবিলে জমা দিতে হবে।

বিশ্বভারতীর অর্থনীতির অধ্যাপক রজনীকান্ত দাস শ্রীনিকেতনেও সমাজতত্ত্ব ও অর্থনীতির একটি বিভাগ খুলেছেন; তিনি সম্প্রতি একটি হিন্দু, একটি মুসলমান ও একটি হিন্দু-মুসলমান মিশ্রিত গ্রামের নানাবিধ জ্ঞাতব্য তথ্য সংগ্রহে নিযুক্ত আছেন। তাঁর আশা, বাংলার সমাজ ও অর্থ সমস্যার মূল কারণ এক বৎসর পরে দেখাতে পারবেন।

পৌষ-সংখ্যা শান্তিনিকেতন-এ পুনরায় 'শ্রীনিকেতন সংবাদ' পরিবেশিত হয়। জানানো হয়েছে, অন্যান্য স্থানের চেয়ে শ্রীনিকেতনে অধিক ধান উৎপাদিত হয়েছে। বর্ষাকালের ফসলগুলি কেটে তিন প্রকার আলু, দু'প্রকারের ছোলা, তিন প্রকার গম, পিঁয়াজ, তিসি, বাঁধাকপি, ফুলকপি, টমেটো, কুসুম, মূলা ও পটল লাগানো হয়েছে। গোশালায় বর্তমানে ২৪টি গাভী, ২৩টি বাছুর, ৩টি ষাঁড় ও ২টি বলদ আছে, শ্রীনিকেতনের সকলকে দুধ সরবরাহ করার পরেও প্রত্যহ ৩২ সের দুধ শান্তিনিকেতনে সরবরাহ করা হয়। স্থানাভাবের জন্য একটি নূতন গোশালা নির্মাণ করার প্রস্তাব নেওয়া হয়েছে। মুর্গির ব্যবসা সন্তোষজনক। এই বিভাগের ভারপ্রাপ্ত গোপালচন্দ্র বসু নূতন প্রণালীতে যন্ত্রের সাহায্যে ডিম ফুটিয়ে শাবক উৎপাদন ও তাদের অল্প সময়ে বাড়িয়ে তোলার কাজে সাফল্য লাভ করেছেন। পুরোনো সাদা লেগহর্ন মুর্গিগুলি বিক্রি করে সেই জাতীয় নূতন মুর্গি কেনার ব্যবস্থা হচ্ছে।

বয়ন বিভাগে প্রস্তুত বিভিন্ন বস্ত্রের মান গত বৎসরের থেকে অনেক উন্নত হয়েছে, ফলে বাজারে তার চাহিদাও ভালো। আশা করা যায়, এই বিভাগ শীঘ্রই স্বাবলম্বী হবে। ব্যবসার সঙ্গে চতুষ্পার্শের গ্রামের লোকদের ও জেলাবোর্ড-প্রেরিত উচ্চ ও মধ্য-ইংরেজি বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের প্রায় ৪০ জন এই বিভাগে শিক্ষাপ্রাপ্ত হয়েছেন।

'বিদ্যালয়গুলিকে কেন্দ্র করিয়া কি উপায়ে আমাদের দেশের বালকদিগকে আত্মনির্ভরতা, কষ্টসহিষ্ণুতা, উপার্জনস্পৃহা, সামাজিক ও নৈতিক উন্নতি, শারীরিক ও গ্রাম্য স্বাস্থ্য সম্বন্ধে সচেষ্ট করিয়া তুলিতে পারা যায় তজ্জন্য কিছুদিন হইতে শ্রীনিকেতন পল্লীসেবা বিভাগ বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন।' গত বৎসর Village

Workers' Training Camp নাম দিয়ে তিনটি ক্যাম্পে ১৬ জন মধ্য-ইংরেজি ও ৭ জন উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয়ের শিক্ষক-সহ ৩৪ জন কর্মী স্কাউটিং, বয়ন, কাপড় রাঙানো, ক্যালিকো প্রিন্টিং, চাষ, গোপালন, শারীরিক ও গ্রাম স্বাস্থ্য এবং গ্রাম্য সমস্যা বিষয়ে শিক্ষা লাভ করেন। 'কর্মীগণ সমস্ত দিন কঠোর পরিশ্রম করিয়া যেভাবে কর্মনিষ্ঠা দেখাইয়া গিয়াছেন তাহাতে আশা করা যায় যে তাঁহারা সত্বর নিজ নিজ গ্রামে ও বিদ্যালয়ে উপরোক্ত কার্যগুলি, শিক্ষা দিতে সক্ষম হইবেন।'

7 Dec 1924 [২২ অগ্র] শ্রীনিকেতনে বহু বিশিষ্ট ব্যক্তির উপস্থিতিতে পল্লিসংস্কার-বিষয়ক জেলা সম্মিলনীর দু'দিন ব্যাপী প্রথম অধিবেশন হয়। জেলার একজন কৃষিদক্ষ জমিদার অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি রায়বাহাদুর অবিনাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর প্রারম্ভিক ভাষণে দেশের কৃষিসমস্যার কারণ ও তার প্রতিকার বিষয়ে একটি সুলিখিত ভাষণ পাঠ করেন। অতঃপর সর্বসম্মতিক্রমে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় সভাপতিপদে বৃত হন। তিনিও একটি সুন্দর ভাষণ দেন। অভ্যাগতদের মনোরঞ্জনের জন্য শান্তিনিকেতনে শিশুরা 'মুকুট' নাটকটি অভিনয় করে ও কয়েকটি সংগীত পরিবেশিত হয়।

6 Feb 1925 [২৪ মাঘ] শ্রীনিকেতন পল্লিসংস্কার বিভাগের চতুর্থ বার্ষিক উৎসবে প্রাতঃকালে রামানন্দবাবু সকলকে নিয়ে উপাসনা করেন। রাত্রে আশ্রমের ছাত্র ও অধ্যাপকেরা একটি যাত্রাগান অভিনয় করেন।

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় দু'দিনের জন্য আশ্রম পরিদর্শনে আসেন। জগদানন্দ রায়, নেপালচন্দ্র রায়, বিধুশেখর শাস্ত্রী প্রভৃতি তাঁকে স্টেশন থেকে অভ্যর্থনা করে আনেন। সেইদিন সন্ধ্যাকালে কলাভবনে তাঁকে সংবর্ধিত করা হয়। পরদিবস সন্ধ্যায় তিনি একটি সভায় বর্তমান শিক্ষাপদ্ধতি সম্বন্ধে নিজের বক্তব্য বলেন। পরের দিন সকালে তিনি আশ্রম পরিত্যাগ করেন। দ্বিজেন্দ্রনাথের সঙ্গে তিনি অনেকটা সময় কাটান। তিনি মাত্র দু'দিন আশ্রমে ছিলেন, কিন্তু 'এই দুই দিনেই স্বভাবসিদ্ধ সরলতায় আশ্রমের ছাত্রগণের সহিত ঘনিষ্ঠতা স্থাপন করিয়া লইয়াছিলেন।'

12 Apr [২৯ চৈত্র] পল্লিসেবা বিভাগের পক্ষ থেকে বীরভূম জেলার কয়েকটি স্কুলের ও গ্রামের ব্রতী বালকদের আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল, প্রায় ২০০ বালক সমবেত হয়। এইদিন অপরাহ্নে তারা নানাপ্রকার ক্রীড়া প্রদর্শন করে। কিন্তু প্রবল ঝড়ে তাদের অনুষ্ঠান শেষ করা যায়নি, পরদিন সকালে অবশিষ্ট খেলা দেখানোর পর 'পূজনীয় গুরুদেব পুরস্কার বিতরণ করেন'।

উল্লেখপঞ্জি

১ চিঠিপত্র ২। ৭৭, পত্র [২৭]

২ কালিদাস নাগ : কবির সঙ্গে একশো দিন [১৩৯৪]। ১৪

৩ দ্র *Asian Ideas*/ 151

৪ রবীন্দ্রজীবনী ৩। ১৮৫

৫ কবির সঙ্গে একশো দিন। ১৮–১৯

৬ ঐ। ১৯–২০

৭ চিঠিপত্র ১৮। ২৮৪–৮৫, পত্র ১৪৯

৮ ড সরোজমোহন মিত্র : রবীন্দ্রনাথ এবং চীন [১৩৯৩]। ৩৭

৯ Kalidas Nag : *Tagore and China* [1945]/ 44

১০ ড প্রণতি মুখোপাধ্যায় : ক্ষিতিমোহন সেন ও অর্ধশতাব্দীর শান্তিনিকেতন [1999]। ২০৬

১১ কবির সঙ্গে একশো দিন। ২২–২৩

১২ *The Modern Review*, Sep 1924/ 293

১৩ *Visva-bharati Bulletin*, Vol. I, Part II/ 24

১৪ কবির সঙ্গে একশো দিন। ২৯

১৫ রবীন্দ্রজীবনী ৩। ১৯২–৯৩

১৬ রবীন্দ্রনাথ এবং চীন। ৬৩

১৭ রবীন্দ্রজীবনী ৩। ১৯৩

১৮ *Asian Ideas*/ 164

১৯ Ibid/ 165, এল্‌ম্‌হার্স্টের 6 May-র ডায়ারি থেকে সংকলিত

২০ দেশ, ৮ পৌষ ১৩৬২। ৫৬২, পত্র ৩৬

২১ ঐ, ২৪ মাঘ ১৩৯৩। ৬৯, পত্র ২

২২ Tagore and China/ 48

২৩ কবির সঙ্গে একশো দিন। ৩৯–৪০

২৪ ড পঞ্চানন মণ্ডল : ভারতশিল্পী নন্দলাল ২ [১৩৯০]। ১৯৯

২৫ *Visva-Bharati Bulletin*, No. 1, Part II/ 41

২৬ কবির সঙ্গে একশো দিন। ৪০–৪১

২৭ *Asian Ideas*/ 169

২৮ বিতর্কিত অতিথি। ৬৬–৬৭

২৯ *Asian Ideas*/ 171

৩০ Ibid/ 170

৩১ Ibid/ 173

৩২ র-মূল

৩৩ দ্র *Asian Ideas*/ 173–74

৩৪ দ্র Ibid/ 174–75

৩৫ সমর ভৌমিক : রাণু মুখোপাধ্যায়ের জীবনালেখ্য [১৪০৪]। ১৮৮

৩৬ র-মূল

৩৭ দ্র *Asian Ideas*/ 177

৩৮ Ibid/ 178

৩৯ Ibid/ 181

৪০ দ্র Ibid/ 181

৪১ কবির সঙ্গে একশো দিন। ৬০

৪২ ঐ। ৬০–৬১

৪৩ ঐ। ৬২

৪৪ ঐ। ৬২

৪৫ দ্র ঐ। ৬২–৬৩

৪৬ *Asian Ideas*/ 184

৪৭ কবির সঙ্গে একশো দিন। ৬৩

৪৮ দ্র ঐ। ৬৩–৬৪

৪৯ রবীন্দ্রনাথ এবং চীন। ৯৪

৫০ কবির সঙ্গে একশো দিন। ৬০

৫১ ভারতশিল্পী নন্দলাল ২। ২০৪–০৫

৫২ সুচন্দ্রা বসু, 'আমরা যেথায় মরি ঘুরে' : দেশ, বিনোদন ১৩৮৩। ৩৭

৫৩ ঐ। ৩৮–৩৯

৫৪ কবির সঙ্গে একশো দিন। ৬৬

৫৫ দ্র ভারতশিল্পী নন্দলাল ২। ২০৫

৫৬ দেশ, ৭ কার্তিক ১৩৮২। ৯৮৯, পত্র ১১৫

৫৭ দ্র ভারতশিল্পী নন্দলাল ২। ২০৬

৫৮ ঐ ২। ২০৬–০৭

৫৯ সমীর রায়চৌধুরী, 'জাপানে ভারতীয় বিপ্লবী / মহাবিপ্লবীর কথা' : প্রবাসী ভারতীয় বিপ্লবী ও রবীন্দ্রনাথ [1997]। ১৮৪–৮৫

৬০ দ্র অমিতাভ গুপ্ত, 'জাপানী শান্তিনিকেতন' : অমৃত, ২৩ পৌষ ১৩৮৩। ১৯–২০

৬১ দেশ, বিনোদন ১৩৮৩। ৪০

৬২ র-মূল

৬৩ কবির সঙ্গে একশো দিন। ৮৫

৬৪ 'জাপানী শান্তিনিকেতন' : অমৃত, ২৩ পৌষ ১৩৮৩। ১৯

৬৫ দ্র ভারতশিল্পী নন্দলাল ২। ২০৯–১০

৬৬ *Bombay Chronicle* [4 Apr 1925] থেকে উদ্ধৃত, দ্র সমীর রায়চৌধুরী, জাপানে আমন্ত্রিত শিক্ষক' : প্রবাসী ভারতীয় বিপ্লবী ও রবীন্দ্রনাথ। ২০০

৬৭ *Purabi*/ 83, Letter 21

৬৮ *The Jewish Chronicle*, 8 Aug 1924, দ্র Samir Roychoudhury, 'The Jewish Connexion': *The Sunday Statesman Miscellany*, 15 Dec 1991

৬৯ কবির সঙ্গে একশো দিন। ৮৮

৭০ রবীন্দ্র-প্রসঙ্গ ১। ৫০০

৭১ ভারতশিল্পী নন্দলাল ২। ২৩৫–৩৬

৭২ রবীন্দ্র-প্রসঙ্গ ১। ৫০০

৭৩ ঐ ১। ৫০১

৭৪ চিঠিপত্র ১৮। ২৯০, পত্র ১৫২

৭৫ সজনীকান্ত দাস : আত্মস্মৃতি [সুবর্ণরেখা-সং, ১৩৮৪]। ১২৯

৭৬ দ্র র-মূল

৭৭ চিঠিপত্র ১৮। ২৯১, পত্র ১৫৩

৭৮ দ্র ভারতশিল্পী নন্দলাল ২। ২৩৯–৪১

৭৯ রবীন্দ-প্রসঙ্গ ১। ১৬২

৮০ ঐ ১। ৩৫৬

৮১ ঐ ১। ৩৫৭

৮২ অমল মিত্র : কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ও নটরাজ শিশিরকুমার [1977]। ২ থেকে উদ্ধৃত

৮৩ ঐ। ৩–৪

৮৪ দেশ, শারদীয় ১৩৭৩। ২৯, পত্র ৩৯

৮৫ ঐ। ২৯, পত্র ৪০

৮৬ রবীন্দ্র-প্রসঙ্গ ১। ২৬৮

৮৭ ঐ ১। ২৬৯

৮৮ সনৎকুমার বাগচী : রবীন্দ্রনাথ ও কয়েকজন রাজপুরুষ [১৩৯৪]। ৬৫–৬৬

৮৯ রবীন্দ্র-প্রসঙ্গ ১। ২৭০

৯০ চিঠিপত্র ১১। ৪০, পত্র ৩০

৯১ ঐ ১৮। ২৯১–৯২, পত্র ১৫৪

৯২ ঐ ৫। ৫৩, পত্র ১৪

৯৩ রবীন্দ্র-প্রসঙ্গ ১। ৩৫৭–৫৮

৯৪ ঐ ১। ৫০৩

৯৫ দ্র ঐ ১। ৩৫৮—৫৯

৯৬ রঙ্গমঞ্চ ও রবীন্দ্রনাথ। ১০৮—০৯

৯৭ স্মৃতির খেয়া। ১৪১

৯৮ রাণু মুখোপাধ্যায়ের জীবনালেখ্য। ৮৮—৮৯

৯৯ ঐ। ৮৯

১০০ শান্তিদেব ঘোষ : রবীন্দ্রসংগীত [১৩৭৬]। ২৩৭

১০১ র-মূল, প্রশান্তচন্দ্র-নির্মলকুমারী মহলানবিশ সংগ্রহ

১০২ দেশ, ৩০ জ্যৈষ্ঠ ১৩৮২। ৪৯৫, পত্র ৩৭

১০৩ হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় : রবীন্দ্রনাথের কথা। ৮ [লিপিচিত্র]

১০৪ ডাঃ পশুপতি ভট্টাচার্য : অন্তরঙ্গ রবীন্দ্রনাথ [১৩৮২]। ৮০

১০৫ চিঠিপত্র ১৮। ২৯২—৯৩, পত্র ১৫৫

১০৬ ঐ ১৮। ৫১০—১৩, পত্র ৬৫

১০৭ ঐ ১৮। ৬৬, পত্র ২৬

১০৮ ঐ ১৮। ২৯৫—৯৬, পত্র ১৫৬

১০৯ যাত্রী [গ্র.প.] ১৯। ৫৩২

১১০ দেশ, ৬ আষাঢ় ১৩৮২। ৫৭৫, পত্র ৫৪

১১১ যাত্রী ১৯। ৪২৭

১১২ কেতকী কুশারী ডাইসন ও সুশোভন অধিকারী, ‘ছবির দিকে ৮’ : রঙের রবীন্দ্রনাথ [1997]। ৪৩৪

১১৩ ঐ। ৪৩৬

১১৪ দেশ, ৬ আষাঢ় ১৩৮২। ৫৭৫, পত্র ৪৫

১১৪ক চিঠিপত্র ১২। ২৯৪, পত্র ১৭

১১৫ যাত্রী ১৯। ৪২৭—২৯

১১৬ দেশ, ৩০ জ্যৈষ্ঠ ১৩৮২। ৪৯৬, পত্র ৪২

১১৭ দেশ, সাহিত্য ১৩৮৬। ৩৮, পত্র ১৬

১১৮ শঙ্খ ঘোষ : ওকাম্পোর রবীন্দ্রনাথ [১৪০৫]। ৩৭

১১৯ ঐ। ৬৪—৬৫

১২০ Ketaki Kushari Dyson : *In Your Blossoming Flower-Garden / Rabindranath Tagore und Victoria Ocampo* [1988]/ 373, Letter 1 [Hereafter: *Flower-Garden]*

১২১ ওকাম্পোর রবীন্দ্রনাথ। ৬৬—৬৭

১২২ দেশ, ৬.আষাঢ় ১৩৮২। ৫৭৬, পত্র ৪৭

১২৩ *Flower-Garden*/ ৪৪

১২৪ দেশ, ৬ আষাঢ় ১৩৮২। ৫৭৬, পত্র ৪৮

১২৫ ঐ। ৫৭৬, পত্র ৪৬

১২৬ অবন্তীকুমার সান্যাল-অনূদিত রম্যাঁ রলাঁ : ভারতবর্ষ / দিনপঞ্জী (১৯১৫–১৯৪৩) [1989]। ৭৩ [অতঃপর গ্রন্থটি 'ভারতবর্ষ : দিনপঞ্জী' নামে উল্লেখিত হবে]

১২৭ ঐ। ৭৬

১২৮ L.K. Elmhirst, 'Personal Memories of Tagore *Rabindranath Tagore, A Centenary Volume, 1861–1961* [Sahitya Akademi, 1961]/ 22 [Hereafter :*Centenary Volume]*

১২৯ ডার্টিংটন হল-সংগ্রহ, অ্যান্ড্রু রবিনসনের সৌজন্যে প্রাপ্ত

১৩০ ওকাম্পোর রবীন্দ্রনাথ। ৬৮

১৩১ Victoria Ocampo : 'Tagore on the Banks of the River Plate' : *Centenary Volume*/ 34

১৩২ *Flower-Garden*/ 374, Letter 2

১৩৩ Ibid/ 375–76, Letter 3

১৩৪ Ibid/ 126

১৩৫ দেশ, ৬ আষাঢ় ১৩৮২। ৫৭৬, পত্র ৪৫

১৩৬ চিঠিপত্র ৪। ১০৮, পত্র ৪৩

১৩৭ ঐ ৩। ৪১, পত্র ১৮

১৩৮ *Flower-Garden*/ 391–92, Letter 12

১৩৯ চিঠিপত্র ৩। ৪০–৪১, পত্র ১৮

১৪০ ওকাম্পোর রবীন্দ্রনাথ। ৭৮–৭৯

১৪১ ঐ। ৮১

১৪২ ঐ। ৮২

১৪৩ ঐ। ৭৫–৭৬

১৪৪ *Centenary Volume*/ 36

১৪৫ ওকাম্পোর রবীন্দ্রনাথ। ৯৭–৯৮

১৪৬ রঙের রবীন্দ্রনাথ। ৪৩৮–৩৯

১৪৭ ওকাম্পোর রবীন্দ্রনাথ। ৮৭

১৪৮ র-মূল

১৪৯ চিঠিপত্র ১২। ২৯৪–৯৫, পত্র ১৭

১৫০ ঐ ১২। ২৯৭–৯৮, পত্র ১৮

১৫১ *Flower-Garden*/ 174

১৫২ দ্র Ibid/ 183–85

১৫৩ দ্র Ibid/179–81

১৫৪ র-মূল

১৫৫ দ্র *Flower-Garden*/ 188

১৫৬ দ্র Ibid/190

১৫৭ Ibid/ 198

১৫৮ চিঠিপত্র ১৮। ২৯৬–৯৯, পত্র ১৫৭

১৫৯ *Flower-Garden*/ 388, Letter.11

১৬০ Ibid/ 390, Letter 12

১৬১ Ibid/ 392, Letter 12

১৬২ Ibid/ 203

১৬৩ রবীন্দ্রজীবনী ৩। ২২৯, ২২৬

১৬৪ *Flower-Garden*/ 398, Letter 14

১৬৫ র-মূল

১৬৬ *Imperfect Encounter*/ 312, Letter 156

১৬৭ *Flower-Garden*/ 402, Letter 16

১৬৮ র-মূল

১৬৯ *Flower-Garden*/ 403, Letter 17

১৭০ র-প্রতিলিপি

১৭১ *Purabi*/ 88, Letter 26

১৭২ Ibid/ 88, Letter 27

১৭৩ যাত্রী ১৯। ৪১০–১১

১৭৪ চিঠিপত্র ১৮। ৩৫৮–৫৯, পত্র ৮

১৭৫ ঐ ১৮। ৩৬০–৬১, পত্র ৯

১৭৬ ঐ ১৮। ৩৬২, পত্র ১০

১৭৭ ঐ ১৮। ২৯৯–৩০০, পত্র ১৫৮

১৭৮ *Flower-Garden*/ 405, Letter 19

১৭৯ Ibid/ 406, Letter 20

১৮০ ভারতবর্ষ : দিনপঞ্জী। ৯১–৯২

১৮১ *Purabi*/ 88–89, Letter 28

১৮২ দেশ, শারদীয় ১৪০৩। ৩১, পত্র ১৬

১৮৩ ঐ। ৩১, পত্র ১৭

১৮৪ রবীন্দ্রজীবনী ৩। ২৩৩

১৮৫ দেশ, শারদীয় ১৪০১। ৩৫, পত্র ৫১

১৮৬ আত্মস্মৃতি। ১২৯

১৮৭ রবি মিত্র ও দেবকুমার বসু : শিশির সান্নিধ্যে [1963]। ১১৫

১৮৮ হেমেন্দ্রকুমার রায় : সৌখীন নাট্যকলায় রবীন্দ্রনাথ [১৮৮১ শক]। ৭৭

১৮৯ দেশ, ১৯ কার্তিক ১৩৬৭। ২০, পত্র ২

১৯০ চিঠিপত্র ১৮। ৩০১, পত্র ১৫৯

১৯১ ঐ ১৮। ২৯৯–৩০০, পত্র ১৫৮

১৯২ চিঠিপত্র ৩। ৩০–৩১, পত্র ১৫

১৯৩ চিত্রা দেব : ঠাকুরবাড়ির অন্দর মহল [১৩৮৭]। ১৬৩

১৯৪ ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী : 'জীবনকথা', স্মৃতিসম্পুট ১ [১৪০৪]। ১৬৬–৬৭

১৯৫ *CWMG* 25 [1967], No. 172

১৯৬ 'আশ্রম সংবাদ', শান্তিনিকেতন, আষাঢ়। ১১৫

১৯৭ প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় : 'শান্তিনিকেতন-বিশ্বভারতী' [১৪০৭]। ১২৫

১৯৮ দ্র প্রবীরকুমার নাথ : 'রবিতীর্থে বিদেশী' [১৪০৬]। ৪৮, পাদটীকা ১

১৯৯ রবীন্দ্র-প্রসঙ্গ ১। ১০১

পঞ্চষষ্টি অধ্যায়

১৩৩২ [1925–26] ১৮৪৭ শক ॥ রবীন্দ্রজীবনের পঞ্চশষ্টি বৎসর

১ বৈশাখ ১৩৩২ [মঙ্গল 14 Apr 1925] প্রাতঃকালে রবীন্দ্রনাথ মন্দিরে নববর্ষের যে-উপাসনা করেন, সেটি বৈশাখ-সংখ্যা শান্তিনিকেতন-এ [পৃ ৯০–৯৩] 'নববর্ষ' শিরোনামে মুদ্রিত হয়। চৈত্র ১৩৩১ মাসটির বৃহদংশ তিনি কাটিয়েছিলেন শহর কলকাতার কোলাহলের বাইরে প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশের আলিপুর অবজারভেটরির কোয়ার্টারে তাঁর তরুণী বধূ রাণীর [নির্মলকুমারী] সুমধুর আতিথ্যের আশ্রয়ে [এর আগেও তিনি আশ্বিন ১৩৩০-এ বেশ কিছুদিন সেখানে ছিলেন, এবারে দ্বিতীয় দফা]। সেই অভিজ্ঞতাই রূপ পেল বর্তমান বৎসরের নববর্ষের ভাষণে :

এবার অসুস্থ শরীর নিয়ে মৃত্যুর পশ্চিম কূলে ব'সে ম্লান প্রাণের আলোকে অভ্যস্ত জীবনযাত্রা থেকে দূরে আপনাকে ও বিশ্বকে দেখবার অবকাশ পেয়েছিলুম। কলকাতায় যেখানে ছিলুম সেখানে শহরের পাথরে-বাঁধানো শুষ্কতা ছিল না, চারদিক গাছপালায় ছিল শ্যামল। সেখানে এবার অনেক দিন পরে প্রকৃতিতে বসন্তের আগমন স্পর্শ করে দেখতে পেলুম। হঠাৎ গাছপালার তন্দ্রা ছুটে গেল, বিশ্বযজ্ঞের নিমন্ত্রণ তাদের কাছে এসে পৌঁছল, সাজসজ্জার সাড়া পড়ে গেল; ফিকে সবুজে, গাঢ় সবুজে, নীলে, লালে, সোনালীতে প্রত্যেকে নিজের বিশেষত্ব নিয়ে আনন্দিত হয়ে প্রস্তুত হয়ে এল; দেখে আমার মন পুলকিত হয়ে উঠল। কোথা থেকে এ ডাক এল, যার সাড়া সমস্ত পৃথিবীর বুক থেকে উঠছে! আকাশের কোন্ অলক্ষ্য চঞ্চলতা দক্ষিণ হাওয়াকে ব্যাকুল করে তুলেছে! তরুলতার প্রাণশক্তি রূপের লীলায় দিকে দিকে বিচিত্র হয়ে উঠল। প্রত্যেক গাছ আপনার রূপকে পরিস্ফুট করে তুলছে। প্রাণ যেখানে আপন বিশেষত্বের ঐশ্বর্যে পূর্ণ হয়ে প্রকাশ পায় সেইখানে তার অকৃপণ দাক্ষিণ্য, সেইখানে সে বিশ্বকে উদারভাবে আহ্বান করে। এক ধারে অশ্বত্থ, তারি পাশে শিরীষ, তারি পাশে কাঞ্চন— তারা সকলেই রূপে স্বতন্ত্র অথচ সেই স্বাতন্ত্র্যের পূর্ণতাতেই তাদের পরস্পরের ভাবের মিল। আকাশবীণার একই আলোকের সুরে তাদের নিজ নিজ বিভিন্ন রাগিণী উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠছে। অরণ্যব্যাপী প্রাণের আনন্দসংগীতে তাদের অবিরোধ মিলন। প্রত্যেক গাছ আপনার বিশেষ আতিথ্য দিয়ে বিশ্বের সঙ্গে আপন আত্মীয়তা জানাচ্ছিল। তা না হলে গাছ দেখে আমার মনে কোনো ভাব আসত না। যখনই সে নিজেকে পূর্ণ করলে, তখনই সে আমাকেও আহ্বান করলে— তার আপনার পূর্ণতা আমারও পূর্ণতাকে উদ্বোধিত করলে।

'নবর্ষের দিন মন্দিরের পর আম্রকুঞ্জে আশ্রমবাসী সকলের জন্য এবং সমাগত অতিথিগণের জন্য জলযোগের আয়োজন করা হয়েছিল।' রবীন্দ্রনাথ ১০ বৈশাখ ডাঃ পশুপতি ভট্টাচার্যের স্ত্রী দুর্গা ভট্টাচার্যকে লেখেন : 'অনুষ্ঠানটি এখানে বেশ ভালই হয়েছিল। ছোট মেয়েরা লক্ষ্মীর পরীক্ষা অভিনয় করেছিল।'[১]

১ বৈশাখ তিনি ইন্দিরা দেবীকে লিখেছিলেন : 'নাৎনীরা আমার গ্রহ; তা'রা আধুনিক জ্যোতিষের নিয়ম ছাড়িয়ে গেছে— তারাই রবিকে নিজের চারদিকে প্রদক্ষিণ করায়— অর্থাৎ আমার চেয়ে তাদের টানের জোর বেশি। রবিকে যে কলকাতার কক্ষ থেকে বিচলিত করেছে তুই তার হিসাব বের করেছিস্;— ঠিক করেছিস এখানে একটি গ্রহ বিরাজমান আছে— শুনেছি এই রকমের একটা হিসাব অনুসরণ করে নেপচুন গ্রহের

অস্তিত্ব ধরা হয়েছিল।’[২] অর্থাৎ পুপেই সেই গ্রহ, যাঁর টানে রবীন্দ্রনাথ কলকাতা ছেড়ে শান্তিনিকেতনে ফিরে এলেন। অবশ্য গ্রীষ্মের ছুটির আগে ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে মিলিত হবার আকাঙ্ক্ষাও তাঁকে টেনে আনতে পারে।

আগেই বলেছি, ৯ বৈশাখ [বুধ 22 Apr] কালিদাস নাগ ও শান্তা চট্টোপাধ্যায়ের বিবাহ হয়। রবীন্দ্রনাথ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন না, তিনি এদিনের তারিখ দিয়ে একটি আশীর্বাদ-কবিতা লিখে পাঠান : ‘দুইয়ের মিলনে রচিয়া পাত্রখানি’ [দ্র চিঠিপত্র ১২। ২৫০, পত্র ৪]।

শান্তিনিকেতনের দিনগুলি রবীন্দ্রনাথ মোটামুটি বিশ্রামে কাটাচ্ছিলেন। সেই কথাই ১০ বৈশাখ লিখেছেন কাদম্বিনী দত্তকে : ‘শরীরের অস্বাস্থ্য উপলক্ষে যে ছুটি পেয়েছি সেই ছুটি আমার অনেক কাজে লেগেচে। অনেকদিন পরে বিশ্বের অন্তঃপুরে মন আপন আসন পেতে বস্‌তে পেরেচে।’[৩]

তাঁর ৬৫তম জন্মোৎসবের আয়োজন চলেছিল ভালোভাবেই, ‘শ্রীযুত কর্ত্তাবাবু মহাশয়ের জন্মোৎসবের নিমন্ত্রণ পত্র ছাপা’র ব্যবস্থাও ছিল। সজনীকান্ত দাস লিখেছেন : ‘শান্তা দেবীকে লইয়া শান্তিনিকেতন পৌঁছিয়াছিলাম ১৩৩২ বৈশাখের মাঝামাঝি। গিয়াই দেখি, রবীন্দ্রনাথের পঞ্চষষ্টিতম জন্মদিন উপলক্ষ্যে বিপুল আনন্দের আয়োজন চলিয়াছে। কলিকাতা হইতে দলে দলে ভক্তেরা আসিতেছেন, শান্তিনিকেতন সরগরম।’[৪]

7 May গান্ধীজি রবীন্দ্রনাথকে জন্মোৎসবের অভিনন্দন জানিয়ে লেখেন : ‘Suneeti Devi tells me she is going to Bolpur to take part in the celebration of your 64th birthday. May I add my wish and prayer to the many that will be sent up tomorrow for your health and long life?’[৫]

আনন্দবাজার পত্রিকা [৩০ বৈশাখ] জন্মোৎসবের একটি বিস্তৃত বিবরণ প্রকাশ করে :

গত ২৫শে বৈশাখ বোলপুর শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথের পঞ্চষষ্টিতম জন্মতিথি উপলক্ষে উৎসব হইয়া গিয়াছে। এই উপলক্ষে কলিকাতা হইতে শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, শ্রীযুক্ত দিলীপকুমার রায়, শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ মৈত্র, শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার ঘোষ ও অন্যান্য বহুলোক বোলপুরে গিয়াছিলেন। যদিও এখন বিশ্বভারতীর ও তৎসংলগ্ন বিদ্যালয়ের গ্রীষ্মাবকাশ চলিতেছে, তবু উৎসব বেশ সুসম্পন্ন হইয়াছে। উষার প্রাক্কালে বৈতালিকগীতি হয় ও প্রাতে ৬টার সময় কবির বাসভবন “উত্তরায়ণে” সকলে সমবেত হন ও শঙ্খ ও ঘণ্টা বাজিয়ে [য] উপবেশন করেন। তৎপরে কয়েকটি সাময়িক গান ও সঙ্গে সঙ্গে আচার্য্য রবীন্দ্রনাথ অনুষ্ঠানভূমিতে আগমন করেন। তখন সকলে দণ্ডায়মান হইয়া বেদগান করেন ও মন্ত্রপাঠ করেন। আশ্রমবাসীর পক্ষ হইতে শ্রীযুক্ত বিধুশেখর শাস্ত্রী মহাশয় কবিবরকে উদ্দেশ করিয়া স্বস্তিবাচন পাঠ করেন ও তাঁহাকে মাল্যচন্দনাদি দান করেন। সঙ্গে সঙ্গে নানারূপ শঙ্খ-ঘণ্টা ধ্বনি ও আনন্দবাদ্য হয়। পথে আশ্রম কন্যকা ও পুরন্ধ্রীগণ প্রশস্তিপাত্র লইয়া সারি বাঁধিয়া আগমন করেন ও নানা ফলমূল ও মিষ্টান্ন নৈবেদ্যাকারে সাজাইয়া আচার্য্যকে অর্ঘ্যপ্রদান করেন। সময়োচিত কয়েকটি গানের পর সমবেত জনমণ্ডলী কবিবরের গৃহে নানারূপ ভোজ্য-পেয় দ্বারা জলযোগ করেন। নানা মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানের মধ্যে স্বর্গবৃদ্ধি দিবসে পান্থপশুপক্ষী ও অন্য প্রাণীর চিত্ত ও সুখের জয় পঞ্চবটী কবি রোপণ করিলেন ও সকলকে উৎসর্গ করিলেন। মধ্যাহ্নকালে আশ্রমের সকলকে প্রচুর আহার করা হয়। সন্ধ্যায় ঝড়বৃষ্টির শেষে “লক্ষ্মীর পরীক্ষা” অভিনয়ান্তে আবার প্রচুর রাত্রিকালীন আহারের পর উৎসব-দিবসের অনুষ্ঠান শেষ হয়।[৬]

জ্যৈষ্ঠ-সংখ্যা প্রবাসী-তে জন্মোৎসবের একটি বিস্তৃত অনুষ্ঠানসূচি মুদ্রিত হয়েছিল।

‘মরুবিজয়ের কেতন উড়াও শূন্যে’ [দ্র গীত ২। ৬১১; স্বর ৩১] গানটি এই অনুষ্ঠানে গীত হয়েছিল। সম্ভবত গানটি এই উপলক্ষেই রচিত হয়। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় অনুমান করেছেন, ‘কী ফুল ঝরিল বিপুল অন্ধকারে’, ‘আমায় থাকতে দে না আপন মনে’ [রচনা : 22 Mar 1923 ৮ চৈত্র ১৩২৯] ও ‘যেতে যদি হয় হবে’ গানগুলি এই সময়েই লেখা [দ্র গীতবিতান কালানুক্রমিক সূচী। ২৭৫–৭৬]—কিন্তু নিছক অনুমান তথ্য বলে গৃহীত হতে পারে না।

অমিতা ঠাকুর [চক্রবর্তী] একটি অপ্রকাশিত স্মৃতিকথায় লিখেছিলেন : ‘১৯২৫ সালে··· কোণার্কের উঁচু চাতালে জন্মোৎসব উপলক্ষ্যে সকালে গান আবৃত্তি এসব হবে ও রাত্রে লক্ষ্মীর পরীক্ষা অভিনয়। কলকাতা

থেকে সেবার বহু লোক গিয়েছিলেন শিশির ভাদুড়ি মশায়ের কথাটা এই উপলক্ষ্যে মনে আছে। আমাকে দুদিন আগে ২৫শে বৈশাখ কবিতাটি পড়িয়ে ঠিক করে দিয়ে মুখস্থ করতে বলেছেন… আমি সেজেছিলাম ক্ষিরি।'

সজনীকান্ত লিখেছেন, "সুন্দরের সাক্ষাৎ পাইবার জন্য আমরা কবির নিকট আবেদন জানাইলাম। আবেদন মঞ্জুর হইল। … সন্ধ্যায় কলাভবনে মেয়েদের 'লক্ষ্মীর পরীক্ষা' অভিনয়ান্তে 'সুন্দরে'র গান হইল।"[৭] মীরা দেবী নীতুকে লিখেছেন : 'অমিতা ক্ষীরি আর গৌরী মালতীর পার্ট খুব ভাল করেছিল।'[৮]

২৭ বৈশাখ [রবি *Santiniketan 10 May 25] রবীন্দ্রনাথ ইন্দিরা দেবীকে একটি দীর্ঘ চিঠি লিখে আগেকার জন্মদিনের সঙ্গে এখনকার জন্মদিবসের পার্থক্যটি ব্যাখ্যা করেছেন [পত্রে উল্লিখিত '২৯ বৈশাখ ১৩৩১' তারিখটি ভুল]। তিনি লেখেন :

এমন একদিন ছিল যখন আমার জন্মদিনের সার্থকতা তোদের কাছে ছাড়া আর কোথাও ছিল না। ক্রমে কখন এক সময়ে আমার জীবনের ক্ষেত্র বহুবিস্তীর্ণ হয়ে পড়ল। সেটা যেন আমার জন্মান্তরের মত। … যার পর ছিল তাদের মধ্যেই একদিন আমার অভ্যর্থনা শুরু হয়েছিল। … কিন্তু এটা মধ্যাহ্ন কালের কথা। এখন অপরাহ্নের মূলতানী সুর হাওয়ায় বেজে উঠেচে। আলো কমে' এল। এখন দেখতে পাচ্চি ভোর বেলা আর গোধূলি বেলার একই গোত্র। অর্থাৎ প্রথম আলোয় যেখান থেকে যাত্রা সুরু হয়, শেষ আলোয় সেইখানেই যাত্রা শেষ হতে চায়। …

এবারে যখন শরীর অপটু হয়ে পড়ল, তখন থেকেই আমার কারখানা ঘরের দরজা যেন বন্ধ হয়ে আস্‌চে। বেরিয়ে এসেই দেখি যেখানে ভিড় নেই সেখানে আমার বালককাল। সেখানে যে বিশ্বপ্রকৃতি ভোর বেলায় আমাকে বুকের কাছে টেনে নিয়ে লালন করেছিল, সেই প্রকৃতিই সন্ধ্যাযূথীর মালা আমার জন্যে গেঁথে রেখেচে। … আবার আমি ফেলে দিয়েছি আমার বই, আমার কাজ। আবার আমার মন পলাতক। সমস্ত দিন কিছুই করিনে কেবল সাম্‌নে চেয়ে আছি— দেখি পূর্ণতা সেই শূন্যে। …

…প্রভাতের সঙ্গে সায়াহ্নের যেমন একটা মিল আছে তেম্‌নি একটা স্বাতন্ত্র্যও আছে। প্রভাতের নবীন আলোয় মধ্যাহ্নের বাণী নেই, কিন্তু সায়াহ্নের পূর্ণতা গূঢ়ভাবে মধ্যাহ্নকে নিয়ে। খেলাঘর থেকে খেলাঘরেই ফিরতে হবে কিন্তু মাঝখানের যাত্রাটা মহামূল্য। পড়ে'-পাওয়া খেলার সঙ্গে পূর্ণ পরিচয় যদি চাই তবে তাকে খুঁজে পাওয়া চাই। খুঁজ্‌তে গিয়ে খেলাটা ভুল্‌লেই ক্লান্তি। আশা করি আজ থেকে আমার খোঁজাও চল্‌বে খেলাও চল্‌বে, দুটো এক হয়ে যাবে।[৯]

—এই লেখাগুলিই রবীন্দ্রনাথের মনের অন্তঃপুরে ঢোকার চাবি, এদের দিয়ে তাঁর জীবনের পরিণত বার্ধক্যেও সজীবতার রহস্য খুঁজে পাওয়া যেতে পারে!

চিঠিটিতে কিছু কাজের কথাও আছে। কেউ-কেউ প্রস্তাব করেছিলেন 'জাপানযাত্রী' ইংরেজিতে অনুবাদ করার জন্য। রবীন্দ্রনাথ ইন্দিরা দেবীকে অনুরোধ করেছেন এই দায়িত্ব নেবার জন্য। রবীন্দ্রভবনে Mss. 445 (A-C) পাণ্ডুলিপিতে ইন্দিরা দেবী-কৃত ও রবীন্দ্রনাথ-সংশোধিত গ্রন্থটির ইংরেজি রূপান্তর পাওয়া যায়। অনুবাদটির কিয়দংশ মুদ্রিত হয় 'On the Way to Japan' নামে *The Visva-Bharati Quarterly*-র Aug-Oct 1938 [pp. 95–106] ও Nov 1938-Jan 1939 [pp. 186–98]-সংখ্যায়; কিন্তু 'To be continued' লেখা থাকলেও শেষাংশটি আর ছাপা হয়নি। অথচ ইন্দিরা দেবী সম্পূর্ণ গ্রন্থটিই ইংরেজিতে অনুবাদ করেছিলেন, যদিও শেষ পৃষ্ঠাটি অযত্নে স্খলিত হয়ে হারিয়ে গেছে।

রাণুকে রবীন্দ্রনাথ জন্মদিনের বিবরণ দিয়ে একটি চিঠি লেখেন [সেটি আমরা পাইনি], তার পরবর্তী চিঠির সঙ্গে ইন্দিরা দেবীকে লেখা পত্রের অনেক সাদৃশ্য দেখা যায়। রাণুকে লিখেছেন : 'এবারকার জন্মদিন সেই পথযাত্রীর জন্মদিন। আজ চৌষট্টি বৎসর পূর্ব্বে মেঘমুক্ত আকাশের দীপ্ত আলোর নীচে এই পথিকই জন্মেছিল, বিদ্যার, ধনের, খ্যাতির তীর্থে যাবার জন্যে সে পরওয়ানা আনে নি— হাটের লোকে যা'কে অলক্ষ্য বলে জানে তাকে লক্ষ্য করে সে যাত্রা আরম্ভ করেছিল। এবার পঁয়ষট্টি বছর বয়সের সুরুতে সেই অতি সাবেককালের কথাটা হঠাৎ আবার মনে পড়ে গেল। পথের সাথী আমাকে বরণ করেচেন, আমার জন্যে ভোগ

নয়, স্বার্থ নয়, কীর্ত্তি নয়, সঙ্গ নয়— একে একে বন্ধন ছিঁড়বে, ঘরের ভিৎ ভাঙবে, সঞ্চয় যাবে শূন্য হয়ে, ভিড়ের সভা হয়ে যাবে ফাঁক— তার পরে যখন সব চুকে বুকে যাবে তখন দেখতে পাব শূন্যতার পাত্রখানি রসে ভরে আছে।'[১০]

১ জ্যৈষ্ঠ [15 May] তাঁকেই একটি চিঠিতে শান্তিনিকেতনের অনেক খবর দিয়েছেন :

উত্তরায়ণে যে বাড়িতে থাকতুম সেটা নতুন করে তৈরি হয়েচে। মাঝের ঘরটার চারদিকে দরজা জানলা নেই, তার ছাদটা হয়েচে উঁচু আর পাকা। পশ্চিম দিকে কাঁকর-দেওয়া যে চাতাল আছে তার উত্তর কোণে একটা ছোট বারান্দার মত তৈরি হয়েচে। সকালে সেইখানে আমার কেদারা নিয়ে বসি। অনেকক্ষণ রোদ্দুর আসে না। সামনে আমার খোয়াই, আর সেটা ছাড়িয়ে দূরে সাঁওতাল পাড়া। বেলা এগারোটা পর্য্যন্ত এইখানে আমার কেটে যায়, তার পরে স্নান করতে যাই, স্নান করে খেয়ে মাঝের ঘরে বসি। সাম্‌নে উত্তর দিকের মাঠ, তার দূর প্রান্তে তালবন। মাঝখান দিয়ে ভুবনডাঙার রাস্তা চলে গেছে। অপরাহ্ণ পর্য্যন্ত এইখানেই আমার দিন কেটে যায়। আজকাল প্রখর রৌদ্র— তপ্তবাতাস যেন তৃষ্ণাতুর পৃথিবীর দীর্ঘশ্বাসের মত। আমি ঘর বন্ধ করে তাপ এড়াতে চাই নে। ··· শালিখগুলো বারান্দায় এসে ঠোঁট খুলে হাঁপাতে থাকে, বুঝতে পারি আমার কাছে তারা জল ভিক্ষা করতে এসেচে— আমি তাদের জন্যে একটা হাঁড়িতে জল ভরে জলসত্র খুলেচি। বেলা যখন চারটে বাজে, সূর্য্য পশ্চিম দিগন্তে হেলে পড়ে' আমার একতলা ঘরটার মধ্যে তার দীর্ঘ করপ্রসারণ করে। তখন পূর্বদিকের বারান্দায় গিয়ে বসি, যথাসময়ে চা আসে। চা খাওয়া হলে পরে পূর্বদিকের কাঁকর বেছানো রাস্তায় আমার চৌকি পড়ে। তখন ছেলেমেয়েরা কেউ কেউ আসে আমার কাছে কবিতা পড়বার জন্যে। এখন বিদ্যালয়ের ছুটি— ছাত্রছাত্রীরা প্রায় কেউ নেই। মেয়েদের মধ্যে আসে লাবী অমিতা গৌরী, আর তাদের মায়েরা; ছেলে কেবল দু জন। আমার সেই বৈকালিক ক্লাস কেবল দু'দিন আরম্ভ হয়েচে। Wordsworth থেকে পড়াতে সুরু করেছি, প্রথম দিন পড়িয়েছিলুম সেই হাইল্যাণ্ড মেয়েটির কবিতা— কাল পড়িয়েছি "She was a phantom of delight।" আমি এমন করে পড়াই যে, ওরা বোধ হয় কখনো ভুলতে পারবেনা। আমি যদি কবিতা ইত্যাদি বাজে জিনিষ লিখে সময় নষ্ট না করতুম তাহলে নিশ্চয়ই ইস্কুলমাস্টার হতে পারতুম। পড়ার ক্লাস হয়ে গেলে পর ক্রমে যখন সন্ধ্যা অন্ধকার নেমে আসে তখন আবার একদল আমার কাছে গান শিখ্‌তে আসে। এখন দিনু নেই— সে গেছে পুরীতে চলে, কাজেই গান শেখাবারও একমাত্র কর্ত্তা আমি। ভুল শেখাই কি ঠিক শেখাই তা অন্তর্যামী জানেন, কিন্তু শিখিয়ে ত যাই। ক্রমে রাত্তির হয়ে আসে— মেয়েরা চলে যায়। সেই বাইরে বসেই রাত্রের খাওয়া খেয়ে নি। তার পরে অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত ঐখানেই পড়ে থাকি। ··· রাত একটা কি দুটো হয় জানতে পারিনে— শোবার ঘরে উঠে গিয়ে মশারির মধ্যে প্রবেশ করি।[১১]

আশ্রমের উত্তর-পশ্চিমের কাঁটাবনে রবীন্দ্রনাথ যে পর্ণকুটিরটি বানিয়েছিলেন তার নাম দিয়েছিলেন 'উত্তরায়ণ', সেটি ভেঙে এখন যে পাকাবাড়িটি নির্মিত হল তার নাম 'কোণার্ক'— আলোচ্য সময়ে সেইটিই তাঁর বাসস্থান।

মানসী মুখোপাধ্যায় 'অতুলপ্রসাদ' গ্রন্থে লিখেছেন [পৃ ১৫২–৫৩] :

১৯২৫, রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে শান্তিনিকেতনে বেড়াতে যাবার আমন্ত্রণলিপি পেলেন অতুলপ্রসাদ। ··· এ বছরে অতুলপ্রসাদের মাতৃবিয়োগ হয়। মনে হয় কবি সে খবর পেয়েই কোমল হৃদয় তাঁর স্নেহের পাত্রটিকে আহ্বান জানিয়েছিলেন। ···

দুই গীতকার একত্র হতেই গানের আসর বসতে লাগল। 'দেহলি'র কাছে নতুন কলাভবনের দ্বিতলে প্রতি সন্ধ্যায় গানের আসর বসত। গুরুদেব তাঁর সব পুরনো গান গেয়ে শোনাতেন— 'মনে রয়ে গেল মনের কথা', 'দে লো সখি দে পাইয়ে গলে', 'শূন্যপ্রাণ কাঁদে সদা', 'হেলা ফেলা সারা বেলা', 'তবু মনে রেখ' ইত্যাদি।

অতুলপ্রসাদ তাঁর গান গেয়ে সকলকে আনন্দ দান করতেন। গাইতেন— 'মুরলী কাঁদে রাধে রাধে বলে', 'নিদ নাহি আঁখিপাতে', 'হও ধরমেতে বীর, হও করমেতে বীর', 'ও আমার নবীন শাখী' ইত্যাদি।

কিন্তু এই তথ্যের কোনো সমর্থন অন্যত্র পাওয়া যায়নি।

ডরোথি হুইটনি স্ট্রেটের সঙ্গে এল্‌ম্‌হার্স্টের বিবাহ হয় 3 Apr 1925 [২০ চৈত্র ১৩৩১] তারিখে। রবীন্দ্রনাথ যথাসময়ে তাঁদের অভিনন্দন জানিয়েছিলেন কিনা জানার কোনো উপকরণ নেই, কিন্তু এই ব্যাপারে তিনি যে চিন্তিত ছিলেন তা বোঝা যায় অসিতকুমার হালদারকে একটি ছবি আঁকার ফরমায়েশ থেকে। 18 Apr [শনি ৫ বৈশাখ] তাঁদের উদ্দেশে একটি টেলিগ্রাম পাঠালেন : "MY BLESSINGS CONGRATULATIONS

FROM SURUL SANTINIKETAN JORASANKO OUR OFFERINGS SENT ENGLAND/ RABINDRANATH'[১২] সেই 'offerings' বা 'অর্ঘ্যম্' প্রেরিত হল 29 Apr [১৬ বৈশাখী] তারিখে এল্‌ম্‌হার্স্টকে লিখিত চিঠির সঙ্গে মুঘল আমলের কলাইয়ের কাজ-করা একটি কণ্ঠহার ও কার্ড পাঠিয়ে; কার্ডে বাংলা, দেবনাগরী ও ইংরেজি মিশিয়ে লেখা :

শ্রীমতী ডরোথি এল্‌ম্‌হার্স্ট কল্যাণীয়াসু [বাংলায়]

"সোন্ন্যা শোন্নোভাবো দ্বিপদে শাং চতুষ্পদে।" [দেনাগরী]

May you be happy and good to men and good to animals.

"ওঁ ইদমর্ঘ্যং প্রতিগৃহ্যতাম্।" [দেবনাগরী]

Accept this offering

From

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর [বাংলা]

সঙ্গের চিঠিতে তিনি এল্‌ম্‌হার্স্টকে লেখেন : 'I am sending to you and to Dorothy my *arghyam* — my homage— in honour of the love that illuminates and unites souls in truth and bliss. I wish we could have been present at your wedding and according to our custom could decorate the bride with ornament and dress you in our true Bengali *dhoṭi* as a part of our *baran* ceremony. I hope that some evening you will celebrate your union in your Bengali incarnation remembering that once on an auspicious day you came to us and blended your life and mind with ours in a fruitful harmony of creation.'[১৩] Feb 1930-তে শ্রীনিকেতনের বার্ষিক উৎসবে ডরোথি ও এল্‌ম্‌হার্স্ট যোগ দিয়েছিলেন। রবীন্দ্রজীবনী-কার লিখেছেন : 'ইঁহাদের লইয়া শান্তিনিকেতনে কয়েকদিন খুবই আনন্দ-উৎসব চলিল— বহু কৌতুকপ্রদ ঘটনাও ঘটিল।'[১৪] কিন্তু তাঁদের কর্মসূচির কোনো লিখিত বা স্মৃতিবাহিত বিবরণ এখনও আমাদের হাতে এসে পৌঁছয়নি।

বৈশাখ ১৩৩২-এ রবীন্দ্রনাথের নিম্নলিখিত রচনাগুলি বিভিন্ন সাময়িকপত্রে মুদ্রিত হয় :

প্রবাসী, বৈশাখ ১৩৩২ [২৫।১।১] :

১–২১ 'পশ্চিমযাত্রীর ডায়ারি দ্র পশ্চিমযাত্রীর ডায়ারি ১৯। ৪০৫–২১

২২–২৪ 'রক্তকরবী' দ্র রক্তকরবী [গ্র.প.] ১৫। ৫৪৬–৫০

৯৮–১০০ 'গান' ['তোমায় চেয়ে আছি বসে পথের ধারে'] দ্র গীত ১। ২১০; স্বর ৩১, স্বরলিপিকার অনাদিকুমার দস্তিদার।

১৫০ 'গান' ['আজ কি তাহার বারতা পেল রে'] দ্র গীত ২। ৫১৯; স্বর ৩১, স্বরলিপি করেন অরুন্ধতী দেবী [চট্টোপাধ্যায়]

আগেই বলা হয়েছে, সজনীকান্ত দাসের অনুলেখনে ৭, ৯, ১১, ১২ ও ১৩ ফেব্রুয়ারির ডায়ারি এখানে মুদ্রিত হয়েছে। অনেকগুলি সমসাময়িক কবিতাও [কখনও-কখনও ভিন্ন পাঠে] এই রচনার অন্তর্গত : 'ওগো

আমার না-পাওয়া গো' [পৃ ৬–৭], 'আন্‌মনা গো, আন্‌মনা' [৯–১০], 'মৌমাছির মতো আমি চাহি না ভাণ্ডার ভরিবারে' [১০–১১], 'মস্ত যে-সব কাণ্ড করি, শক্ত তেমন নয়' [১৩], 'বহুদিন মনে ছিল আশা' [১৪–১৫], 'উদয়াস্ত দুই তটে অবিচ্ছিন্ন আসন তোমার' [১৫–১৭] ও 'পূর্ণতার সাধনায় বনস্পতি চাহে ঊর্দ্ধপানে' [২০–২১]।

'রক্তকরবী' 'কবির অভিভাষণ' টীকা-সহ মুদ্রিত হয়। রবীন্দ্রনাথের এই ভাষণটি কোথাও প্রদত্ত হয়েছিল বলে জানা যায় না। গ্রন্থাকারে প্রকাশের সময়ে [পৌষ ১৩৩৩] এটি 'প্রস্তাবনা' নামে গ্রন্থসূচনায় ব্যবহৃত হয়, কিন্তু দ্বিতীয় মুদ্রণে [আষাঢ় ১৩৫৭] এই 'প্রস্তাবনা' গ্রন্থপরিচয়ে স্থানান্তরিত হয়, পাণ্ডুলিপি থেকে সংগৃহীত একটি গদ্যরচনা সেই স্থানে 'নাট্যপরিচয়' নামে মুদ্রিত হয়েছে। পাণ্ডুলিপিতে 'প্রস্তাবনা'র পাঠে কয়েকটি অতিরিক্ত অনুচ্ছেদ আছে দ্র র° র° ১৬ [প.ব.]। ৭৫২।

শান্তিনিকেতন, বৈশাখ ১৩৩২ [৬। ৪] :

৮৭–৮৯ 'গান' ['কুসুমে কুসুমে চরণচিহ্ন দিয়ে যাও'] দ্র গীত ২। ৪২৮; স্বর ৩০, স্বরলিপি করেন অনাদিকুমার দস্তিদার।

৯০–৯৩ 'নববর্ষ'

৯৩–৯৬ 'বর্ষশেষ'

কল্লোল, বৈশাখ ১৩৩২ [৩। ১]:

৩–৫ 'মুক্তি' ['মুক্তি নানা মূর্ত্তি ধরি' দেখা দিতে আসে জনে জনে'] দ্র পূরবী ১৪। ৭৫–৭৬

৬–৭ 'চিঠি'

৬ জ্যৈষ্ঠ ১৩২৪ তারিখে কোনো অজ্ঞাত ব্যক্তিকে লেখা 'আমার জগৎ' প্রবন্ধ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের চিঠি এখানে ছাপা হয়েছে।

The Modern Review, May 1925 [Vol. XXXVII, No. 5]:

497–99 'Truth'

499–501 'To the Child'

501–04 'My School' দ্র *EWRT* 3/ 641–45

504–07 'The Death Traffic'

'The Death Traffic' জেনিভায় অনুষ্ঠিত মাদক-বিরোধী সম্মেলনকে প্রভাবিত করার উদ্দেশ্যে সম্ভবত সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর-কৃত জ্যৈষ্ঠ ১২৮৮সংখ্যা ভারতী-তে মুদ্রিত রবীন্দ্রনাথের 'চীনে মরণের ব্যবসায়' প্রবন্ধটির অনুবাদ।

The Visva-Bharati Quarterly, April 1925 [Vol. III, No. 1]:

1–10 'The Voice of Humanity' দ্র *EWRT* 3/ 519–23

প্রশান্তচন্দ্রের স্ত্রী রানী মহলানবিশ জন্মোৎসবে যোগ দিতে এসে এখানে কিছুদিন থেকে যান। 17 May [৩ জ্যৈষ্ঠ] তিনি স্বামীকে লেখেন : 'আজ একটু আগেই চিঠি এসেছে যে রাণুরা সদলবলে বৃহস্পতিবার [৭ জ্যৈষ্ঠ

: 21 May] সকালে এখানে পৌঁছবে।' কিছুদিন আগে রবীন্দ্রনাথ নিজেই রাণুকে লিখেছিলেন : 'বিয়ের আগে তোরা কিছুদিন এখানে এসে থাকবি না ত কি। যখন তোদের সুবিধা হয় আসিস্।'[১৫] ১৪ আষাঢ় [28 Jun] রাণুর বিবাহের তারিখ নির্দিষ্ট হয়েছিল। বিয়ের প্রস্তুতির জন্য কলকাতায় যাবার আগে তাঁরা সপরিবারে শান্তিনিকেতনে কয়েকটি দিন কাটিয়ে যান। ২৬ জ্যৈষ্ঠ মীরা দেবী প্রবাসী পুত্র নীতুকে লেখেন : 'কিছুদিন আগে কাশী থেকে রাণুরা সবাই এখানে এসেছিল। ভক্তি তোমার কথা বলছিল··· তারা সব এখান থেকে কলকাতায় গেছে'।[১৬] এক সময়ে রাণুর বাবা ফণিভূষণ প্রস্তাব করেছিলেন, রাণুর বিবাহ জোড়াসাঁকোয় বিচিত্রা-গৃহে হলে তাঁদের সুবিধা হবে— রবীন্দ্রনাথ তাতে সম্মতি জানিয়ে লেখেন : 'রাণুর বিবাহ নিশ্চয়ই আমার বিচিত্রা বাড়িতেই হবে। তোমরা ওখানে যতদিন খুসি থেকো— কারো তাতে কোনো অসুবিধা হবে না। ইতিমধ্যে বিচিত্রা আমরা চুনকাম করিয়ে পরিষ্কার করে রাখব।'[১৭] কিন্তু রাণুর ভাবী শশুর স্যার রাজেন মুখার্জির পরিবার এই প্রস্তাবে রাজি হননি, তাই ফণিভূষণ প্রশান্তচন্দ্রের আলিপুরের কোয়ার্টারে ওঠেন, বিবাহ হয় রাজেন মুখার্জির ভাড়া-করা বাড়িতে।

গান্ধীজি এই সময়ে চরকা ও খাদির প্রচারে বাংলার বিভিন্ন অঞ্চল পরিভ্রমণ করছিলেন। আরও-একবার রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করে তাঁকে নিজের মতের অনুকূলে আনবার আশা নিয়ে তিনি নিজেই শান্তিনিকেতনে আসার ইচ্ছা প্রকাশ করে সংবাদ প্রেরণ করেন। মতবিরোধের আশঙ্কা সত্ত্বেও সৌজন্যবশত রবীন্দ্রনাথ তাঁকে আহ্বান জানিয়ে পত্র লেখেন [পাওয়া যায়নি]। কিন্তু ভুলোমন নেপালচন্দ্র রায়ের মাধ্যমে চিঠিটি পাঠানো হয়েছে জানতে পেরে রবীন্দ্রনাথ উদ্বিগ্ন হয়ে ৪ জ্যৈষ্ঠ [18 May] পুত্রকে লেখেন : 'মহাত্মাজিকে যে নিমন্ত্রণ চিঠি দিয়েছি সেটা এখনো তাঁর হাতে না পৌঁছনো ভালো হয় নি। কেননা তিনি স্বয়ং এখানে আসবার ইচ্ছা প্রকাশ করেচেন— অথচ এতদিন আমরা তাঁকে কিছুই বল্লাম না এটা ভালো হল না। ··· যাই হোক্ আর একটুও দেরি করা উচিত হবে না।'[১৮] অবশ্য গান্ধীজি এইদিনই তাঁকে লেখেন : 'Nepal Babu has sent me your very kind and cordial note. I do want to pass a day or two at Bolpur. I would not think of your leaving Bolpur to meet me. I know the delicate state of your health. I shall inform you of the date when I can come.'[১৯]

গান্ধীজি 29 May [শুক্র ১৫ জ্যৈষ্ঠ] রাত্রে বোলপুর স্টেশনে অবতরণ করলে অ্যান্ডরুজ ও অন্যেরা তাঁকে অভ্যর্থনা করে মোটরে চড়িয়ে শান্তিনিকেতনে নিয়ে আসেন, তাঁর সঙ্গে আসেন সস্ত্রীক সতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত, মহাদের দেশাই, প্যারেলাল প্রভৃতি। গান্ধী-রচনাবলির টীকায় লেখা হয়েছে : 'On arrival he was escorted to a flower-decked room of the Poet's Santiniketan house. Gandhiji, it is reported, asked Tagore, "Why bring me to this bridal chamber?" Tagore replied with a smile, "Santiniketan, the ever-young queen of our hearts, welcomes you,"[২০]

পরদিন 30 May [শনি ১৬ জ্যৈষ্ঠ] সকালে গান্ধীজি প্রথমেই 'বড়োদাদা' দ্বিজেন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করতে যান, দ্বিজেন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে গান্ধীজির মতাদর্শের সবচেয়ে বড় সমর্থক ছিলেন। 'এই প্রাচীন দার্শনিক ও মহাত্মাজীর মধ্যে যে প্রাথমিক আলাপ হয়, তাহা অতি মর্ম্মস্পর্শী হইয়াছিল এবং মহাত্মাজীর প্রতি "বড়দাদার"

স্নেহ যেন উথলিয়া উঠিয়াছিল।' এর পরে গান্ধীজি রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করেন। তিনি অসুস্থ ছিলেন। আনন্দবাজার পত্রিকা [১৯ জ্যৈষ্ঠ] লেখে : 'কবি একটি বড় চেয়ারে শুইয়া শুইয়াই মহাত্মার সঙ্গে কথা বলেন। উভয়ের মধ্যে প্রায় ৩ ঘণ্টাকাল আলাপ হয়। রবীন্দ্রনাথের কাছে যাইবার পুর্ব্বে বাহিরে দণ্ডায়মান বিরাট জনতাকে লক্ষ্য করিয়া মহাত্মাজী বলেন যে, তিনি নির্জ্জনে একটু কথাবার্ত্তা বলিতে চান কেহ যেন কোনপ্রকার গোলমাল না করেন। তিনি মাত্র শ্রীযুক্ত এণ্ডরুজকে তাঁহার সঙ্গে যাইতে বলেন। তাঁহারা এবং আশ্রমের দুই একজন লোক ছাড়া এই কথাবার্ত্তার সময়ে আর কেহ উপস্থিত ছিলেন না।'[২১]

গান্ধীজির আলোচনার অনুলেখক মহাদেব দেশাই শান্তিনিকেতনে গেলেও উক্ত সাক্ষাৎকারের সময়ে তাঁকেও থাকতে দেওয়া হয়নি, অ্যান্ডরুজও এই বিষয়ে কিছু লেখেননি— তাই এই আলোচনা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ 'চরকা' [দ্র সবুজপত্র, ভাদ্র। ১১–৩১; কালান্তর ২৪। ৪০১–১৩] ও 'স্বরাজসাধন' [দ্র ঐ, আশ্বিন। ১৩৬–৫০; ঐ ২৪। ৪১৪–২২] প্রবন্ধে এবং গান্ধীজির মন্তব্যে [দ্র "The Poet and the Charka', *Young India*, 5 Nov 1925] যা লিখিত হয়েছে তার অতিরিক্ত কিছু জানার উপায় নেই। বস্তুত গান্ধীজির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতির আমূল পার্থক্য ছিল, তাই পারস্পরিক শ্রদ্ধা থাকলেও বৃহৎ যন্ত্রশিল্প বা ক্ষুদ্র চরকার যান্ত্রিক অনুবর্তনে রবীন্দ্রনাথের মতো সৃষ্টিশীল প্রতিভার সায় দেওয়া অসম্ভব ছিল, আর রাজনৈতিক আন্দোলনে চরকার গুরুত্ব সম্পর্কে তাঁর কোনো তাঁর কোনো মোহ ছিল না— তাই উভয়ের আলোচনা ব্যর্থ হওয়া ছাড়া অন্য-কোনো পরিণতির প্রত্যাশা করা উচিত নয়।

আনন্দবাজার পত্রিকা-র [২০ জ্যৈষ্ঠ] বিবরণ অনুযায়ী, গান্ধীজি রবিবার [১৭ জ্যৈষ্ঠ : 31 May] ভোরে শান্তিনিকেতনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সুরুলের কৃষিবিভাগ শ্রীনিকেতন পরিদর্শনে যান। সেখানকার কাজ দেখে তিনি সন্তোষ প্রকাশ করেন। 'ঐ স্থানে পল্লীগঠন কার্য্যে গ্রামবাসীদের সহায়তার জন্য কোন চেষ্টা বাদ রাখা হইতেছে না। মহাত্মা গান্ধী দুই ঘণ্টাকাল তথায় ছিলেন। ঐ স্থানে গোপালনের যে ব্যবস্থা আছে তাহা দেখিয়া মহাত্মা খুব সন্তোষ লাভ করেন। মহাত্মা কর্ম্মীদের সঙ্গে এই বিষয়ে অনেক প্রশ্ন করেন। ফিরিবার সময় পরলোকগত মিঃ পিয়ার্সনের কর্ম্মস্থল একটি সাঁওতাল গ্রাম তাঁহাকে দেখান হয়। এই স্থানে মিঃ পিয়ার্সন সাঁওতালদিগকে যে একটি ইউকেলিপটাস গাছ উপহার দেন তাহা এখন প্রকাণ্ড হইয়াছে। উহা মহাত্মাজীকে দেখান হয়। মহাত্মাজী মিঃ পিয়ার্সনের কার্য্যাবলী দেখিয়া এবং তাঁহার কথা স্মরণ করিয়া খুব বিচলিত হন।'

সুরুল থেকে ফিরে তিনি কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দ্বিতীয়বার দেখা করেন। আনন্দবাজার পত্রিকা জানিয়েছে, 'তাঁহাদের মধ্যে যে আলাপ হয় তাহাতে কেহ উপস্থিত ছিল না সুতরাং ঠিক কিছু জানা যায় নাই।'[২৩] কথাটি সম্পূর্ণ ঠিক নয়। রাজনৈতিক বিষয়ে আলাপের সময়ে কেউ না থাকলেও অন্যবিধ আলোচনার সময়ে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ও অন্যান্য কিছু ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। এই দিনও তিন ঘণ্টাকাল উভয়ের মধ্যে আলাপ হয়।

কলকাতার মেথডিস্ট চার্চের বিশপ Frederick Bohn Fisher [1882–1938] সস্ত্রীক গান্ধীজি ও রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে এই সময়ে শান্তিনিকেতনে আসেন। Mrs. Welthy H. Fisher 'A week-end with Tagore and Gandhi' [*Span*, Sep 1963/ 34–36] রচনায় গান্ধী-রবীন্দ্রনাথের মতপার্থক্য বিষয়ে একটি উল্লেখযোগ্য তথ্য পরিবেশন করেছেন। কথাবার্তার সময়ে গান্ধীজি হরিজনদের সিঁদুরমাখানো প্রস্তরপূজার সমর্থন করতে গিয়ে বলেন : 'That painted piece of stone is the only tangible symbol of

God our half-starved brother has ever had. How can we deny him the only link between himself and God?" রবীন্দ্রনাথের উক্তি : "No... if idols and idolatory, if beads and painted stones are not needed by us in this room, not righteous for us, then they are not righteous for any of our people, however lowly. I'd like to sweep up every idol of every kind, brass, wood, stone and alabaster, from every city and village— every temple and mohulla, and make one great heap from the whole country, and sweep them into the sea and so cleanse our stables!"[২২]

রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধীজির আলোচনায় রাজনীতির সঙ্গে ধর্মনীতিও বিশেষ অংশ গ্রহণ করেছিল। আনন্দবাজার লেখে : 'সংবাদ যে এই দিন প্রথমে উভয়ের মধ্যে রাজনৈতিক বিষয় এবং পরে ধর্ম্মসম্পর্কে আলোচনা হয়।' বস্তুত তাঁদের আলোচনায় রাজনীতি ও ধর্ম অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত ছিল— হিন্দুধর্মের জাতি ও বর্ণাশ্রম প্রথা ছিল উভয়ের বিতর্কের অন্যতম বিষয়। গান্ধী রচনাবলিতে লেখা হয়েছে : 'Mr. Gandhi explained very carefully his own meaning, showing that he did not believe in the sub-divisions of castes of modern days, but believed that the division into the main vocational castes was scientifically correct. But he did believe in a vocational division of manhood in which there was no question of inferior or superior but rather of different functions being performed in the body corporate of humanity.' অর্থাৎ তিনি বর্ণাশ্রম ধর্ম ও বিভিন্ন বর্ণের কর্মবিভাগ সমর্থন করেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর বক্তব্য মানতে পারেননি। তাঁর মতে জন্ম অনুসারে কর্মবিভাগ অবৈজ্ঞানিক ও অস্বাভাবিক, মানবজাতি তার ক্ষমতা ও প্রবণতা অনুযায়ী নিজের পছন্দ অনুযায়ী কাজ বেছে নেবে এটাই বাঞ্ছনীয়। তিনি গান্ধীজিকে চরকা ও খদ্দর বিষয়ে তাঁর বক্তব্য পরিষ্কার করে বুঝিয়ে দিতে বললে গান্ধীজি তাঁর পূর্ববাংলার অভিজ্ঞতা বিবৃত করে বলেন, চরকা সেখানকার গ্রামের জীবনযাত্রায় কী বিপুল পরিবর্তন এনেছে। তিনি চান দরিদ্র ও নিপীড়িত মানুষদের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশের উদ্দেশ্যে শিক্ষিত ব্যক্তিরাও দিনের কিছুটা সময় চরকা কাটুন।[২৩]

31 May [রবি ১৭ জ্যৈষ্ঠ] 'বৈকালে মহাত্মাজী আশ্রমের বালকদিগকে তাঁহার নিকট আসিতে নিমন্ত্রণ করেন এবং চরকা কাটিতে কাটিতে তাঁহাদের সঙ্গে কথা বলেন। অনেক বালক-বালিকা অতিথিভবনে মহাত্মার সঙ্গে দেখা করিয়া তাঁহার সঙ্গে চরকা সম্বন্ধে কথা বলে। মহাত্মাজী তাহাদের সকলকে চরকার কথা বিশদভাবে বুঝাইয়া দেন। কয়েকটি বালিকা সঙ্গীত গাহিয়া মহাত্মার চিত্ত বিনোদন করে।'[২৪] তিনি বলেন, আমি তোমাদের কবিতা, সাহিত্য বা সংগীত-চর্চা বন্ধ করতে বলছি না। আমি শুধু চাই সব কাজের মধ্যেই তোমরা দিনের মধ্যে মাত্র আধঘণ্টা চরকা কাটো। চরকা আমাদের সংকীর্ণতা কাটাতে সাহায্য করবে। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষদের মধ্যে একমাত্র চরকাই সংযোগ সাধন করতে পারে। আমরা এতদিন প্রায় কিছুই করতে পারিনি। এখন কিছু কাজ করা দরকার। বিদেশি বস্ত্রবর্জন অবশ্যই উল্লেখযোগ্য কাজ। অস্পৃশ্যতার সমস্যা কেবল হিন্দুদের, হিন্দু ও মুসলমানের ঝগড়াও একদিন মিটে যাবে— কিন্তু খাদির প্রচলন না হলে দেশ দারিদ্র্যে নিমজ্জিত থাকবে।

পরের দিন সোমবার গান্ধীজির মৌনব্রত ছিল, দিনটি তিনি বিশ্রামে কাটান। ১৯ জ্যৈষ্ঠ [মঙ্গল 2 Jun] সকাল দশটায় তিনি দার্জিলিঙে অসুস্থ চিত্তরঞ্জন দাশের সঙ্গে সাক্ষাতের উদ্দেশে কলকাতা রওনা হন।

চরকা, জাতিভেদ প্রভৃতি কয়েকটি বিষয়ে গান্ধীজির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের মতপার্থক্যের বিষয়ে দেশবাসী অবহিত ছিল, তাই তাঁদের আলোচনার বিবরণ অপ্রকাশিত থাকায় নূতন করে কোনো বিতর্ক এই সময়ে দেখা দেয়নি, কিন্তু পুনঃপ্রচারিত সবুজপত্র-এর ভাদ্র-সংখ্যায় [পৃ ১১–৩১] রবীন্দ্রনাথের 'চরকা' প্রবন্ধে তাঁর মত প্রকাশিত হলে বিতর্ক ও নিন্দাবাদের ঝড় ওঠে, আমরা যথাস্থানে সেই বিষয়ে আলোচনা করব।

গান্ধীজির শান্তিনিকেতন থেকে বিদায়গ্রহণের পর রবীন্দ্রনাথ অন্য একটি গুরুতর কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। কাউন্ট কাইজারলিং 5 March [২১ ফাল্গুন ১৩৩১] তাঁকে লিখেছিলেন :

I am arranging for a book, which will be called the book of Marriage. Most Western people have lost both the knowledge of what marriage means & the art of being married; hence the revolting disorder of these days in all corresponding matters. My aim is to form a sort of orchestra, in which different voices, chosen among the most competent in existence should deal with the different possible aspects of marriage from the point of view of understanding. Among the prominent authors who either have already promised to collaborate or seem sure to do so are Thomas Mann, Gerhard Hauptmann, Soderblom, Hamnack, Wells, Bernard Shaw, Galsworthy.... This book of Marriage is meant to become a help to each & all. Now what I ask you to do is to write an essay about Indian Marriage or better still the Indian ideal of Marriage.... Your essay should not be popular in the ordinary sense of the word, on the contrary: only the highest level of thought & wisdom appeals to everybody as India in particular has always realized.[২৫]

তিনি জানান, প্রবন্ধটি অতি দীর্ঘ হবার দরকার নেই, আর সেটি 1 Aug তারিখের মধ্যে পেলেই চলবে। 14 May রবীন্দ্রনাথের সম্মতিসূচক টেলিগ্রাম পেয়ে তিনি আশ্বস্ত বোধ করেছেন। ইংরেজি রচনাটি পেয়ে 2 Oct জানিয়েছেন, প্রবন্ধটি তাঁর ভালো লেগেছে এবং জার্মান সংস্করণ *Das Ehe Buch* 1 Nov ও ইংরেজি সংস্করণ *The Book of Marriage* সম্ভবত ডিসেম্বর মাসের মধ্যেই আমেরিকায় প্রকাশিত হবে।

রবীন্দ্রনাথ ৩১ জ্যৈষ্ঠ [রবি 14 Jun] প্রমথ চৌধুরীকে লিখেছেন : 'Count Keyserling ভারতীয় বিবাহ সম্বন্ধে আমার কাছে একটা লেখা চেয়েছিলেন। ইংরেজিতে লিখ্‌তে দেরি হবে ভয় করে বাংলায় লিখেচি— পরে তর্জ্জমা করে তাকে পাঠাতে হবে।'[২৬] প্রমথ চৌধুরী তখন সবুজপত্র পুনঃপ্রকাশের কথা ভাবছিলেন, সেই প্রসঙ্গে তাঁকে লেখেন : 'সবুজপত্র বের করতে চাচ্চ কিন্তু রস জুগিয়ে পত্রোদগমের সহায়তা করতে পারি আজকাল আমার মধ্যে শক্তির তেমন দাক্ষিণ্য নেই।' বিবাহ-সংক্রান্ত মস্ত বড়ো লেখাটি একমাসের সবুজপত্রপুট আগাগোড়া ভরে দিতে সমর্থ হলেও ভাদ্র ১৩২৫-এর আগে পত্রিকাটির পুনঃপ্রচার সম্ভব হয়নি, 'ভারতবর্ষীয় বিবাহ' আষাঢ়-সংখ্যা শান্তিনিকেতন-এ [পৃ ১২০-৩৩] ও শ্রাবণ-সংখ্যা প্রবাসী-তে [পৃ ৪৫৭-৬৯]

মুদ্রিত হয়। প্রবাসী-তে 'আনন্দ-লহরী' [৫৭৮-৭৯]-শীর্ষক রবীন্দ্রনাথের নামাঙ্কিত একটি রচনা মুদ্রিত হয়, এর প্রথম অনুচ্ছেদটি বাদ দিয়ে বাকি অংশ 'ভারতবর্ষীয় বিবাহ' ['শান্তিনিকেতন' পত্রিকার পাঠ] প্রবন্ধের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে—এই পাঠটিই শতবার্ষিক-সংস্করণ রবীন্দ্র-রচনাবলী-র অন্তর্গত। সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর-কৃত ইংরেজি অনুবাদটি 'The Indian Ideal of Marriage' নামে July [pp. 89-108]-সংখ্যা *Visva-Bharati Quarterly*-তে মুদ্রিত হয়।

প্রবন্ধটি রচনার জন্য রবীন্দ্রনাথকে বহুবিধ শাস্ত্রগ্রন্থ পাঠ করতে হয়েছিল— বিধুশেখর শাস্ত্রী ও ক্ষিতিমোহন সেনের মতো পণ্ডিতও তাঁকে যথোচিত সাহায্য করেছিলেন বলে অনুমান করা যায়। ৪ আষাঢ় তিনি ঠাট্টা করে রাণুকে লিখেছেন : 'আজকাল আমি সংহিতা আলোচনা করে বিবাহ সম্বন্ধে শাস্ত্রবিধি সবই জেনে নিয়েচি, ···হরণ করে বিবাহকে ভগবান মনু অষ্টবিধ বিবাহের মধ্যে অন্যতম বলে স্বীকার করেন। এর একটা মস্ত সুবিধা এই যে, কন্যাপক্ষে কোনো খরচপত্র লাগেনা; প্রণামী দেবার জন্যে ভালো বেনারসী সাড়ি কিন্‌তে হয় না— আর যাদের বলে ইতরে জনাঃ wedding present সম্বন্ধে তাদের চিন্তা ও চেষ্টার দরকার থাকে না। এই সকল কারণে সবদিক চিন্তা করে আমি এই প্রণালীর বিবাহটাকেই সমাজে প্রচলিত করবার জন্যে একটা সভা স্থাপন করব মনে করচি। কন্যাপণপীড়িত ভদ্র পরিবারের পক্ষে এটা খুবই উপাদেয় হবে।'[২৭]

ভারতবর্ষীয় বিবাহ সম্বন্ধে লেখবার জন্য য়ুরোপ থেকে অনুরোধ পেয়ে তাঁর প্রথমেই মনে হয়েছে উভয় অঞ্চলের বিবাহপ্রথার প্রভেদ 'কেবল বাহিরের অনুষ্ঠানের নয়, আন্তরিক অভিপ্রায়ের।' বিবাহ জিনিসটা হল প্রকৃতির অভিপ্রায়ের সঙ্গে মানুষের অভিপ্রায়ের সন্ধি স্থাপনের ব্যবস্থা। এদের সামঞ্জস্যের বিভিন্নতা থেকে নানা জাতীয় বিবাহের উদ্ভব। এখানে প্রধান দ্বন্দ্ব ব্যক্তিগত ভাবাবেগ ও সামাজিক কর্তব্যবুদ্ধির মধ্যে। হিন্দুভারতে গার্হস্থ্যাশ্রমের মর্যাদা বেশি, তাই বিবাহে সমাজস্বীকৃত নীতির আনুগত্যকে, এমন-কি কালিদাস-প্রমুখের সাহিত্যেও, অধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। তবে ভারতবর্ষের সমাজে এই অভিব্যক্তি একদিনেই হয়নি, তাকে অবস্থান্তরের সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন পরিণামের ভিতর দিয়ে যেতে হয়েছে। তাই গান্ধর্ব রাক্ষস আসুর পৈশাচ প্রভৃতি বিবাহবিধিকেও মনু তাঁর সমাজবিধির মধ্যে স্থান দিতে বাধ্য হয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন : 'ভারতবর্ষে বিবাহরীতির মূলে যে মনোভাবটি আছে কোনো য়ুরোপীয় যদি তা স্পষ্ট করে বুঝতে চান তাহলে পাশ্চাত্ত্যে আজকাল সৌজাত্য নিয়ে (Eugenics) যে আলোচনা চলছে সেইটে বিচার করে দেখলে সুবিধা হতে পারে। বিজ্ঞানে ব্যক্তিগত ভাবাবেগকে যথেষ্ট আমল দিতে চায় না। বিবাহে সুসন্তান হবে এই যদি লক্ষ্য হয়, তাহলে কামনা-প্রবর্তিত পথকে নিষ্ঠুরভাবে বাধা না দিলে চলে না। বিজ্ঞান বলে, স্ত্রীপুরুষের মধ্যে যেখানে কোনো বংশসঞ্চারী দৈহিক রোগ বা মানসিক বিকার আছে। সেখানে রাজদণ্ডের বা সমাজশাসনের সাহায্যে বিবাহকে বাধা দেওয়া কর্তব্য। একথা স্বীকার করলেই বিবাহকে, ভাবাবেগের টান থেকে সরিয়ে এনে বুদ্ধির এলেকায় দাঁড় করাতে হয়।'

এখানে প্রশ্ন ওঠে, বিবাহ থেকে ইচ্ছাকে যদি সম্পূর্ণ নির্বাসিত করা হয়, তাহলে দাম্পত্যের মধ্যে প্রেমের স্থান হয় কী করে? কিন্তু ইচ্ছার অনুবর্তনে বিবাহ হলেই যে দাম্পত্য সম্পর্ক আজীবন প্রেমময় থাকবে তারও নিশ্চয়তা নেই। এই সমস্যার সমাধান চিন্তা করতে গিয়ে ভারতবর্ষ বলেছে বিবাহের গোড়াতেই ইচ্ছার বেগকে স্বীকার না করাই নিরাপদ এবং বাল্যবিবাহই সর্বাধিক নিরাপদ পদ্ধতি। তাছাড়া ভারতীয় সমাজে মেয়েরা

শিশুকাল থেকেই স্বামী বলে একটি ভাবকে ভক্তি করতে শেখে, নানা কথা কাহিনী ব্রতপার্বণের ভিতর দিয়ে এই ভক্তিভাবকে মেয়েদের রক্তের সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়া হয়। এছাড়া সতী স্ত্রীর মাহাত্ম্য সম্বন্ধে একটি সংস্কারও এই সমাজে আছে। এই বোধের মধ্যে বড়ো হয়ে বালিকারা 'স্বামীকে যখন পায় তখন তাকে তারা ব্যক্তি বলে নয়, স্বামী বলে দেখে। সেই স্বামী অনেকখানিই তাদের নিজেরই মনের জিনিস, বাইরের জিনিস নয়। বিচার বুদ্ধি পরিণত হবার পূর্ব হতেই অনির্দিষ্ট ব্যক্তির উপরে এই স্বামী-ভাব আরোপ করে দিনে দিনে এই পতিগত সংস্কার তাদের দেহমনকে অধিকার করে তোলে। ··· অর্থাৎ স্ত্রীপুরুষের প্রেম বলে যে একটি স্বাভাবিক হৃদয়বৃত্তি আছে তাকে অতিক্রম করে দাম্পত্য-প্রেম নামক একটি সামাজিক হৃদয়বৃত্তিকে সাধনার দ্বারা গড়ে তোলবার বিশেষ চেষ্টা আমাদের দেশে আছে।' কিন্তু পুরুষের দাম্পত্য-একনিষ্ঠতা সম্বন্ধে সমাজের কোনো অনুশাসন নেই, অবৈধ লঙ্ঘনকে শাসন করার চেষ্টারও অভাব [রবীন্দ্রনাথের আমলে]। ··· 'এই অসাম্যের দ্বারা স্ত্রীলোকের চরিত্রে হীনতা ঘটতে পারত। তা যে ঘটেনি তার কারণ, স্বামী তার পক্ষে আইডিয়া। ব্যক্তির কাছে পাশববলে সে নত হয় না, আইডিয়ার কাছে ধর্মবলে সে আত্মসমর্পণ করে। ··· এই আইডিয়াল প্রেম হচ্ছে যথার্থ মুক্ত প্রেম। এ প্রেম প্রকৃতির মোহবন্ধনকে উপেক্ষা করে।'

প্রবন্ধের শেষাংশে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, এতদিন ভারতীয় সমাজের যে-আধারের উপর তার বিবাহপ্রথা প্রতিষ্ঠিত ছিল সেই আধারের বিকৃতি হওয়ায় বিবাহের মূলগত ভাব ও তার ব্যবহার সবকিছুর সঙ্গে ঠিকমতো খাপ খাচ্ছে না। 'নরনারীর মধ্যে প্রকৃতি যে-বিচ্ছেদ ঘটিয়ে রেখেছেন, সেই বিচ্ছেদের আকাশে একটি প্রবল শক্তি সর্বদা বিচিত্র আকর্ষণলীলায় প্রবৃত্ত। এ শক্তি সংহার করে, সৃষ্টি করে। এই শক্তি পর্দার আড়াল থেকে আমাদের চিত্তবৃত্তির উপর উদ্বোধন মন্ত্র চালায়। ··· পুরুষের চিত্তের উপর স্ত্রীলোকের যে প্রভাব তাকে আমাদের দেশে শক্তি বলে। অর্থাৎ তার অভাব ঘটলে সমাজে সৃষ্টিক্রিয়ার নির্জীবতা ঘটে।'

মানব সংসারে সৃষ্টির ধারা দ্বিমুখী— প্রাকৃতিক মানুষের সন্তানসৃষ্টি ও সামাজিক মানুষের সভ্যতাসৃষ্টি। একটি প্রাণের জগৎ, অপরটি হল মনের জগৎ। এই দুই সৃষ্টির মধ্যেই স্ত্রীপুরুষের যোগ আছে, কারণ সৃষ্টিমাত্রেই দ্বৈতের লীলা। কিন্তু এই যোগের স্বভাব দুই সৃষ্টিতে ভিন্ন রকমের। সন্তানসৃষ্টিতে পুরুষের দায়িত্ব গৌণ অথচ অপরিহার্য, কিন্তু তার পরে গর্ভধারণ থেকে সন্তানপ্রসবের সুদীর্ঘ ভার নারীর। এইখানে পুরুষ পেয়েছে তার মনঃপ্রকৃতির উদ্বোধনের অবকাশ। এই অধ্যায়ে নারী অনেকটা অনাবশ্যক, কারণ 'যে-সংসার নারীর, সে-সংসার পুরুষের অন্বেষণশীল মনকে বেঁধে রাখতে চায়। সভ্যতাসৃষ্টিকার্যে নারীর এই স্বল্পপ্রয়োজনীয়তার অগৌরব আজও লেগে আছে। সেইজন্য আজ বিদ্রোহিণীর দল প্রাণপ্রকৃতির দায়িত্ব লাঘব করে সমাজ-সৃষ্টিকার্যে পুরুষের সমকক্ষতা দাবি করছে।'

এইখানে রবীন্দ্রনাথ একটি বিতর্কমূলক মন্তব্য করেছেন। তিনি লিখেছেন, নারীর প্রকৃতির মধ্যে যে হৃদয়বৃত্তির প্রবলতা আছে তাকে বাইরে থেকে তাড়া দিয়ে বিদায় করা যায় না। এই হৃদয়বৃত্তিগুলির স্বভাব চলার অভিমুখী নয়, আঁকড়াবার দিকেই তার ঝোঁক। 'এইজন্যে স্থিতির মধ্যে যে-সম্পদ, নারী তারই সাধনা করলে সার্থকতা লাভ করে। গতিবান অধ্যবসায়ের কাজে সে যদি জোর করে যায় তাহলে নিজের প্রকৃতির সঙ্গে তার দ্বন্দ্ব বাধবে এবং সেই নিরন্তর দ্বন্দ্বের বিক্ষেপ বহন করে পুরুষের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় সে প্রধান স্থান কখনই পাবে না।'

অবশ্য হৃদয়বৃত্তির একটি আনুষঙ্গিক উৎপন্ন জিনিস আছে তাকে মাধুর্য বলা যায়— এ আলোর মতো একটি শক্তি। পুরুষের সৃষ্টিকার্যে নারীস্বভাবের এই অনির্বচনীয় মাধুর্য চিরদিনই যোগ দিয়েছে। তা অলক্ষিত কিন্তু অপরিহার্য। পুরুষের চিত্তকে নারীর এই প্রাণবান মাধুর্য ভিতরে ভিতরে সক্রিয় না করলে তা আপন পূর্ণ ফল ফলাতে পারে না। বীরের বীর্য, কর্মীর কর্মোদ্যম, রূপকারের কলাকৃতিত্ব প্রভৃতি সভ্যতার সমস্ত বড় বড় চেষ্টার পিছনে নারী প্রকৃতির গূঢ় প্রবর্তনা আছে।'

আগেই বলা হয়েছে, 'আনন্দ-লহরী' প্রবন্ধের প্রথম অনুচ্ছেদটি 'ভারতবর্ষীয় বিবাহ'-র অন্তর্ভুক্ত হয়নি। এখানে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য কথা আছে বলে আমরা অনুচ্ছেদটি উদ্ধৃত করছি :

মাতৃত্বের যে অংশ শরীরগত এবং সন্তানপালনের সঙ্গে জড়িত, মোটের উপরে সেটা ইতর প্রাণীদের সঙ্গে অভিন্ন। সেটা সাধারণ জীবসৃষ্টির পর্যায়ভুক্ত, তাতে মানুষের সৃষ্টিশক্তির স্বকর্তৃত্ব নেই, তাতে প্রকৃতির দূত প্রবৃত্তিরই শাসন। কিন্তু মাতা যখন ভাবী কুমারের জন্যে তপস্যা করেন, স্বাভাবিক প্রবৃত্তিগুলিকে সংযত করে' শরীরের ক্রিয়ার উপর মন ও আত্মার কর্তৃত্বকে প্রতিষ্ঠিত করেন, তখনই সেটা যথার্থ তার সৃষ্টিশক্তির অধীন হয়। আজকাল পাশ্চাত্য দেশে অনেক সময়ে দেখা যায়, মেয়েরা মাতৃত্বের মধ্যে হীনতা অনুভব করে, অর্থাৎ মেয়েদের উপর প্রকৃতির জবরদস্তিকে তারা অপমানকর বলেই জানে। কিন্তু এই অপমান থেকে রক্ষা পাবার উপায় মাতৃত্বকে পরিহার করে নয়, মাতৃত্বকে আপন কল্যাণ-অভিপ্রায়ের সঙ্গে সঙ্গত করে' তাকে আত্মশক্তির দ্বারা নিয়মিত করা। প্রাচীন ভারতে সুসন্তান লাভের সেইরূপ একটি সাধনা ছিল, তা যথেচ্ছকৃত ব্যাপার ছিল না। সেই সাধনা বর্তমান বিজ্ঞানের নিয়মানুমোদিত কি না সে প্রশ্ন বিশেষভাবে জিজ্ঞাস্য নয়,— কিন্তু এই আত্মসংযত মানসিক আধ্যাত্মিক সাধনার দ্বারাই মানবমাতা আপন মর্যাদা লাভ করেন, এইটেই বড় কথা। কালিদাসের কয়টি কাব্যের মধ্যে সেই মর্যাদার গৌরব বর্ণিত দেখি।

'ভারতবর্ষীয় বিবাহ' প্রবন্ধটি জ্যৈষ্ঠ মাসের মধ্যেই লেখা হয়ে গিয়েছিল। ১ আষাঢ় [সোম 15 Jun]। রবীন্দ্রনাথ প্রশান্তচন্দ্রকে লিখেছেন : 'বিবাহের উপর আমার লেখাটা শেষ হয়ে গেছে। বাংলায় লিখেচি। এই সঙ্গে তোমার কাছে পাঠাব— যদি সুরেনকে দিয়ে শীঘ্র ইংরেজি করে পাঠাতে পার তা হলে revise করে Count Keyserlingকে পাঠিয়ে দিতে পারব। তাকে শীঘ্র পাঠানো হবে বলে cable করতে হয়েছে। ভালো হয় সুরেন যদি খানিক খানিক করে তর্জ্জমা করে আমাকে পাঠাতে পারে। এটা তোমাদের Journal-এ যেতে পারবে।'[২৮] আগেই বলা হয়েছে, রচনাটি জুলাই-সংখ্যা বিশ্বভারতী কোয়ার্টার্লি-তে মুদ্রিত হয়েছিল।

জ্যৈষ্ঠ ১৩৩২-এ রবীন্দ্রনাথের নিম্নলিখিত রচনাগুলি সাময়িকপত্রে প্রকাশিত হয় :

প্রবাসী, জ্যৈষ্ঠ ১৩৩২ [২৫। ১। ২] :

১৬৯-৮৭ 'পশ্চিমযাত্রীর ডায়ারি' দ্র পশ্চিমযাত্রীর ডায়ারি ১৯। ৪২১-৩৬

১৭৪-৭৫, 'প্রবাহিণী' ['দুর্গম দূর শৈলশিরের'] দ্র পূরবী ১৪। ১২৬-২৭

১৭৫-৭৬ 'প্রাণ-গঙ্গা' ['প্রতিদিন নদীস্রোতে পুষ্পপত্র করি অর্ঘ্য দান'] দ্র ঐ ১৪। ১৫১-৫২

১৭৬-৭৭ 'সৃষ্টিকর্তা' ['জানি আমি মোর কাব্য ভালোবেসেছেন মোর বিধি'] দ্র ঐ ১৪। ১৩৯

১৮০-৮২ 'মুক্তি' ['মুক্তি নানা মূর্তি ধরি দেখা দিতে আসে নানা জনে'] দ্র ঐ ১৪। ৭৫-৭৬

১৮২-৮৪ 'তৃতীয়া' ['কাছের থেকে দেয় না ধরা, দূরের থেকে ডাকে'] দ্র ঐ ১৪। ১২০-২২

১৮৪-৮৫ 'ফোটোগ্রাফের উত্তরে' ['তিন বছরের বিরহিণী জানলাখানি ধরে'] দ্র ঐ ১৪। ১৩৬-৩৭ [বিরহিণী']

১৮৮-৮৯ 'মৃত্যুর আহ্বান' ['জন্ম হয়েছিল তোর সকলের কোলে'] দ্র ঐ ১৪। ৯৪-৯৫

১৮৯-৯০ 'দুঃখসম্পদ্' ['দুঃখ, তব যন্ত্রণায় যে-দুর্দিনে চিত্ত উঠে ভরি'] দ্র ঐ ১৪। ৯৩-৯৪

১৯০ 'বেদনার লীলা' ['গানগুলি বেদনার খেলা যে আমার'] দ্র ঐ ১৪। ৯৯

বঙ্গবাণী, জ্যৈষ্ঠ ১৩৩২ [৪ । ১ । ৪] :

৩৯৭-৯৯ 'পদধ্বনি' ['আঁধারে প্রচ্ছন্ন ঘন বনে'] দ্র পূরবী ১৪ । ৮১-৮৪

The Modern Review, June 1925 (Vol. XXXVII, No. 6]:

609-11 'Getting and Not-Getting'

724 'The Cleanser'

দুটি রচনাই রবীন্দ্রনাথ কৃত ইংরেজি অনুবাদ; প্রথমটিতে টীকা আছে : 'Translated by the Author from paragraphs written by him while on his voyage to the West' এবং দ্বিতীয়টির টীকা : 'This poem is a free rendering of Satyendranath Datta's Bengali poem "Methar" ("The Scavenger"), which appeared in Prabasi 16 years ago.' 'মেথর' কবিতাটি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের 'কুহু ও কেকা' কাব্যের অন্তর্গত।

রাণুর বিবাহের তারিখ নির্দিষ্ট হয়েছিল ১৪ আষাঢ় [রবি 28 Jun]। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার জন্য স্বয়ং রাণুরই দাবি ছিল। তাঁকে রবীন্দ্রনাথ ২৭ জ্যৈষ্ঠ লিখেছিলেন : 'আমাকে তোর বিবাহ নিমন্ত্রণে সশরীরে উপস্থিত দেখবি আশা করচিস্—কিন্তু আমার পরামর্শ এই যে আশা না করলে নৈরাশ্যের হাত থেকে রক্ষা পাবি। রেলগাড়িযোগে নড়াচড়া করা আমার পক্ষে বিভীষিকা। দূরে থেকে সমস্ত মন দিয়ে তোদের আশীর্ব্বাদ করব। আর যদি মিষ্টান্ন এখানে ডাকযোগে পাঠিয়ে দিস তাহলে তোদের ভোজেও যোগ দিতে পারব।'[২৯] বিবাহের উপহার হিসেবে তিনি নিজের বাংলা ও ইংরেজি গ্রন্থাবলির উৎকৃষ্ট সংস্করণ দিতে চাইছিলেন উপযুক্ত বাঁধাই ও আধার সহ। এ বিষয়ে রথীন্দ্রনাথকে লেখেন :

> রাণু লিখেছে তার ভাবী ননদেরা আমাদের কাছ থেকে কোনো একটা জবর wedding present-প্রত্যাশায় আছে! ও খুব ভয় পেয়ে গেছে—লিখ্ছে, "আমি কিছুই চাই নে কিন্তু আপনাকে নিয়ে আমাকে যেন একটুও খোঁটা সইতে না হয়।" এখন ভাবচি ওকে যে বইগুলো দেব তার একটা ভালো আধার দিতে পারলে চোখ-ভরা গোছের চেহারা হত। বৌমার সঙ্গে পরামর্শ করে একটু ভেবে দেখিস্। একথা সত্য ওদের খুব একটা কৌতূহল আছে। বাংলা পদ্যগ্রন্থাবলীর মোটা কাগজের সংস্করণটাই যেন দেওয়া হয়—স্বরলিপি ও অন্যান্য সমস্ত ছোট বড় বই দিয়ে বোঝা ভারি করিস্। ম্যাকমিলানের সংস্করণ সমস্ত ইংরেজি বইও দিতে হবে—সেগুলো বিশেষ করে না বাঁধালেও ক্ষতি হবে না। বাঁধাইয়ের কাপড় তোরাই পছন্দ করে দিস্, কিন্তু সময়মত যেন হয়ে যায়— রাণুকে আমি ডরাই।[৩০]

এই চিঠিতেই তিনি লিখেছেন : 'যাবার জন্যে রাণু খুব চেঁচামেচি করে চিঠি লিখেচে—চেষ্টা করব এড়াতে। যদি যাই একেবারে দুই একদিন আগে যাব।'

কিন্তু তাঁর কলকাতায় যাবার তাগিদ এল একেবারে অপ্রত্যাশিত একটি কারণে। দেশনেতা চিত্তরঞ্জন দাশ স্বাস্থ্যোদ্ধারের জন্য দার্জিলিঙে গিয়েছিলেন, কিন্তু উক্ত ২ আষাঢ় [মঙ্গল 16 Jun] তারিখেই সেখানে তাঁর জীবনাবসান হয়। তরুণ চিত্তরঞ্জনের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের খুবই ঘনিষ্ঠতা ছিল, বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময়েও তা অক্ষুন্ন ছিল সেটি বোঝা যায় এই পর্বে লিখিত জাতীয় সংগীতের খসড়া ও খেয়া-র পাণ্ডুলিপি-সংবলিত খাতাটি ভ্রমক্রমে তাঁর বাড়িতে ফেলে আসায়। এর পরে কী কারণে উভয়ের সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে তিক্ততায় পর্যবসিত হল তা বলা শক্ত। অনেকে মনে করেন, বহুব্যয়ে মুদ্রিত চিত্তরঞ্জনের 'সাগরসঙ্গীত' [জ্যৈষ্ঠ ১৩২১] কাব্যগ্রন্থ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের নীরবতা তাঁর মনোবিকারের কারণ হতে পারে। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বলেছেন, রবীন্দ্রনাথের নাইটহুড-গ্রহণ তাঁর গভীর মনোবেদনার কারণ হয়েছিল, সেটি অবশ্য কিঞ্চিৎ পরবর্তীকালের

ঘটনা। যে-কোনো কারণেই হোক, তার ফল হয়েছিল অত্যন্ত গ্লানিকর। অগ্রহায়ণ ১৩২১-এ চিত্তরঞ্জনের সম্পাদনায় প্রকাশিত 'নারায়ণ' মাসিক পত্রিকা রবীন্দ্র-বিরোধী আলোচনা প্রকাশের অন্যতম প্রধান বাহন হয়ে ওঠে। তাঁর রাজনৈতিক বক্তব্যেও তীব্র রবীন্দ্র-বিরোধিতা দেখা দেয়। রবীন্দ্রনাথ অবশ্য প্রত্যক্ষভাবে চিত্তরঞ্জনের সঙ্গে কোনো বাগ্‌বিতণ্ডায় যোগ দেননি, কিন্তু স্বরাজ্যদলের রাজনীতির প্রতি তাঁর কোনো সমর্থন ছিল এমন প্রমাণও পাওয়া যায় না। বরং জালিয়ানওয়ালা বাগের ঘটনা নিয়ে তিনি যখন চিত্তরঞ্জনের সাহায্যপ্রার্থী হয়েছিলেন, তখন তাঁর এড়িয়ে যাওয়ার মনোভাবে তার সুবিধাভোগী রাজনৈতিক চরিত্রটি রবীন্দ্রনাথের কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল— অবশ্য অসহযোগ আন্দোলনের সুবাদে বাঙালি ভদ্রলোকের জেলে যাওয়া ও বাধ্যতামূলক বিশ্রামের সুযোগ তখনও চালু হয়নি।

কিন্তু চিত্তরঞ্জনের অকালমৃত্যু রবীন্দ্রনাথকে একধরনের সামাজিক সংকটে নিক্ষেপ করল। ৪ আষাঢ় [বৃহ 18 Jun] তিনি রথীন্দ্রনাথকে লিখলেন : 'চিত্তঞ্জনের মৃত্যু উপলক্ষ্যে আমার কলকাতায় যাওয়া উচিত বলে আমার মনে একটা আন্দোলন চল্‌চে। ··· বিশেষত চিত্তর সঙ্গে বরাবরই আমার একটা বিরোধ ছিল— এ কথা কেউ যেন মনে না করে যে আমার মনে তার প্রতি একটুও প্রতিকূল ভাব আছে। আর কিছু নয় কলকাতায় গিয়ে ওদের বাড়িতে একবার দেখা করে আসা উচিত হবে বলে বোধ হচ্চে। নিতান্তই যদি সভা সমিতিতে টানাটানি করে তাহলেও দুচার কথা বল্‌তে হবে। এ চিঠি পেয়েই আমাকে urgent তার যোগে তোদের পরামর্শ জানাস। প্রশান্তকেও এ সম্বন্ধে লিখ্‌চি।'[৩১] এইদিন প্রশান্তচন্দ্রকে লিখলেন : 'শাস্ত্রী মশায়ের সঙ্গে আজ সকালে আলোচনা করে আমার মনে হচ্চে চিত্তরঞ্জনের মৃত্যু উপলক্ষ্যে এখনি আমার কলকাতায় যাওয়া উচিত। তার প্রতি আমার যে টুকু দেয় দেশের লোক তা আশা করে— শরীরের অস্বাস্থ্য ওজর খাটবে না। কিছু না, একবার ওদের বাড়িতে উপস্থিত হয়ে অভিশোচন প্রকাশ করা। আর নিতান্তই যদি সভাসমিতিতে কিছু বলতে ধরে দু'চার কথা বলা। আমার প্রতি চিত্ত চিরদিন নিরন্তর অশ্রদ্ধা প্রকাশ করে এসেছিলেন বলেই আজ এই কর্ত্তব্য আমাকে টানচে— নইলে কলকাতায় যাবার ইচ্ছে ছিল না— এর পরে সভাপতিত্ব ইত্যাদি বালাই থেকে রক্ষা পাব। যেটা স্থির কর এই চিঠি পেয়েই জরুরি টেলিগ্রাম যোগে জানিয়ো।'[৩২]

কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ঠিক কবে কলকাতায় আসেন নিশ্চিতভাবে জানা যায়নি। তিনি 'অভিশোচন' প্রকাশের জন্য চিত্তরঞ্জনের বাড়িতেও সম্ভবত গিয়েছিলেন, কিন্তু সংবাদপত্রে বা কোনো স্মৃতিবাহিত বর্ণনায় তার উল্লেখ চোখে পড়েনি।

রাণুর বিবাহে সশরীরে উপস্থিত থাকতে তিনি হয়তো একধরনের সংকোচ অনুভব করছিলেন, তাই এই উপলক্ষে কলকাতায় আসাতেই তাঁর আপত্তি ছিল। কিন্তু চিত্তরঞ্জনের কারণে এখানে এসে অনুষ্ঠানে যোগ না দিয়ে ফিরে যাওয়াটাও ভালো দেখায় না বলে তিনি থেকে যেতে মনস্থ করেন। এই থাকা নিয়েও একটি অস্বস্তিকর অবস্থার উদ্ভব হয়েছিল তার বর্ণনা পাওয়া যায় ইন্দিরা দেবীর 'রোজনাম্‌চা বা দৈনিক লিপি'-তে :

রবি'কা তাঁর সব গ্রন্থাবলী একই ধরনে বেশ সুন্দর বাঁধিয়ে সব বইয়ের ভিতরে স্বহস্তে আশীর্বাদ লিখে একটা কাঁচের আলমারিসহ রাণুকে উপহার দিয়েছেন। তাই নিয়ে যে কী ব্যস্ত!

সে-আবার এক ইতিহাস। এই বিয়ে-বাড়ি যাবারই সুবিধে হবে ব'লে আর আমাদেরও [২০ মে ফেয়ার] ঘর প'ড়ে আছে, এলে খুশিই হব ব'লে, তাঁকে সেই সময়ে দু-চার দিন আমাদের এখানে এসে থাকতে অনুরোধ করলুম। তিনিও রাজি হলেন। মনে আছে, এক বৃহস্পতিবার ২৫শে জুন এলেন। রবিবার ২৮শে রাণুর বিয়ে। অন্তত সে পর্যন্ত থেকে সোমবারে চলে যাবেন, এই জানি। তার আগের দিনই প্রিয়[ম্বদা দেবী] অসুস্থ হয়ে আমাদের বাড়ি এসে থাকবার ইচ্ছে প্রকাশ করেছিল ব'লে, তাকে নিয়ে এসেছিলুম। তাকে ছোটোবাড়িতে এক ঘর গুছিয়ে দিয়ে আমাদের ঘর

রবিকা'কে ছেড়ে দিয়ে, আমরা তার পাশের ঘরে উঠে গিয়ে তো অনেক হেরফের ক'রে অতিথি সৎকারের ব্যবস্থা হল। কিন্তু প্রধান অতিথি কায়ক্লেশে বৃহস্পতি শুক্র দু'দিন থেকে শনিবার সকালে একটু বেলা হতেই বাড়ি যাবার জন্যে এত অস্থির কেন-যে হয়ে পড়লেন তা এখন পর্যন্ত ঠিক বুঝে উঠতে পারি নি। সুরেনদের ওখানে সেদিন সকালে গিয়ে বলেছেন শুনলুম যে, মন বসছে না, একটা চিঠি পর্যন্ত লিখতে পারছেন না, ইত্যাদি। আমাদের বললেন যে, রথীদের উপর চিঠিপত্র লেখা প্রভৃতি যে ভার দিয়েছেন তা সম্ভবত হচ্ছে না, ফোনে ঠিক বোঝানো যায় না, ইত্যাদি। সেদিন বিকালে জোড়াসাঁকোয় একটা গানবাজনার মজলিস ছিল। আমি জানি সেখান থেকে আমাদের সঙ্গেই ফিরবেন···কিন্তু প্রিয় ভাবেগতিকে বুঝেছিল যে, তাঁর চাকর 'বনমালী' বাহনে তিনি একেবারেই স'রে পড়বার মতলব করেছেন! পরে আমরাও সেইরকম ব্যবস্থা করলুম। তবে সেটুকু খুলে বললেই পারতেন, আর অত ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়বার কোনো কারণ ছিল না। তাঁর থাক-না-থাক, আমাদের তো একটা সামাজিক জ্ঞান আছে, এই-সব ব্যবহারে তাতে আঘাত লাগে। আসলে আমার বিশ্বাস রাণুকে যা দেবেন তার কী হল জানবার জন্যে ব্যস্ত এবং সেদিন আবার এক সাইক্লোন হবার হুজুক উঠেছিল তার জন্যে ভীত হয়ে এই কাণ্ডটি করলেন। পরে শুনলুম, সেই ভয়ে তাড়াতাড়ি রাত দশটার সময় গাড়ি ক'রে রাণুর যৌতুক পাঠিয়েছিলেন।[৩৩]

১৩ আষাঢ় [27 Jun] উল্লিখিত শনিবারেই রবীন্দ্রনাথ একটি চিঠি লিখে রাণুকে উপহারসামগ্রী প্রেরণ করেন : 'আশীর্ব্বাদসহ কিছু উপহার পাঠালুম। তোর কোনো কাজে লাগ্‌বেনা জানি। কিন্তু আমার যা সব-চেয়ে দেবার জিনিষ তাই দিলুম। হয়ত স্বরলিপির বইগুলো কখনো কখনো দরকার হতে পারে। এগুলো তোরা একবার দেখে তার পরে সার্ রাজেনের ওখানে পাঠিয়ে দিস্—কারণ সেখানে ওঁর য়ুরোপীয় আমন্ত্রিতরা হয়ত এর মূল্য বুঝবে।[৩৪] বাক্যবিন্যাসের এই অসংলগ্নতা থেকেই বোঝা যায় রবীন্দ্রনাথ তখনও একধরনের মানসিক অস্থিরতায় ভুগছেন।

ইন্দিরা দেবী লিখেছেন : 'রাণুর বিয়েতে নিমন্ত্রিত, অতিথি, সহকারী, কর্মকর্তা, সবই বলতে গেলে জোড়াসাঁকো। সুবীর ক'দিনই দৌড়োদৌড়ি ক'রে খুব খেটেছে, পরিবেশন করেছে, সাজিয়েছে, ইত্যাদি। ··· সবিতা ও প্রতিমা পিঁড়ে-আল্পনা থেকে ক'নে-সাজানো প্রভৃতি সবই করেছে'।[৩৫]

রবীন্দ্রনাথ বিবাহের আসরে উপস্থিত ছিলেন। সমর ভৌমিক লিখেছেন : 'বিবাহ বাসরে বর্ধমানের মহারাজ, দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, দিলীপকুমার রায়, অবনীন্দ্রনাথ, গগনেন্দ্রনাথ, সমরেন্দ্রনাথ, প্রতিমা দেবী, কালিদাস নাগ, মীরা দেবী, প্রশান্ত[চন্দ্র মহলানবিশ] প্রভৃতি সকলেই এসেছিলেন। দিলীপকুমার গান গেয়েছিলেন, রবীন্দ্রনাথ আশীর্বাদ করতে এসে বিচ্ছিন্নতার ছেঁড়া তার যেন জুড়ে গেলেন সারা সন্ধ্যে আমোদ আহ্লাদ করে।'[৩৬]

1 Jul [বুধ ১৭ আষাঢ়] চিত্তরঞ্জন দাশের শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু '১৬ আষাঢ় শ্রীযুক্ত কর্ত্তাবাবু মহাশয়ের কলিকাতা হইতে আগমন খরচ'-এর হিসাব দেখে মনে হয়, রবীন্দ্রনাথ তার আগের দিনই শান্তিনিকেতনে ফিরে আসেন। অবশ্য '১লা জুলাই ১৯২৫' তারিখ দিয়ে তিনি স্বহস্তলিখিত বাণী প্রচার করেন : 'আপন দানের দ্বারাই মানুষ আপন আত্মাকে যথার্থভাবে প্রকাশ করে। চিত্তরঞ্জন তাঁহার যে সর্বশ্রেষ্ঠ দান দেশকে উৎসর্গ করিয়াছেন তাহা কোনও বিশেষ রাষ্ট্রিক বা সামাজিক কর্তব্যপালনের আদর্শমাত্র নহে; তাহা সেই সৃষ্টিশক্তিশালী মহাতপস্যা যাহা তাঁহার ত্যাগসাধনের মধ্যে অমৃতরূপ ধারণ করিয়াছে।'[৩৭] ইংরেজিতেও তিনি একই বক্তব্য লিখে দেন : Man truly reveals himself through his gift, and the best gift that Chittaranjan has left for his countrymen is not any particular political or social programme, but the creative force of a great aspiration that has taken a deathless form in the sacrifice which his life represented.'[৩৮]

চিত্তরঞ্জন ভবানীপুরে তাঁর সুরম্য প্রাসাদ দেশবাসীর উদ্দেশে দান করেছিলেন। সেখানে চিত্তরঞ্জন সেবাসদন নামে মেয়েদের জন্য একটি হাসপাতাল প্রতিষ্ঠার সংকল্প নিয়ে দেশবন্ধু স্মৃতি তহবিল গঠিত হয়। এই তহবিলে অর্থসংগ্রহের উদ্দেশে রবীন্দ্রনাথ কয়েকদিন আগে একটি কবিতিকা লিখে দেন। প্রভাতচন্দ্র গুপ্ত লিখেছেন :

একদিন বিকেলবেলায় ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় জোড়াসাঁকোতে তাঁর কাছে গিয়ে উপস্থিত হলেন। বললেন— 'দেশবন্ধু স্মৃতিভাণ্ডারে অর্থসংগ্রহের জন্যে আমরা আবেদনপত্র প্রচার করছি, তাতে দেশবন্ধুর অন্তিম শয়নের ছবির নীচে দেবার জন্যে একটা ছোট কবিতা লিখে দিতে হবে আপনাকে, যাতে বিগতপ্রাণ দেশবন্ধুর ছবিতে প্রাণসঞ্চার হয়।'....বোধ হয় মিনিট পাঁচসাত পরেই ফিরে এলেন। লিখে এনেছেন সেই বিখ্যাত চার লাইনের কবিতা—

এনেছিলে সাথে করে
　　মৃত্যুহীন প্রাণ,
মরণে তাহাই তুমি
　　করে গেলে দান।[৩৯]

কবিতিকাটি বর্তমান সময়েই লেখা, তার প্রমাণ, শ্রাবণ ১৩৩২-সংখ্যা প্রবাসী-তে [পৃ ৫৮৮] আর্ট কাগজে ছাপা চিত্তরঞ্জনের বিগতপ্রাণ ছবির নিচে রবীন্দ্র-হস্তাক্ষরে লিখিত এই কবিতাটি।

বিধানচন্দ্র রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে রবীন্দ্রজন্মোৎসবে সভাপতির অভিভাষণে ঘটনাটি বিবৃত করেছিলেন।

আনন্দবাজার পত্রিকা [১০ চৈত্র] জানায় : 'গত ২১শে মার্চ্চ রবিবার দিন চিত্তরঞ্জন সেবা-সদন উদ্বোধনের দিন ধার্য্য ছিল। সেবা সদন রবীন্দ্রনাথের উদ্বোধনের কথা ছিল কিন্তু রবীন্দ্রনাথ অসুস্থ থাকায় উদ্বোধনের কার্য্য সম্প্রতি কিছু দিনের জন্য স্থগিত রহিল।'[৪০] ১ বৈশাখ ১৩৩৩ [14 Apr 1926] মোতিলাল নেহরু হাসপাতালের উদ্বোধন করেন।

শান্তিনিকেতনে ফিরে রবীন্দ্রনাথ চরকা নিয়ে গান্ধীজির সঙ্গে তাঁর বিতর্ক-প্রসঙ্গে 'চরকা' প্রবন্ধটি রচনা করলেন। *6 Jul [সোম ২২ আষাঢ়] তিনি প্রমথ চৌধুরীকে লিখলেন : 'চরকার উপর একটা আমার মন্তব্য লিখেছি। তোমাকে দিতে পারি কিন্তু সবুজপত্রের পুনরুদ্ধার হবে কোন্ ঋতুতে কোন্ মাসে এখনো তার কোনো খবর পাইনি। যেহেতু বিষয়টা সাময়িক এবং মহাত্মাজি অতি শীঘ্র আমার একটা অভিমত দাবী করচেন তোমার যদি বিলম্ব থাকে তাহলে অগত্যা আর কোথাও ছাপতে দিতে হবে। লেখাটা কিন্তু সবুজপত্রেরই সবর্ণ। এটার একটা ইংরেজি করাও চাই— যদি তুমি বাংলাটা গ্রহণ কর তাহলে ইংরেজীকরণের ভার বিবিকে নিতে হবে। নইলে সুরেন আছে। শীঘ্র জবাব দিয়ো।'[৪১] *14 Jul [মঙ্গল ৩০ আষাঢ়] তাঁকেই লিখলেন : 'লেখাটা হিন্দুস্থান ইন্‌সিয়ুরেন্স্ ঠিকানায় সুরেনকে রেজেস্ট্রিডাকে পাঠিয়েছি। ওর ইংরেজিটা আগামী Augustএ Modern Reviewতে ছাপানো চাই বলে সুরেনকে পাঠাতে হোলো। বিবি বলেছিল তাড়ার মুখে তর্জ্জমা করা তার দ্বারা হয়ে ওঠেনি। ও সম্বন্ধে সুরেনের অসামান্য ক্ষমতা। বাংলাটা তোমাদেরই প্রাপ্য। তর্জ্জমা হয়ে গেলেই ছাপতে দিতে পারবে। কলকাতায় যখন যাব তখন কোনো একটা ছোট গোছের সভায় ওটা পড়বার ইচ্ছে আছে।'[৪২] ৫ শ্রাবণে তিনি কলকাতায় আসেন, আনন্দবাজার পত্রিকা [৩ ভাদ্র] জানিয়েছে : 'কিছুদিন পূর্ব্বে শুনিয়াছিলাম, কবি রবীন্দ্রনাথ 'চরকা' সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লিখিয়া, এক বৈঠকী-সভায় তাঁহার ভক্ত ও অনুরাগীমণ্ডলীকে তাহা পাঠ করিয়া শুনাইয়াছেন'[৪৩] —কিন্তু বিশ্বভারতী সম্মিলনীর মতো কোনো আনুষ্ঠানিক

সভায় সেটি পঠিত হয়ে ছিল কি না জানা যায়নি। তাছাড়া সম্ভবত অনুবাদে সুরেন্দ্রনাথেরও দেরি হয়েছিল, তাই ইংরেজি তর্জমা অগাস্টের পরিবর্তে সেপ্টেম্বরে মুদ্রিত হয়।

সবুজপত্র-এর পুনঃপ্রকাশ ঘটতে ভাদ্র মাস হয়ে যায়, পত্রিকাটির প্রচার বাড়ানোর জন্য রবীন্দ্রনাথকে অগত্যা সেই সময় পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয় দ্র সবুজপত্র, ভাদ্র। ১১-৩১; কালান্তর ২৪। ৪০১-১৩। সুরেন্দ্রনাথ-কৃত অনুবাদটি 'The Cult of the Charka' নামে *The Modern Review*, Sep 1925 [pp. 263-70]-সংখ্যায় মুদ্রিত হয় [দ্র *EWRT* 3/ 538-48]।

কিছুদিন আগে বিজ্ঞানী ড প্রফুল্লচন্দ্র রায় কোনো প্রবন্ধে চরকা কাটেন না বলে রবীন্দ্রনাথ ও ড ব্রজেন্দ্রনাথ শীলকে অভিযুক্ত করেছিলেন। ঠাট্টা করে রবীন্দ্রনাথ লিখলেন, এতেই প্রমাণ হয় মানুষের মধ্যে মতভেদ আছে অর্থাৎ 'সকল মানুষে মিলে মৌমাছির মতো একই নমুনার চাক বাঁধবে, বিধাতা এমন ইচ্ছে করেন নি। কিন্তু সমাজবিধাতারা কখনো কখনো সেইরকম ইচ্ছা করেন। তাঁরা কাজকে সহজ করবার লোভে মানুষকে মাটি করতে কুণ্ঠিত হন না।' এই সুদীর্ঘ প্রবন্ধের শেষ অনুচ্ছেদটি ছাড়া তিনি আর-কোথাও গান্ধীজির নাম করেননি, কিন্তু সমস্ত প্রবন্ধটিই তাঁর অযৌক্তিক জবরদস্তির বিরোধী সমালোচনা ছাড়া কিছু নয়। বস্তুত গান্ধীজির কর্মপদ্ধতি সম্পর্কে তিনি প্রথমাবধি একটি বিরূপ ধারণা পোষণ করেছেন। 1915-এ শান্তিনিকেতনে তিনি যখন ফিনিক্স স্কুলের ছাত্রদের দেখেছিলেন, তখনই তাদের চিন্তাহীন নিয়মপালন তাঁকে বেদনা দিয়েছিল—অ্যান্ডরুজের কাছে তিনি একে 'moral tyranny' নামে অভিহিত করেছিলেন। এর পরে যখন তিনি শোনেন, সবরমতী আশ্রমের কোনো ছাত্রের বা আশ্রমবাসীর অপরাধের জন্য গান্ধীজি নিজে অনশনব্রত অবলম্বন করে তাকে সংশোধন করার চেষ্টা করেন, তাঁর রুচি ও নীতিবোধ তাতে পীড়া বোধ করেছিল। দেশীয় রাজনীতির ক্ষেত্রেও গান্ধীজি প্রায়শই বিভিন্ন মেয়াদের অনশনব্রত নিয়ে দেশবাসীকে উদ্বিগ্ন করে চাপ সৃষ্টির কৌশল গ্রহণ করেছেন। প্রায়ই তিনি সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার বিরুদ্ধে অনশন করতেন, ফলে দুই সম্প্রদায় আপাত-সমঝোতা করে তাঁকে অনশনভঙ্গে সম্মত করাত ও তার পরেই নূতন উদ্যমে দাঙ্গা আরম্ভ করত। অধিকাংশ সময়ে তিনি সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের অন্যায় দাবি মেনে নেওয়ার জন্য সংখ্যাগুরুদের উপর চাপ সৃষ্টি করেছেন, যা শেষপর্যন্ত দেশ ও দেশবাসীর ক্ষতির কারণ হয়েছে। এই কর্তাভজার দেশে গান্ধীজির এইসব অন্যায়ের প্রতিবাদ ও ধিক্কার জানানোর সৎসাহস দেশের মধ্যে কেবল রবীন্দ্রনাথেরই ছিল এবং তিনি প্রকারান্তরে বহুবার তা করেছেন—কিন্তু অদ্ভুত অবাস্তব এক কারণে বারবার দ্বিধান্বিতও হয়েছেন। বর্তমান প্রবন্ধেও তিনি লিখেছেন : 'তাঁর মহৎ চরিত্র আমার কাছে পরম বিস্ময়ের বিষয়'— কিন্তু গান্ধীজির চরিত্রমাহাত্ম্যের কোন্ পরিচয় তিনি কোথায় পেলেন তার কোনো ব্যাখ্যা দেননি। তিনি নিজেই লিখেছেন : 'যে-কারণ ভিতরে থাকাতে **রামমোহন** রায়ের মতো অত বড়ো মনস্বীকেও মহাত্মা বামন বলতে কুণ্ঠিত হন নি, অথচ আমি সেই রামমোহনকে আধুনিক যুগের মহত্তম লোক ব'লেই জানি— সেই আভ্যন্তরিক মনঃপ্রকৃতিগত কারণই মহাত্মাজির কর্মবিধিতে এমন রূপ ধারণ করেছে যাকে আমার স্বধর্ম আপন ব'লে গ্রহণ করতে পারছে না। সেজন্যে আমার খেদ রয়ে গেল। ··· ব্যক্তিগত অনুরাগের টানে মহাত্মাজির কাছ থেকে চরকায় দীক্ষা নেবার প্রবল ইচ্ছা বারে বারে আমার মনে এসেছে। কিন্তু, আমার বুদ্ধিবিচারে চরকার যতটুকু মর্যাদা তার চেয়ে পাছে বেশি স্বীকার করা হয়, এই ভয়ে অনেক দ্বিধা করে নিরস্ত হয়েছি।' এই দ্বিধাই ভারতবর্ষের দুর্ভাগ্য, এক অদ্ভুত সম্মোহনে অভিভূত হয়ে অন্ধভক্তি ও কুযুক্তিকে শিরোধার্য করে ভারত গান্ধীজি-প্রবর্তিত একাধিক অপরিকল্পিত

রাজনৈতিক আন্দোলনের পরিণামে এক খণ্ডিত প্রতিবন্ধী স্বাধীনতাকে স্বীকার করেছিল এবং আজও তার ফল ভোগ করে চলেছে ও চলবে।

প্রবন্ধটি প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই দেশে তুমুল আলোড়ন দেখা দেয়। কেবল আনন্দবাজার পত্রিকা-তে প্রায় রোজই সম্পাদকীয়তে ও অন্যান্য আলোচনায় রবীন্দ্রনাথের বক্তব্যকে ধিক্কার জানানো হয়েছে [দ্র রবীন্দ্র-প্রসঙ্গ ১। ২৭৯-৯৩]। তিনি 'চরকা' প্রবন্ধেই লিখেছিলেন : 'আমাকে কেউ কেউ বলেছেন, চরকা ছাড়া আর কোনো কাজ কোরো না, এমন কথা তো আমরা বলি নে। তা হতে পারে, কিন্তু আর কোনো কাজ করো, এ কথাও তো বলা হয় না। সেই না-বলাটাই কি প্রবল একটা বলা নয়। স্বরাজসাধনায় একটিমাত্র কাজের হুকুম অতি নির্দিষ্ট, আর তার চার দিকেই নিঃশব্দতা।' কৌতুকের বিষয়, 'চরকা' প্রবন্ধের সমালোচনাতেও সেই নিঃশব্দতা অটুট থেকেছে। ৭ ভাদ্রের সম্পাদকীয়তে লেখা হয়েছে : 'দেশের ভিতর শুভবুদ্ধি যাহাতে জাগ্রত হয় সেজন্য চরকার মন্ত্র লইয়া দেশের শিক্ষিত কর্ম্মী সম্প্রদায় জনসাধারণের ভিতর প্রচারের কার্য্য গ্রহণ করিতেছেন। ....যাহারা কখনো পল্লীতে ফিরিবার কল্পনা করেন নাই, মনের শক্তিতে এবং ত্যাগের শক্তিতে শক্তিমান, এরূপ বহু তরুণ মন, আজ পল্লীকেই তাহাদের জীবনের কর্ম্মভূমি রূপে গ্রহণ করিয়াছেন। সেখানে সকলের সঙ্গে সমানভাবে মিশিয়া তাহাদের কাজের ক্ষেত্র রচিত হইতেছে, নৈশ স্কুল, অবৈতনিক স্কুল প্রতিষ্ঠিত হইতেছে, রোগে ঔষধ দিবার, শোকে সান্ত্বনা দিবার চেষ্টা চলিতেছে। কাজের অভাবে যাহারা নিরন্ন উপবাসী ছিল, কাজ দিয়া তাহাদের অন্নবস্ত্রের সংস্থান করিয়া দিতেও তাঁহারা চেষ্টার ত্রুটি করিতেছেন না।'[৪৪] অসহযোগ আন্দোলনের সময়ে সুরুলের গ্রামে রবীন্দ্রনাথ এরূপ বহু শিক্ষিত যুবককে দেখেছিলেন যাদের গ্রামবাসীরা আপন বলে গ্রহণ করেননি, অ্যান্ডরুজ উত্তর ভারতের বহু গ্রাম ঘুরে তাঁর একই অভিজ্ঞতার কথা বিদেশে রবীন্দ্রনাথকে জানিয়েছিলেন। বস্তুত রবীন্দ্রনাথ চাইতেন, বাইরের সাহায্য নয়— পল্লিবাসীর আত্মনির্ভর স্বাধীন চেষ্টার উদ্বোধন— শ্রীনিকেতনে যে-সাধনা চলছিল মডেলের আকারে, তাকেই দেশের সর্বত্র ছড়িয়ে দিতে।

'চরকা' প্রবন্ধ লেখার অনতিকাল পরে রবীন্দ্রনাথ প্রধানত গান্ধীজিকে আবার আক্রমণ করলেন 'স্বরাজসাধন'-শীর্ষক প্রবন্ধে, তাঁর আন্দোলনের আর-একটি অবাস্তব অংশের সমালোচনা করে। 1920-তে কলকাতায় গান্ধীজি কংগ্রেসের মঞ্চ থেকে ঘোষণা করেছিলেন, অসহযোগ আন্দোলনের জন্য তিনি যে কর্মবিধির প্রস্তাব করছেন, সেগুলি মানলে এক বৎসরের মধ্যে স্বরাজলাভ অনিবার্য। কিন্তু অনেক আশা জাগিয়ে যখন সময় অতিক্রান্ত হওয়ার পরেও স্বরাজের আবির্ভাব ঘটল না, তখন বলা হল শর্ত পালন না করার জন্যই এই ব্যর্থতা। রবীন্দ্রনাথ লিখলেন, দিন স্থির করে দিলে যে-নেশা লাগে এখন সেই নেশাই সহজিয়া সাধনের পন্থা নিয়েছে— 'সেই পথের অন্তর্গত হয়ে পড়েছে চরকা'। দেশের চাষীরা তাদের অবসরকালে সুতো কেটে যদি কিছু উপার্জন করে অন্তত সেটুকুও তাদের কাজে দেয়। কিন্তু বাংলাদেশের অন্তত দুটি জেলার চাষীদের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ পরিচয়ে তিনি দেখেছেন, অনভ্যাসের কাজে তাদের নিযুক্ত করা প্রায় অসম্ভব। ধান উৎপাদন করতে যে-চাষীরা হাড়ভাঙা পরিশ্রম করে তারাই অন্য সময়ে সেখানে সব্‌জি উৎপন্ন করতে পারত, কিন্তু তিনি নিজে উৎসাহ দিয়েও তাদের সেই কাজে প্রবৃত্ত করাতে পারেননি। অন্য একটি জেলার চাষীরা ধান পাট আখ সর্ষে প্রভৃতি নানাবিধ চাষে নিযুক্ত থাকে, কিন্তু যে-জমিতে এইসব চাষ হয় না তাদের বৃথা ফেলে রেখে তাদের খাজনা বহন করে চলে। অথচ পশ্চিম অঞ্চলের চাষীরা এসে সেই জমিতেই তরমুজ খরমুজ কাঁকুড় প্রভৃতি ফলিয়ে যথেষ্ট লাভ নিয়ে দেশে ফিরে যায়, স্থানীয় চাষীরা তা চোখে

দেখেও সেই অনভ্যস্ত কাজে হাত লাগায় না। রবীন্দ্রনাথ এই উদাহরণ দিয়ে বললেন, পথ বাৎলানো সহজ কিন্তু মানুষের মনের সঙ্গে রফানিষ্পত্তি করাই হল গোড়ার কাজ। 'হিন্দু-মুসলমানের মিলন হোক, বাহিরের দিক থেকে এই পরোয়ানা জাহির করা কঠিন নয়। এই উপলক্ষে হিন্দুরা খিলাফৎ-আন্দোলনে যোগ দিতে পারে, কেননা সেরকম যোগ দেওয়া খুবই সহজ। এমন কি নিজেদের আর্থিক সুবিধাও মুসলমানদের জন্য অনেক পরিমাণে ত্যাগ করতে পারে; সেটা দুরূহ সন্দেহ নেই, তবু 'এহ বাহ্য'। কিন্তু, হিন্দু-মুসলমানের মিলনের উদ্দেশে পরস্পরের মনের চিরাগত সংস্কারের পরিবর্তন করা সহজ নয়। …হিন্দুর কাছে মুসলমান অশুচি, আর মুসলমানের কাছে হিন্দু কাফের— স্বরাজপ্রাপ্তির লোভেও এ কথাটা ভিতর থেকে উভয় পক্ষের কেউ ভুলতে পারে না।' রবীন্দ্রনাথ বললেন, বাধা আমাদের অন্তরের মধ্যেই আছে বলে সেটা দূর করার কথা বললে মন বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। তাই একটি সহজ বাহ্যিক প্রণালীর কথা শুনলে মন আশ্বস্ত হয়, চরকা এমনই একটি সহজ কাজ— 'এইরকম অন্ধ সাধনায় মহাত্মার মতো লোক হয়তো কিছুদিনের মতো আমাদের দেশের একদল লোককে প্রবৃত্ত করতে পারেন, কারণ তাঁর ব্যক্তিগত মাহাত্ম্যের 'পরে তাদের শ্রদ্ধা আছে। এইজন্যে তাঁর আদেশ পালন করাকেই অনেকে ফললাভ বলে গণ্য করে।' কিন্তু রবীন্দ্রনাথের মতে, 'এরকম মতি স্বরাজলাভের পক্ষে অনুকূল নয়'। তিনি লিখেছেন :

> সাধারণের মঙ্গল জিনিসটা অনেকগুলি ব্যাপারের সমবায়। তারা পরস্পর ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। তাদের একটাকে পৃথক করে নিলে ফল পাওয়া যায় না। স্বাস্থ্যের সঙ্গে, বুদ্ধির সঙ্গে, জ্ঞানের সঙ্গে, কর্মের সঙ্গে, আনন্দের সঙ্গে মিলিয়ে নিতে পারলে তবেই মানুষের সব ভালো পূর্ণ ভালো হয়ে ওঠে। স্বদেশের সেই ভালোর রূপটিকে আমরা চোখে দেখতে চাই। … মানুষ আপন দেশকে আপনি সৃষ্টি করে। সেই সৃষ্টির কাজে ও রক্ষণের কাজে দেশের লোকের পরস্পরের মধ্যে সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠ হয়, আর সেই সৃষ্টি-করা দেশকে তারা প্রাণের চেয়ে ভালোবাসতে পারে। … দেশকে সৃষ্টি করার দ্বারাই দেশকে লাভ করবার সাধনা আমাদের ধরিয়ে দিতে হবে। সেই সৃষ্টির বিচিত্র কর্মে মানুষের বিচিত্র শক্তির প্রয়োজন। নানা পথে এক লক্ষ্য-অভিমুখে সেই বিচিত্র শক্তির প্রয়োগের দ্বারাই আমরা আপনাকে দেশের মধ্যে উপলব্ধি করি। এই দেশসৃষ্টির সাধনা কাছের থেকে আরম্ভ করে ক্রমে দূরে প্রসারিত করলে তবেই আমরা ফল পাব। … সম্মিলিত আত্মকর্তৃত্বের চর্চা, তার পরিচয়, তার সম্বন্ধে গৌরববোধ জনসাধারণের মধ্যে ব্যাপ্ত হলে তবেই সেই পাকা ভিত্তির উপর স্বরাজ সত্য হয়ে উঠতে পারে। … যে-মানুষ গ্রাম থেকে মারী দূর করবার উদ্‌যোগ করছে তাকে যদি বা দুর্ভাগ্যক্রমে সম্পূর্ণ একলাও কাজ করতে হয়, তবু তার কাজের আদিতে ও অন্তে সমস্ত গ্রামের চিন্তা নিবিড়ভাবে যুক্ত। এই কাজের দ্বারাই নিজের মধ্যে সমগ্র গ্রামকে সে উপলব্ধি করে। … তারই কাজে স্বরাজসাধনার সত্যকার আরম্ভ বটে। তার পরে সেই কাজে যদি সমস্ত গ্রামের লোক পরস্পর যোগ দেয় তা হলেই বুঝব, গ্রাম নিজেকে নিজে সৃষ্টি করার দ্বারাই নিজেকে নিজে যথার্থরূপে লাভ করবার দিকে এগোচ্ছে। এই লাভ করাকেই বলে স্বরাজলাভ। পরিমাণ হিসেবে কম হলেও সত্য হিসাবে কম নয়। … তার পরে একটা দীপের থেকে আর-একটা দীপের শিখা জ্বালানো কঠিন হবে না; স্বরাজ নিজেই নিজেকে অগ্রসর করতে থাকবে, চরকার যান্ত্রিক প্রদক্ষিণপথে নয়, প্রাণের আত্মপ্রবৃত্ত সমগ্রবৃদ্ধির পথে।

—সুরুল ও তার পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলি নিয়ে ছোটো আকারে এই স্বরাজসাধনারই কাজ চলছিল, সেখানকার পল্লিপুনর্গঠন কেন্দ্র স্থাপিত হলে এল্‌ম্‌হার্স্টের নির্দেশে ছাত্ররা তাদের কুটিরের সামনে 'স্বরাজ' কথাটি লিখে রেখেছিলেন [দ্র রবিজীবনী ৮। ১৯৪], তথ্যটি আমরা এই প্রসঙ্গে স্মরণ করতে পারি।

'স্বরাজসাধন' প্রবন্ধটি আশ্বিন-সংখ্যা [পৃ ১৩৬-৫৩] সবুজপত্র-তে মুদ্রিত হয় [দ্র কালান্তর ২৪। ৪১৪-২২], Striving for Swaraj' নামে সম্ভবত সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর-কৃত এর ইংরেজি অনুবাদ ছাপা হয় *The Modern Review*, Dec 1925/ 681-85-সংখ্যায়।

আষাঢ় ১৩৩২-এ সাময়িকপত্রে রবীন্দ্রনাথের রচনা-প্রকাশের তালিকাটি খুব দীর্ঘ নয় :

শান্তিনিকেতন, আষাঢ় ১৩৩২ [৬। ৬] :

১১৯ 'বিদায়কালে ইতালীয়ার প্রতি' ['কহিলাম, ওগো রাণী'] দ্র পূরবী ১৪। ১৫৩-৫৪ [ইটালিয়া']

১২০-৩৩ 'ভারতবর্ষীয় বিবাহ' দ্র র° র° [শত] ১৩। ৫-২০

১৩৯-৪০ 'পত্র'

২০ মাঘ ১৩২৬ তারিখে জোড়াসাঁকো থেকে কোনো অজ্ঞাত ব্যক্তিকে লেখা একটি চিঠি 'পত্র' শিরোনামে ছাপা হয়।

আষাঢ়-সংখ্যা প্রবাসী-তে নূতন রবীন্দ্ররচনার অভাবে মানসী কাব্যের 'মেঘদূত' কবিতাটি পুনর্মুদ্রিত হয়েছিল।

The Modern Review, July 1925 (Vol. XXXVIII, No.1]:

1-8 'Letters to a Friend'

অ্যান্ডরুজকে লেখা তাঁদের প্রাথমিক পরিচয়-পর্বের ২৫টি চিঠি এখানে ছাপা হয়েছে।

The Visva-Bharati Quarterly, July 1925 [Vol. VIII, No. 2] :

89-108 'The Indian Ideal of Marriage' দ্র *EWRT* 3/ 524-37

135 'With a Grand Scheme in Mind'

148 'The Cleanser' J *EWRT* 3/ 954

172-80 'Notes and Comments'

181 'Deshbandhu Chittaranjań Das' [Facsimile]

'The Indian Ideal of Marriage' 'ভারতবর্ষীয় বিবাহ' প্রবন্ধটির সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর-কৃত ও রবীন্দ্রনাথ-সংশোধিত ইংরেজি অনুবাদ। 'With a Grand Scheme in Mind' পূরবী-র 'আশা' কবিতার প্রথমাংশ 'মস্ত যে-সব কাণ্ড করি' প্রভৃতি কয়েকটি ছত্রের রবীন্দ্রনাথ-কৃত ইংরেজি অনুবাদ। 'The Cleanser' সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের 'কুহু ও কেকা' কাব্যের অন্তর্গত 'মেথর' কবিতার অনুবাদ। দক্ষিণ আমেরিকার সান ইসিদ্রোতে বড়োদিনের সকালে রবীন্দ্রনাথ যে-আলোচনা করেন এল্‌ম্‌হার্স্ট-কৃত তার অনুলেখন 'Notes and Comments'-এ মুদ্রিত হয়। চিত্তরঞ্জনের শ্রাদ্ধদিনে রবীন্দ্রনাথের শ্রদ্ধার্ঘ্য তাঁর নিজের হস্তাক্ষরে এখানে ছাপা হয়েছে।

২৭ জ্যৈষ্ঠ রবীন্দ্রনাথ রাণুকে লিখেছিলেন, 'প্রখর তাপে গায়ের রক্ত শুকিয়ে ভিতরে ভিতরে আমসত্বর মত' হয়ে যাচ্ছিল, ১ আষাঢ় তাঁকেই জানান : 'আমাদের এখানে মাঝে মাঝে ঘন ঘোর ঘটায় দিগন্ত অন্ধকার করে প্রান্তরে প্রান্তরে ঝড়বৃষ্টির তাণ্ডব চল্‌চে। আষাঢ়স্য প্রথম দিবসঃ এসে পড়্‌ল— এ সময়ে আমার মত কবির উচিত হচ্চে যথানিয়মে বিরহ যাপন করা।' এই সময়ে রচিত তাঁর কয়েকটি গানে বিরহের কথা আছে, কিন্তু বর্ষার সংবর্ধনাতেও তাঁর কোনো ত্রুটি হয়নি— Ms. 464-তে দেখা যাচ্ছে ২ আষাঢ় [মঙ্গল 16 Jun] তিনি গান লিখেছেন 'ঐ আকাশ পরে সুধায় ভরে' দ্র গীত ২। ৪৪৭-৪৮; স্বর ৩১ ['আজি ওই আকাশ-'পরে']। ৩ শ্রাবণ [রবি 19 Jul] আশ্রমে 'বর্ষামঙ্গল' অনুষ্ঠিত হয়। তার আগে এই পাণ্ডুলিপিতেই নিম্নোক্ত গানগুলি লেখা হয়েছিল :

'আছ আকাশ পানে তুলে মাথা' দ্র গীত ২। ৩১১-১২; স্বর ৩১

‘তার হাতে ছিল হাসির ফুলের হার’ দ্র ঐ ২। ৩৬৯; স্বর ৩১— পাণ্ডুলিপিতে রচনার তারিখ ‘জ্যৈষ্ঠ ১৩৩২’, পাঠকের মনে আছে গানটি প্রথমে রচিত হয়েছিল পূরবী-র ‘বদল’-শীর্ষক কবিতার আকারে 17 Jan 1925 জুলিয়ো চেজারে জাহাজে, বর্তমানে সেটি গীতিরূপ লাভ করল।

‘মরণের মুখে রেখে দূরে যাও চলে’ দ্র গীত ১। ২৩১; স্বর ২

‘অবেলায় যদি এসেছ আমার বনে’ দ্র ঐ ৩। ৮৯৯; স্বর ৩১

‘দ্বারে কেন দিলে নাড়া ওগো মালিনী’ দ্র ঐ ২। ৪০৭; স্বর ৩১

‘গান আমার যায় ভেসে যায়’ দ্র ঐ ২। ২৭৬-৭৭; স্বর ৩১

‘ওগো আষাঢ়ের পূর্ণিমা আজি’ দ্র ঐ ২। ৪৪৮; স্বর ৩১ [‘ও আষাঢ়ের পূর্ণিমা আমার’]

‘যেতে দাও গেল যারা’ দ্র ঐ ২। ৪৪৭; স্বর ৩১

‘গহন রাতে শ্রাবণধারা পড়িছে ঝরে’ দ্র ঐ ২। ৪৪৬; স্বর ৩১

‘কোথা যে উধাও হল’ দ্র ঐ ২। ৪৫৮; স্বর ২

‘জানি জানি হল যাবার আয়োজন’ দ্র ঐ ২। ৩৩৮; স্বর ৩১; পাণ্ডুলিপিতে গান রচনার তারিখ ১ শ্রাবণ [১৩৩২]।

‘সখী আঁধারে একেলা ঘরে’ দ্র ঐ ২। ৩৮৩; স্বর ২।

এর সবগুলি গান বর্ষা-বিষয়ক নয় ও বর্ষার নবরচিত সব গানগুলিই ৩ শ্রাবণের বর্ষামঙ্গল অনুষ্ঠানে গীত হয়নি। আষাঢ়-সংখ্যা শান্তিনিকেতন-এ অনুষ্ঠানটির বিবরণ মুদ্রিত হয় :

গত ৩রা শ্রাবণ মহাসমারোহে বর্ষামঙ্গল সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। এই উপলক্ষ্যে কলাভবনটিকে পদ্মে ও পদ্মপাতায় ধূপে ও আলিপনায় সাজানো হইয়াছিল। সন্ধ্যাকালে আশ্রমবাসিগণ সমবেত হইলে প্রত্যেকের কপালে চন্দন লেপন করা হয় ও প্রত্যেককে একটি পদ্ম ও একখানি গীতিপুথিকা বর্ষার মাঙ্গলিক প্রতীক স্বরূপ দেওয়া হয়। সভাতে স্বয়ং আচার্য্যদেব উপস্থিত ছিলেন। প্রথমে শ্রীযুক্ত সঙ্গমেশ্বর শাস্ত্রী বীণাবাদন করেন। তৎপরে শ্রীযুক্ত ভীমরাও শাস্ত্রী একটি হিন্দী গান করেন। তারপরে আচার্য্যদেব গানের দলকে লইয়া এতদুপলক্ষ্যে নির্দিষ্ট পনেরোটি গান করেন। ইহার মধ্যে ছয়টি গান আধুনিকতম। ইহার পরে একজন মহিলা আচার্য্যদেবের লিখিত একটি গান গাহিয়াছিলেন। পণ্ডিতজি এই গানটিতে সুর সংযোগ করিয়াছিলেন। সর্বশেষ সকলে দাঁড়াইয়া উঠিয়া ‘শান্তিনিকেতন’ গানটি গাহিয়া সভাভঙ্গ করেন।

২৫৯ অপার চিৎপুর রোডের শ্রীকৃষ্ণ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ কর্তৃক মুদ্রিত ‘বর্ষামঙ্গল / শ্রাবণ, ১৩৩২’ মলাটে লেখা ১২ পৃষ্ঠার ‘গীতিপুথিকা’য় কিন্তু পনেরোটির পরিবর্তে তেরোটি গান আছে :

১ আকাশতলে দলে দলে মেঘ যে ডেকে যায়; ২ ছায়া ঘনাইছে বনে বনে; ৩ শ্রাবণ বরিষণ পার হয়ে; ৪ আজ কিছুতে যায় না মনের ভার; ৫ এই শ্রাবণ-বেলা বাদলঝরা; ৬ আজি ঐ আকাশ পরে সুধায় ভরে; ৭ পূব হাওয়াতে দেয় দোলা আজ মরি মরি; ৮ শাঙন গগনে ঘোর ঘনঘটা; ৯ ধরণীর গগনের মিলনের ছন্দে; ১০ গহনরাতে শ্রাবণ ধারা পড়িছে ঝরে; ১১ যেতে দাও গেল যারা; ১২ সখি, আঁধারে একেলা ঘরে মন মানে না এবং ১৩ বজ্র-মাণিক দিয়ে গাঁথা।

শ্রাবণ-সংখ্যা শান্তিনিকেতন-এ ‘বর্ষা মঙ্গল’ শিরোনামে উক্ত ছয়টি ‘আধুনিকতম’ গান মুদ্রিত হয় [পৃ ১৪৪-৪৫], তার মধ্যে দুটি উপরের তালিকায় নেই :

১ ‘ধরণী দূরে চেয়ে’ দ্র গীত ২। ৪৬৫-৬৬; স্বর ৩০

৫ ‘জানি হল যাবার আয়োজন’ দ্র ঐ ২। ৩৩৮ স্বর ৩১ [‘জানি জানি হল যাবার আয়োজন’]

—এই গানগুলিও উক্ত পাণ্ডুলিপিতেই রচিত।

অন্যান্যবার 'বর্ষামঙ্গল' শান্তিনিকেতনে অনুষ্ঠিত হওয়ার পরে কলকাতার অনুরাগীদের কাছে পরিবেশন ও অর্থসংগ্রহের উদ্দেশ্যে আয়োজিত হত— মুদ্রিত অনুষ্ঠানসূচি দেখে মনে হয় এবারেও হয়তো তার পরিকল্পনা ছিল, যা রবীন্দ্রনাথের অসুস্থতা বা অন্য কোনো কারণে কার্যকর হয়নি। তাছাড়া স্বাস্থ্যোদ্ধারের জন্য তাঁর বিদেশযাত্রার কথাও ছিল।

কিন্তু এই সব-কিছুর মধ্যে একটি পারিবারিক সমস্যা নাছোড়বান্দার মতো তাঁকে পীড়িত করে গেছে। কনিষ্ঠ জামাতা নগেন্দ্রনাথ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হওয়ায় রবীন্দ্রনাথ মনে করেছিলেন, তাঁর আর্থিক চাহিদার অবসান হল এবং হয়তো মীরা দেবীর সঙ্গে তাঁর দাম্পত্যবিরোধেরও সুরাহা হবে। কিন্তু এর কোনোটাই হয়নি। কারণে-অকারণে তিনি রবীন্দ্রনাথ বা রথীন্দ্রনাথের কাছে অর্থের প্রার্থনা, জানিয়েছেন— কখনো-কখনো তা মেটানোও হয়েছে। এর পরে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে যখন তাঁকে গবেষণার জন্য ইংল্যান্ডে পাঠানো হল, তখন কেবল মীরা দেবীকে পীড়া দেবার জন্য তিনি পুত্র নীতুকেও সঙ্গে করে নিয়ে যান। অথচ তাঁর শিক্ষা সম্পর্কে নগেন্দ্রনাথের কোনো প্রাথমিক পরিকল্পনাও ছিল না, তাঁর লেখাপড়ার খরচ মেটানোও সাধ্যাতীত ছিল। রবীন্দ্রনাথ কয়েকবার প্রস্তাব করেছেন, বিদেশে তাঁর একাধিক অনুরাগী নীতুকে নিজেদের কাছে রেখে মানুষ করার দায়িত্ব নিতে চান— নগেন্দ্রনাথ তাতে রাজি হননি। অথচ টাকা চাইতেও তাঁর চক্ষুলজ্জা ছিল না। রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত 10 Jun [২৭ জ্যৈষ্ঠ]-এর একটি চিঠি থেকে জানা যায়, রথীন্দ্রনাথ তাঁর প্রার্থনাপূরণে অসম্মতি জানিয়েছেন। এইসব ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে 27 Jul [১১ শ্রাবণ] রোটেনস্টাইনকে লেখা নগেন্দ্রনাথের একটি পত্র রবীন্দ্রগবেষকদের আতঙ্কিত করার পক্ষে যথেষ্ট : 'I am sending two manuscripts of my father-in-law, Sir Rabindranath Tagore, to you in the hope that you may find someone interested in them. While in Rome, May 1923, in connection with the International Agricultural Conference, an American admirer of Tagore offer me £25/- for each,... I have Tagore's Vernacular manuscripts which I may have to sell later if my second appeal to the Government is rejected.' মীরা দেবী-কৃষ্ণ কৃপালনী-সংগ্রহে রবীন্দ্রনাথের কিছু পাণ্ডুলিপি পাওয়া গেছে, কিন্তু উল্লিখিত পদ্ধতিতে বিক্রীত আরও কত পাণ্ডুলিপি বিদেশে চালান হয়ে গিয়ে ব্যক্তিগত সংগ্রহে রক্ষিত বা বিনষ্ট হয়েছে ভাবলেও বিষন্ন হতে হয়।

আমরা আগেই বলেছি, আর্ট থিয়েটার লিমিটেডের সঙ্গে চুক্তি অনুসারে রবীন্দ্রনাথ 'প্রজাপতির নির্বন্ধ' উপন্যাসটিকে 'চিরকুমার সভা' নামে নাট্যরূপ দেন। নাটকটি স্টার থিয়েটারে প্রথম অভিনীত হল ২ শ্রাবণ [শনি 18 Jul] রাত্রি সাড়ে সাতটায়। অন্যতম অভিনেতা অহীন্দ্র চৌধুরী লিখেছেন :

> …আমাদের পার্ট সব আমরা পেয়ে গেছি, বই অবশ্য নাট্যাকারে তখনো ছাপা হয়ে বেরোয়নি। ঠিক হয়েছিল, কবি যে-সব নতুন গান এতে সংযোজিত করেছেন, সেগুলির স্বরলিপি রাধাচরণ গিয়ে-গিয়ে তুলে নিয়ে আসবে।…গানের ব্যাপারে তত্ত্বাবধায়ক থাকবেন দীনেন্দ্রনাথ ঠাকুর। গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুরও দেখে দেবেন মঞ্চ-ব্যবস্থা…সেট্‌সিন প্রভৃতি। …বিশেষ করে চন্দ্রবাবুর ঘরটি যা করে দিয়েছিলেন, তার চমৎকারিত্বের কথা আজও ভুলিনি! একটা সিঁড়ি ছিল, ঘরের মধ্যে নেমে এসেছে। কিউবিস্ট কম্পোজিশন করেছিলেন ঘরখানির'।[৪৫]

অভিনয় করেছিলেন তিনকড়ি চক্রবর্তী - অক্ষয়; অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় - রসিক; অহীন্দ্র চৌধুরী - চন্দ্রবাবু; দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় - পূর্ণ; রাধিকানন্দ মুখোপাধ্যায় - বিপিন; ইন্দুভূষণ মুখোপাধ্যায় - শ্রীশ; কাশীনাথ চট্টোপাধ্যায় - গুরুদাস; হরিমোহন - দারুকেশ্বর; ব্রজেন্দ্রনাথ সরকার - মৃত্যুঞ্জয়; সুশীলাসুন্দরী - শৈলবালা; রাণীসুন্দরী - সুরবালা; নীহারবালা - নীরবালা; ফিরোজবালা - নৃপবালা; নিভাননী - নির্ম্মলা এবং নন্দরাণী - জগত্তারিণী।

আর্ট থিয়েটারের অভিনয় খুবই প্রশংসনীয় হয়। ৭ শ্রাবণ [23 Jul] আনন্দবাজার পত্রিকা লেখে :

প্রথম অভিনয় রজনী উপলক্ষে আর্ট থিয়েটারের কর্তৃপক্ষের আহ্বানে বহু সুধী ও বিদ্বজ্জন সমাগত হইয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথের অতি সূক্ষ্ম রসসৃষ্টি ও রঙ্গ-কৌতুক সাধারণ শ্রোতারা সম্যক গ্রহণ করিতে পারিবেন কি না এবং অভিনেতৃবৃন্দ তাহা যথাযথ ফুটাইয়া তুলিতে সক্ষম হইবেন কি না, এ সম্বন্ধে অনেকেরই সংশয় ছিল। কিন্তু যবনিকা উত্তোলিত হইয়া অভিনয় কিয়দ্দূর অগ্রসর হইলেই বোঝা গেল যে, অভিনেতৃগণের সমস্ত শ্রম সার্থক হইয়াছে। মুহুর্মুহু হাস্যে, সাধুবাদে ও করতালি ধ্বনিতে রঙ্গমঞ্চ মুখরিত হইয়া উঠিল। এই অভিনব নাটিকার অনুপম উচ্ছ্বসিত প্রশংসা এমন অনেকের মুখে শুনিলাম, যাঁহারা সহজে প্রশংসা করিবার পাত্র নহেন। অভিনয়ের প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত দর্শকগণের কৌতূহল সমভাবে সঞ্জীবিত ছিল।

অক্ষয়ের ভূমিকায় তিনকড়ি বাবুর সঙ্গীত ও অভিনয় চমৎকার হইয়াছে। রসিকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হইয়াছিলেন অপরেশ বাবু। এমন সুন্দর সংযত শুভ্র হাস্যরস সৃষ্টির অসামান্য দক্ষতা বাঙ্গলার রঙ্গমঞ্চে খুব সুলভ নহে। অহীন্দ্রবাবুর 'চন্দ্রবাবু' একটা সৃষ্টি। কবি-কল্পনাকে তিনি ধ্যানে আত্মস্থ করিয়া যে মূর্ত্তি দিয়াছেন, তাহা তাঁহার সাধনাকে গৌরবান্বিত করিয়াছে। 'চিরকুমার সভা'র সভ্য শ্রীশ ও বিপিনের ভূমিকা যথাক্রমে দুর্গাদাসবাবু ও রাধিকাবাবু গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহারা শক্তিশালী নট; অনাড়ম্বর সহজ অভিনয়ে দর্শকগণকে যথেষ্ট আনন্দ দিয়াছেন। অন্যতম সভ্য পূর্ণবাবুর অভিনয়ের স্থানে স্থানে কিঞ্চিৎ আতিশয্য লক্ষিত হইলেও প্রণয়ী যুবকের আকুলতা ও আত্মহারা ভাব সুন্দর ফুটিয়া উঠিয়াছিল। ইঁহার ভাবভঙ্গীতে দর্শকগণ হাসিয়া আকুল হইয়াছিলেন। স্ত্রী-ভূমিকাগুলিও নিখুঁত হইয়াছিল। 'নীরবালার' ভূমিকায় শ্রীমতী নীহারবালার অভিনয়-চাতুর্য্য ও লীলায়িত ভঙ্গী, সমগ্র অভিনয়টিকে এক সজীব হাস্যে সমুজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছিল। দর্শকগণের আগ্রহপূর্ণ অনুরোধে তাঁহাকে প্রত্যেকখানি গানই দুইবার করিয়া গাহিতে হইয়াছে। 'শৈলবালা' ওরফে অবলাকান্তবাবুর অংশটি শ্রীযুক্তা সুশীলাসুন্দরী এবং পুরবালার অংশ শ্রীযুক্তা রাণীসুন্দরী সুন্দর অভিনয় করিয়াছিলেন। অন্যান্য অপ্রধান স্ত্রী ভূমিকাগুলিও সুন্দর অভিনয় হইয়াছিল।[৪৬]

প্রথম অভিনয়ের দিন রবীন্দ্রনাথ উপস্থিত ছিলেন না, ৩ শ্রাবণ শান্তিনিকেতনে 'বর্ষামঙ্গল' অনুষ্ঠানের পরে তিনি কলকাতায় আসেন ৫ শ্রাবণ [মঙ্গল 21 Jul] তারিখে। অতঃপর ৯ শ্রাবণ (শনি 25 Jul] নাটকটির দ্বিতীয় অভিনয় দর্শনের জন্য তিনি স্টার থিয়েটারে উপস্থিত হন। তাঁর উপস্থিতির কথা পূর্ব্বেই সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপিত হয়েছিল।

অহীন্দ্র চৌধুরী লিখেছেন :

কবি ত যথারীতি অভিনয় দেখে চলে গেলেন। সেদিন আর ওঁর সঙ্গে এই নিয়ে কোনো কথা তুলবার সময় পেলাম না আমরা। স্থির হলো, কবির সঙ্গে কথা হবে কাল। সকালবেলায়। ওঁর জোড়াসাঁকোর বাড়িতে। যাবেন অপরেশচন্দ্র আর প্রবোধবাবু। ··· ভোরবেলাতেই হাজির হলাম স্টেজে। সেখান থেকে ওঁদের সঙ্গে জোড়াসাঁকোয়, কবির সন্নিধানে। গিয়ে সাক্ষাৎকার ঘটতেই পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে বসলাম কাছাকাছি। নিকটেই দাড়িয়েছিলেন চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য মশাই। আমি কাছে যাওয়া মাত্রই ইনি আমাকে দেখিয়ে কবিকে বলে উঠলেন— ইনিই চন্দ্রবাবুর অভিনয় করেছেন।

তখন ঠিক বুঝিনি, কেন ওকথা বললেন চারুবাবু। পরে শুনলাম, কবি ভাবতেই পারেননি যে একটি যুবক চন্দ্রমাধবের ভূমিকায় অভিনয় করছে। তাঁর ধারণা হয়েছিল, চন্দ্রবাবু সেজেছে নিশ্চয়ই কোনো প্রবীণ বা প্রৌঢ় অভিনেতা। সপ্রশংস দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে কবি বললেন— বেশ হয়েছে।[৪৭]

বসন্তবিহারী চন্দ্র ১২ ভাদ্র আনন্দবাজার পত্রিকা-য় 'চিরকুমার সভা'র একটি দীর্ঘ সপ্রশংস সমালোচনা লেখেন। তিনি সাধারণ রঙ্গমঞ্চে রবীন্দ্রনাথের নাটক অভিনয় প্রসঙ্গে কিছু উদ্ধারযোগ্য মন্তব্য করেছেন :

বিশ্ববরেণ্য কবি রবীন্দ্রনাথের নাটকগুলির অভিনয় আমাদের দেশের রঙ্গালয়ে খুব কমই হইয়া থাকে। তাহার কারণ অনেক থাকিতে পারে, কিন্তু আমার মনে হয় উপযুক্ত দর্শক ও অভিনেতা উভয়ের অভাবই প্রধান কারণ। শিক্ষিত অভিনেতা মিলে না, একথা আজকাল আর বলা চলে না। সকলের অভিনয় চাতুর্য্য সমান না থাকিতে পারে, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের নাটক অভিনয় করিবার মত অভিনেতার অভাব আজকাল বঙ্গ রঙ্গালয়ে

নাই একথা নিঃসঙ্কোচে বলা যায়। কিন্তু যথেষ্ট পরিমাণ দর্শকের একান্তই অভাব। বাঙ্গলার মুষ্টিমেয় শিক্ষিত সম্প্রদায়, যাঁহারা রবীন্দ্র সাহিত্যের সহিত সুপরিচিত, তাঁহারা সংখ্যায় এত বেশী নন যে তাঁহাদের রুচির উপর নির্ভর করিয়া থিয়েটার চালাইতে পারা যায়। কাজেই যাঁহারা থিয়েটারগুলিকে "বাঁচাইয়া" রাখিয়াছেন বঙ্গের সেই সাধারণ সম্প্রদায়ের রুচি ও আশঙ্কা সম্বন্ধে কর্তৃপক্ষদিগের খরতর দৃষ্টি রাখিতে হয়।[৪৮]

বিভিন্ন ইংরেজি ও বাংলা সংবাদপত্রে 'চিরকুমার সভা'র অভিনয় প্রশংসিত হয়, অভিনয় দর্শকদের আনুকূল্যও লাভ করেছিল। রুদ্রপ্রসাদ চক্রবর্তী 'সাধারণ রঙ্গালয় ও রবীন্দ্রনাথ' [১৪০৬] গ্রন্থে [পৃ ৭৩-৯৭] প্রচুর উদ্ধৃতি-সহ প্রসঙ্গটির বিস্তৃত আলোচনা করেছেন।

শ্রাবণ ১৩৩২-সংখ্যার সাময়িক পত্রগুলিতে রবীন্দ্রনাথের নিম্নলিখিত রচনাগুলি প্রকাশিত হয় :

প্রবাসী, শ্রাবণ ১৩৩২ [২৫। ১। ৪] :

৪৫৭-৬৯ 'ভারতবর্ষীয় বিবাহ' দ্র র° র° ১৩ [শত]। ৫-২০

৫৭৮-৭৯ 'আনন্দ-লহরী'

৫৮৮ [দেশবন্ধুর বিগতপ্রাণ ফোটোগ্রাফের নিচে রবীন্দ্রনাথের স্বহস্তে লিখিত কবিতিকা 'এনেছিলে সাথে করি' ইত্যাদির প্রতিলিপি]

'আনন্দ-লহরী' 'ভারতবর্ষীয় বিবাহ' প্রবন্ধেরই সংযোজিত অংশ—আষাঢ়-সংখ্যা শান্তিনিকেতন-এ পূর্ণাঙ্গ পাঠটি পাওয়া যায়।

শান্তিনিকেতন, শ্রাবণ ১৩৩২ [৬। ৭] :

১৪৪-৪৫ 'বর্ষা মঙ্গল'

১৪৪ ১'ধরণী দূরে চেয়ে' দ্র গীত ২। ৪৬৫-৬৬; স্বর ৩০

১৪৪ ২ 'গহন রাতে শ্রাবণ ধারা' দ্র গীত ২। ৪৪৬; স্বর ৩১

১৪৪ ৩ 'আজি ঐ আকাশ পরে' দ্র গীত ২। ৪৪৭-৪৮; স্বর ৩১

১৪৪-৪৫ ৪'যেতে দাও গেল যারা' দ্র গীত ২। ৪৪৭; স্বর ৩১

১৪৫ ৫ 'জানি হল যাবার আয়োজন' দ্র গীত ২। ৩৩৮; স্বর ৩১

১৪৫ ৬ 'বজ্রমাণিক দিয়ে গাঁথা' দ্র গীত ২। ৪৫০-৫১; স্বর ৩১

১৫০-৫১ 'গান' ['আজিকে এই সকাল বেলাতে'] দ্র গীত ১। ১৩৯; স্বর ৪১, স্বরলিপিকার অনাদিকুমার দস্তিদার।

১৫২-৫৬ 'আলোচনা'

The Modern Review, August 1925 (Vol. XXXVIII, No. 2] :

157-61 'Letters to a Friend'

252 'To Italia'

1913-14-এ অ্যান্ডরুজকে লেখা ২৫টি চিঠি এখানে মুদ্রিত হয়েছে, এগুলি *Letters to a Friend* [1929] গ্রন্থে সংকলিত হয়। 'To Italia' কবিতাটি 'ইতালিয়া' কবিতার অশোক চট্টোপাধ্যায়-কৃত অনুবাদ, তাঁর 'Rabindranath Tagore and Italy' 'Notes' [pp. 251-53]-এর অন্তর্গত।

রবীন্দ্রনাথের গ্রন্থপ্রকাশের ভার ইন্ডিয়ান প্রেসের হাত থেকে নিয়ে প্রকাশনার দায়িত্ব বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়ের উপর অর্পিত হয়েছিল। একটি গ্রন্থপ্রকাশ সমিতি থাকলেও প্রধান দায়িত্ব ছিল প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশের উপর, ফলে রবীন্দ্রনাথের সমস্ত গঞ্জনা ভোগ করতে হয়েছে তাঁকেই। *7 Jun [রবি ২৪ জ্যৈষ্ঠ]-এর চিঠিতে অভিযোগের তালিকা সুদীর্ঘ : 'পূরবীর প্রুফ একটুখানি উঁকি মেরেই গা ঢাকা দিয়েছে। প্রবাহিণীর সংবাদ পাইনি। চয়নিকার এক অংশ এখনো এখানেই পড়ে আছে। গল্পগুচ্ছের একটা ফাইল আমার হাতে এসেছে তাতে নরেন্দ্র ভট্টাচার্যের দৃষ্টির চিহ্ন আছে কিন্তু অতি বিরল। Talks in Japan কি অবস্থায়? ··· Talks in Chinaর যথেষ্ট প্রচার হয়নি বলে লোকে এন্ড্রুজের কাছে নালিশ জানিয়েছে।'[৪৯]

একটি ছাত্রপাঠ্য গদ্যরচনার সংগ্রহ প্রকাশের সংকল্প নেওয়া হয়েছিল, তার নামকরণ-প্রসঙ্গে প্রশান্তচন্দ্রের প্রশ্নের উত্তরে তিনি ১ আষাঢ় [সোম 15 Jun] জানান : 'অবচয়ন কথাটার অর্থ selection। সঙ্কলন কথাটার অর্থ collection। দুটোই কানে ভালো ঠেক্‌চে না। সংগ্রথন বল্লে কেমন হয়? তা'তে সংগ্রহ করা এবং সাজানো দুই বোঝায়। সাহিত্য-সংগ্রথন শুন্‌তে খারাপ লাগে না।'[৫০] অবশ্য শেষপর্যন্ত 'সঙ্কলন' নামটিই গৃহীত হয়। কিন্তু এই চিঠিতেই রবীন্দ্রনাথ প্রায় নিঃশব্দে গঞ্জনার ইঙ্গিতও বহাল রেখেছেন : 'পূরবী? Talks in Japan? চিরকুমার সভা? প্রবাহিণী?'

প্রথমে ঠিক হয়েছিল, দক্ষিণ আমেরিকা যাত্রা, বুয়েনোস আইরেসে থাকার সময়ে ও ফেরার পথে যে কবিতাগুলি লেখা হয় সেগুলি 'বৈকালী' নামে সংকলিত হবে— পরে তার নামকরণ হয় 'পূরবী'। সজনীকান্ত দাস তখন প্রবাসীর কর্মী হলেও বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়ের সঙ্গেও তাঁর কিঞ্চিৎ যোগ ছিল। তিনি লিখেছেন : 'একদিন সেখানে গিয়া শুনিলাম, রবীন্দ্রনাথের নূতন কাব্যগ্রন্থ 'পূরবী'র পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত হইতেছে প্রধানত 'পশ্চিমযাত্রীর ডায়ারি'র কবিতাগুলি লইয়া।··· নূতন কবিতাগুলির সঙ্গে··· পুরাতন ও পুস্তকাকারে অপ্রকাশিত কবিতাগুলিও ছাপাইবার প্রস্তাব হইল। আধুনিক পুরাতন খুঁজিতে খুঁজিতে অতি পুরাতন অনেকগুলি কবিতাও আবিষ্কৃত হইল— অনেকগুলি স্বদেশী আমলের বিখ্যাত কবিতা— যাহা এতাবৎকাল পরিত্যক্ত হইয়া আসিয়াছে। আমার খাতায় নকল ছিল, আমিই সেগুলি সরবরাহ করিলাম। বইখানির তিন ভাগ হইল, "পূরবী"-অংশে হালী পুরাতন কবিতা, "পথিক"-অংশে নূতন ডায়ারির কবিতা এবং "সঞ্চিতা"-অংশে হারাইয়া যাওয়া পুরাতন কবিতা।"[৫১]

1924-এ জাপানভ্রমণের সময়ে রবীন্দ্রনাথ যে-বক্তৃতাগুলি দিয়েছিলেন এল্‌ম্‌হার্স্ট তার অধিকাংশেরই অনুলিখন করেছিলেন, আমরা তা আগেই জেনেছি। তাদের মধ্যে কতকগুলি মডার্ন রিভিয়ু বা বিশ্বভারতী কোয়ার্টার্লি-তে মুদ্রিত হয়েছিল। সবগুলি নিয়ে *Talks in China*-র মতো *Talks in Japan* মুদ্রণেরও পরিকল্পনা নেওয়া হয় এবং তা বিজ্ঞাপিতও হয়েছিল— কিন্তু অদ্যাবধি তা প্রকাশিত হয়নি। তবে অদূর ভবিষ্যতে এটি সুসম্পাদিত হয়ে প্রকাশিত হবে বলে আশা করা যায়।

নবরচিত গানগুলি 'প্রবাহিণী' নামে প্রকাশের কথা ভাবা হচ্ছিল; 'চিরকুমার সভা' 'প্রজাপতির নির্বন্ধ'-এর নাট্যরূপ।

কিন্তু বর্তমান বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগের মতো তৎকালীন বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়েরও গয়ংগচ্ছ মনোভাবে বিরক্ত হয়ে রবীন্দ্রনাথ ৪ আষাঢ় প্রশান্তচন্দ্রকে লিখলেন : 'আমি বিলাত যাবার আগে আমার কোনো বই ছাপা

হবে বলে বোধ হচ্চে না।'[৫২] *6 Jul [সোম ২২ আষাঢ়] আবার তাড়া দিয়েছেন : 'পূরবীর প্রুফ দিচ্চ না কেন?'[৫৩] প্রশান্তচন্দ্র অবশ্য 8 Jul রথীন্দ্রনাথ মারফৎ জানিয়েছেন, ওঁকে বল্‌বেন আজ পূরবীর প্রুফ একগোছা পাঠাব।'

*7 Jun [28 জ্যৈষ্ঠ]-এর পত্রে রবীন্দ্রনাথ যে 'গল্পগুচ্ছের একটা ফাইল'-এর উল্লেখ করেছেন, সেটি কিছু বিভ্রান্তিকর। স্বপন মজুমদার-সংকলিত 'রবীন্দ্রগ্রন্থসূচি' [১৩৯৫]-তে দেখা যাচ্ছে, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয় থেকে ৫ শ্রাবণ ১৩৩৩ [15 Sep 1926]-এর ভূমিকা-সংবলিত গল্পগুচ্ছ-এর একটি সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে; এটি যদি সেই বইয়েরই ফাইল হয়, তাহলে বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগের বর্তমান কাজকর্মকে বিশেষভাবে নিন্দনীয় বলার কোনো কারণ নেই— বলতে হয়, ঐতিহ্যের অনুসরণ তারা যথাযথভাবেই করে চলেছেন!

এই প্রসঙ্গে একটি প্রায়-অপরিচিত তথ্যের উল্লেখ করা যায়। অগ্র ১৩৩১-সংখ্যা প্রবাসী-তে বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়ের পক্ষ থেকে মুদ্রিত একটি বিজ্ঞাপন বিষয়ে উক্ত সংখ্যার 'বিবিধ প্রসঙ্গ'তে [পৃ ২৮১] লেখা হয় :

> "বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়" বিজ্ঞাপন দিয়াছেন, রবিবাবুর ছোট গল্পের বইগুলি হইতে ১৫টি ছোটগল্প নির্বাচন করিয়া দিবার জন্য তিনটি পুরস্কার দেওয়া হইবে। রবিবাবু নিজে একটি তালিকা করিয়া দিয়াছেন। সেই তালিকাভুক্ত গল্পগুলির নামের সঙ্গে যাঁহাদের তালিকার নামগুলি মিলিয়া যাইবে, কিম্বা অনেকটা মিলিবে, তাঁহারা মিলের পরিমাণ অনুসারে পুরস্কার পাইবেন।
>
> রবীন্দ্রনাথের কবিতাগুলি হইতে উৎকৃষ্টতম কবিতা সমূহ বাছিয়া দিবার জন্য যখন বিজ্ঞাপন দেওয়া হয় তখন আমরা যে-মর্ম্মের কথা বলিয়াছিলাম, এখনও সেইরূপ বলিতেছি; — নির্বাচন উপলক্ষে কবির গল্পগুলি নূতন করিয়া পড়িবার আনন্দ ও উপকার লাভই আসল লাভ, পুরস্কারটা আনুষঙ্গিক উপরি পাওনা মাত্র। সুতরাং পুরস্কার যদিও তিনটি, কিন্তু আসল পুরস্কার যাহা তাহা নির্বাচক মাত্রেরই হইবে।
>
> ইহার মধ্যে একটা কৌতূহলের বিষয়ও আছে। রবিবাবু কোন গল্পগুলিকে শ্রেষ্ঠ মনে করেন তাহা জানিবার ইচ্ছা পাঠকদের হওয়া স্বাভাবিক। পিতামাতার স্নেহ কেবল কৃতী গুণবান সন্তানের উপরই পড়ে না, অকৃতী অক্ষমের উপরও বিশেষ করিয়া পড়ে।
>
> মানবসন্তানের সম্বন্ধে কবিদের মমতা এইরূপ উভয় দিকে ধাবিত হয় কিনা, অকবিরা নিজেদের অভিজ্ঞতা হইতে বলিতে পারিবেন না। কিন্তু যাঁহাদের গল্পের তালিকার সহিত রবিবাবুর তালিকার বেশী গরমিল হইবে, তাঁহারা এই মনে করিয়া কৌতুক অনুভব ও সান্ত্বনা লাভ করিতে পারিবেন, যে, কবি তাঁহার মানস সন্তানদের সম্বন্ধে কেবল গুণ-অনুসারে বিচার করিতে পারেন নাই, হয়ত জনক-জননীসুলভ দুর্বলতাও আছে![৫৪]

পুরস্কারপ্রাপকদের নাম জানা গেলেও তাঁদের নির্বাচিত ও রবীন্দ্রনাথ-মনোনীত গল্পের তালিকাটি এখনও পাওয়া যায়নি।

11 Dec 1924 [২৬ অগ্র ১৩৩১] প্রশান্তচন্দ্র রথীন্দ্রনাথকে খবর দেন : 'কবিতা-নির্ব্বাচন প্রতিযোগীতার [য] ফল আজ বের করছি। প্রথম ও দ্বিতীয় পুরস্কার পেয়েছেন দু'জন মেয়ে! একজন ফরিদপুরে, আরেকজন ভবানীপুর; দুজনের কাউকে আমরা চিনি না।' 3 Apr 1925 [২০ চৈত্র] কর্ম্মসমিতির অধিবেশনে গল্প-প্রতিযোগিতার ফল অনুমোদিত হয়—প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অধিকার করেন যথাক্রমে ইন্দুলেখা দাসী, মন্মথনাথ সিংহ ও নির্মলকুমারী মহলানবিশ এবং সান্ত্বনা পুরস্কার পান চারজন— অনুপম দত্ত, আশাবতী দেবী, কালিদাস নাগ ও পুষ্পলতা দেবী; সিদ্ধান্ত হয়, প্রথম তিনজন ১৫ টাকা দামের ও সান্ত্বনা পুরস্কার-প্রাপকগণ ৬ টাকা দামের বই পাবেন।

১৩১৬ সালে রবীন্দ্রনাথের কবিতা-সংকলন 'চয়নিকা' প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল— বাছাই করেছিলেন চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, অজিতকুমার চক্রবর্তী প্রমুখ রবীন্দ্রানুরাগীরা— পরে এর পাঁচটি সংস্করণ বা পুনর্মুদ্রণ হয়। পরবর্তী সংস্করণ প্রকাশিত হল নূতন পরিকল্পনায়, 'পাঠ পরিচয়'-এ প্রকাশক প্রশান্তচন্দ্র লিখলেন :

কিছুদিন আগে রবীন্দ্রনাথের ২০০টি ভালো কবিতা বাছিয়া দিবার জন্য, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয় হইতে একটি প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করা হয়। এই প্রতিযোগিতায় ৩২০ জন পাঠক যোগ দিয়াছিলেন। তাহাদের ভোট সংখ্যা দ্বারা কবিতাগুলির জন-প্রিয়তা সম্বন্ধে কিছু আভাষ পাওয়া যায়।

বর্ত্তমান সংস্করণ চয়নিকা মোটামুটি এই লোক-প্রিয়তা অনুসারে সংকলন করা হইয়াছে। সূচিপত্রে প্রত্যেকটি কবিতার পাশে তাহার ভোট সংখ্যা উল্লেখ করা হইল। আমরা কিন্তু শুধু ভোট সংখ্যা দিয়া বাছাই করি নাই। প্রত্যেকটি প্রচলিত বই হইতে যাহাতে কিছু কিছু কবিতা থাকে, এবং কোনো বিশেষ সময় বা বিশেষ ধরণের লেখা যাহাতে একেবারে বাদ না পড়ে সেদিকেও লক্ষ্য রাখিতে চেষ্টা করিয়াছি। এই জন্য ভোট কম পাইয়াছে এমন কোনো কোনো কবিতাও রাখা হইল। আবার একই বই হইতে যাহাতে খুব বেশী কবিতা না যায় এই জন্য ভোট বেশী পাইয়াছে এমন কবিতাও বাদ দেওয়া হইয়াছে। স্থানাভাবের জন্য খুব দীর্ঘ কবিতাগুলিও রাখা যায় নাই।

এই, ‘তৃতীয় (বিশ্বভারতী) সংস্করণ’-এর ‘পাঠ পরিচয়’ রচনার তারিখ ‘১৩৩২ ফাল্গুন’, কিন্তু স্বপন মজুমদার-প্রদত্ত বেঙ্গল লাইব্রেরি ক্যাটালগে উল্লিখিত প্রকাশের তারিখ 15 Sep 1926 [২৯ ভাদ্র ১৩৩৩]— এটিও বিশ্বভারতী-ঐতিহ্যের আর-একটি মহিমার দৃষ্টান্ত!

তবে এই সময় থেকেই প্রধানত প্রশান্তচন্দ্রের চেষ্টায় বাংলা বানানে কিছু সংস্কারের প্রয়াস দেখা দিয়েছে। ও বিশ্বভারতী-প্রকাশিত গ্রন্থে কয়েকটি প্রাতিষ্ঠানিক রীতি প্রবর্তনের সূচনা হয় :

আদ্য ্যা-ধ্বনি দেখাইবার জন্য সর্ব্বত্র “ে”-কার ব্যবহার করা হইয়াছে। ইহাতে এ-ধ্বনি আর ্যা-ধ্বনির পার্থক্য নির্দ্দেশ করা সহজ হইবে। যেমন, “দেখো” (=দেখিও) আর “দেখো” (দ্যাখো=দেখহ), ফেলো (=ফেলিও) আর “ফেলো” (ফ্যালো=ফেলহ) প্রভৃতি।

অ-কারের ও-ধ্বনি ’-চিহ্ন (ইলেক চিহ্ন) দ্বারা নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। যেমন— “করে” আর “ক’রে” (কোরে=করিয়া অর্থে); “দলে” (দলন করে) আর “দ’লে” (দলন করিয়া)।

উপরোক্ত চিহ্নগুলি [য] যথাসম্ভব ব্যবহারের চেষ্টা করা হইয়াছে, কিন্তু ছাপার ত্রুটিতে বইখানির সকল স্থানে ঠিক মত ব্যবহৃত হয় নাই।

তবে কবিতার ক্ষেত্রে এইরূপ সংস্করণ প্রকাশিত হলেও গল্পের অনুরূপ পাঠক-পছন্দ সংস্করণ প্রকাশ পেয়েছিল বলে জানা যায় না।

যাই হোক্, রবীন্দ্রনাথের গঞ্জনা বা অন্য-কোনো কারণে বিশ্বভারতী গ্রন্থালয় থেকে প্রথম-প্রকাশিত গ্রন্থ হিসেবে ‘পূরবী’ প্রকাশিত হল শ্রাবণ ১৩৩২-এ; গ্রন্থটির আখ্যাপত্র ও প্রকাশ-সংক্রান্ত অন্যান্য তথ্য এখানে উদ্ধৃত করছি :

পূরবী / শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর / বিশ্বভারতী-গ্রন্থালয় / ১০ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।

[পরপৃষ্ঠায় :] বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়। প্রকাশক — শ্রীকরুণাবিন্দু বিশ্বাস। ১০ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ··· মূল্য — ২; বাঁধাই — ২।।; মোটা এন্টিক কাগজে— ২ ০ ও ৩।০ / ইউ, রায় এণ্ড সন্স প্রেসে শ্রীকার্তিকচন্দ্র বসু কর্তৃক মুদ্রিত। / ১০০ গড়পার রোড্, কলিকাতা।

উৎসর্গ / বিজয়ার করকমলে—

পৃষ্ঠাসংখ্যা—২+২+৪+২+১-৬১ [পূরবী]+২+৬৩-২২৪ [পথিক]+২+২২৫-৫৪ [সঞ্চিতা]; মুদ্রণসংখ্যা : ২১০০।

মুদ্রিত গ্রন্থটি দেখে সজনীকান্ত দাস অত্যন্ত হতাশ হন; তিনি লিখেছেন : ‘শ্রাবণ মাসের মাঝামাঝি ‘পূরবী’ বাহির হইল।···অসংখ্য ভুল এবং বিশ্রী ভুলে ভরা বইখানি আমার শিরঃপীড়ার কারণ হইল। রবীন্দ্রনাথ তখন জোড়াসাঁকোতেই ছিলেন। অবিলম্বে সংশোধিত কপিখানি সরাসরি তাঁহার নিকট দাখিল করিলাম। তিনি অতি সংযত ধীরস্থির পুরুষ; সেদিন দেখিলাম, রাগে আত্মবিস্মৃত হইলেন এবং তখনই কাহাকে যেন ডাকিয়া বিশ্বভারতীর তদানীন্তন কর্তৃপক্ষের মুণ্ডপাত করিতে করিতে হুকুম দিলেন, সব আগুনে পুড়িয়ে ফেলে নতুন

ক'রে ছাপাও।'[৫৫] আমরা অবশ্য 'শিরঃপীড়ার কারণ' হবার মতো ভুল প্রথম সংস্করণে দেখতে পাইনি, রবীন্দ্রনাথের তথাকথিত নির্দেশও পালিত হয়নি— 'পূরবী'র দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৩৩৮-এ।

বলা বাহুল্য, উক্ত 'বিজয়া' হলেন ভিক্টোরিয়া ওকাম্পো; বইটির একটি কপি 29 Oct [বৃহ ১২ কার্তিক] তাঁকে পাঠিয়ে রবীন্দ্রনাথ লেখেন : 'I am sending to you a Bengali book of poems which I wish I could place in your hand personally. I have dedicated it to you though you will never be able to know what it contains. A large number of poems in this book were written while I was in San Isidro. My readers who will understand these poems will never know who my Vijaya is with whom they are associated. I hope this book will have the chance of a longer time with you than its author had.'[৫৬] কেতকী কুশারী ডাইসন ওকাম্পো-সংগ্রহশালায় এই কপিটির পরিবর্তে 'To/ Vijaya/ with love/ Rabindranath/ July 30/ 1940' [১৪ শ্রাবণ ১৩৪৭] তারিখে স্বাক্ষরিত দ্বিতীয় সংস্করণের একটি কপি দেখতে পেয়েছেন। তিনি আরও জানিয়েছেন, 1960-এ প্রকাশিত ক্ষিতীশ রায়-অনূদিত *Poems from PURAVI* পুস্তিকা পাঠ করে ওকাম্পো দুধের সাধ ঘোলের সাহায্যে কিছুটা মেটাতে পেরেছিলেন![৫৭]

প্রায় সমকালে রবীন্দ্রনাথের একটি গদ্যগ্রন্থ 'সঙ্কলন' নামে মুদ্রিত হয়, যার নামকরণ-প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ 'অবচয়ন' 'সংগ্রথন' 'সাহিত্য-সংগ্রথন' প্রভৃতি শব্দ নিয়ে দোলাচল ছিলেন, পরে প্রচলিত 'সঙ্কলন' নামটিই গৃহীত হয়। করুণাবিন্দু বিশ্বাস-প্রকাশিত ও ১এ, রামকিষণ দাস লেন'-এর 'নিউ আর্টিষ্টিক প্রেস—শ্রীশরৎশশী রায় কর্তৃক মুদ্রিত' এক টাকা চৌদ্দ আনা দামের ৪+৩৮৫ পৃষ্ঠার বিরাট গ্রন্থটির 'প্র—'-লিখিত ভূমিকার তারিখ 9 Aug 1925 [২৪ শ্রাবণ ১৩৩২]। প্রশান্তচন্দ্র লেখেন :

> রবীন্দ্রনাথের কাব্য-গ্রন্থাবলী হইতে চয়ন করিয়া একখানি কবিতার বই "চয়নিকা" অনেকদিন হইল বাহির করা হইয়াছে এবং ইহার অনেকগুলি সংস্করণও হইয়া গিয়াছে। কিন্তু গদ্য-গ্রন্থাবলী হইতে বাছিয়া পাঠ্য-পুস্তক ব্যতীত কোনো বই এ পর্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। এইবার আমরা গদ্য-গ্রন্থাবলী হইতে বাছিয়া "সঙ্কলন" বাহির করিতেছি। গল্প ও উপন্যাস ভিন্ন আর সকল রকম লেখাই ইহাতে আছে। কোনো বইতে এখনও গ্রথিত হয় নাই এমন লেখাও "সঙ্কলনে" দেওয়া হইল। লেখাগুলি বিষয় অনুযায়ী ভাগ করিয়া লেখার তারিখ অনুসারে সাজানো হইয়াছে।

এখানেও অনুসৃত বানানরীতি সম্পর্কে সংক্ষেপে উল্লেখ করা হয়েছে। বইটিতে সাময়িকপত্রে মুদ্রিত ও এতাবৎ-অগ্রন্থিত 'শিক্ষার বাহন' 'শিক্ষার মিলন' প্রভৃতি সহ মোট ত্রিশটি প্রবন্ধ এবং 'ছিন্নপত্র', 'জীবনস্মৃতি' 'য়ুরোপ-যাত্রী[র ডায়ারি]', 'জাপানযাত্রী' ও 'পশ্চিমযাত্রীর ডায়ারি'র কিয়দংশ মুদ্রিত হয়— শেষোক্ত রচনাটিও এই প্রথম গ্রন্থভুক্ত হল।

রবীন্দ্রনাথের পুস্তকপ্রকাশ সম্পর্কে আরও কিছু সংবাদ এই সুযোগে বলে নেওয়া যায়। পাঠকরা হয়তো জানেন, চিনের বক্তৃতাবলি মোটামুটি বক্তৃতার কালানুক্রম অনুসরণ করে 1924-এ প্রকাশিত হয়েছিল, কিন্তু তার পরেই অজ্ঞাত কোনো কারণে গ্রন্থটির প্রচার বন্ধ করে দিয়ে বক্তৃতার স্থান-কালের চিহ্ন বর্জন করে বিষয়ানুক্রমে বইটি 1925-এ পুনর্মুদ্রিত হয়, এই পাঠটিই সাধারণভাবে পরিচিত ছিল পাঠকসমাজে। পুরো ঘটনাটির অন্তরালবর্তী নাটকটির যবনিকা উন্মোচিত হয়েছে 21 Nov 1924 [৮ অগ্র ১৩৩১] তারিখে শান্তা চট্টোপাধ্যায়কে লেখা প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশের পত্রে :

Talks in China বইখানা antique কাগজে linotypeএ ছাপানো হয়েছিল কবি রওনা হবার পনেরো দিন আগে [অর্থাৎ মোটামুটি ২০ ভাদ্র ১৩৩১ (5 Sep 1924) নাগাদ]। বিশ্বভারতী আপিসের through দিয়ে হয় নি— সুরেনবাবু direct প্রেসের কাছে প্রুফ পাঠিয়ে ছাপিয়ে ছিলেন, আপিসের through দিয়ে যদি দেরী হয় এই ভয়ে। বইখানার আর কোনও দোষ নেই—ছাপার ভুলও খুবই সামান্য, শুধু margin কম আছে, আর পৃষ্ঠার অঙ্কটায় bracket দিয়েছে— (27) এইরকম— এইজন্য দেখ্‌তে একটু খারাপ হয়েছে। কবি তা'তে এত দুঃখিত হলেন যে আমরা সমস্ত editionটা suppress করতে বাধ্য হয়েছি। কবি তারপর আবার **অল্পস্বল্প** বদ্‌লিয়ে mss পাঠিয়েছেন, এখন সমস্ত বইখানা reprint করাচ্ছি।'[৫৮]

বদল অবশ্য 'অল্পস্বল্প' নয়, চিনে রবীন্দ্রনাথের ভাষণের প্রতিক্রিয়া বোঝার পক্ষে কালানুক্রমিক সংকলনের রীতি অনেক বেশি উপযোগী ছিল। 1 Jan 1925 [১৭ পৌষ ১৩৩১] প্রশান্তচন্দ্র রথীন্দ্রনাথকে জানিয়েছেন : 'Talks in China ছাপা হচ্ছে, কয়েকদিনের মধ্যেই পাঠাব।' এটিই এতাবৎ-প্রচলিত সংস্করণ, যদিও এখন প্রথম সংস্করণের পাঠটি আর দুর্লভ নয়।

শান্তা দেবীকে লেখা উক্ত চিঠিটি অন্য-একটি কারণেও মূল্যবান। বাংলা বানানের সংস্কার সম্পর্কে বিশেষ কোনো চেতনা তখন গড়ে ওঠেনি, কোনো প্রকাশন-সংস্থা এই বিষয়ে অন্তত একটি প্রাতিষ্ঠানিক রীতি ['House Style'] অনুসরণ করার কথাও চিন্তা করেনি, তখন প্রশান্তচন্দ্র এই নিয়ে যথেষ্ট ভাবনা ও সময় ব্যয় করেছেন। অবশ্য ব্যাপারটি ঘটেছে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আলোচনা করেই। প্রশান্তচন্দ্র লিখেছেন : 'রবিবাবুর সমস্ত বাংলা লেখার একটা standard spelling করবার কথা ঠিক হয়েছে। কবি এ সম্বন্ধে আমাকে এই কথা বলে' গেছেন যে সুনীতি চাটুয্যেকে জিজ্ঞাসা করে' একটা standard list যেন আমি তৈরি করে' ফেলি। নিজে কতকগুলি কথা সম্বন্ধে ওঁর মতও বলে' গেছেন, সেগুলি note করে নিয়েছি। বাকি সব কথা নিয়ে সুনীতির সঙ্গে বসে' কালিদাস আর আমি একটা list তৈরি কাজ আরম্ভ হয়ে গেছে, তিন চারদিন আমরা অনেক কাজ এগিয়ে এনেছি। যে-সব বিষয়ে কি করা ঠিক বুঝতে পারছিনে, সেগুলি এখন রেখে দিচ্ছি, কবিকে জিজ্ঞাসা করে' স্থির করব। এসব বিষয়ে আপাতত কবি original mss. যেমন লিখেছেন ঠিক তেমনি ছাপা হবে।' এরই পরিণতি 1935-36-এ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোগে গঠিত বানান-সংস্কার সমিতি। অন্যের মত অনুসরণ করার ব্যাপারে বাঙালির সবসময়েই আপত্তি, তাই বানানবিধি নির্ধারণ করে কোনো ফলই হয়নি, প্রত্যেকেই নিজের ইচ্ছামতো বানান লিখে গেছেন বা লেখেন— বিশেষত ক্রিয়াপদের বানানে, রবীন্দ্রনাথও তার ব্যতিক্রম নন— আর 'কবি original mss. যেমন লিখেছেন ঠিক তেমনি ছাপা হবে' সিদ্ধান্তটিও বিপজ্জনক, রবীন্দ্রনাথ দ্রুত লিখতে গিয়ে নিজের স্বীকৃত বানানরীতিও মানেননি, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়ও প্রথম দিকে কোনো নির্দিষ্ট পরিকল্পনা অনুসরণ করেনি, তাই এক ধরনের নৈরাজ্যের নিদর্শন সেখানেও চোখে পড়ে।

বিশ্রামের নির্দেশ থাকলেও শ্রাবণ মাসে রবীন্দ্রনাথকে কয়েকবার শান্তিনিকেতন ও কলকাতার মধ্যে যাতায়াত করতে হয়। বিশ্বভারতী সংসদের অধিবেশনে তিনি খুব নিয়মিত উপস্থিত থাকতেন না, কিন্তু ৫ শ্রাবণ (মঙ্গল 21 Jul] সন্ধ্যা ৬টায় জোড়াসাঁকো ভবনে অনুষ্ঠিত সংসদের তৃতীয় অধিবেশনে তিনি কিছুক্ষণের জন্য সভাপতিত্ব করে অ্যান্ডরুজকে দায়িত্ব দিয়ে সভাস্থল পরিত্যাগ করেন। প্রথমে তিনি তাঁর আসন্ন য়ুরোপ-সফরের বিষয়ে বলেন, তিনি রম্যাঁ রলাঁকে ভারতে আসার জন্য পীড়াপীড়ি করবেন এবং বার্ট্রান্ড রাসেল ও য়ুরোপের শ্রেষ্ঠ মনীষীদের বিশ্বভারতীর লক্ষ্য সম্বন্ধে আগ্রহী করার জন্য চেষ্টা করবেন। তাঁর অনুপস্থিতি ও অস্বাস্থ্যের জন্য বিশ্বভারতীর প্রত্যক্ষ দায়িত্ব থেকে অবসর নিয়েছেন, কিন্তু সংসদের ও বিভিন্ন কার্যকরী সমিতির সদস্যদের সমবেত চেষ্টায় কাজ যথাযথভাবে অগ্রসর হচ্ছে দেখে তিনি খুশি হয়েছেন।

সংসদের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা-সদস্য ও রবীন্দ্রনাথের বন্ধু সুশীলকুমার রুদ্রের জীবনাবসানের [30 Jun 1925] জন্য শোকপ্রস্তাব তিনি স্বয়ং উপস্থিত করেন। প্রস্তাব নেওয়া হয় : Resolved that this meeting of the Samsad places on record its sense of loss at the death of Susil K. Rudra, Principal, St. Stephen's College, Delhi, a foundation member of the Visva-Bharati and a member of the Samsad for some time. In its incipient stage the Visva-Bharati has had the benefit of his active sympathy and help. As one who embodied in himself the ideals of the Visva-Bharati his loss as an irreparable one. The Samsad tenders to the bereaved family its heartfelt sympathy and condolence.' রবীন্দ্রনাথ-উত্থাপিত তৃতীয় প্রস্তাবে রম্যাঁ রলাঁকে সর্বসম্মতিক্রমে বিশ্বভারতীর সাম্মানিক সদস্য নির্বাচিত করা হয়। এর পরে অ্যান্ডরুজের উপরে সভাপতির দায়িত্ব দিয়ে রবীন্দ্রনাথ সভাস্থল পরিত্যাগ করেন।

এই অধিবেশনে অনেকগুলি গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব গৃহীত হয়, সেগুলি নিয়ে আমরা প্রাসঙ্গিক তথ্যে আলোচনা করব।

৭ শ্রাবণ স্বর্ণকুমারী দেবীর জ্যেষ্ঠা কন্যা হিরন্ময়ী দেবীর আদ্যশ্রাদ্ধ অনুষ্ঠিত হয়। রবীন্দ্রনাথ হয়তো সেখানে উপস্থিত ছিলেন।

৯ শ্রাবণ [শনি 25 Jul] তিনি স্টার থিয়েটারে চিরকুমার সভা-র দ্বিতীয় অভিনয়ে উপস্থিত ছিলেন, বিষয়টি নিয়ে আমরা আগেই আলোচনা করেছি।

ক্যাশবহির হিসাব থেকে অনুমিত হয়, রবীন্দ্রনাথ ১৫ শ্রাবণ [31 Jul] কলকাতা থেকে শান্তিনিকেতনে ফিরে আসেন।

7 Aug [শুক্র ২২ শ্রাবণ] তিনি একটি ছোটো মেয়েকে লেখেন : 'ডাক্তারের কড়া হুকুমে চিঠিপত্র লেখা কমিয়ে দিতে হয়েছে।'[৫৯] একই দিনে নলিনী মৈত্রকে [তালুকদার] লেখেন : 'তোমার খাতাখানি পড়ে দেখলুম। ভালো লাগল। তোমার মনটি খুব ছেলেমানুষ আছে। অনেক সময় তুমি নিজেকে মিথ্যা পীড়ন করেছ।'[৬০] এই-সব খুচরো কাজের পরিপ্রেক্ষিতে তিনি 2 Aug [১৭ শ্রাবণ] ভিক্টোরিয়া ওকাম্পোকে লিখেছিলেন :

My time in this country is constantly pelted with petty claims by numerous individuals, each of whom believes that he is the only one who deserves to be attended to. There is no escape from them unless I run away from India. Roma[i]n Rolland has thought of a sanitorium [sic] near his own place in Switzerland where he will arrange to intern me as long as doctor advises. Our steamer sailing on the 15th August will reach Genoa somewhere about the beginning of September. I wish you could be there to welcome me. But I suppose it is not going to happen.[৬১]

তিনি লেখেন, কর্মহীনতার অবসরে সান ইসিদ্রোর স্মৃতি তাঁর মনে গুঞ্জিত হয়, তখন কবিতার যে ফুল ফুটে উঠেছিল 'I can assure you, most of them will remain fresh long after the time when the laboriously built towers of my beneficent deeds will crumble into oblivion.'

য়ুরোপযাত্রার জন্য রবীন্দ্রনাথ কলকাতায় আসেন 9 Aug [রবি ২৪ শ্রাবণ]। কিন্তু আনন্দবাজার পত্রিকা ২৮ শ্রাবণ লেখে : 'ডাঃ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গতকল্য সুইজারল্যাণ্ডে যাত্রা করিবার কথা ছিল। যাত্রার প্রাক্কালে ডাঃ নীলরতন সরকার তাঁহাকে জানান যে তাঁহার হৃদ্‌যন্ত্রের পীড়া সম্পূর্ণ আরাম হয় নাই। তাঁহাকে যাত্রা স্থগিত রাখিতে উপদেশ দেওয়া হয়। ফলে রবীন্দ্রনাথ যাত্রা স্থগিত রাখিয়াছেন। তাঁহাকে সম্পূর্ণ বিশ্রাম লইতে এবং যথাসম্ভব কম লোকের সহিত সাক্ষাৎ করিতে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে।'[৬২] 17 Aug [১ ভাদ্র] রবীন্দ্রনাথ রলাঁকে টেলিগ্রাম করে যাত্রা স্থগিত রাখার কথা জানান। আশাহত রলাঁ 'দিনপঞ্জী'-তে লেখেন :

রবীন্দ্রনাথ আমাদের এক নতুন আশাভঙ্গের কারণ ঘটিয়েছেন। গত তিন মাস ধরে তিনি আমাদের জানাচ্ছিলেন, আগষ্টে ভিলন্যভে উপস্থিত হবেন। জুলাইয়ের মাঝামাঝি পর্যন্ত তাঁর ছেলে রথীন্দ্রনাথের চিঠিপত্রে জোর দিয়ে বলা হচ্ছিল যে, ১ আগস্ট তিনি বোম্বাই থেকে যাত্রা করবেন। পরে, এক নতুন চিঠিতে কাজের অজুহাতে যাত্রা ১৫ আগস্ট পেছিয়ে গেল। গতকাল (১৭ আগস্ট) কালিদাস নাগের একটি কথা আমাদের উদ্বেগে ফেলেছে : তিনি লিখেছেন যে, ইউরোপে তাঁর বিরুদ্ধে কিছু কিছু আক্রমণ তাঁকে অত্যন্ত আহত করেছে এবং তিনি যাবেন কিনা সে-সম্পর্কেও আর তিনি নিশ্চিত নন। অবশেষে আজ এক টেলিগ্রামে স্বাস্থ্যের কারণ দেখিয়ে রবীন্দ্রনাথ তাঁর যাত্রা নিশ্চিতভাবে খারিজ করেছেন। তাঁকে অভ্যর্থনার সমস্ত আয়োজন করা হয়েছিল : অতেল বির্‌ঁ, ভালমঁর চিকিৎসকরা; যেখানে শান্তি ও স্বাধীনতার জন্যে নারী-লীগের উদ্যোগে বার্ষিক আন্তর্জাতিক পুনর্মিলন অনুষ্ঠিত হচ্ছে। সেই খনঁ-তে সমস্ত দেশের যৌবন রবীন্দ্রনাথকে অভিবাদন ক'রে আনন্দিত হতো; — আমার সঙ্গে বসে প্রকাশক রনিজে প্রকাশনা এবং ইউরোপীয়-এশীয় বুদ্ধিজীবীদের সহযোগিতায় এক পরিকল্পনা তৈরি করেছিলেন তাঁকে পেশ করার জন্যে। সবকিছু ব্যর্থ হয়ে গেল। এই ভারতীয়দের উপরে নির্ভর ক'রে কোনো কিছু শুরু করা প্রায় অসম্ভব : উৎসাহ এবং নিরুসাহের প্রতিটি ঝাপ্টার কাছে ওরা আত্মসমর্পণ করে; ওদের পাশে পাশে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়, নিজেদের পরিকল্পনার শেষপর্যন্ত নিয়ে যাবার জন্যে ওদের পিছনে লেগে থাকতে হয়। এমন এক কাজের জন্যে সময় দিয়ে এতো নিজেকে ক্লান্ত করেছি, যার সম্পর্ক আমার চেয়ে ওদের সঙ্গে অনেক বেশি এবং যে-কাজে ওদের কাছ থেকে··· কোনো সাহায্যই পাইনি। তাঁর সফর খারিজ করার ফলে যা কিছু নস্যাৎ হয়ে গেল রবীন্দ্রনাথ নিজে তার ধারণাও করতে পারবেন না।[৬৩]

অত্যন্ত কঠিন মন্তব্য! কিন্তু রবীন্দ্রনাথের সফরসূচির সম্পর্কে কথাটা সত্য। সমস্ত পরিকল্পনা করে এমন তুচ্ছ কারণে বা অকারণে তিনি সফর বাতিল করেছেন, তাতে অন্য পক্ষের কী অসুবিধা তা তিনি চিন্তাও করেননি। অসুস্থতার জন্য সফর বাতিল করতে হলে কিছু বলার নেই, কিন্তু অনেক সময়ে সে যুক্তিও খাটে না। ইতালি সফরে মিলানের আবহাওয়ায় তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন— কিন্তু মিলান ছেড়ে আসার পরেই তাঁর শারীরিক উন্নতির ফলে ইতালির অন্যান্য শহর বা সুইজারল্যান্ডে যাওয়া কঠিন ছিল না, দেশেও তাঁর জন্য এমন-কিছু গুরুতর কর্তব্য-কর্ম অপেক্ষা করছিল না যার জন্য তাঁকে তাড়াতাড়ি দেশে ফিরে আসতে হবে ও তার পরক্ষণেই য়ুরোপে যাবার জন্য অস্থির হয়ে উঠতে হবে! একে অবাঞ্ছিত খেয়াল ছাড়া আর কিছু বলে ব্যাখ্যা করা যায় না।

18 Aug রলাঁ রবীন্দ্রনাথকে এই কথাগুলিই লিখলেন অনেক সংযত ভাষায়; এমন সুযোগ আবার সৃষ্টি করা দুরূহ সে-কথা জানিয়ে লিখলেন : At any rate, spare your health! It is precious to us. It is necessary for the world that you should live long.... Do not altogether give up the idea of coming to have yourself treated at Valmont! *You would be able to effect a complete cure.* It would be wrong not to avail oneself of this treatment.'[৬৪]

রবীন্দ্রনাথ প্রায় কৈফিয়তের ভঙ্গিতে এই চিঠির উত্তর দিয়েছেন 23 Sep [৭ আশ্বিন] তারিখে :

...Personally I do not think that my over cautious doctor was wise in holding me back. He does not fully realise how great is the mental strain that my stay in India imposes upon me. It is the moral loneliness which is a constant and invisible burden that oppresses me most. I

wish it were possible for me to join hands with Mahatma Gandhi and thus at once surrender myself to the current of popular approbation. But I can no longer hide it from myself that we are radically different in our appreciation and pursuit of truth. Today to disagree with Mahatma and yet to find rest in one's surroundings in India is not possible and therefore I am waiting for my escape next March with an impatient feeling of longing. I know I have friends in Europe who are my real kindred and whose sympathy will act as a true restorative in my present state of weariness.[৬৫]

রবীন্দ্রনাথের নিজের লেখায় গান্ধীবাদের পীড়নের এই ধরনের স্বীকৃতি আদৌ সুলভ নয়, কিন্তু জনপ্রিয়তাকে সম্পূর্ণরূপে বাজি রেখে কথাগুলি সর্বসমক্ষে উচ্চারণ করলে তিনি ভালো করতেন! রলাঁ তাঁর বোনের কৃত ফরাসি অনুবাদে চিঠিটি তার 'দিনপঞ্জী'-তে লিখে রেখেছেন, অবশ্য কোনো মন্তব্য করেননি। বস্তুত রলাঁ নিজেও গান্ধীজি সম্পর্কে এক অদ্ভুত দ্বিধাগ্রস্ত মনোভাব পোষণ করতেন। অপ্রতুল তথ্যের ভিত্তিতে লেখা তাঁর গান্ধী-বিষয়ক বইটি যে বহু বিদেশি নরনারীকে গান্ধীভক্ত করে তুলেছিল এই সত্য তো অস্বীকার করার উপায় নেই!

ইতিমধ্যে লর্ড সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ একদিন শান্তিনিকেতন-শ্রীনিকেতন পরিদর্শনে গিয়ে সেখানকার কাজকর্ম দেখে খুশি হয়ে দশ হাজার টাকা দান করার অঙ্গীকার করেন। সংবাদটি জেনে কৃতজ্ঞতা নিবেদন করে 19 Aug [৩ ভাদ্র] রবীন্দ্রনাথ তাঁকে লেখেন : 'আমি য়ুরোপ যাত্রার জন্যে সম্পূর্ণ প্রস্তুত হয়েছিলুম ইতিমধ্যে সার নীলরতন এসে পরীক্ষা করে আমাকে যাত্রার অযোগ্য বলে স্থির করে দিয়েছেন। ··· চিকিৎসা উপলক্ষ্যে কয়েক দিন এখানে থেকে আবার শান্তিনিকেতনে যাব।'[৬৬] চিকিৎসা উপলক্ষে বা অন্য-কোনো কারণে রবীন্দ্রনাথ এই সময়ে শান্তিনিকেতনে না গিয়ে সম্ভবত কলকাতাতেই অবস্থান করেন।

22 Aug [শনি ৬ ভাদ্র] রবীন্দ্রনাথ তাঁর ট্রাস্ট ডীডে স্বাক্ষর করেন। সুরেন্দ্রনাথ ও রথীন্দ্রনাথ ট্রাস্টী নিযুক্ত হন। ট্রাস্ট ডীডটি প্রধানত মূল্যবান এই কারণে যে, এতে দেবেন্দ্রনাথের উইল ও তার পরিণতির একটি আনুপূর্বিক ইতিহাস পাওয়া যায়। রবীন্দ্রনাথ এই দলিলে তার সম্পত্তি ও পুস্তকাদির আয় বিশ্বভারতী, রথীন্দ্রনাথ, প্রতিমা দেবী, মীরা দেবী, নন্দিনী, নন্দিতা ও নীতীন্দ্রনাথের জন্য বিভিন্ন হারে ব্যয় করার নির্দেশ লিপিবদ্ধ করেন [দ্র প্রাসঙ্গিক তথ্য : ১]।

বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্যার চিমনলাল এইচ. শীতলবাদ অগাস্ট মাসে সেখানকার সমাবর্তন সভায় প্রধান অতিথির ভাষণ দেবার জন্য আমন্ত্রণ জানালে রবীন্দ্রনাথ অসুস্থতার কারণে তাঁর অপারগতার কথা জানিয়ে 22 Jun [৮ আষাঢ়] তাঁকে লিখেছিলেন :

I wish I were at this moment strong enough to accept your invitation and speak to the students of Bombay University about what should be our attitude of mind towards Western culture. I have always wanted to say to our countrymen that as it is the nature of truth to respond to truth we only prove an inertness of our own culture when in a fit of foolish pride

we reject the best that Europe offers to us today and thus help to prolong for ourselves the dark period of dominance of all that is worst in Western character. But unfortunately I am ill and already have arranged to sail for Europe on the 1st of August in search of rest and health. I hope I shall have the opportunity of meeting you in Bombay about the time of my departure when I shall be delighted to have a talk with you about your scheme of reconstructing your university.[৬৭]

উল্লেখ্য, এই খসড়া রচনার কিছুদিন আগেই জাতীয় শিক্ষা ও সমকালীন ভারতীয় রাজনীতি-সংশ্লিষ্ট বিষয়াবলি নিয়ে গান্ধীজির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের দীর্ঘ আলোচনা হয়ে গেছে।

বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন অনুষ্ঠানটি হয় 18 Aug [২ ভাদ্র] তারিখে। পরদিন আনন্দবাজার পত্রিকা লেখে : 'গত ১৮ই তারিখ বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি বিতরণ সভা হইয়া গিয়াছে। ··· স্যার চিমনলাল সভাপতিত্ব করেন। সভায় কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথের একখানি চিঠি পাঠ করা হয়। ঐ চিঠিতে তিনি বলেন :—বর্তমানে ছাত্ররা বিদ্যাক্ষেত্রে স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করিতেছে, ইহা বড়ই দুঃখের বিষয়। পৃথিবীর যাহা কিছু মহৎ, যাহা কিছু উৎকৃষ্ট সে সমস্ত আপনার বলিয়া দাবী করিতে পারাই সর্বাপেক্ষা বড় অধিকার।'[৬৮]

রবীন্দ্রজীবনী-কার লিখেছেন : "কলিকাতায় 'চিরকুমার সভা' অভিনয় দেখিয়া কবি শান্তিনিকেতনে ফিরিলেন। বর্ষাগানের ঝরনাধারা এখনো মনোমধ্যে বহিতেছে; 'শেষবর্ষণএর পালাগান রচিলেন। এই পালাগান কলিকাতায় অভিনীত হইবে।"[৬৯] যেন এতগুলি ঘটনার যে-বিবরণ উপরে দেওয়া হয়েছে— বিশেষত য়ুরোপযাত্রার আয়োজন চিকিৎসকের নির্দেশে বাতিল হয়ে যাওয়া ইত্যাদি কোনো ঘটনাই এই সময়ে সংঘটিত হয়নি!

বস্তুত ডাঃ নীলরতন সরকার নিশ্চয়ই রবীন্দ্রনাথকে চিকিৎসকদের নিয়মিত পর্যবেক্ষণের অধীনে থাকতে বলেছিলেন, আর সেই কারণেই তাঁকে কলকাতায় বসে থাকতে হয়।

তবে ডাক্তারেরা তাঁর জন্য কর্মহীন বিশ্রামের ফরমায়েশ করলেও নিতান্ত চুপ করে থাকা তাঁর মতো সৃজনশীল মানুষের পক্ষে সহজ নয়। তাই 'চিরকুমার সভা'র সাফল্যের পরে তিনি পুরোনো গল্পকে নাট্যরূপ দেওয়া বা গান রচনা করার মতো সহজতর কাজে নিমগ্ন হন। ৭ ভাদ্র আনন্দবাজার পত্রিকা-য় সংবাদ প্রকাশিত হয় : "রবীন্দ্রনাথ আর্ট থিয়েটারকে তার 'কর্মফল' অভিনয় করিবার জন্য দিয়াছেন। শুনিতেছি নাট্য মন্দিরও বঞ্চিত হন নাই। তারা রবীন্দ্রনাথের 'গোড়ায়-গলদ' পাইয়াছেন। আরও সুসংবাদ, রবীন্দ্রনাথ আধুনিক বাঙ্গলা রঙ্গালয়ের জন্য পাঁচ ছয়খানি নূতন নাটক লিখিতেছেন। বাঙ্গলা রঙ্গালয়ে এবার সত্যই নূতন যুগ আসিল দেখিতেছি।'[৭০] সংবাদটি সম্পূর্ণ গুজব নয়, রবীন্দ্রনাথ সত্যই 'কর্মফল' [কুন্তলীন পুরস্কার ১৩১০] গল্পটি অবলম্বনে 'শোধবোধ' ও 'শেষের রাত্রি' [সবুজপত্র, আশ্বিন ১৩২১] অবলম্বনে 'গৃহপ্রবেশ' নাটক রচনা করেন—আর 'গোড়ায় গলদ' [৩১ ভাদ্র ১২৯৯] প্রহসন রূপেই পূর্বে রচিত ও অভিনীত হয়েছিল, রবীন্দ্রনাথ তার রূপান্তর ঘটান 'শেষরক্ষা' নামে (আষাঢ় ১৩৩৪, আশ্বিন ১৩৩৫]।

এই সময়ে বিশ্বভারতীর কর্মসমিতির প্রতিবেদনে দেখা যাচ্ছে, রবীন্দ্রনাথের গল্প বা নাটকের মঞ্চায়ন বা চলচ্চিত্রায়ণের আবেদন আসছে প্রায়ই। 18 Jul-এর অধিবেশনে আর্ট ফিল্ম সিন্ডিকেটকে কয়েকটি শর্তসাপেক্ষে 'দালিয়া' চলচ্চিত্রায়ণের অনুমতি দেওয়া হয় [হয়তো রবীন্দ্রনাথ নিজেই গল্পটির চিত্রনাট্যরূপান্তর করতে গিয়ে প্রস্তাবনা-স্বরূপ 'ওগো জলের রাণী' গানটি রচনা করেছিলেন, দ্র ভারতী, কার্তিক-পৌষ ১৩৩২। ২০১; গীত ৩। ৯০১; স্বর ৫৬]; একই দিনে শিশিরকুমার ভাদুড়ীর 'বিসর্জন' ও 'গোড়ায় গলদ' মঞ্চায়নের অনুমতি মেলে ছ'মাসের মধ্যে নাটকগুলি মঞ্চস্থ করার শর্তসাপেক্ষে—তাঁকে অবশ্য আরও কয়েকটি শর্তের বন্ধনে আবদ্ধ করা হয়—প্রতিটি নাটক প্রথম অভিনয়ের পরে এক বছরের মধ্যে একাদিক্রমে ছ'মাস অভিনীত না হলে চুক্তি বাতিল করা হবে; কর্মসমিতির অনুমোদন ছাড়া কোনো গান বা অতিরিক্ত বিষয় নাটকে সংযুক্ত করা যাবে না; ন্যূনতম ৩০০ টাকা রয়্যালটি প্রদানের শর্তে প্রত্যেকটি অভিনয়ের জন্য ৩০ টাকা ও টিকিট বিক্রি ১৫০০ টাকা অতিক্রম করলে প্রতি অভিনয়ে ৫০ টাকা রয়্যালটি দিতে হবে।

31 Jul-এর অধিবেশনে আর্ট থিয়েটারকে 'মুক্তধারা' ও 'প্রায়শ্চিত্ত' অভিনয়ের অনুমতি দেওয়া হলেও 26 Aug-এর অধিবেশনে এই অনুমতি প্রত্যাহৃত হয়। এইদিন লন্ডনের ভারতীয় অভিনেতাদের দ্বারা রবীন্দ্রনাথের ইংরেজি নাটক অভিনয়ের প্রস্তাবও অগ্রাহ্য করা হয়। 9 Sep-এর অধিবেশনে 'কর্মফল', 'গৃহপ্রবেশ' ও 'বশীকরণ' নাটক অভিনয়ের স্বত্ব আর্ট থিয়েটারকে প্রদত্ত হয়— 'বশীকরণ'কে অর্ধনাটক হিসাবে গণ্য করা হয়।

২৩ ভাদ্র [মঙ্গল 4 Sep] রবীন্দ্রনাথ ক্ষিতিমোহনের কন্যা মমতা বা লাবীকে জানালেন : 'আমার জ্বর ছেড়েছে কিন্তু গ্রহ এখনও ছাড়েনি। একটা গানের বৈঠক বসবে, তারি তদবির করতে হচ্চে। সেই উপলক্ষ্যে কিছু টাকা তোলবার লোভ আছে বলেই নড়তে দিচ্চে না।'[৭১] গত কয়েক বৎসর ধরে 'বর্ষামঙ্গল' নামে শান্তিনিকেতনে নববর্ষাকে আবাহন করার পরে কলকাতাতেও সেটি পরিবেশিত হত। বিশ্বভারতীর জন্য কিছু টাকা সংগ্রহের বাসনায়, কলকাতার অনুরাগীদের কাছে নূতন গানের ডালি উপহার দেওয়ার আগ্রহও থাকত তাতে। এবারে আশ্রমে অনুষ্ঠানটি হলেও রবীন্দ্রনাথের অসুস্থতা ও বিদেশযাত্রার তাগিদে সেটি কলকাতায় পরিবেশিত হয়নি। এখন বর্ষা শেষ হবার মুখে রবীন্দ্রনাথ তাকে বিদায় জানালেন 'শেষ বর্ষণ' নামে। এটি নিছক গান-আবৃত্তির অনুষ্ঠান নয়, রবীন্দ্রনাথ মোট ২৪টি গানকে জুড়ে দিলেন নটরাজ, রাজা, রাজকবি ও নাট্যাচার্যের কথোপকথনের সূত্র দিয়ে—বর্ষা, শরৎ, শুকতারা প্রভৃতি চরিত্রকে উপযোগী সাজপোশাকে ভূষিত করে, শান্তিদেব ঘোষের ভাষায়, 'মূকাভিনয়, গীতাভিনয় ও দেহভঙ্গিতে একটু ছন্দ লাগিয়ে' এবং গুজরাট অঞ্চলের লোকনৃত্যের কিঞ্চিৎ মিশ্রণ ঘটিয়ে[৭২] গীতিনাট্যরূপে একে পরিবেশন করা হল।

এর প্রথম অনুষ্ঠানটি হল ২৬ ভাদ্র [শুক্র 11 Sep] তারিখে। পরের দিন আনন্দবাজার পত্রিকা-য় লেখা হল : 'গতকল্য সন্ধ্যা ৬ ॥ টার সময় ৬নং দ্বারকানাথ ঠাকুর লেনে "বিচিত্রাগৃহে"র স্বল্পায়তনক্ষেত্রে শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের "শেষ-বর্ষণ" নামক নূতন বর্ষা শরতের বিদায় অভিনন্দন-মূলক গীতিপ্রাণ নাট্যাভাস অভিনীত হইয়াছিল। গীত সংখ্যা কুড়িটির অধিক নয়, কিন্তু তাহারি ভিতর দিয়া অপূর্ব্ব সূক্ষ্ম একটি নাট্যরস মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছিল। বর্ষা-শরৎ প্রভৃতির ভূমিকা যাঁহারা গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের সজ্জা স্ব-স্ব কালের সম্পূর্ণ উপযোগী হইয়াছিল। কবিবর স্বয়ং অসুস্থতা নিবন্ধন যোগ দিতে পারেন নাই, দূরে বসিয়া আয়োজনটি দেখিতেছিলেন।'[৭৩]

এই উপলক্ষে মলাট-ছাড়া ১৬ পৃষ্ঠার চার আনা মূল্যের 'শ্রীকৃষ্ণ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ / ২৫৯ নং অপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা। /শ্রীহেমেন্দ্রকুমার শীল দ্বারা মুদ্রিত' 'শেষ বর্ষণ / ভাদ্র ১৩৩২' পুস্তিকাটি প্রকাশিত হয়। এতে কেবল ২০টি গান ছাপা হয়, সংলাপ-সহ সম্পূর্ণ পাঠটি মুদ্রিত হয় কার্তিক-সংখ্যা সবুজপত্র-তে [পৃ ১৫১-৭৬] দ্র শেষ বর্ষণ ১৮। ১২৭-৪৩। এটি প্রথম গ্রন্থভুক্ত হয় বিশ্বভারতী গ্রন্থালয় থেকে জগদানন্দ রায় প্রকাশিত 'ঋতু-উৎসব' (১৩৩৩) সংকলনে। এই পাঠগুলিতে মোট ২৪টি গান আছে। এদের মধ্যে 'বজ্রমাণিক দিয়ে গাঁথা' ও 'পুব হাওয়াতে দেয় দোলা' গানগুলি পূর্বরচিত, 'ঐ আসে ঐ অতি ভৈরব হরষে' ও 'ওগো শেফালি বনের মনের কামনা' পুরোনো দুটি কবিতায় সুরারোপ করা হয়েছে, বাকি গানগুলি নূতন, যাদের মধ্যে ১৪টি গানের পাণ্ডুলিপি রমা মজুমদারকে [কর] উপহার-দেওয়া ডায়ারিটিতে [Ms. 464] নিম্নলিখিত পৃষ্ঠানুক্রমে পাওয়া যায় :

১. গান আমার যায় ভেসে যায় দ্র গীত ২। ২৭৬-৭৭; স্বর ৩১

২. কোথা যে উধাও হল দ্র গীত ২। ৪৫৮; স্বর ২; রবীন্দ্রনাথ পাণ্ডুলিপিতে গানটির মূল পাঠ অশুদ্ধভাবে লিখে রাখেন 'বোল রে— পাপৈ, য়ারা—', মূল গান : 'বোল রে পাপিয়ারা' দ্র গবেষণা-গ্রন্থমালা ৩। ৮৩

৩. ওলো শেফালি দ্র গীত ২। ৪৯০; স্বর ৩১

৪. ঝরে ঝরঝর ঝর ভাদর বাদর দ্র গীত ২। ৪৫৮; স্বর ৩১

৫. একলা বসে বাদলশেষে শুনি কত কী দ্র গীত ২। ৪৬০; স্বর ৩১

৬. তোমার নাম জানি নে দ্র গীত ২। ৪৯১; স্বর ৩১

৭. আজ শ্রাবণের পূর্ণিমাতে দ্র গীত ২। ৪৫৮-৫৯; স্বর ৩১

৮. যে ছায়ারে ধরব বলে দ্র গীত ২। ২৭২; স্বর ৩১

৯. আমার রাত পোহালো দ্র গীত ২। ৪৯২; স্বর ২.

১০. অশ্রুভরা বেদনা দিকে দিকে জাগে দ্র গীত ২। ৪৫৯; স্বর ২; এটি একটি হিন্দিভাঙা গান, যার মূল রবীন্দ্রনাথ পাণ্ডুলিপিতে লিখে রাখেন; মূল গান : 'তনমনধন ভূয় পরবারে' দ্র গবেষণা-গ্রন্থমালা ৩। ৮০

১১. বন্ধু, রহো রহো সাথে দ্র গীত ২। ৪৬০; স্বর ২; এটিও একটি হিন্দিভাঙা গান, যার মূল রবীন্দ্রনাথ পাণ্ডুলিপিতে লিখে রেখেছিলেন; মূল গান : 'সঙ্গে চলা দিয়া হাওয়ে' দ্র গবেষণা-গ্রন্থমালা ৩। ৯২

১২. হে ক্ষণিকের অতিথি দ্র গীত ২। ৩৩৪-৩৫; স্বর ৩১

১৩. শ্যামল শোভন শ্রাবণ, তুমি নাই বা গেলে দ্র গীত ২। ৪৬০; স্বর ৩১

১৪. এসো নীপবনে ছায়াবীথিতলে দ্র গীত ২। ৪৫৮; স্বর ৩১

আগেই বলা হয়েছে, এদের মধ্যে কয়েকটি হিন্দিভাঙা গানের শুনে-শুনে লেখা মূল গান অশুদ্ধ পাঠে পাণ্ডুলিপিতে পাওয়া যায়— মনে হয়, গান ও তাদের সুর ভীমরাও শাস্ত্রীর কাছ থেকে পাওয়া— আশ্বিন-সংখ্যা শান্তিনিকেতন-এ উল্লেখ করা হয়েছে, এই উৎসবে যোগ দিবার জন্য আশ্রমের সুযোগ্য সঙ্গীতাধ্যক্ষ পণ্ডিত শ্রীভীমরাও শাস্ত্রী এবং কয়েকজন ছাত্র ও ছাত্রী কলিকাতায় গিয়াছেন।'

অন্যান্য গানগুলি হল :

১৫. ধরণীর গগনের মিলনের ছন্দে দ্র গীত ২। ৪৫৯-৬০; স্বর ৩০

১৬. পথিক মেঘের দল জোটে ঐ দ্র গীত ২। ৪৫০; স্বর ৩১

১৭. দেখো শুকতারা আঁখি মেলি চায় দ্র গীত ২। ৪৯০; স্বর ৩১

১৮. এসো শরতের অমল মহিমা দ্র গীত ২। ৪৯০; স্বর ২; এটিও হিন্দিভাঙা গান, মূল গান : 'বাজে ঝনন ঝনন' দ্র গবেষণা-গ্রন্থমালা ৩। ৮৩

১৯. এবার অবগুণ্ঠন খোলো দ্র গীত ৪৯১; স্বর ৩০

২০. কার বাঁশি নিশিভোরে বাজিল দ্র গীত ২। ৪৯১; স্বর ২; এই হিন্দিভাঙা গানের মূল : 'অব তো মোরে কান ভনকবা পরিলো দ্র গবেষণা-গ্রন্থমালা ৩। ৭৩।

শেষ বর্ষণ-এর আরও কয়েকটি অভিনয় বিচিত্রা-গৃহে পরিবেশিত হয়েছিল। ২৬ ভাদ্রের অভিনয়ের পরে ৩০ ভাদ্র [মঙ্গল 15 Sep] পিয়র্সন হাসপাতালের জন্য অর্থসংগ্রহের উদ্দেশ্যে একটি অভিনয় হয়। ১ আশ্বিন [বৃহ 17 Sep] আর-একটি বিশেষ অভিনয়ের বিবরণে আনন্দবাজার পত্রিকা-য় [৩ আশ্বিন] লেখা হয়েছে :

> গত বৃহস্পতিবার রাত্রিতে বেলজিয়ামের রাজদম্পতি, লর্ড ও লেডী লিটন এবং লাট প্রাসাদের কয়েকজন জোড়াসাঁকো রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাড়ীতে পদার্পণ করিয়াছিলেন এবং তথায় শেষ বর্ষণের অভিনয় দর্শন করেন। রাজদম্পতি এবং লাট দম্পতি প্রত্যেকটি সঙ্গীত মনোনিবেশপূর্ব্বক শ্রবণ করেন এবং মাঝে মাঝে হর্ষধ্বনি প্রকাশ করেন।
>
> অভিনয় শেষ হইলে রাজদম্পতি রঙ্গমঞ্চের সাজ-সরঞ্জাম ঘনিষ্ঠভাবে দেখিবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। অভিনেতা এবং গায়কদের সহিত তিনি অনেকক্ষণ সরস আলাপ করেন। রাজদম্পতি শান্তিনিকেতনে কবির বিশ্বভারতী সম্বন্ধে অনেক প্রশ্ন করেন এবং কবিকে বেলজিয়ামে সাদর আমন্ত্রণ জানান।[৭৪]

১ আশ্বিন উক্ত পত্রিকায় জানানো হয়েছিল : 'বিশেষ অনুরোধে আগামী ১৯শে সেপ্টেম্বর, শনিবার····আবার শেষবর্ষণের অনুষ্ঠান হইবে। ইহাতে কয়েকটি নূতন গান সন্নিবিষ্ট হইবে ও অনুষ্ঠানক্রমও নূতনভাবে পরিবর্তিত হইবে।

ভাদ্র ১৩৩২-এ রবীন্দ্রনাথের নিম্নলিখিত রচনাগুলি বিভিন্ন সাময়িকপত্রে প্রকাশিত হয় :

প্রবাসী, ভাদ্র ১৩৩২ [২৫। ১। ৫] :

৬০৯-১৪ 'মরমিয়া' দ্র র° র° ১৫ক [প.ব., ১৪০৬]। ৮৪০-৪৪

রচনাটির পাদটীকায় 'প্রবাসীর সম্পাদক' লেখেন : 'এই প্রবন্ধটি শ্রীযুক্ত ক্ষিতিমোহন সেন মহাশয়ের দাদুর পদসংগ্রহের ভূমিকা। এই পুস্তক শীঘ্রই মুদ্রিত হইবে।'

এই সংখ্যারই শেষ পৃষ্ঠায় [পৃ ৭৫২] সম্পাদক ঘোষণা করেন : 'আশ্বিনের "প্রবাসী"তে রবীন্দ্রনাথের "কর্ম্মফল" বাহির হইবে।' অবশ্য শেষপর্যন্ত 'কর্মফল'-এর পরিবর্তে 'গৃহপ্রবেশ' নাটকটি আশ্বিন-সংখ্যা প্রবাসী-তে মুদ্রিত হয়।

সবুজপত্র, ভাদ্র ১৩৩২ [৯। ১] :

১১-৩১ 'চরকা' দ্র কালান্তর ২৪। ৪০১-১৩

৫০ 'অতীত' ['সেই ভালো, প্রতি যুগ আনে না নিঃশেষ অবসান' দ্র পূরবী ১৪। ৯৮ ['অতীত কাল']

৫১-৫২ 'প্রভাতী' ['চপল ভ্রমর, হে কালো কাজল আঁখি'] দ্র ঐ ১৪। ১১৮-১৯

৫৩-৫৫ 'একদা' ['জীবন-মরণের স্রোতের ধারা'] দ্র ঐ ১৪। ১৪৬-৪৮ ['মিলন']

শান্তিনিকেতন, ভাদ্র ১৩৩২ [৬। ৮] :

১৬৩ *‘গান’*

১ ‘বাজো রে বাঁশরী বাজো’ দ্র গীত ৩। ৮০৫; স্বর ১

২ ‘ওগো আষাঢ়ের পূর্ণিমা আমার’ দ্র গীত ২। ৪৪৮; স্বর ৩১

‘বাজো রে বাঁশরি বাজো’ গানটি ‘গৃহপ্রবেশ’ নাটকে হিমির কণ্ঠে ব্যবহৃত হয়। দুটি গানেরই খসড়ার সন্ধান মেলে Ms. 464-এ, যাতে মনে হয় এদের রচনাকাল আষাঢ় ১৩৩২।

The Modern Review, September 1925 [Vol. XXXVIII, No. 3] :

263-70 ‘The Cult of Charka’ দ্র *EWRT* 3/ 538-48

ক্ষিতিমোহন সেনের ‘দাদু’ গ্রন্থের ভূমিকা ‘মরমিয়া’ রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন সম্ভবত শ্রাবণ মাসে। ক্ষিতিমোহন দীর্ঘদিন ধরেই হিন্দিভাষী সন্তকবিদের বাণী সংগ্রহ করে আসছিলেন উত্তরপশ্চিম ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল পরিভ্রমণ করে, বাংলার গ্রাম ঘুরে বাউলদের গান সংগ্রহেও তাঁর ক্লান্তি ছিল না। বাংলার বাউলগানের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের প্রত্যক্ষ পরিচয় ছিল, কিন্তু হিন্দি সন্তবাণীর সঙ্গে তিনি ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হন সম্ভবত ১৩১৫ [1908] সালে ক্ষিতিমোহন ব্রহ্মচর্যাশ্রমের কাজে যোগ দেওয়ার পরে তাঁর সান্নিধ্যে এসে। এই কথা তিনি আলোচ্য প্রবন্ধেও উল্লেখ করেছেন : ‘আমার অপরিচিত হিন্দীসাহিত্যের মহলে কাব্যের বিশুদ্ধ রসরূপটি যখন খুঁজছিলুম, এমন সময় একদিন ক্ষিতিমোহন সেন মশায়ের মুখ থেকে বঘেল-খণ্ডের কবি জ্ঞানদাসের দুই-একটি হিন্দী পদ আমার কানে এল। আমি বলে উঠলুম, এই তো পাওয়া গেল। খাঁটি জিনিস, একেবারে চরম জিনিস, এর উপরে আর তান চলে না।’ হিন্দিকবি জ্ঞানদাসের পদের রবীন্দ্রনাথ-কৃত ইংরেজি অনুবাদ *The Fugitive* [1921] গ্রন্থে স্থান পেয়েছে।

কবীরের দোঁহার সঙ্গে বাঙালি তথা রবীন্দ্রনাথের পরিচয় আগেই ঘটেছিল, রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে সেটি ঋদ্ধতর হয় ক্ষিতিমোহনের সংগ্রহের মাধ্যমে। তাঁরই উৎসাহে ও আনুকূল্যে ইন্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস থেকে ক্ষিতিমোহন-কৃত ‘কবীর’ চারখণ্ডে প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থ অবলম্বনে অজিতকুমার চক্রবর্তী-কৃত ইংরেজি অনুবাদের খসড়ার রবীন্দ্রনাথ কৃত পরিমার্জিত রূপ *One Hundred Poems of Kabir* [1915] নামে প্রকাশিত হয়।

দাদূও অনুরূপ একজন সন্তকবি। ক্ষিতিমোহন এঁর বাণীর বাংলা অনুবাদ প্রকাশে উদ্যোগী হওয়ায় রবীন্দ্রনাথ সানন্দে তার ভূমিকা লিখে দেন। জ্ঞানদাসের উল্লেখের পরে তিনি লেখেন : ‘ক্ষিতিবাবুর কল্যাণে ক্রমে হিন্দুস্থানের আর কোনো কোনো সাধক কবির সঙ্গে আমার কিছু কিছু পরিচয় হল। আজ আমার মনে সন্দেহ নেই যে, হিন্দী ভাষায় একদা যে গীত-সাহিত্যের আবির্ভাব হয়েছে তার গলায় অমরসভার বরমাল্য। অনাদরের আড়ালে আজ তার অনেকটা আচ্ছন্ন; উদ্ধার করা চাই, আর এমন ব্যবস্থা হওয়া চাই যাতে ভারতবর্ষের যারা হিন্দী ভাষা জানে না তারাও যেন ভারতের এই চিরকালের সাহিত্যে আপন উত্তরাধিকার-গৌরব ভোগ করতে পারে।’ সেই অস্পৃশ্যতা-দূরীকরণ আন্দোলনের যুগে এই সাধক-কবিদের পরিচয় দিতে গিয়ে তিনি লিখেছেন : ‘তাঁরা সকলেই প্রায় অন্ত্যজ, সমাজের নীচের তলাকার; পণ্ডিতদের বাঁধা মতের শাস্ত্র, ধার্মিকদের বাঁধা নিয়মের আচার তাঁদের কাছে সুগম ছিল না। বাইরের পূজার মন্দির তাঁদের কাছে বন্ধ ছিল বলেই অন্তরের মিলনমন্দিরের চাবি তাঁরা খুঁজে পেয়েছিলেন। … এঁরা হলেন এক বিশেষজাতের মানুষ।

ক্ষিতিবাবুর কাছে শুনেছি, আমাদের দেশে এঁদের দলের লোককে বলে থাকে 'মরমিয়া'। এঁদের দৃষ্টি, এঁদের স্পর্শ মর্মের মধ্যে; এঁদের কাছে আসে সত্যের বাহিরের মূর্তি নয়, তার মর্মের স্বরূপ।

ভারতের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার প্রতি ইঙ্গিত করে তিনি লিখলেন : 'অমৃতের রসবোধ যার হয় নি, সে-ই মানে ভয়কে, ক্ষুধাকে, ক্ষমতাকে। সে এমন একটি দেবতাকে মানে, যিনি বর দেন, নয় দণ্ড দেন। যাঁর দক্ষিণে স্বর্গ, বামে নরক। যিনি দূরে বসে কড়া হুকুমে বিশ্বশাসন করেন। যাঁকে পশুবলি দিয়ে খুশি করা চলে, যাঁর গৌরব প্রচার করবার জন্যে পৃথিবীকে রক্তে ভাসিয়ে দিতে হয়, যাঁর নাম করে মানবসমাজে এত ভেদবিচ্ছেদ, পরস্পরের প্রতি এত অবজ্ঞা, এত অত্যাচার। ভারতের মরমিয়া কবিরা শাস্ত্রনির্মিত পাথরের বেড়া থেকে ভক্তের মনকে মুক্তি দিয়েছিলেন। প্রেমের অশ্রুজলে দেবমন্দিরের অঙ্গন থেকে রক্তপাতের কলঙ্করেখা মুছে দেওয়া ছিল তাঁদের কাজ।'

এই সূত্রেই রবীন্দ্রনাথ লিখলেন : "যেহেতু ভারতীয় সমাজ ভেদবহুল, যেহেতু এখানে নানা ভাষা, নানা ধর্ম, নানা জাতি, সেইজন্যেই ভারতের মর্মের বাণী হচ্ছে ঐক্যের বাণী। সেইজন্যেই যাঁরা যথার্থ ভারতের শ্রেষ্ঠপুরুষ তাঁরা মানুষের আত্মায় আত্মায় সেতু নির্মাণ করতে চেয়েছেন। যেহেতু বাহিরের আচার ভারতে নানা আকারে ভেদকেই পাকা করে রেখেছে এইজন্যেই ভারতের শ্রেষ্ঠ সাধনা হচ্ছে বাহ্য আচারকে অতিক্রম করে অন্তরের সত্যকে স্বীকার করা। ··· ভারতীয় এই সাধকদেরই সাধনাধারা বর্তমান কালে প্রকাশিত হয়েছে রামমোহন রায়ের জীবনে। এই যুগে তিনিই উপনিষদের ঐক্যতত্ত্বের আলোকে হিন্দু-মুসলমান খ্রীস্টানকে সত্যদৃষ্টিতে দেখতে পেয়েছিলেন, তিনি কাউকেই বর্জন করেন নি। বুদ্ধির মহিমায় ও হৃদয়ের বিপুলতায় তিনি এই বাহ্যভেদের ভারতে আধ্যাত্মিক অভেদকে উজ্জ্বল করে উপলব্ধি করেছিলেন এবং সেই অভেদকে প্রচার করতে গিয়ে দেশের লোকের কাছে আজও তিনি তিরস্কৃত। যাঁর নির্মল দৃষ্টির কাছে হিন্দু-মুসলমান খ্রীস্টানের শাস্ত্র আপন দুরূহ বাধা সরিয়ে দিয়েছিল তাঁকে আজ তারাই অভারতীয় বলতে স্পর্ধা করছে পাশ্চাত্য বিদ্যা ছাড়া আর কোনো বিদ্যায় যাদের অভিনিবেশ নেই। আজকের দিনেও রামমোহন রায় আমাদের দেশে যে জন্মেছেন তাতে এই বুঝতে পারি যে, কবীর নানক দাদূ ভারতের যে সত্যসাধনাকে বহন করেছিলেন আজও সেই সাধনার প্রবাহ আমাদের প্রাণের ক্ষেত্র পরিত্যাগ করে নি।

দাদূ প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ রামমোহনের সাধনার কথা টেনে আনলেন প্রধানত কবীর নানকের তুলনায় গান্ধীজি রামমোহনকে 'পিগমি' আখ্যা দিয়েছিলেন বলে। গান্ধীজির সেই সংকীর্ণ দৃষ্টিকোণ এবং বিদ্যা ও বোধের অভাবকে রবীন্দ্রনাথ যে-কোনোদিন ক্ষমা করতে পারেননি, এটি তারই অপর-একটি দৃষ্টান্ত।

রবীন্দ্রনাথ প্রবন্ধটি শেষ করলেন ক্ষিতিমোহনের কাছে একটি দাবি জানিয়ে : 'মৃত্যু থেকে মানুষের চিত্তকে পরিত্রাণ করার জন্যে বৈকুণ্ঠের অমৃতরস প্রস্রবণের উপরেই আমাদের মরমিয়া কবিরা দৃঢ় আস্থা রেখেছিলেন, কোনো একটা বাহ্য আচারের রাজিনামার উপরে নয়। তাঁরা যে-রসের ধারাকে বৈকুণ্ঠ থেকে এনেছিলেন, আমাদের দেশের সামাজিক বালুর তলায় তা অন্তর্হিত। কিন্তু তা মরে যায় নি। ক্ষিতিমোহনবাবু ভার নিয়েছেন বাংলা দেশে সেই লুপ্তস্রোতকে উদ্ধার করে আনবার। শুধু কেবল হিন্দী ভাষা থেকে নয়, আশা করে আছি বাংলা ভাষার গুহার থেকে বাউলদের সেই সুবর্ণরেখার বাণীধারাকে প্রকাশ করবেন যার মধ্যে সোনার কণা লুকিয়ে আছে।'

রবীন্দ্রনাথের ভূমিকা-সংবলিত ক্ষিতিমোহনের ‘দাদূ’ অবশ্য প্রকাশিত হয় বিশ্বভারতী গ্রন্থালয় থেকে দশ বছর পরে ২৫ বৈশাখ ১৩৪২ তারিখে।

অভিনয়ের পালা চুকে যাওয়ার পরে রবীন্দ্রনাথ পুত্র ও পুত্রবধূকে নিয়ে পিঠাপুরমের উদ্দেশে রওনা হন। ৩১ ভাদ্র [16 Sep] কোকনাদের সংবাদ হিসাবে *The Hindu* [18 Sep] লেখে : ‘Dr. Rabindranath Tagore will arrive at Pithapuram in a couple of days as the guest of the Maharaja... in order to attend the 21st annual musical entertainments to be given by the Saraswathi Gana Sabha, Cocanada, in the Pithapur Raja's College, during the Devi Navaratram festival from the 19th instant to the 27th instant (inclusive).’ রবীন্দ্রনাথ ৬ আশ্বিন [মঙ্গল 22 Sep] পিঠাপুরম রওনা হয়েছিলেন, কিন্তু একটি অঘটনের জন্য এই যাত্রা বাতিল হয়; আনন্দবাজার পত্রিকা [৮ আশ্বিন] সংবাদ দেয় : ‘শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পুত্র এবং পুত্রবধূ সহ পিট্টাম্পুরম যাইবার মানসে গত পরশ্ব দিন স্টেশনে যাত্রা করিয়াছিলেন। পুত্র ও পুত্রবধূ যথা সময়ে গাড়ীতে চাপেন, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ভীড় ঠেলিয়া গাড়ী চাপিবার পূর্ব্বেই গাড়ী ছাড়িয়া দেওয়ায় তিনি আর যাইতে পারেন নাই।’[৭৫] অতঃপর তিনি পিঠাপুরম যাত্রা বাতিল করে শান্তিনিকেতনে ফিরে আসেন।

[১০ আশ্বিন শনি] *27 Sep রবীন্দ্রনাথ সেখান থেকে ইন্দিরা দেবীকে লিখলেন :

> এখানে এসে খোলা আকাশের তলায় একটু আরাম পেয়েছি। যদি দেখি মনটা সুস্থ হতে পাচ্চে না তাহলে মনে করচি Waltairএ দৌড় মারব — সেখানে একটা ভালো বাড়ির সন্ধান পেয়েচি। যাবার সময় চল্‌তি গাড়িতে লাফ দিয়ে উঠে পথের থেকে ফিরে আসব না এটুকু আশ্বাস দিতে পারি। প্রমথকে বলিস্ তার সম্পাদকীয় চিত্ত যেন উদ্বিগ্ন না হয়। আমি শেষবর্ষণের আর-একটা কপি নিয়ে সংশোধনের কাজ সেরে দিয়েচি—নুটু সেটা নকল করচে, হয়ে গেলেই তোদের পাঠাব’।[৭৬]

এই চিঠি থেকে বোঝা যায়, ৩ আশ্বিনের অভিনয়ে যে ঘোষিত হয়েছিল : ‘ইহাতে কয়েকটি নূতন গান সন্নিবিষ্ট হইবে ও অনুষ্ঠানক্রমও নূতনভাবে পরিবর্তিত হইবে’, তার অর্থ ছিল রবীন্দ্রনাথ গীতিনাট্যটির সংশোধন-সংযোজনের কাজ করছিলেন—সেইটিই সম্পূর্ণ হল শান্তিনিকেতনে এসে, রমা মজুমদার-কৃত তার প্রতিলিপি সবুজপত্র-এর দপ্তরে প্রেরিত হয়।

পরের দিন রবীন্দ্রনাথ সম্পাদক প্রমথ চৌধুরীকেও লিখলেন : ‘আগামী কাল সোমবারে রথী কলকাতায় যাচ্চে। তার হাতে শেষবর্ষণের সংশোধিত কপি দিচ্চি। তাকে টেলিফোন করে জিনিষটা হস্তগত কোরো। তোমরা দার্জ্জিলিং যাচ্চ, প্রুফের কি দশা হবে? কাপিটা বেশ পরিষ্কার করে লেখা হয়েছে— ঠিকমত মিলিয়ে গেলেই কোনো আশঙ্কার বিষয় থাকবে না।’[৭৭]

বিশ্বভারতীর গুজরাটি ছাত্রী শ্রীমতী হাতিসিং-এর আমন্ত্রণে মীরা দেবী পুত্রকন্যাদের নিয়ে আমেদাবাদে বেড়াতে গিয়েছিলেন। ১৬ আশ্বিন [শুক্র 2 Oct] কোজাগরী পূর্ণিমার পরের দিন তাঁকে একটি চিঠি লিখে রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনের অনেক খবর দিয়েছেন :

> কাল মেয়েরা লক্ষ্মীপূর্ণিমায় আমার কোণার্কের ছাতে গান গেয়ে উৎসব করেছিল।
>
> পুপে হঠাৎ দেখি পর্শু দিন মাথাখানি একেবারে সম্পূর্ণ মুড়িয়ে ফেলেছে। শরতের আকাশে যেমন বর্ষার কালো মেঘ কেটে গিয়ে দিনগুলি নির্ম্মল হয়েছে তেমনি কালো চুল অন্তর্ধান করে ওর মুখখানি সবটাই শুভ্র দেখাচ্চে।····মাঝে মাঝে ওকে আবার বাঘের গল্প শোনার নেশা পেয়ে বস্‌চে। কিছুদিন সেটা একেবারে ভুলে গিয়েছিল। আজকাল জয়জির সঙ্গে বন্ধুত্ব করেই দিন কাটাচ্চে।

…এন্ড্রুজ সেই অবধি অদৃশ্য। একটা পালাবার ছুতোয় ছিল— সুবিধে পেয়ে বেঁচে গেছে। গুরুদয়াল আমার ইংরেজি চিঠি লেখা এবং অন্যান্য অনেক কাজ চালিয়ে দিচ্চে। তাতে ভারি সুবিধে হয়েছে। আমার নীলমণির কোনোপ্রকার পরিবর্ত্তন হয়নি— নতুন কোনো চিন্তার বিষয় উপস্থিত হলেই সকরুণভাবে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে— অত্যন্ত শোকাবহ রকমের চেহারা হয়।[৭৮]

জয়জি বা জায়জি অধ্যাপক জাহাঙ্গির ভকিলের কন্যা— তাঁর উল্লেখের ধরন ঈর্ষাজনিত বলে মনে হয়, গল্প শোনার বায়না ছাড়া বিখ্যাত দাদামশায়ের সঙ্গের পরিবর্তে জয়জির সঙ্গে দিনযাপন ন্যায়তই তাঁকে ঈর্ষান্বিত করতে পারে!

রবীন্দ্রনাথ এই সময়ে নবরূপায়িত কোণার্ক বাড়িটিতে বাস করছিলেন। কয়েকদিন পরে লিখিত একটি চিঠিতে [১৯ আশ্বিন] মীরা দেবীকেই লিখেছেন : 'আমাদের এখানে গরম আর নেই। তার উপরে মেঘ করে আজ খুব কষে পূবে হাওয়া লাগিয়েছে। কিছুদিন আকাশের শুকনো মূর্ত্তি দেখে আমি নিশ্চিন্ত মনে লেখবার পড়বার সরঞ্জাম টেনেটুনে গুছিয়ে নিয়ে বসেছিলুম। যদি বৃষ্টি নামে তাহলে আবার পাৎতাড়ি গুটিয়ে সেই কোণের ঘরটাতে দৌড় মারতে হবে। বেশ বুঝতে পারছি নতুন বারান্দায় বৃষ্টির ঝাপটা যথোচিত নিবারণ করতে পারবে না।'[৭৯] এই বারান্দাটি তাঁর খুব প্রিয় ছিল, কিন্তু দেখা যাচ্ছে ইতিমধ্যেই এর সম্পর্কে অসন্তোষ জমা হচ্ছে। নূতন-নূতন বাড়ি তৈরির বাতিক তাঁর এখনও দেখা দেয়নি, না হলে তখনই বারান্দাটিতে পাঁচিল তুলে তার শ্রী হরণ হত বা নূতন ঘরের ফরমায়েশ জারি করা হত। এই চিঠিতেও পুপের প্রসঙ্গ আছে; তাঁর দাবি অবশ্য বর্ধমান : 'আমার কাছে সকালে সন্ধ্যায় দুটো করে গল্প দাবী করে—সকালে বাঘের গল্প, রাত্রে শিউলি ফুলের।' ভাগিনেয় সত্যপ্রসাদ তখন জোড়াসাঁকোর পাট তুলে দিয়ে বরোদা ম্যুজিয়মের কিউরেটর পুত্র সুপ্রকাশের আশ্রয়ে বাস করছিলেন, মীরা দেবীকে লেখা দুটি চিঠিতেই তাঁর সঙ্গে দেখা করে আসার উপরোধ জানানো হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথ এইসময়ে ঘটনাচক্রে একটি সামাজিক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়লেন। পৃথিবীর তথা দরিদ্র দেশগুলির জনসংখ্যা হ্রাসের উদ্দেশ্যে কৃত্রিম উপায়ে জন্মনিয়ন্ত্রণের পদ্ধতি ব্যবহার করার জন্য আমেরিকান সমাজসেবী Dr. Margaret Sanger [1879-1966] দীর্ঘকাল প্রচারকার্য চালাচ্ছিলেন, তার জন্য সামাজিক পীড়ন বা কারাবাস তাঁকে নিবৃত্ত করতে পারেনি। 12 Aug [২৭ শ্রাবণ] তিনি নিউ ইয়র্ক থেকে রবীন্দ্রনাথকে লেখেন : 'The Indian papers just received report that Mahatma Gandhi has been visiting you at Shantiniketan. Perhaps you have seen his recent statement in opposition to Birth Control. ...we take it granted that with your international outlook on life and human society you cannot but feel friendly towards Birth Control.' এর পরে তাঁর *The Birth Control Review* পত্রিকায় তিনি রবীন্দ্রনাথের 'The Beginning' [*The Crescent Moon*] কবিতাটি ছেপেছেন সংবাদটি জানিয়ে তাঁকে অনুরোধ করেন : 'We should feel highly honored if you would send us a statement regarding birth control for publiication in our Birth Control Review.' রবীন্দ্রনাথ এই আহ্বানে সাড়া দিলেন 30 Sep [বুধ ১৪ আশ্বিন] তারিখে। গান্ধীজি নৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে জন্মনিয়ন্ত্রণে কৃত্রিম পদ্ধতি ব্যবহারের বিরোধিতা করে বিবাহের বয়সবৃদ্ধি ও দম্পতির ব্রহ্মচর্যপালনের নির্দেশ দিয়েছিলেন [যদিও তাঁর নিজের যৌনজীবন যাপনের যে-ইতিহাস তিনি আত্মজীবনীতে ব্যক্ত করেছেন, তাতে ব্রহ্মচর্যপালনের কোনো

প্রয়াসই ছিল না। রবীন্দ্রনাথ গান্ধীজির বহুবিধ অবাস্তব ফতোয়ার মতো এই বিষয়েও একমত ছিলেন না। তিনি লিখলেন :

I am of opinion that Birth Control movement is a great movement not only because it will save women from enforced and undesirable maternity, but because it will help the cause of peace by lessening the number of surplus population of a country scrambling for food and space outside its own rightful limits. In a hunger-striken country like India it is a cruel crime thoughtlessly to bring more children to existence than could properly be taken care of, causing endless sufferings to them and imposing a degrading condition upon the whole family. It is evident that the utter helplessness of a growing poverty very rarely acts as a check controlling the burden of over-population. It proves that in this case nature's urging gets better of the severe warning that comes from the providence of civilised social life. Therefore, I believe, that to wait till the moral sense of man becomes a great deal more powerful than it is now and till then to allow countless generations of children to suffer privations and untimely death for no fault of their own is a great social injustice which should not be tolerated. I feel grateful for the cause you have made your own and for which you have suffered.[৮০]

The Amrita Bazar Patrika [5 Jan 1926] রবীন্দ্রনাথের পত্রটির প্রতিলিপি প্রকাশ করে, একই তারিখের আনন্দবাজার পত্রিকা-য় এর বঙ্গানুবাদ ছাপা হয় [দ্র রবীন্দ্র-প্রসঙ্গ ১। ২৯৯]।

আরও একটি ইংরেজি রচনা রবীন্দ্রনাথকে লিখতে হল রম্যাঁ রলাঁ-র ষষ্ঠিতম জন্মবার্ষিকী [29 Jan 1926] উপলক্ষে প্রকাশিতব্য *Liber Amicorvm Romain Rolland* [Rotapfel-Verlag, Zurich und Leipzig, 1926] গ্রন্থের জন্য [দ্র *Rolland and Tagore* [1945]/ 1-2], রচনাটি 5 Oct 1925 [সোম ১৯ আশ্বিন] শান্তিনিকেতনে লিখিত। রবীন্দ্রনাথ লিখলেন, যখন তিনি আমেরিকায় ছিলেন তখন ব্যক্তি মানুষকে তুচ্ছ করে দিয়ে নৈপুণ্যের অজুহাতে যান্ত্রিক নিয়মে পিণ্ডীকৃত বৃহদাকার প্রতিষ্ঠানের দ্রুত ও ব্যাপক শ্রীবৃদ্ধির বিরুদ্ধে তিনি একটি ভাষণ দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, জীবনের অধিকাংশ ক্ষেত্রে যন্ত্র মানুষের প্রতিনিধিত্ব করার ফলে একধরনের নৈতিক অসাড়তার উদ্ভব হচ্ছে। এই কারণে নিষ্ঠুরতা ও অবিচার করা অনেক সহজ হয়েছে, বৃহদাকার প্রতিষ্ঠানগুলির প্রতি আনুগত্যের কারণে ভয়ংকর অন্যায়ও ধর্মপালনের মর্যাদা লাভ ক'রে তাদের বিবেককে শান্তি দেয়। 'It is the modern form of fetish worship with its numerous rituals of human sacrifice, in the shadow of which all other religions have faded into unreality.' এই কথা শুনে একজন সহানুভূতিশীল শ্রোতা প্রশ্ন করেন, অন্য কোনো প্রতিষ্ঠান না গড়ে এইসব প্রাতিষ্ঠানিক অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়াই করা যাবে কী করে। 'My answer was that my reliance is on those individuals who have made human ideals living in their personality.' যাদের বিরুদ্ধে লড়াই তাদের পাশে তাঁদের ক্ষুদ্র ও দুর্বল মনে হতে পারে, যেন বৃহৎ প্রস্তরখণ্ডের পাশে গাছের চারা— কিন্তু বৃক্ষশিশুর মধ্যে আছে প্রাণের

শক্তি। 'I believe that when anti-human forces spread their dominion, individuals with firm faith in humanity are born, who become acutely conscious of the menace to man and fearlessly fulfil their destiny through insult and isolation.... When we see them, we know that the living spark of human spirit is not yet extinct and that there is hope. Human civilizations have their genesis in individuals, and they also have their protectors in them. One of the few proofs that the present day is not utterly barren of them is the life and work of Romain Rolland. And that the present day needs him most is proved by the scourging he has received from it, which is true recognition of his greatness by his fellow-beings.' নেপাল মজুমদার এই প্রসঙ্গে লিখেছেন : 'বিবেকী বুদ্ধিজীবীদের, বিশেষতঃ শিল্পী ও মনীষীদের নৈতিক সংগ্রামের একটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা আছে, সকলেই উহা একবাক্যে স্বীকার করেন। কিন্তু শুধুমাত্র বুদ্ধিজীবীদের নৈতিক সংগ্রামে পুঁজিবাদী শোষণব্যবস্থার অবসান ঘটান যায় না। তাছাড়া তখন রোলাঁ-বারবুস্ প্রমুখ ইউরোপীয় শিল্পীদের অহোরাত্র চিন্তা ও সাধনার বিষয়, কী ভাবে এই যুদ্ধবাজ সাম্রাজ্যবাদীদের মারমুখী-ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে বুদ্ধিজীবী ও শ্রমজীবী শ্রেণীর সম্মিলিত প্রতিরোধ-আন্দোলন সৃষ্টি করা যায়। রবীন্দ্রনাথ তখনও উহার বিস্তারিত খবর এবং উহার সঠিক তাৎপর্যও হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন নাই। কবি সাম্রাজ্যবাদের আক্রমণের বিরুদ্ধে এই প্রতিরোধ-আন্দোলনকে শুধু যেন নৈতিক সংগ্রামের স্তরেই সীমাবদ্ধ রাখিতে চাহিয়াছিলেন।'[৮১] উল্লেখ্য, বিবিধ চেষ্টা সত্ত্বেও রলাঁ-বারবুস্‌দের সংগ্রামী আন্দোলন যখন সাম্রাজ্যবাদী আক্রমণে ধূলিসাৎ হয়ে গেছে, তখন রবীন্দ্রনাথের নৈতিক সমর্থন যেমন রলাঁরা চেয়েছেন তেমনি মুসোলিনিদেরও লোভ ছিল এরই প্রতি। ইতিহাসের গতিতে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অন্তে রাশিয়া ও চিনে পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে এক শ্রেণীর সাম্যবাদী সাম্রাজ্যবাদেরও উদ্ভব হয়েছিল— য়ুরোপে ও এশিয়ায় তার ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত দেখা গিয়েছে। রলাঁ-বারবুস্ এই পরিণতির কথা ভাবতে পারেননি, রবীন্দ্রনাথ ভেবেছেন এবং 'রথের রশি' বা 'কালের যাত্রা' নাটকে ও অনেক রচনায় তার ইঙ্গিতও রেখে গেছেন।

এর পরেই ক্যাশবহিতে '২১ আশ্বিন [বুধ 7 Oct] কর্ত্তাবাবু মহাশয়ের সঙ্গীয় লগেজ আদি হাওড়া হইতে জোড়াসাঁকো ঢোলাই'-এর খরচের হিসাব থেকে জানা যায়, রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতন ছেড়ে কলকাতায় চলে এসেছেন— আসার কারণ কর্ণপীড়া। পীড়ার বিবরণটি রবীন্দ্রনাথ কৌতুকরস মিশিয়ে বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন ৯ কার্তিক [26 Oct] দার্জিলিং-প্রবাসিনী ইন্দিরা দেবীকে :

এবার আমার ব্যামোটা একটুও শ্রুতিসুখকর হয়নি। সাধারণত রোগ দুঃখ সম্বন্ধে আমি অনুদ্বিগ্নমনা হবার চেষ্টা করে থাকি এবারে আমাকে তার উদ্বেগে শান্তিনিকেতন থেকে এখানে খেদিয়ে এনেছে। প্রথম প্রথম আমার পীড়া কর্ণ ধরে যেরকম ঝিঁকে মারছিল এখন আর ততটা বেগ নেই কিন্তু চেপে ধরে আছে। কানে শুন্‌চি খুব কম, ডাক্তার বলচে ভিতরের প্রদাহটা কমে গেলে আবার শুন্‌তে পাব। তুই চিঠিতে আক্ষেপ প্রকাশ করেছিস, যে ডাক্তারের কথা আমি কানে তুলি নে সে কথা সত্য হয়ে উঠেছে। কিন্তু ডাক্তার আমার কানে কথা প্রয়োগ বন্ধ করে অন্য রকম প্রয়োগবিধি সুরু করেছে— উপদেশের চেয়ে তাতে বেশি ফল পাওয়া যাবে বলে সকলে আশা করচে। মনটা উড়ু উড়ু করে কিন্তু কানটা রয়েছে ডাক্তারের হাতে। কতদিনে যে খালাস করে নিতে পারব তার কোনো ঠিকানা নেই। বোলপুর থেকে মরিসকে আনিয়ে নিয়েছি— সে আমার চিঠিপত্র লিখে দেয়, ডাক্তার এলে তার সহকারিতা করে, যথাসময়ে ভোজ্য প্রস্তুত হলে তৎ-সম্বন্ধে আমার কর্তব্য স্মরণ করিয়ে দেয়, অপরাহ্নে বায়ু সেবনের জন্যে মোটর-রথযাত্রা আমার পক্ষে উপাদেয় ব'লে দু'দিন থেকে কানের কাছে মুখ এনে উচ্চস্বরে পরামর্শ দিচ্চে—তার সেই হিতবাণী আমার চেয়ে স্পষ্ট করে শুনতে পাচ্চে ওবাড়ির থেকে গগনরা।[৮২]

এইরূপ অসুস্থ অবস্থায় বয়স্ক মানুষ আপনজনের সঙ্গ ও সেবার প্রত্যাশা করেন, রবীন্দ্রনাথের ভাগ্য এ ব্যাপারে প্রায়শই তাঁর আনুকূল্য করেনি। সেই আক্ষেপের ইঙ্গিত আছে ইন্দিরাকে লেখা তাঁর ৩১ আশ্বিনের [17 Oct] পত্রে : 'মীরা কিছুদিন হল তার বন্ধু শ্রীমতীর সঙ্গে আমেদাবাদে বেড়াতে গিয়েছে— কথা ছিল বৌমা এসে চার্জ্জ বুঝে নেবেন— ঠিক দিনে চিঠি পাওয়া গেল তিনি প্রশান্তদের সঙ্গে রাজপুতানায় ভ্রমণ করতে যাত্রা করলেন। যখন মনে মনে বল্‌চি আমি স্বাধীন, আমি আত্মপর্য্যাপ্ত— এমন সময়ে বিধাতা আমার দর্পহরণ করবার জন্যে শরীর দিলেন ভেঙে। জাহাজভাঙা রবিনসন্ ক্রুসোর মত বেদনা-সমুদ্রে ঘেরা নির্জ্জনতার মধ্যে আট্‌কা পড়লুম। সেখানে গুড্ ফ্রাইডের অভাব ছিল না কিন্তু রোগের দিনে তাদের নিয়ে চলে না। এখন আছি তেতালার কোণের ঘরে— কমল হয়েছেন অভিভাবক—সুখে দুঃখে দিন চলে যাচ্চে। এরই মধ্যে রোগশয্যায় সরলা দূত পাঠিয়েছিল আমাকে ধরবার জন্যে। সে কালীপূজোর নূতন ব্যাখ্যা ক'রে হিন্দুসমাজের চমক লাগাবার আয়োজন করচে, তার ইচ্ছে আমি হই সভাপতি। এখন বুঝতে পারবি বিধির বিধানে রোগ জিনিষটাও নিরবচ্ছিন্ন মন্দ নয়। ডাক্তারের সার্টিফিকেট দেখিয়ে খালাস পেয়েছি। সরোজিনী নাইডু সরলাকে মর্ত্ত্য থেকে হঠিয়ে দিয়েছে বটে কিন্তু এখনো স্বর্গলোক বাকি আছে— তাই সরলা মরীয়া হয়ে দেবদেবীর সঙ্গে পাল্লা দিতে লেগেছে। বেচারা কালীর জন্যে তোরা প্রার্থনা করিস্।'[৮৩] এই ভাগিনেয়ীটির অদ্ভুত মতামত ও কার্যকলাপ রবীন্দ্রনাথের অপছন্দ ছিল, তাই প্রায়শই তাঁকে নিয়ে তিনি ব্যঙ্গবিদ্রূপ করেছেন — বিশেষত ইন্দিরা দেবীর কাছে! সন্দেহ হয়, 'নামঞ্জুর গল্প' কাহিনীটির পশ্চাদ্‌পটে সরলা দেবীর ভূমিকা রয়েছে।

6 Oct [২০ আশ্বিন] রবীন্দ্রনাথ আঁদ্রে কার্পেলেস্‌কে একটি চিঠি লিখেছিলেন, তার মধ্যেও এইরূপ বেদনার কথা আছে। তিনি লেখেন :

I wish I had boldly defied doctor's advice and sailed away for Europe last August. I know I could be in proper hands there and loving care would not be wanting. I have not yet had any benefit through this interruption in my programme. Not only my weakness persists but my longing to be once again among my friends in Europe is daily growing stronger making me feel afraid lest it should never be realised. I am cherishing the hope that about the end of the winter— sometime in March— I shall find myself in your neighbourhood.... Romain Rolland is arranging for me some Sanatorium— most probably in Switzerland where he will put me under a capable doctor. But I do hope you will not transfer your responsibility to him and desert me. My illness has brought back to me my boyhood with all its craving for personal sympathy and ministration.[৮৪]

বেঙ্গল লাইব্রেরির ক্যাটালগ অনুসারে 'গৃহপ্রবেশ' প্রকাশিত হয় 12 Oct 1925 [২৬ আশ্বিন], মুদ্রণসংখ্যা ১০০০। আখ্যাপত্রে আছে :

গৃহপ্রবেশ/ শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর / বিশ্বভারতী গ্রন্থালয় / ১০ নং কর্ণওয়ালিস্ স্ট্রীট্, কলিকাতা

[পরের পৃষ্ঠায় :] বিশ্বভারতী গ্রন্থালয় / প্রকাশক — শ্রীকরুণাবিন্দু বিশ্বাস। ১০, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। / গৃহপ্রবেশ / আশ্বিন, ১৩৩২ / মূল্য — দশ আনা / প্রবাসী প্রেস—৯১, আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা। / শ্রীঅবিনাশচন্দ্র সরকার কর্ত্তৃক মুদ্রিত।
— 'গৃহপ্রবেশ' আশ্বিন-সংখ্যা প্রবাসী-তেই মুদ্রিত হয়।

আশ্বিন ১৩৩২-এ রবীন্দ্রনাথের নিম্নলিখিত রচনাগুলি বিভিন্ন সাময়িকপত্রে প্রকাশিত হয় :

প্রবাসী, আশ্বিন ১৩৩২ [২৫ / ১ / ৬] :

৭৫৩-৮৪ 'গৃহপ্রবেশ' দ্র গৃহপ্রবেশ ১৭। ১০৭-৫১

৮২৯-৩১ 'অরূপ-রতনের গানের স্বরলিপি

৮২৯-৩০ (১) '[আমি] তোমার প্রেমে.হবো সবার' দ্র গীত ২। ৩০৭-০৮; স্বর ৬২

৮৩০-৩১ (২) 'এখনো গেল না আঁধার' দ্র গীত ১। ৭০; স্বর ৪২— দুটি গানেরই স্বরলিপি করেন সাহানা দেবী।

প্রবাসী-র গত সংখ্যায় ঘোষিত হয়েছিল যে, আশ্বিন-সংখ্যায় 'কর্মফল' নাটক মুদ্রিত হবে— কিন্তু বর্তমান সংখ্যায় 'গৃহপ্রবেশ' প্রকাশের কৈফিয়ৎ-স্বরূপ লেখা হয় :

অনেক বৎসর পূর্ব্বে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত "কর্ম্মফল" নামক একটি গল্প প্রকাশিত হয়। সম্প্রতি তিনি তাহাকে নাটকের আকার দিয়া "প্রবাসীতে" ছাপিতে দিবেন বলেন। পরে "গৃহপ্রবেশ" রচিত হয়। তখন তিনি "কর্ম্মফল" ও "গৃহপ্রবেশ" এই দুটির মধ্যে একটি বাছিয়া লইতে বলেন। তদনুসারে "প্রবাসীর" জন্য "গৃহপ্রবেশ" নির্ব্বাচিত হয়। এই কারণে প্রবাসীর আশ্বিন সংখ্যায় "কর্ম্মফল" বাহির হইবে, এইরূপ বিজ্ঞাপন দেওয়া সত্ত্বেও তাহার পরিবর্তে "গৃহপ্রবেশ" প্রকাশিত হইল।

এ বিষয়ে নানা কাল্পনিক কথার প্রচার হইতেছে বলিয়া, প্রকৃত কথা আমরা যতটুকু পাঠকদিগকে জানান দরকার লিখিলাম।

'গৃহপ্রবেশ' নাটকে প্রবাসী-র পাঠে ৭টি গান আছে, তাদের মধ্যে "বাজোরে বাঁশরি বাজো', 'যদি হল যাবার আয়োজন' ও 'যৌবনসরসীনীরে' নূতন তিনটি গান Ms. 464 পাণ্ডুলিপিতে পাওয়া যায়। অভিনয়ের সময়ে ও পরে রবীন্দ্রনাথ আরও কয়েকটি গান সংযোজন বা বর্জন করেন— রবীন্দ্র-রচনাবলী-র পাঠে ৯টি গান আছে। নানা সময়ে রবীন্দ্রনাথ নাটকটিতে কিছু অতিরিক্ত চরিত্র, সংলাপ প্রভৃতি সংযোজিত করেন দ্র গ্রন্থপরিচয় ১৭। ৪৪০-৫১; পশ্চিমবঙ্গ সরকার-প্রকাশিত রবীন্দ্র-রচনাবলী ১৬শ খণ্ডের [১৪০৮] গ্রন্থপরিচয়ে [পৃ ৭৩১-৪০] আরও তথ্য সংযোজিত হয়েছে।

'কর্মফল'-এর নাট্যরূপ 'শোধবোধ' প্রকাশিত হয় [আশ্বিন] ১৩৩২-এর 'বার্ষিক বসুমতী' পত্রিকায়। এটি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় 19 Jun 1926 [৪ আষাঢ় ১৩৩৩] তারিখে, মুদ্রণসংখ্যা ১১০০। এর অনতিকাল পরে ৭ শ্রাবণ [শুক্র 23 Jul] আর্ট থিয়েটার লিমিটেড-কর্তৃক স্টার থিয়েটারে নাটকটির প্রথম অভিনয় অনুষ্ঠিত হয়।

এই গ্রন্থটির পাণ্ডুলিপি সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য তথ্য হল, 'গৃহপ্রবেশ' নাটকের অন্যের-হাতে কপি-করা শাদা এক্সারসাইজ খাতা পাণ্ডুলিপিটির খালি পৃষ্ঠাতে রবীন্দ্রনাথ 'শোধবোধ' নাটকটি লিখতে শুরু করেন। প্রথম দৃশ্যটি দু'কলমে লেখা, ইংরেজি শব্দগুলি রোমান হরফেই লিখিত, মুদ্রিত গ্রন্থের সঙ্গে পার্থক্য বিশেষ নেই। দ্বিতীয় দৃশ্যটি 'কর্ম্মফল' গল্পের একটি মুদ্রিত কপির শুরুতে একটি সাদা পাতা জুড়ে আরম্ভ হয়েছে, 'সতীশের মাসি সুকুমারী ও মেসোমশায় শশধরবাবুর প্রবেশ' মুদ্রিত কপিটির উপরেই সংশোধন-পরিবর্ধন করে লেখা।

বোঝা যায়, রবীন্দ্রনাথ ‘গৃহপ্রবেশ’ রচনার পরে ‘কর্মফল’ গল্পের নাট্যরূপান্তর ‘শোধবোধ’ রচনায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। নাটকটিতে মাত্র তিনটি গান ব্যবহৃত হয়েছে— ‘বেদনায় ভরে গিয়েছে পেয়ালা’, ‘[এবার] উজাড় করে লও হে আমার’ ও ‘সে আমার গোপন কথা’— সবগুলি গানের পাণ্ডুলিপিই Ms. 464-এ পাওয়া যায়।

সবুজপত্র, আশ্বিন ১৩৩২ [৯ / ২] :

১৩৬-৫০ ‘স্বরাজ সাধন’ দ্র কালান্তর [সংযোজন] ২৪। ৪১৪-২২

কল্লোল, আশ্বিন ১৩৩২ [৩ / ৬] :

৪৯৭ ‘শেফালি’ [‘ওলো শেফালি / সবুজ ছায়ার আঁধারে তুই’] দ্র গীত ২। ৪৯০; স্বর ৩১

এখানে গানটির রচনা-তারিখ পাওয়া যায় ‘শ্রাবণ সংক্রান্তি ১৩৩২’ [৩১ শ্রাবণ রবি 16 Aug 1925]।

কার্তিক ১৩৩২-এ সাময়িকপত্রে রবীন্দ্রনাথের প্রকাশিত রচনার তালিকা নিচে দেওয়া হল :

প্রবাসী, কার্তিক, ১৩৩২ [২৫ / ২ / ১] :

১-৫ ‘চিঠি’ দ্র চিঠিপত্র ১৪ [১৪০৭]

চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে লেখা রবীন্দ্রনাথের ৭টি চিঠি এখানে মুদ্রিত হয়।

সবুজপত্র, কার্তিক ১৩৩২ [৯ / ৩] :

১৫১-৭৬ ‘শেষ বর্ষণ’ দ্র শেষ বর্ষণ ১৮। ১২৭-৪৩

এখানে সম্পূর্ণ গীতিনাট্যটি মুদ্রিত হয়েছে, যাতে মোট গানের সংখ্যা ২৪টি।

শান্তিনিকেতন, কার্তিক ১৩৩২ [৬ / ১০] :

২০৩-০৫ ‘বুধবার মন্দির / ৩১শে আষাঢ় ১৩৩২’

২০৫ ‘অনুবাদ’ [‘সেই তো পুরুষ সিংহ উদ্যোগী যে জন’] দ্র রূপান্তর ২৮। ১৭৪

২০৫-০৮ ‘শেষ বর্ষণ’

‘তব দয়া দিয়ে হবে গো মোর’ গানটির মর্মব্যাখ্যা অবলম্বনে উপাসনাটি প্রদত্ত হয়। ঘটকর্পরের ‘নীতিসার’ গ্রন্থের অন্তর্গত ‘উদ্যোগিনং পুরুষসিংহমুপৈতি লক্ষ্মীঃ’ শ্লোকটির রবীন্দ্রনাথ-কৃত অন্তত ৪টি বঙ্গানুবাদ পাওয়া গেছে— এটি তারই একটি। ‘শেষ বর্ষণ’ গীতিনাট্যের ১৩টি গান এখানে মুদ্রিত হয়।

The Visva-Bharati Quarterly, October 1925 [Vol. III, No. 3] :

195-208 ‘Judgment’ দ্র *EWRT*/ 549-58

234 ‘Come My Lover' ('Come my lover, in thy lavish splendour’]

279-82 ‘Illuminated Travel Literature’

283-85 ‘Visva-Bharati Bulletin’/ I ‘Red Oleanders/ Author's Interpretation’ (From the Manchester Guardian) দ্র র° র° ১৬ [প.ব.]। ৭৫৬-৫৯

‘Judgment’ প্রবন্ধটি রবীন্দ্রনাথ 12 May 1924 পিকিঙে পাঠ করেন। ‘Come My Lover’ কবিতাটি ‘খেয়া’ কাব্যগ্রন্থের ‘প্রচ্ছন্ন’ [‘কোথা ছায়ার কোণে দাড়িয়ে তুমি’] কবিতার ইংরেজি রূপান্তর। কাউন্ট কাইজারলিং 5 Mar 1925 রবীন্দ্রনাথকে লিখেছিলেন : ‘I must send you my Travel Diary of a

Philosopher in its English setting, which will be out in a few weeks.... Should you see your way to write a few lines about it in the Visva-Bharati, you would oblige me much.' 'Illuminated Travel Literature' সেই গ্রন্থটিরই মূল্যায়ন শেষোক্ত রচনাটির বিষয়বস্তু তার নামেই প্রকাশ পেয়েছে। আমরা আগেই বলেছি, 'রক্তকরবী'র দীর্ঘতর একটি মর্মব্যাখ্যা রবীন্দ্রনাথ আর্জেন্টিনায় থাকার সময়ে ভিক্টোরিয়া ওকাম্পোর কাছে করেছিলেন— এল্‌ম্‌হার্স্ট-কৃত তার অনুলেখন বিশ্বভারতী কোয়ার্টার্লি-র Nov 1951-Jan 1952-সংখ্যায় মুদ্রিত হয় দ্র র° র° ১৬ [প.ব.]। ৭৫৯-৬৫।

কর্ণপীড়ার চিকিৎসার জন্য রবীন্দ্রনাথ কলকাতায় আসেন ২১ আশ্বিন [7 Oct] তারিখে, এখানে তিনি ডাঃ তেজেন্দ্রনাথ রায়ের চিকিৎসাধীন ছিলেন। মোটামুটি সুস্থ হয়ে তিনি শান্তিনিকেতনে ফেরেন দীর্ঘদিন পরে ৩ অগ্রহায়ণ [বৃহ 19 Nov] তারিখে। তার আগের দিন নিজের শারীরিক অবস্থার বর্ণনা দিয়ে অমিয় চক্রবর্তীকে লেখেন :

এদিকে কাঁধের উপরে এক মস্ত দায় চেপেছে— সর্ব্বভারতীয় দার্শনিক সম্মেলনের সভাপতি হয়ে বসেছি কতকটা আরব্য উপন্যাসের আবু হোসেনের গতিক। ইংরেজিতে একখানা বক্তৃতা লিখতে বসেছি— যতক্ষণ সভায় পড়া না হবে সেই বিলিতী ভূতটার পিণ্ডদান শেষ হবে না, মগজের মধ্যে তার উৎপাত চল্‌তে থাকবে। এ সমস্তর উপরে সম্পাদকবর্গের দাবী বহুধা হয়ে আমাকে ব্যস্ত করে তুলেছে।

কাল পালাচ্চি শান্তিনিকেতনে।[৮৫]

Indian Philosophical Congress-এর প্রথম অধিবেশন বসে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোগে 19 Dec 1925 [শনি ৪ পৌষ] সিনেট হলে, রবীন্দ্রনাথ সেখানে 'The Philosophy of Our People' প্রবন্ধটি পাঠ করেন। এই সময়ে উক্ত ভাষণ রচনায় তিনি ব্যস্ত হয়ে পড়েন। লেখাটি শেষ হতে দেরি হয়। 2 Dec [বুধ ১৬ অগ্র] ইন্দিরা দেবীকে লিখছেন : 'দিনরাত লোকজন, কথাবার্ত্তা, কাজ কর্ম, তার উপরে এক অভিভাষণ কাঁধে চেপেছে। মনটা ভিতরে ভিতরে লেখা সম্বন্ধে হরতাল নেবার পরামর্শ করচে। টাকা ছুঁলেই রামকৃষ্ণ পরমহংসের যেরকম সর্ব্বাঙ্গে আক্ষেপ উপস্থিত হ'ত কলম ছুঁতে গেলেই আমার সেই রকম হয়। ··· লেখার তাগিদ মনের মধ্যে নেই।'[৮৬] লেখাটির মধ্যে অবশ্য কোনো অনাগ্রহের চিহ্ন নেই।

রবীন্দ্রনাথ ইতালি ভ্রমণের সময়ে ইতালিয়ান ভারততত্ত্ববিদ্ কার্লো ফর্মিকি-কে অনুরোধ করেছিলেন, সুযোগ পেলে তিনি যেন বিশ্বভারতীতে অতিথি-অধ্যাপক হিসেবে যোগ দেন। ফর্মিকির সম্মতিপত্র পাওয়ার পরে 26 Aug [১০ ভাদ্র] কর্মসমিতির বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয়, মাসিক ৫০০্ টাকা সাম্মানিক বৃত্তিতে পাঁচ মাসের [Nov 1925-Mar 1926] জন্য অতিথি-অধ্যাপক রূপে নিয়োগ করা হচ্ছে এবং তাঁর বৃত্তি ও যাতায়াতের খরচ হিসেবে মোট ৪০০০্ টাকা মঞ্জুর করা হয়। ফর্মিকি 'রবীন্দ্রবীক্ষা' সংকলন ৩৯-এ [২২ শ্রাবণ ১৪০৮, পৃ ৩১-৫০] প্রকাশিত 'On Tagore' প্রবন্ধে লিখেছেন : 'On 20 August 1925 I received the following telegram from Calcutta: "On behalf of Visvabharati I invite you as visiting professor for the period from November to March at same conditions as previous professors. Council's official letter following soon— Rabindranath Tagore, Chancellor, Visva-bharati."

ফর্মিকির বহুদিনের স্বপ্ন সফল হল। কিন্তু এর কয়েকদিন পরেই কালিদাস নাগ একটি চিঠিতে তাঁকে অনুরোধ করলেন, শান্তিনিকেতনবাসীরা চান তিনি যেন তাঁর সঙ্গে একজন ইতালিয়ান ভাষাশিক্ষক এবং শিল্প

ও নন্দনতত্ত্ববিষয়ক পুস্তকসংগ্রহ নিয়ে আসেন, তাঁর পূর্ববর্তী অতিথি-অধ্যাপকেরা যেমন এনেছিলেন। ফর্মিকি শিক্ষাদপ্তর ও বিদেশদপ্তরে আবেদন করে ব্যর্থ হওয়ার পরে স্বয়ং মুসোলিনির শরণাপন্ন হন। মুসোলিনি এই সুযোগ ত্যাগ করেননি, তিনি সরকারি খরচে রোম বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক Dr. Giuseppe Tucci-কে বিশ্বভারতীর জন্য মনোনীত করেন এবং ফর্মিকির দেওয়া পুস্তকতালিকার উপরে লিখে দেন 'to be increased and completed'।

অতঃপর ফর্মিকি 21 Nov [শনি ৫ অগ্র] বিকেল চারটের সময়ে বোলপুর স্টেশনে উপস্থিত হন। এই বিষয়ে কার্তিক-সংখ্যা শান্তিনিকেতন-এ লিখিত হয় :

এতদুপলক্ষ্যে আশ্রমের আম্রকুঞ্জে আশ্রমবাসী ছাত্রছাত্রী অধ্যাপক ও মহিলাগণ সমবেত হইয়াছিলেন। সভায় স্বয়ং পরম পূজনীয় আচার্য্যদেব উপস্থিত ছিলেন। অধ্যাপক মহাশয় শঙ্খধ্বনির মধ্যে সভায় পদার্পণ করিলে সকলে দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহাকে স্বাগত করেন। এতদুপলক্ষ্যে পূজনীয় আচার্য্যদেব একটি পুরাতন গানকে কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন করিয়া সময়োপযোগী করিয়া তুলিয়াছিলেন তাহা গীত হয় ['শান্তিমন্দির পুণ্য অঙ্গন' দ্র শান্তিনিকেতন, অগ্র। ২২০]। তৎপরে পূজনীয় শাস্ত্রী মহাশয় তাঁহাকে মাল্যচন্দনে অভিনন্দিত করিলে স্বয়ং আচার্য্যদেব ভারতবর্ষের, বিশ্বভারতীর, এবং নিজের তরফ হইতে তাঁহাকে সম্বর্ধনা করেন।

ইহার উত্তরে অধ্যাপক বলেন, বন্ধুগণ, আমি সমগ্র ইতালির সম্ভাষণ এবং শুভকামনা বহন করিয়া তোমাদের কাছে আসিয়াছি। ইতালি ও ভারতবর্ষের মধ্যে ভৌগোলিক, ঐতিহাসিক ও পৌরাণিক যোগ আছে কিন্তু এইবার আন্তরিক যোগ সাধন করিবার সময় আসিয়াছে। আমি ইতালি হইতে যাত্রা করিবার পূর্ব্বাহ্নে ইতালির বর্ত্তমান অধিমন্ত্রী (Prime Minister) মুসোলিনীর নিকট হইতে তার পাইয়াছিলাম। তাহাতে তিনি ভারতীয় বিদ্যার প্রধান কেন্দ্র বিশ্বভারতীর মঙ্গল কামনা করিয়াছেন এবং ইতালির যাহা গৌরবের বস্তু সেই চিত্রকলা ও সাহিত্যের যাবতীয় গ্রন্থাবলী তিনি বিশ্বভারতীকে দান করিয়াছেন। অধ্যাপক মহাশয় আরো বলেন যে ইতালি গভর্ণমেন্ট বিশ্বভারতীতে ইতালীয় ভাষা আলোচনার জন্য একজন অধ্যাপককে পাঠাইতেছেন— তিনি শীঘ্রই আসিয়া পৌছিবেন।

ফর্মিকি তাঁর প্রবন্ধে মুসোলিনির পাঠানো বার্তাটি সম্পূর্ণ উদ্ধৃত করেছেন :

Distinguished Professor,/ In expressing my vivid satisfaction for the invitation you have received from Visvabharati University, which honours not only an Italian scientist but also Italian science and the University of Rome. I am glad to entrust you the task of bringing the books mentioned in the enclosed list as a gift to that University, the main centre of Indian culture. I wish this offer will help in strengthening more and more the cultural relations between India, the classical land and cradle of the world's civilization, and Italy.

শান্তিনিকেতন অতিথিশালায় 22 Nov সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত কর্মসমিতির বৈঠকে ফর্মিকির আগমন-সংবাদ ঘোষণা করে মুসোলিনির চিঠিটি পঠিত হয় ও প্রস্তাব নেওয়া হয় : 'Resolved that the matter be reported to the Samsad with the recommendation that a cable be sent to Signor Mussolini in the name of the Founder-President on behalf of the Visva-Bharati expressing the heartfelt thanks of the Visva-Bharati for Signor Mussolini's generous gift and for his practical sympathy with its ideals.' মুসোলিনিকে প্রেরিত কেব্‌ল্‌টির রবীন্দ্রনাথের স্বহস্তে লিখিত খসড়া রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত আছে :

Allow me to convey to you our gratitude in the name of Visva-Bharati for sending us through Prof. Formichi your cordial appreciation of Indian civilization and deputing Prof.

Tucci of the Uniyersity of Rome for acquainting our student with Italian History and Culture and working with us in various departments of Oriental studies and also for the generous gift of books sent in your name showing a spirit of magnanimity worthy of the tradition of your great country. I can assure you that such an expression of sympathy from you as the representative of the Italian people will open up a channel of communication for exchange of culture between your country and ours having every possibility of developing into an event of great historical significance.

এই বার্তার বঙ্গানুবাদ আনন্দবাজার পত্রিকা-য় ১০ অগ্র [26 Nov] প্রকাশিত হয়।[৮৭]

এই সময়েই ৮ অগ্র [মঙ্গল 24 Nov] বাংলার গবর্নর লর্ড লিটন ও তাঁর পত্নী রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সাক্ষাৎ ও বিশ্বভারতীর কাজকর্ম পরিদর্শনের উদ্দেশ্যে শান্তিনিকেতনে আগমন করেন। ১০ অগ্র আনন্দবাজার পত্রিকা জানায় :

মঙ্গলবার প্রাতে গবর্নর বাহাদুর বোলপুরে পৌঁছেন। তথা হইতে মোটরযোগে তিনি কবির গৃহে গমন করেন। গৃহদ্বারে কবি এবং তাঁহার পুত্রবধূ তাঁহাকে অভ্যর্থনা করেন। তথায় কবির সহিত কিছুকাল আলাপের পর তাঁহাকে বিশ্বভারতীতে লইয়া যাওয়া হয়। তিনি তথায় বিশ্বভারতীর বিশাল পুস্তকালয় পরিদর্শন করেন এবং সংগ্রহের প্রাচুর্য্য দেখিয়া বিশেষ তৃপ্ত হন। ইটালীর অধ্যাপক কার্লো-ফর্ম্মিকিকে তাঁহার সহিত পরিচয় করিয়া দেওয়া হয়। অতঃপর লর্ড লিটন কবির সহিত জলযোগ করেন। জলযোগে বহু গণ্যমান্য ব্যক্তিকে নিমন্ত্রণ করা হইয়াছিল।···

অপরাহ্নে লাটবাহাদুর আম্রকাননে চা পান করেন। সায়ংকালে নানাবিধ আমোদের বন্দোবস্ত হইয়াছিল। লাটবাহাদুরের চিত্তবিনোদনার্থ মধুর মনোমুগ্ধকর সঙ্গীতের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। অতঃপর রবীন্দ্রনাথের একখানা নাটক অভিনয় হয়। তাহাতে শান্তিনিকেতনের বালিকারা কৃতিত্বের সহিত অভিনয় করিয়া শ্রোতৃবর্গের সন্তুষ্টি উৎপাদন করিয়াছিল।

রাত্রিতে লাটবাহাদুর আশ্রম পরিত্যাগ করেন।[৮৮]

১৪ অগ্র উক্ত পত্রিকাতেই 'চিঠিপত্র' বিভাগে জনৈক 'দর্শক' স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ-নিন্দিত অর্ডিন্যান্সের প্রবর্তক ও অন্যান্য অপকর্মের নায়ক লিটনকে শান্তিনিকেতনে আপ্যায়ন নিয়ে অভিযোগ জানিয়ে লেখেন : 'লাট-বাহাদুরের শান্তিনিকেতনে আগমনের সংবাদে কোন কোন স্থান হইতে প্রতিবাদের গুঞ্জন উঠিলে, কর্ত্তৃপক্ষ এই বলিয়া তাঁহাদের সান্ত্বনা দিয়াছেন যে লর্ড লিটন বাঙ্গলার গবর্নর হিসাবে এখানে আসিতেছেন না; তিনি আসিতেছেন এক সাধারণ অতিথি হিসাবে। ইহার সূক্ষ্ম পার্থক্য, অত্যন্ত দুর্ভাগ্যের কথা, আমাদের স্থুল বুদ্ধিতে কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারি নাই।'[৮৯] রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় পৌষ-সংখ্যা 'বিবিধ প্রসঙ্গ'-তে 'লিটনের শান্তিনিকেতন গমন' [পৃ ৯৮-১০০] রচনায় উক্ত দর্শকের মন্তব্যের প্রতিবাদ করে লেখেন : 'কিছুদিন আগে রবিবাবুর সহিত কলিকাতায় কথা প্রসঙ্গে লাট-সাহেবের শান্তিনিকেতন দর্শন-সম্বন্ধে তিনি যাহা বলেন তাহা লিপিবদ্ধ করিবার অনুমতি আমরা চাই নাই। অনুমতি থাকিলে প্রমাণ করা সহজ হইত যে, ঐ দর্শন-ব্যাপারটা তাঁহার আকাঙ্ক্ষিত বস্তু ছিল না।' প্রকৃতপক্ষে কেউ নিজের থেকে শান্তিনিকেতনে আসতে চাইলে তাঁকে বারণ করা ঠাকুরবাড়ির আভিজাত্যের বিরোধী ছিল— এই কারণেই অত্যাচারী শাসক ভাইসরয় লর্ড আরউইনের আগমনে বিশ্বভারতীর অধ্যাপক ও ছাত্রেরা ক্ষুব্ধ হলেও রবীন্দ্রনাথকে বাধ্য হয়ে সেই তিক্ততা মেনে নিতে হয়। তাছাড়া বিশ্বভারতীরই স্বার্থে লর্ড লিটনের আনুকূল্য রবীন্দ্রনাথের পক্ষে আবশ্যক ছিল— সেই আলোচনা আমরা যথাস্থানে উত্থাপন করব।

লর্ড ও লেডি লিটনকে আপ্যায়িত করার জন্য রবীন্দ্রনাথের কোন্ নাটক অভিনীত হয়েছিল আমাদের জানা নেই। কিছুদিন আগে তাঁর অনুরোধে ত্রিপুরার তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী কুমার ব্রজেন্দ্রকিশোর দেববর্মা শান্তিনিকেতনে মণিপুরী নৃত্যশিক্ষা দেওয়ার জন্য ঠাকুর নবকুমার সিংহ ও তাঁর অনুজ বৈকুণ্ঠনাথকে পাঠিয়ে দেন। বর্তমান প্রসঙ্গে নবকুমার লিখেছেন : "কিছুকাল পরে শান্তিনিকেতনে 'প্রাইভেট ভিজিটে' আসিলেন তৎকালীন বাংলার ছোটলাট লর্ড লীটন। কবি তাঁহার অতিথি-আপ্যায়নের যথারীতি ব্যবস্থা করিলেন। এই উপলক্ষে সংগীত-নৃত্যেরও আয়োজন হইয়াছিল। মনে পড়ে, আমি খুব সংক্ষিপ্ত সময়ের মধ্যে কয়েকজন মেয়েকে নিয়া মণিপুরী 'রাসলীলা নৃত্য' পরিবেশন করিয়াছিলাম। নৃত্যে সংযোজিত পদগুলির মধ্যে একটির শেষ পংক্তি ছিল— 'গোবিন্দ দাস তাই যায় বলিহারি'। কবির অনুমতি না লইয়াই আমি ভণিতায় 'গোবিন্দ দাসের' স্থলে 'রবীন্দ্রনাথ' বসাইয়া দিয়াছিলাম। ছোটলাট আমাদের আতিথেয়তার উচ্চ প্রশংসা করিয়াছিলেন।"[৯০]

৯ অগ্র [বুধ 25 Nov] প্রবাসী-র তৎকালীন কার্যকরী সম্পাদিকা শান্তা দেবীর লেখা পাঠানোর তাগিদের উত্তরে রবীন্দ্রনাথ অগ্র-সংখ্যা প্রবাসী-তে মুদ্রিত 'নামঞ্জুর গল্প'টির প্রতি ইঙ্গিত করে লিখলেন : 'আমার আশা ত্যাগ কর— যুগলক্ষ্মী ক্ষণকালের জন্যে আমার খেয়ালে ভর করেছিলেন, সম্প্রতি তাঁর ঠিকানা কোথায় কেউ জানে না। এখানে এসে অবধি নিজের শরীরের দুঃখটা নিয়েও যে একটু আরাম করে তাকে লালন করব তারও সময় পাই নি। ··· অবকাশের ফাঁকা কোথাও নেই, সমস্ত নিরেট করে কাজে অকাজে ঠাসা।··· সবচেয়ে মুস্কিল হচ্চে লেখায় অরুচি। নানা দিকে আমাকে যতই টান্চে আমার মন ততই উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে উঠ্চে।'[৯১]

এইরূপই এক অকাজে এইদিনই তাঁকে লক্ষ্মীশ্বর সিংহের 'কাঠের কাজ' গ্রন্থের ভূমিকা লিখতে হল। লক্ষ্মীশ্বর [1905-78] দারুশিল্পে শিক্ষা গ্রহণ করে শ্রীনিকেতনে কর্মগ্রহণ করেন। কার্তিক-সংখ্যা শান্তিনিকেতন-এ জানানো হয়েছে : 'আজকাল আশ্রমের কর্তৃপক্ষগণ ছেলেদের হাতের কাজ শিখাইবার দিকে অনেকটা দৃষ্টি দিয়াছেন··· অনেকে ছোটখাটো ডেস্ক, বাক্স, আলমারী প্রভৃতি কাঠের জিনিস তৈরি করিতে পারে। গত বৎসর ইহারা ছেলেদের জন্য ২৫টি কাঠের ডেস্ক তৈরি করিয়া দিয়াছিল।' লক্ষ্মীশ্বর এই বিষয়েই গ্রন্থ রচনা করলে রবীন্দ্রনাথ ভূমিকায় লেখেন :

> ···বাঙালী ভদ্রসন্তানের একমাত্র মোক্ষ লাভ ছিল চাকরিধামে, কেরাণীতীর্থে। সেখানে জায়গার টানাটানি ঘটিতেই দেখা গেল তাহার মতো অসহায় প্রাণী জীবলোকে আর নাই। সংসার সমুদ্রে পুঁথিগত বিদ্যাই যাহাদের একমাত্র ভেলা ছিল তাহাদের এবার নৌকাডুবির পালা। সেই সংকটের তাড়নায় ভদ্রলোকের ছেলেকেও আজ হাতে ও কলমে দুই দিকেই শক্ত হইতে হইবে এই তাগিদ আসিয়াছে। এই শুভদিনের প্রারম্ভে শ্রীযুক্ত লক্ষ্মীশ্বর সিংহ 'কাঠের কাজ' বইখানি লিখিয়াছেন; ভদ্রলোকের ভয়ে 'ছুতারের কাজ' নাম দিতে পারেন নাই। তা হউক, বইখানি সকলেরই কাজে লাগিবে, কেবলমাত্র জীবিকার জন্য নহে, শিক্ষার জন্য। কারণ যাহার হাত দুটো কর্মিষ্ঠ নয়, হাতের দিকে সে মূঢ়, তা হোক না সে নবাবজাদা, বা পণ্ডিত বংশের কুলতিলক। দেশের এই সব বোকা-হাতের মানুষকে শিক্ষিত-হাতের মানুষ করিবার অভিপ্রায়ে এই যে বইখানি লেখা, ইহা বাঙালীর ঘরে এবং বিদ্যালয়ে আজকাল আদর পাইবে বলিয়া আশা হইতেছে। লেখক বিশ্বভারতীর শ্রীনিকেতন বিভাগে কাঠের কাজের সাধনাতেই নিযুক্ত। এই চর্চায় তিনি যেমন বই পড়িতে উৎসাহী তেমনি হাত চালাইতেও অক্লান্ত; অতএব এই বিদ্যায় তাঁহার উপদেশ দিবার অধিকার আছে পাঠকদিগকে আমরা এমন ভরসা দিতে পারি।

কয়েকদিন বাদে ২০ অগ্র [রবি 6 Dec] তাঁকে আরও একটি গ্রন্থের ভূমিকা লিখতে হল— সেটি ম্যাজিস্ট্রেট গুরুসদয় দত্তের লেখা তাঁর পত্নী 'সরোজ-নলিনী'র জীবনকথা— রচনাটি রবীন্দ্র-হস্তাক্ষরে স্বতন্ত্র কাগজে দুটি পৃষ্ঠায় মুদ্রিত করে গ্রন্থে জুড়ে দেওয়া হয়। বারকয়েক সরোজনলিনী স্বামীর সঙ্গে শান্তিনিকেতনে এসেছিলেন, কিন্তু যাকে সত্যকার পরিচয় বলে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর সেই সম্পর্ক রচিত হয়নি, সেই কথার

উল্লেখ করে তিনি লিখেছেন : ‘সরোজনলিনীর জীবনী পড়িয়া বুঝিলাম জীবনীলেখক তাঁহার স্বামী শ্রীযুক্ত গুরুসদয় দত্ত যথার্থই ভাগ্যবান। কারণ এরূপ স্ত্রীকে মৃত্যুর মধ্যে হারাইয়াও হারানো সম্ভব নহে; শুভাদৃষ্টক্রমে যিনি তাঁহাকে নিকটে পাইয়াছেন তাঁহার জীবনের মধ্যেই তিনি চিরদিন জীবিত থাকিবেন।’ সরোজনলিনী গৃহকোণচারিণী ছিলেন না, বাহির সংসারের ভিড়ের মধ্যেই তিনি জীবনের অধিকাংশ সময় কাটিয়েছেন, বিদেশি সমাজের অতিথি বন্ধুদের নিয়ে তাঁকে সামাজিকতা করতে হয়েছে; তাঁর কর্মজীবনের পরিধি আত্মীয়স্বজন বন্ধুমণ্ডলির মধ্যেই অবরুদ্ধ ছিল না— তাঁর সংসার আত্মীয়-অনাত্মীয়, স্বদেশি-বিদেশি, পরিচিত-অপরিচিত অনেক লোককে নিয়ে। ‘এই তাঁর বড়ো সংসারের মধ্যে সকলের সঙ্গে সম্বন্ধকে তিনি মাধুর্যের দ্বারা শোভন ও ত্যাগের দ্বারা কল্যাণময় করিয়াছিলেন। এইরূপ ক্ষেত্রেই নারীজীবনের যথার্থ পরিচয় ও পরীক্ষা। তাঁহার কাছে বাহিরের দ্বারা ঘর ও ঘরের দ্বারা বাহির পরাহত হয় নাই। এই উভয়ের সুন্দর সমন্বয়েই তাঁহার মহিমা প্রকাশিত হইয়াছে। আজকালকার দিনে যে নারী একান্তভাবেই গৃহিণী তিনি আমাদের আদর্শ নহেন, ঘরে বাহিরে সর্বত্রই যিনি কল্যাণী তিনিই আদর্শ, যাঁহার জীবন কেবলমাত্র চিরাগত প্রাদেশিক প্রথা ও সংস্কারের ছাঁচে ঢালা তিনি আদর্শ নহেন কিন্তু যাঁহার মধ্যে বৃহৎ বিশ্বের জ্ঞান ও ভাবের বিচিত্র ধারা গভীর ও সুন্দরভাবে সংগতি লাভ করিতে বাধা না পায় তিনিই আদর্শ। সরোজনলিনীর জীবনী পড়িয়া আমরা এই আদর্শের পরিচয় পাইলাম।’

অধ্যাপক প্যাট্রিক গেডেস ফ্রান্সের মন্টপেলিয়ারের [Montpellier] বিশ্ববিদ্যালয়ে ‘College des Indiens’ প্রতিষ্ঠা করে রবীন্দ্রনাথকে তার প্রেসিডেন্ট পদে নির্বাচিত করেন। তিনি স্কটল্যান্ডের রাজধানী এডিনবার্গে ‘International Congress on University Progress’ নামে একটি সম্মেলন আয়োজিত করতে চেয়ে সেখানে রবীন্দ্রনাথের উপস্থিতি কামনা করে 12 Feb 1925 ও 28 Oct 1925 [১১ কার্তিক] দুটি চিঠি পাঠান। রবীন্দ্রনাথ শেষোক্ত চিঠির উত্তরে 7 Dec [২১ অগ্র] জানান, প্রধানত চিকিৎসার উদ্দেশ্যে আগামী গ্রীষ্মে তাঁর য়ুরোপে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে, তখন চিকিৎসদের অনুমতিসাপেক্ষে তিনি এডিনবার্গেও যেতে পারেন। প্রেসিডেন্ট পদে নির্বাচন উপলক্ষে তিনি লেখেন : ‘...as for the President's post which you offer me I do not have the heart to refuse although I have a profound dislike for taking any conspicuous place in a public function.’ এইদিন তিনি ই. জে. টমসনকেও প্রায় একই কথা লেখেন। মরিজ ভিন্টারনিৎস 15 Nov [২৯ কার্তিক] রবীন্দ্রনাথকে একটি চিঠি লিখে জানান, তিনি তাঁর ভারতীয় সাহিত্যের ইতিহাস গ্রন্থটির প্রথম খণ্ডের ইংরেজি সংস্করণটি রবীন্দ্রনাথকে উৎসর্গ করতে চান; প্রত্যুত্তরে 8 Dec [২২ অগ্র] রবীন্দ্রনাথ আগামী গ্রীষ্মে য়ুরোপে ও প্রাগে যাওয়ার ইচ্ছা জানিয়ে লেখেন : 'Your proposal of dedicating the English version of your book to me has delighted my heart, my appreciation of your friendship will find its fit memorial in this association of my name with your work.’

সুভাষচন্দ্র বসু তখন বেঙ্গল অর্ডিন্যান্সে গ্রেপ্তার হয়ে বিনা বিচারে ব্রহ্মদেশের মান্দালয় জেলে বন্দী ছিলেন, আর্ট সম্বন্ধে আলোচনা করে তিনি বন্ধু দিলীপকুমার রায়কে ইংরেজিতে একটি চিঠি লেখেন; দিলীপকুমার 22 Nov লখনৌ থেকে পত্রটি রবীন্দ্রনাথকে পাঠিয়ে দিলে [দ্র দেশ, সাহিত্য ১৩৮৩। ৩৫, পত্র ১] রবীন্দ্রনাথ আনুমানিক 10 Dec [বৃহ ২৪ অগ্র] দিলীপকুমারকে একটি চিঠি লিখে সুভাষচন্দ্রের পত্রের প্রশংসা করেও তাঁর

বক্তব্য-প্রসঙ্গে দ্বিমত প্রকাশ করে লেখেন : 'সুভাষ আর্ট সম্বন্ধে যা লিখেছেন তার বিরুদ্ধে বলবার কিছু নেই। যেখানে আর্টের উৎকর্ষ, সেখানে গুণী ও গুণজ্ঞদের ভাবের উচ্চশিখর। সেখানে সকলেই অনায়াসে পৌঁছবে এমন আশা করা যায় না— সেইখানে নানা রঙের রসের মেঘ জমে ওঠে— সেই দুর্গম উচ্চতায় মেঘ জমে বলেই তার বর্ষণের দ্বারা নীচের মাটি উর্বরা হয়ে ওঠে। অসাধারণের সঙ্গে সাধারণের যোগ এমনি করেই হয় উপরকে নীচে বেঁধে রেখে দিলে হয় না। যারা রসের সৃষ্টিকর্তা তাদের উপর যদি হাটের ফরমাস চালানো যায় তাহলেই সর্বনাশ ঘটে। ফরমাস তাদের অন্তর্যামীর কাছ থেকে। সেই ফরমাস অনুসারে যদি তারা চিরকালের জিনিস তৈরি করতে পারে তাহলেই আপনিই তার উপরে সর্বলোকের অধিকার হবে।'[৯২] এইদিনই রবীন্দ্রনাথ সবুজপত্র-সম্পাদক প্রমথ চৌধুরীকে লিখলেন : 'এইমাত্র দিলীপকে একখানি চিঠিতে আর্ট সম্বন্ধে দুচার কথা আলোচনা করে লিখেছি। যদি সে চিঠি সবুজপত্রে ছাপতে দিতে তার সম্মতি নিতে পারো তাহলে এই আলোচনাটির অনুবর্ত্তন করে তোমরাও কিছু বলতে পারবে। বড় কিছু লেখবার না পাচ্চি সময় না পাচ্চি শক্তি।'[৯৩] সম্মতি পাওয়া গিয়েছিল— মাঘ-সংখ্যা সবুজপত্র-তে [পৃ ৪১৯-৩১] সুভাষচন্দ্রের ইংরেজিতে লেখা চিঠির সোমনাথ মৈত্র-কৃত বঙ্গানুবাদ, দিলীপকুমার রায়ের চিঠি, প্রমথ চৌধুরীর মন্তব্য প্রভৃতির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের পত্রটিও মুদ্রিত হয় [পৃ ৪২৮-৩১]।

লর্ড সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ শ্রাবণ মাসে একবার শান্তিনিকেতন ও শ্রীনিকেতন ঘুরে যান ও বিশ্বভারতীকে দশ হাজার টাকা দান করার প্রতিশ্রুতি দেন। তখন রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে ছিলেন না। এই সময়ে লর্ড সিংহ প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ মারফৎ রবীন্দ্রনাথের 6 Dec-এর আমন্ত্রণ পেয়ে 9 Dec [বুধ ২৩ অগ্র] তাঁকে লিখলেন : 'শুক্রবার দিন প্রাতে ১০।টার গাড়ীতে ছাড়িয়া সেইদিন সন্ধ্যার পূর্ব্বেই আপনার আতিথ্য গ্রহণ করিব।' তিনি প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেন এবং শান্তিনিকেতন ও শ্রীনিকেতনের কাজ দেখে খুবই সন্তুষ্ট হন। দু'দিন পরে তিনি একটি চিঠির সঙ্গে পাঁচ হাজার টাকার চেক পাঠিয়ে মার্চ-এপ্রিল মাস নাগাদ 'দ্বিতীয় অৰ্দ্ধ' পাঠানোর অঙ্গীকার ক'রে তাঁর প্রীতি ব্যক্ত করেন।

প্রবাসী-সাহিত্যিক কেদারনাথ বন্দোপাধ্যায়ের [1863-1949] সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের পরিচয় ছিল। তাঁদের বয়সের পার্থক্য মাত্র দু'বৎসরের হলেও কেদারনাথ তাঁর একটি সাম্প্রতিক পত্রে রবীন্দ্রনাথকে প্রণাম নিবেদন করলে ২১ অগ্র [সোম 7 Dec] তিনি কৌতুক ও আন্তরিকতার সঙ্গে তাঁকে 'তুমি' সম্বোধনে লেখেন :

> বয়সের তো বেশি তফাৎ নেই, তাই তোমার পত্রে আমাকে যে পাঠ লিখেছ তা গ্রহণ করতে পারলেম না। ভক্তির সম্ভাষণ প্রৌঢ় বয়সেই ভাল লাগে, তখন পাকা চুলের প্রথম সম্মানের স্বাদটাতে মনের মধ্যে শ্লাঘা বোধ হয়। সেই মাঝ বয়স পেরোলে অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মধ্যে সবচেয়ে বেশি রাগ ধরে শ্রীচরণটার উপর। ওতে কেবল মনে করিয়ে দেয়, জীবলোকে যাদের পূর্ণ অধিকার আমি তাদের সমবয়সী নই। একদিন ছিল যখন লোকে মুখের উপরেই বেশী লক্ষ্য করত, শ্রীহস্তের প্রতিও কেউ কেউ দাবী রাখত, নামতে নামতে একদিন যখন শ্রীচরণে মাত্র সংসারের নজর এসে ঠেকল তখন উত্তরে হাওয়ায় এই ধ্বনিটাই এসে পৌঁছল— "তোমার আর ভাব করবার সময় নেই, কাজ করবারও সময় নেই, সময় হয়েছে চলে যাবার, অতএব মর্ত্য পৃথিবীর শেষ সম্ভাষণ কুড়িয়ে নিয়ে ঐ চরণ দুটোই আজ প্রাধান্য লাভ করুক।" অল্প বয়সের ঔদ্ধত্যে আমার চরণ ছাড়া আমার বাকি সমস্ত কিছুকেই উপেক্ষা করে তাদের ক্ষমা করতে পারি— কিন্তু ষাটের কোঠায় পা দিয়ে তুমিও যদি সেই সব অর্বাচীনদের অনুকরণ কর সেটা শোভন হয় না।[৯৪]

তিনি শেষে লেখেন : 'তোমার লেখা অগ্রথিত আকারে মাঝে মাঝে আমাকে আনন্দ দিয়েছে, গ্রন্থ আকারে যদি পাই তবে আরো খুসি হব।' অতঃপর কোনো নূতন বই প্রকাশিত হলে কেদারনাথ তাদের প্রত্যেকটি রবীন্দ্রনাথকে প্রেরণ করেছেন।

অগ্রহায়ণ ১৩৩২-এ বিভিন্ন সাময়িকপত্রে রবীন্দ্রনাথের নিম্নলিখিত রচনাগুলি প্রকাশিত হয় :

প্রবাসী, অগ্র ১৩৩২ [২৫। ২। ২] :

১৪৫-৫২ 'নামঞ্জুর গল্প' দ্র গল্পগুচ্ছ ২৪। ২০৩-১৫

১৯৫-৯৭ 'চিঠি' দ্র চিঠিপত্র ১৪

২১২-১৫ 'শূদ্রধর্ম্ম' দ্র কালান্তর ২৪। ৩৬২-৬৭

২১৫-১৬ "গড্ডলিকা" দ্র র° র° ১৫ক [১৪০৬]। ৮৪৪-৪৫

শান্তিনিকেতন, অগ্র ১৩৩২ [৬। ১১] :

২১৯ 'গান' ['আমার ঢালা গানের ধারা'] দ্র গীত ১। ১৮; স্বর ৩

২১৯ 'কেতকী' ['একলা বসে বাদল শেষে'] দ্র ঐ ২। ৪৬০; ঐ ৩১

২২০ 'শেফালি' ['ওলো শেফালি'] দ্র ঐ ২। ৪৯০; ঐ ৩১

২২০ 'গান' ['শান্তিমন্দির পুণ্য অঙ্গন']

The Modern Review, December 1925 [Vol. XXXVIII, No. 6] :

681-85 'Striving for Swaraj'

'Striving for Swaraj' 'স্বরাজসাধন' প্রবন্ধের সম্ভবত সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর-কৃত ইংরেজি অনুবাদ।

অগ্রহায়ণ-সংখ্যা প্রবাসী-তে চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে লেখা ৬টি চিঠি ছাড়া রবীন্দ্রনাথের তিনটি রচনা প্রকাশিত হয়— 'নামঞ্জুর গল্প' নামক কাহিনী, 'শূদ্রধর্ম্ম'-শীর্ষক প্রবন্ধ ও রাজশেখর বসুর 'গড্ডলিকা' গল্পগ্রন্থের সমালোচনা; মনে হয়, এগুলি জোড়াসাঁকোয় চিকিৎসাধীন থাকা অবস্থায় লেখা। 'নামঞ্জুর গল্প'টি তো স্পষ্টতই সরলা দেবীর 'কালীপূজোর নূতন ব্যাখ্যা ক'রে হিন্দুসমাজের চমক লাগাবার আয়োজন'কে ব্যঙ্গ করে লেখা— বারীন ঘোষদের বিপ্লবী আন্দোলন থেকে আরম্ভ করে অসহযোগ ও খদ্দর আন্দোলন পর্যন্ত সর্বত্রই সরলা দেবী 'যুগলক্ষ্মী'র ভূমিকা নেবার জন্য উদ্‌গ্রীব ছিলেন,—রবীন্দ্রনাথ এই কাহিনীর মধ্যে সরলা দেবীকে উপলক্ষ করে এই দীর্ঘ সময়ের নিষ্ফল রাজনীতিকে বিদ্রূপ করেছেন, শেষাংশে তাঁর ব্যঙ্গের বিষয়ীভূত হয়েছে গান্ধীজির অস্পৃশ্যতাবিরোধী আন্দোলনের অন্তঃসারশূন্যতাও।

গান্ধীজি জ্যৈষ্ঠ মাসে শান্তিনিকেতনে এসে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে চরকা ও খাদি বিষয়ে আলোচনার সময়ে হিন্দুধর্মের জাতি ও বর্ণাশ্রম প্রথা সম্পর্কেও কথা বলেছিলেন— রবীন্দ্রনাথ তখন জন্ম অনুসারে কর্মবিভাগের হিন্দুপ্রথাকে অবৈজ্ঞানিক ও অস্বাভাবিক বলে মত প্রকাশ করেন। 'শূদ্রধর্ম' প্রবন্ধটি সেই আলোচনার পটভূমি অবলম্বন করে লেখা। হিন্দুশাস্ত্রে বলা হয়েছে, 'স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্মো ভয়াবহঃ' অর্থাৎ যে-বর্ণের শাস্ত্রবিহিত যে-ধর্ম তাকে তা-ই পালন করতে হবে। এই ধর্মেরই অনুসরণ করে ইংরেজের বেতনভোগী ভারতীয়রা দেশে ও বিদেশে যে-ধরনের অত্যাচারী ভূমিকা নিতেন রবীন্দ্রনাথ চিনে হংকং বন্দরে তা প্রত্যক্ষ করেছেন। তাই এটি নূতন কোনো প্রসঙ্গ নয়, 'জাপানযাত্রী' থেকে আরম্ভ করে পরে বহুবার বিভিন্ন প্রসঙ্গে তিনি ঘটনাটির উল্লেখ করেছেন। সুতরাং প্রবন্ধটি রচনার প্রত্যক্ষ কারণ রবীন্দ্রজীবনী-কার কথিত 'চীনের সমসাময়িক একটি ঘটনার সংবাদপাঠ' নয়, এর মূল আরও গভীরে। গান্ধীজির সঙ্গে আলোচনার স্মৃতিরোমন্থন

করে তিনি ভারতীয়দের ধিক্কার দিয়ে লিখলেন : 'স্বধর্মরত শূদ্রের সংখ্যাই ভারতবর্ষে সবচেয়ে বেশি, তাই এক দিক থেকে দেখতে গেলে ভারতবর্ষ শূদ্রধর্মেরই দেশ। তার নানা প্রমাণ ইতিহাসে পাওয়া গেছে। এই অতি প্রকাণ্ড শূদ্রধর্মের জড়ত্বের ভারাকর্ষণে ভারতের সমস্ত হিন্দুসম্প্রদায়ের মাথা হেঁট হয়ে আছে। বুদ্ধিসাধ্য জ্ঞানসাধ্য চারিত্রশক্তিসাধ্য যে-কোনো মহাসম্পদলাভের সাধনা আমরা আজ করতে চাই তা এই প্রবল শূদ্রত্বভার ঠেলে তবে করতে হবে— তার পরে সেই সম্পদ রক্ষা করবার ভারও এই অসীম অন্ধতার হাতে সমর্পণ করা ছাড়া আর উপায় নেই। এই কথাই আমাদের ভাববার কথা।'

তবে প্রবাসী-তে মুদ্রিত 'শূদ্রধর্ম' প্রবন্ধের বর্জিত শেষাংশে রবীন্দ্রনাথ চিনের সাংহাই শহরে শ্রমিক ও ছাত্রদের যে ধর্মঘট চলছে সেই প্রসঙ্গে ভারতীয় পুলিশের অন্যায় অত্যাচার বিষয়ে একজন আমেরিকানের প্রতিবেদন উদ্ধৃত করেন। মূল প্রবন্ধের শেষ অনুচ্ছেদে রবীন্দ্রনাথ ইংরেজের বিরুদ্ধে চিনের জাগরণের সম্ভাবনার ইঙ্গিত দিয়ে লিখেছেন : 'তখন এসিয়ার মধ্যে এই শূদ্র ভারতবর্ষের কী কাজ। তখন সে য়ুরোপের কামারশালায় তৈরি লোহার শিকল কাঁধে ক'রে নির্বিচারে তার প্রাচীন বন্ধুকে বাঁধতে যাবে। সে মারবে, সে মরবে। কেন মারবে, কেন মরবে, এ কথা প্রশ্ন করতে তার ধর্মে নিষেধ। ··· ইংরেজসাম্রাজ্যের কোথাও সে সম্মান চায় না, পায়ও না— ইংরেজের হয়ে সে কুলিগিরির বোঝা ব'য়ে মরে যে-বোঝার মধ্যে তার অর্থ নেই, পরমার্থ নেই····শূদ্রের এই তো বহু যুগের দীক্ষা। তার কাজে স্বার্থও নেই, সম্মানও নেই, আছে কেবল 'স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ' এই বাণী।'

'গড্ডলিকা' রাজশেখর বসুর [1880-1960] 'পরশুরাম' ছদ্মনামে রচিত উক্ত নামীয় গ্রন্থের সমালোচনা। বইটি সাহিত্যের গড্ডলিকা-প্রবাহের অন্তর্গত নয় ঘোষণা করে রবীন্দ্রনাথ গ্রন্থটির নিরঙ্কুশ প্রশংসা করে লিখলেন :

> ···সহসা ইহার অসামান্যতা দেখিয়া চমক লাগিল। চমক লাগিবার হেতু এই যে এমন একখানি বই হাতে আসিলে মনে হয়, লেখকের সঙ্গে দীর্ঘকালের পরিচয় থাকা উচিত ছিল।···
>
> লেখক পরশুরাম ছদ্মনামের পিছনে গা-ঢাকা দিয়াছেন। অনেক ভাবিয়া দেখিলাম, চেনা লোক বলিয়া মনে হইল না। কেননা, লেখাটার উপর কোনো চেনা হাতের ছাপ পড়ে নাই। নতুন মানুষ বটে সন্দেহ নাই, কিন্তু পাকা হাত।
>
> পিতৃদত্ত নামের উপর তর্ক চলে না, কিন্তু স্বকৃত নামের যোগ্যতা বিচার করিবার অধিকার সমালোচকের আছে। পরশু অস্ত্রটা রূপধ্বংসকারীর, তাহা রূপসৃষ্টিকারীর নহে। পরশুরাম নামটা শুনিয়া পাঠকের সন্দেহ হইতে পারে যে লেখক বুঝি জখম করিবার কাজেই প্রবৃত্ত। কথাটা একেবারেই সত্য নহে। বইখানি চরিত্র-চিত্রশালা। ··· মানুষের অবুদ্ধি দুর্বুদ্ধিকে লেখক তাঁহার রচনায় আঘাত করিয়াছেন কিনা, সেটা তেমন করিয়া আমার নজরে পড়ে নাই। আমি দেখিলাম তিনি মূর্তির পর মূর্তি গড়িয়া তুলিয়াছেন। এমন করিয়া গড়িয়াছেন যে, মনে হইল ইহাদিগকে চিরকাল জানি। ····লেখক বোধ করি আধুনিক রুদ্র-তেজের দিনে নিজেকে বীরপুরুষের দলে চালাইয়া দিবার লোভ সামলাইতে পারেন নাই, কিন্তু আমরা তাঁহাকে রসস্রষ্টার দলেই দাবি করি।

লেখার সঙ্গে যতীন্দ্রকুমার সেনের অঙ্কিত চিত্রেরও অবিমিশ্র প্রশংসা আছে লেখাটিতে : 'লেখনীর সঙ্গে তুলিকার কী চমৎকার জোড় মিলিয়াছে, লেখার ধারা রেখার ধারা সমান তালে চলে, কেহ কাহারও চেয়ে খাটো নহে। তাই চরিত্রগুলো ভাষায় ও চেহারায় ভাবে ও ভঙ্গিতে ডাহিনে বামে এমন করিয়া ধরা পড়িয়াছে যে, তাহাদের আর পলাইবার ফাঁক নাই।'

রাজশেখর বসু আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়-প্রতিষ্ঠিত বেঙ্গল কেমিক্যাল অ্যান্ড ফার্মাসিউটিক্যাল প্রতিষ্ঠানের রাসায়নিক ও অন্যতম কর্মকর্তা, তাই রবীন্দ্রনাথের এই সমালোচনা পড়ে প্রফুল্লচন্দ্র ছদ্ম-অভিযোগের সুরে তাঁকে লেখেন : 'সম্প্রতি দেখিতেছি আপনি সত্যসত্যই আমার ক্ষতি করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। গড্ডলিকার

প্রথম সংস্করণ বিক্রয় হইয়া গিয়াছে। কিন্তু যখন দেখি সাহিত্য-সম্রাট স্বয়ং তাঁহার সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তখন অচিরে পর পর বারো হাজার কপি যে বিক্রয় হইবে, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। ··· এখন তাঁহার মাথা না বিগড়াইয়া যায়।' রবীন্দ্রনাথ ১৮ অগ্র পত্রোত্তরে লিখলেন : 'আপনার রাসায়নিক বন্ধুটিকে বলবেন, মাসিক-পত্রবলে যে-সব জীবাত্মা হয়ত বা সাহিত্যবীর হতে পারত, ভুষণ্ডীর মাঠে তাদের অঘটিত সম্ভাবনার প্রেতগুলির সঙ্গে আপনার মোকাবিলার পালা যেন তিনি রচনা করেন। আমার কথা যদি বলেন— আপনার চিঠি পড়ে আমি অনুতপ্ত হইনি, বরঞ্চ মনের মধ্যে একটু গুমর হয়েছে। এমন কী, ভাবছি, স্বামী শ্রদ্ধানন্দের মত শুদ্ধির কাজে লাগব; যে-সব জন্ম-সাহিত্যিক গোলেমালে ল্যাবরেটরীর মধ্যে ঢুকে পড়ে জাত খুইয়ে বৈজ্ঞানিকের হাটে হারিয়ে গিয়েছেন, তাদের ফের একবার জাতে তুলব।····যাই হোক, আমি রস যাচাইয়ের নিয়মে আঁচড় দিয়ে দেখলেন আপনার বেঙ্গল কেমিক্যালের এই মানুষটি একেবারেই কেমিক্যাল গোল্ড নন ইনি খাঁটি খনিজ সোনা।'[৯৫]

এর পরে শুধু সাহিত্যজগতেই নয়, বানান ও অভিধান-সংশোধনের কাজে এবং বিশ্বভারতীর বিভিন্ন কার্যক্রমের সঙ্গে রাজশেখর বসুর যোগ ক্রমেই বেড়ে উঠতে থাকে।

শান্তিনিকেতন-এ মুদ্রিত 'শান্তিমন্দির পুণ্য অঙ্গন' গানটি বসু বিজ্ঞানমন্দির প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে রচিত 'মাতৃমন্দির পুণ্য অঙ্গন' গানটির ঈষৎ পাঠান্তর ঘটিয়ে ফর্মিকির অভ্যর্থনায় গীত হয়।

Indian Philosophical Congress-এর উদ্বোধনের দিন ধার্য হয়েছিল 19 Dec 1925 [শনি ৪ পৌষ] তারিখে। সেইজন্য রবীন্দ্রনাথ কলকাতার উদ্দেশে রওনা হন ২ পৌষ [বৃহ 17 Dec]। 19, 21 ও 22 Dec কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট হাউসে ভারতীয় দর্শন মহাসভার অধিবেশনগুলি অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম দিনে অর্থাৎ 19 Dec-এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের বিবরণে আনন্দবাজার পত্রিকা [৬ পৌষ] লেখে :

গত শনিবার সাড়ে দশটার সময় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোগে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সভাপতিত্বে ভারতীয় দার্শনিক মহাসভার প্রথম অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। লর্ড লিটন সভার উদ্বোধন করেন। সভাপতি রবীন্দ্রনাথ 'মুক্তির' দার্শনিক অর্থ সম্বন্ধে এক মনোমুগ্ধকর অভিভাষণ প্রদান করেন। তাঁহার অভিভাষণের সার কথা 'মুক্তি'।

তিনি বলেন,—"যেমন রূপের রাজ্যে, তেমনি ঈশ্বরের রাজ্যে আমাদের আত্মা কায়ার বন্ধন হইতে বিশুদ্ধ আনন্দে বিরাজিত হইতে চাহে। সেই আনন্দই সৃষ্টির লক্ষ্য এবং মূল। অনন্ত রূপের মৃগ তৃষ্ণায় অবিরত ভ্রমণে ক্লান্ত আত্মা, মুক্তির জন্য কাঁদিয়া ফিরিতেছে। দর্শনের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত এই মুক্তির আকাঙ্ক্ষা আমাদের জীবনের, আমাদের সমস্ত হৃদয়াবেগের সহিত জড়িত— আমাদের সমস্ত কাব্যের ডানা মেলিয়া এই মুক্তির উদ্দেশ্যেই স্বর্গলোকে যাত্রা করিয়াছে।"

কবি একখানা বেদীর উপর উপবেশন করিয়াছিলেন। তাঁহার এক পার্শ্বে লর্ড লিটন এবং অপর পার্শ্বে [ভাইস চ্যান্সেলার] সার ইউরার্ট গ্রীভ্‌স বসিয়াছিলেন। তাঁহার স্বভাব-সুলভ সুমিষ্টকণ্ঠে যে অভিভাষণ প্রদান করিয়াছিলেন, তাহা সভার সর্বত্র স্পষ্ট শোনা গিয়াছিল।[৯৬]

অতঃপর রবীন্দ্রনাথের বক্তব্যের সারাংশ বাংলায় প্রদত্ত হয় [দ্র রবীন্দ্র-প্রসঙ্গ ১। ৩৬১-৬৩] তাঁর মূল ইংরেজি ভাষণ 'The Philosophy of Our People' Jan 1926 [pp. 77-84]-সংখ্যা *The Modern Review*-তে মুদ্রিত হয় [দ্র *EWRT* 3/ 559-69]। প্রবন্ধটির বঙ্গানুবাদ 'ভারতবর্ষীয় দার্শনিক সঙ্ঘের সভাপতির অভিভাষণ' নামে মাঘ-সংখ্যা প্রবাসী [পৃ ৫৪২-৫১], বঙ্গবাণী [পৃ ৭৫৮-৭১] প্রভৃতি বহু পত্রিকায় ছাপা হয়েছিল।

রবীন্দ্রনাথ ভাষণের সূচনাতেই বলেন, শিক্ষার দিক দিয়ে দর্শনশাস্ত্রের সঙ্গে তাঁর কোনো পরিচয় নেই, তবু কোনো দার্শনিক গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত না-হওয়ার জন্যই তিনি হয়তো এই সভার যোগ্য সভাপতি। প্লেটো তাঁর

কল্পরাজ্য থেকে কবিদের নির্বাসন দিতে চেয়েছিলেন, কিন্তু ভারতীয়দের কাছে কবি সহজেই তত্ত্বদর্শীর আখ্যা লাভ করেন যখন তাঁর ধীশক্তি প্রজ্ঞার আভায় দীপ্ত হয়ে ওঠে। আমাদের মহাকাব্য মহাভারত তার অন্যতম প্রমাণ। মুসলিম যুগে ভারতে যে-সব সাধুসন্তের আবির্ভাব ঘটেছিল তাঁরা সকলেই গীতরসিক, কল্পনাশক্তির সমন্বয়ে তাঁদের মর্মানুভূতি মানুষের অস্তিত্বের তাৎপর্য-সংক্রান্ত গূঢ় প্রশ্নের সমাধান করতে গিয়ে প্রায়শই দার্শনিকদের জগতে পদার্পণ করত। কিন্তু তাঁদের গান পণ্ডিতদের সভায় গীত হবার জন্য রচিত নয়, তাদের উপভোক্তা ছিল গ্রামের অশিক্ষিত নরনারী— এতেই প্রমাণ হয় ভারতীয় জনসাধারণের মগ্নচৈতন্যে একধরনের দার্শনিক প্রজ্ঞা স্বভাবতই অনুপ্রবিষ্ট হয়েছিল। এরপর কবীরের দোঁহা, গ্রাম্য কবি বা বাউলের গান উদ্ধৃত করে রবীন্দ্রনাথ প্রমাণ করার চেষ্টা করেন, শেলির Hymn to the Intellectual Beauty যেখানে রসিকজনের উপভোগ্য সেখানে এই প্রায়-অশিক্ষিত গ্রাম্য সাধকেরা কত সহজে সাধারণের উপযোগী করে প্রায় একই সত্য পরিবেশন করেছেন। এই জিনিস সম্ভব হয়েছে ভারতবর্ষে লোকশিক্ষার অতুলনীয় পদ্ধতির সাহায্যে, যা এখন বিলুপ্তপ্রায়। পৌরাণিক কাহিনী অবলম্বনে রচিত যাত্রাপালা, লোককথা ভ্রাম্যমাণ গায়কদের মাধ্যমে দেশের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ত এবং এই উপায়ে সাধারণ মানুষদের মধ্যেও সাংখ্য বেদান্ত বা যোগের তত্ত্বসমূহ প্রচার লাভ করত। রবীন্দ্রজীবনী-কার যথার্থই লিখেছেন : 'ভারতের এই উপেক্ষিত ও স্বল্পপরিচিত জনতার আধ্যাত্মিক সাধনার কথা রবীন্দ্রনাথ সর্বপ্রথম শিক্ষিত ভদ্রদের গোচরীভূত করিয়াছিলেন। কবির পূর্বে এমনভাবে অজ্ঞাতদের কেহ সম্মান দেন নাই— তথ্য অনেকে সংগ্রহ করিয়াছেন, কিন্তু তাহাদের তত্ত্বের মধ্যে গভীর শ্রদ্ধা লইয়া কেহ প্রবেশ করেন নাই।'[৯৭]

১৯ অগ্র [শনি 5 Dec] সন্ধ্যা সাড়ে সাতটায় স্টার থিয়েটারে আর্ট থিয়েটার-কর্তৃক 'গৃহপ্রবেশ' নাটকটির প্রথম অভিনয় হয়। সংবাদপত্রে জানানো হয়, রবীন্দ্রনাথ ও দিনেন্দ্রনাথের সংগীতশিক্ষায় এবং গগনেন্দ্রনাথের দৃশ্যপরিকল্পনায় নাটকটি পরিবেশনের উপযোগী করা হয়েছে। চরিত্রলিপি ছিল এইরূপ : যতীন - অহীন্দ্র চৌধুরী, মাসি - সুশীলাসুন্দরী, হিমি নীহারবালা, অখিল - কনকেন্দ্রনারায়ণ, মণি সেরাবালা, ডাক্তার তিনকড়ি চক্রবর্তী প্রভৃতি। বিভিন্ন পত্রিকায় দৃশ্যসজ্জা ও অভিনয় উচ্চপ্রশংসিত হয়। রুদ্রপ্রসাদ চক্রবর্তী 'সাধারণ রঙ্গালয় ও রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থে [পৃ ৯৮-১২৮] অভিনয়-সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্য সযত্নে চয়ন করে দিয়েছেন।

৪ পৌষ [শনি 19 Dec] রবীন্দ্রনাথ স্টার থিয়েটারে নাটকটির তৃতীয় অভিনয় দেখতে যান। 'নাচঘর' পত্রিকার প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, অধ্যাপক ফর্মিকি ও তুচ্চি, অবনীন্দ্রনাথ, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ, চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য প্রভৃতি অনেকেই তাঁর সঙ্গে অভিনয় দেখতে গিয়েছিলেন। অহীন্দ্র চৌধুরী লিখেছেন, অভিনয়ের পরে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গেলে তিনি পরের দিন আসতে বলেন। "গেলাম পরদিন। আলোচনা করলেন। বললেন— একটু পরিবর্তন করা দরকার। লিখে রেখে দেবো। এসে নিয়ে যেও। ফের গেলাম। তখন 'গৃহপ্রবেশ'-এর যে ছোট বইখানি পাওয়া যেতো, সেইরকম একটা বইয়ে পৃষ্ঠার পাশে ও ওপরে উনি অতিরিক্ত সংলাপগুলি লিখে রেখেছেন, কোথাও-কোথাও বা এডিট করে দিয়েছেন।....এর পরে আরও পরিবর্তন-পরিমার্জনা করেছিলেন। পরে আরও একটু এডিট্ করেছেন। বইয়ের ভাঁজে ভাঁজে বইয়ের পৃষ্ঠার মাপে আমরা সাদা কাগজ দিয়েছিলাম, সেই কাগজে নতুন সংলাপগুলি লিখেছিলেন। এর পরে আবার একটু বদলালেন। দেখি এবারে দুটি নতুন চরিত্রই সৃষ্টি করে দিয়েছেন—একটি কিশোরী মেয়ে টুক্রি, অপরটি একটি বৈষ্ণবী।....কবি এইভাবে ৩। ৪ বার পরিবর্তন করেছিলেন পাণ্ডুলিপিতে।"[৯৮] সম্ভবত 31 Dec [১৬

পৌষ] রবীন্দ্রনাথ গগনেন্দ্রনাথকে লিখেছেন : ‘গৃহপ্রবেশ আরো কিছু বদল করে দিলুম। একটি নতুন character যোগ করেছি— টুক্‌রি বলে ছোট মেয়ে। অত ছোট মেয়ে ওরা জোটাতে পারবে ত? কিছু কিছু ছেঁটেও দিয়েছি। বড় ঘন ঘন গান ছিল, কমিয়ে দিলুম। তোমার সেই গৃহপ্রবেশ বইখানায় কিছু কিছু জোড়াতাড়া করেছিলুম সেগুলোও এই কপির মধ্যে যোগ করে দিয়ো। কপিটা ফেরৎ চাই— কারণ ছাপতে দিতে হবে।’[৯৯] এই-সব পরিবর্তনের মোটামুটি বিবরণ পাওয়া যায় রবীন্দ্র-রচনাবলী ১৭শ খণ্ডের ‘গ্রন্থপরিচয়’-এ [পৃ ৪৪০-৫১] বা র° র° ১৬ [প.ব., ১৪০৮] ৭৩১-৪০ পৃষ্ঠায়। অনাথনাথ দাসের সৌজন্যে 'Stage Copy 25/12/25’-লেখা একটি কপি আমরা দেখেছি, যাতে এই-সমস্ত পরিবর্তন কেউ পাশে বা স্বতন্ত্র কাগজে লিখে রেখেছেন।

পৌষ-উৎসবের জন্য রবীন্দ্রনাথ সম্ভবত ৫ পৌষ [রবি 20 Dec] শান্তিনিকেতনে ফিরে আসেন। অগ্রহায়ণ মাসের শেষ দিক থেকে তাঁর ঢাকা তথা পূর্ববঙ্গ সফরের ভূমিকা রচিত হচ্ছিল। গোপালচন্দ্র রায় লিখেছেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্গত ছাত্রাবাস জগন্নাথ হলের প্রোভোস্ট বা অধ্যাপক-পরিচালক ছিলেন ইতিহাস বিভাগের প্রধান ড রমেশচন্দ্র মজুমদার [1888-1980]। তাঁরই আমন্ত্রণে কালীমোহন ঘোষ ঢাকায় গেলে রমেশচন্দ্র, বাংলা বিভাগের চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, দর্শন বিভাগের ড হরিদাস ভট্টাচার্য প্রভৃতি রবীন্দ্রনাথকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আমন্ত্রণের ব্যাপারে তাঁর সঙ্গে পরামর্শ করেন। শান্তিনিকেতনে ফিরে এসে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আলোচনা করে কালীমোহন 14 Dec [২৮ অগ্র] রমেশচন্দ্রকে ও 16 Dec ড হরিদাস ভট্টাচার্যকে তাঁর সম্মতির কথা জানিয়ে শেষোক্ত পত্রে লেখেন : ‘তিনি বললেন যে, ৭ই পৌষের পর ১৫ দিন সময় আছে, এর মধ্যে পূর্ববঙ্গ ঘুরে আসতে পারেন। নতুবা আর কখন হবে না। …আজ সকালে আমাকে বললেন, লিখে দিতে যে, ২৭শে ডিসেম্বর রওনা হবেন। গোয়ালন্দ হতে লঞ্চ-এতে ঢাকা যাবেন। বোধ হয়, তথা হতে ময়মনসিংহ যেতে পারেন। তিনি বিশেষ করে আপনাকে লিখতে বললেন, আপনি [তৎকালীন ভাইস-চ্যান্সেলার] মিঃ হার্টগকে দিয়ে গুরুদেবকে টেলিগ্রাম করাবেন। প্রফেসার ফর্মিকিকেও নিমন্ত্রণ করলে ভাল হয়।’[১০০] Philip J. Hartog-এর কার্যকালে রবীন্দ্রনাথের পক্ষে ঢাকায় যাওয়া সম্ভব হয়নি, কিন্তু হার্টগ অবসরগ্রহণের পরে 5 Jan 1926-এর আগে [এই তারিখে কলকাতা থেকে লেখা তাঁর একটি চিঠি রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত আছে] একটি দিন শান্তিনিকেতনে কাটিয়ে যান। রবীন্দ্রনাথ ‘রবিবার’ [৫ পৌষ] রমেশচন্দ্রকে ও ৬ পৌষ [21 Dec] চারুচন্দ্রকে এই বিষয়ে দুটি চিঠি লেখেন, শেষোক্ত পত্রটি উদ্ধৃত করছি :

তোমাদের ওখানে যাওয়া স্থির করেছি। প্রথমে ভেবেছিলেম ডিসেম্বরের মধ্যেই যাত্রা করব কিন্তু তোমাদের তখন কলেজ বন্ধ থাকবে শুনে জানুয়ারির শেষভাগেই যাবার সঙ্কল্প করচি। রমেশ তাঁর বাসায় আমাকে আশ্রয় দেবার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন, কিন্তু তোমাদের পাড়াতেই নানী সম্পর্কীয়া আত্মীয়া [দ্বিজেন্দ্রনাথের পৌত্রী, সুধীন্দ্রনাথের কন্যা এণা] আছে বলে রমেশকে কথা দিতে সাহস করছিনে। …আমার জন্যে অভ্যর্থনার বিরাট পর্ব্ব করলে সইবে না, তাহলে শান্তিপর্ব্ব ডিঙিয়ে একেবারে স্বর্গারোহণপর্ব এগিয়ে আসবে। / আমার সঙ্গে কালীমোহন যাবেন— আর ভাবছি নন্দলালকেও নেব— হয় ত আমাদের মুসলমান অধ্যাপক জিয়াউদ্দীনও যেতে পারেন। রথীরও যাবার ইচ্ছা আছে। অতএব সেখানে গিয়ে আমরা শান্তিনিকেতন পঞ্চায়েৎ বসাতে পারব।[১০১]

৭ পৌষ [মঙ্গল 22 Dec] সকাল সাড়ে সাতটায় রবীন্দ্রনাথ যথারীতি মন্দিরে উপাসনা করেন। ‘আনন্দধ্বনি জাগাও গগনে’ গানের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের ভাষণ ‘মন্দির, ৭ই পৌষ ১৩৩২’ শিরোনামে মাঘ-সংখ্যা

শান্তিনিকেতন-এ [পৃ ১-৭] ছাপা হয়; পরে এরই অন্য-একটি পাঠ 'শুভইচ্ছা' নামে ফাল্গুন-সংখ্যা প্রবাসী-তে [পৃ ৬৮৯-৯২] মুদ্রিত হয়— টীকায় লেখা আছে : 'গত ৭ই পৌষ শান্তিনিকেতন মন্দিরে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই উপদেশ প্রদান করেন। ইহা তিনি তৎপরে স্বহস্তে আদ্যোপান্ত লিখিয়া দিয়াছেন। লিখিবার সময় শ্রীযুক্ত ইন্দ্রকুমার চৌধুরীর অনুলিখন স্মারক-লিপির কাজ করিয়াছিল।' এর আগে 7 Jan 1926 [২৩ পৌষ] স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ এই বিষয়ে ক্ষিতিমোহন সেনকে লিখেছিলেন : '৭ই পৌষের বক্তৃতাটি আপনার কলমের অগ্রে যদি উদ্ধার না করেন তবে সে ডুবল। তার আর আশা নেই। কর্ত্তৃপক্ষেরা খুব ধুম করে লিখে নেবার আয়োজন করেছিলেন বলেই এই দুর্গতি ঘটল। তাই আপনার শরণ নিলুম।'[১০২] মাঘ-সংখ্যা প্রবাসী-তে [পৃ ৪৩৩] 'ধ্বনিল আহ্বান মধুর গম্ভীর প্রভাত অম্বর মাঝে' [দ্র গীত ১। ১২৭-২৮; স্বর ১৩] গানটি মুদ্রিত করে 'প্রঃ সঃ' [প্রবাসী-সম্পাদক] জানান : 'এই গানটি গত ৭ই পৌষ শান্তিনিকেতন আশ্রমের উৎসবে গীত হইয়াছিল।'

এই ভাষণে রবীন্দ্রনাথ বলেন, আমাদের প্রকৃত পরিচয় আমরা বাইরের নানা বিক্ষেপে ভুলে যাই, উৎসব উপলক্ষে অন্তরের ভিতরে প্রবেশ ক'রে, সাধনার উপরে যে-ধূলিস্তর জমা হয় তাকে সম্মার্জন ক'রে নিজেদের স্বধর্মকে আমরা চিনতে পারি। একেই বলে দীক্ষা— 'যে সত্যকে স্বীকার করেছি অথচ সার্থক করতে পারিনি, পুনঃপুনঃ তাকে নূতন ক'রে স্বীকার করতে হবে··· সাম্বৎসরিকে আমাদের সেই স্বীকৃতির পুনরাবর্ত্তন।' মানুষ তার সহজ প্রবৃত্তিকে চরম বলে স্বীকার করে না— যদি করত, তাহলে সে পশু হয়েই থাকত। 'মানুষের মধ্যে অনন্ত পুরুষের বিকাশ নিত্য সচেষ্ট। সুদূর কাল থেকে এই অন্তহীনের পরিচয় ক্রমশ স্ফুটতর হয়ে উঠছে। ··· মানুষ যে বিজ্ঞানচর্চা ক'রে এসেছে, প্রথম থেকে আজ পর্য্যন্ত তা'তে ভ্রমের ধারা প্রবাহিত, কিন্তু যতটুকু অংশে সেই ভ্রম কেটে যাচ্ছে, ততটুকু অংশেই আমরা বিজ্ঞানের সত্যধর্ম্ম উপলব্ধি করি। তাই সকল প্রমাণের বিরুদ্ধে জোর ক'রে বলতে পারি, বিজ্ঞানের লক্ষ্য সত্যকে উদ্‌ঘাটন করা, মিথ্যাকে প্রচার করা নয়। ···মানুষের ধর্ম্ম-সম্বন্ধেও সেই কথা। উপস্থিত প্রমাণের ওজন করতে গেলে দেখা যায়, প্রত্যহই মানুষ অন্যায় করছে, তার অসত্যের পার পাওয়া যায় না— তবুও সমস্ত আশু প্রমাণের ভিড় ঠেলে মানুষ বলে এসেছে, তার ধর্ম্ম অর্থাৎ তার নিগূঢ় স্বভাব অন্যায় নয়, অসত্য নয়। এইজন্যে যারা মানুষের শুভবুদ্ধির কোনো আধ্যাত্মিক নিত্য আশ্রয় মানে না, তারাও ব্যক্তিগত বা সমাজগত দায়ে ঠেকলে মানুষের ধর্ম্মবুদ্ধিরই দোহাই দিতে থাকে।'

ভাষণের শেষে রবীন্দ্রনাথ বললেন : 'আমাদের দীক্ষা শুভইচ্ছার দীক্ষা। ··· সকল বড়ো বড়ো ধর্ম্মশাস্ত্রের মধ্যে দিয়ে সেই ইচ্ছা নিত্য নিয়তই কাজ করছে, আমরা সেই শক্তির পক্ষে আপন শক্তিকে নিযুক্ত করবার সাধনা নিয়েছি। শান্তিনিকেতনের সাম্বৎসরিক দিনে আমাদের সাধনার সেই আত্মপরিচয় স্মরণ করতে চাই, তার সমস্ত মলিনতা দূর করে তাকে উজ্জ্বল করে তুলতে চাই। সাধনায় সত্য হবার আশা করব, আশু ফললাভের আশা করব না। এর প্রতিকূলে দুঃখবাধা, আত্মীয়-পরিজনের ঔদাসীন্য ও অবজ্ঞা সমস্তই স্বীকার করব, কিন্তু বিশ্বাস হারাব না। ··· বিশ্বভারতীর সাধনা সেই আশাকেই পরম সম্পদের মধ্যে গ্রহণ করুক, রক্ষা করুক, এই আমাদের প্রার্থনা।'

৮ পৌষ [বুধ 23 Dec] সকালে আম্রকুঞ্জে প্রাক্তন ছাত্রদের সম্মিলনসভার অধিবেশন হয়। ইন্দুভূষণ সেনের সভাপতিত্বে প্রায় ত্রিশজন প্রাক্তন ছাত্র এই সভায় যোগ দেন। 'তৎপরে পূজনীয় আচার্য্যদেব স্বীয় বক্তব্য প্রকাশ করেন।' এই ভাষণটি কোথাও প্রকাশিত হয়েছে বলে আমাদের জানা নেই।

৯ পৌষ [বৃহ 24 Dec] সকালে আম্রকুঞ্জে বিশ্বভারতী পরিষদের বার্ষিক অধিবেশন হয়। পৌষ-সংখ্যা শান্তিনিকেতন-এর 'আশ্রম সংবাদ'-এ লিখিত হয় : 'সংসদের সদস্যগণ সহ প্রতিষ্ঠাতা আচার্য্য সভায় প্রবেশ করিলে বৈদিক স্বস্তিবচনের মধ্যে সভা আরম্ভ হয়। সভায় আচার্য্যদেব প্রথমে নিজের বক্তব্য বলেন; তৎপরে অধ্যাপক ফার্মিকী, শ্রীযুক্ত ক্ষিতিমোহন সেন, শ্রীযুক্ত ইন্দুভূষণ সেন, শ্রীযুক্ত বিধুশেখর শাস্ত্রী ও হায়দ্রাবাদের ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডাক্তার হাকিম বিশ্বভারতীর আদর্শ সম্বন্ধে নিজেদের মত প্রকাশ করেন। / তৎপরে আচার্য্যদেব ডাক্তার ষ্টেন কোনো ও শ্রদ্ধেয় এণ্ডরুজ সাহেবের নিকট হইতে উৎসবের সম্ভাষণপূর্ণ প্রাপ্ত পত্র পাঠ করেন।' ফাল্গুন-সংখ্যা শান্তিনিকেতন-এর সঙ্গে দু'আনা মূল্যের ৯+২ পৃষ্ঠার একটি পুস্তিকার আকারে 'আচার্য্যের অভিভাষণ / বিশ্বভারতী বার্ষিক পরিষৎ ১৩৩২। / শ্রীযুক্ত ইন্দ্রকুমার চৌধুরী কর্তৃক অনুলিখিত' হয়ে প্রকাশিত হয় দ্র বিশ্বভারতী ২৭। ৩৮৯-৯৭ [১২]।

এই ভাষণে রবীন্দ্রনাথ বললেন, বিদ্যায়তন প্রতিষ্ঠার সময় থেকে যুক্ত একটি ছাত্র [? সন্তোষচন্দ্র মজুমদার] সেদিনকার ইতিহাসের একটি খণ্ডকালকে কয়েকটি চিঠিপত্র ও মুদ্রিত বিবরণীর ভিতর দিয়ে তাঁর সামনে এনে দিয়েছিলেন। সেটি পড়ে তাঁর মনে হল, কত তুচ্ছ আয়োজনে কত ক্ষীণতায় এর সূচনা হয়েছিল— 'সেদিন যে মূর্তি এই আশ্রমের শালবীথিচ্ছায়ায় দেখা দিয়েছিল, আজকের দিনের বিশ্বভারতীর রূপ তার মধ্যে এতই প্রচ্ছন্ন ছিল যে, সে কারো কল্পনাতেও আসতে পারত না। … কোনো একদিন বিরাট ভারতবর্ষ এই আশ্রমের মধ্যে আসন পাতবে, এই ভারতবর্ষ— যেখানে নানা জাতি নানা বিদ্যা নানা সম্প্রদায়ের সমাবেশ, সেই ভারতবর্ষের সকলের জন্যই এখানে স্থান প্রশস্ত হবে, সকলেই এখানে আতিথ্যের অধিকার পাবে, এখানে পরস্পরের সম্মিলনের মধ্যে কোনো বাধা কোনো আঘাত থাকবে না' সেই সংকল্প তাঁর মনে ছিল, কিন্তু কোনোদিন তিনি-যে তাকে রূপ দিতে পারবেন তা তিনি কল্পনাও করতে পারেননি। এই কর্মানুষ্ঠানটিকে বহুদিন একলা বহন করবার পরে তিনি যেদিন একে সকলের হাতে সমর্পণ করেছিলেন সেদিনও তাঁর মনে এই দ্বিধা ছিল সকলে একে শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করবেন কি না, 'এর প্রমাণ আরম্ভ হয়েছে যখন দেখতে পাচ্ছি আপনারা এর ভার গ্রহণ করেছেন'। এই প্রতিষ্ঠানের বাহ্যায়তনটিকে সুচিন্তিত বিধি-বিধান দ্বারা সুসম্বদ্ধ করবার ভার বিশ্বভারতী পরিষদের সদস্যেরা নিয়েছেন, এই নিয়ম-সংঘটন, অঙ্গবন্ধনের প্রয়োজনও আছে— জলের পক্ষে জলাশয়ের উপযোগিতা অনস্বীকার্য। 'সেইসঙ্গে এ কথাও মনে রাখা চাই যে, চিত্ত দেহে বাস করে বটে কিন্তু দেহকে অতিক্রম করে। দেহ বিশেষ সীমায় বদ্ধ, কিন্তু চিত্তের বিচরণক্ষেত্র সমস্ত বিশ্বে। দেহব্যবস্থা অতিজটিলতার দ্বারা চিত্তব্যাপ্তির বাধা যাতে না ঘটায় এ কথা আমাদের মনে রাখতে হবে।' অর্থাৎ নিয়মের জটিলতায় এর বিকাশের পথ যেন রুদ্ধ না হয়।

ভাষণের শেষাংশে রবীন্দ্রনাথ বললেন, এ কথা অনস্বীকার্য যে বর্তমান যুগে সমস্ত পৃথিবীর উপর য়ুরোপ নিজের প্রভাব বিস্তার করেছে— বিজ্ঞানই তার শক্তি। 'পশ্চিম-মহাদেশ তার পলিটিক্সের দ্বারা বৃহৎ পৃথিবীকে পর করে দিয়েছে, তার বিজ্ঞানের দ্বারা বৃহৎ পৃথিবীকে নিমন্ত্রণ করেছে। বৃহৎকালের মধ্যে ইতিহাসের উদার রূপ যদি আমরা দেখতে পাই তা হলে দেখব, আত্মম্ভরি পলিটিক্সের দিকে য়ুরোপের আত্মাবমাননা, সেখানে তার অন্ধকার; বিজ্ঞানের দিকেই তার আলোক জ্বলেছে, সেখানেই তার যথার্থ আত্মপ্রকাশ; কেননা বিজ্ঞান সত্য, আর সত্যই অমরতা দান করে।' দক্ষিণ-আমেরিকায় তিনি যখন রুগ্নকক্ষে আবদ্ধ ছিলেন তখন আগন্তুকের দল প্রশ্ন করত পৃথিবীকে দেবার মতো কোন্ ঐশ্বর্য ভারতবর্ষের আছে। রবীন্দ্রনাথ তার উত্তরে

বলেছেন, 'আমার মনে এই বিশ্বাস দৃঢ় হয়েছে যে, আজ ভারতবর্ষের কেবল যে ভিক্ষার ঝুলিই সম্বল তা নয়, তার প্রাঙ্গণে এমন একটি বিশ্বযজ্ঞের স্থান আছে যেখানে অক্ষয় আত্মদানের জন্য সকলকে সে আহ্বান করতে পারে।' সকলের জন্য ভারতের যে বাণী বিশ্বভারতীতে সেটিই অভিব্যক্ত হয়েছে। বিশ্বভারতী এই বেদমন্ত্রের দ্বারাই নিজের পরিচয় দিতে চায়— 'যত্র বিশ্বং ভবত্যেকনীড়ম্'। যে আত্মীয়তা বিশ্বে বিস্তৃত হবার যোগ্য সেই আত্মীয়তার আসন এখানে পাতা হয়েছে। দূরদেশের অতিথিরা এখানে ভারতবর্ষের আতিথ্য পেয়ে তৃপ্তিলাভ করেছেন— 'আমাদের দেশের পক্ষ থেকে তাঁরা আত্মীয়তা পেয়েছেন, তাঁদের পক্ষ থেকেও আত্মীয়তার সম্বন্ধ সত্য হয়েছে।'

'আমাকে এইটেতেই সকলের চেয়ে নম্র করেছে যে, ভারতের যে পরিচয় অন্য দেশে আমি বহন করে নিয়ে গেছি কোথাও তা অবমানিত হয় নি। আমাকে যাঁরা সম্মান করেছেন তাঁরা আমাকে উপলক্ষ করে ভারতবর্ষকেই শ্রদ্ধা জানিয়েছেন। যখন আমি পৃথিবীতে না থাকব তখনো যেন তার ক্ষয় না ঘটে, কেননা এ সম্মান ব্যক্তিগতভাবে আমার সঙ্গে যুক্ত নয়। বিশ্বভারতীকে গ্রহণ করে ভারতের অমৃতরূপকে প্রকাশের ভার আপনারা গ্রহণ করেছেন। আপনাদের চেষ্টা সার্থক হোক, অতিথিশালা দিনে দিনে পূর্ণ হয়ে উঠুক, অভ্যাগতরা সম্মান পান, আনন্দ পান, হৃদয় দান করুন, হৃদয় গ্রহণ করুন, সত্যের ও প্রীতির আদানপ্রদানের দ্বারা পৃথিবীর সঙ্গে ভারতের যোগ গভীর ও দূরপ্রসারিত হোক, এই আমার কামনা।'

১০ পৌষ [শুক্র 25 Dec] 'প্রাতে খৃষ্টোৎসব উপলক্ষ্যে আচার্য্যদেব মন্দিরে উপদেশ দেন।' উপদেশটি প্রকাশিত হয়নি।

অগ্রহায়ণ মাসের শেষ দিক থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আমন্ত্রণে রবীন্দ্রনাথের সেখানে যাওয়ার আয়োজন হচ্ছিল ও তিনি পৌষ উৎসবের পরে সেখানে যেতে সম্মতি দিয়েছিলেন, সে কথা আমরা আগেই বলেছি। কিন্তু নানাবিধ কারণে যাত্রার সময়টি পরিবর্তিত হয়; এই বিষয়ে ১২ পৌষ [রবি 27 Dec] রমেশচন্দ্র মজুমদারকে লেখেন :

তাহলে এই কথাই পাকা রইল তোমার ওখানেই আশ্রয় নেব। নাতনীর অভিসারে যদি কখনো কখনো যাত্রা করি আশা করি তাহলে কোনো কথা উঠবে না। চিঠিতে জানিয়েছি যে ৩রা ফেব্রুয়ারি থেকে তোমাদের ওখানে আমাদের কাজের পালা। তার এক আধদিন আগে পৌঁছতেও পারি। অনিশ্চয়তার কারণ জলপথে যাত্রা। কলকাতা থেকে সুন্দরবন ডেসপ্যাচ যোগে যাওয়াই আমার পক্ষে শ্রেয়। রেলপথের আন্দোলন ক্লান্তিকর। সিউড়িতে ২৩শে জানুয়ারি তারিখে আমি আবদ্ধ, ২৪শে পর্য্যন্ত বন্ধন। ২৫শে আশ্রমে ফিরব। ২৬শে কলকাতায় যাব। ২৭শে জাহাজে উঠব। জাহাজে কতদিন লাগে জানিনে। আন্দাজ করছি ৩রার পূর্বে পৌঁছতে বাধা ঘটবে না। যদি সে আশঙ্কা থাকে আমাকে জানালে ২৪শে তারিখে সিউড়ি থেকে কলকাতায় গিয়ে ২৫শে বা ২৬শে জাহাজে উঠতে পারি। যদি বিঘ্নের সম্ভাবনা বুঝি তাহলে ১লা তারিখে রেলপথেই বেরিয়ে পড়ব। আমার অভ্যর্থনার জন্যে বিরাট আয়োজন কোরো না। জনতার পরিমাণ দিয়ে আমি আমার সম্মানের ওজন যাচাই করিনে। বাহ্য কৌতূহলের চেয়ে আন্তরিক শ্রদ্ধা আমার কাছে বেশি মূল্যবান। পূর্ববঙ্গের চিত্ত সরল ও সহজেই শ্রদ্ধাবান, এই ভরসাতেই সেখানে যাবার প্রস্তাবে আনন্দ বোধ করছি। ১০৩

এই চিঠি পড়লে বোঝা যায়, মধ্যবর্তী কিছু চিঠি পাওয়া যায়নি যাতে 3 Feb 1926 ঢাকায় রবীন্দ্রনাথের সফর শুরুর কথা হয়েছিল।

সিউড়িতে রবীন্দ্রনাথের যাওয়া হয়নি, তবে তাঁর প্রতিশ্রুত কার্যবিবরণীটি পাওয়া যায় আনন্দবাজার পত্রিকা-র ১১ পৌষের প্রতিবেদনে : "বর্তমান বৎসরের সিউড়ী প্রদর্শনীর সভ্যগণ, সিউড়ী প্রদর্শনীর দ্বার উন্মোচনের জন্য কবিগুরু রবীন্দ্রনাথকে সাদরে আহ্বান করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ ঐ সাদর নিমন্ত্রণ আনন্দের

সহিত গ্রহণ করিয়াছেন। আগামী ২৩শে জানুয়ারী প্রদর্শনীর দ্বার উন্মোচন হইবে। যাহাতে সিউড়ীবাসীর পক্ষ হইতে রবীন্দ্রনাথকে যথাযোগ্যরূপে আদর অভ্যর্থনা করা হয়, সে বিষয়ে জল্পনা কল্পনা চলিতেছে। ...লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত শিবরতন মিত্র মহাশয়ের সাধনা কেন্দ্র 'রতন লাইব্রেরী' দর্শন করাও রবীন্দ্রনাথের সিউড়ী প্রোগ্রামের অন্যতম বিষয়। শ্রীযুক্ত মিত্র মহাশয় বিশেষ পরিশ্রম এবং চেষ্টা যত্ন দ্বারা নানারূপ তত্ত্বপূর্ণ পুস্তকাদি এবং বিচিত্র পাণ্ডুলিপি এই 'রতন লাইব্রেরীতে' সঞ্চয় করিয়াছেন।"[১০৪] এই পুস্তক ও পুঁথির সম্ভার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও রবীন্দ্রনাথ বিশ্বভারতীর জন্য সংগ্রহ করতে চেয়েছিলেন, 'রবীন্দ্র-প্রসঙ্গ' গ্রন্থের সম্পাদক জানিয়েছেন : 'বর্তমানে অবশ্য তথাকথিত গবেষক দ্বারা লুণ্ঠিতাবশেষ রতন লাইব্রেরি বিশ্বভারতীর সংগ্রহকে সমৃদ্ধতর করেছে।'

রবীন্দ্রনাথ পৌষ মাসের মাঝামাঝি গগনেন্দ্রনাথ, কালিদাস নাগ, প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ প্রভৃতিকে লিখলেন, তিনি 4 Jan 1926 [সোম ২০ পৌষ] কলকাতায় আসবেন। তিনি আসার কারণ কাউকে লেখেননি, কিন্তু তাঁর আগমনের উদ্দেশ্য অনুমান করা যায়। 31 Dec তিনি বাংলার গবর্নর লর্ড লিটনের কাছ থেকে একটি দীর্ঘ চিঠি পান। এই চিঠি থেকে জানা যায়, লিটন যখন শান্তিনিকেতনে গিয়েছিলেন তখন রবীন্দ্রনাথ তাঁকে একটি 'নোট' দেন 'in which you asked Government to grant Visvabharati a Charter as a University enabling it to confer its own degrees.' কিন্তু তিনি রবীন্দ্রনাথের অনুরোধ রক্ষা করতে অক্ষমতা জানান 'because I am not satisfied that your institution at Santiniketan has yet reached the high standard which is necessarily required before a University Charter can be granted.' লিটনের মতে, প্রধানত দুটি শর্তপূরণ-সাপেক্ষে কোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বীকৃতি দেওয়া যায় : '1) The enjoyment of large and assured endowments— whether State or private. 2) The attainment of a high academic standard in a variety of subjects.' তিনি লেখেন, যদিও রবীন্দ্রনাথ বিশ্বভারতীর আর্থিক অবস্থাকে স্থিতিশীল বলে দাবি করেছেন কিন্তু তাঁর সংগৃহীত তথ্য এই দাবি সমর্থন করে না। দ্বিতীয়ত, 'The Visyabharati appears to me to undertake advance work in oriental languages alone. Its main activities seem to me to be diverted towards School and elementary University work. I hardly feel, therefore, that it has yet reached a sufficiently advanced standard in a variety of subjects to justify its recognition as a University by Government.' তবে তিনি আশা করেন, বিশ্বভারতী একদিন এইসব অভাব কাটিয়ে উঠবে এবং তাঁর চিঠি বর্তমানে হতাশা সৃষ্টি করলেও হয়তো উক্ত পশ্চাৎপদতা দূরীকরণে অনুপ্রেরণা দেবে।[১০৫]

রবীন্দ্রনাথ সম্ভবত এই বিষয়ে অনেকের সঙ্গে আলোচনা করে লিটনের চিঠির উত্তর রচনা করেন 4 Jan [সোম ২০ পৌষ] তারিখে, যার খসড়া রবীন্দ্রভবনে প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ-সংগ্রহে রক্ষিত আছে। রবীন্দ্রনাথ জানান:

Your's letter explaining why charter cannot be granted to Visva-bharati in its present condition has not caused me disappointment and I fully agree with the reasons given for the denial.

For nearly twenty four years I have allowed this Institution to find its natural growth from within itself. Whatever result it may have attained to-day is owing to this independence and utter freedom from greed of success in its guiding principle. It has never been my ambition to build up the education department of Visva-bharati in imitation of a university which has had inevitable process of evolution in the history of Europe. Such an institution can never fit us and its huge burden of bulk itself is disproportionately heavy for our means and our manner of living. We have seen universities in India which have gained their charter through their conformity to a type of academy that has its roots in an alien soil and therefore they cannot help being immensely wasteful, both in money and mind. Unfortunately for this university of ours it is easier to discover what it lacks than what it does possess, for I have ever relied upon some living ideal and not on any external pattern for the shaping of it. And therefore the most valuable factor in the creation of this place is its atmosphere of culture and aspiration which refuses to be measured and classified, folded and packed in an inspector's report. I know for certain that such a spontaneous spirit of life will be smothered, directly we introduce into it a faith in big funds, ostentations array of miscellanies, and regulations that are an imposition of a complexity mostly consisting of the non-essential.

Believing that Your Excellency has sympathy for our endeavour I have ventured to write at some length about the character of our work even though it is sure to remain vague to you like all living principles that can never be defined but only be realised through a direct experience of contact

Your Excellency is aware that Visva-bharati has been given over to a public body which necessarily will follow its own bend of mind within a certain limit in building up and maintaining this organisation. That this body has its own ambition which is not personally mine is proved by the desire of some of its members finding its way into the note submitted to Your Excellency during your last visit to Santiniketan. The temptation in the shape of phantasm of success, an overgrown figure of unreality, has unfortunately become almost universal in India owing to the importation of a standard applicable to foreign circumstances. And my mind is not altogether free from the fear that some day the serpent may creep into this Eden of ours: our paradise may then be turned into a chartered commonplace like the crowd of other futilities in India that have the bloated appearance of success.[১০৬]

লিটন চিঠিটির উত্তর দেন 16 Jan [শনি ২ মাঘ] তারিখে, দীর্ঘ এই পত্রের বঙ্গানুবাদ ড সনৎকুমার বাগচী 'রবীন্দ্রনাথ ও কয়েকজন রাজপুরুষ' [পৃ ৫৮-৬০] গ্রন্থে প্রদান করেছেন। লিটন লেখেন :

…য়ুরোপীয় ধরনের শিক্ষার থেকে তরুণ ভারতীয় ছাত্রদের বিকশিত মনের পক্ষে অধিকতর উপযোগী শিক্ষা পদ্ধতির ব্যবস্থাপনার জন্য বিশ্বভারতী সত্যই সাদর অভ্যর্থনা পেতে পারে। আমি আপনার সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত যে কোনো শিক্ষা-পরিদর্শকের পক্ষে বিশ্বভারতীতে কী নেই তা নির্দেশ করা খুব সহজ হলেও এখানে কী আছে তা উপলব্ধি করতে হলে ব্যক্তিগত পরিচয় এবং এর আদর্শের প্রতি সহানুভূতি প্রয়োজন। কিন্তু, ব্যক্তিগত মতামতের উপর নির্ভরশীল নয় এমন সুনাম হওয়া পর্যন্ত আমাদের পরিচিত বিশ্ববিদ্যালয় সমূহের মানদণ্ডে একে বিচার করাটা কত অপরিহার্য তা নিশ্চয়ই আপনি উপলব্ধি করবেন। বাংলা সরকার এই মুহূর্তে অন্য কিছু করতে পারেন না। সেজন্য আশা করি আপনার অনুরোধের উত্তরে আমার বক্তব্যকে এই অর্থেই নেবেন— অন্যভাবে নয়।…

শান্তিনিকেতনে যে বিবৃতি আপনি আমার হাতে দিয়েছেন তাতে আপনি একটি অনুরোধও করেছেন, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন পরীক্ষায় বসার জন্য ছাত্রদের সার্টিফিকেট দেওয়ার অধিকার সরকার যেন বিশ্বভারতীকে দেন। …মনে হয় আপনার প্রস্তাবিত ব্যবস্থা বিশ্বভারতীর স্বার্থের পক্ষে সত্যিই অনুকূল হবে না। জানতে পারলাম কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেট বিশ্বভারতীকে অস্থায়ীভাবে স্বীকৃতি এবং আই.এ. ও বি.এ. পরীক্ষায় ছাত্র পাঠাবার অধিকার দিয়েছেন। কিন্তু এই সুযোগ ১৯২৬ থেকে কেবলমাত্র দু বছরের জন্য। খুব স্বাভাবিক, এই অস্থায়ী স্বীকৃতিকে স্থায়ী করার জন্য আপনি উদ্বিগ্ন হয়েছেন।

রাজ্য সরকার বিশ্বভারতীকে এ ধরনের সার্টিফিকেট দেওয়ার অধিকার দিতে পারেন কিন্তু এই সার্টিফিকেটকে গ্রাহ্য করার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়কে বাধ্য করতে পারেন না। সেজন্য এই অধিকার প্রয়োগ করলে আপনার আশানুরূপ কাজ। হবে না। …

আমার মনে হয় যে আপনাদের উদ্দেশ্য সাধিত হবে যদি দু বছরের সময়সীমা শিথিল করার জন্য আপনারা বিশ্ববিদ্যালয়কে চাপ দেন এবং সীমাবদ্ধতা না রেখে স্বীকৃতির জন্য আবেদন করেন যা বিশ্ববিদ্যালয় প্রয়োজনমতো যে-কোনো সময়ে প্রত্যাহার করে নিতে পারবেন, যদি দেখা যায় বিশ্বভারতীর সার্টিফিকেটপ্রাপ্ত ছাত্রদের যোগ্যতা সন্তোষজনক নয়।[১০৭]

রবীন্দ্রনাথ লর্ড লিটনের প্রতি কিছুটা অনুকূল মনোভাব পোষণ করতেন কেন এইসব চিঠিপত্রই তার প্রমাণ। ভারতবর্ষীয় ইংরেজদের সম্পর্কে তাঁর অশ্রদ্ধা তিনি বিভিন্ন লেখায় প্রকাশ করেছেন, তবু লিটনের দমনমূলক আইন, ভারতীয় নারীদের সম্পর্কে বেফাঁস মন্তব্য প্রভৃতির জন্য তাঁর সমালোচনা করলেও তাঁর আন্তরিক মহানুভবতাকে তিনি স্বীকার করতেন। তবু-তো তিনি জানতেন না যে, Apr-July 1925-এ অস্থায়ী গবর্নর-জেনারেল থাকার সময়ে রবীন্দ্রনাথ ও বিশ্বভারতীর বিরুদ্ধে গোয়েন্দাদপ্তরের বিরূপ মন্তব্য পাঠ করে লিটন 18 Jul সরকারি পুলিশের বক্তব্যকে সমর্থন না করে লিখেছিলেন : 'I do not dispute any of the facts mentioned by the police but I differ from their interpretation of the facts. I agree that they are justified in regarding the institution with suspicion but my own opinion of it is based rather on my knowledge of Sir Rabindranath's own influence, aims & ideals than upon the presence either on the staff or among the students or individuals with anti-British sentiments. It is Sir Rabindranath's deliberate object to provide an efficient educational institution for persons who are not favourably disposed towards Government institutions and to divert their attention from politics to learning' [দ্র রবীন্দ্রনাথ ও কয়েকজন রাজপুরুষ। ৮৭-৮৮, ৯০-৯১]। একথা ঠিক যে, স্বয়ং গবর্নরও ব্যুরোক্র্যাসির মতকে প্রভাবিত করতে পারেননি, কিন্তু আমলাতন্ত্রের স্বভাব আজও সেইরূপই আছে তার সুপ্রচুর উদাহরণ আমরা প্রায়শই প্রত্যক্ষ করি। বাংলার সরকার তৎকালীন ডিরেক্টর অব্ পাবলিক ইন্স্ট্রাকশন সুভাষচন্দ্রের বহিষ্কার-ব্যাপারে কুখ্যাত Edward Farley Oaten-কে বিশ্বভারতীর কাজকর্ম সম্পর্কে রিপোর্ট দেবার জন্য শান্তিনিকেতনে পাঠায়। রবীন্দ্রনাথের অনুপস্থিতিতে 4 Sep 1925 [২১ ভাদ্র] কলকাতা মাদ্রাসার অধ্যক্ষ A.H. Harley-কে সঙ্গে নিয়ে তিনি শান্তিনিকেতনে যান ও সেখানকার পঠন-পাঠন সম্পর্কে দীর্ঘ ৬ পৃষ্ঠার রিপোর্ট পেশ ক'রে পরিশেযে মন্তব্য করেন :

…এই বিদ্যায়তন থেকে এ পর্যন্ত যেসব ছাত্র ম্যাট্রিকুলেশন দিয়েছে সাফল্যের ব্যাপারে তারা সংগত মানে পৌঁছেছে— এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচী-বহির্ভূত অনেক কিছু তারা শিক্ষা করে বলে এটা আরো সন্তোষজনক বলতে হবে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মান বিবেচনা করে আমি নিঃসন্দেহ যে বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতর পরীক্ষায় বসলে এখানকার ছাত্ররা কৃতিত্বের পরিচয় দেবে। শেষ পর্যন্ত শান্তিনিকেতনের উপর এইসব

পরিবর্তনের ফল গভীর হবে। কিন্তু কেউই চান না, শান্তিনিকেতনের মূল আদর্শ পরিবর্তিত হোক। শান্তিনিকেতন এই প্রদেশের শিক্ষাক্ষেত্রকে সমৃদ্ধ করেছে।[১০৮]

কিন্তু অস্থায়ী গবর্নর-জেনারেল বা বাংলার ডি.পি. আই-এর মন্তব্য বা প্রতিবেদন এখানকার গোয়েন্দাদপ্তরের মনোভাব সম্পূর্ণ পরিবর্তিত করতে পারেনি— আশ্রমের কাজে নিযুক্ত বিভিন্ন ব্যক্তির বিরুদ্ধে ব্রিটিশ-বিরোধী মনোভাব বা কার্যকলাপের অভিযোগ ক'রে 19 Oct গোয়েন্দা-অধিকর্তা একটু সুর নরম ক'রে লেখেন : 'মিঃ পেট্রির মতে ড. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রতিষ্ঠানকে সহায়তা করা উচিত নয়। কিন্তু তিনি বুঝতে পারছেন বাংলা সরকারের শিক্ষা বিভাগের রিপোর্টের পরিপ্রেক্ষিতে এই প্রতিষ্ঠানকে আর্থিক সাহায্য রোধ করা কষ্টকর। যাই হোক, পেট্রি আমাকে প্রস্তাব করতে বলেছেন যে উত্তরের খসড়াটি আর একটু পরিবর্তিত হতে পারে। তিনি মনে করেন, ড রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জীবদ্দশায় আর্থিক সাহায্যে সম্মতি দেওয়ার পরিবর্তে বলা উচিত, ঠিক এই মুহূর্তে সাহায্য বন্ধ করা না হলেও যে-কোনো সময়ে তার প্রয়োজন হতে পারে যদি এই প্রতিষ্ঠান সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ সৃষ্টির কেন্দ্রে পরিণত হয়। সেখানে কিছু অধ্যাপকের ব্রিটিশ-বিরোধী মনোভাবের জন্য এই পরিবর্তন শীঘ্রই হতে পারে।'[১০৯] অবশ্য এই মন্তব্য সত্ত্বেও 22 Oct ভারত সরকার লন্ডনে ভারতসচিবের দপ্তরকে জানায়, বিশ্বভারতীকে কেউ আর্থিক সাহায্য করলে তারা বাধা দেবে না। বিদ্যাভবন-শিক্ষাভবন-কলাভবন প্রভৃতি বিভাগ এই সময়ে কখনোই আর্থিক সাহায্য প্রার্থনা করেনি, কিন্তু শ্রীনিকেতনে সরকারি আর্থিক ও অন্যান্য সাহায্য কিঞ্চিৎ কৃপণতাদুষ্ট হলেও অনেকটা পাওয়া গেছে সেকথা মানতেই হবে।

লিটনের চিঠির জবাবের খসড়া রচনার জন্য রবীন্দ্রনাথ কলকাতায় এসে কয়েকদিন সেখানে ছিলেন। ২৫ পৌষ [শনি 9 Jan 1926] আনন্দবাজার পত্রিকা-য় জানানো হয় : 'আগামী সন্ধ্যায় বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ লর্ড সিংহ সমভিব্যহারে ষ্টার থিয়েটারে গৃহপ্রবেশ অভিনয় দেখিতে আসিবেন। ইতিপূর্ব্বে কবীন্দ্র রবীন্দ্র আর একবার গৃহপ্রবেশ অভিনয় দেখিয়া নাটকখানির প্রথমাংশে কয়েকটি অত্যাবশ্যকীয় অদল বদল করিয়া সমগ্র অভিনয়টিকে সাধারণ দর্শকের মনোরঞ্জক করিয়া দিয়াছেন।'[১১০]

কিন্তু রবীন্দ্রনাথ সেদিন অভিনয় দেখতে গিয়েছিলেন এমন কোনো খবর বা স্মৃতিচারণ পাওয়া যায়নি, পরিবর্তে 10 Jan [রবি ২৬ পৌষ] রমেশচন্দ্র মজুমদারকে ঢাকা-যাত্রার দিন-পরিবর্তন সম্পর্কে কিছু খবর দিয়ে লিখেছেন : 'লক্ষ্ণৌ থেকে আহ্বান এসেছে— সেখানে যাচ্ছি। পাঞ্জাবে সিরমুরে নিমন্ত্রণ আছে, এই সুযোগে সেটাও সেরে আসব। ...এখনি শান্তিনিকেতনে যাচ্ছি। সেখান থেকে ১৩। ১৪ই নাগাদ লক্ষ্ণৌ রওনা হব।'[১১১]

তিনি শান্তিনিকেতনে আসার পরে 12 Jan [মঙ্গল ২৮ পৌষ] লীগ অব্ নেশন্‌সের সাংস্কৃতিক প্রতিনিধি M.S. Marvin আশ্রম-পরিদর্শনে আসেন। রবীন্দ্রজীবনী-কার লিখেছেন :

লীগ পৃথিবীর শান্তিরক্ষার জন্য কী করিতেছে, তিনি সেই বিষয়ে বলেন। কিন্তু তাঁহার ভাষণ বিষয়ের গুরুত্বের অনুপাতে আদৌ মনোজ্ঞ হয় নাই— কারণ শ্রোতারা বেশ ক্রিটিক্যাল ও দুনিয়ার রাজনীতিক ঘটনাদি সম্বন্ধে ভালো রকম ওয়াকিবহাল ছিলেন। রবীন্দ্রনাথের সহিত মার্ভিন সাহেবের সাক্ষাৎ হইলে তিনি লীগ অব্ নেশনসের কথাই পাড়েন; তখন কবি বলেন যে, পরিতাপের বিষয় প্রাচ্যদেশে য়ুরোপ হইতে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিরা আসেন না; যে-সব ইংরেজ আসেন তাঁহাদের মধ্যে দার্শনিক বা artistic type বা শিল্পী-মেজাজী লোক খুবই কম। ইংরেজদের ব্যাবসা এ দেশে শুরু, শাসনকার্যে তাহার সমাপ্তি। এই শ্রেণীর লোকই অধিক সংখ্যায় এ দেশে আসে। কিন্তু শাসনকার্যটি পরিচালনাই য়ুরোপীয় সভ্যতার চরম কথা নয়। সংস্কৃতির দিকটা এ দেশে অজ্ঞাত থেকে যায়। সেইটি হইলে পশ্চিমের সহিত প্রাচ্যের যথার্থ যোগবন্ধন সার্থক হইবে। দেশে ফিরিয়া মার্ভিন

সাহেব 'ম্যানচেস্টার গার্ডিয়ানে' (২৩ জুন ১৯২৬) লেখেন, "He (Tagore) is the attraction and the stimulous, and one can see but a doubtful prospect for the settlement [Santiniketan] if these were withdrawn."।"[১১২]

নিখিলভারত সংগীত সম্মেলন উপলক্ষে আমন্ত্রিত হয়ে রবীন্দ্রনাথ লখনৌতে যান। তাঁর সঙ্গী হয়েছিলেন বিরাট একটি দল; মাঘ-সংখ্যা শান্তিনিকেতন-এ লিখিত হয় : 'কিছুদিন পূর্ব্বে পূজনীয় আচার্য্যদেব আর্ট কনফারেন্স উপলক্ষ্যে লক্ষৌ গিয়াছিলেন; তাঁহার সহিত নিম্নলিখিতেরা ছিলেন। শ্রীমতী প্রতিমা দেবী, শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসু, শ্রীযুক্ত রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর, মিঃ মরিস, মিঃ বাকে এবং মিসেস বাকে।' ৩০ পৌষ [বৃহ 14 Jan] ক্যাশবহিতে 'শ্রীযুক্ত কর্ত্তাবাবু মহাশয় দিগরের লক্ষৌ যাওয়াকালে ষ্টেসনের কুলী'ভাড়ার হিসাব পাওয়া যায়। রবীন্দ্রজীবনী-কার জানিয়েছেন, 'তাঁহার থাকিবার ব্যবস্থা হয় আউধের নবাবদের এক প্রাসাদ মোতিমহল-এ', কিন্তু উক্ত সম্মেলনে রবীন্দ্রনাথের উপস্থিতি ও কার্যকলাপ সম্পর্কে কোনো তথ্য তিনি দেননি, আমাদেরও হাতে নেই। অসিতকুমার হালদার তখন লখনৌ আর্ট স্কুলের অধ্যক্ষ। শান্তিনিকেতনে ফিরে এসে রবীন্দ্রনাথ ১১ মাঘ [সোম 25 Jan] তাঁর পিতা সুকুমার হালদারকে লিখেছেন : 'লক্ষ্ণৌতে অসিতকে দেখে এলেম। রাজার হালে আছে। কিন্তু গাছে অতিরিক্ত সার দিলে পাতা হয়, ফুল ধরে না; শেষকালে ওর সেইরকম অতিপুষ্টির আশঙ্কা করচি। সংসারের তরফ থেকে সেটা খারাপ নয়— তবে কিনা, পদমর্য্যাদার চেয়ে চিত্তমর্য্যাদার যদি আদর থাকে তাহলে ভাববার কথা।'[১১৩]

রবীন্দ্রনাথের বড়োদাদা দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জীবনাবসান হয় ৪ মাঘ [সোম 19 Jan] ভোররাত্রে, রবীন্দ্রনাথ তখন লখনৌতে। এই সংবাদ পেয়ে তিনি সেখানকার কার্যসূচি অসমাপ্ত রেখে শান্তিনিকেতনে ফিরে আসেন। এই বিষয়ে উল্লিখিত পত্রে তিনি সুকুমার হালদারকে লিখেছিলেন : 'বড়দাদাও গেলেন— এখন আমিই শীতের গাছে শেষ পাতাটার মত উত্তরে হাওয়ায় কাঁপছি— ঝরে পড়লেই হয়— বোঁটাও আলগা হয়েচে।'

১৪ মাঘ [বৃহ 28 Jan] জোড়াসাঁকো ও শান্তিনিকেতনে যুগপৎ দ্বিজেন্দ্রনাথের আদ্যশ্রাদ্ধের আয়োজন করা হয়। মাঘ-সংখ্যা তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা-য় [পৃ ৩১১] শেষোক্ত অনুষ্ঠানের বিবরণে লিখিত হয় : 'এই আশ্রমের সর্ব্বত্র তাঁহার [দ্বিজেন্দ্রনাথের] পুণ্যস্মৃতির এক অচ্ছেদ্য যোগ অনুভব করিয়া পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় বিশ্বভারতীর খ্যাতনামা পণ্ডিত শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত বিধুশেখর শাস্ত্রী মহাশয়ের পৌরোহিত্যে উক্ত দিবসে যথাসময়ে 'শান্তিনিকেতন আশ্রমে' তাঁহার পূজনীয় অগ্রজের যথাশাস্ত্র বৃষাদি উৎসর্গ পূর্ব্বক এক স্বতন্ত্র শ্রাদ্ধানুষ্ঠান সম্পন্ন করিয়াছেন এবং তদীয় পুণ্যস্মৃতির উদ্দেশে একটী কূপখননের ব্যবস্থা করিয়াছেন। এতদুপলক্ষে গত ২০শে মাঘ বুধবার সেখানে একটী বৃহৎ ভোজের আয়োজন করা হইয়াছিল। উক্ত দিবস সমাগত দরিদ্রদিগকে ভোজনান্তে এক-একখানি কম্বল উপহার দেওয়া হইয়াছিল।' মাঘ-সংখ্যা শান্তিনিকেতন-এর বর্ণনাটি এইরূপ : '১৪ই মাঘ পরলোকগত আত্মার মঙ্গল কামনায় শ্রাদ্ধ ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। ঠাকুর পরিবারের প্রথামত শাস্ত্র পাঠ করিয়া এই ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। দ্বিজেন্দ্রনাথের পৌত্র শ্রীদিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর দান ও বৃষ উৎসর্গাদি করেন। দ্বিজেন্দ্রনাথের কনিষ্ঠ ভ্রাতা আচার্য্য রবীন্দ্রনাথও উপস্থিত ছিলেন। শ্রীযুক্ত ক্ষিতিমোহন সেন ও শ্রীযুক্ত বিধুশেখর শাস্ত্রী আচার্যের কাজ করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত ভীমরাও শাস্ত্রী শ্রীযুক্ত গোখ্‌লে, শ্রীযুক্ত রঙ্গস্বামী, ও শ্রীযুক্ত আয়ার স্বামী এই উপলক্ষ্যে বেদ পাঠ করেন।' এর আগে ১১ মাঘ [সোম 25 Jan]

মন্দিরের উপাসনায় রবীন্দ্রনাথ যা বলেন, সেটি 'দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মৃত্যুর পর শান্তিনিকেতন মন্দিরে ১১ই মাঘে ভাষিত' টীকা-সহ 'মৃত্যু নামে মাঘ-সংখ্যা ভারতী-তে [পৃ ৩৫৬-৫৭] মুদ্রিত হয়।

রবীন্দ্রনাথ কোনোদিন মৃত্যুকে জীবনের চরম পরিণতি বলে মানেননি, এখানেও তিনি সেই কথাই বললেন :

সংসারের ভিতর মৃত্যুকে ক্ষতি বলে জানি, দুঃখ বলে জানি। জীবনের বিরুদ্ধ, অস্তিত্বের বিরুদ্ধ, 'না' বলেই জানি। এই সঙ্কীর্ণ পরিধির আবেষ্টনে অমৃতের মধ্যে মৃত্যুর যে প্রতিষ্ঠা তা দেখ্‌তেই পাইনে। কাছের দিকটাতে চেয়ে দেখি মৃত্যু আমাদের পক্ষে প্রকাণ্ড অভাবের রূপ ধরে আসে, অথচ এই বিপুল বিশ্বসংসারের দিকে যখন তাকাই তখন দেখি তার জ্যোতি কোথাও ম্লান নয়, আনন্দের সঙ্গীত, সূর্যের মহিমা আকাশে বিস্তৃত, কোনও জায়গায় বিষাদের কোনও চিহ্ন নেই।

ছন্দের মধ্যে যতি তার গতিকেই প্রকাশ করে। সেই সমাপ্তিগুলিকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে দেখলে অবসানকেই দেখি, গতিকে দেখিনা; তখন সে কিছুই প্রকাশ করেনা। ছন্দের সমাপ্তির মধ্যে যতিকে দেখলে বুঝি, তার মধ্যেই প্রাণের দোলা। বিপুল বিশ্বসংসারে বিস্তৃত করে মৃত্যুকে দেখলে বুঝি সে অবসান নয়। বুঝি যে, সমাপ্তির তালে তালে করতাল বাজিয়ে চলেছে চিরন্তন।···

এই বিশ্বসৃষ্টির মধ্যে অগ্নি সূর্য্য বায়ু যা কিছু সৃষ্টিকে ঘটিয়ে তুলচে এরা সবাই বিশ্বের গতিলীলার প্রকাশ; তারি সঙ্গে মিলিয়ে বলা হয়েছে, মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ— মৃত্যুও তাদেরই তালে তালে চলেছে; এই সংসারে প্রাণচাঞ্চল্যের যে পঞ্চায়েৎ বসেছে মৃত্যুও সেই পঞ্চায়েতের একজন। মৃত্যু তার বিরুদ্ধ নয়। সে যে সৃষ্টির চক্রকে অবরুদ্ধ করছে তা হতেই পারেনা, সে তাকে আরও অগ্রসর করে দিচ্ছে। মৃত্যু যাঁর ছায়া অমৃত যাঁর ছায়া সেই পরম আনন্দের মধ্যে যাঁরা মৃত্যুকে দেখেন তাঁদের ভয় থাকে না। ···মৃত্যু কোনও সূত্রকে ছিন্ন করবার জন্য নয়, সূর্য্য বায়ু জল প্রভৃতি অন্যান্য শক্তির মত সেও সৃষ্টির বাহন। সৃষ্টিকে সে রূপ থেকে রূপান্তরে কাল থেকে কালান্তরে বহন করে নিয়ে যাচ্ছে— না হলে অচল রূপের চাপে সব পিষ্ট হয়ে যেত।

অনেক আত্মীয়-বন্ধুর মৃত্যুর ঘটনায় রবীন্দ্রনাথকে নীরব অচঞ্চল দেখে আমাদের অনেকের হয়তো মনে হয়, তিনি হয় নিষ্ঠুর নতুবা নির্বিকার— কিন্তু মৃত্যুকে যিনি এই দার্শনিক পটভূমিকায় দেখেন, তাঁকে বিচার করার মানদণ্ডটিই তো আলাদা হওয়া উচিত!

লখনৌ যাওয়ার খবর দিয়ে রবীন্দ্রনাথ রমেশচন্দ্রকে লিখেছিলেন : 'ঠিক ৩রা তারিখে পাছে এসে পৌঁছতে না পারি, এই ভেবে আরো দুটো দিন পিছিয়ে দিতে চাই। পাঁচই ফেব্রুয়ারি ঢাকায় পৌছিয়ে ৬ই তারিখ থেকে কাজে লাগব— এই সংকল্প করেছি। আশা করি অসুবিধা হবে না। জাহাজে করে যাবার খেয়াল ছেড়ে দিয়েছি।'

এই পর্যন্ত ঠিক ছিল, রবীন্দ্রনাথ ঢাকায় গিয়ে অধ্যাপক রমেশচন্দ্র মজুমদারের সরকারি কোয়ার্টারে তাঁর অতিথি হবেন। কিন্তু অভ্যর্থনা সমিতি গঠিত হওয়ার সময় থেকেই বাঙালির স্বভাবসিদ্ধ ঈর্ষাবহ্নি প্রজ্জ্বলিত হল। রবীন্দ্রনাথ এসে রমেশচন্দ্রের বাসায় অতিথি হলে তার গুরুত্ব বেড়ে যাবে এটা অন্যেরা কেউ-কেউ ঠিক সহ্য করতে পারছিলেন না, তাই এই বিষয় নিয়ে একটি ঘোঁট-পাকানোর সূচনা হল। 6 Feb *The Bengalee* পত্রিকায় মুদ্রিত এক প্রতিবেদনে রমেশচন্দ্রের বাসায় রবীন্দ্রনাথের থাকা নিয়ে কলহের বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া হয়েছে, সেখানে অপূর্বকুমার চন্দের নাম গুরুত্বসহকারে উল্লেখিত হয়। ২৫ মাঘ আনন্দবাজার পত্রিকা লিখেছে : 'ঢাকায় রবীন্দ্রনাথের আগমন উপলক্ষে বেশ একটু দলাদলি ও কোলাহলের সৃষ্টি হইয়াছিল। তিনদিন ক্রমাগত বাক্‌যুদ্ধের পরে, তাহাতে শান্তির যবনিকা পড়িয়াছে। আমরা এই বিষয় লইয়া আর কোনও আলোচনা করিব না।'[১১৪] কিন্তু দেখা যাচ্ছে, শান্তির যবনিকা আজও পড়েনি।

বিশিষ্ট গবেষক গোপালচন্দ্র রায় স্বয়ং রমেশচন্দ্রের কাছ থেকে রবীন্দ্রনাথ ও অন্যান্যদের লেখা চিঠিপত্র সংগ্রহ ক'রে ও তাঁর মুখে রবীন্দ্রনাথের ঢাকা সফরের বিবরণ শুনে 'ঢাকায় রবীন্দ্রনাথ' নামে একটি প্রবন্ধ লিখে

'দেশ' সাপ্তাহিকে Nov 1968-এর তিনটি সংখ্যায় প্রকাশ করেন ও পরে আরও তথ্য দিয়ে একই নামে ১৭০ পৃষ্ঠার একটি গ্রন্থ প্রকাশ করেন Aug 1972-তে। কিন্তু রমেশচন্দ্র 4 Dec 1978-এ প্রকাশিত তাঁর আত্মজীবনী 'জীবনের স্মৃতিদীপে' গ্রন্থে অভিযোগ করেন যে, তাঁর কাছে রক্ষিত রবীন্দ্রনাথের চিঠিপত্র ও ঢাকায় থাকার কয়দিন তাঁর দৈনন্দিন কার্যের মুদ্রিত প্রোগ্রাম নিয়ে গিয়ে এবং তাঁর মুখে-শোনা বিবরণী অবলম্বন ক'রে গোপালচন্দ্র 'দেশ' পত্রিকার তিনটি সংখ্যায় 'ধারাবাহিকভাবে রবীন্দ্রনাথের ঢাকা-ভ্রমণকাহিনী সবিস্তারে বর্ণনা করেন এবং তাঁর এই লেখাটি আমার মতে তথ্য বিচারে যথাযথ এবং সর্বাঙ্গসুন্দর বলা যেতে পারে। ১৯৭২ সালের আগস্ট মাসে "ঢাকায় রবীন্দ্রনাথ" নামে গোপালচন্দ্র রায়ের একটি বই প্রকাশিত হয়েছে। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, এই বই-এ তিনি এমন কতগুলি কথা লিখেছেন যা সম্পূর্ণ অসত্য; এবং তিনি নিজে পূর্বে যা লিখেছিলেন তার সঙ্গেও কোন সঙ্গতি নেই। ...গোপালবাবুর বই পড়ে তাঁকে বললাম, এমন অলীক বিবরণ কোথায় পেলেন? যে-কথা পূর্বে লিখেছেন তা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরণের আর একটি কাহিনীর অবতারণা কেন করলেন? তিনি বললেন যে সেই সময়কার আনন্দবাজার পত্রিকায় ঢাকা থেকে প্রেরিত যে রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছিল, তিনি তারই অনুসরণ করেছেন। ...ঢাকায় রবীন্দ্রনাথের আমার বাড়িতে থাকার প্রস্তাবে যে কবির কয়েকজন ভক্তের আপত্তি ছিল এবং এ নিয়ে যে কিছুদিন একটা গোলযোগ চলেছিল....গোপালবাবুকে সে কথা জানিয়ে বললাম যে এই বিক্ষুব্ধ ভক্তদের মধ্যে কেউ যে আনন্দবাজার পত্রিকায় এমন মিথ্যা সংবাদ পাঠিয়েছেন তাতে কোন সন্দেহ নেই। আপনার বই-এ এরূপ বিবরণ থাকলে লোকের মনে সন্দেহ জাগতে পারে 'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত কাহিনী সত্য, না এই বই-এর বিবরণ সত্য! সুতরাং এর সংশোধনী হিসাবে একটি বিবরণী মুদ্রিত করে এই বইএ সংযোজন করুন। নইলে আমাকে বাধ্য হয়ে সংবাদপত্রের মারফৎ জনসাধারণকে জানাতে হবে যে আপনার এই বিবরণ ভ্রান্ত। গোপালবাবু বিষয়টির গুরুত্ব উপলব্ধি করে বললেন, আপনি এখন কোথাও এ নিয়ে লিখবেন না। ভুল সংশোধন করে একটি পৃষ্ঠা ঐ বইএ আমি যোগ করে দেব। এরপর পাঁচ-ছয় বছর সময় পার হয়েছে। কিন্তু গোপালবাবু আজও [সেপ্টেম্বর ১৯৭৮] সে ভুল সংশোধন করেন নি।'[১১৪] তবে রমেশচন্দ্রের জীবনাবসানের [মৃত্যু 12 Feb 1980] আগেই 'দেশ'-এ [24 Sep 1979] প্রকাশিত এক পত্রে গোপালচন্দ্র বিবিধ প্রমাণ-সহ রমেশচন্দ্রের বক্তব্যের ভ্রান্তি প্রদর্শন করেন ও কিছুকাল আগে প্রকাশিত [1 Jan 2000] গ্রন্থটির দ্বিতীয় সংস্করণে আরও প্রমাণ সহযোগে উক্ত পত্রটি " 'তুরাগ' হাউসবোটে রবীন্দ্রনাথ" নামে পুনর্মুদ্রিত করেছেন, তাতে স্পষ্টই প্রমাণিত হয় রমেশচন্দ্র তাঁকে প্রকৃত তথ্য জানাননি ও পরে অন্যায্য অভিযোগ করেছেন।

রবীন্দ্রনাথের ঢাকা বা পূর্ববঙ্গ সফরের বিবরণ ছাপা নিয়ে আনন্দবাজার ও বসুমতী পত্রিকার মধ্যে যে একটি প্রতিযোগিতা দেখা দিয়েছিল, তার প্রমাণ আছে রথীন্দ্রনাথকে লেখা কালীমোহন ঘোষের 26 Jan-এর সুপারিশপত্র থেকে : 'বসুমতীর প্রচার পূর্ব্ববঙ্গে খুব বেশী। ...বসুমতী টাকা দিতে প্রস্তুত আছে যদি গুরুদেবের বক্তৃতা অন্য কোনো বাঙ্গলা কাগজে প্রকাশিত না হয়। তার substance অন্য কাগজে দেওয়া যাইবে। ...কারণ গুরুদেব পূর্ব্ববঙ্গে যে idea প্রচার করিবেন বসুমতীর সাহায্যে তাহা পূর্ব্ববঙ্গের প্রত্যেক গ্রামে পৌঁছিবে এবং আনন্দবাজারকেও বাধ্য হইয়া সেই সুরে লিখিতে হইবে।' আর-একটি চিঠিতে লেখেন : 'রমেশবাবু ও অপূর্ব্ব চন্দ উভয়েরই ইচ্ছা গুরুদেবের আসা উপলক্ষে নিজেদের importance বাড়ানো।' একই ধরনের কথা চারুচন্দ্র

বন্দ্যোপাধ্যায় রথীন্দ্রনাথকে লিখে পাঠিয়েছেন : ‘কাল সন্ধ্যার সময় রবীন্দ্র-অভ্যর্থনা সমিতির এক অধিবেশন হয়ে গেল। আমি উপস্থিত ছিলাম। কবিগুরুকে রমেশবাবুর বাসায় পাবলিক গেস্ট রূপেই রাখা হবে, এই ধারণাই সমস্ত পাবলিক-এর ছিল দেখলাম। রমেশবাবুর বাসায় কবীন্দ্র থাকলে কারো আপত্তি এখনো নেই বোঝা গেল। কেবল পাবলিক নামের দোহাই দিয়ে বিশ্বভারতী সম্মিলনীর সম্পাদক অপূর্ব[কুমার চন্দ] ও মনোরঞ্জন [চৌধুরী] আপত্তি করলেন। আপনি মনোরঞ্জনের কথায় গুরুদেবের অন্যত্র বাসের ব্যবস্থা অনুমোদন করে ইউনিভারসিটির ছাত্রদের নিতান্ত নিরুৎসাহ ও হতোদ্যম করে দিয়েছেন।’[১১৫] ব্রহ্মচর্যাশ্রমের প্রাক্তন ছাত্র মনোরঞ্জন চৌধুরী ঢাকায় বিশ্বভারতী সম্মিলনীর প্রতিষ্ঠাতা ও অপূর্বকুমার চন্দ ছিলেন তৎকালীন সম্পাদক, সেই অধিকারে তাঁরা রবীন্দ্রনাথের উপর একচেটিয়া স্বত্ব দাবি করে এইসব চক্রান্তের অংশীদার হয়ে নানাবিধ অশান্তি সৃষ্টি করছিলেন।

তবে কোনো সন্দেহ নেই, রমেশচন্দ্রের বিরোধী পক্ষ তাঁদের কৌশলে জয়ী হয়েছিলেন— রবীন্দ্রনাথ অন্তত 10 Feb [বুধ ২৭ মাঘ] দুপুর পর্যন্ত ঢাকার জনসাধারণের অতিথি হিসাবে বুড়িগঙ্গা নদীর উপরে নবাবের ‘তুরাগ’ নামক বজরায় বাস করার দাবি মেনে নিতে বাধ্য হয়েছিলেন।

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে অন্যান্যদের মধ্যে ইতালিয়ান অধ্যাপক ফর্মিকি ও তুচ্চি ঢাকায় যাবেন ও আমন্ত্রিত হ’লে বক্তৃতাও দেবেন বলে ঠিক হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভাষণের জন্য কোনো টাকা নেবেন না, তিনি শুধু বিশ্বভারতীর জন্য দান বা সাহায্য গ্রহণ করেন এই প্রশ্ন উঠলে রমেশচন্দ্র নিজের থেকে বিশ্বভারতীকে ৫০০ টাকা দান করবেন বলে প্রতিশ্রুতি দেন এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বরাদ্দ পারিশ্রমিক ফর্মিকি ও তুচ্চিকে দেবার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এঁদের আতিথ্য দেবার দায়িত্ব নেন ভাইস-চ্যান্সেলার মিঃ ল্যাংলি।

কিন্তু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আমন্ত্রণে রবীন্দ্রনাথ সেখানে আসবেন শুনে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান তাঁকে অভিনন্দন জানাবার আয়োজন শুরু করেন ও তাঁদের পক্ষ থেকে কয়েকজন প্রতিনিধি শান্তিনিকেতনে এসে তাঁকে নিমন্ত্রণ জানিয়ে স্বতন্ত্র আতিথ্য দেবার প্রস্তাব দেন। এই প্রস্তাবের মধ্যেও হয়তো পূর্বোক্ত চক্রান্তকারীরা ছিলেন, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করে এঁদের প্রস্তাবে সম্মতি জ্ঞাপন করেন। এই পরিবর্তিত কর্মসূচির কথা জানিয়ে ১৬ মাঘ [30 Jan] তিনি রমেশচন্দ্রকে লেখেন : ‘ঢাকার জনসাধারণের পক্ষ থেকে আজ আমাকে নিমন্ত্রণ করবার জন্যে দূত এসেছিলেন। তাঁদের বিশেষ অনুরোধে নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বেই যাত্রা করতে প্রস্তুত হয়েছি। ৬ই তারিখে রাত্রে রওনা হয়ে গোয়ালন্দ থেকে তাঁদেরই জলযানে ভেসে পড়ব। ১০ই তারিখ পর্যন্ত তাঁদের আতিথ্য ভোগ করে ঐ কর্তব্য অন্তে তোমার আশ্রয়ে উঠে বিশ্ববিদ্যালয়ের নিমন্ত্রণ পালন করব। নইলে আমাকে দীর্ঘকাল ঢাকায় থাকতে হয়। আমার সময় নেই। বিশ্ববিদ্যালয়ের বহিঃস্থিত ঢাকার লোকের নিমন্ত্রণ কোনো মতেই উপেক্ষা করা উচিত বোধ করিনে। তাই দুই নিমন্ত্রণ ক্ষেত্রে আমার সময়কে বিভক্ত করে দিলুম। যে কয়দিন তোমাদের দেব স্থির করেছিলুম, সে কয়দিন সম্পূর্ণই রইল।’[১১৬] এইভাবে রবীন্দ্রনাথ দুই কূল রক্ষার প্রয়াস নিয়েছিলেন, কিন্তু অকুস্থলে উপস্থিত রমেশচন্দ্র চক্রান্তের কথা সবই জানতেন, তিনি চিঠিটি পেয়ে ক্ষোভে সম্ভবত 1 Feb একটি টেলিগ্রাম পাঠান : 'Your decision to remain public guest till tenth a painful surprise to me Posted letter yesterday describing how that proposal emanated not

from public but from interested individuals for humiliating me My earnest prayer that you select one residence for the whole period of stay If you prefer remain in town as public guest I release you from obligations becoming my guest. Please wire decision'. এই টেলিগ্রাম ও চিঠি [রক্ষিত হয়নি] পেয়ে রবীন্দ্রনাথ তাঁকে শান্ত করার অভিপ্রায়ে জানান : 'Not the least change in programme of stay in your house only extra three days promised to public letter follows'. চিঠিতে লেখেন :

তোমার ওখানে যে কয়দিন থাকা স্থির করেছিলুম তার থেকে একদিনো বাদ দিই নি। যখন সাধারণের তরফ থেকে আতিথ্য গ্রহণের জন্য সনির্বন্ধ অনুরোধ এল, তখন অসুবিধা সত্ত্বেও আরো তিনদিন বাড়িয়ে দিয়ে নৌকায় থাকার প্রস্তাব গ্রহণ করেছিলুম। এতে তোমার মনঃক্ষোভের কোনো কারণ ঘটতে পারে, এ আমি কল্পনা করিনি। ১০ই তারিখ থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের নিমন্ত্রণের মেয়াদ আরম্ভ। আমি ত তোমাদের পূর্বেই সে কথা জানিয়েছি। তার আগে যদি অন্য নিমন্ত্রণ উপলক্ষে অন্যত্র যাই, তাতে কি তোমাদের উপেক্ষা করা হ'ল মনে করতে পার? এই দুই নিমন্ত্রণও কি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র নয়? আমার মনে লেশমাত্র সংশয় জন্মেনি বলেই আমি ঢাকার জনসাধারণের তরফ থেকে নিমন্ত্রণ স্বীকার করতে অসম্মতি দিতে পারিনি। ···তোমার টেলিগ্রামের ভাবে বোধ হচ্ছে, তোমার মতে ঢাকার সর্বসাধারণের কাছ থেকে আমার কাছে বিশেষ নিমন্ত্রণ একেবারেই আসেনি। দূতরূপে যাঁরা আমার কাছে এসেছিলেন, তাঁদের বিশ্বাস করেই নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেছি। যদি প্রতারিত হয়ে থাকি, তবে ঢাকায় পৌঁছিয়ে তার প্রতিকারের চেষ্টা করব।[১১৭]

রবীন্দ্রনাথ শুধু এই চিঠি পাঠিয়ে ক্ষান্ত হলেন না, নিরপেক্ষ তদন্তের জন্য নেপালচন্দ্র রায়কে ঢাকায় পাঠালেন; 2 Feb রথীন্দ্রনাথ টেলিগ্রাম করে রমেশচন্দ্রকে জানালেন : 'Father sending Nepal Chandra Roy to settle all details'.

তদন্তের ফলাফল সম্বন্ধে গোপালচন্দ্র 'দেশ'-এ লিখেছিলেন : 'নেপালবাবু ঢাকায় গিয়ে সব দেখে শুনে ফিরে এসে রবীন্দ্রনাথকে জানালেন— ঢাকায় গিয়ে আগাগোড়াই রমেশবাবুর অতিথি হিসাবে আপনার থাকাই ভাল। তবে ইচ্ছা করলে আপনি দু-একদিন নৌকায় থাকতে পারেন। কিন্তু তখনও আপনাকে রমেশবাবুর অতিথি হিসাবেই থাকতে হবে এবং ঐ নৌকাতেও তিনিই আপনার দেখাশোনা করবেন। রবীন্দ্রনাথ নেপালবাবুর কথাই মেনে নিলেন।' গোপালচন্দ্র তাঁর তথ্যসূত্র উল্লেখ করেননি, রবীন্দ্রভবনে এই বিষয়ে নেপালচন্দ্রের কোনো চিঠিপত্র নেই— কিন্তু গ্রন্থে গোপালবাবু এই বক্তব্য ঈষৎ পরিবর্তিত করে লিখেছেন, 'তবে ইচ্ছা করলে আপনি প্রথমে দু'তিন দিন নৌকায় থাকতে পারেন'— এই পরিবর্তনের যুক্তিও তিনি দেননি এবং রমেশচন্দ্র একে তথ্যবিকৃতি বলে মনে করেছেন।[১১৮] তবে রমেশচন্দ্রের বিবৃতিও যে নির্ভরযোগ্য নয়, তার প্রমাণ ২৭ মাঘ [বুধ 10 Feb] বীরেন্দ্রকুমার দত্তগুপ্তকে লেখা রবীন্দ্রনাথের একটি চিঠি, তিনি লেখেন : 'ঢাকায় আসিয়া মুহূর্তকাল অবসর পাওয়া কঠিন হইয়াছে। আজ রমনায় রমেশবাবুর বাসায় আশ্রয় লইতে চলিয়াছি। সেখানে তাঁহারা আমাকে অবকাশ দিবেন কিনা জানি না। আমার বিশ্বাস মধ্যাহ্ন আহারের অনতিকাল পরে অর্থাৎ একটা হইতে দুইটা পর্য্যন্ত জনতার অভাব ঘটিতে পারে। আগামী ১৩ই তারিখের মধ্যে ঐ রকম সময়ে যদি আসিতে পারেন তবে বিরলে আলাপ হইতে পারে।[১১৯] এই আলাপের সুযোগ ঘটেছিল কিনা আমাদের জানা নেই, কিন্তু অন্তত 10 Feb সকালে এই চিঠি লেখা পর্যন্ত তিনি-যে রমেশচন্দ্রের বাসায় ছিলেন না তার প্রমাণ পত্রটিতে আছে।

রবীন্দ্রনাথ সদলবলে 6 Feb [শনি ২৩ মাঘ] রাত্রে ঢাকা মেলে কলকাতা থেকে গোয়ালন্দের উদ্দেশে রওনা হন— দলে ছিলেন রথীন্দ্রনাথ, প্রতিমা দেবী, নন্দিনী, দিনেন্দ্রনাথ, মরিস, চিনা অধ্যাপক লিম নো

ছিয়াঙ [Dr. Lim Ngo Chiang], ইতালিয়ান অধ্যাপক ফর্মিকি ও তুচ্চি। কালীমোহন ঘোষ ও নেপালচন্দ্র রায় সম্ভবত আগে থেকেই ঢাকায় ছিলেন। 7 Feb ভোরে সকলে গোয়ালন্দে পৌঁছে স্পেশাল স্টিমারে বেলা প্রায় এগারোটার সময়ে নারায়ণগঞ্জে পৌঁছন। ট্রেনে নারায়ণগঞ্জ থেকে ঢাকা যাওয়ার ব্যবস্থা থাকলেও মোটরে করে শোভাযাত্রা-সহকারে রবীন্দ্রনাথকে ঢাকায় নিয়ে যাওয়ার আয়োজন করা হয়েছিল। আনন্দবাজার পত্রিকা [২৬ মাঘ] লেখে : 'নারায়ণগঞ্জ ষ্টীমার ষ্টেশন সেদিন জনসমুদ্রে পরিণত হইয়াছিল। ...রবীন্দ্রনাথের ষ্টীমার ঘাটে পৌঁছিলে চতুর্দিক হইতে ঘন ঘন আনন্দধ্বনি উত্থিত হয়। কয়েকজন বিশিষ্ট নেতা অগ্রসর হইয়া তাঁহাকে পুষ্পমাল্যে বিভূষিত করেন এবং ষ্টীমার হইতে নামাইয়া আনেন। ষ্টেশন ঘাটে সুসজ্জিত মোটর অপেক্ষা করিতেছিল। অতঃপর রবীন্দ্রনাথ দলবলসহ সেই মোটরে চড়িয়া ঢাকা অভিমুখে যাত্রা করেন। ঢাকা শহরের পূর্ব্ব সীমান্তে একদল স্কাউট, বহুসংখ্যক স্বেচ্ছাসেবক ও শহরের বিশিষ্ট ভদ্রলোক উপস্থিত ছিলেন। রবীন্দ্রনাথের মোটর দৃষ্টিপথে প্রবিষ্ট হইবামাত্র ঘন ঘন জয়ধ্বনি উত্থিত হয়। রবীন্দ্রনাথ সেই অপূর্ব্ব অভ্যর্থনা লাভ করিয়া ঢাকা শহরে প্রবেশ করেন। অতঃপর এক বিরাট শোভাযাত্রা করিয়া বুড়ীগঙ্গা নদীর উপর ভাসমান 'তড়াগ' নামক বজরাতে তাঁহাকে লইয়া যাওয়া হয়।'[১২০]

এই প্রসঙ্গে রমেশচন্দ্র মজুমদার লিখেছেন : 'বিপুল সংবর্ধনাসহকারে নারায়ণগঞ্জ স্টিমার স্টেশন থেকে গাড়ি করে রবীন্দ্রনাথকে ঢাকায় আমার বাড়িতে নিয়ে আসা হল। সেখানকার বড় বড় জমিদার, বিশেষতঃ ভাওয়ালের রাজকুমার এবং ঢাকার নবাব, আমায় বলে পাঠালেন যে রবীন্দ্রনাথের জন্য কোন গাড়ি দরকার হলে আমি যেন তাঁদের জানাতে দ্বিধা না করি। রবীন্দ্রনাথের আগমন উপলক্ষ্যে ঢাকায় বিপুল উদ্দীপনা; রাস্তায় বহু লোক তাঁকে সংবর্ধনা জানালেন। আমি তখন জগন্নাথ হলের প্রোভোস্ট এবং প্রোভোস্টের জন্য নির্দিষ্ট বাড়িতে থাকি। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী, শহরের কয়েকজন বিশিষ্ট মহিলা এবং অধ্যাপকদের স্ত্রী— এঁরা সবাই আমার বাড়িতে এসে কবিগুরুর অভ্যর্থনা এবং সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা করলেন। তাঁর আসার দিন আমার গৃহদ্বারে, সিঁড়িতে, উপরের বারান্দায় এবং ঘরে নানারকম আলপনা দেওয়া হয়, দরজার সামনে মঙ্গলকলস এবং আম্রপল্লব। কয়েকজন ছাত্র এবং শিক্ষককে নিয়ে আমি নারায়ণগঞ্জে গিয়েছিলাম কৰিগুরুকে অভ্যর্থনা করার জন্য। কবি এসে পৌঁছনোমাত্রই তাঁর উপর ফুলবর্ষণ শুরু হল। মেয়েরা শঙ্খধ্বনিতে তাঁকে স্বাগত জানালেন। মঙ্গলকলসের মাঝে পথ দিয়ে আমরা বাড়িতে প্রবেশ করলাম। শহরের বহু ভদ্রলোক এবং মহিলা তখন সেখানে উপস্থিত ছিলেন।'[১২১] বীরেন্দ্রনাথ দত্তগুপ্তকে লেখা চিঠি থেকে জানা যায়, এই বর্ণনা অন্তত 7 Feb রবীন্দ্রনাথের ঢাকায় আগমন-প্রসঙ্গে প্রযোজ্য নয়।

ঢাকায় রবীন্দ্রনাথের কার্যসূচি 'Dr. Rabindranath Tagore's Programme at Dacca' নামে ইংরেজিতে মুদ্রিত হয়েছিল; অবশ্য নানাকারণে তার কিছু-কিছু পরিবর্তনও হয়েছে। এই তালিকানুযায়ী, 7 Feb [রবি ২৪ মাঘ] ঢাকায় আসার পরে বিকেল চারটেয় নর্থব্রুক হলে ম্যুনিসিপ্যালিটি ও পিপ্‌ল্‌স অ্যাসোসিয়েশন কর্তৃক অভিনন্দন এবং বিকেল পাঁচটায় করোনেশন পার্কে জনসাধারণের পক্ষ থেকে কবি-সংবর্ধনার আয়োজন ছিল। নর্থব্রুক হলের অনুষ্ঠান সম্পর্কে আনন্দবাজার পত্রিকা [২৮ মাঘ] লেখে : 'এখানে অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকার সময় কবিবরকে অভিনন্দন প্রদানের ব্যবস্থা হইয়াছিল। বেলা ২টা হইতেই জনসমাগম আরম্ভ হয় এবং ৪টা বাজিবার পূর্ব্বেই উকীল, ব্যারিস্টার, ডেপুটী, মুন্সেফ, জজ, অধ্যাপক, মিউনিসিপ্যাল কমিশনার, জমিদার ও শিক্ষিত জনসঙঘদ্বারা নর্থব্রুক হল পূর্ণ হইয়া যায়। তিলমাত্র স্থানও সেখানে ছিল না। কবিবর ঠিক ৪-৩৫

মিনিটের সময় সভাস্থলে আগমন করেন। বাহিরে পথে, নর্থব্রুক হলের হাতার মধ্যে বহুলোক সাগ্রহে কবিবরের প্রতীক্ষা করিতেছিলেন।'[১২২]

ম্যুনিসিপ্যালিটির ভাইস-চেয়ারম্যান রায় বাহাদুর কেশবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় অভিনন্দনপত্র পাঠ করেন। এর পরে পিপ্‌ল্‌স্‌ অ্যাসোসিয়েশন-প্রদত্ত অভিনন্দনপত্র পঠিত হয়।

এর পরে বুড়িগঙ্গার তীরে করোনেশন পার্কের জনসভায় রবীন্দ্রনাথ যোগদান করেন। পার্কের পশ্চিম দিকে একটি উচ্চ মঞ্চ নির্মাণ করা হয়েছিল। তাঁর আসন গ্রহণের পরে উপেন্দ্রচন্দ্র গুহ ঢাকার জনসাধারণের পক্ষ থেকে, ব্যারিস্টার আর. কে. দাস রেটপেয়ার্স অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষে এবং হিন্দু-মোসলেম সেবক সমিতির পক্ষ থেকে আর. দাস অভিনন্দনপত্র পাঠ করেন। নলিনীকান্ত ভট্টশালী লিখেছেন : 'কবি উত্তর দিতে উঠিবামাত্র সেই বিশাল জনসমুদ্র জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল। মুখের উপর সান্ধ্য সূর্যের রক্তিম রশ্মি আসিয়া পড়িয়া কাব্যলক্ষ্মীর এই বরপুত্রকে যেন অপার্থিব গন্ধর্ব লোকের অপরূপতায় মণ্ডিত করিয়া তুলিল। তিনি বলিতে আরম্ভ করিবামাত্র সেই বিশাল জনসঙঘ একেবারে নিস্তব্ধ হইয়া গেল।'

রবীন্দ্রনাথ এই দুটি অভিনন্দনের উত্তরে যা বলেন, সংবাদপত্রগুলি তার যথাযথ অনুলিখনে অসমর্থ হওয়ায় রবীন্দ্রনাথ নিজেই সেগুলি লিখে দেন ও রচনা-দুটি 'ঢাকা ম্যুনিসিপ্যালিটির অভিনন্দনের উত্তরে' শিরোনামে চৈত্র-সংখ্যা প্রবাসী-তে [পৃ ৮৮০-৮৩] মুদ্রিত হয়; টীকায় সম্পাদক লেখেন : 'বিগত ৭ই ফেব্রুয়ারি ঢাকা নগরীতে কবিবর যে বক্তৃতা দেন, তিনি স্বয়ং তাহা লিখিয়া দিয়াছেন। দৈনিক কাগজে তাঁহার বক্তৃতার যেসব প্রতিলিপি বাহির হইয়াছিল তাহার অনেক স্থলের সহিত ইহার অমিল দৃষ্ট হইবে' [দ্র ঢাকায় রবীন্দ্রনাথ। ৯৭-১০২]।

তাঁর গঠনমূলক কাজকর্মের উল্লেখ থাকার জন্য ম্যুনিসিপ্যালিটির অভিনন্দনটি রবীন্দ্রনাথকে প্রীত করেছিল — এই কারণেই অসুস্থতা সত্ত্বেও তিনি দীর্ঘ বক্তৃতা করেন। পরিশেষে বলেন :

> ত্রিশ বৎসর পূর্বে বারম্বার বলেছিলাম, বধিরের কাছে, অসাড়ের কাছে, উদাসীনের কাছে যে, নিজের ঘরে ফিরতে হবে সেবার দ্বারা কর্মের দ্বারা। ক্ষমতার অভাবে কৃতকার্য না হতে পেরে থাকি, কিন্তু আমার সাধনার ত্রুটি হয়নি,— আমার কণ্ঠ ক্ষীণ বলে আমার বাণী যদি সকলের হৃদয়ে পৌঁছে না থাকে তবে আমার সংকল্পকে দোষ দেবেন না, দোষ দেবেন আমার অপটুতাকে। কিন্তু একদিন আমি যে বলেছিলাম, সে-কথা আপনারা স্মরণ করেছেন, তাতেই আমি ধন্য। আজ আমি অন্য কথা বলতে বসেছি— প্রান্তরের প্রান্তে, নিভৃত আশ্রমের মাঝখানে দাঁড়িয়ে, মুখের কথায় নয়, কর্মের ভিতর দিয়ে। কিন্তু সে আমার নিজের কথা নয়, তার মধ্যে আমাদের ঋষিদের কথার প্রতিধ্বনি। সেই জন্যে কেউ-কেউ কখনো-কখনো যখন আমাকে ঋষি উপাধি দেন তখন আমার সঙ্কোচের সীমা থাকে না। আমি ঋষিদের বাণী চয়ন করেছি কিন্তু আমি ত মন্ত্রদ্রষ্টা নই। যে উচ্চপদে যার অধিকার নেই তাকে সেই পদগৌরব দেওয়ার মতো অন্যায় আর হতে পারে না। আমি যাঁদের অন্তরের সঙ্গে সম্মান করি তাঁদের সম্মানের অংশ নিজে হরণ করাকে অধর্ম বলেই জানি। কবি বলে আমাকে যে সম্মান করেন তা গ্রহণ করতে আমি কুণ্ঠিত হইনে। ভাষার সেবা করেছি, কর্তব্যবোধে দেশের লোকের রুচিবিরুদ্ধ কথাও বলেছি, ভারতের শ্রেষ্ঠদান দেশে বিদেশে বহন করেছি। এই পথিকবৃত্তিতে দেহ ক্লান্ত ও দুর্বল, তবু আমার পক্ষে যে ভার অসাধ্য তাও নিতে বিমুখ হইনি। ...যদি দয়া করে আমাকে মনে রাখেন, তবে আমার যেটুকু সত্য পরিচয় তাই মনে রাখবেন। অত্যুক্তির কোনো প্রয়োজন নেই।

রবীন্দ্রনাথের করোনেশন পার্কের অভিভাষণটি সংক্ষিপ্ত। 1898-এর বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মিলনীর অধিবেশন উপলক্ষে তিনি প্রথমবার ঢাকায় এসেছিলেন তার স্মৃতিচারণ করে তিনি বলেন, তখনকার দিনে রাষ্ট্রীয় সভাগুলিতে ইংরেজি ভাষাতে বক্তৃতা হত বলে জনসাধারণের মধ্যে রাষ্ট্রিক শিক্ষা বিস্তারের উদ্দেশ্যটি ব্যর্থ হচ্ছিল, 'এই সংকীর্ণ বেষ্টনীর মধ্যে দেশসেবার যে সাধনা বিদেশী ভাষার শৃঙ্খলে শৃঙ্খলিত হয়ে ছিল তাকে

তার আপন ভাষার মধ্যে মুক্তি দেবার জন্যেই এখানে এসেছিলাম। আমার বিশ্বাস আমার সেদিনকার সে চেষ্টা সফল হয়েছিল; তার পর থেকে প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সম্মিলনীতে ইংরেজি ভাষার প্রভুত্ব দূর হয়ে গেছে।'

এইদিন রবীন্দ্রনাথকে দেওয়া অন্তত সাতটি অভিনন্দনপত্র রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত আছে। ঢাকা রেটপেয়ার্স অ্যাসেসিয়েশনের পক্ষে একটি, ম্যুনিসিপ্যাল কমিশনারদের পক্ষ থেকে একটি, ঢাকার জনসাধারণের পক্ষ থেকে অন্তত চারটি এবং ঢাকার হিন্দু-মুসলিম সেবাশ্রমের পক্ষ থেকে একটি অভিনন্দনপত্র সেখানে রয়েছে।

8 Feb [সোম ২৫ মাঘ] রবীন্দ্রনাথের ঘোষিত কর্মসূচি ছিল— সকালে অতিথিদের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎকার, বিকেল চারটে থেকে ছ'টা 'Moslem gentlemen Tea Party' ও সাড়ে ছ'টায় কেবল মহিলাদের জন্য দীপালি সঙেঘর অনুষ্ঠানে যোগদান।

সকালে ঢাকার অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তি 'তুরাগ' হাউসবোটে গিয়ে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করেন। রবীন্দ্র-কথাসাহিত্যের বিশিষ্ট মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষক সুখরঞ্জন রায়ও এই দর্শনার্থীদের মধ্যে ছিলেন, রবীন্দ্রনাথ তাঁর রচনার প্রশংসা করেন।

বিকেলে ঢাকার নবাবের বাড়িতে বিশিষ্ট মুসলিম ভদ্রমহোদয়গণের প্রদত্ত টি-পার্টিতে রবীন্দ্রনাথ যোগ দেন।

এর পরে পূর্ববাংলা ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরে লীলা নাগ-প্রতিষ্ঠিত দীপালি সঙ্ঘের অনুষ্ঠানে রবীন্দ্রনাথ উপস্থিত হন। 'শহরের শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত ভদ্রমহিলাগণ প্রায় সকলেই ঐ সভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। প্রায় দুই হাজার মহিলা সমবেত হইয়াছিলেন।' সম্পাদিকা স্বরচিত ক্ষুদ্র অভিনন্দনপত্রটি [রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত] পাঠ করার পর রবীন্দ্রনাথ দীপালি বিদ্যালয়ের শিক্ষয়িত্রী ও ছাত্রীদের দ্বারা প্রস্তুত বিবিধ কারুকার্য পরিদর্শনান্তে যে-ভাষণ দেন, সেটি চৈত্র-সংখ্যা সবুজপত্র-তে [পৃ ৫৭২-৭৮] 'দীপালি সংঘ। / (ঢাকা, নারীসভা।)' নামে প্রকাশিত হয়। রবীন্দ্রনাথ বলেন :

> আজ আমি মেয়েদের কাছ থেকে যে সমাদর পেয়েছি, তার মধ্যে তাঁদের যে আনন্দ প্রকাশ পেয়েছে, সে আনন্দের কারণ এই যে, আমি মানুষের সুখদুঃখের মধ্যে কিছু সুর যোগ করে দিয়েছি— যেটা বেদনাকে গানে বাজিয়ে তোলে, পৃথিবীর শ্যামলতার উপর হৃদয়ের লাবণ্য মাখিয়ে দেয়, সংসারকে তার প্রাত্যহিক তুচ্ছতার গহ্বর থেকে মুক্তি দিয়ে তাকে চিরকালের আলোতে বের করে আনে। আজ মেয়েদের আনন্দ ধ্বনির মধ্যে যা আমাকে পুরস্কৃত করেছে। সে হচ্ছে এই যে, এর মধ্যে মজুরীশোধের কথা নেই।
>
> ···আমাদের মেয়েদের মধ্যে পুঁথিগত শিক্ষার বিস্তার যথেষ্ট হয়নি বটে, কিন্তু তাদের চিত্তের মধ্যে সহজবোধের ঐশ্বর্য আছে। সেই কারণে আমার এই অহংকারটুকু সত্য হতে পেরেছে যে, আমার কাব্য গ্রহণ করতে আমাদের দেশের মেয়েদের তেমন বাধা ঘটে নি। কখনো কখনো এমনো দেখেছি, আমার রচনা সম্বন্ধে বাইরের ঘরে যেখানে বিরুদ্ধতা, ভিতরের ঘরে সেখানে বেদনার সঙ্গে মেয়েরা তাকে আশ্রয় দিয়েছে।···
>
> আজ যেমন বৃহৎভাবে ভারতের গৃহকর্মের প্রয়োজনে আমাদের মন জেগেছে, তার অন্নবস্ত্রের সচ্ছলতার কথা চিন্তা করছি, এই জাগরণের দিনে আজ তেমনি বড় করেই ভারতের ধর্মসাধনের কথাও যেন ভাবতে পারি। এই দুই চিন্তার পথেই মেয়েদের সেবাশক্তি ও শুভবুদ্ধির আহ্বান আছে। এই উভয় সাধনাতেই তোমাদের প্রবর্তনা, তোমাদের মঙ্গল ইচ্ছা দেশকে শক্তি দেবে। আজ তোমরা তোমাদের কবিকে অভিনন্দন করছ, তার মধ্যে যদি তোমাদের এই কথাটি থাকে যে, 'যাও বাহিরে, বিশ্বকে আহ্বান কর'— তাহলে আমি ধন্য হব।

আনন্দবাজার পত্রিকা-র প্রতিবেদক মেয়েদের এই সভায় প্রবেশ করতে পারেননি বলে ক্ষোভ ব্যক্ত করেছেন : 'আমরা মহিলাসঙেঘ উপস্থিত হইতে পারি নাই। বিশেষ বিশেষ অনুগৃহীত ব্যক্তি মহিলাসভায় উপস্থিত হইয়া সভার রিপোর্ট লইতে পারিয়াছিলেন, অপরের বেলা সেরূপ ব্যবস্থা হয় নাই, কে এইরূপ ব্যবস্থা করিল? রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে একজন বাঙ্গলা 'সর্টহ্যাণ্ড' লেখকও আসিয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথের বক্তৃতায়

সাধারণের সমান অধিকার থাকা উচিত।'[১২১] এই পক্ষপাতিত্ব পূর্বোল্লিখিত বসুমতী-আনন্দবাজার চক্রান্তের ফলও হতে পারে!

মুদ্রিত কার্যসূচিতে 9 Feb [মঙ্গল ২৬ মাঘ] রবীন্দ্রনাথের জন্য নির্ধারিত ছিল সকালে মহিলাদের সঙ্গে আলাপচারিতা, বিকেল চারটে থেকে ছ'টা বিশ্বভারতী [সম্মিলনীর] সভা ও সাড়ে ছ'টায় জগন্নাথ ইন্টারমিডিয়েট কলেজে জনসভা।

এই কর্মসূচি অনুসারে সকালে বহু মহিলা হাউসবোটে এসে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ করেন। বিকেলে নর্থব্রুক হলে অনুষ্ঠিত ঢাকা বিশ্বভারতী সম্মিলনীর সভায় রবীন্দ্রনাথ সভাপতিত্ব করেন। 'আজ সেখানে এত বেশী জনতা হইয়াছিল যে, হল গৃহে প্রবেশ করিবার সাধ্য ছিল না।' সভার কাজ যথাসময়ে আরম্ভ হলে অধ্যাপক তুচ্চি, মিঃ লিম ও মিঃ মরিস ভাষণ দেন। আনন্দবাজার পত্রিকা [৩ ফাল্গুন] লিখেছে :

> প্রত্যেক বক্তাই আন্তরিক প্রীতি ও শ্রদ্ধার সহিত বিশ্বভারতীর কার্যাবলী পর্যালোচনা করিয়া যে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন, তাহা হৃদয়গ্রাহী ভাষায় প্রকাশ করেন। ভারতের নিজস্ব বাণী ত্যাগ ও আধ্যাত্মিকতার শ্রেষ্ঠ আদর্শ জগতে প্রচার করা একান্ত আবশ্যক— একথা প্রত্যেক বক্তাই শ্রোতাদিগকে বিশেষভাবে স্মরণ রাখিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। বিশ্বভারতীর প্রতি জনসাধারণের মনোযোগী হওয়া কর্তব্য এবং তাহার কার্যের সহায়ক হওয়া উচিত— এ কথা সকলেই শ্রোতাদিগকে বিশেষভাবে বলিয়াছিলেন।
>
> অতঃপর রবীন্দ্রনাথ বলিলেন— আমার নাম বিশ্বভারতীর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আছে বলেই আমি বলছি, আপনারা বিশ্বভারতীকে ভালবাসুন, তাহার কার্যের সহায়ক হউন তা নয়। আমি বলতে চাই, বিশ্বভারতীর কাজ দিয়ে আপনারা তার বিচার করুন। তাহলেই আমি বলব যে, আপনারা বিশ্বভারতীর কার্য উপলব্ধি করেছেন।
>
> কবির সংক্ষিপ্ত বক্তৃতাটুকু খুবই মর্মস্পর্শী হইয়াছিল।[১২২]

এর পরে রবীন্দ্রনাথ জগন্নাথ ইন্টারমিডিয়েট কলেজের বিস্তৃত প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠেয় সভায় উপস্থিত হন। 'কলেজের বিরাট মাঠ প্রায় দুই ঘণ্টা পূর্ব হইতেই ছাত্র, শিক্ষক, অধ্যাপক, সরকারী কর্মচারী এবং শহরের গণ্যমান্য ব্যক্তিসমূহের দ্বারা পূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। বহু সংখ্যক মহিলাও সভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন।' উঁচু সোপানের উপর পুরু গালিচা বিছিয়ে তাকিয়া ইত্যাদি দিয়ে দেশিপ্রথায় রবীন্দ্রনাথের আসন প্রস্তুত হয়েছিল। বন্দনাগীতি, কবিতাদি পাঠের পর রবীন্দ্রনাথ একটি সুদীর্ঘ বক্তৃতা প্রদান করেন। আনন্দবাজার পত্রিকায় মন্তব্য করা হয় : 'অদ্যকার বক্তৃতা প্রত্যেকের হৃদয় স্পর্শ করিয়াছিল। ভাগীরথীর কলগীতির ন্যায় রবীন্দ্রনাথের ভাব ও ভাষা বাক্যলহরীর ভিতর দিয়া আপনাকে জীবন্ত করিয়া তুলিয়াছিল। তাঁহার বক্তৃতায় তিনটি অতি দুরূহ সমস্যার সুমীমাংসার কথা ছিল— (১) হিন্দু-মুসলমান সমস্যা (2) অস্পৃশ্য জাতির প্রতি আমাদের কর্তব্য (৩) পল্লী-সংস্কার। ঢাকায় এ পর্যন্ত তিনি এমন সুন্দর মর্মস্পর্শী বক্তৃতা একটিও প্রদান করেন নাই। পাঁচ হাজার শ্রোতা নীরবে তাঁহার বাক্যসুধা পান করিয়াছিল। …রবীন্দ্রনাথ প্রায় দেড় ঘণ্টাকাল বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন।'[১২৩] রবীন্দ্রনাথের ভাষণের অনুলেখন ৩ ফাল্গুনের আনন্দবাজার পত্রিকা-য় প্রকাশিত হয় দ্র ঢাকায় রবীন্দ্রনাথ। ১০৭-১৩; রবীন্দ্র-প্রসঙ্গ ১। ৪৫৮-৬২। রবীন্দ্রনাথ এই ভাষণে বলেন, আত্মীয়তার সূত্রেই মানুষ মানুষের সঙ্গে মিলিত হতে পারে, এই দেশ নদীমাতৃক বলে এই আত্মীয়তার সুযোগ অপেক্ষাকৃত অধিক। অধিকাংশ বড়ো সভ্যতা নদীকে অবলম্বন করে গড়ে উঠেছিল। যোগাযোগের আর-একটি সূত্র ভাষা — জলপথে মিলনের সুযোগ ছিল বলেই বাংলা এক ভাষাভাষী হতে পেরেছিল। আমাদের দেশ গ্রামপ্রধান, সেখানে মানুষের আত্মীয়তার ক্ষেত্র প্রশস্ত ছিল। কিন্তু এখন দিন পরিবর্তিত হয়েছে, হিন্দু-মুসলমানের বিরোধ এখনকার জ্বলন্ত সমস্যা। রবীন্দ্রনাথ এর কারণ অনুমান ক'রে সমাধানের পথনির্দেশও করেছেন : 'হিন্দু-

মুসলমানের আত্মীয়তায় এত বিরোধ কেন? শস্যের সমান ভাগ নিয়ে দর কষাকষি— অন্নের ভাগ কমে গেছে — তাই মারামারি। যেদিন আবার গ্রামের প্রাণ জাগবে, সেদিন হিন্দু-মুসলমান উভয়ে সমান ভোগ করবে, তখন দরদ হবে, আনন্দ নিকেতনে তখন উভয়ের অমৃত উভয়ের পাতে পড়বে। যেদিন প্রাচুর্য্য হবে সেদিন বিরোধ ঘুচে যাবে।' সুখেদুঃখে একাত্ম হলে মিলন হতে পারে, কিন্তু ঘুষ দিয়ে কখনই নয়। বঙ্গভঙ্গের দিনে প্রয়োজনের তাগিদে হিন্দু মুসলমানকে 'ভাই' বলে ডেকে ঘুষ দেবারই চেষ্টা করেছিল— তাই মিলন হয়নি। কিন্তু শ্রীনিকেতনে তাঁর কর্ম্মক্ষেত্রে হিন্দু মুসলমান উভয়েই সেবা পাচ্ছে; 'আমাদের লোকেরাই তাদের সব বিরোধ মিটান। পূর্ব্বে কত মারামারি, মাথা কাটাকাটি হত, পুলিশ এসে শাসন করতে পারেনি, কিন্তু আজ তারা নিরস্ত হয়েছে কেন? কারণ আমি তাদের নিকট কোন স্বার্থের দাবী করিনি তাই। আমি শুধু তাদের বলেছি, আমি তোমার দেশের লোক, তোমাদের সেবা করবার অধিকার আমার আছে; সে অধিকার রুদ্ধ করোনা, হৃদয়ের দ্বার খোল। তোমরা সবল হও, সুস্থ হও, আমি কৃতার্থ হব।' এতে অবশ্য সমস্ত ভারতবাসীর কিছু হবে না, কিন্তু 'ক্ষুদ্র সীমার মধ্যেও আত্মশক্তি যদি সত্য হয়, তাতেই ভারতের সেবা হবে। প্রদীপের আলোটি ক্ষুদ্র হলেও তাতে সমস্ত পৃথিবী গ্রাস করবার ক্ষমতা বর্তমান।'

এইভাবে নমঃশুদ্র জাতি সমাজ থেকে ভ্রষ্ট হয়ে গেছে। রাষ্ট্রীয় প্রয়োজনে তাদের 'ভাই' বলে ডেকেও কোনো কাজ হবে না। 'আমাদের দেশে শুধু ত্যাগ আছে, গ্রহণ নেই— ব্যয় আছে আয় নেই। কিন্তু তাতে ত চলবে না। যারা নিকটে আছে, তাদের আরও নিকটতর— যারা আপন, সেবাদ্বারা তাদের আরও ঘনিষ্ঠতর আত্মীয় করতে হবে।'

শুধু অন্নবস্ত্র জুগিয়ে পল্লির প্রাণকে সজীব করা যাবে না— শিক্ষাও আবশ্যক। 'পল্লীতে প্রাণ আছে, তাকে পুষ্ট করা চাই— তাকে সর্বপ্রকারে পরিপুষ্ট করতে পারলে সমস্ত চেষ্টা সার্থক হবে। ...আমার শান্তিনিকেতনের জ্ঞান শিক্ষিতদের জন্য Reserve নয়, তাতে সকল দেশের সকল লোকের সমান অধিকার— সকলে তা লাভ করুক তাতে জেগে উঠুক এই আমার নিবেদন। ...সিদ্ধিলাভ বাক্যদ্বারা হবে না, গ্রামের ভিতরে গিয়ে কাজ করতে হবে। তাহলে ২/১ টা গ্রামেই যে আলো জ্বলে উঠবে— সমস্ত দেশের লোকই তাকে দেখতে পাবে।'

নমঃশূদ্রদের সমস্যা ও গ্রামোন্নয়নের কথা বলেই তাঁর হয়তো মনে হয়েছিল, এর পরে তাঁকে গান্ধীভক্তদের বিভিন্ন প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হবে, কতকগুলি নিয়মবিধি পালন করলে এক বছরের মধ্যে স্বরাজ আনার প্রতিশ্রুতির কথাও তাঁর স্মরণে ছিল। তাই ভাষণটি তিনি শেষ করলেন এই বলে : 'আর কোন প্রশ্নের জবাব আমি দেব না। যদি আমাকে জিজ্ঞাসা করেন, দেশ স্বাধীন হবে কিসে? আমি বলব, আমি জানি না। আমাদের সাধনাকে সত্য করতে হবে এই শুধু জানি তাতেই দেশ নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে উঠবে।' শূন্যগর্ভ রাজনৈতিক আস্ফালনের পরিবর্তে গ্রামে গ্রামে সার্বিক উন্নয়নের প্রয়াসে নিজেদের পায়ে দাঁড়াতে পারলে অন্তত অর্থনৈতিক স্বাধীনতার পথে অনেকটাই এগোনো সম্ভব শ্রীনিকেতনের পরীক্ষামূলক সাধনায় তার প্রমাণ ইতিমধ্যেই পাওয়া গিয়েছিল।

এইদিনের তারিখযুক্ত একটিমাত্র অভিনন্দনপত্র রবীন্দ্রভবনে আছে— যোগেশচন্দ্র চৌধুরী কাগজে ছাপা একটি স্বাগতপত্র রবীন্দ্রনাথকে উপহার দেন।

‘পূর্ব্ব বাঙ্গালা ব্রাহ্মসমাজ’-এর সম্পাদক অক্ষয়কুমার সেন একটি মুদ্রিত আমন্ত্রণপত্রে 10 Feb বুধবার সকাল আটটার অন্তত পনেরো মিনিট আগে অভ্যাগতদের আসন গ্রহণের অনুরোধ জানান। তত্ত্ব-কৌমুদী-তে [১৬ ফাল্গুন] লেখা হয়েছে : ‘রবীন্দ্রনাথ ১০ই ফেব্রুয়ারী [বুধ ২৭ মাঘ] প্রাতে পূর্ব্ববাঙ্গালা ব্রাহ্মসমাজে কার্য্য করেন। তিনি বেদীতে আসন গ্রহণ করিলে শ্রীযুক্ত অমলচন্দ্র বসু একটি সঙ্গীত করেন। তৎপরে তিনি স্বয়ং “তুমি আপনি জাগাও মোরে” এই সংগীতটি গাহিয়া উপদেশ প্রদান করেন।’

আনন্দবাজার পত্রিকা [৩ ফাল্গুন] ‘শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরীর বাগান পরিদর্শন’ শিরোনামে লেখে; ‘ব্রাম্ভ সমাজ হইতে সদলবলে নরেন্দ্রবাবুর বাগান দেখিবার জন্য আসিয়াছিলেন’। নরেন্দ্রবাবু সঙ্গীত বাদ্য ইত্যাদি নানারূপ অনুষ্ঠান দ্বারা কবিকে অভ্যর্থিত করিয়াছিলেন। বাগান দেখিয়া কবিবর অত্যন্ত প্রীতিলাভ করেন। কবিবর নরেন্দ্রবাবুর ভক্তি ও শ্রদ্ধাপূর্ণ ব্যবহারে অত্যন্ত প্রীতিলাভ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন বাঙ্গলা দেশের অনেকস্থান আমি বেড়াইয়াছি কিন্তু নিজের বাড়ীতে এমন সুন্দর বাগান তৈয়ারী করিয়া রাখিতে কোথাও দেখি নাই।’[১২৪] রবীন্দ্র-প্রসঙ্গ-এর সম্পাদক টীকায় [পৃ ৬৫০] লিখেছেন :

ঢাকা জেলার বলধার জমিদার নরেন্দ্রনারায়ণ রায় চৌধুরী নাট্যকার, উদ্যানবিলাসী এবং নানাবিধ দ্রব্যের সংগ্রাহক ছিলেন। ঢাকা শহরের উয়ারী অঞ্চলে খ্রীস্টান গোরস্থানের বিপরীত দিকে তাঁর রচিত মনোরম উদ্যান এবং সংগ্রহশালা দর্শকদের জন্য উন্মুক্ত থাকে। সংগ্রহশালাটি সুবিস্তৃত জমিদার ভবনের এক তলায় অবস্থিত। এই বাড়িকে বেষ্টন করে রয়েছে দুই ভাগে বিভক্ত উদ্যান। রবীন্দ্রনাথ উদ্যানটি দেখে আনন্দিত হয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ যে উদ্যান দেখেছিলেন তা এরূপ : “জাদু ঘরের সংলগ্ন উদ্যানকে বাগান না বলিয়া “বট্যানিক্যাল গার্ডেন” বলাই সঙ্গত। বেষ্টিত বাগান দুইটির একটির ‘কালচার' এবং অপরটি ‘সিবেলী’ নামকরণ অত্যন্ত অর্থপূর্ণ। কিন্তু সমগ্র বাগানটির রচনার পরিকল্পনা ও কৌশলের পরিচয় নাই। “কালচার” নামক বাগান দুই খণ্ডে বিভক্ত। ছোটখণ্ডের নাম “সাইকী”। ইহার এক পার্শ্বে জলপদ্ম পরিপূর্ণ পুকুরের সারি বিদ্যমান। ইহার ঠিক মধ্যের তৃণাচ্ছাদিত আয়ত খণ্ডকে তিন দিকে পুষ্পিত বিভিন্ন উদ্ভিদ বেষ্টন করিয়া আছে। বড়ো খণ্ডের কেন্দ্রস্থলে একটি গোলাকার পিরামিড আছে। ইহার প্রতি ধাপ ক্যাকটাস গাছে পূর্ণ। ইহার উত্তর ও দক্ষিণে গাছপালা গজাইবার উপযোগী কতিপয় কাচের গৃহ এবং পূর্ব ও পশ্চিমে অন্যান্য উদ্ভিদ আছে।”[১২৫]

দুপুরে রবীন্দ্রনাথ ঢাকা কলেজিয়েট স্কুল পরিদর্শন করেন; ছাত্রেরা তাঁকে একটি অভিনন্দনপত্র প্রদান করে [রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত]। এর পরেই তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্জন হলে বেলা আড়াইটায় স্টুডেন্টস’ য়ুনিয়নের অভিনন্দনপত্র গ্রহণ করেন; ‘বিদ্যার্থী সঙ্ঘ’-প্রদত্ত সিল্কের উপর বাংলায় লেখা সেই অভিনন্দনপত্রটি রবীন্দ্রভবনে সংরক্ষিত আছে [দ্র ঢাকায় রবীন্দ্রনাথ। ৫৭-৫৮]।

এই অনুষ্ঠানের বিস্তৃত বিবরণ সংবাদপত্রে পাওয়া যায়নি, গোপালচন্দ্র রায় নলিনীকান্ত ভট্টশালীর একটি প্রবন্ধ থেকে তথ্য সংগ্রহ করে দিয়েছেন। নলিনীকান্ত লিখেছেন, কথা ছিল ভাইস-চ্যান্সেলার জর্জ হ্যারি ল্যাংলি রবীন্দ্রনাথকে অভ্যর্থনা জানাবেন— কিন্তু ঘটনাচক্রে তাঁর কিছু বিলম্ব হওয়ায় তিনি এতটাই বিভ্রান্ত হয়ে পড়েন যে, প্রথমে তিনি কথা বলতেই পারছিলেন না। নলিনীকান্তের ডায়ারিতে রবীন্দ্রনাথের ভাষণের মূল কথাগুলি ছিল এইরূপ :

সভা-সমিতিকে তিনি চিরদিন ভয় করেন। সভামঞ্চে বসিয়া বা দাঁড়াইয়া নীচের অসহায় শ্রোতাগণের মস্তকে শিলাবৃষ্টির মত বক্তৃতাবৃষ্টি করা নিতান্ত নিষ্ঠুরতা। ঘনিষ্ঠতর পরিচয়ের মধ্যে ছাত্রগণকে পাইতে ইচ্ছা। নিজের ছাত্রজীবনের ইতিহাস। দুইবার প্রাইজ পাওয়ার ইতিহাস। তাঁহার বয়স সম্বন্ধে লোকের ভুল বিশ্বাস। ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে জন্ম গণিয়া বয়সের হিসাব করিতে তাঁহারা বেজায় ভুল করেন। কারণ, তিনি সকল যুগের ছাত্রদের সমবয়সী। ছাত্রদের অন্তরঙ্গরূপে তিনি ছাত্রদের আশা-আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে পরিচিত। তাঁহার নিজের যুগের ছাত্রজীবনের সঙ্গে এই যুগের ছাত্রজীবনের বিভিন্নতা। তখন ছাত্রদের কোন ভবিষ্যৎ ছিল না। বর্তমান ছাত্রদের হাতে দেশের ভবিষ্যৎ। তাঁর নিজের নিস্ফল জীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষা উত্তরাধিকার সূত্রে ভবিষ্যৎ ছাত্রগণের হাতে তিনি নিঃশেষে দিয়া যাইতেছেন। বাক্যে ও কর্মে সংযম চাই, অনর্থক হৈ-চৈ করিয়া শক্তির অপব্যয় করা ভয়ানক বোকামি। বাঁশী ফুঁকিতে ইঞ্জিনের সমস্ত স্টীম খরচ হইয়া গেলে গাড়ি চলিবে কিসের জোরে? আমাদের আরব্ধ প্রত্যেক কর্মের বিফলতার মূল ঐখানে। প্রকৃত শিক্ষার আদর্শ— ছাত্রদের গ্রহণ ক্ষমতা ও আগ্রহ জাগাইয়া তোলা।

ঢাকায় আসার পরে প্রথম তিনদিন রবীন্দ্রনাথ জনসাধারণের অতিথি ছিলেন, তাই তাঁদের ব্যবস্থাপনায় তিনি 'তুরাগ' হাউসবোটে অবস্থান করেন। 10 Feb [বুধ ২৭ মাঘ] থেকে তাঁর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যসূচি আরম্ভ হয়, তাই এইদিন তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের অতিথি হিসাবে ড রমেশচন্দ্র মজুমদারের সরকারি নিবাসে উঠে যান। সেই কথাই লিখেছিলেন বীরেন্দ্রকুমার দত্তগুপ্তকে : 'আজ রমনায় রমেশবাবুর বাসায় আশ্রয় লইতে চলিয়াছি।' প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী এই বাসাবদল ঘটে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রসঙঘ-আয়োজিত অনুষ্ঠানের পরে। নলিনীকান্ত লিখেছেন : 'এখানকার ব্যাপার সারিয়া কবি ডক্টর মজুমদারের গৃহে যাইয়া অতিথি হন এবং মজুমদার গৃহিণী আলপনা, খই, ফুল, শঙ্খধ্বনি-সহকারে কবিকে অভ্যর্থনা করেন।' এই বিষয়ে রমেশচন্দ্রের বর্ণনা আমরা পূর্ব্বেই উদ্ধৃত করেছি।

ড রমেশচন্দ্র মজুমদারের বাসায় স্থানান্তরের অল্পক্ষণ পরেই রবীন্দ্রনাথকে আবার বিশ্ববিদ্যালয়ে আসতে হল মুসলিম হলের ছাত্রদের আয়োজিত সভায়। সভার সময় নির্দিষ্ট ছিল বিকেল চারটে থেকে ছ'টা পর্যন্ত। এই সভাটির প্রধান বিশেষত্ব ছিল ছাত্রদের পুষ্পসজ্জা। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশপথ থেকে হল পর্যন্ত ফুল দিয়ে সাজিয়ে হল ও সভামঞ্চটিকেও পুষ্পসজ্জিত করা হয়। সভামঞ্চের উপরিস্থিত পাখাগুলির ব্লেডের উপর সুগন্ধী ফুল স্তূপ করে রাখা ছিল; রবীন্দ্রনাথ আসনগ্রহণের পরেই পাখাগুলি চালিয়ে দিলে পুষ্পবৃষ্টি শুরু হয়। রবীন্দ্রনাথ কৌতুক ক'রে সঙ্গী রমেশচন্দ্রকে বলেন, এতদিন পরে একটি প্রশ্নের সমাধান তিনি পেলেন; কালিদাসের 'রঘুবংশ' কাব্যে তিনি পড়েছিলেন, রাজা অজের পত্নী ইন্দুমতীর গায়ে স্বর্গপথে ভ্রাম্যমান দেবর্ষি নারদের বীণা থেকে স্খলিত পারিজাত ফুলের মালা এসে পড়ায় তাঁর মৃত্যু ঘটে— ফুলের আঘাতে মানুষের মৃত্যুর রহস্য তিনি এতদিন বুঝতে পারেননি, আজ সেটি তাঁর বোধগম্য হল।

গোপালচন্দ্র রায় আবুল ফজলের লেখা থেকে উদ্ধৃত করে জানিয়েছেন, রবীন্দ্রনাথকে যে অভিনন্দন পত্র দেওয়া হয়েছিল সেটি সম্ভবত মুসলিম হলের হাউস টিউটর আবুল হোসেনের লেখা— অসুস্থতার জন্য রবীন্দ্রনাথ সংক্ষেপে অভিনন্দনের উত্তর দেন। কিন্তু ভাদ্র ১৩৩৩-সংখ্যা 'অভিযান' পত্রিকা থেকে প্রবাসী-র ফাল্গুন ১৩৩৩-সংখ্যার [পৃ ৭০৭-০৮] 'কষ্টিপাথর'-এ উদ্ধৃত 'ঢাকা মুস্‌লিম হলে অভিভাষণ'টি খুব সংক্ষিপ্ত নয়। রবীন্দ্রনাথ এতে বলেন :

> এই সভাগৃহে প্রবেশ করার পর হ'তে এপর্য্যন্ত আমার উপর পুষ্পবৃষ্টি হচ্ছে। প্রাচীন শাস্ত্রে পড়েছি, কৃতী ব্যক্তির উপর পুষ্পবৃষ্টি হয়। এ পুষ্পবৃষ্টি যদি তারই সপ্রমাণ করে, তবে আমি আজ অত্যন্ত আনন্দিত। কৃতী হয় প্রীতি দিয়ে।···এপর্যন্ত আমার সকল সাধনা ও ইচ্ছায়, রচনা ও কর্ম্মে আমার সংকল্প হয়েছে হৃদয়ের প্রীতি সর্ব্বজাতি, সর্ব্বদেশকে দিতে। পাশ্চাত্য দেশে আমি মানবের কবি ব'লে সমাদৃত। তার কারণ কোন সম্প্রদায় বিশেষের মধ্যে সীমাবদ্ধ হ'য়ে আমি কোন কার্য্য করিনি।···
>
> ···ভারতের বুকে এত জাতি, এত ধর্ম্ম স্থান লাভ করেছে, তার অর্থ আছে। ভারতের হাওয়ায় এমন শক্তি আছে যার বলে সকল সম্প্রদায় এখানে আসন লাভ করতে পেরেছে।···
>
> ভারতের বিভিন্ন ধর্ম্ম ও সম্প্রদায়ের মধ্যে বিরোধ ও পরস্পরের বিচ্ছেদ দেখে নিতান্ত দুঃখিত, মর্ম্মাহত, লজ্জিত হই। ধর্ম্মে ধর্ম্মে বিরোধ হ'তে পারে না। কারণ ধর্ম্ম হ'ল মিলনের সেতু আর অধর্ম্ম বিরোধের। ···যখন ধর্ম্মে বিকার উপস্থিত হয় তখনই বিচ্ছেদ প্রবল হ'য়ে ওঠে। শুধু হিন্দু-মুসলমানে প্রভেদ নয় সমাজের মধ্যে ভেদের অন্ত নেই। যখন মানুষ মানুষকে অপমান করে, তখন সে দুর্গতি-দারিদ্র্যের চরম সীমায় উপনীত হয়; আমি আমার সমাজের জন্য লজ্জিত হয়েছি। ···বিচ্ছেদের রক্তপ্লাবনে মানব-সমাজের প্রতি স্তর কলুষিত হয়েছে।···এই সমস্যা ভারতে বহুদিন থেকে আছে। বিরোধের প্রাচীর তুলে ত সমস্যার সমাধান হবে না। ···শুভবুদ্ধির আলোক বিকীর্ণ হোক্। তবেই আমাদের চিত্ত যুক্ত হবে। ···সঙ্কীর্ণতার মধ্যে বাহিরের চুক্তি দ্বারা সে ঐক্য হবে না। আমাদের শুভবুদ্ধি শুভকর্ম্মে যুক্ত হোক।

মুসলিম হলের অনুষ্ঠান সমাপ্ত হলে সন্ধ্যা সাড়ে ছ'টায় রবীন্দ্রনাথ ভাইস-চ্যান্সেলার মি. ল্যাংলি ও রমেশচন্দ্র মজুমদারের সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্জন হলে আসেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আমন্ত্রণ অনুসারে

আয়োজিত কার্যসূচির সূত্রপাত এই অনুষ্ঠান দিয়ে। রবীন্দ্রনাথ এখানে ইংরেজি প্রবন্ধ 'The Meaning of Art' পাঠ করেন [দ্র *Visva-Bharati Quarterly*, Apr 1926/ 1-15; *EWRT* 3/ 580-88]; ভাষণটি *Dacca University Bulletin XII*-এও মুদ্রিত হয়। আনন্দবাজার পত্রিকা-য় লেখা হয়েছে : 'বেশ উচ্চ সুস্পষ্ট কণ্ঠে প্রায় এক ঘণ্টা বলিলেন। প্রকাণ্ড হলের দূরতম কোণ হইতে সবাই স্পষ্ট শুনিতে পাইল।' পূর্ণ সভাগৃহে সভাপতি মি. ল্যাংলি বক্তার পরিচয় দিতে গিয়ে বলেন, জগতের যিনি শ্রেষ্ঠ আর্টিস্ট আজ তাঁরই মুখে আমরা আর্টের কথা শুনব এটি আমাদের পরম সৌভাগ্যের বিষয়।

রবীন্দ্রনাথ বলেন, মানুষের আত্মপ্রকাশ তার প্রয়োজনাতিরিক্ত প্রাচুর্যের মধ্যে— সৃষ্টিতেই তার আনন্দ— 'Art reveals man's wealth of life, which seeks its freedom in forms of perfection which are an end in themselves.' এই তত্ত্বটিকেই তিনি বিজ্ঞান, সংগীত, ইতিহাস প্রভৃতির দৃষ্টান্ত দিয়ে ব্যাখ্যা করেছেন।

গোপালচন্দ্র রায় লিখেছেন : 'এই দিন রাত্রে কবির আত্মীয় ঢাকার সিভিল সার্জনের [ড. রাজেন্দ্রচন্দ্র রায়] আমন্ত্রণে তাঁর বাড়িতে নৈশভোজেও কবিকে যেতে হয়েছিল। এই সিভিল সার্জন ছিলেন রবীন্দ্রনাথের বড়দাদা দ্বিজেন্দ্রনাথের পুত্র সুধীন্দ্রনাথের কন্যা এনা দেবীর স্বামী।'[১২৬]

এই দিনে প্রাপ্ত দুটি অভিনন্দনপত্র রবীন্দ্রভবনে আছে— একটি ঢাকা কলেজিয়েট স্কুল ও অপরটি বিদ্যার্থী সঙ্ঘের কাছ থেকে পাওয়া।

২৮ মাঘ [বৃহ 11 Feb] তারিখের কার্যসূচি ছিল সকাল আটটা থেকে ন'টা ছাত্রদের সঙ্গে কথাবার্তা, বিকেল চারটে থেকে ছ'টা জগন্নাথ হলের অনুষ্ঠান এবং ছ'টা থেকে সাড়ে ছ'টা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র য়ুনিয়নের অভিনন্দনপত্র গ্রহণ। পরের দিন 12 Feb-র কর্মসূচিতে ছিল সকাল আটটা থেকে ন'টা সাক্ষাৎকার, দুপুর দু'টো থেকে চারটে ইডেন গার্লস' কলেজের অনুষ্ঠান এবং চারটে থেকে ছ'টা ঢাকার সাহিত্য পরিষদের পক্ষ থেকে অভিনন্দন। কিন্তু কয়েকদিনের অতিরিক্ত পরিশ্রমের ফলে রবীন্দ্রনাথ অসুস্থ হয়ে পড়ায় এই দু'দিনের কার্যসূচি পরিত্যক্ত হয়।

অবশ্য সম্পূর্ণ বিশ্রামে তাঁর দিন কাটেনি। ঢাকা মুজিয়মের কিউরেটর নলিনীকান্ত ভট্টশালী লিখেছেন :

> ২৮শে মাঘ বৃহস্পতিবার সকাল আটটায় ডক্টর মজুমদারের বাড়ি গিয়া দেখি, লেঙ্গলী সাহেব আগেই আসিয়াছেন। দোতলার বারান্দায় বসিয়া কঠিন কঠিন দার্শনিকতত্ত্ব লইয়া রবীন্দ্রনাথের সহিত আলোচনা জুড়িয়া দিয়াছেন। ...চুপ করিয়া পিছনে বসিয়া শুনিতে লাগিলাম। প্রোগ্রাম বা দৈনিক কর্তব্যের তালিকার প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইতেই আমি মিউজিয়মের দাবি অগ্রসর করিলাম। ...দেখিলাম, কেমন যেন উন্মনস্ক ভাব, কথা বলিতে বলিতে যেন খেই হারাইয়া ফেলেন। এমন সময় ছাত্রদের দাবিতে তাঁহাকে নীচে নামিয়া যাইতে হইল। সেখানে গিয়া দেখি, নিতান্ত লাজুক মুখচোরার মত তিনি যেন কতকটা অসহায় ভাবে বসিয়া আছেন, কাহারও মুখের দিকে চাহিতেছেন না। ইতিমধ্যে কবির 'তিন বছরের প্রিয়া' নাতনীটি আসিয়া ভারী আসর জমাইয়া বসিল। কবি তাহারই সহিত নানা রহস্য করিতে লাগিলেন। নাতনীটির একটি প্রশ্ন ছিল বোধ হয়, ঢাকায় বাঘ আছে কিনা।
>
> কবি বলিলেন— মেলা বাঘ, রাশি রাশি বাঘ। বাঘ জোর করে ধরে নিয়ে যায়, আর বলে বক্তৃতা দাও, না হয় গল্প বল।[১২৭]

রবীন্দ্রনাথ অসুস্থ হওয়ায় তাঁর দু'দিনের কার্যসূচি বাতিল হলেও অধ্যাপক কার্লো ফর্মিকি 11 Feb 'Meditative and Active India' এবং অধ্যাপক তুচ্চি 12 Feb 'The Idealistic School in Buddhism'-শীর্ষক দু'টি প্রবন্ধ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠ করেন।

রবীন্দ্রনাথ রমেশচন্দ্রের বাড়িতে ক'দিন ছিলেন নির্দিষ্ট করে বলার মতো উপকরণ নেই, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ সম্ভবত তাঁর প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর কর্মসূচির দিনগুলি সেখানেই কাটান। গোপালচন্দ্র রায়

লিখেছেন : "কবি অসুস্থ হয়ে রমেশবাবুর বাড়িতে কয়েকদিন রইলেন। রমেশবাবু এবং তাঁর স্ত্রীর সেবায় কবি শীঘ্রই সুস্থ হয়ে উঠলেন। রমেশবাবু জগন্নাথ হলের প্রোভোষ্ট ছিলেন বলে, ঐ সময় জগন্নাথ হলের ছাত্ররাও কবির সেবায় আগিয়ে এসেছিল। এ প্রসঙ্গে ঐ বছরের জগন্নাথ হলের ছাত্রদের মুখপত্র 'বাসন্তিকা' পত্রিকায় তখন ছাত্রেরা লিখেছিল— 'কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঢাকা প্রবাস-কালে ডাঃ শ্রীযুত রমেশচন্দ্র মজুমদারের অতিথি স্বরূপ কয়েকদিন ছিলেন। হলের ছাত্রগণ তখন কবিগুরুর সান্নিধ্য লাভ করিয়া ধন্য হইয়াছেন। কবির অসুস্থ অবস্থায় সর্বদাই আমাদের ছাত্রগণ তাঁহার কাছে ছিলেন।"[১২৭]

রমেশচন্দ্র স্বয়ং এই বিষয়ে লিখেছেন :

এর মধ্যে রবীন্দ্রনাথ একদিন বললেন যে তাঁর শরীরটা একটু খারাপ বোধ হচ্ছে। শোনামাত্রই সিভিল সার্জন ও ঢাকার অন্যান্য বড় বড় ডাক্তাররা সকলেই আমার বাড়িতে হাজির হলেন। তাঁরা দেখে বললেন যে অসুখের কোন লক্ষণ তো দেখা যাচ্ছে না। রবীন্দ্রনাথ শুনে বললেন যে অসুখ তেমন কিছু নয়। তবে বহুদিন পরে পূর্ব বাংলায় এসেছি; মনে হয় জলে একটু থাকতে পারলে ভাল হত। ডাক্তাররাও বললেন, ভাল কথা। ঢাকার নবাবের একটি দোতলা বড় নৌকা ছিল— স্টিম লঞ্চ সেটি টেনে নিয়ে যেত। নবাব বললেন, তাঁর সেই নৌকায় কবিকে নিয়ে চলো। নৌকার এক তলায় দু'তিনটি ঘর এবং উপরের তলায় একটি বড় হল ছিল। ঢাকা শহরের পাশেই বুড়ীগঙ্গা নদী; সেই নদীর ঘাটে নৌকা বাঁধা হল। কবিগুরু সেই নৌকায় এসে উঠলেন। জগন্নাথ হলের প্রায় কুড়ি পঁচিশ জন ছাত্র কবির পরিচর্যার জন্য সেখানে রইল। সব ছাত্রই যেতে উৎসুক; সুতরাং পরিচর্যার কোন অসুবিধা ছিল না। আমার বাড়ি থেকে নদীর ঘাট প্রায় তিন মাইল দূরে। কবির খাওয়া দাওয়া ও অন্যান্য ব্যবস্থার জন্য আমি ও আমার স্ত্রী সারাদিনই সেখানে থাকতাম, রাত্রে বাড়ি ফিরে আসতাম। শহরে[র] অনেক লোকও সেখানে থাকতেন এবং অনেকেই নিজের বাড়ি থেকে ভাল ভাল খাবার তৈরী করে পাঠাতেন। জ্ঞান ঘোষ ও সত্যেন বোস বললেন, তোমরা তো বাড়িতে থাক না; তোমার ছেলেমেয়েরা আমাদের বাড়িতে থাকবে। এভাবে সকলেই কবিগুরুর সংবর্ধনা ও পরিচর্যার জন্য পরিশ্রম করেছিলেন এবং আমাকে নানাভাবে সাহায্য করেছিলেন।[১২৮]

রমেশচন্দ্র স্বভাবতই রবীন্দ্রনাথের প্রথমবারের 'তুরাগ'-বাসের কোনো উল্লেখ করেননি, যেন ঢাকায় আসার পরে রবীন্দ্রনাথ এতদিন তাঁর বাড়িতেই ছিলেন, এখন সামান্য অসুস্থ হওয়ায় নৌকাবাসের ইচ্ছা প্রকাশ ক'রে 'তুরাগ'-এ গিয়ে ওঠেন!

রবীন্দ্রনাথ 15 Feb [সোম ৩ ফাল্গুন] বিকেলে ময়মনসিংহে পৌঁছন। তার আগে 13 Feb তিনি কার্জন হলে বিশ্ববিদ্যালয়ের শেষ বক্তৃতাটি দেন। তাহলে কবে তিনি রমেশচন্দ্রের বাড়ি ছেড়ে নৌকায় গিয়ে উঠেছিলেন? এই প্রশ্নের সঠিক উত্তর দেওয়ার জন্য উপকরণের অভাব আছে।

যাই হোক্, মুদ্রিত কর্মসূচি অনুযায়ী 13 Feb [শনি ১ ফাল্গুন] সকালের সাক্ষাৎকার ও বিকেল চারটে থেকে ছ'টা ভাইস-চ্যান্সেলারের পার্টির অনুষ্ঠান বর্জিত হলেও সন্ধ্যা সাড়ে ছ'টায় কার্জন হলে রবীন্দ্রনাথ 'The Rule of the Giant' প্রবন্ধটি পাঠ করেন [দ্র *The Visva-Bharati Quarterly*, July-Sep 1926/ 99-112; *EWRT* 1/570-79; ঢাকায় রবীন্দ্রনাথ। ১১৮-৩২]।

প্রবন্ধটি বস্তুত অনেক আগে চিন-সফরের পূর্বে লেখা [দ্র Ms. 324 (i-iv)], 10 May 1924 [২৭ বৈশাখ ১৩৩১] রবীন্দ্রনাথ পিকিঙে 'The Giant Killer' [Ms. 324 (v-vi)] প্রবন্ধটির সঙ্গে 'The Rule of the Giant' প্রবন্ধটির বক্তব্য মিলিয়ে একটি রচনা পাঠ করেন— এর সারমর্ম আমরা আগেই লিপিবদ্ধ করেছি। রবীন্দ্রনাথ প্রবন্ধের শেষে চিনা কবি Po-Chu-I-এর একটি কবিতার ইংরেজি অনুবাদ উদ্ধৃত করে লিখেছেন : 'The modern meaning of this poem is, that meat and drink was offered at the shrine of Democracy, innumerable lives are Ṣacrificed, but only plutocrats and autocrats in various disguise thrive on them, the idol does not know it, and the pious worshippers smile in foolish

satisfaction.' একবিংশ শতাব্দীর সূচনাতে ভারতীয় গণতন্ত্রের চেহারা দেখে কি মনে হয় না যে, কথাটি আজ আরও বেশি সত্যি!

আমরা আগেই বলেছি, অসুস্থতার জন্য রবীন্দ্রনাথের 11-12 Feb [২৮-২৯ মাঘ]-এর অনুষ্ঠানসূচি বাতিল হয়েছিল। ২৮ মাঘ বিশ্ববিদ্যালয়ের জগন্নাথ হলে তাঁর সংবর্ধনার কথা ছিল, রমেশচন্দ্র মজুমদার ছিলেন যার প্রোভোস্ট— অথচ আশ্চর্যের বিষয়, রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত অভিনন্দনপত্র-সংগ্রহে জগন্নাথ হলের ছাত্রসঙেঘর কোনো অভিনন্দনপত্র নেই; তবে ১ ফাল্গুন ১৩৩২ তারিখ-দেওয়া ঢাকা হল সমিতির সভাপতি ও সভ্যগণ-প্রদত্ত সিল্কের উপর মুদ্রিত কবিতাপত্রটি সম্ভবত তাঁরাই ক্ষতিপূরণ হিসেবে কার্জন হলের ভাষণের আগে রবীন্দ্রনাথকে দেন; ঐ বৎসরের 'বাসন্তিকা' লিখেছে: 'কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের সম্বর্ধনার জন্য, হল ইউনিয়ন বিপুল আয়োজন করিয়া ছিলেন। কবি হঠাৎ অসুস্থ হইয়া পড়ায় সম্বর্ধনা হইতে পারে নাই। কার্জন হলে আমাদের হলের পক্ষ হইতে কবিকে একটি অভিনন্দন দেওয়া হয়। অভিনন্দন পত্র মূল্যবান বস্ত্রে মুদ্রিত ও রৌপ্যখচিত হইয়া ভেলভেট নির্মিত একটি সুদৃশ্য আধারে কবিকে উপহৃত হয়। কবি ইহার কারুকার্যে অতীব প্রীত হইয়াছিলেন।'[১২৯]

২৯ মাঘ ইডেন গার্লস' কলেজ ও সাহিত্য পরিষদে যাওয়ার কথা ছিল, তাঁরা যথাসম্ভব প্রস্তুতিও নিয়েছিলেন— সুতরাং রবীন্দ্রনাথ অনুপস্থিত থাকায় তাঁরা অবশ্যই হতাশ হয়েছিলেন। সাহিত্য পরিষদের পক্ষ থেকে সুরেশচন্দ্র ঘটক বাংলা, সংস্কৃত ও ইংরেজি কবিতার আকারে মুদ্রিত অভিনন্দনপত্র রমেশচন্দ্রের বাসায় এসে রবীন্দ্রনাথের হাতে তুলে দেন। নরেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরীও সাহিত্য পরিষদের পক্ষ থেকে আর-একটি অভিনন্দনপত্র প্রদান করেন। ইডেন গার্লস' কলেজ ও স্কুলের অধ্যক্ষা ও ছাত্রীগণ বুড়িগঙ্গা নদীর তীরে কাদা মাড়িয়ে 'তুরাগ'-এ এসে রবীন্দ্রনাথকে প্রণাম করেন।

মুদ্রিত কর্মসূচিতে 14 Feb [রবি ২ ফাল্গুন]-এর কাজ ছিল বিকেল চারটে থেকে ছ'টা 'Educational Institution Party' ও আটটা থেকে দশটা ঢাকা হল-আয়োজিত ডিনার— কিন্তু গোপালচন্দ্র রায়-প্রদত্ত তালিকায় আছে : 'সকালে অনুন্নত সম্প্রদায়ের সভায় যোগদান। বিকাল ৪-৩০ মিঃ বিশ্বভারতী সম্মিলনীতে যোগদান। এডুকেশনাল ইন্‌সটিটিউট কর্তৃক প্রদত্ত টি-পার্টি। ৬টা চিরকুমার সভা নাটকাভিনয়। রাত্রি ৮টা-১০টা ঢাকা হল কর্তৃক নৈশভোজের ব্যবস্থা।'[১৩০]

রবীন্দ্রনাথ 'তুরাগ'-এ থাকার সময়ে রোজ সকালে একটি ছোটো লঞ্চে জলবিহারে যেতেন। এইদিন জনৈক স্বেচ্ছাসেবক স্নিগ্ধকুমার গুহের কেনা 'বলাকা' কাব্যগ্রন্থের কপিতে তিনি একটি কবিতিকা লিখে দেন :

> ভারী কাজের বোঝাই তরী কালের পারাবারে
> পাড়ি দিতে গিয়ে কখন ডোবে আপন ভারে।
> তার চেয়ে মোর এই ক'খানা হাল্কা কথার গান
> হয়ত ভেসে রইবে স্রোতে তাই করিলাম দান।[১৩১]

একই দিনে লেখা তাঁর আর-একটি কবিতিকার সন্ধান পাওয়া যায় :

> খেলার খেয়াল বশে কাগজের তরী
> স্মৃতির খেলেনা দিয়ে দিয়ে গেনু ভরি।

যদি ঘাটে গিয়ে ঠেকে প্রভাত বেলায়।

তুলে নিয়ে তোমাদের প্রাণের খেলায়।[১৩২]

একই দিনে তিনি রমেশচন্দ্রের জ্যেষ্ঠা কন্যা সুষমা [পোশাকী নাম শান্তিলতা]-কে তাঁর দুটি নামই ব্যবহার করে লিখে দেন :

আয়রে বসন্ত হেথা, কুসুমের সুষমা জাগা রে

শান্তি-স্নিগ্ধ মুকুলের হৃদয়ের নিস্তব্ধ আগারে।

ফলেরে আনিবে ডেকে।

সেই লিপি যায় রেখে

সুবর্ণ তুলিকাখানি পর্ণে পর্ণে যতনে লাগা রে ॥[১৩৩]

বিশ্বভারতী সম্মিলনীর অনুষ্ঠানটি হয়েছিল সম্পাদক অপূর্বকুমার চন্দের বাসায়। এর আগে সম্মিলনীর আনুষ্ঠানিক সভাটি হয়েছিল 9 Feb [মঙ্গল ২৬ মাঘ], যার বিবরণী আমরা পূর্বেই দিয়েছি। বর্তমান অনুষ্ঠানটি ছিল ঘরোয়া। আবুল ফজলের 'ঢাকায় রবীন্দ্রনাথ' প্রবন্ধ থেকে জানা যায়, অনুষ্ঠানে রবীন্দ্রনাথ গোটা দুই কবিতা পড়েন ও দিনেন্দ্রনাথ কয়েকটি গান গেয়ে শোনান।[১৩৪]

৩ ফাল্গুন [সোম 15 Feb] সকাল সাড়ে এগারোটার সময় রবীন্দ্রনাথ সদলবলে ঢাকা ত্যাগ করে ময়মনসিংহের উদ্দেশে রওনা হন। রেলস্টেশনে অসংখ্য লোক সমবেত হয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ গাড়ি থেকে নামার পর মহারাজা শশিকান্ত আচার্য চৌধুরী তাঁকে পুষ্পমাল্যে ভূষিত ক'রে আলেকজান্দ্রা ক্যাসেলে নিয়ে যান, সেখানে মহারাজের অতিথি হয়ে তারা সকলে কয়েকটি দিন অবস্থান করেন।

এইদিন অপরাহ্ণ ৬টার সময়ে সূর্যকান্ত টাউনহলে 'ময়মনসিংহ মিউনিসিপালিটির চেয়ারম্যান ও কমিশনার বৃন্দ' রবীন্দ্রনাথকে একটি অভিনন্দনপত্র প্রদান করেন। রবীন্দ্রনাথ প্রত্যুত্তরে যা বলেন, তার সারমর্ম আনন্দবাজার পত্রিকা-র ৪ ও ৬ ফাল্গুন-সংখ্যায় মুদ্রিত হয় [দ্র রবীন্দ্র-প্রসঙ্গ ১। ৪৬৩-৬৪, ৪৬৫-৬৭]— শেষোক্ত পাঠটি ময়মনসিংহ থেকে প্রকাশিত রবীন্দ্র-সংখ্যা 'সৌরভ' পত্রিকার ফাল্গুন-সংখ্যাতেও [পৃ ২৬-২৭] উদ্ধৃত হয়েছে। বৈশাখ ১৩৩৩-সংখ্যা প্রবাসী-তে এইটি [পৃ ১৩-১৪] ও এখানে প্রদত্ত আরও দুটি ভাষণ 'পূর্ব্ববঙ্গে বক্তৃতা' শিরোনামে 'এই বক্তৃতাগুলি শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় সংশোধন করিয়া ও স্থানে স্থানে স্বয়ং লিখিয়া দিয়াছেন' টীকা-সহ মুদ্রিত হয়। তিনি বলেন, পূর্ববঙ্গের শ্যামল ক্ষেত্রের মধ্যে বঙ্গমাতার একটি পীঠস্থানে তিনি এসেছেন, কিন্তু দেবীকে সহজে প্রত্যক্ষ করা যায় না— তাঁর দরিদ্র বেশ ও অপূর্ণতাই আমাদের চোখে পড়ে। কিন্তু আমাদের মনের মধ্যে যদি নিষ্ঠা থাকে ত্যাগ থাকে তাহলে আমরা প্রত্যেক অসম্পূর্ণতার মধ্যে সম্পূর্ণতাকে দেখতে পাব এবং বর্তমান দৈন্য ও অবিশ্বাসের মধ্যেও দেবীর অস্তিত্ব অনুভব করতে পারব। তিনি সকলকে তারই জন্য সচেষ্ট হতে আহ্বান করেন।

৪ ফাল্গুন [মঙ্গল 16 Feb] সকাল আটটায় স্থানীয় ব্রাহ্মসমাজ পরিদর্শনে গেলে 'ময়মনসিংহ ব্রাহ্মসমাজের উপাসকমণ্ডলী' রবীন্দ্রনাথকে একটি অভিনন্দনপত্র প্রদান করেন। প্রত্যুত্তরে তিনি একটি দীর্ঘ ভাষণে [দ্র রবীন্দ্র-প্রসঙ্গ ১। ৪৭৪-৭৬] স্বাধীনতার জন্য মানবের অদম্য আগ্রহের কথা উল্লেখ করে বলেন, পশুর সঙ্গে মানুষের পার্থক্য তার চাতুর্যে বা শারীরিক শক্তিতে নয়, মানুষ শ্রেষ্ঠ তার আত্মার শক্তিতে। মানুষ আপাত-

আবশ্যকতার মধ্যে তার আশা আকাঙক্ষাকে সীমাবদ্ধ করতে গিয়ে নিজেকে দরিদ্র করে ফেলে; কিন্তু স্বাধীনতালাভ বা মুক্তির বাসনা যখন তার ভিতরে জাগে, সে তখন স্বার্থের বাঁধন ছিন্ন করে নিজের পরিপূর্ণ সৌন্দর্য ও জ্যোতিতে বিমণ্ডিত হয়ে প্রকাশ পায়। আধ্যাত্মিক শক্তির প্রভাবে মানবাত্মা বন্ধনমুক্ত হয়ে বিশ্বজনীন যোগ্যতালাভ করে, প্রাচীন ভারত সেই বার্তাই প্রচার করেছিল। অতীন্দ্রিয় অনুভূতি এবং অপরোক্ষ জ্ঞানের উদার ভিত্তির উপরই পরিপূর্ণতা গড়ে উঠতে পারে। যে তত্ত্ব ভারত একদিন অন্তরে আদরের সঙ্গে ধারণ করেছিল এবং জগৎকে দেবার জন্য ব্যগ্র হয়েছিল, তাকে আজ আবার উজ্জীবিত করতে হবে। যখন বিশ্বপ্রেমের পবিত্র বহ্নিজ্বালায় স্বার্থ ও সংকীর্ণতার সকল শৃঙ্খল ধ্বংস হয়ে পড়বে তখন সকল দৈন্য ও সকল বন্ধন বিনির্মুক্ত মহত্তর ভারতের উদ্ভব হবে।[১৩৫]

এইদিন বিকেল সাড়ে চারটায় রবীন্দ্রনাথ স্থানীয় আনন্দমোহন কলেজ পরিদর্শনে যান। কলেজের পক্ষ থেকে বিশ্বভারতীর সাহায্যার্থে ৬২৫ টাকা দেওয়া হয়। এখানেও রবীন্দ্রনাথ এক দীর্ঘ ভাষণে [দ্র রবীন্দ্র-প্রসঙ্গ ১। ৪৭১-৭৪; সৌরভ, ফাল্গুন। ৩০-৩৩, প্রবাসী, বৈশাখ ১৩৩৩। ১৭-২০] ছাত্রদের উদ্দেশে বলেন, তিনি তাদের মধ্যে এসেছেন উপদেষ্টা ও শ্রোতার ব্যবধান ভুলে গিয়ে। শান্তিনিকেতনেও এই প্রয়াসই করেছেন তিনি। যখনই সেখানকার ছাত্রদের সঙ্গে মিশতে চেয়েছেন তখনই তাদের সুখদুঃখের ভার নিয়ে মিশেছেন। গুরুশিষ্যের সম্মানের দূরত্বের উপর দাঁড়িয়ে কখনও কোনো কাজ করেননি, বয়স্যভাবে তাদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন। 'আমার বিশ্বাস, অন্তরে তাদের সমবয়সী না হ'তে পারলে তাদের কিছু দিতে পারা যায় না।' যে শিক্ষা ছাত্ররা এখন পাচ্ছে তাতে ভালো কিছু নেই, তার দ্বারা তারা কেবল ভারগ্রস্ত হয়ে পড়ছে। পাখির মতো তাদের যে খাদ্য দেওয়া হচ্ছে তা তারা হজম করতে পারছে না। বাল্যকাল থেকে নোটবই মুখস্থ করে বছর বছর পাশ করার পর তারা আর জ্ঞানের আলোচনায় আগ্রহী নয়, বাস্তবরাজ্যে পুঁথিগত বিদ্যার সার্থকতা খুঁজে নেবার প্রবৃত্তি তাদের নেই; শিক্ষা পুঁথির জিনিস হয়ে পড়লে মন ভালো কিছু গ্রহণ করতে পারে না, কেবল পুঁথির বোঝা বয়ে বেড়ায়। সঙ্গী তিন বিদেশি অধ্যাপক ফর্মিকি, তুচ্চি ও লিম্‌কে দেখিয়ে রবীন্দ্রনাথ বলেন, এঁরা যে দিবারাত্রি নিবিষ্ট হয়ে আমাদের শাস্ত্র থেকে রত্ন উদ্ধার করছেন, আমাদের দেশের বিদ্যা সংগ্রহ করছেন, এঁরা স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে ভারতের প্রতি প্রীতিবশত এখানে এসেছেন। এরা আমাদের জিনিস আমাদেরই বুঝিয়ে দিতে এখানে এসেছেন, কিন্তু আমরা ক'জন তা আগ্রহের সঙ্গে গ্রহণ করছি? করছি না, এইটিই আমাদের দুর্ভাগ্য। 'মানুষকে মানুষের জানবার ইচ্ছাই মানুষের ইতিহাস। এই বিদেশীগণ আমাদের যেমন ভাবে জানতে চেয়েছেন, আমরা তো তেমনভাবে চাইনি। আমি তো দেখেছি, কি অসীম অধ্যবসায়ের সঙ্গে, কি আগ্রহ, নিষ্ঠার সঙ্গে এরা আমাদের জ্ঞানভাণ্ডার মন্থন করে আনন্দ পাচ্ছেন— একটা ছেঁড়া পুঁথির পাতা পেয়ে এদের মুখ আনন্দে কেমন উজ্জ্বল হয়ে ওঠে! এদের কথা শুনে লজ্জা হয়— নিজেদের কথা ভেবে, কিন্তু এদের প্রতি ভক্তি হয়। এদের তপস্যা তো আমরা পেলুম না! পাইনি বলে আমাদের দুর্ভাগ্য, আরও দুর্ভাগ্য এদের স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে জিজ্ঞেস পর্যন্ত করি না, এদেশ থেকে ওরা কি পেয়েছে। আমরাই বলি, আমরা ভারতকে ভালবাসি, ভারতে আমাদের অধিকার। অধিকার তো জন্ম দিয়ে আসে না, জ্ঞানের সংগ্রামে অধিকার পেতে হয়। তোমরা কেউ সে সংগ্রাম করেছ? ···আমি জানি, সে প্রবৃত্তি নেই। যে পর্যন্ত সে ইচ্ছা না জাগ্রত হবে, আমি বলে রাখছি, সে পর্যন্ত দেশের উদ্ধার নেই।'

৫ ফাল্গুন [বুধ 17 Feb] বিকেল তিনটের সময়ে মুক্তাগাছার ‘ত্রয়োদশী সম্মিলনী’র পক্ষ থেকে মুক্তাগাছার অন্যতম জমিদার সুধেন্দুনারায়ণ আচার্যচৌধুরীর ময়মনসিংহ-স্থিত বাসভবনে সংস্কৃত শ্লোক খোদাই-করা একটি রৌপ্যফলক উপহার দিয়ে রবীন্দ্রনাথকে অভিনন্দন জানানো হয়। সেখানে মুক্তাগাছার সমস্ত জমিদার ও ভদ্রলোক উপস্থিত ছিলেন। তাঁদের পক্ষ থেকে দেড় হাজার টাকার একটি তোড়া বিশ্বভারতীর সাহায্যার্থে প্রদত্ত হয়।

এর পরে বিকেল পাঁচটায় ময়মনসিংহ টাউন হলের সম্মুখস্থ চত্বরে শহরবাসী কয়েক হাজার ব্যক্তি রবীন্দ্রনাথকে সংবর্ধনা জানাতে উপস্থিত হন। জনসাধারণের পক্ষ থেকে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি মহারাজা শশিকান্ত আচার্যচৌধুরী ও সাহিত্য সম্মিলনীর পক্ষ থেকে সম্পাদক যতীন্দ্রনাথ মজুমদার দু’টি অভিনন্দনপত্র পাঠ করেন। এ ছাড়াও কোনো-এক অজ্ঞাতনামা ব্যক্তির কবিতায় লেখা একটি অভিনন্দনপত্র রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত আছে। প্রত্যুত্তরে রবীন্দ্রনাথ বলেন, তিনি পূর্ববাংলা সফরে এসেছেন কোনো কাজ করার জন্য নয়, সেই শক্তি তাঁর এখন নেই। তাঁর কাব্য ও সাহিত্য দিয়ে তিনি যদি আনন্দ দিয়ে থাকেন তার বিনিময়ে প্রীতির অর্ঘ্য তিনি পেতে পারেন। কিন্তু শুধু কাব্য রচনা নয়, প্রায় ত্রিশ বৎসর পূর্বে সমস্ত বাংলাদেশে মানুষের চিত্ত যখন উদ্বোধিত হয়ে উঠেছিল তখন কাব্য ও গান রচনা ছাড়াও তিনি দেশবাসীকে কর্মের আহ্বানও জানিয়েছিলেন। ‘অনুভব করেছিলাম, যখন দেশের লোকের হৃদয় উদ্বোধিত হয় তখন কেবল ভাবসম্ভোগ দ্বারা সেই মহামুহূর্তকে সমাপ্ত করা মস্ত একটা অপব্যয়।····আমি বলেছিলাম এইবার আমাদের কাজের সময় এসেছে। এই যে ভাবাবেগ, এতে চিত্ত অনুকূল হয়েছে,— এই কর্ম করবার উপযুক্ত সময়। কারণ কেবলমাত্র ভাবের আবেগ স্থায়ী হয় না, ক্ষণকালীন ভাবাবেগের দ্বারা চিত্ত সম্মিলিত হয় না। কর্মক্ষেত্রে সকলে আপন আপন শক্তিকে ব্যক্ত করে তুলতে পারলে যথার্থ ঐক্য হয়। সেই কর্ম করবার দিন এসেছে। কি কর্ম? এই যে বাংলাদেশের পল্লীগুলি নিরন্ন হয়েছে, নিরানন্দ হয়েছে, তার স্বাস্থ্য দূর হয়েছে, সেখানে কর্ম দ্বারা তপস্যা দ্বারা নূতন প্রাণ দিতে ব্রতী হতে হবে। এই কথাটি আমি সেদিন স্মরণ করিয়ে দিতে চেষ্টা করেছিলাম— কেবলমাত্র কাব্যে নয়। তখন স্বীকার করেনি লোক। তখন আমি ভাবুকতার মধ্যে প্রচ্ছন্ন ছিলাম, একথা ঠিক নয়। ···বাংলাদেশের যেখানে আমাদের প্রাণের নিকেতন, সেইখানে আমাদের প্রাণের যথার্থ কেন্দ্র, সেইখানে আমাদের যথার্থ কর্মক্ষেত্র, এবং সেইখানেই আমরা সার্থকতা লাভ করব। তাই বলেছিলাম, এবং নিজের কাজের সূত্রপাত করেছি।’

রবীন্দ্রনাথ বললেন, আবার দিন এসেছে, দেশের মধ্যে আবার চিত্তের জাগরণ ঘটেছে— এই সময়ে তিনি কেমন করে নিজের ভগ্নস্বাস্থ্যের অন্তরালে চুপ করে থাকবেন। ‘যদি উদ্বোধন উপলব্ধি করে থাকো, তবে কেবল বাক্যবিন্যাস নয়, এই অনুকূল সময়কে অপব্যয় কোরো না।···সকলে মিলে সৃষ্টির কাজে লাগতে হবে। ···বসন্তকালের অরণ্যে সৌন্দর্য যেমন করে আত্মবিকাশ করে, তেমন করে দেশের প্রাণের বিকাশ হয়েছে, একথা তো স্বীকার করতে পারি না। ভাবের আবেগ দেখেছি, কিন্তু কর্মের প্রবর্তনা কত অল্প! আবার সেই জন্যে এই কথা আমাকে পুনরায় স্মরণ করাতে হবে।’ তাঁর স্বাস্থ্য গিয়েছে, তবু আসতে হয়েছে পুরস্কারের জন্যে নয়। ‘আমার দেশকে আপনারা জানবেন কর্মের দ্বারা, লাভ করবেন কর্মের দ্বারা, এইটি দেখে যাব— জীবনের এই অবসানকালে দেখে যাব দেশের সর্বত্র কর্মশক্তি উদ্বোধিত হয়েছে। যদি না দেখতে পাই, তবে জানব এই ভাবাবেগে সত্য নেই।’

তিনি আরও বললেন, পূর্বকালে সমস্ত দেশে গ্রামে গ্রামে প্রাচুর্য ছিল— গ্রামে গ্রামে জলাশয় ও অতিথিশালা, পল্লিতে পল্লিতে নানাবিধ উৎসব আনন্দ, শিক্ষাবিধানের ব্যবস্থা, সেই তো ছিল প্রাণের লক্ষণ। সেই জলাশয় আজ দূষিত হয় কেন? কেন সমস্ত দেশে গ্রীষ্মের রৌদ্রতপ্ত আকাশে তৃষ্ণার্তের কান্না উত্থিত হয়? কেন এত অজ্ঞান, মারী? কারণ প্রাণের সহজ স্বাভাবিক গতি রুদ্ধ হয়েছে। পল্লিতে পল্লিতে যে প্রাণের শক্তি শাখাপ্রশাখায় প্রবাহিত ছিল সেই প্রবাহ নির্জীব হয়ে গেছে, সেই জন্য ফসল ফলছে না। সেই জন্যই পল্লির প্রাণের পুনর্জীবন ঘটাতে হবে— তাঁর বিশ্বাস, তাহলেই সমস্ত সমস্যা দূর হয়ে যাবে। শরীরের নানা স্থানে যখন রোগের লক্ষণ দেখা দেয়, তখন বুঝতে হবে রক্ত দূষিত হয়েছে। 'আমাদের পরস্পরের মধ্যে বিরোধ বিদ্বেষ প্রভৃতি রোগের লক্ষণ। বাইরে থেকে স্বতন্ত্র আকারে রোগ মুক্ত করা যায় না। সমস্ত পল্লীদেহে যা কিছু দুর্গতি, দূর হয়ে যাবে প্রাণশক্তির উদ্বোধনে, এই কথাটুকু স্মরণ করিয়ে দিতে এসেছি। ···সত্যকার কাজ সভাসমিতিতে নয়। সত্যকার কাজ যেখানে দারিদ্র্য সেখানে গিয়ে, যেখানে অপমান সেখানে দাঁড়িয়ে— দেশের সকলের সঙ্গে মিলে আমাদের তার প্রতিকার করতে হবে।···আমি দেশের হয়ে আপনাদের কাছে ত্যাগের ভিক্ষা করতে এসেছি; ফিরিয়ে দেবেন না। যদি এই ত্যাগভিক্ষা না দেন, আপনাদেরই জীবন ব্যর্থ হবে — এবং এই দেশ কখনও সার্থকতা লাভ করতে পারবে না। আমি আপনাদের মনোরঞ্জন করতে আসিনি— স্তুতিবাক্যের জন্য আসিনি। স্বল্পাবশিষ্ট জীবনের বাক্য দিয়ে একথা বলছি। দেশের ভিক্ষাপাত্র ভরে' দিতে হবে প্রাণ দিয়ে, কর্মশক্তি দিয়ে, ত্যাগ দিয়ে, এই বলে আপনাদের কাছ থেকে আজ বিদায় গ্রহণ করি।'[১৩৬]

৬ ফাল্গুন [বৃহ 18 Feb] বিকেল সাড়ে চারটেয় রবীন্দ্রনাথ স্থানীয় বিদ্যাময়ী বালিকা বিদ্যালয়ে যান। 'সৌরভ' লিখেছে : 'কুমারী শান্তিপ্রভা রায় আবাহন সঙ্গীত গাইলে কুমারী কল্পনা সেন রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠে পুষ্পমাল্য প্রদান করেন এবং কুমারী সুশীলা সেন কবিতায় অভিনন্দন পাঠ করেন। অতঃপর একখানা অর্ঘ্যপাত্র, চন্দনের বাটী ও নগদ ১০১ টাকা বিশ্বভারতীর সাহায্যের জন্য তাঁহার হস্তে প্রদান করা হয়।'

এর পরে সিটি স্কুলে রবীন্দ্রনাথ ছাত্রদের উপদেশ দেন। অতঃপর সেখানে শহরের শিক্ষিতা মহিলাদের একটি সভা হয়। 'কবি সম্রাট তথায় সমাগত হইলে একটী বরণ সঙ্গীত গীত হয়। শ্রীমতী নীহারবালা বসু বিশ্বভারতীর সাহায্য কল্পে কবিবরের হস্তে রৌপ্য থালায় পুষ্প চন্দন ও দুর্ব্বার সহিত ১১২ টাকা মূল্যের স্বর্ণ মুদ্রা প্রদান করেন।' প্রথম দুটি সভায় রবীন্দ্রনাথের ভাষণের মর্ম রক্ষিত হয়নি, কিন্তু মহিলা সমিতির অভিনন্দনের প্রত্যুত্তরে রবীন্দ্রনাথের ভাষণ আনন্দবাজার পত্রিকা-য় [১০ ফাল্গুন] সংক্ষেপে ও ফাল্গুন-সংখ্যা 'সৌরভ'-এ বিস্তৃত আকারে মুদ্রিত হয় [পৃ ৩৩-৩৪]। রবীন্দ্রনাথ বলেন, মেয়েদের এই অভিনন্দনকে তিনি অত্যন্ত সত্য বলে অনুভব করছেন, কারণ সব মঙ্গলকর্ম মেয়েদের দ্বারাই সম্পন্ন হয়। মাতৃভাষার যে বাণী তা মেয়েদের কাছে যেমন সত্য হয়ে পৌঁছয় এমন আর কোথাও নয়। পুরুষেরা যখন অন্যমনস্ক তখন মেয়েরা হৃদয়ের সমস্ত প্রীতি দিয়ে তাঁর কবিতা ও গানকে গ্রহণ করেছেন এর জন্য তিনি কৃতজ্ঞ। এতদিন বাংলার মেয়েরা তাদের নিকটাত্মীয়দের বরণ করে নিয়েছেন— তাদের শোকতাপে সান্ত্বনা দিয়েছেন; কিন্তু আজ সমস্ত পৃথিবী অতিথিরূপে দ্বারে এসেছে, তার সম্মানের ভার মেয়েরা যদি না নেন তাহলে অতিথি সৎকার হয় না, অভিসম্পাত লাগে। মেয়েদের সামনে আজ বিশ্বের কর্তব্য দাঁড়িয়ে বলছে 'অয়মহং ভোঃ', আমি এসেছি, অন্যমনস্ক না থেকে সেবার জন্য প্রস্তুত হয়ে এসো— যেখানে দারিদ্র্য, যেখানে রোগশোক, যেখানে অভাব, সেখানে তোমাদের সেবার হস্ত প্রসারিত করে দাও।

আমাদের পল্লীতে পল্লীতে আনন্দের উৎসব ছিল। আজ নিরন্ন দেশের ক্রন্দন তোমাদের দ্বারেও এসে পৌঁছেছে, কেবল পুরুষদের কাছে নয়। এতকাল আমাদের দেশে পুরুষেরাই কাজ করে এসেছে, এখন মেয়েদেরও তার সঙ্গে যোগ দিতে হবে, নইলে তা সম্পূর্ণ হবে না। দুই হাত একত্রিত হলে তবেই অঞ্জলি দেওয়া যায়; এতকাল আমরা এক হাতে অঞ্জলি দিয়ে বর চাইতে গিয়েছিলাম, কিন্তু সেই আধখানা কাজের ভাঙা পাত্রে যা সঞ্চিত হচ্ছে তা পড়ে যাচ্ছে— দেবতাকে যা দেওয়া হয়েছে তাও যেমন স্খলিত হয়েছে, বিধাতা যে বর দিয়েছেন তাও গ্রহণ করা যায়নি। 'আজ দুই হাত জোড় করে দাঁড়াবার সময় হয়েছে। দুই হাত জুড়ে অঞ্জলি রচনা করতে হবে, তা হলে আসবে তাঁর আশীর্বাদ— তাঁর বর। দুই হাত জোড় করে অর্ঘ্য দেব, তিনি দ্বিগুণ করে ফিরিয়ে দেবেন— আমাদের ত্যাগ, আমাদের প্রাণ, আমাদের সম্পদ। যদি না পারি— বারে বারে ব্যর্থ হয়ে যাবে। সকল মহাদেশ সকল মহাজাতি তার বড় বড় যে চেষ্টা তা মেয়ে পুরুষে মিলে করেছে। আমাদের দেশে সেই মহামুহূর্ত আসুক সমস্ত শুভকার্যের মঙ্গল হুলুধ্বনি মেয়েদের মুখে বাজুক, তার বরমাল্য তার অর্ঘ্য মেয়েরা তৈরি করুক।'

আঠারবাড়ি-র জমিদারপুত্র প্রমোদচন্দ্র রায়চৌধুরী একসময়ে শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রমে পড়াশোনা করেছিলেন, এখন তিনিই সেখানকার জমিদার। তাঁরই আমন্ত্রণে রবীন্দ্রনাথ ৭ ফাল্গুন [শুক্র 19 Feb] প্রত্যুষে ময়মনসিংহ ত্যাগ করে সেখানে উপস্থিত হন। আনন্দবাজার পত্রিকা-য় [১০ ফাল্গুন] লেখা হয়েছে :

আঠারবাড়ী ষ্টেশনে এবং রাজবাড়ীতে স্থানীয় জনসাধারণ এবং আঠারবাড়ীর কুমার কবিকে বিপুলভাবে অভিনন্দিত করেন। কবিকে ভক্তি অর্ঘ্য প্রদান করিবার নিমিত্ত হাজার হাজার লোক ষ্টেশনে সমবেত হইয়াছিল। আঠারবাড়ী ষ্টেটের তরফ হইতে কুমার ম্যানেজার এবং ষ্টেটের কর্মচারীগণ, ময়মনসিংহের উকীল সভার প্রেসিডেন্ট বাবু দীননাথ চৌধুরী প্রভৃতি ষ্টেশনে উপস্থিত ছিলেন। ট্রেণ ষ্টেশনে পৌঁছিলে শঙ্খধ্বনি হয়, এবং বোমা ফাটান হয়। তখন বিপুল জনমণ্ডলী 'রবীন্দ্রনাথ কি জয়' ধ্বনি করিতে করিতে ট্রেণের দিকে ছুটিয়া যায়। হস্তী, অশ্ব, ব্যাণ্ড, পতাকা-বাহী ভলান্টিয়ারদিগকে লইয়া একটি বিরাট মিছিল করিয়া রবীন্দ্রনাথকে নূতন প্রাসাদে লইয়া যাওয়া হয়। রবীন্দ্রনাথ সোনার চাবি দিয়া রাজবাড়ীর প্রাসাদের দ্বারোদঘাটন করেন। আঠারবাড়ীর জনসাধারণ এবং প্রমোদ লাইব্রেরীর সদস্যগণ তাঁহাকে অভিনন্দন-পত্রের দ্বারা সংবর্দ্ধিত করেন। আহারের পর রবীন্দ্রনাথ কিছুকাল বিশ্রাম করেন। তাহার পর অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ তাঁহার সহিত দেখাসাক্ষাৎ করেন। রবীন্দ্রনাথকে গাজীর গান শুনান হয়।"[১৩৭]

অতঃপর দুপুর তিনটের ট্রেনে তিনি সঙ্গীদের নিয়ে কুমিল্লার উদ্দেশে রওনা হন।

রবীন্দ্রনাথ সদলবলে ৭ ফাল্গুন [শুক্র 19 Feb] রাত্রে কুমিল্লা স্টেশনে পৌঁছন। পথে প্রত্যেক স্টেশনে অজস্র লোক তাঁকে দর্শন করার জন্য উপস্থিত ছিলেন। কিশোরগঞ্জ স্টেশনে প্রায় দশ হাজার লোক সমবেত হয়ে রবীন্দ্রনাথের জয়ধ্বনি করতে থাকে। তাঁদের অনুরোধে তিনি গাড়ি থেকে নেমে জনতার উদ্দেশে কয়েকটি কথা বলেন। তিনি বলেন, বহুদিন ধরেই তিনি বলে আসছেন— নিজেদের দেশকে উদ্ধার করতে হলে পল্লিতে পল্লিতে প্রাণ সঞ্চার করতে হবে; গ্রামে গ্রামে বিচিত্র কল্যাণকর্মের অনুষ্ঠান সৃষ্টি করতে হবে; সকল সম্প্রদায়ের লোক যাতে প্রীতির বন্ধনে ঐক্যবদ্ধ হয়ে পরস্পরের সহযোগিতায় কল্যাণকর্ম গড়ে তুলতে পারে, এই জন্য তিনি সকলকে অনুরোধ করেন। জনতা প্রতি স্টেশনে মাল্য ও পুষ্প দিয়ে তাঁকে অভিনন্দিত করেছিল। কোনো স্টেশনে গাড়ি পৌঁছলে গ্রামের অধিবাসীরা শঙ্খ, ঘণ্টা ও বাদ্য সহকারে তাকে অভ্যর্থনা করতে এসেছিল। বহুসংখ্যক মুসলমান টুপি পরে নানা বর্ণের পতাকা বহন করে রবীন্দ্রনাথকে দেখতে এসে 'রবীন্দ্রনাথের জয়' ও 'আল্লা হো আকবর' ধ্বনিতে স্টেশন মুখরিত করে তোলে।[১৩৮]

রবীন্দ্রনাথ আগেই নিষেধ করেছিলেন বলে কুমিল্লা স্টেশনে অধিক জনতার ভিড় হয়নি। তবে শহরের নেতৃস্থানীয় অনেকে সেখানে উপস্থিত ছিলেন। ত্রিপুরা রাজ্যের আমন্ত্রণে রবীন্দ্রনাথ সেখানে যাওয়ার পথে কুমিল্লায় এসেছিলেন। ত্রিপুরার তৎকালীন মহারাজা নাবালক, একটি মন্ত্রিপরিষদ তখন সেখানকার রাজকার্য পরিচালনা করে। তাঁদেরই হয়ে অন্যতম মন্ত্রী কুমার ব্রজেন্দ্রকিশোর দেববর্মা রবীন্দ্রনাথকে ত্রিপুরায় আসার জন্য আমন্ত্রণ জানান। প্রথমে ঠিক ছিল ত্রিপুরার দ্বারপথে অবস্থিত কুমিল্লার রাজভবনে রবীন্দ্রনাথ আতিথ্য গ্রহণ করবেন, কিন্তু আনন্দবাজার পত্রিকা-য় লেখা হয়েছে : 'ত্রিপুরার মহারাজা এখানে না থাকাতে রবীন্দ্রনাথ অভয় আশ্রমে অবস্থান করিতেছেন।'[১৩৯] অভয় আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা ডাঃ সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় [1887-1961] আশ্রমের তৃতীয় বার্ষিক উৎসবে রবীন্দ্রনাথকে সভাপতিত্ব করার জন্য অনুরোধ করেছিলেন, তিনি সেই আমন্ত্রণ গ্রহণ করেন। আশ্রমের নবনির্মিত হাসপাতাল গৃহে তাঁর থাকার ব্যবস্থা করা হয়।

৮ ফাল্গুন [শনি 20 Feb] সকালে আশ্রমে উপাসনার পরে আশ্রমিকরা রবীন্দ্রনাথকে একটি অভিনন্দনপত্র দ্বারা সংবর্ধিত করেন। প্রত্যুত্তরে তিনি বলেন : 'মানুষ যে পরিমাণ তাঁহার সৃষ্টিতে আপনাকে উৎসর্গ করিতে সক্ষম হয়, তাহার সৃষ্টিও ততটা সুন্দর হইয়া উঠে। এ দেশে আমাদের প্রচেষ্টা এত ব্যর্থ হয়, ইহার কারণ কি? আর কিছুই নহে, যে সব কাজ আমাদের প্রিয়, আমরা তাহাতে সমগ্রভাবে আত্মবিনিয়োগ করিতে পারি না। আমাদের চেষ্টায় প্রবল প্রাণশক্তি থাকে না, কাজেই আমাদের ব্যর্থতা ঘটে। এই আশ্রমের কর্ম্মীদের কর্মতৎপরতার সম্বন্ধে আমার প্রত্যক্ষ জ্ঞান ছিল না; কিন্তু আমি তাঁহাদের কর্ম্মনিষ্ঠা উপলব্ধি করিয়াছিলাম। এই কর্ম্মীদিগের আন্তরিক ত্যাগ এবং সেই নিষ্ঠার প্রতি আমার শ্রদ্ধা নিবেদন করিবার জন্যই আমি এখানে আসিয়াছি। ...ত্যাগই তাঁহাদের সম্বল। এই ত্যাগ এবং নিষ্ঠার প্রভাবেই চারিদিকের এই শূন্যতাকে দিগন্তব্যাপী এই অন্ধকারকে আপনারা প্রাচুর্য্য স্বাস্থ্য এবং আনন্দে উজ্জ্বল করিতে সক্ষম হইয়াছেন। ...কোন দেশে জন্মিলেই সে দেশ আপনার হয় না, নিজের জীবনের সাধনা দিয়াই দেশকে আপনার করা যায়। ...বাহির হইতে হঠাৎ কোন একদিন আমরা স্বরাজ লাভ করিব,— এমন স্বপ্নে আমরা যেন বিভোর না থাকি। সেবার প্রভাবে আমরা আমাদের দেশের সর্ব্বত্র আত্মচেতনা যতটা অনুস্যূত করিতে পারিব, স্বরাজ ততটা আমাদের করায়ত্ত হইবে।'[১৪০] অভয় আশ্রমের বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে চরকা, খেলা ইত্যাদি বিভিন্ন প্রতিযোগিতার আয়োজন ছিল। খেলার পর হরদয়াল নাগের সভাপতিত্বে শিক্ষায়তনের বার্ষিক অধিবেশন হয়। এই সময়ে রবীন্দ্রনাথ পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে খদ্দর প্রদর্শনী পরিদর্শন করেন। সন্ধ্যার পর সুধীরকুমার করের লেখা 'শহিদ' নাটকের অভিনয় রবীন্দ্রনাথ অনেকক্ষণ দেখেছিলেন।

21 Feb [রবি ৯ ফাল্গুন] সকালে শহরের অনেকে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করেন। দুপুর দুটোয় 'কুমিল্লার নারীবৃন্দ' কাপড়ের উপরে বাংলায় ছাপা একটি অভিনন্দনপত্র তাঁকে প্রদান করেন। বিকেলে অভয় আশ্রমের তৃতীয় বার্ষিক অধিবেশনে রবীন্দ্রনাথ সভাপতিত্ব করেন। তাঁর ভাষণে তিনি বলেন, হৃদযন্ত্রের দুর্বলতা দেখা দেওয়ায় চিকিৎসকগণ তাঁকে কাজ করতে নিষেধ করেছেন। কিন্তু তাঁর বিধাতার নির্দেশ হল, কর্মকে না এড়িয়ে কাজ সমাধা করেই তাঁকে ছুটি নিতে হবে— তাই তিনি পূর্ববঙ্গে এসেছেন। পূর্ব্ববঙ্গের লোক নিষ্ঠাবান, দৃঢ়সংকল্প, সরলচিত্ত— তাঁরা বুদ্ধির অহংকারে বিদ্রুপ করে বড়ো কথাকে তুচ্ছ করেন না, তাই পূর্ববঙ্গ বাংলাদেশের অন্যতম কর্মক্ষেত্র, যার একটি রূপ অভয়াশ্রমে প্রত্যক্ষ করে তাঁর মনে আশার অঙ্কুরোদগম

হয়েছে। মানবদেহে হৃৎপিণ্ডের মতো এই প্রতিষ্ঠানগুলিই দেশের মর্মস্থান, যেখান থেকে পল্লিসমূহে প্রাণ সঞ্চারিত হবে। একদিন তিনি ঘোষণা করেছিলেন, পল্লির মধ্যে প্রাণের ঐক্যই মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করবে— তার জন্য চেষ্টা শুরু করেও তাঁর সংকল্প অনেক দুঃখের আঘাত পেয়েছিল। সেইজন্যই যদি তিনি দেখতে পান তাঁর সেই সংকল্প কোথাও কোনো জায়গায় আকার ধারণ করেছে তখন তাঁর আনন্দ হয়— এখানে সেই আনন্দ তিনি লাভ করেছেন। বাল্যকাল থেকে সমগ্রতার রূপই তাঁর আরাধ্য, খণ্ডতা তাঁর কাছে বড়ো নয়। 'মানুষের সর্বতোমুখী শক্তিকে আজ আহ্বান করতে হবে। জ্ঞানতপস্বী জ্ঞানের, কর্মী কর্মের, ভাবুক ভাবের তপস্যা করছে। আমাদের দেশেও তপস্যা বিস্তৃত হোক, বহুধা হোক। নানা তপস্যা জাগ্রত হোক। সংকীর্ণ সীমায় চৈতন্যকে বদ্ধ করলে সিদ্ধ হবে না। মানবধর্মের মধ্যে বৈচিত্র্য বহুধা শক্তির স্থান আছে। অস্বীকার করলে মনুষ্যত্বের মূলে কুঠারাঘাত করা হবে। সমগ্রতার, পরিপূর্ণতার উপাসক আমি। আপনাদের কর্ম যেন সমগ্রতাকে বাদ না দেয়।'[১৪১]

'কুমিল্লার অভয়াশ্রমে প্রদত্ত অভিভাষণ "ভারতী"তে প্রকাশের জন্য কবিকর্তৃক প্রেরিত' টীকা-সহ ভাষণটি 'একের সাধনা' নামে বৈশাখ ১৩৩৩-সংখ্যা ভারতী-তে [পৃ ১৬৭-৭২] মুদ্রিত হয়। রচনাটি দুটি ভাগে বিভক্ত, উপরোক্ত ভাষণটি সেখানে ১-সংখ্যায় চিহ্নিত হয়েছে।

এইদিন সন্ধ্যার পর ডাঃ সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা 'শ্রীগৌরাঙ্গ' নাটক অভিনীত হয়। 'কবিবর নিজে শেষ পর্য্যন্ত উপস্থিত থাকিয়া সকলকে উৎসাহিত করেন।'

22 Feb [সোম ১০ ফাল্গুন] প্রাতে উপাসনার পরে রবীন্দ্রনাথ একটি ভাষণ দেন, এটি 'অভয় আশ্রমে রবীন্দ্রনাথের তৃতীয় বক্তৃতা' নামে ৩-৪ চৈত্র-সংখ্যা আনন্দবাজার পত্রিকা-য় মুদ্রিত হয় [দ্র রবীন্দ্র-প্রসঙ্গ ১। ৪৮২-৮৫]। 'স্বাভাবিকী জ্ঞান বলক্রিয়া চ' মন্ত্রের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে প্রধানত একটি দার্শনিক বক্তৃতার শেষে রবীন্দ্রনাথ প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের শিক্ষাদর্শের পার্থক্য বিষয়ে যা বলেছেন, সেটি মূল্যবান। তিনি বলেন, শান্তিনিকেতনের অদূরে কেন্দুলিতে প্রতি বৎসর 'জয়দেব মেলা' হয়— কবিকে স্মরণে রাখার এটিই সহজতম উপায়, যা অন্য-কোনো দেশে নেই। আমাদের দেশের যে প্রণালী, তাতে প্রেসিডেন্ট নেই, সেক্রেটারি নেই, ধনভাণ্ডার নেই। বছরের পর বছর লক্ষ লক্ষ লোক এসে তাঁকে স্মরণ করছে, গান করছে, আনন্দ করছে। এই যে mass education এটা সমাজ শরীরের স্বাভাবিক ক্রিয়া। এতে স্কুল নেই, ক্লাস নেই, ভাইসচ্যান্সেলার নেই। এই শিক্ষা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে লোকমনকে উর্বর করেছে, আমাদের দেশের নিরক্ষর লোকের মধ্যেও একটা শিক্ষার ধারা বর্ষিত হয়ে তাদের চিত্তকে সরল, কোমল, সরস করে তুলেছে। তিনি বললেন :

আমাদের দেশের চাষীরা সারাদিন চাষ করে রাত ১১টা পর্যন্ত আঙিনায় কীর্তন করছে। অন্য দেশে এ সময়ে তারা public house-এ যায়, মদের দোকানে যায়, উম্মত্ততার মধ্যে মুক্তিকে খোঁজে। আমাদের দেশে দীর্ঘকাল ধরে তাদের উপর শিক্ষার যে ধারা বর্ষণ হয়েছে, তাতে সহজেই তারা কর্মের গ্লানি থেকে চিত্তকে মুক্ত করতে পারে। সে শিক্ষা কত স্বাভাবিক শিক্ষা। আমাদের দেশে যে নিরক্ষর সেও তত্ত্বজ্ঞানের অধিকারী। চাষীকেও যদি তত্ত্বকথা বলি তবে সে ধৈর্যের সঙ্গে শোনে। আমি একখানে দেখেছি চাষীরা রাত দুপুর পর্যন্ত যোগী-গান গাইল। তার মধ্যে এমন অনেক কথা আছে, যা বুঝতে বাস্তবিক কষ্ট হয়। মুসলমান চাষী-প্রজা তারা রাতদুপুর পর্যন্ত সে গান শুনলে। কারণ তারা জানে, সবটুকু বুঝলেও যতটুকু বুঝি তাতে ফল আছে— আনন্দ আছে।···আমাদের দেশের ইউনিভার্সিটি ভাটপাড়া। যিনি শিক্ষালাভ করছেন তিনিই দান করছেন। তখন ছাত্রেরা গুরুকে অন্বেষণ করেছেন— এইটেই স্বাভাবিক। ···আধুনিক ব্যবস্থার স্রোতে এগুলো ভেঙে ফেললে অন্য কিছু গড়ে তুলতে পারব না। যেমন সহস্র বছর ধরে এই শক্তি স্বাভাবিক প্রাণের ক্রিয়া দ্বারা গ্রামে অন্ন, বিদ্যা, ধর্ম দিয়েছে তেমনি আজও করুক। সেই পদ্ধতিতে বাধাযুক্ত করে তাতে প্রাণ সঞ্চার করতে হবে। অন্য দেশের প্রণালীতে দেশকে গড়ে তুলব না, দেশ যেমন ছিল তেমনি ভাবে তাকে সার্থক করে তুলতে হবে। আমাদের দেশে যাত্রাগান একটা স্বাভাবিক আনন্দের উপায়। য়ুরোপে সমস্তই গুরুভার; Theatre, Stage, এ সব ভারি জিনিস, যেখানে সেখানে নিয়ে ঘুরে বেড়ান যায় না। আমাদের সারেঙ্গি একতারা একেবারে লোকের কাছে উপস্থিত হয়। এই ভারবিহীন আত্মপ্রকাশকে প্রাণবান করে তুলতে

হবে, আজকের এই সর্বপ্রধান কর্ম। নিজেদের ভিতর শক্তি স্বাভাবিকী হোক— স্বাভাবিক প্রকাশের নূতন শক্তি নিয়ে বর্তমান কালের উপযোগী পথে চালিত করি। দেশের যে প্রাচীন রূপ ছিল, সেই রূপকেই জাগ্রত করতে হবে।[১৪২]

—এই ভাষণটি ভারতী-তে মুদ্রিত 'একের সাধনা' প্রবন্ধে ২-সংখ্যায় চিহ্নিত হয়।

সংবাদপত্রে জানানো হয়েছে, রবীন্দ্রনাথ বেলা বারোটার সময়ে স্থানীয় নেতা অখিলচন্দ্র দত্ত [1869-1950?] ও ইন্দুভূষণ দত্তের বাড়িতে যান। অতঃপর তিনি প্রসিদ্ধ হোমিয়োপ্যাথি ঔষধ-ব্যবসায়ী মহেশচন্দ্র ভট্টাচার্যের [১২৬৫-১৩৫০] মাতার স্মৃতিরক্ষার্থে প্রতিষ্ঠিত রামমালা ছাত্রাবাস পরিদর্শন করেন। সেখানে তাঁকে কবিতায় লেখা একটি অভিনন্দনপত্র দেওয়া হয়। তিনি ভিক্টোরিয়া কলেজও পরিদর্শন করেন। সন্ধ্যার পরে তিনি মহেশ-প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত একটি সভায় ভাষণ দেন। সর্বত্রই তিনি অভয় আশ্রমের কর্মীদের ত্যাগ ও কার্যের প্রশংসা করেন।

কুমিল্লা থেকে রাত্রের গাড়িতে রওনা হয়ে রাত্রি দশটা নাগাদ রবীন্দ্রনাথ সদলে ত্রিপুরার রাজধানী আগরতলায় সপ্তম ও শেষবারের জন্য আগমন করেন। নাবালক রাজার অনুপস্থিতিতে রাজকুমার ব্রজেন্দ্রকিশোর দেববর্মার আমন্ত্রণে তাঁর এই আগমন। এবারে তিনি অবস্থান করলেন কুঞ্জবন প্রাসাদে। হরিদাস ভট্টাচার্য 'আগরতলায় রবীন্দ্রনাথ' প্রবন্ধে লিখেছেন : '১০ই ফাল্গুন, রাত্রি প্রায় দশ ঘটিকার সময় বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ কুঞ্জবন-প্রাসাদে পদার্পণ করেন। দেখিয়া তাঁহাকে অত্যন্ত ক্লান্ত ও অবসন্ন বোধ হইল। রাস্তা হইতে সিঁড়ি ভাঙ্গিয়া প্রাসাদের দরজায় আসিতে রীতিমত পরিশ্রম বোধ করিয়াছেন বলিয়া অনুমান করিলাম। সমবেত ভাইস্ প্রেসিডেন্ট বাহাদুর ও চিফ্ সেক্রেটারী মহোদয় প্রভৃতির সহিত সাদর সম্ভাষণান্তর আহারে বসিয়া তিনি রাজ-পরিবারের সকলের কুশল প্রশ্নাদি করিলেন। ···আহারের পর অধিক রাত্রি হইয়া যাওয়ায়, কবি সকলের নিকট বিদায় গ্রহণ করিলেন। বলা বাহুল্য যে, আখাউড়া হইতে আরম্ভ করিয়া মহারাজকুমার ব্রজেন্দ্রকিশোর ও রণবীরকিশোর আহারের পর কবির বিদায় গ্রহণ করা পর্য্যন্ত সঙ্গে সঙ্গেই ছিলেন। খুব সম্ভব সেই রাত্রি শুক্লপক্ষের দশমী তিথি ছিল।'[১৪৩]

১১ ফাল্গুন [মঙ্গল 23 Feb] সকালে চা-পানের আসরে তিনি স্বর্গত মহারাজ বীরচন্দ্র মাণিক্যের রাজোচিত বিনয় ও সৌজন্যের স্মৃতিচারণ করেন। এইদিন রবীন্দ্রনাথের জন্য সম্পূর্ণ বিশ্রামের ব্যবস্থা ছিল। বিকেলে ব্রজেন্দ্রকিশোর তাঁকে মোটরগাড়িতে শহরের কিয়দংশ ঘুরিয়ে আনেন।

১১ ফাল্গুন রবীন্দ্রনাথ 'দোলে প্রেমের দোলনচাঁপা' গানটি রচনা করেন দ্র গীতবিতান ২। ৫০৩; স্বর ৫; চৈত্র-সংখ্যা সবুজপত্র-তে [পৃ ৫৭০] গানটি 'দোল-পূর্ণিমায়' শিরোনামে মুদ্রিত হয়। গান-রচনার পটভূমিকাটি পাওয়া যায় পরের দিনে অমিয় চক্রবর্তীকে লেখা চিঠিতে : 'আমি নিরতিশয় ক্লান্ত হয়ে আছি। এখানে এসে কতকটা বিশ্রাম ভোগ করতে পারচি। বসন্তে এখানে বনশ্রী যৌবনে প্রফুল্ল হয়ে উঠেচে— আমার ঘরের বাতায়নের কোণটি থেকে তার দিকে চেয়ে আছি।'[১৪৪]

১২ ফাল্গুন [বুধ 24 Feb] সকালে উমাকান্ত একাডেমি হলে মহারাজকুমার ব্রজেন্দ্রকিশোরের সভাপতিত্বে স্থানীয় 'কিশোর সাহিত্য সমাজ' কবিসংবর্ধনার আয়োজন করে। ব্রজেন্দ্রকিশোর বলেন, অকৃতী হয়েও তিনি কবির স্নেহকোমল প্রাণের স্পর্শ পেয়ে কৃতার্থ হয়েছেন— তাঁর জীবনে এমন দিন গেছে যখন রবীন্দ্রনাথের বাণীই তাঁকে সত্য ও ন্যায়ের পথ দেখিয়ে দিয়েছে। 'তাঁহার উপদেশপূর্ণ পত্রগুলি আমার অমূল্য সম্পদ! আমার মনে যখন কোনওপ্রকার দুঃখ অথবা নৈরাশ্য আসিয়া দেখা দেয়, আমি সেই পুরাতন পত্রগুলি বাহির

করিয়া একটির পর একটি পাঠ করিয়া যাই, আমার মনের কালিমা দূর হইয়া যায়।'[১৪৫] এর পরে বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শীতলচন্দ্র চক্রবর্তী 'রবীন্দ্র-প্রশস্তি' করেন। কিশোর সাহিত্য সমাজের পক্ষ থেকে রেশমি কাপড়ে ছাপা একটি অভিনন্দনপত্র দেওয়া হলে রবীন্দ্রনাথ ত্রিপুরা রাজপরিবারের সঙ্গে তাঁর দীর্ঘকালীন সম্পর্কের বিবরণ দিয়ে বলেন : 'এই উপলক্ষে ত্রিপুরার রাজগণের প্রতি আমার বিশেষ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করতে ইচ্ছা করি। আমি বিশবৎসরের ঊর্ধ্বকাল শান্তিনিকেতনে বিদ্যায়তন স্থাপন করেছি। সুদীর্ঘকাল পর্যন্ত আমাদের দেশের লোকের মধ্যে একমাত্র রাধাকিশোর মাণিক্যের কাছ থেকে আমি নিয়মিত আনুকূল্য পেয়েছি। তিনি স্বয়ং আমাদের আশ্রমে আতিথ্য গ্রহণ করে আমাদের আনন্দিত ও সম্মানিত করেছেন। সে সময় আমার এই প্রতিষ্ঠান দৈন্য-পীড়িত ও অধিকাংশের অপরিজ্ঞাত ছিল। অথচ তখনই রাধাকিশোর কেবল যে বার্ষিক অর্থদানের দ্বারা এই শুভকর্মের সাহায্য করেছিলেন তা নয়, ত্রিপুরার অনেক বালককে ছাত্রবৃত্তি দিয়ে শান্তিনিকেতনে বিদ্যাশিক্ষার জন্য পাঠিয়েছিলেন। তাঁর পুত্র বীরেন্দ্রমাণিক্যও যে কেবলমাত্র এই দানকে শেষ পর্যন্ত রক্ষা করেছিলেন তা নয়, সেখানকার হাসপাতাল নির্মাণ করতে পাঁচ হাজার টাকা দান করেছিলেন এবং আরো পাঁচ হাজার টাকা দিতে স্বীকার করে গিয়েছিলেন। আমার কর্মের প্রতি প্রথম থেকেই তাঁদের এই শ্রদ্ধার স্মৃতি আমার পক্ষে একান্ত সমাদরের সামগ্রী।'[১৪৬]

রবীন্দ্রনাথ এইদিন ভিক্টোরিয়া ওকাম্পো ও এল্‌ম্‌হার্স্টকে দুটি চিঠি লেখেন, দুটিতেই আসন্ন ইতালি সফরের প্রসঙ্গ আছে। ভিক্টোরিয়াকে লেখেন : 'I am tired, and I wish I had nothing else to do but squander away my hours in this spring time in spinning dreams and weaving verses.'[১৪৭]

১৩ ফাল্গুন [বৃহ 25 Feb]-এর বিবরণে হরিদাস ভট্টাচার্য লিখেছেন :

…প্রাতে 'রাজমালা' সম্পাদক কালীপ্রসন্নবাবু মহারাজকুমার ব্রজেন্দ্রকিশোর সহ কবির সহিত কুঞ্জবনে দেখা করিতে যান। কালীপ্রসন্নবাবু তাঁহার লিখিত পাণ্ডুলিপি ও মুদ্রিত রাজমালার কতগুলি ফর্ম্মা ও 'গীত-চন্দ্রোদয়' নামক অপ্রকাশিত বৈষ্ণব-পদাবলী গ্রন্থ সঙ্গে লইয়া গিয়াছিলেন। কবি রাজমালা সম্পাদকের লিখন ও সম্পাদন প্রণালী আলোচনা করিয়া বড়ই প্রীত হইয়া সানুকূল মন্তব্য প্রকাশ করিলেন। এইভাবেই যত সত্বর হয় পুস্তকখানা মুদ্রিত হওয়া আবশ্যক বলিয়া বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিলেন। 'গীতচন্দ্রোদয়ে'র পাণ্ডুলিপিখানা লইয়া কবি প্রথমেই হস্তাক্ষরের বিশেষ প্রশংসা করিয়াছিলেন এবং কাব্যরসের মাধুর্য্যে মুগ্ধ হইয়া বলিয়াছিলেন, এই পুস্তকখানা অতিসত্বরই যাহাতে স্থানীয় 'কিশোর' সাহিত্য সমাজ প্রকাশ করেন, তদ্বিষয়ে সচেষ্ট হওয়া কর্তব্য। পুস্তকখানা যাহাতে পরহস্তগত না হয় তদ্বিষয়েও সাবধানতা অবলম্বন করিতে বারম্বার বলিলেন। সেদিন বিকালে কবি প্রতাপগড় কৃষিক্ষেত্র (দি টিপারা হিল্ ডেভেলপমেন্ট কোং লিমিটেডের বাগান) দেখিতে যান। সেখানে তাঁহার ও সমবেত ভদ্রমণ্ডলীর জন্য সামান্য জলযোগের ব্যবস্থা ছিল। বাগানটি দেখিয়া তিনি বড়ই আনন্দিত হন। চাষ-আবাদ সম্বন্ধে তিনি নিজে বড়ই উৎসাহী। জমিতে রস সংরক্ষণ সম্বন্ধে তিনি নিজে যে experiment করিয়াছেন, তাহা ভদ্রচাষীদের পক্ষে বিশেষ উপকারে আসিবে। জমিতে একহাত পরিমাণ গর্ত্ত করিয়া জমির সমুদয় মাটি একস্থানে জমা করিয়া রাখিয়া সমস্ত জমিটাকে খুব দুরমুশ করিয়া দিতে হইবে। তারপর জমা-করা মাটি সারের সহিত মিশ্রিত করিয়া জমিতে ছড়াইয়া দিবে। ইহাতে শীত বা গ্রীষ্ম, কোন ঋতুতেই জমিতে রসের অভাব হইবে না। প্রত্যেক বর্ষার পরই মাটি আলগা করিয়া দিতে হইবে।

তখন বেশ মেঘ ঘনাইয়া আকাশটা কালো হইয়া আসিতেছিল। তিনি এই দৃশ্য দেখিয়া আনন্দে অধীর হইয়াছিলেন। সেই সময়, তিনি মহারাজকুমার ব্রজেন্দ্রকিশোরকে বলিতেছিলেন, "আমার নাম বদলাইয়া তোমরা এখানে আমাকে একখানা কুটীর বাঁধিয়া দাও। জীবনের শেষকয়টা দিন প্রকৃতির এই অপূর্ব্ব দৃশ্য দেখিয়াই অতিবাহিত করিব।"[১৪৮]

সেদিন সন্ধ্যায় ব্রজেন্দ্রকিশোরের বাড়িতে রবীন্দ্রনাথকে মণিপুরের মেয়েদের রাসলীলা নৃত্য দেখানো হয়। রবীন্দ্রজীবনী-কার লিখেছেন : 'কবি এই নৃত্য দেখিয়া এতই মুগ্ধ হইলেন যে, এই নৃত্য প্রবর্তনার জন্য নবকুমার সিংহ নামে এক মণিপুরী শিক্ষককে শান্তিনিকেতনের জন্য নিযুক্ত করার ব্যবস্থা করিয়া আসিলেন।'[১৪৯] তথ্যটি ঠিক নয়, রবীন্দ্রনাথের অনুরোধে ব্রজেন্দ্রকিশোর নবকুমার ও তাঁর ভাই বৈকুণ্ঠনাথকে

আগেই শান্তিনিকেতনে পাঠিয়ে দেন, ক্যাশবহিতে 'নৃত্য শিক্ষকদের বেতন শোধ দঃ ৫ই নবেম্বর মা° নবকুমার সিং ৫২ মা° বৈকুণ্ঠ সিং ২৬ ' হিসাব থেকে জানা যায়, তাঁরা 5 Nov 1925 [১৯ কার্তিক] কাজে যোগ দেন। নাবালক রাজা বীরবিক্রমকিশোর মাণিক্য এতদিন রাজধানীতে ছিলেন না— এই সান্ধ্যসম্মিলনেই রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ ও আলাপ হয়েছিল। 'ধ্বংসমুখে পতিত ত্রিপুরার প্রাচীন কীর্তিগুলি সংরক্ষণ করার জন্য রবীন্দ্রনাথ মহারাজকে বিশেষভাবে অনুরোধ করেন।'

১৪ ফাল্গুন [শুক্র 26 Feb] দুপুরে রবীন্দ্রনাথ আগরতলা ত্যাগ করে কলকাতা রওনা হন। পথে তিনি চাঁদপুরে জনসাধারণের অনুরোধে যাত্রাবিরতি ঘটাতে বাধ্য হন। আনন্দবাজার পত্রিকা ১৮ ফাল্গুন সংবাদ প্রকাশ করে :

রবীন্দ্রনাথ চাঁদপুরবাসীগণ কর্ত্তৃক পুনঃ পুনঃ অনুরুদ্ধ হইয়া তাহাদের প্রাণের আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করিবার জন্য কুমিল্লা হইতে কলিকাতা অভিমুখে প্রত্যাগমন করিবার সময় গত শুক্রবার পথিমধ্যে কিয়ৎকালের নিমিত্ত চাঁদপুরে অবস্থান করিয়াছিলেন। শহরের বহু গণ্যমান্য লোক রবীন্দ্রনাথের সাদর অভ্যর্থনার জন্য ষ্টেশনে উপস্থিত ছিলেন। তিনি গাড়ী হইতে অবতরণ করিয়া তথাকার খ্যাতনামা উকীল শ্রীযুক্ত ভগবানচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের দ্বিতল অট্টালিকায় ক্ষণকাল বিশ্রামকরত কিঞ্চিৎ জলযোগ করিয়া সভাস্থলে উপস্থিত হন। তাঁহার আগমন উপলক্ষে নীরদপার্ক পত্রপুষ্পে সুশোভিত হইয়াছিল। জাতি-নির্বিশেষে বহু নরনারী রবীন্দ্রনাথের দর্শন মানসে জড় হইয়াছিলেন। কবি সুললিত বঙ্গভাষায় এক প্রাণস্পর্শী নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা দ্বারা শ্রোতৃবৃন্দের বিপুল আনন্দ বর্দ্ধন করিয়াছিলেন। বুভুক্ষিত ভিখারীকে মুষ্টিমেয় অন্নদান, মৃত্যুমুখ রোগীর পরিচর্য্যা, অভাবগ্রস্ত ব্যক্তির সহায়তা প্রভৃতি দেশহিতকর কার্য্যে ব্রতী হইয়া ধ্বংসোন্মুখ পল্লী গ্রামগুলিকে রক্ষা করাই প্রকৃত দেশের সেবা করা বলিয়া তিনি সর্ব্বজন সমক্ষে বিদিত করিয়াছেন। ···শনিবার প্রত্যুষের ষ্টীমারে রবীন্দ্রনাথ চাঁদপুর ত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন।[১৫০]

ঢাকা যাওয়ার পথে রবীন্দ্রনাথ নারায়ণগঞ্জ হয়েই গিয়েছিলেন, কিন্তু এখানে কোনো বক্তৃতাদি করেননি। প্রত্যাবর্তন-পথে সেখানকার ছাত্রসঙ্ঘের অনুরোধে তাঁকে একটি অভিনন্দনপত্র গ্রহণ ও প্রত্যুত্তর দিতে হল। রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত ছাত্রসঙেঘর অভিনন্দনপত্রের তারিখ ১৫ ফাল্গুন [শনি 27 Feb], কিন্তু ২২ ফাল্গুন আনন্দবাজার-এ মুদ্রিত [দ্র রবীন্দ্র-প্রসঙ্গ ১। ৪৮৬-৮৭] তাঁর ভাষণের সারমর্মের সূচনায় লেখা হয়েছে, 'রবীন্দ্রনাথ ২৮শে ফেব্রুয়ারী নারায়ণগঞ্জ ছাত্রসঙ্ঘের প্রদত্ত মান-পত্রের উত্তরে' বক্তৃতা করেন। সম্ভবত প্রথম তারিখটিই সঠিক।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর ভাষণে বলেন, কথা নয়, কাজের মধ্য দিয়েই দেশের বিচিত্র সমস্যার সমাধান করতে হবে। বাংলাদেশে বিদ্যাশিক্ষার উদ্দেশ্যই ছিল চাকুরিপ্রাপ্তি, সৌভাগ্যক্রমে তার সুযোগ সংকীর্ণ হওয়ায় শিক্ষিত যুবকেরা স্বাধীন উপায়ে জীবিকার্জনে সচেষ্ট হয়েছে। রাষ্ট্রনীতি-চর্চাতেও পরিবর্তন এসেছে। আগে মনে হত, রাষ্ট্রীয় সমিতিতে বাক্যব্যয় করেই দেশলক্ষ্মীর বর পাওয়া যাবে। অনেক ব্যর্থতার পর দেশবাসী বুঝেছে ভিক্ষার উপর নির্ভর করে রাষ্ট্রীয় উন্নতি হবে না। বাক্যের ব্যর্থতা উপলব্ধি করে এখন লক্ষ্য গিয়েছে কর্মের দিকে। কিন্তু অনভ্যাসবশত এখনও তাতে মন নিবিষ্ট হয়নি। রবীন্দ্রনাথ বলেন, পূর্ববঙ্গের সঙ্গে তাঁর প্রথম পরিচয় শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের মধ্য দিয়ে। প্রথমদিকে সেখানকার অধিকাংশ ছাত্রই ছিল পূর্ববঙ্গের— চরিত্রের দৃঢ়তা, কর্তব্যনিষ্ঠা ও সরলতা প্রভৃতি যে গুণগুলি থাকলে কর্ম সফল হয় তাদের মধ্যে সেই গুণ ছিল। এবারও নানা অনুষ্ঠান দেখে তাঁর মনে হয়েছে, পূর্ববঙ্গ কর্মীসংগ্রহের স্থান— এঁরা যে কর্মে প্রবৃত্ত হবেন, নিষ্ঠা ও সরলতা দ্বারা তাতে সফলতা লাভ করবেন। তাঁর বয়স থাকলে এখানেই তিনি কাজে প্রবৃত্ত হতেন— এখানকার ভূমি যেমন উর্বর, মানুষের চিত্তশক্তিও তেমনি উর্বর— কিন্তু নূতন কর্মক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হওয়ার শক্তি তার নেই। পশ্চিমবঙ্গের একপ্রান্তে বীরভূম তাঁর কর্মক্ষেত্র, সেখানকার ভূমি অনুর্বর, দারিদ্র্য ও ব্যাধি-ক্লিষ্ট

অধিবাসীদের মনও কতকটা উদ্যমহীন। এই প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে কর্মীগণ যে অভিজ্ঞতা লাভ করবেন তা পাকা হবে, তাই সেখানকার কাজেরও একটা বড়ো সার্থকতা আছে। কিন্তু এখানকার অনুকূল ক্ষেত্রে যদি পল্লিসেবার ব্রত গৃহীত হয় তবে তা সহজেই সফল হবে। কুমিল্লার অভয় আশ্রমের কাজ দেখে তিনি মুগ্ধ হয়েছেন। অশুদ্ধজাতি বলে সমাজে যাদের অবজ্ঞা করা হয়, তাঁরা তাদের প্রকাশ্যভাবে গ্রহণ করে সাহসের পরিচয় দিয়েছেন। এই ব্যবধানই আমাদের দেশের ঐক্যপথকে বিরোধ ও ভেদবুদ্ধিতে কণ্টকিত করে রেখেছে — যারা দেশের যথার্থ শক্তির ভিত্তি তাদেরই আমরা ভেদের দ্বারা দুর্বল করে রেখেছি। বিপদে যারা আমাদের রক্ষক, অন্ন উৎপাদন দ্বারা যারা আমাদের পালক, তাদের আত্মসম্মানকে আমরা নষ্ট করে দিয়েছি। এদের মধ্যে আত্মসম্মান জাগাতে চেষ্টা করে অভয় আশ্রমের কর্মীরা বিশেষ সাহসের পরিচয় দিয়েছেন। পূর্ববঙ্গের ছাত্রদের এই দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে কাজে প্রবৃত্ত হওয়ার আহ্বান জানিয়ে রবীন্দ্রনাথ তাঁর বক্তব্য শেষ করেন।

১৫ ফাল্গুন দোলপূর্ণিমার দিন রবীন্দ্রনাথ একটি গান রচনা করেন- 'ফাগুনের নবীন আনন্দে' দ্র গীত ২। ৫২৪; স্বর ৫। রবীন্দ্রজীবনী-কার লিখেছেন : '১৫ ফাল্গুন কলিকাতায় সুশোভন সরকার ও রেবা মহলানবিশের (প্রশান্তচন্দ্রের ভগ্নী) বিবাহের দিন। রবীন্দ্রনাথ আগরতলা হইতে পূর্বাহ্ণেই ঐ তারিখ দিয়া গান দুইটি লিখিয়া পাঠাইয়া দেন।'[১৫১] কিন্তু দ্বিতীয় গানটির তারিখ পাণ্ডুলিপিতেই [Ms. 27] পাওয়া যায়, সুতরাং সেইদিনই বিবাহানুষ্ঠানে পাঠানোর সম্ভাবনা অল্প।

রবীন্দ্রনাথ সম্ভবত 28 Feb-1 Mar [১৬-১৭ ফাল্গুন] কলকাতায় পৌঁছে আলিপুর অবজারভেটরিতে প্রশান্তচন্দ্রের কোয়ার্টারে ওঠেন। কিছুদিনের মধ্যেই তিনি খুব অসুস্থ হয়ে পড়েন, ফলে দীর্ঘকাল কলকাতায় তাঁকে চিকিৎসাধীনে থাকতে হয়েছিল— তিনি শান্তিনিকেতনে ফেরেন ১১ চৈত্র [25 Mar] তারিখে।

অধ্যাপক কার্লো ফর্মিকি মাত্র তিন মাসের জন্য অতিথি অধ্যাপক হিসেবে শান্তিনিকেতনে এসেছিলেন। 3 Mar [বুধ ১৯ ফাল্গুন] উত্তরায়ণে বিশ্বভারতীর অধ্যাপক ও ছাত্রদের পক্ষ থেকে তাঁকে বিদায়-সংবর্ধনা জানানো হয়। এই উপলক্ষে ছাত্ররা সংস্কৃত 'মুদ্রারাক্ষস' নাটকের কয়েকটি অঙ্ক অভিনয় করেন। অধ্যাপক তুচ্চি অবশ্য এখানেই থেকে যান। কলকাতাতেও 9 Mar [মঙ্গল ২৫ ফাল্গুন] 'বিচিত্রা' গৃহে ফর্মিকিকে বিদায় জানানো হয়। এই উপলক্ষে 'আচার্য্য কার্লো ফর্ম্মিকি মহাশয়ের / বিদায়-সভা। / বিচিত্রা-মন্দির— জোড়াসাঁকো। / ২৫শে ফাল্গুন, ১৩৩২ সাল।' শিরোনামে 'মঙ্গল-গীতি', 'অর্ঘ্য', 'নমস্কার ও প্রার্থনা' ও 'শান্তিবাচন' হিসাবে চারটি সংস্কৃত শ্লোক বঙ্গানুবাদ-সহ ছাপিয়ে উপস্থিত ব্যক্তিদের মধ্যে বিতরণ করা হয়। রবীন্দ্রনাথের বিদায়-সম্ভাষণও একটি পুস্তিকার আকারে মুদ্রিত হয়— 'Visva-Bharati Farewell Address/ to Professor Carlo Formichi/ by/ Rabindranath Tagore/ (Founder President)/ Calcutta,/ March 9th, 1926'. বিশ্বভারতী কোয়ার্টার্লি-র Apr 1926 [Vol. IV, No. 1]/ 91-93-সংখ্যায় ভাষণটি 'Farewell Address to Professor Carlo Formichi' নামে মুদ্রিত হয়; দ্র *EWRT* 3/ 769-71. রবীন্দ্রনাথ বলেন : 'The happy time of our meeting in Santiniketan, in the atmosphere of rich leisure and peaceful cooperation, has at last come to an end, and your departure from our midst draws near. The very few weeks that you have been able to give us contain in them a full harvest of friendship that in the normal course of things would require the sunshine of a lifetime to mature.' ভারতবিদ্যার ফর্মিকির অধিকার ও এখানকার সহকর্মীদের সঙ্গে তাঁর অন্তরঙ্গতার প্রশংসা করে

রবীন্দ্রনাথ তাঁর সঙ্গে আনীত বিরাট ইতালিয়ান গ্রন্থসম্ভার সম্পর্কে বলেন : 'Your arrival in our *ashrama* was accompanied by the gift of an Italian library from your country, surprising in its magnificence.... This library has been a generous invitation to our people by your country to the feast of soul in that guest-house of hers which is open to all time and to all humanity.' ফর্মিকির প্রাক্তন ছাত্র ইতালি সরকারের কাছ থেকে ঋণস্বরূপ পাওয়া অধ্যাপক তুচ্চিকে তাঁর প্রতিনিধি হিসাবে রেখে যাওয়াকেও তিনি স্বাগত জানান।

প্রবাসী-তে [চৈত্র। ৯০৩-০৪] লেখা হয়েছে : 'উত্তরে আচার্য্য ফর্ম্মিকি সাশ্রুনেত্রে ও বাষ্পভারাক্রান্ত কণ্ঠে ভারতবর্ষের প্রতি, বিশ্বভারতীর প্রতি, এবং কবির প্রতি নিজের শ্রদ্ধা ও প্রীতি, জ্ঞাপন করেন। তাঁহাকে বিশ্বভারতী ও কবি যে প্রীতি ও সম্মান দেখাইয়াছেন, এবং কবি যাহা বলিয়াছেন, তাহা তাঁহার স্বর্গগতা জননী শুনুন ও তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করুন, ইহা বলিতে গিয়া তাঁহার কণ্ঠরোধ হইয়া যায়। … অতঃপর কবি তাঁহাকে নিজের গ্রন্থ ও অন্যান্য দ্রব্য উপহার দেন।'

পরের দিন ২৬ ফাল্গুন [বুধ 10 Mar] ফর্মিকি কলকাতা ত্যাগ করে স্বদেশযাত্রা করেন। তাঁর হাত দিয়ে রবীন্দ্রনাথ মুসোলিনির উদ্দেশে একটি দীর্ঘ কৃতজ্ঞতাজ্ঞাপক পত্র প্রেরণ করেন :

On the eve of the departure of Professor Carlo Formichi, may I be allowed to send you through him our message of deep and cordial appreciation of what Italy has contributed to the growth of Visva-bharati? Professor Formichi came with a rich gift of a library of Italian Classics and of books on art, the value of which will be gratefully inscribed in the memory of successive generations of our students. Prof. Formichi's own stay at Santiniketan has been fruitful not only in the formation of lasting bonds of co-operation between him and the scholars who worked with him in his subject, but also in the creation of intimate links of friendship with others who happened to come into his contact.

We are very thankful, too, that Prof. Giusseppe Tucci did at last come to Santiniketan and introduce our students of Italian language and literature. Prof. Tucci's brilliant versatility of talents has made him an invaluable colleague of those of our scholars who pursue studies in Buddhism through Tibetan and Chinese texts. Visva-bharati scholars recognise with feelings of gratitude the help he has rendered them and earnestly hope that his services may be available to them for a number of years to come. I am confident that in the duration of Professor Giusseppe Tucci's stay here be to a sufficient long period of years, we shall be able to consolidate the work which he has begun with admirable energy and the fruits of which promise to be of great mutual benefit in the history of cultural relations between Italy and India.[১৫২]

এইদিন ২৬ ফাল্গুন অজিতকুমার চক্রবর্তীর কন্যা অমিতার সঙ্গে অরুণেন্দ্রনাথের পুত্র অজীন্দ্রনাথের বিবাহ হয়। পরিবারের বর্তমান জ্যেষ্ঠ পুরুষ হিসেবে নিমন্ত্রণপত্রে রবীন্দ্রনাথের নামই ছাপা হয়েছিল। চৈত্র-সংখ্যা তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা-য় [পৃ ৩৭২] লিখিত হয় : 'বিগত ২৬শে ফাল্গুন বুধবার গোধূলিলগ্নে শ্রীযুক্ত অরুণেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের একমাত্র পুত্র শ্রীমান্ অজীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহিত পরলোকগত সাহিত্যিক ৺অজিতকুমার চক্রবর্ত্তীর জ্যেষ্ঠা কন্যা কল্যাণীয়া শ্রীমতী অমিতা দেবীর শুভ বিবাহ সম্পন্ন হইয়াছে। পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বেদী গ্রহণ করিয়াছিলেন।'

২১ ফাল্গুন [শুক্র 5 Mar] রবীন্দ্রনাথ 'নববধূ' ['বসন্তের দূতী তুমি, ফাগুনের কুসুম উৎসবে'] কবিতাটি রচনা করেন কলকাতায় থাকার সময়ে [দ্র ভারতী, চৈত্র। ৪৬৭], সম্ভবত অমিতা ও অজীন্দ্রনাথের বিবাহোপলক্ষে কবিতাটি রচিত। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় 'গীতবিতান কালানুক্রমিক সূচী'তে [পৃ ২৮৫] রচনাটি সম্পর্কে অদ্ভুত কিছু তথ্য পরিবেশন করেছেন : 'রচনা ১১ ফাল্গুন ১৩৩২ [২৩ ফেব্রুয়ারি ১৯২৬] আগরতলা। রমেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের কন্যার বিবাহ উপলক্ষে রচিত। 'রবি' পত্রে রচনার তারিখ ১৮ ফাল্গুন ১৩৩২ [২ মার্চ ১৯২৬]; 'রবি' ত্রিপুরা রাজ্যের ত্রৈমাসিক পত্র, পৃ. ৩৮০।' রমেশচন্দ্র তাঁর কন্যার বিবাহোপলক্ষে কবিতাটি লেখা হয়েছিল নিজে এমন দাবি কোথাও করেননি, তিনি লিখেছেন, তাঁর দ্বিতীয়া কন্যা সুজাতার বিয়ের সময়ে রবীন্দ্রনাথের আশীর্বাদবাণী প্রার্থনা করলে তিনি ২৮ বৈশাখ ১৩৪৫ 'আজি তোমাদের শুভ পরিণয় রাতে' কবিতাটি লিখে পাঠান।[১৫৩] ২ চৈত্র রবীন্দ্রনাথ ব্রজেন্দ্রকিশোরকে লেখেন :'তোমাদের পত্রিকার জন্য গান পাঠাই'– এই গানটিই 'বসন্তের দূতী তুমি' পাঠে 'রবি' পত্রিকাতে ১৮ ফাল্গুন তারিখ দিয়ে ছাপা হয়। ভারতী-তে একই পাঠের তারিখ ২১ ফাল্গুন।

এর পরেই দীর্ঘ পূর্ববঙ্গ ভ্রমণ ও অজস্র ভাষণ রবীন্দ্রনাথের শরীরের উপর প্রতিশোধ গ্রহণ করতে শুরু করল। তাঁকে পরীক্ষা করে 17 Mar [বুধ ৩ চৈত্র] ডাঃ নীলরতন সরকার লেখেন : 'আপনার শরীরের বর্ত্তমান অবস্থা পরীক্ষা করিয়া আমার ধারণা হইয়াছে যে, এখন কিছুদিনের জন্য আপনার সকল প্রকার শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রমের কার্য্য পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য। পুনঃ পুনঃ অতিরিক্ত শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রমের অবশ্যম্ভাবী ক্লান্তি ও অবসাদ হইতে অল্প সময়ের মধ্যে মুক্তিলাভ করিবার শক্তি এখন আপনার নাই। এজন্য সমস্ত পরিশ্রমই আপনার পক্ষে বর্জ্জনীয়।' বিশ্বভারতীর কর্মসচিব প্রশান্তচন্দ্র পত্রটি সংবাদপত্রে পাঠিয়ে অনুরোধ করেন : 'বন্ধু বান্ধব ও সাধারণের অবগতির জন্য নীলরতন বাবুর নির্দ্দেশ আপনার পত্রিকায় প্রকাশ করিলে বাধিত হইব।' পরের দিন বিজ্ঞপ্তিটি বিভিন্ন সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়।

এরপর প্রায় প্রতিদিনই সংবাদপত্রে রবীন্দ্রনাথের স্বাস্থ্য-সংক্রান্ত বুলেটিন ছাপা হয়েছে। 21 Mar [রবি ৭ চৈত্র] তাঁর চিত্তরঞ্জন সেবাসদন হাসপাতাল উদ্বোধনের কথা ছিল, কিন্তু তাঁর অসুস্থতার জন্য অনুষ্ঠানটি স্থগিত রাখা হয়। ৯ চৈত্র আনন্দবাজার পত্রিকা-য় 'রবীন্দ্রনাথের স্বাস্থ্য' শিরোনামে জানানো হয়েছে : 'গতকল্য সংবাদ লইয়া জানা গেল যে, রবীন্দ্রনাথের স্বাস্থ্য ক্রমেই উন্নতিলাভ করিতেছে। সুতরাং চিন্তার কোনই কারণ নাই। তবে এখনও তিনি নিতান্ত দুর্ব্বল আছেন। কাহারও সহিত সাক্ষাৎ করার মতো অবস্থা এখনও তাঁহার হয় নাই।'[১৫৪]

কিন্তু সম্ভবত পরের দিনই [১০ চৈত্র] তিনি গিরিজাপতি ভট্টাচার্যকে লেখেন : 'অত্যন্ত ক্লান্ত। কাল ভোরে শান্তিনিকেতনে পালাচ্ছি। যদি সময় পাও ১লা বৈশাখে তোমরা যেয়ো।'[১৫৫] এর পরের দিন ১১ চৈত্র [বৃহ 25

Mar] ক্যাশবহিতে ‘শ্রীযুক্ত কর্ত্তাবাবুমহাশয় দিগরের কলিকাতা হইতে বোলপুর আগমন’-এর হিসাব পাওয়া যায়।

শান্তিনিকেতনে গিয়েই তিনি নানাবিধ কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। নীহাররঞ্জন রায় চৈত্র-সংখ্যা প্রবাসী-র ‘পুস্তক পরিচয়’-এ [পৃ ৭৯৭-৮০২] ‘পূরবী’ কাব্যগ্রন্থের বিস্তৃত রসগ্রাহী পর্যালোচনা করেন, রবীন্দ্রনাথ সেটি পড়ে খুশি হয়ে ১২ চৈত্র তাঁকে লিখেছেন : ‘তুমি পূরবীর মর্ম্মকথাটি ঠিক ধরতে পেরেচ। যা অনেকের পক্ষে দুর্গম তা তোমার কাছে সহজে ধরা দিয়েচে এতে আমি বিস্মিত হয়েচি। / আমার শরীর ক্লান্ত, তাই নড়াচড়া বন্ধ, কাজকর্ম্মও যথাসম্ভব কমিয়ে দিয়েচি।’[১৫৬] কিন্তু একই দিনে প্রশান্তচন্দ্রকে লেখা চিঠিটির বক্তব্য কিঞ্চিৎ অন্যরকম। বিশ্বভারতীর কাজ কলকাতা ও শান্তিনিকেতনে দ্বিধাবিভক্ত হওয়ার ফলে সমন্বয়ের অসুবিধা নিয়ে রবীন্দ্রনাথ বহুবার সোচ্চার হয়েছেন— তিনি চাইতেন সমস্ত কাজ, এমন-কি গ্রন্থমুদ্রণও, শান্তিনিকেতনেই হোক যাতে তিনি সরাসরি দেখাশোনা করতে পারেন। বর্তমান পত্রটিতে বিভিন্ন উদাহরণ-সহযোগে এই কথাটিই জোর দিয়ে বলা হয়েছে :

জর্ম্মান কন্সল জেনেরাল Bakeকে বলেছে যে Prussian Academy থেকে আমাদের নামে বই এসেছে কিন্তু Custom duty দিয়ে কে যে খালাস করে নেবে তার কোনো ব্যবস্থা হচ্চে না। কাকে প্রশ্ন করব তা জানিনে, আমরা দুই নৌকোয় পা দিয়ে আছি। Sten Konowর সাতখানা রেজেস্ট্রি চিঠি কর্নোওয়ালিশ স্ট্রীটের আপিসে এখান থেকে রি-ডাইরেক্টেড হয়ে গিয়েছিল তার একখানাও Konow পান নি, …এই রকম করে দু জায়গায় দুই ছিদ্র রেখে কি ভালো হচ্চে?

বসুমতীতে সেই দুখানা বক্তৃতার কি গতি হল। দ্বিতীয় বক্তৃতার প্রুফ পাইনি— হয়ত দেবেও না কিন্তু ফাইল পেলে এখানে ছাপতে দিতে পারি।

রথীকে শোধবোধের কপি দিয়েছিলুম, ছাপতে দিয়েচে কি? ঋতু উৎসবের খানিকটা ছাপা হয়েছিল এখন পণ্ডিতের হাতে পড়লে তার উদ্ধার হবে না। এখানে ১লা বৈশাখে “বসন্ত” কিম্বা কিছু একটা করবার ইচ্ছা ছিল, বইটা হাতে থাকলে হয়ে যেত। যদি একসঙ্গে পাঁচ ছয় ফর্মার second proof আমাকে পাঠাও আমি একদিনে ঠিক করে দেখে ফেরৎ পাঠাতে পারি।…

এখামে শরীরটা অপেক্ষাকৃত ভালই আছে। …সেই ডায়ারির প্রথম খসড়াগুলো পেলে মিলিয়ে দেখতে পারি।[১৫৭]

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের বহুকাল পরে পূর্ববঙ্গ সফরের সময়ে রবীন্দ্রনাথ জাতির উদ্দেশে নূতন কর্মসূচি ঘোষণা করেছিলেন বিভিন্ন বক্তৃতার মাধ্যমে— উৎসুক সহৃদয় শ্রোতা পেয়ে তাঁর বলতেও ভালো লাগছিল, তাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকটি অনুষ্ঠান ছাড়া অস্বাস্থ্যের অভিযোগে ভাষণ দেবার প্রায় কোনো সুযোগই তিনি ত্যাগ করেননি। বক্তৃতাগুলি সম্পর্কে তাঁর যথেষ্ট দুর্বলতা ছিল, তাই সংবাদপত্রে প্রকাশিত অনেকগুলি ভাষণের অসম্পূর্ণতা তিনি নিজে সংস্কার করে প্রবাসী, ভারতী, সবুজপত্র, শান্তিনিকেতন প্রভৃতি পত্রিকাতে প্রকাশের জন্য প্রেরণ করেছেন। এগুলিকে গ্রন্থাকারে বের করার ইচ্ছাও তাঁর ছিল, তাই কলকাতায় থাকার সময়ে চৈত্রের কোনো তারিখে তিনি শান্তা দেবীকে লিখেছিলেন : ‘ঢাকায় যে বক্তৃতা দিয়েছিলুম তারই একটা তোমাদের দেব ঠিক করেছিলুম। কিন্তু সেগুলো খবরের কাগজে একবার মোটামুটি বেরিয়ে গেছে। তার পরে আবার বই আকারে সেগুলো ছাপা আরম্ভ হয়েছে— প্রবাসী বেরিয়ে যাবার যথেষ্ট আগেই ছাপা হয়ে যাবে।’[১৫৮] প্রশান্তচন্দ্রকে লেখা চিঠিটিতেও এই প্রসঙ্গ আছে, কিন্তু বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়ের কর্মতৎপরতার কারণে বইটি কোনোদিনই প্রকাশিত হয়নি। চৈত্র-সংখ্যা সবুজপত্র, প্রবাসী-র চৈত্র ১৩৩২ ও বৈশাখ ১৩৩৩-সংখ্যায় রবীন্দ্রনাথের দ্বারা পুনর্লিখিত ঢাকা ও ময়মনসিংহে প্রদত্ত পাঁচটি বক্তৃতা মুদ্রিত হয়। ‘ঋতুউৎসব’ ও ‘শোধবোধ’ প্রকাশ পায় ১৩৩৩ সালে।

28 Mar [১৪ চৈত্র] লর্ড সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ তাঁর প্রতিশ্রুত দশ হাজার টাকার বাকি পাঁচ হাজার টাকার চেক পাঠিয়ে রবীন্দ্রনাথকে অনুরোধ করেন, 'রাইপুরটি যেন শ্রীনিকেতনের একটি শাখাস্বরূপ গণ্য হয়। খরচপত্র আমিই দিব।' তিনি 13 Apr য়ুরোপের উদ্দেশে রওনা হন। মুসোলিনির সঙ্গে দেখা করার উদ্দেশ্যে রবীন্দ্রনাথের কাছে একটি পরিচয়পত্র প্রার্থনা করলে তিনি পরের দিনই মুসোলিনির উদ্দেশে তাঁকে লিখে পাঠান: 'Our distinguished countryman Lord Sinha is starting for a tour in Europe and will be very glad to call on you during his stay in Rome. I feel sure you will be pleased to receive him, for, besides being a great lawyer and a great administrator, he is a very well-informed personality of singular modesty and charm,'[১৫৯]

ভাদ্র ১৩৩২-এ 'শেষ বর্ষণ' অভিনীত হওয়ার পরে অসুস্থতা প্রভৃতি কারণে রবীন্দ্রনাথ গান লিখেছেন অনেক কম পরিমাণে। অগ্রহায়ণ ১৩৩২-এ 'প্রবাহিনী' প্রকাশিত হয়, কিন্তু এতে মুদ্রিত গানগুলি আগেই লেখা। ফাল্গুন মাসে আগরতলায় কুঞ্জবন প্রাসাদে থাকার সময়ে বসন্তের স্পর্শে রবীন্দ্র-রচনায় গানের আবির্ভাব ঘটেছিল, শান্তিনিকেতনে এসে তা স্রোতে পরিণত হল। রমা মজুমদারকে [কর] উপহার দেওয়া ডায়ারির [Ms. 464] পৃষ্ঠাগুলি তখন ফুরিয়ে যাওয়ার মুখে। এখানে 'শেষ বর্ষণ'-এর গান 'এসো নীপবনে ছায়াবীথিতলে'-র পরে আর মাত্র ১২টি গান ও একটি কবিতা লিখিত হয়। সেগুলির তালিকাটি এইরূপ :

'জানি নে ও কে গো অমল আকাশে'

'যাব, যাব, যাব তবে' ['যেতে যদি হয় হবে'] দ্র গীত ১। ২৪১; স্বর ২

'কে বলে যাও যাও' দ্র গীত ২। ৩৩৮-৩৯; স্বর ২

'মত্ত[চৈত্র] পবনে মম চিত্ত বনে' দ্র গীত ২। ১০৪; স্বর ৩১

'মন রে ওরে মন' দ্র গীত ১। ২১৮-১৯; স্বর ১

'কালো মেঘের ঘটা ঘনায় রে' দ্র গীত ৩। ৯০১; স্বরলিপি নেই।

'সকালবেলার কুঁড়ি আমার' দ্র গীত ২। ৫৫৩-৫৪; স্বর ৩

'ওগো জলের রাণী' দ্র গীত ৩। ৯০১; স্বর ৫৬; কার্তিক-পৌষ-সংখ্যা ভারতী-তে [পৃ ২০১] গানটি 'জলের রাণী' শিরোনামে 'কবি একখানি নূতন নাটক লিখিতেছেন, ইহা তাহার আরম্ভের প্রস্তাবনাগীতি' টীকা-সহ মুদ্রিত হলেও সেই সময়ে অত্যন্ত অনিয়মিত-প্রচার পত্রিকাটি মাঘ মাসের আগে প্রকাশিত হয়নি [ফাল্গুন-সংখ্যা প্রবাসী-র 'কষ্টিপাথর'-এ উদ্ধৃত]। গীতবিতান ৩-এর 'গ্রন্থপরিচয়'-এ [পৃ ১০০৮] জানানো হয়েছে : 'কবি 'দালিয়া' ছোটো গল্পের আখ্যান লইয়া নাটক রচনা করার সংকল্প করিয়াছিলেন শুনা যায়; ইহা তাহারই প্রস্তাবনা-গীত।'

'আপনহারা মাতোয়ারা' দ্র গীত ৩। ৯০০; স্বর ৬০

'এসো আমার ঘরে এসো' দ্র গীত ২। ২৯৭; স্বর ৩১

'সে যে মনের মানুষ কেন তারে' দ্র গীত ১। ২১৫-১৬; স্বর ৩

'বনে যদি ফুটল কুসুম' দ্র স্বর ২। ৩৭৪; স্বর ৩১

'যখন আমি উর্ব্বশীরে করেছিলেম স্তব' দ্র সবুজপত্র, পৌষ ১৩৩২। ৩৫০-৫১ ['নাতনীর উদ্দেশে']; নন্দিনী [পুপে]র উদ্দেশে লিখিত কৌতুক-কবিতাটি এখনও কেন কোনো গ্রন্থভুক্ত হয়নি, তার ব্যাখ্যা পাওয়া

কঠিন।

এইখানেই পাণ্ডুলিপিটি শেষ হয়েছে, ২৯ বৈশাখ ১৩৩৩ তারিখে রবীন্দ্রনাথ 'কল্যাণীয়া শ্রীমতী রমা / বীণাপাণি দিলা তাঁর বীণাখানি তোর কণ্ঠস্বরে / রমা যেন ক্ষমা করে, ঈর্ষ্যা নাহি রাখে তোর 'পরে।' লিখে তাঁকে উপহার দেন। পাণ্ডুলিপিটি এখনও তাঁর পরিবারে রক্ষিত আছে, তবে গবেষকদের সুবিধার জন্য এর একটি বাঁধানো ফোটোকপি [Ms. 464] রবীন্দ্রভবনে পাওয়া যাবে।

এই ডায়ারিটি শেষ হওয়ার পরে রবীন্দ্রনাথ 1926-এর নূতন একটি ডায়ারি পাণ্ডুলিপি হিসাবে ব্যবহার করতে থাকেন [Ms. 27]— বিদেশভ্রমণের সময়েও ডায়ারিটি তাঁর সঙ্গে ছিল, তাঁর অনেক রচনার খসড়া এর পৃষ্ঠাতেই প্রথম লিখিত হয়। এই পাণ্ডুলিপির প্রথম রচনা 'পরবাসী চলে এসো ঘরে' [দ্র গীত ২। ৫৯২ স্বর ১] ২২ মাঘ [5 Feb 1926] তারিখে কলকাতায় রচিত— প্রবাসী-র রজতজয়ন্তী-সংখ্যা বৈশাখ ১৩৩৩-এর [২৬। ১। ১] জন্য লিখিত। দীর্ঘ এই কবিতাটি ভেঙে তিনি দুটি গান রচনা করেন—'পরবাসী চলে এসো ঘরে' [দ্র গীত ২। ৫৯২; স্বর ১] ও 'এসো এসো এসো প্রাণের উৎসবে' [দ্র ঐ ২। ৬১৪; স্বর ১]। এই পাণ্ডুলিপিটির দুটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখযোগ্য; এর মধ্যে মাঝে মাঝে কয়েকটি পৃষ্ঠা ছিঁড়ে নেওয়া হয়েছে, কে ও কেন এই কাজ করেছেন জানা যায় না; দ্বিতীয়ত কোনো-কোনো রচনা অলংকৃত কাটাকুটির অন্তরালে অন্তর্হিত হয়েছে। এই পাণ্ডুলিপিতে অধিকাংশ রচনাতেই রবীন্দ্রনাথ তারিখ দেননি, অনাদিকুমার দস্তিদারের খাতা থেকে 'বৈকালী' [১৩৮১]-সম্পাদক কানাই সামন্ত ও প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় 'গীতবিতান কালানুক্রমিক সূচী' গ্রন্থে তারিখগুলি উল্লেখ করেছেন। উক্ত খাতা দেখার সুযোগ আমরা পাইনি।

এরপর কর-পাণ্ডুলিপি থেকে 'বনে যদি ফুটল কুসুম', 'এসো আমার ঘরে এসো', 'আপনহারা মাতোয়ারা' ও 'ওগো জলের রাণী' গানগুলি কপি করা হয়েছে। অষ্টম পৃষ্ঠায় লেখা হয়েছে :

১১ ফাল্গুন [মঙ্গল 23 Feb] 'দোলে প্রেমের দোলন চাঁপা' দ্র গীত ২। ৫০৩; স্বর ৫

১৫ ফাল্গুন [শনি 27 Feb] 'ফাগুনের নবীন আনন্দে' দ্র গীত ২। ৫২৪; স্বর ৫। সুশোভনচন্দ্র সরকার জানিয়েছেন, এইদিন দোলপূর্ণিমার রাত্রে রেবা মহলানবিশের সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়, 'বিবাহের দিন রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে দুটি গান এসে হাজির, তাঁর প্রিয় বাবলির উদ্দেশে আশীর্বাদ'[১৬০] — অর্থাৎ দ্বিতীয় গানটিও হয়তো ১১ ফাল্গুন তারিখেই লেখা; যাতে আগরতলা থেকে কলকাতায় পৌঁছতে পারে।

'অনন্তের বাণী [বসন্তের দূতী] তুমি'– এটির বিষয়ে আমরা পূর্বেই আলোচনা করেছি।

'তোমার বীণা আমার মনোমাঝে' দ্র গীত ১। ৭-৮; স্বর ৩। এই গানটি সম্পর্কে রানী মহলানবিশ লিখেছেন, কিছুদিন আগে আলিপুরে থাকার সময়ে একজন তরুণ পাগল-কবি তাঁকে কবিতা পড়ে শোনাতে আসে। তার সত্যকার কবিত্বশক্তি থাকলেও পাগলামির জন্য কয়েক লাইন লেখার পরেই তার সংগতি হারিয়ে যেত। রানী লিখেছেন : 'এই পাগল রবীন্দ্রনাথের মনকে এতটা নাড়া দিয়েছিল যে, খানিকক্ষণ পরে চমৎকার একটি গান লিখলেন— তোমার বীণা আমার মনোমাঝে…।'[১৬১]

১৯ পৃষ্ঠায় রবীন্দ্রনাথ একটি কবিতাকে কাটাকুটির নকশায় ঢেকে দিয়েছেন, কানাই সামন্ত অনুমান করেছেন, কবিতাটি 'আঁধারের লীলা'-র খসড়া [দ্র 'লীলা', ভারতী, বৈশাখ ১৩৩৩। ১১৭; গীত ২। ৫৮৩; স্বর নেই], ভারতী-তে মুদ্রিত রচনার তারিখ ১ বৈশাখ ১৩৩৩।

১২ চৈত্র [শুক্র 26 Mar] 'চপল তব নবীন আঁখি দুটি' দ্র গীত ২। ৩০৩; স্বর ৩; এটি একটি বড়ো কবিতার অংশমাত্র।

"নুপূর বেজে যায় রিনিরিনি' দ্র গীত ২। ৩১৩; স্বর ৩

'লিখন তোমার ধূলায় হয়েছে ধূলি' দ্র গীত ২। ৩৮২-৮৩; স্বর ৩

রানী মহলানবিশ এই গানটি রচনার পটভূমি বর্ণনা করে লিখেছেন :

যখন "লিখন তোমার ধূলায় হয়েছে ধূলি" গানটা কবির মুখে প্রথম শুনলাম, শেখাতে গিয়ে বল্লেন, "জানো এ গানটা লেখা হোলো কেমন করে? চাতালে বসে দেখলুম গ্রীষ্মের শুকনো হাওয়ায় লাল কাঁকরের রাস্তার উপর ফরফর করে একটা ছেঁড়া চিঠির টুকরো উড়ে চলেছে; ব্যাস ঐ টুকু। কেমন যেন মনের মধ্যে একটা ছবি তৈরী হয়ে উঠলো যে একদিন যে চিঠির কতো আদর ছিল আজ তা অনাদরে পথের ধূলোর উপর উড়ে চলে যাচ্ছে। এই ছবিটাতে মন উদাস হোলো বলেই সঙ্গে সঙ্গে গান আপনি তৈরী হয়ে উঠেছে।'[১৬২]

পরবর্তী গানটি থেকে অনাদিকুমার দস্তিদারের খাতার সাহায্য পাওয়া যাওয়ায় গানগুলির তারিখ নির্ধারণ করা সম্ভব হয়েছে :

১৬ চৈত্র [মঙ্গল 30 Mar] 'জানি তোমার অজানা নাহি গো' দ্র গীত ২। ৩০১-০২; স্বর ৩

১৭ চৈত্র [31 Mar] 'কি ফুল ঝরিল' দ্র ২। ৩৮২; স্বর ৩০

১৭ চৈত্র 'আমার লতার প্রথম মুকুল' দ্র গীত ২। ৩২৩-২৪; স্বর ৫

১৮ চৈত্র সকাল [1 Apr] 'কেন রে এতই যাবার ত্বরা' দ্র গীত ২। ৩৩৭; স্বর ৩

১৮ চৈত্র সকাল 'কাদার সময় অল্প ওরে' দ্র গীত। ২; স্বর ৫

১৯ চৈত্র সকাল [2 Apr] 'বিনা সাজে সাজি' দ্র গীত ২। ৩৯৮; স্বর ৩১

১৯ চৈত্র দুপুর 'কি পাই নি তারি হিসাব মিলাতে' দ্র গীত ২। ৫৬৩; স্বর ১

'সেই ভালো সেই ভালো' দ্র গীত ২। ৩৪৬; স্বর ৩

২১ চৈত্র [4 Apr] 'অনেক কথা যাও যে বলে' দ্র গীত ২। ৩২৯; স্বর ৫

'দে পড়ে দে আমায় তোরা' দ্র গীত ২। ৩০০; স্বর ৩

'পাতার ভেলা ভাসাই নীরে' দ্র গীত ১। ২২৬; স্বর ৩০

২৩ চৈত্র সকাল 'এবার এল সময় রে তোর' দ্র গীত ২। ৫০৪; স্বর ৫

২৫ চৈত্র 'শেষ বেলাকার শেষের গানে' দ্র গীত ২। ৩৩৬-৩৭; স্বর ৫

'আধেক ঘুমে নয়ন চুমে' দ্র গীত ২। ৫৮৪; স্বর ১

'এ পথে আমি যে' দ্র গীত ২। ৩৮১; স্বর ১

'আমার প্রাণে গভীর গোপন' দ্র গীত ১। ১৪১; স্বর ৩

২৭ চৈত্র [শনি 10 Apr] সকাল 'হার মানালে [গো] ভাঙিলে অভিমান' দ্র গীত ১। ২২৪; স্বর ৩

'দিন পরে যায় দিন' দ্র গীত ২। ৩৮০; স্বর ৫

'বাঁধন ছাড়ার সাধন হবে' দ্র গীত ১। ৮৪; স্বর ২।

এই পাণ্ডুলিপির সাক্ষ্যে বলা যায়, ২২ মাঘ থেকে চৈত্রের শেষ পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ অন্তত ৩২টি গান রচনা করেছেন।

অবশ্য এই সময়ে রবীন্দ্রনাথ পাণ্ডুলিপিটিতে শুধু গানই রচনা করেননি, ‘স্ফুলিঙ্গ’-জাতীয় অনেক কবিতিকা, কখনও-কখনও তাদের ইংরেজি অনুবাদ-সহ, এখানে লিখিত হয়েছে। এদের মধ্যে সংস্কৃত নীতি-কবিতার সমিল বাংলা অনুবাদও আছে, আবার নাতনি পুপের উদ্দেশে কৌতুকপূর্ণ ছড়াও রয়েছে :

প্রেয়সী মোর পুপে
তোমায় চুপে চুপে
ভালোবাসা দিয়ে গেলেম
গলার ভূষণরূপে।
কোন্‌দিনে কি জানি
খুল্‌বে হৃদয়খানি
সোনার স্মরণ দিয়ে গড়া
এই মায়া-কুলুপে। দ্র স্ফুলিঙ্গ [১৩৯৭]। ২৩২, ২২৪-সংখ্যক।

রানী মহলানবিশ একধরনের অসংক্রামক শুষ্ক যক্ষ্মারোগে ভুগতেন, ফলে জ্বরে ভোগা তাঁর পক্ষে নিত্যনৈমিত্তিক ছিল। স্বভাবতই রবীন্দ্রনাথ উদ্বিগ্ন হতেন, বিভিন্ন ঔষধের বিধান দিতেন— আর লিখতেন অজস্র সুদীর্ঘ চিঠি যা পেয়ে, রবীন্দ্রনাথ মনে করতেন, রানী শরীরের দুঃখ কিছুটা ভুলে থাকবেন। তাঁর জ্বরের খবর জেনে এইদিন গুডফ্রাইডেতে তাঁকে লিখলেন : ‘আজ এইমাত্র নুটুদের একটা নতুন গান শেখাচ্ছিলুম কিন্তু তোমার চিঠি পড়ার ব্যথা আমাকে ভিতরে ভিতরে ভারি পীড়ন করছিল, কিছুতে ঝেড়ে ফেলতে পারছিলুম না। ...আমি কতকটা ভালো আছি। কিন্তু বুকের কাছে ক্লান্তির বাসাটা ভাঙেনি। এখানে একটা বড় উৎপাত আছে। কত যে টুরিস্‌ট [য] এসে আমাকে আক্রমণ করে তার সংখ্যা নেই। শুনচি আজ এগারো জন মার্কিণ অতিথি আসবে। তাছাড়া আজ ইটালীয়ান কন্সলদের আসবার কথা আছে। তাছাড়া সুহৃদ সিংহ আজ আস্‌বে নোটিস্‌ দিয়েছে, তাছাড়া আরো অনেকগুলি ভারতবর্ষীয় এখানে ছুটি যাপন করে যাবে বলে শাসিয়ে রেখেচে।’[১৬৪]

আগে শান্তিনিকেতনে থাকলে বুধবারের উপাসনা তিনি সহজে বাদ দিতেন না, এবারে অসুস্থতার জন্য শরীরকে বিশ্রাম দিতে গিয়ে তিনি মন্দিরে যাননি, কিন্তু তার জন্যও মন পীড়িত হয়েছে : ‘বুধবারে আমি এবার বলিনি— কিন্তু মন খুঁৎ খুঁৎ করছিল— ভিতরকার পাগলটা তাড়া দেয়, ঠাণ্ডা থাকতে দেয় না। এখনো মনে হচ্চে ফাঁক দেওয়াটা ভালো হয়নি। কেননা বুধবার পরের হিতের জন্যে নয়, ওটা আমার নিজেরই গরজে। নিজের ভিতরকার কথা শুনতে পাইনে যদি কাউকে শোনাতে না বসি। এই ভিতরকার মানুষটা বাইরের মানুষটার সঙ্গে ঘর করে বটে কিন্তু তেমন চেনাশোনা নেই— সেইজন্যে তাকে চেনবার জন্যেই মাঝে মাঝে তাকে বাইরে আনতে হয়— তাতে করে অন্তত খানিকক্ষণের মতো বাইরের লোকটাকে থামিয়ে রাখা যায়।’

এর মধ্যে দিলীপকুমার রায় কয়েকবার শান্তিনিকেতনে গিয়ে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা ক’রে বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করেন। এইরূপ একটি আলোচনা ভাদ্র ১৩৩৪-সংখ্যা প্রবাসী-তে [পৃ ৬৩১-৩৯] ‘সমাজে নারীশক্তির প্রভাব’ নামে মুদ্রিত হয়। এর পরে তিনি আরও-একবার শান্তিনিকেতনে যান। জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৩-

সংখ্যা ভারতবর্ষ-তে [পৃ ৯৩৯-৪১] 'সঙ্গীত' রচনাতে তিনি স্বরচিত সুর ও স্বরলিপি-সহ 'মিশ্র তিলোককামোদ-বেহাগ ঝাঁপতাল' সুর-তালে নিবদ্ধ রবীন্দ্রনাথের 'তোমার বীণা আমার মনোমাঝে' গানটি ছাপিয়ে লেখেন :

গত ১২ই এপ্রিল [সোম ২৯ চৈত্র] তারিখে কবিবর শান্তিনিকেতনে আমাকে তাঁর এই স্বরচিত গানটিতে সুর দিতে বলেন। তার পর দিন গানটিতে এই সুরটি সংযোজিত ক'রে তানালাপ শুদ্ধ আমি তাঁকে শোনাই। বাহুল্যভয়ে বর্ত্তমান গানটিতে সে সব তানালাপের স্বরলিপি দিলাম না। কেবল এই কথা ব'লে রাখা দরকার মনে করছি যে সেরূপ তানালাপ কবির সুর সংযোজন ভঙ্গীর প্রতিকূল হওয়া সত্ত্বেও তিনি খুব খুসি হ'য়েছিলেন ও বলেছিলেন যে তাঁর যে কোনও গানে অপরে স্বরচিত সুর সংযোজন করে গাওয়া সম্পর্কে তাঁর পূর্ব্ব মতের পরিবর্ত্তন হয়েছে। অর্থাৎ এখন তাঁর মত এই যে তাঁর গানে কেউ সম্পূর্ণ নূতন সুর দিয়ে গাইলে সেটা অনুচিত হয় না। এ সূত্রে তাঁর সঙ্গে যে কথাবার্ত্তা হয়েছিল তা ভারতবর্ষে প্রকাশিত হবে।

আন্তরিক স্নেহ সত্ত্বেও তার্কিক দিলীপকুমারকে রবীন্দ্রনাথ ভয় পেতেন, আরও ভয় পেতেন তাঁর নিজের বানানো-কথা অবলীলাক্রমে রবীন্দ্রনাথের বা অপরের মুখে বসিয়ে পত্রিকায় বা গ্রন্থে প্রচার করার কুশ্রী অভ্যাসের জন্য। নইলে রবীন্দ্রনাথ নিজের গানে অপরে তানকর্তব-সহ সুর দেবেন এমন অনুরোধ কাউকে করবেন এর চেয়ে অবিশ্বাস্য কথা আর-কিছু হতে পারে না। এই দিলীপকুমারকেই তিনি 29 Mar 1925 [১৫ চৈত্র ১৩৩১] বলেছিলেন : '…তুমি কি বলতে চাও যে, আমার গান যার যেমন ইচ্ছা সে তেমনিভাবে গাইবে? আমি তো নিজের রচনাকে সেরকম ভাবে খণ্ডবিখণ্ড করতে অনুমতি দেই নি। …যে রূপসৃষ্টিতে বাহিরের লোকের হাত চালাবার পথ আছে তার এক নিয়ম, যার পথ নেই তার অন্য নিয়ম। …আমার গানে তো আমি সেরকম ফাঁক রাখি নি যে, সেটা অপরে ভরিয়ে দেওয়াতে আমি কৃতজ্ঞ হয়ে উঠব।'[১৬৪] সুতরাং একবছরের মধ্যে 'বদলে গেল মতটা' এতটা ভাবা শক্ত। দিলীপকুমারের স্বরলিপি ও উদ্ধৃত মন্তব্য প্রকাশের পর রবীন্দ্রনাথ প্রতিবাদপত্র প্রকাশ করতে পারতেন, কিন্তু তিনি তখন বিদেশে ও তার্কিক দিলীপকুমারের সঙ্গে অবান্তর তর্কে অবতীর্ণ হওয়াকে তিনি অশ্রদ্ধেয় বলেও ভাবতে পারেন! দিলীপকুমার সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের অনেক বিরূপ বক্তব্য রানী মহলানবিশকে লেখা প্রকাশিত পত্রগুচ্ছে বিন্দু-চিহ্নের আড়ালে আত্মগোপন করে আছে!

2 Apr [শুক্র ১৯ চৈত্র] কলকাতায় হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা আরম্ভ হয়। রবীন্দ্রজীবনী-কার লিখেছেন : 'কবি কলিকাতায় আছেন; জানিতে পারিলেন হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা অকস্মাৎ কলিকাতায় আরম্ভ হইয়াছে। (মার্চ ১৯২৬)। কবি স্বচক্ষে দেখিতেছেন ভীতত্রস্ত লোক প্রাণভয়ে জোড়াসাঁকোর বাটীতে আশ্রয়ের জন্য আসিতেছে।'[১৬৫] বর্ণনাটি তথ্যসম্মত নয়— রবীন্দ্রনাথ এর অনেক আগেই ১১ চৈত্র শান্তিনিকেতনে ফিরে এসেছিলেন, সুতরাং দাঙ্গার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা তাঁর পাবার কথা নয়। তবে সংবাদপত্রের মারফৎ খবর জানার কোনো অসুবিধা ছিল না।

দাঙ্গার পটভূমিকা অনেকদিন ধরেই রচিত হচ্ছিল। বর্ণহিন্দুদের অত্যাচার ও অবজ্ঞা থেকে মুক্তির জন্য নিম্নবর্ণ বা তথাকথিত অচ্ছুত হিন্দুরা বিভিন্ন সময়ে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিল, বস্তুত ভারতীয় মুসলমানদের বৃহত্তর অংশ এইশ্রেণীর ধর্মান্তরিত হিন্দু। স্বামী শ্রদ্ধানন্দের নেতৃত্বে আর্যসমাজীরা এই শ্রেণীর মুসলমানদের পুনরায় হিন্দুসমাজে ফিরিয়ে আনার জন্য উত্তর ও পশ্চিম ভারতে শুদ্ধিযজ্ঞের আয়োজন করছিলেন। স্বভাবতই মুসলিম নেতারা ব্যাপারটি পছন্দ করছিলেন না। তাছাড়া দুই সম্প্রদায়ের বিরোধের কারণ ছিল একপক্ষে গোহত্যা ও অন্যপক্ষে ধর্মীয় শোভাযাত্রায় মসজিদের সামনে বাদ্যবাদন। সরকার গোহত্যা নিষিদ্ধ

করতে পারেনি, কিন্তু মসজিদের সামনে বাদ্যাদি নিষিদ্ধ করে। এই নিষেধাজ্ঞা প্রায়শই লঙ্ঘিত হত ও দাঙ্গার কারণ ঘটাত।

চিত্তরঞ্জন দাশ বাংলায় হিন্দু-মুসলিম সংঘর্ষ এড়ানোর লক্ষ্যে স্বরাজ্যদলের পক্ষ থেকে মুসলিমদের বহু অন্যায় সুবিধা দিয়ে হিন্দু-মুসলিম প্যাক্ট স্বাক্ষর করেছিলেন, ফলে এখানে একটা আপাত-শান্তির বাতাবরণ রক্ষিত হচ্ছিল। কিন্তু তাঁর অকালপ্রয়াণের পরে সেই কৃত্রিম বন্ধন শিথিল হয়ে পড়ে। 2 Apr গুড ফ্রাইডের দিন কলকাতার অবাঙালি আর্যসমাজীরা একটি ধর্মীয় মিছিল বের করে ইচ্ছাকৃতভাবে মসজিদের সামনেও বাদ্যাদি বন্ধ করেনি, দাঙ্গার প্রত্যক্ষ কারণ এইটিই। পূর্ববাংলার বক্তৃতায় রবীন্দ্রনাথ অর্থনৈতিক উন্নতির স্বার্থে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির পক্ষে সওয়াল করেছিলেন, তার এই পরিণতি তাঁকে যথেষ্ট পীড়িত করে। 6 Apr [২৩ চৈত্র] তিনি প্রমথ চৌধুরীকে এই বিষয়ে লেখেন; 'হিন্দু মুসলমান সমস্যার কূল পাওয়া যায় না। লাঠালাঠির দ্বারা কোনো জিনিষের সমাধান হয় না। যে রীতিমত জ্ঞানশিক্ষা দ্বারা ধর্ম্মান্ধতার আরোগ্য ঘটে তা ছাড়া উপায় নেই। য়ুরোপেও এককালে এই বিপদ ছিল, তারা কেবল শিক্ষা দ্বারা মনের বিকার ঘুচিয়ে তবে উদ্ধার পেয়েছে। আমাদের ৩৩ কোটিকে তেমন শিক্ষা কবে দেবে, কে দেবে?'[১৬৬] ২৫ চৈত্র রানী মহলানবিশকে লিখলেন : 'কোথাও একটা কোনো অন্যায় উপদ্রব হলে আমার বুকের ভিতর ভারি একটা ক্ষোভ উপস্থিত হয়। এই হিন্দু মুসলমান উৎপাতে আমার শরীরটাকে ভারি পীড়ন করচে। এক এক সময় মনে হয় অবস্থা শোচনীয়তম না হলে অবস্থার পরিবর্ত্তন হয় না। মারের বীজে আমরা ধর্ম্মের নামে জল সেচন করে এসেছি, তারই ফল ফ'লে যখন মাথায় ভেঙ্গে পড়বে তখনই চিকিৎসার কথা প্রাণপণে স্মরণ করতে হবে। অতএব মারকে পালন করার চেয়ে মারকে খাওয়াই ভালো।'[১৬৭] পত্রটি শেষ করেছেন রবীন্দ্রনাথ কৌতুকের সুরে : 'পয়লা বৈশাখে তোমরা আসবে ত? না হিন্দু মুসলমানের প্রেম সম্মিলনের জন্যে অপেক্ষা করে থাকবে?'

প্রেমের আবির্ভাব হতে দেরি হয়েছিল। ১৪ বৈশাখ ১৩৩৩ [27 Apr] তারিখেও তিনি প্রমথ চৌধুরীকে লেখেন : 'শুনচি কলকাতায় আজকাল রক্ত বর্ষণ ছাড়া আর সব রকম বৃষ্টি বন্ধ— উত্তাপ ক্রমেই বেড়ে চলেচে।'[১৬৮] গোলমাল মফস্বল বাংলায় ছড়িয়ে দেবার চেষ্টাও হয়েছিল, ১৮ বৈশাখ তাঁকেই লিখেছেন : 'কয়েকদিন হল কলকাতা থেকে এখানে সাত আটশো মুসলমান গুণ্ডার সমাগম হয়েছিল। রক্তবৃষ্টির পূর্ব্বেই মেঘ গিয়েছে কেটে— সিউড়ি থেকে অবিলম্বে শস্ত্রধারী পুলিস আসাতে চাপা পড়ে গেল। রক্তমোক্ষণের পরে কলকাতার বায়ুপ্রকোপের কিছু উপশম হয়েচে শুনচি।'[১৬৯]

১৯-২১ চৈত্র [শুক্র-রবি 2-4 Apr] ঈস্টারের ছুটিতে সিউড়িতে বঙ্গীয় সাহিত্যসম্মেলনে রবীন্দ্রনাথের সভাপতিত্ব করার কথা ছিল, তিনি এই উপলক্ষে সাধুভাষায় 'সাহিত্যসম্মিলন' নামে একটি প্রবন্ধও লেখেন— কিন্তু শেষপর্যন্ত শারীরিক দুর্বলতার জন্য এবারও তাঁর সিউড়িতে যাওয়া হয়নি, তাঁর অনুপস্থিতিতে অমৃতলাল বসু সভাপতিত্ব করেন। রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধটি বৈশাখ ১৩৩৩-সংখ্যা প্রবাসী-তে [পৃ ৭০-৭৩] 'সাহিত্য-সম্মিলন' নামে প্রকাশিত হয় দ্র সাহিত্যের পথে [পরিশিষ্ট] ২৩। ৪৮২-৮৬। রবীন্দ্রনাথ লিখলেন, বাঙালি একটি সত্য বস্তু পেয়েছে, সেটি তার সাহিত্য— এটি তার নিজের সৃষ্টি, যাকে তার নূতন সৃষ্টিও বলা যায়, কারণ এটি দেশের পুরাতন সাহিত্যের অনুবৃত্তি নয়। আমাদের দেশের অধিকাংশ আচার-বিচার পুরাতনের নির্জীব পুনরাবৃত্তি, কেবল সাহিত্যই নূতন রূপ নিয়ে নূতন প্রাণে নূতন কালের সঙ্গে যোগসাধন করতে প্রবৃত্ত,

বাঙালিকে সাহিত্যই যথার্থভাবে ভিতরের দিক থেকে মানুষ করে তুলছে। 'যেখানে তাহার সমাজের আর-সমস্তই স্বাধীন পন্থার বিরোধী, যেখানে তাহার লোকাচার তাহাকে নির্বিচার অভ্যাসের দাসত্বপাশে অচল করিয়া বাঁধিয়াছে, সেখানে তাহার সাহিত্যই তাহার মনকে মুক্তি দিবার একমাত্র শক্তি।' এই অন্তরের মুক্তিই একদা তাকে বাইরেও মুক্তি দেবে। সেই মুক্তিই তার দেশের মুক্তির সত্যকার ভিত্তি। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন : 'বর্তমান কালের রাষ্ট্রিক আন্দোলনের দিনে মত্ততার তাড়নায় বাঙালি যুবকেরা যদি-বা ব্যর্থতার পথেও গিয়া থাকে, তবু আগুন যদি ভারতবর্ষের কোথাও জ্বলিয়া থাকে সে বাংলাদেশে; কোথাও যদি দলে দলে দুঃসাহসিকেরা দারুণ দুঃখের পথে আত্মহননের দিকে আগ্রহের সহিত ছুটিয়া গিয়া থাকে সে বাংলাদেশে।' বাঙালির অন্তরের মধ্যে বাংলাসাহিত্য অনেক দিন থেকে অগ্নিসঞ্চয় করছে— তার চিত্তের ভিতর চিন্তার সাহস এনেছে, তাই কর্মের মধ্যে তার নির্ভীকতা স্বভাবতই প্রকাশ পায়। শুধু রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে নয়, তার চেয়ে দুঃসাধ্য সমাজক্ষেত্রেও বাঙালিই সকলের চেয়ে কঠোর অধ্যবসায়ে মুক্তির জন্য সংগ্রাম করেছে— পরিণত বয়সে বিবাহ, বিধবাবিবাহ, অসবর্ণবিবাহ, সাম্প্রদায়িক ধর্মের বাধামোচন প্রভৃতি ব্যাপারে বাঙালিই সকলের আগে ও সকলের চেয়ে বেশি করে আপন ধর্মবুদ্ধির স্বাতন্ত্র্যকে জয়যুক্ত করতে চেয়েছে। তার চিন্তার জ্যোতির্ময় বাহন সাহিত্যই সর্বদা তাকে বল দিয়েছে। কেউ-কেউ বলেছেন, ভারতের রাষ্ট্রীয় ঐক্যের খাতিরে অন্য-কোনো ভাষাকে বাঙালির গ্রহণ করা উচিত। কিন্তু যেখানে আমাদের আত্মপ্রকাশ বাধাহীন সেখানেই আমাদের মুক্তি, বাঙালির চিত্তের আত্মপ্রকাশ বাংলাভাষাতেই— কোনো বাহ্যিক উদ্দেশ্যের খাতিরে সেই আত্মপ্রকাশের বাহনকে বর্জন করা এক-জাতীয় মূঢ়তা।

এই সময় থেকে একদল লোক আরবি-ফারসি শব্দের বহুল প্রয়োগে ইসলামি বাংলা প্রবর্তনের পক্ষে সওয়াল করছিলেন। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন : 'সম্প্রতি হিন্দুর প্রতি আড়ি করিয়া বাংলাদেশের কয়েকজন মুসলমান বাঙালি-মুসলমানের মাতৃভাষা কাড়িয়া লইতে উদ্যত হইয়াছেন। এ যেন ভায়ের প্রতি রাগ করিয়া মাতাকে তাড়াইয়া দিবার প্রস্তাব।' বাংলাদেশের শতকরা নিরানব্বই জনেরও অধিকসংখ্যক মুসলমানের ভাষা বাংলা, সেই ভাষাকে কৃত্রিমভাবে উর্দু-কণ্টকিত না করেও তাঁদের মুসলমানি সম্পূর্ণভাবে প্রকাশ হতে পারে, তৎকালীন বাংলাসাহিত্যের মুসলমান লেখকেরা প্রতিদিন তার প্রমাণ দিচ্ছেন। তাঁদের মধ্যে যাঁরা প্রতিভাশালী তাঁরা সেই ভাষাতেই অমরত্ব লাভ করবেন। নজরুলের নাম তিনি করেননি, কিন্তু অবশ্যই তাঁর কথা মনে রেখে তিনি লিখেছেন, তাঁরা বাংলাভাষাতে মুসলমানি মালমশলা বাড়িয়ে তাকে আরও জোরালো করে তুলতে পারবেন। পরিশেষে তিনি লিখেছেন :

> সাহিত্যে বাংলাদেশে যে একটি বিপুল মিলনযজ্ঞের আয়োজন হইয়াছে, যাহার বেদী আমাদের চিত্তের মধ্যে, সত্যের উপরে ভাবের উপরে যাহার প্রতিষ্ঠা, সেখানেও হিন্দু-মুসলমানকে যাঁহারা কৃত্রিম বেড়া তুলিয়া পৃথক করিয়া রাখিবার চেষ্টা করিতেছেন তাঁহারা মুসলমানেরও বন্ধু নহেন। দুই প্রতিবেশীর মধ্যে একটা স্বাভাবিক আত্মীয়তার যোগসূত্রকেও যাঁহারা ছেদন করিতে চাহেন তাঁহাদের অন্তর্যামীই জানেন, তাঁহারা ধর্মের নামে দেশের মধ্যে অধর্মকে আহ্বান করিবার পথ খনন করিতেছেন। কিন্তু, আশা করিতেছি, তাঁহাদের চেষ্টা ব্যর্থ হইবে।

রবীন্দ্রনাথকে লেখা জগদীশচন্দ্র বসুর পত্রাবলি জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৩-সংখ্যা থেকে প্রবাসী-তে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হওয়া শুরু হয়। এই পত্রাবলির জন্য রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের অনুরোধে রবীন্দ্রনাথ ২২ চৈত্র [সোম 5 Apr] 'পত্র পরিচয়' লিখে দেন দ্র প্রবাসী, জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৩। ২৫৫-৫৬; চিঠিপত্র ৬। ১২১-২৩। বিজ্ঞানসাধক জগদীশচন্দ্রের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের যোগাযোগ গড়ে উঠেছিল উভয়ের যৌবনকালে, যখন তাঁদের প্রতিভার স্ফুরণ

দেখা দিয়েছে কিন্তু তখনও উভয়ের কীর্তিসূর্য মধ্যাহ্নের দীপ্যমানতা লাভ করেনি। রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্র ছিল পৃথিবীর বহুভাষার মধ্যে প্রায়-অখ্যাত বাংলা ভাষার সাহিত্যে, কিন্তু জগদীশচন্দ্রের সাধনা ছিল দেশকালের সীমাতিক্রমী বিজ্ঞানের রহস্য উদঘাটনে— তবু তাঁরা কাছাকাছি এসেছিলেন পরাধীন দেশের আত্মস্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠার অদম্য আকাঙ্ক্ষার সূত্রে; বিশ্বসভায় জগদীশচন্দ্রের প্রতিভার স্বীকৃতি যাতে অবারিত হয়, তার জন্য রবীন্দ্রনাথ তাঁর সমস্ত শক্তি নিয়োগ করেছিলেন। 'পত্র-পরিচয়'-এ রবীন্দ্রনাথ সেই সময়ের ইতিবৃত্তটি স্মরণ করে লিখেছেন :

তখন জগদীশ যে চিঠিগুলি আমাকে লিখেছিলেন তার মধ্যে আমাদের প্রথম বন্ধুত্বের স্বত চিহ্নিত পরিচয় অঙ্কিত হয়ে আছে। সাধারণের কাছে ব্যক্তিগতভাবে তার যথোচিত মূল্য না থাকতে পারে, কিন্তু মানবমনের যে ইতিহাসে কোনো কৃত্রিমতা নেই, যা সহজ প্রবর্তনায় দিনে দিনে আপনাকে উদ্ঘাটন করেছে, মানুষের মনের কাছে তার আদর আছেই। …প্রথম বন্ধুত্বের স্মৃতি যদিচ মনে থাকে, কিন্তু তার ছবি সর্বাংশে সুস্পষ্ট হয়ে থাকে না। এই চিঠিগুলির মধ্যে সেই মন্ত্র ছড়ানো আছে যাতে করে সেই ছবি আবার আজ মনে জেগে উঠচে। সেই তাঁর ধর্মতলার বাসা থেকে আরম্ভ করে আমাদের নির্জন পদ্মাতীর পর্যন্ত বিস্তৃত বন্ধুলীলার ছবি। …আমার জীবনে প্রথম বন্ধুত্ব জগদীশের সঙ্গে।…আমার বন্ধুর মধ্যে আলো দেখেছিলুম। আমি গর্ব করি এই যে, প্রমাণের পূর্বেই আমার অনুমান সত্য হয়েছিল। …এই চিঠিগুলির মধ্যে তারই ইতিহাস পাওয়া যাবে, আর যদি কোনো দিন এরই উত্তরে প্রত্যুত্তরে আমার চিঠিগুলিও পাওয়া যায়, তাহ'লে এই ইতিহাস সম্পূর্ণ হতে পারবে।

জগদীশচন্দ্রকে লেখা রবীন্দ্রনাথের চিঠি তুলনামূলকভাবে কমই পাওয়া গেছে। তবু পৌষ ১৩৩৩-সংখ্যা প্রবাসী-তে জগদীশচন্দ্রের চিঠির প্রকাশ সম্পূর্ণ হবার পরে মাঘ-সংখ্যা থেকে তাঁকে লেখা রবীন্দ্রনাথের অনেকগুলি চিঠি মুদ্রিত হয়, জগদীশচন্দ্রের মৃত্যুর পরে আরও কিছু চিঠি প্রকাশিত হয় প্রবাসী-র ফাল্গুন ১৩৪৪-আষাঢ় ১৩৪৫-সংখ্যায়। বর্তমানে 'চিঠিপত্র ৬ষ্ঠ খণ্ড' ও ড দিবাকর সেন-সম্পাদিত 'পত্রাবলী : আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু' [১৪০১] গ্রন্থে উভয়ের প্রাপ্ত প্রায়-সমগ্র পত্রাবলি [তাঁর সহধর্মিণী অবলা বসুর পত্রাবলি-সহ] বিস্তৃত টীকাটিপ্পনী-যোগে পাওয়া যাবে।

২৩ চৈত্র [মঙ্গল 6 Apr] শান্তিনিকেতনে বিশ্বভারতী ব্রতীবালক সম্মিলনীর দ্বিতীয় বার্ষিক অধিবেশন হয়। বীরভূম জেলার ১২টি কেন্দ্র থেকে প্রায় ৩০০ ব্রতীবালক এই সম্মিলনীতে যোগ দেয়। হেতমপুরের মহারাজা সত্যনিরঞ্জন চক্রবর্তী সভাপতিত্ব করেন। পুরস্কার বিতরণ উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথ বালকদের যে-উপদেশ দেন, তার সারমর্ম জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৩-সংখ্যা প্রবাসী-তে [পৃ ৩৬৬-৬৭] মুদ্রিত হয়েছে।

12 Apr 1926 [২৯ চৈত্র ১৩৩৩] 'চিরকুমার সভা' গ্রন্থাকারে প্রথম প্রকাশিত হয়; মুদ্রণসংখ্যা ১১০০, ২১৭ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট থেকে করুণাবিন্দু বিশ্বাস কর্তৃক প্রকাশিত।

বর্ষশেষ ও নববর্ষের উৎসবে যোগদান করার জন্য রবীন্দ্রনাথ বিভিন্ন ব্যক্তিকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন, যা অনেকেই রক্ষা করেন। দিলীপকুমার রায় জানিয়েছেন, 12 Apr [২৯ চৈত্র] রবীন্দ্রনাথ তাঁকে 'তোমার বীণা আমার মনোমাঝে' গানটিতে সুর দিতে বলেন। রানী মহলানবিশ লিখেছেন, ''আমরা চৈত্র সংক্রান্তির আগে গিয়ে পৌঁছই। তারপর ১লা বৈশাখের উৎসব হয়ে গেলেও আমি অনেকদিন শান্তিনিকেতনে ছিলাম।'

৩০ চৈত্র [মঙ্গল 13 Apr] বর্ষশেষের দিন; বৈশাখ ১৩৩৩-সংখ্যার শান্তিনিকেতন পত্রিকায় সংবাদ দেওয়া হয়েছে : 'বর্ষশেষ উপলক্ষ্যে ও ৩০শে চৈত্র সন্ধ্যায় তিনি [রবীন্দ্রনাথ] মন্দিরে উপাসনা করেন'। কিন্তু তাঁর উপাসনার মর্ম কোথাও মুদ্রিত হয়েছিল কিনা জানা যায় না।

আমরা অগ্রহায়ণ ১৩৩২ পর্যন্ত বিভিন্ন সাময়িকপত্রে প্রকাশিত রবীন্দ্ররচনার সূচি সংকলন করে দিয়েছি; এখানে পৌষ থেকে চৈত্র মাসগুলিতে প্রকাশিত রচনার তালিকা দেওয়া হল :

ভারতী, কার্তিক-পৌষ ১৩৩২ [৪৯ / ৭-৯] :

২০১ 'জলের রাণী' ['ওগো জলের রানী'] দ্র গীত ৩। ৯০১; স্বর ৫৬।

এই সময়ে ভারতী-র প্রকাশ অত্যন্ত অনিয়মিত, সেইজন্য সংখ্যাটি ত্রৈমাসিক হিসাবে মাঘ মাসের আগে প্রকাশিত হয়নি বলে ধরে নেওয়া যায়। উক্ত গানটি ফাল্গুন-সংখ্যা প্রবাসী-র 'কষ্টিপাথর'-এ উদ্ধৃত হয়। ভারতী-তে গানটির টীকায় লেখা হয় : 'কবি একখানি নূতন নাটক লিখিতেছেন, ইহা তাহার আরম্ভের প্রস্তাবনা-গীতি।' এই নাটকের পাণ্ডুলিপির কোনো সন্ধান পাওয়া যায়নি।

প্রবাসী, পৌষ ১৩৩২ [২৫ / ২ / ৩] :

৩০৫-০৮ 'চিঠি' দ্র চিঠিপত্র ১৪

চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে লেখা রবীন্দ্রনাথের নয়টি পত্র এখানে সংকলিত হয়।

সবুজপত্র, পৌষ ১৩৩২ [৯ / ৫] :

৩৫০-৫১ 'নাতনীর উদ্দেশে' ['যখন আমি উর্ব্বশীরে']

৩৫২ 'গান। / ভীমপলশ্রী-দাদ্‌রা। / সকালবেলার কুঁড়ি আমার' দ্র গীত ২। ৫৫৩-৫৪; স্বর ৩।

The Modern Review, January 1926 (Vol. XXXIX, No. 1]:

49 'To Romain Rolland/ An Appreciation' দ্র *Rolland and Tagore* [1945]/ 1-2

77-84 'The Philosophy of Our People' দ্র *EWRT* 3/ 559-69

Visva-Bharati Quarterly, January 1926 [Vol. III, No. 4] :

295-310 'The Philosophy of Our People' দ্র *EWRT* 3/ 559-69

338 'The Wreath of Victory' ['The young pilgrim's eyes shone']

387-95 'Notes and Comments'

'The Wreath of Victory' পলাতকা-র 'মালা' কবিতার সংক্ষেপিত ইংরেজি অনুবাদ।

ভারতী, মাঘ ১৩৩২ [৪৯ / ১০]:

৩০০ 'আধুনিকতা'

৩৫৬-৫৭ 'মৃত্যু'।

'আধুনিকতা' রচনাটি সাধুভাষায় লেখা, এটি রচনার উপলক্ষ জানা যায়নি। অগ্রন্থিত এই রচনাটির মূল বক্তব্য রবীন্দ্রনাথ প্রথম দুটি অনুচ্ছেদেই ব্যক্ত করেছেন :

> আজ প্রাচ্যের তরুণের দল যাহা কিছু আধুনিক বলিয়া কল্পনা করে তাহাতেই আকৃষ্ট হয়। এবং তাহাদের দৃঢ় বিশ্বাস হইয়াছে যে পাশ্চাত্যজীবন আধুনিকতাময়। পশ্চিমের আচার-ব্যবহার ও মনোভাবের মধ্যে তরুণপ্রাচী আধুনিক হইয়া পড়িয়া উঠার মন্ত্র খুঁজিয়া বেড়াইতেছে। তাহাদের ধারণা এই যে যা'কে আধুনিকতা বলে, অপরিমিত বৃদ্ধি ও মুক্তির তত্ত্ব তাহাতে নিহিত আছে; তাহাই যৌবন, তাহাই জীবন।
>
> যদি আধুনিকতার সংজ্ঞা তাহাই হয় তবে জানিতে হইবে উহার অপরিহার্য্য অংশ কাল-বিশেষে নয়, সত্য বিশেষে ন্যস্ত থাকে— সে সত্যটুকু বর্জ্জিত হইলে যতই পালিশ করা আর হালফ্যাসনের হোক্ না— আধুনিক সেকেলে হইয়া যায় এবং তার নাশ অবশ্যম্ভাবী।

'মৃত্যু' 'দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মৃত্যুর পর শান্তিনিকেতন মন্দিরে ১১ই মাঘে ভাষিত'।

প্রবাসী, মাঘ ১৩৩২ [২৫। ২। ৪] :

৪৩৩ 'গান' [ধ্বনিল আহ্বান মধুর গম্ভীর'] দ্র গীত ১। ১২৭-২৮; স্বর ১৩

৫৪২-৫১ 'ভারতবর্ষীয় দার্শনিক সঙেঘর সভাপতির অভিভাষণ'

'গান'-সম্পর্কে প্রবাসী-সম্পাদকের টীকায় জানানো হয়েছে : 'এই গানটি গত ৭ই পৌষ শান্তিনিকেতন আশ্রমের উৎসবে গীত হইয়াছিল।' দ্বিতীয় রচনাটি মূল ইংরেজি থেকে অনূদিত।

The Modern Review, February 1926 [Vol. XXXIX, No. 2] :

158 'Rabindranath Tagore and Knighthood'

ইংরেজ-বিরোধী অসহযোগ আন্দোলনের প্রবক্তা গান্ধীজি রবীন্দ্রনাথ-প্রসঙ্গে কিছু লিখতে হলেই ইংরেজ সরকার-প্রদত্ত 'Sir' শব্দটি প্রায়ই তাঁর নামের আগে ব্যবহার করতে অভ্যস্ত ছিলেন, অথচ জালিয়ানওয়ালাবাগের গণহত্যার প্রতিবাদে এই উপাধি পরিত্যাগ করতে চেয়ে রবীন্দ্রনাথ তৎকালীন ভাইসরয়কে চিঠি লিখেছিলেন এই তথ্য তাঁর অজানা থাকার কথা নয়। জনৈক সুবোধচন্দ্র বসু এই প্রসঙ্গে মডার্ন রিভিয়্যু-তে একটি মন্তব্য পাঠালে সম্পাদক লেখেন, রবীন্দ্রনাথ তাঁর নামের সঙ্গে স্যার, ডক্টর, মিস্টার, এস্কোয়ার, বাবু, শ্রীযুত ইত্যাদি কোনো উপসর্গই ব্যবহারের পক্ষপাতী নন। এই বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ নিজে তাঁর বক্তব্য প্রকাশ করেন বর্তমান রচনায়।

ভারতী, ফাল্গুন ১৩৩২ [৪৯। ১১] :

৩৮২-৮৩ 'জীবন ও যন্ত্র'

প্রবাসী, ফাল্গুন ১৩৩২ [২৫। ২। ৫] :

৬৮৯-৯২ 'শুভইচ্ছা'

টীকায় লেখা হয় : 'গত ৭ই পৌষ শান্তিনিকেতন মন্দিরে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই উপদেশ প্রদান করেন। ইহা তিনি তৎপরে স্বহস্তে আদ্যোপান্ত লিখিয়া দিয়াছেন। লিখিবার সময় শ্রীযুক্ত ইন্দ্রকুমার চৌধুরীর অনুলিখন স্মারক-লিপির কাজ করিয়াছিল।'

শান্তিনিকেতন, ফাল্গুন ১৩৩২ [৭। ২] :

৪৬-৪৮ 'গান' ['লহ লহ তুলে লহ'] দ্র গীত ১। ২০৮-০৯; স্বর ৩১; স্বরলিপিকার অনাদিকুমার দস্তিদার।

ভারতী, চৈত্র ১৩৩২ [৪৯। ১২] :

৪৬৭ 'নববধূ' ['বসন্তের দূতী তুমি, ফাগুনের কুসুম উৎসবে']

এটি রচনার তারিখ দেওয়া আছে ২১ ফাল্গুন ১৩৩২। অমিতা চক্রবর্তীর বিবাহে আশীর্বাণী হিসাবে কবিতাটি লেখা— এটিকে পাঠান্তরিত করে রবীন্দ্রনাথ গানে পরিণত করেন : 'অনন্তের বাণী তুমি' দ্র গীত ২। ৫০৪; স্বর ৬৩।

প্রবাসী, চৈত্র ১৩৩২ [২৫। ২। ৬]:

৮৮০-৮৩ 'ঢাকা ম্যুনিসিপ্যালিটির অভিনন্দনের উত্তরে'

টীকায় লেখা হয় : 'বিগত ৭ই ফেব্রুয়ারি ঢাকা নগরীতে কবিবর যে বক্তৃতা দেন, তিনি স্বয়ং তাহা লিখিয়া দিয়াছেন। দৈনিক কাগজে তাঁহার বক্তৃতার যেসব প্রতিলিপি বাহির হইয়াছিল তাহার অনেক স্থলের সহিত ইহার অমিল দৃষ্ট হইবে।'

সবুজপত্র, চৈত্র ১৩৩২ [৯ / ৮]:

৫৭০-৭১ 'দোল-পূর্ণিমায়'।

৫৭০ (১)'দোলে প্রেমের দোলনচাঁপা' দ্র গীত ২। ৫০৩; স্বর ৫

৫৭১ (২) 'ফাগুনের নবীন আনন্দে' দ্র গীত ২। ৫২৪; স্বর ৫; এখানে রচনার তারিখ ১৫ই ফাল্গুন ১৩৩২

৫৭২-৭৮ 'দীপালি সংঘ। / (ঢাকা, নারীসভা।)' দ্র ঢাকায় রবীন্দ্রনাথ। ১০৩-০৬

শান্তিনিকেতন, চৈত্র ১৩৩২ [৭ / ৩] :

৪৯-৫১ 'কুমিল্লার অভয়াশ্রমের বার্ষিক সভায় সভাপতির অভিভাষণ'

৫১-৫৪ 'অভয়াশ্রম'

প্রাসঙ্গিক তথ্য :১

রবীন্দ্রনাথের কনিষ্ঠ জামাতা নগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর স্ত্রী মীরা দেবী, পুত্র-কন্যা নীতীন্দ্রনাথ ও নন্দিতা, এমন-কি রবীন্দ্রনাথের জীবনে যে-সংকট ঘনীভূত করে তুলেছিলেন— তার অনেক বিবরণ আমরা পূর্বে নানা উপলক্ষে বর্ণনা করেছি। আমেরিকায় কৃষিবিদ্যা শিখিয়ে এনে রবীন্দ্রনাথ চেয়েছিলেন, নগেন্দ্রনাথ জমিদারিতে উন্নত কৃষিব্যবস্থার প্রবর্তন ঘটিয়ে নিজের জীবিকার সংস্থান করবেন— কিন্তু স্ত্রীর উপর মানসিক ও শারীরিক অত্যাচার ক'রে জমিদারের জামাতা নগেন্দ্রনাথ ধনী ও নামজাদা শ্বশুরকে শোষণ ক'রে জীবিকানির্বাহের সহজ পথটিই বেছে নিয়েছিলেন। পরে ভালো চাকরির সন্ধানে তিনি বহুবিধ চেষ্টা করেছেন, কিন্তু সফল হননি। অসহযোগ আন্দোলনের সময়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংকটজনক অবস্থায় রবীন্দ্রনাথের সমর্থন নিশ্চিত করার অভিপ্রায়ে ভাইস-চান্সেলার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় সিনেট-সদস্যদের সমালোচনা অগ্রাহ্য করে প্রয়োজনীয় যোগ্যতা না থাকা সত্ত্বেও নগেন্দ্রনাথকে মাসিক ৫০০ টাকা বেতনে Dec 1921 থেকে গুরুপ্রসাদ প্রফেসার অব্ এগ্রিকালচার পদে নিয়োগ করেন— অবশ্য এই বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ আশুতোষের কাছে কোনো সুপারিশ করেননি।

তখনকার দিনে মাসিক ৫০০ টাকা বেতন ও বালিগঞ্জ বিজ্ঞান কলেজ ভবনে একটি কোয়ার্টার নিতান্ত সামান্য ছিল না। কিন্তু অমিতব্যয়ী ও উদ্ধতস্বভাব [রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, 'তোমার অধৈর্য্য অসহিষ্ণুতা, তোমার আত্মসম্বরণে অসাধ্যতা, তোমার দুর্দ্দান্ত ক্রোধ এবং আঘাত করবার হিংস্র ইচ্ছা সাংসারিক দিক থেকে আমাকে অনেক সময়ে কঠিন পীড়া দিয়েচে'[১৭০]] নগেন্দ্রনাথ তাতেও সন্তুষ্ট হননি, মীরা দেবীর উপর অত্যাচার তিনি অব্যাহত রাখেন, যার মানসিক যন্ত্রণা রবীন্দ্রনাথকেও বহন করতে হয়েছে— মীরা দেবী ও নগেন্দ্রনাথকে লেখা অনেক চিঠিতে তার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। ফলে মীরা দেবী নগেন্দ্রনাথের সান্নিধ্য ত্যাগ করে শান্তিনিকেতনে পিতার কাছে চলে আসেন, নীতীন্দ্রনাথ ভর্তি হন শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ে। তখন নগেন্দ্রনাথ

নীতীন্দ্রনাথের অধিকার দাবি করে মানসিক অত্যাচারের নূতন পদ্ধতির ব্যবহার শুরু করলেন, তাতে পুত্রের পড়াশোনার ক্ষতি তিনি বিবেচনা করেননি। তাঁর শুভবুদ্ধি উন্মেষের জন্য অ্যান্ডরুজ, পিয়র্সন ও প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশের বহু চেষ্টা ব্যর্থ হয়। তাঁর চাকরির শর্তানুযায়ী বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর পর্যায়ে পঠনপাঠন ও গবেষণার উপযুক্ত করে নিজেকে গড়ে তোলার জন্য ইংল্যান্ডে যাওয়ার জন্য তিনি দু'বৎসর সবেতন ছুটি ও ৮০০ টাকা পাথেয় পান Mar 1923-তে, এপ্রিলে তিনি পিয়র্সনের সঙ্গে রওনা হন, রবীন্দ্রনাথ সাহায্য হিসেবে তাঁকে ৫০০ টাকা দেন— কিন্তু পুত্রের শিক্ষাবিষয়ে কোনোরকম পরিকল্পনা ছাড়াই তাঁকেও সঙ্গে নিয়ে যান কেবল মীরা দেবীকে কষ্ট দেবার জন্য, ফলে নীতুর মন ও শরীর দুই-ই পীড়িত হয়েছে— কে বলতে পারে, এইগুলিই তাঁর অকালমৃত্যুর ভূমিকা রচনা করেছে কি না!

ড দীনেশচন্দ্র সিংহের 'রবীন্দ্রনাথ, নগেন্দ্রনাথ ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়' [দ্র দেশ, শারদীয় ১৪০৪। ৪৫-৫৫] প্রবন্ধ-পাঠে জানা যায়, ইংল্যান্ডে থাকার সময়ে গবেষণার জন্য নগেন্দ্রনাথের যত টাকার প্রয়োজন হয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় তা মেটানোর ব্যবস্থা করেছে— কিন্তু প্রায়শই রবীন্দ্রনাথ বা রথীন্দ্রনাথের কাছে অর্থসাহায্য প্রার্থনা করে তিনি চিঠি লিখেছেন, যা কখনও পূরণ হয়েছে, কখনও হয়নি।

নীতীন্দ্রনাথ কোথায় কোন্ বিষয়ে পড়াশোনা করবেন সেই বিষয়েও নগেন্দ্রনাথের কোনো সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা ছিল না। রবীন্দ্রনাথ ১৯ মাঘ ১৩২৯ [2 Feb 1923] তাঁকে লিখেছিলেন : 'পিয়র্সন লেচফীল্ডে একটি ভাল বিদ্যালয়ের সংবাদ জানিয়েচেন, সেখানে নিশ্চয়ই নীতুর উপকার হবে।' আবার 26 Jan 1924 [১২ মাঘ ১৩৩০] লিখেছেন : 'আমাদের এখানে পারিসবাসিনী একজন ধনী ইংরেজ মহিলা এসেছিলেন তিনি নীতুর কথা শুনে বলেছিলেন প্যারিসে তাঁর কাছে নীতুকে রেখে তিনি তাকে শিক্ষা দেবার ভার নিতে রাজি আছেন। ...প্যারিসে আমাদের আরেক বিশেষ বন্ধু আছেন Rana (ভারতীয়) তাঁর স্ত্রী জর্ম্মান, উভয়ে খুব ভদ্র। এঁরা মানুষ করবার জন্যে আমার কাছে একটি ছোট বাঙালীর মেয়ে চেয়েছিলেন। খুঁজে কাউকে পাইনি।' অর্থাৎ এঁদের কাছে রেখে নীতুকে বিনাখরচে স্বাচ্ছন্দ্যের সঙ্গে উচ্চশিক্ষা দেওয়া যেত, কিন্তু নগেন্দ্রনাথ সেই সুযোগ গ্রহণ করেননি। তাঁর দরকার ছিল টাকা, তারই চেষ্টায় May 1924-এ তিনি যখন রোমে আন্তর্জাতিক মৃৎবিজ্ঞান সম্মেলনে যোগ দিতে গেছেন তখন জনৈক আমেরিকানের কাছে রবীন্দ্রনাথের দুটি পাণ্ডুলিপি বিক্রয়ের চেষ্টা করেছেন, পরে একই বিষয়ে রোটেনস্টাইনের দ্বারস্থ হয়েছেন— এইভাবে কতগুলি পাণ্ডুলিপি তিনি পরহস্তগত করতে পেরেছিলেন তা আমাদের জানা নেই, কিন্তু অন্তত একটির ক্ষেত্রেও যদি তিনি সফল হয়ে থাকেন তা রবীন্দ্র-গবেষকদের কাছে অপূরণীয় ক্ষতি হিসেবেই গণ্য হবে।

অতঃপর স্যার জন রাসেলের অধীনে গবেষণা করে লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের পি.এইচ.ডি. ডিগ্রি লাভ করে দেশে ফিরে 4 Jan 1926 কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে নগেন্দ্রনাথ তাঁর কাজে যোগ দেন— কিন্তু ইতিমধ্যে রানী বাগীশ্বরী অধ্যাপক পদে অবনীন্দ্রনাথের স্থলাভিষিক্ত স্টেলা ক্রামরিশ বালিগঞ্জ বিজ্ঞান কলেজে নগেন্দ্রনাথের অধিকৃত কোয়ার্টারটিতে অধিষ্ঠিত হওয়ার ফলে তাঁর বাসস্থান নিয়ে সমস্যা দেখা দেয়। এর মধ্যে তাঁর শুভানুধ্যায়ী আশুতোষ পরলোকগত হয়েছেন, নগেন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথের শরণাপন্ন হলে তিনি আশুতোষ-তনয় সিন্ডিকেট-সদস্য শ্যামাপ্রসাদকে 10 Jan 1926 [২৬ পৌষ ১৩৩২] লেখেন :

শ্রীমান নগেন্দ্রনাথকে তোমার পিতা যেখানে আশ্রয় দিয়াছিলেন সেখান হইতে অকস্মাৎ বঞ্চিত হইয়া তিনি সঙ্কটে পড়িয়াছেন। আমার কাছে মনে হয় কাজটা বিধিবিহিত হয় নাই। যখন তাঁহাকে তোমরা য়ুরোপে পাঠাইয়াছিলে সেই সময়েই যদি তিনি তোমাদের কাছ হইতে নোটিস

পাইতেন তাহা হইলেও সঙ্গত হইত। সেখানে থাকিতেও তাঁহাকে নূতন ব্যবস্থার কথা জানিতে দেওয়া হয় নাই। ঠিক কাজ আরম্ভ করিবার মুখে বিনা কারণে বিনা অপরাধে তাঁহাকে তাঁহার অধিকারচ্যুত করা কি উচিত হইয়াছে? তোমরাই বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজে তাঁহাকে বিদেশে পাঠাইয়াছিলে বলিয়াই তাঁহার অনুপস্থিতি ঘটিয়াছিল— সে কাজও তিনি প্রশংসার সহিত উদ্ধার করিয়াছেন। ইহাতে কি তিনি এমন দোষ করিয়াছেন যাহাতে তিনি শাস্তি বা অবমাননার যোগ্য বলিয়া গণ্য হইতে পারেন?[১৭১]

এই চিঠিতে কোনো লাভ হয়নি, বিশ্ববিদ্যালয় কোয়ার্টারের পরিবর্তে নগেন্দ্রনাথকে মাসিক ১০০ টাকা বাড়িভাড়া মঞ্জুর করে।

উক্ত প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ নগেন্দ্রনাথের পক্ষাবলম্বন করেছিলেন, কিন্তু নগেন্দ্রনাথ নীতুকে তাঁর সঙ্গে ইংল্যান্ড থেকে ফিরিয়ে এনে ভ্রাতা ধীরেন্দ্রনাথের কাছে অনর্থক ফেলে রাখায় তিনি বিরক্ত হয়ে ১০ ফাল্গুন ১৩৩৩ [22 Feb 1927] তাঁকে লেখেন :

ভেবেছিলুম নীতুর শিক্ষা সম্বন্ধে তোমার বিশেষ কোনো সংকল্প আছে তাই মীরার কাছ থেকে তাকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করা সত্ত্বেও সে দুঃখ আমি নীরবে সহ্য করেছিলুম! ন্যায়ত সন্তানের প্রতি অধিকার তোমার চেয়ে মীরার কম আছে বলে মনে করিনে। কিন্তু জোর তোমার, এবং সে জোরের উপর ন্যায়ের দোহাই খাট্‌বে না। কিন্তু তাই বলে নীতুকে কলকাতায় ধীরেনের কাছে অকর্ম্মা ফেলে রেখে নীতুর কোনো কল্যাণ সাধন হচ্চে একথা কল্পনা করতে পারিনে। এতে কেবল নীতু ও নীতুর মা উভয়কেই কঠিন শাস্তি দেওয়া হচ্চে। দিতে চাও দাও আমি কিছু বলব না। তোমাদের দুজনের মাঝখানে আমার কেবল একটি কথা আছে। যখন মনে করেছিলুম ছেলেমেয়েদের সম্বন্ধে মীরার আংশিক দায়িত্ব আছে তখন আমি মীরার মুখ চেয়ে তদুপযুক্ত বৈষয়িক ব্যবস্থা করেছিলুম। কিন্তু সমস্ত দায়িত্ব যদি একমাত্র তোমারই হয় তাহলে ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন করব। এ সম্বন্ধে তোমার কাছ থেকে শেষ কথা চাই। তোমার ছেলেমেয়েদের ভবিষ্যতের কথা ভেবে আমার যখন কোনো ফল নেই তখন সেই ভাবনা থেকে আমি সম্পূর্ণ নিষ্কৃতি পেতে ইচ্ছে করি।[১৭২]

এই চিঠি পরের বছরের হলেও আমরা এখানেই বিষয়টি আলোচনা করে নিতে চাই, তার কারণ রবীন্দ্রনাথ যে-ব্যবস্থার কথা লিখেছেন সেটি এই বৎসরের ঘটনা। তিনি ৬ ভাদ্র ১৩৩২ [শনি 22 Aug] একটি ট্রাস্ট ডীডে স্বাক্ষর করেন, যেটি তাঁর পরিবারস্থ বিভিন্ন ব্যক্তি ও বিশ্বভারতীর পক্ষে একটি অত্যন্ত মূল্যবান দলিল। সুতরাং তার বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া প্রয়োজন।

হীরেন্দ্রনাথ দত্ত অ্যান্ড কোম্পানি সলিসিটার ফার্মের দ্বারা প্রস্তুত এই ট্রাস্ট ডীডে রথীন্দ্রনাথ ও সুরেন্দ্রনাথকে ট্রাস্টী নিযুক্ত করে তাঁদের উপর রবীন্দ্রনাথ তাঁর শর্তাবলি পালনের দায়িত্ব অর্পণ করেন। প্রথমে দেবেন্দ্রনাথ-কৃত উইলের সারমর্ম বর্ণনা করে উইলের নির্দেশ অনুযায়ী দায়গুলি মেটানো কথা বলা হয়েছে। এর পর সত্যেন্দ্রনাথ [তাঁর অবর্তমানে সুরেন্দ্রনাথ] ও রবীন্দ্রনাথ দ্বিজেন্দ্রনাথের সম্পত্তি লীজ নেওয়ার ফলে যে বাড়তি দায় পরিশোধ করতে হবে তার বিবরণও দেওয়া হয়েছে। সত্যেন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথ সম্পত্তি বন্ধক দিয়ে অমিয়নাথ চৌধুরী ও প্রমীলা ফ্লোরেন্স চৌধুরীর কাছ থেকে যে বাষট্টি হাজার টাকা ধার করেছিলেন, তার সুদ ও আসল মেটানোর দায়ও ট্রাস্টীদের দেওয়া হয়।

ইতিপূর্বে বিশ্বভারতীকে হস্তান্তরিত সম্পত্তি বাদ দিয়ে রবীন্দ্রনাথের বাড়ি ও সম্পত্তির তৎকালীন বাজারদর ধরা হয়েছে যথাক্রমে ৮৮১২০ টাকা ও ৪,১০০০০ টাকা এবং সেই সময় পর্যন্ত তাঁর রচিত পুস্তকাবলির মূল্য ২৫০০০ টাকা নির্ধারিত হয়েছে। তাঁর একমাত্র জীবিত পুত্র রথীন্দ্রনাথ, তাঁর পত্নী প্রতিমা দেবী ও তাঁদের পালিতা কন্যা নন্দিনী, একমাত্র জীবিতা কন্যা মীরা দেবী এবং তাঁর নাবালক পুত্র-কন্যা নীতীন্দ্রনাথ ও নন্দিতা গঙ্গোপাধ্যায়কে বিভিন্ন হারে মাসোহারা ও অন্যান্য আর্থিক সুবিধা দেওয়ার কথা উল্লেখ করা হয়েছে এই ট্রাস্ট ডীডে— উল্লেখ্য, দুই জীবিত জামাতার কোনো প্রসঙ্গ এই দলিলে নেই।

এই আর্থিক ব্যবস্থাদির মধ্যে প্রথম উল্লেখটিই হতভাগিনী কন্যা মীরা দেবীর সংস্থান-সংক্রান্ত। নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, মীরা দেবীর জীবৎকালের জন্য কমপক্ষে ছ'হাজার টাকা ব্যয়ে একটি বাড়ি শান্তিনিকেতনে তৈরি করে দিতে হবে, সারা জীবন তিনি মাসিক ৪০০ টাকা বৃত্তি পাবেন, তাঁর মৃত্যু ঘটলে টাকাটি সমানভাবে ভাগ করে দেওয়া হবে দুই পুত্র-কন্যার মধ্যে তাঁদের সাবালকত্ব প্রাপ্তির পরে। যদি তাঁদেরও অকালমৃত্যু ঘটে এই টাকা বৃত্তি হিসেবে দেওয়া হবে বিদেশে পড়তে-যাওয়া কোনো ছাত্র বা ছাত্রীকে। নন্দিতার জন্য পনেরো হাজার টাকা বরাদ্দ থাকবে তাঁর বিবাহের জন্য। প্রতিমা দেবী পাবেন প্রতি মাসে ১০০ টাকা। নন্দিনীর বিবাহের জন্য পঁচিশ হাজার টাকা বরাদ্দ থাকবে, তাঁর অকালমৃত্যু ঘটলে এই টাকা দুঃস্থ প্রজাদের জন্য খরচ করা হবে, ইত্যাদি।

রবীন্দ্রনাথ নগেন্দ্রনাথকে জানিয়েছিলেন, তিনি যদি পুত্র-কন্যাদের উপর পূর্ণ অধিকার দাবি করেন, তাহলে এই ট্রাস্ট ডীডে উল্লিখিত তাঁদের জন্য সমস্ত বরাদ্দ প্রত্যাহার করে নেওয়া হবে।

২৯ আষাঢ় [সোম 13 Jul] রাত্রি দশটার সময়ে মাত্র ৫৭ বৎসর বয়সে ৫৪ হাজরা রোড-স্থ নিজস্ব বাসভবনে স্বর্ণকুমারী দেবীর জ্যেষ্ঠা কন্যা হিরন্ময়ী দেবীর জীবনাবসান হয়। ইন্দিরা দেবী লিখেছেন :

বোধহয় রাণুর বিয়ের দিনই [28 Jun] তিনি দার্জিলিং থেকে নেবে স্বর্ণপিসিমার ওখানে ওঠেন, এই দুই কাজই মন্দের ভালো হয়েছিল। প্রথম যেদিন দেখতে যাই, একটু ভালো আছেন বললেন। আমার সৌভাগ্যক্রমে দার্জিলিং থেকে এখন পর্যন্ত যেদিনই দেখতে গেছি সেদিনই শুনেছি একটু ভালো। কিন্তু পনেরো দিনের মধ্যেই সব শেষ হল। বহুকাল বহুমূত্র রোগভোগে শরীর জীর্ণ ছিল, কষ্টও অনেক পেয়েছেন, তার থেকে নিষ্কৃতি পেলেন, সে ভালো। তবে বুড়ো মা'র চোখের সামনে এই দৃশ্য দেখা, বুড়ো স্বামীর পক্ষে এ-বয়সে একলা সংসারের ভার বওয়া, এবং সাবালক ছেলের পক্ষে মাতৃহারা হওয়া অতি কষ্টকর।[১৭৩]

৭ শ্রাবণ [23 Jul] কনিষ্ঠ পুত্র আনন্দকুমার মুখোপাধ্যায় হিরন্ময়ী দেবীর আদ্যশ্রাদ্ধ করেন।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠপুত্র দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ব্রহ্মচর্যাশ্রম প্রতিষ্ঠার কয়েক বৎসর পর থেকেই শান্তিনিকেতনের দক্ষিণে 'নিচু বাংলা' নামে পরিচিত কুটিরে বাস করতেন। বয়স, পাণ্ডিত্য, হাস্যমুখর সরলতা, পশুপক্ষীর প্রতি প্রেম প্রভৃতি গুণের জন্য তিনি আশ্রম ও বাইরের দেশীয় ও বিদেশীয় আবালবৃদ্ধবনিতার শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। শ্রীপঞ্চমী তিথিতে সরস্বতীর এই বরপুত্র ৮৭ বৎসরের অতি-পরিণত বয়সে ৪ মাঘ, [সোম 18 Jan 1926] ভোর তিনটের সময়ে পরলোকগমন করেন। মাঘ-সংখ্যা শান্তিনিকেতন-এ সম্পাদক প্রমথনাথ বিশী 'বড়বাবু' শিরোনামে [পৃ ১৮-২০] এই মৃত্যু উপলক্ষে একটি দীর্ঘ রচনা প্রকাশ করেন। তিনি লেখেন :

...মৃত্যুর সময়ে তিনি বলিতে গেলে কোনো কষ্ট পান নাই। মৃত্যুকে কত সহজে যে গ্রহণ করা যায়— এই মৃত্যুতে আমরা তাহাই বুঝিতে পারিয়াছি। মৃত্যুর পরে তাঁহার প্রশান্ত মুখশ্রী দেখিয়া ইহলোক ও পরলোকের মধ্যে ব্যবধানটি কাহারো চোখে পড়ে নাই।

মৃত্যুর পূর্ব্বদিনেও শান্তিনিকেতন পত্রিকার জন্য তাঁহার কবিতার প্রুফ সংশোধন করিয়া দিয়াছেন এবং নূতন একটি কবিতা লিখিয়াছিলেন। ঠাণ্ডা লাগিয়া সামান্য একটু ব্রঙ্কো নিউমোনিয়া মাত্র হইয়াছিল। মৃত্যুর মাত্র কয়েক ঘণ্টা পূর্ব্বেও কেহ এই আসন্ন সম্পূর্ণতার কথা বুঝিতে পারে নাই।...

দ্বিজেন্দ্রনাথের মৃত্যুর পরে সেই দিন বিকাল ৪টার সময়ে তাঁহার দেহকে পুষ্প চন্দনে সুসজ্জিত করিয়া ছাতিমতলায় লইয়া যাওয়া হয়। সেখানে তাঁহার প্রিয় "কর তাঁর নাম গান" সঙ্গীতটি গীত হয়। অবশেষে আশ্রমের উত্তরে খোয়াইএর মধ্যে যেখানে মহেশ্বরের পিঙ্গল জটাজালের মত একসারি তালগাছ উঠিয়াছে— সেখানকার শ্মশানে সকলে শবানুগমন করে। মানুষ মৃত্যুর পরে এই পর্য্যন্তই আসিতে পারে। দ্বিজেন্দ্রনাথের মৃত্যুসংবাদ পাইয়া কলিকাতা হইতে তাঁহার পুত্রদ্বয় শ্রীসুধীন্দ্রনাথ ও শ্রীকৃতীন্দ্রনাথ ঠাকুর আসিয়া পৌছিয়াছিলেন।

১৪ই মাঘ পরলোকগত আত্মার মঙ্গল কামনায় শ্রাদ্ধ ক্রিয়া নিষ্পন্ন হয়। ছাতিমতলায় শ্রাদ্ধবাসর হইয়াছিল। ঠাকুর পরিবারের প্রথামত শাস্ত্র পাঠ করিয়া এই ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। দ্বিজেন্দ্রনাথের পৌত্র শ্রীদিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর দান ও বৃষ উৎসর্গাদি করেন। দ্বিজেন্দ্রনাথের কনিষ্ঠ ভ্রাতা আচার্য্য

রবীন্দ্রনাথও উপস্থিত ছিলেন। [ইনি জ্যেষ্ঠভ্রাতার মৃত্যুকালে লখনৌতে ছিলেন, এই দুঃসংবাদ পেয়ে সেখানকার কর্মসূচি বাতিল করে শান্তিনিকেতনে ফিরে আসেন— এমন কাজ তিনি আর-কারো ক্ষেত্রে করেছেন কি না সন্দেহ আছে।] শ্রীযুক্ত ক্ষিতিমোহন সেন ও শ্রীযুক্ত বিধুশেখর শাস্ত্রী আচার্য্যের কাজ করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত ভীমরাও শাস্ত্রী, শ্রীযুক্ত গোখ্‌লে, শ্রীযুক্ত রঙ্গস্বামী, ও শ্রীযুক্ত আয়ার স্বামী এই উপলক্ষ্যে বেদ পাঠ করেন।

বিকাল বেলায় আম্রকুঞ্জে তাঁহার জীবনী আলোচনার জন্য একটি সভা আহূত হয়। প্রথমে শ্রীযুক্ত ভীমরাও শাস্ত্রী গীতা পাঠ করেন, তৎপরে শ্রীযুক্ত ক্ষিতিমোহন সেন মহাভারতের শান্তিপর্ব্ব হইতে কিয়দংশ পড়িয়া তাহার ব্যাখ্যা করেন। অবশেষে শ্রীযুক্ত নেপালচন্দ্র রায় বাংলা সমাজের উপর বড়বাবুর প্রভাব সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা করেন।

রবীন্দ্রনাথ ১১ই মাঘের উপাসনায় এই উপলক্ষে মৃত্যু সম্পর্কে তাঁর দার্শনিক মতামত বিবৃত করেন, সেটি 'মৃত্যু' নামে মাঘ-সংখ্যা ভারতী-তে প্রকাশিত হয়।

উক্ত দিবসে জোড়াসাঁকোতেও যথাবিধি দ্বিজেন্দ্রনাথের শ্রাদ্ধানুষ্ঠান পালিত হয়।

আশ্চর্যের বিষয়, দ্বিজেন্দ্রনাথের মৃত্যুর দেড় মাসের মধ্যেই ২৬ ফাল্গুন [বুধ 10 Mar 1926] তাঁর পৌত্র অজীন্দ্রনাথের বিবাহ হয় পরলোকগত অজিতকুমার চক্রবর্তীর জ্যেষ্ঠা কন্যা অমিতার সঙ্গে— অজীন্দ্রনাথ দ্বিজেন্দ্রনাথের দ্বিতীয় পুত্র অরুণেন্দ্রনাথের একমাত্র পুত্র, পরিবারের তৎকালীন জ্যেষ্ঠ পুরুষ হিসেবে নিমন্ত্রণপত্রে রবীন্দ্রনাথের নাম ছাপা হয়, তিনিই বেদি গ্রহণ করে আচার্যের কাজ করেন। উল্লেখ্য, ৩ ফাল্গুন ১৩১৮ [15 Feb 1912] অমিতার নামকরণ উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথই উপাসনা করেছিলেন।

এখানে ১২ পৌষ [27 Dec 1925] ক্যাশবহিতে লিখিত একটি হিসাবের প্রতি কৌতূহলী পাঠক ও বিশেষ করে স্থপতিদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই : 'কুনো সাহেবের দ্বারা উত্তরায়ণের main Buildingএর sketch কাঠের ফ্রেমে করানর খরচের বিল শোধ' করতে ১৭৮ টাকা দশ আনা নয় পাই ব্যয় লেখা হয়েছে। উত্তরায়ণের মেন বিল্ডিং বলতে সম্ভবত উদয়নের কথাই এখানে বলা হয়েছে; যার গঠন ও তল-বিভাজনের বৈচিত্র্য দেখে আমাদের স্বভাবতই ধারণা হয়, অর্থাভাবের সঙ্গে লড়াই করতে করতে দীর্ঘদিন ধরে গড়ে তোলা এই বাড়িটির সম্প্রসারণে উক্ত তল-বিভাজন অপরিহার্য ছিল; কিন্তু জাপানি দারুশিল্পী কুনো সানের দ্বারা নির্মিত এই কাঠের ফ্রেমের বহুমূল্য স্কেচ তৈরির হিসাব দেখে সন্দেহ হয়, পুরো কাঠামোর পরিকল্পনাটি হয়তো আগেই নেওয়া হয়েছিল, তাকে রূপ দেওয়া হয়েছে ধীরে ধীরে অর্থের সংস্থানের উপর নির্ভর করে। বিষয়টি স্থাপত্যবিদ্‌রা ভেবে দেখতে পারেন।

প্রাসঙ্গিক তথ্য : ২

এই বছর ভারতীয় রাজনীতির সব চেয়ে বড়ো ঘটনা দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের অকালমৃত্যু.। কয়েক বছর ধরেই কংগ্রেসের অভ্যন্তরীণ সংকট ও স্বরাজ্য দল গড়ে তোলা, নির্বাচনের জন্য প্রচার ইত্যাদি ঘটনায় তাঁর শরীরের উপর অত্যধিক চাপ পড়ছিল— ওকালতি ব্যবসা ছেড়ে দেওয়া ও দেশবাসীর উদ্দেশে সর্বস্ব ত্যাগ করাতে তিনি অভ্যস্ত জীবনযাত্রার সুখস্বাচ্ছন্দ্য থেকে বঞ্চিতও হচ্ছিলেন— তার অবশ্যম্ভাবী ফল হিসেবে তাঁর স্বাস্থ্য ভেঙে পড়ে এবং বিশ্রাম ও স্বাস্থ্যোদ্ধারের উদ্দেশ্যে তিনি দার্জিলিঙে যান। গান্ধীজি শান্তিনিকেতন থেকে ফিরে তাঁর সঙ্গে আলোচনার জন্য 4 Jun 1925 দার্জিলিঙে তাঁর কাছে যান, পাঁচ দিন তাঁদের মধ্যে কথাবার্তা হয়। কিন্তু তিনি ফিরে আসার কয়েকদিন পরেই 16 Jun [মঙ্গল ২ আষাঢ়] অকস্মাৎ চিত্তরঞ্জনের মৃত্যু হয়

মাত্র ৫৫ বছর বয়সে। তাঁর মরদেহ কলকাতায় নিয়ে এলে জনতার ভিড়ে এক অভূতপূর্ব দৃশ্যের অবতারণা হয়, গান্ধীজিও সেই শোকযাত্রায় অংশগ্রহণ করেন। বিশাল জনতার শোক ও জয়ধ্বনির মধ্য দিয়ে 18 Jun কেওড়াতলা শ্মশানে তাঁর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া নিষ্পন্ন হয়। চিত্তরঞ্জন রসা রোডে ৪ বিঘা জমির উপর নির্মিত বিশাল ভবনটি দেশবাসীকে দান করেছিলেন, কিন্তু তাঁর প্রায় দু'লক্ষ টাকা দেনাও ছিল। তাই গান্ধীজি 22 Jun সেই ভবনে মেয়েদের জন্য একটি চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠার জন্য দশ লক্ষ টাকার দেশবন্ধু স্মৃতি তহবিল গড়ার প্রস্তাব দিয়ে একটি বিবৃতি প্রচার করেন। ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়, নির্মলকুমার চন্দ্র, তুলসীচরণ গোস্বামী, কুমার সত্যমোহন ঘোষাল, নলিনীরঞ্জন সরকার, ডাঃ নীলরতন সরকার ও সতীশরঞ্জন দাশ ট্রাস্টী মনোনীত হন, কোষাধ্যক্ষ হন স্যার রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

1 Jul [১৭ আষাঢ়] চিত্তরঞ্জনের শ্রাদ্ধানুষ্ঠান হয়, গান্ধীজি সেই পর্যন্ত তাঁর পরিবারের সঙ্গে ছিলেন— যা অন্তত বাংলায় তাঁর জনপ্রিয়তার পুনরুদ্ধারে সাহায্য করে।

চিত্তরঞ্জন অবশ্য তাঁর অকালমৃত্যুর আগে এমন কয়েকটি কাজ করছিলেন, যা তাঁর ব্যক্তিগত ও স্বরাজ্যদলের জনপ্রিয়তার পক্ষে ক্ষতিকর হয়ে দাঁড়াচ্ছিল। ভোটের রাজনীতির মুখাপেক্ষী হয়ে অশুভ আঁতাত গড়ে তুলতে তিনি অত্যন্ত পটু ছিলেন, যার জন্য অপছন্দের ব্যক্তির বিরুদ্ধে গোষ্ঠীগঠন, চরিত্রহনন ইত্যাদিতেও তাঁর অরুচি ছিল না— যা তাঁর মৃত্যুর বেশ-কিছুদিন পর পর্যন্ত তাঁর প্রিয় শিষ্য সুভাষচন্দ্র বসু কখনও-কখনও গুরুর চেয়ে আরও দক্ষতার সঙ্গে পালন করে গেছেন। চিত্তরঞ্জনের 'বেঙ্গল প্যাক্ট' এই ভোটমুখাপেক্ষী রাজনীতির একটি প্রধান উদাহরণ। তৎকালীন হিন্দু-মুসলিম সংঘর্ষের আবহাওয়ায় বিশেষত মুসলিম-সংখ্যাগরিষ্ঠ বাংলায় চাকুরি ও অন্যান্য কিছু ক্ষেত্রে পশ্চাৎপদ মুসলিম জনগোষ্ঠীকে কিঞ্চিৎ সুযোগসুবিধা দেওয়ায় কোনো অন্যায় ছিল না, কিন্তু ভোট ও সমর্থন পাওয়ার লোভে তার অতিরেক অন্য পক্ষের কাছে আপত্তিকর মনে হতেই পারে, ফলে কোকনাদ কংগ্রেসে তাঁর বেঙ্গল প্যাক্টের প্রস্তাব মৌলানা মহম্মদ আলি সভাপতির আসনে অধিষ্ঠিত থাকা সত্ত্বেও মুসলিম-তোষক গান্ধীবাদীদেরই বিরোধিতায় পরাজিত হয়।

কোনো কারণে চিত্তরঞ্জনের রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গিরও কিছু-কিছু পরিবর্তন হচ্ছিল। May-Jun 1924-এ সিরাজগঞ্জে বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনে তিনি হিংসাত্মক কাজের নিন্দা করেও গোপীনাথ সাহার আত্মত্যাগের প্রশংসা করে প্রস্তাব এনেছিলেন : 'This conference while denouncing and dissociating itself from violence and adhering to the principle of non-violence, appreciates Gopinath Saha's ideal of self-sacrifice, misguided though it is, in respect of the country's best interest and expresses respect for self-sacrifice.' আমেদাবাদে কংগ্রেস অধিবেশনে প্রস্তাবটি মাত্র ৮ ভোটে পরাজিত হয়— সেই চিত্তরঞ্জনই 29 Mar 1925 সর্বপ্রকার হিংসাত্মক কাজের তীব্র নিন্দা করে একটি ইস্তাহার প্রকাশ করেন, যাতে ভারতের য়ুরোপিয়ান অ্যাসোসিয়েশনও সন্তোষ প্রকাশ করে। ভারতসচিব লর্ড বার্কেনহেড ব্রিটিশ পার্লামেন্টে এর উল্লেখ ক'রে তাঁকে গবর্মেন্টের সঙ্গে সহযোগিতা ও হিংসাত্মক কার্যকলাপ সম্পূর্ণ বন্ধ করার জন্য প্রয়াসী হতে আহ্বান জানান। চিত্তরঞ্জনও তাতে সম্মত হন। ফরিদপুর প্রাদেশিক কংগ্রেসে 2 May 1925 সভাপতির অভিভাষণে তিনি একটি সম্পূর্ণ আপোষমূলক ভাষণ দিয়ে সহযোগিতার প্রস্তাব উত্থাপন করেন। তিনি বলেন, প্রথমত গবর্মেন্ট সমস্ত দমনমূলক আইন প্রত্যাহার করে রাজবন্দীদের মুক্তি দেবেন; দ্বিতীয়ত ব্রিটিশ

সাম্রাজ্যের মধ্যে থেকেই দেশবাসীর পূর্ণ স্বরাজ লাভের পথ প্রস্তুত করতে হবে; তৃতীয়ত তার জন্য শাসনযন্ত্রকে যথোপযুক্তভাবে পরিবর্তনের প্রয়াস নিতে হবে— পক্ষান্তরে দেশবাসীও রাজদ্রোহমূলক হিংসাত্মক কার্যকলাপ থেকে বিরত থাকবে। কিন্তু গবর্মেন্ট এই আপোষের পথ গ্রহণ না করলে সমগ্র প্রজাশক্তি অহিংসামূলক অথচ সংগ্রামী পথ নিতে বাধ্য হবে, স্বাধীনতার উদ্দেশ্যে সেটিই হবে শেষ যুদ্ধ। জনসাধারণের উদ্দেশে চিত্তরঞ্জনের এই শেষ ভাষণ কিন্তু অনেককেই খুশি করতে পারেনি— বিপ্লবীরা ও তাঁর অনুগামীদের মধ্যে অনেকেই প্রকাশ্যে এর বিরোধিতা করেন। চিত্তরঞ্জনের আশা ছিল, এই প্রস্তাবে কিছু সুফল দেখা দেবে। কিন্তু সরকারপক্ষ এটিকে তাঁর পরাজয় বলেই মনে করলেন, লিটন একটি নিষ্ঠুর সত্য উচ্চারণ করেন, 'Politically speaking... C.R. Das died at Faridpur'।[১৭৪]

চিত্তরঞ্জনের মৃত্যু ভারতীয় রাজনীতিতে একটি মৌলিক পরিবর্তন আনয়ন করল। তাঁর ব্যক্তিত্ব ও ব্যবহারজীবীসুলভ যুক্তিপূর্ণ ভাষণে পর্যুদস্ত হয়ে গান্ধীজিকেও প্রত্যক্ষ রাজনীতি থেকে অপসৃত করে খদ্দরপ্রচার, অস্পৃশ্যতানিবারণ ও সাম্প্রদায়িক ঐক্যসাধনার কর্মক্ষেত্রে নির্বাসিত করেছিল, দাশের মৃত্যু তাঁকে আবার রাজনীতির কেন্দ্রে ফেরার সুযোগ করে দিল। মোতিলাল নেহরু সক্রিয় থাকলেও স্বরাজ্যদলে ভাঙন দেখা দেয়। ড অমলেশ ত্রিপাঠী বার্কেনহেডের কাছে চিত্তরঞ্জনের ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাস-প্রাপ্তির দুরাশাকে লক্ষ্য করে পরিস্থিতিটির একটি সুন্দর বিশ্লেষণ করেছেন :

দাশের অমূলক আশা স্বরাজপন্থী রাজনীতির দুর্বলতারই দ্যোতক। মর্লের কাছে গোখ্‌লের প্রত্যাশা যেমন প্রহসনে পরিণত হয়েছিল, তেমনি রিডিং-বার্কেনহেডের কাছে দাশের প্রত্যাশা। অথচ অতুলনীয় দেশপ্রেম, ত্যাগ, সংগঠনশক্তি, গণ-আবেদন সবই তাঁর ছিল। সহযোদ্ধারা ছিলেন নিজ নিজ ক্ষেত্রে কৃতী ও নিবেদিত। তবু কেন এমন হল? বাইরে থেকে বাংলা স্বরাজ দলের কর্মসমিতি গুণিজনের সমাহার মনে হলেও তাঁদের অন্তর্দ্বন্দ্বই দুর্বলতার অন্যতম কারণ। তাঁর মৃত্যুর পর করপোরেশন ও দলের কর্তৃত্ব নিয়ে লজ্জাজনক কলহ তার প্রমাণ। দ্বিতীয় কারণ, লক্ষ্য অযৌক্তিক না হলেও উপায় অনেক ক্ষেত্রে অবাস্তব ছিল। হিন্দু-মুসলিম প্যাক্টের জন্য দেশবন্ধু শ্রদ্ধেয়, কিন্তু মন্ত্রীদের বেতন নামঞ্জুর করে ডায়ার্কির পতন ঘটাতে তাঁকে চাকুরি ও অর্থ দরাজ হাতে বিতরণ করতে হয়েছিল। তৃতীয়ত, এই প্যাক্টের জন্য রক্ষণশীল হিন্দুদের বিরাগভাজন হন তিনি, অথচ প্রতিক্রিয়াশীল মুসলিমদের আস্থা অর্জন করতে পারেননি। ...সরকার ভালভাবেই জানতেন এমন 'সুবিধাবাদী বিবাহ' বেশিদিন টিকবে না। চতুর্থত, শ্রমিক সংগঠনের ব্যাপারে দেশবন্ধুর কোন সত্যকার উৎসাহ দেখি না। কৃষকদের ঋণমকুব বা ভাগচাষীদের স্বার্থরক্ষায়ও তিনি ব্যর্থ হন দলীয় জমিদার-মহাজন শক্তির প্রতিবন্ধকতায়। বাংলার গ্রামাঞ্চলে শ্রেণীসংগ্রাম যে কোন সময় সাম্প্রদায়িক সংগ্রামের রূপ নিত, দাশ সেই মৌল দ্বন্দ্বের নিরসন করতে পারেননি। পঞ্চমত, হিংসায় বিশ্বাস না করলেও রাজনৈতিক কারণে তার প্রতিবাদও তিনি করতে পারেননি, বরং গোপীনাথ সাহার পক্ষ নিয়ে সিরাজগঞ্জ ও এ আই সি সি-তে লড়াই করেছেন।...

দুর্ভাগ্যবশত বাংলার স্বরাজ দল দাশের মৃত্যুর পর প্রায় ভেঙে যেতে বসল। দাশের শূন্য আসন নেবেন কে? তাঁরই সঞ্চিত ও ধারকরা টাকায় দল চলত; তিনি নরম, গরম, হিন্দু, মুসলমান, গ্রাম ও শহর-এর একটা কাজচলা সমন্বয় তৈরি করতে পেরেছিলেন, শুধু আপন ব্যক্তিত্ব ও ত্যাগের মহিমায়; তাঁরই বুদ্ধি, বিচক্ষণতা ও সাহস গান্ধীর মত প্রতিপক্ষকে নির্বীর্য করেছিল। অদৃষ্টের পরিহাস, সেই গান্ধীর শরণ নিতে হল দাশের উত্তরাধিকারী নির্বাচনে। গোয়েন্দা দফতরের মতে প্রথমে তিনি অরবিন্দকে ফিরে আসতে অনুরোধ জানান এবং তাতে ব্যর্থ হয়ে, আজাদের পরামর্শে, যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তের মস্তকে স্বরাজ দলের নেতৃত্ব, কলিকাতা করপোরেশনের মেয়র পদ ও প্রাদেশিক কংগ্রেসের সভাপতিত্ব রূপ 'ত্রিমুকুট' পরিয়ে দেন। বলা বাহুল্য, বিভেদপ্রবণ ও উচ্চাকাঙ্ক্ষী বাঙালীদের অনেকেই এটা পছন্দ করেননি। সেই থেকে বাংলার কংগ্রেসী রাজনীতিতে যে দলাদলির বীজ রোপিত হল, আজ তা বিষবৃক্ষে পরিণত।[১৭৫]

চিত্তরঞ্জনের 'সাগরসঙ্গীত' [জ্যৈষ্ঠ ১৩২১] কাব্যগ্রন্থ প্রকাশের পরে কোনো অজ্ঞাত কারণে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের অবনতি ঘটে, তাঁর অর্থানুকুল্যে ও সম্পাদনায় প্রকাশিত 'নারায়ণ' [প্রথম প্রকাশ : অগ্র ১৩২১] মাসিক পত্রিকা রবীন্দ্র-বিরোধী আলোচনা প্রকাশের একটি অন্যতম মাধ্যমে পরিণত হয়, রাজনৈতিক আলোচনাতেও চিত্তরঞ্জন রবীন্দ্রনাথের মতের বিরোধিতায় প্রবৃত্ত হন। কিন্তু দেশনেতা 'দেশবন্ধু'তে পরিণত চিত্তরঞ্জনের অকালমৃত্যু রবীন্দ্রনাথকে উভয়সংকটে ফেলল, রথীন্দ্রনাথকে লেখা তাঁর পূর্বোদ্ধৃত পত্রেই তা

অত্যন্ত স্পষ্ট। বিশ্বের দিক থেকে মুখ-ফেরানো গান্ধীজির আত্মকেন্দ্রিক অসহযোগ আন্দোলন তিনি সমর্থন করতে পারেননি, চিত্তরঞ্জনের নাস্তিক্যবাদী রাজনীতিও তাঁর আদর্শের পরিপন্থী ছিল। সুতরাং এই অবস্থায় কোনো শোকসভায় যদি তাঁকে সভাপতিত্ব করতে হত, তাহলে তিনি খুবই অসুবিধায় পড়তেন— পরিবর্তে ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের অনুরোধে তাঁকে যে কবিতিকাটি লিখে দিতে হল, তাতে তিনি অসাধারণ প্রতিভায় সবদিক রক্ষা করেছেন, তাঁর ইংরেজি-বাংলা দুটি শোকজ্ঞাপক বাণীতেও তিনি চিত্তরঞ্জনের রাজনীতি সম্পর্কে নীরব থেকে তাঁর ত্যাগের মাহাত্ম্যকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। কিন্তু পরে যখন প্রায় প্রতি বৎসর তাঁর কাছ থেকে কবিতা বা বাণী চাওয়া হয়েছে তখন তিনি নিজের বিরক্তিকে চেপে রাখতে পারেননি।

চিত্তরঞ্জনের সঙ্গে দার্জিলিঙে দেখা করতে যাওয়ার আগে গান্ধীজি শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলেন, তার উদ্দেশ্য ছিল চরকা ও অস্পৃশ্যতাবিরোধী আন্দোলনে রবীন্দ্রনাথের সমর্থন সংগ্রহ করা, বস্তুত এই উদ্দেশ্যেই এই বৎসরের গোড়া থেকে বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে তিনি সফর করছিলেন। কিন্তু অসহযোগ ও খিলাফত আন্দোলন আরম্ভ করার পূর্বে রবীন্দ্রনাথ নিজে 1920-তে গান্ধীজির কাছে অস্পৃশ্যতা দূরীকরণকে তাঁর আন্দোলনের অঙ্গীভূত করার প্রস্তাব করেন, 'Gandhiji could not then accept the suggestion because he thought he had already committed himself to a heavy programme of activities centered round non-cooperation' [দ্র রবিজীবনী ৮। ৪]। এখনকার পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে চরকা ও অস্পৃশ্যতানিবারণ গান্ধীজির গঠনমূলক কর্মসূচির দুটি প্রধান অঙ্গ হয়ে দাঁড়ায়— যাদের মধ্যে চরকাকে স্বাধীনতার জন্য আন্দোলনে কোনো গুরুত্ব দিতেই রবীন্দ্রনাথ প্রস্তুত ছিলেন না, আর অস্পৃশ্যতা নিবারণের আন্দোলনে বর্ণাশ্রমপ্রথা ও তথাকথিত নিম্নবর্ণের মানুষদের প্রতীকপূজাকে সমর্থন করতেও তাঁর আপত্তি ছিল— 'চরকা' ও 'স্বরাজসাধন' প্রবন্ধে তাঁর আপত্তির কারণসমূহ সবিস্তারে ব্যাখ্যাত হয় ['The Cult of the Charka' ও 'Striving for Swaraj' নামে সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর-কৃত ইংরেজি অনুবাদে যার বহুল প্রচার ঘটেছিল], গান্ধীজি যার প্রথমটির জবাব দিয়েছিলেন 'The Poet and the Charka' ও 'The Poet and the Wheel' নামক দুটি রচনায়, দ্বিতীয়টির কথা কোথাও উল্লেখ করেননি। রবীন্দ্রনাথ অবশ্য কিছুকাল পরে পূর্ববঙ্গ সফরে গিয়ে কুমিল্লায় অভয় আশ্রমের কাজকর্মে সেখানকার গঠনমূলক কার্যাবলি ও অস্পৃশ্যতানিবারণ-মূলক কাজ দেখে বিভিন্ন ভাষণে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন।

তাঁর বিভিন্ন রচনায় রবীন্দ্রনাথকে 'স্যার' উপাধি-সহ উল্লেখ করায় এক ব্যক্তি আপত্তি জানালে তিনি 21 Dec 1925 ব্যক্তিগত পত্রে বিধুশেখর শাস্ত্রীকে একটি অর্থহীন ব্যাখ্যা লিখে পাঠান :

...Gurudev's title was not used in ignorance. I knew that he had not renounced the title but had asked to be relieved of it. He was not so relieved. And Andrews and I had a discussion over it and we both came to the conclusion that the title not having been taken away, we, Gurudev's friend should make no fuss about it. We also felt that it would be courtesy even to make use of the title now and then. I know what poison has been emitted over these boycotts. I have therefore gone out of my way to describe titled personages by their titles in order to show that the use of titles was no crime. It was thus out of regard for Gurudev that I used the

title. It was used so automatically that I knew that I had used it, only when Mahadev drew my attention to it, on receipt of Ramachandran's letter.[১৭৬]

—কৌতুকের বিষয়, গান্ধীজির পরামর্শদাতা অ্যান্ডরুজ কিন্তু জালিয়ানওয়ালা বাগের ঘটনার পরে কখনও রবীন্দ্রনাথকে 'স্যার' বলে উল্লেখ করেননি!

চিত্তরঞ্জনের অকালমৃত্যুর পরে গান্ধীজি ভারতীয় রাজনীতিতে আবার প্রায় একচ্ছত্র প্রাধান্য লাভ করলেও 22 Sep 1925 পাটনায় অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের অধিবেশনে সভাপতির আসন থেকে স্বরাজ্য দলের সঙ্গে গোঁড়া কংগ্রেসিদের বোঝাপড়া করে চলবার প্রস্তাব করেন। তিনি বলেন, যেখানে উভয়পক্ষের শক্তি সমান সেখানে 'নো-চেঞ্জার'রা স্বরাজ্যবাদীদের হাতে ক্ষমতা ও অফিস ছেড়ে দেবেন— যেখানে তাঁদের শক্তি অধিক সেখানেও স্বরাজ্যবাদীদের কাজে বাধা না দিয়ে সহযোগিতা করবেন। তিনি যথাসম্ভব স্বরাজীদেরই সাহায্য করবেন, কিন্তু কংগ্রেসের নীতি নির্ধারণ করবেন সরোজিনী নাইডু মোতিলাল নেহরুর সঙ্গে পরামর্শ করে।

নবেম্বর মাসের শেষদিকে সবরমতী আশ্রমের কিছু ব্যক্তির নৈতিক বিচ্যুতির জন্য তিনি সাতদিন অনশন করেন। 3 Jan 1926 ঘোষণা করেন, তিনি এক বৎসরের জন্য রাজনীতি থেকে অবসর নিয়ে আশ্রমেই অবস্থান করে বিশ্রাম নেবেন। যদিও তার অব্যবহিত আগে কানপুরে অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশনে দক্ষিণ আফ্রিকার পরিস্থিতি নিয়ে তিনি একটি জোরালো ভাষণ প্রদান করেন।

কিন্তু গান্ধীজির নিঃশর্ত সমর্থন সত্ত্বেও স্বরাজ্যদলে ভাঙন দেখা দিল। ক্ষমতার অলিন্দের এত কাছাকাছি থেকে কাউন্সিলে শুধু বাধাদানের নীতি অনেকেরই পছন্দ হচ্ছিল না, সরকারের সহযোগিতায় যতটা সম্ভব দেশের মঙ্গলের জন্য এমন-কি মন্ত্রিত্ব গ্রহণের কথাও কেউ-কেউ ভাবছিলেন; মারাঠি সদস্য মুঞ্জে, কেলকার, জয়াকর প্রভৃতি স্বরাজ্য দল থেকে বেরিয়ে 'রেসপনসিভ কো-অপারেশন' দল গঠন করেন— ইংরেজরা গোপনে অনেককে লোভও দেখাচ্ছিলেন। ফলে 1926-এর শেষে কাউন্সিল-নির্বাচনে স্বরাজ্য দলের ভরাডুবি ঘটে।

আমরা আগেই বলেছি, রবীন্দ্রনাথের ইতালি সফর নিয়ে একটি ভুল-বোঝাবুঝির সৃষ্টি হয়েছিল— তার কারণ সেখানে বেনিতো মুসোলিনি নামক স্বৈরতান্ত্রিক এক ফ্যাসিস্ত রাষ্ট্রনায়ক ও তাঁর দলের উপস্থিতি, যাঁরা প্রথমে রবীন্দ্রনাথের মানবিকতাবাদী বক্তব্যের সমালোচনায় মুখর হয়েও পরে নিজেদের দলের স্বার্থেই তাঁর নাম ও তাঁর প্রশংসাবাক্য ব্যবহারের সুযোগ নেবার জন্য বিশ্বভারতীর উদ্দেশ্যে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেন। এতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই, অনেক ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান, এমন-কি রাষ্ট্রও, রবীন্দ্রনাথকে নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করেছে বা করছে— কয়েক বছর আগেও সোভিয়েত রাশিয়া বা তার অনুরাগী গোষ্ঠী 'আপাতত রাশিয়ায় এসেছি— না এলে এ জন্মের তীর্থদর্শন অত্যন্ত অসমাপ্ত থাকত'-জাতীয় শব্দগুচ্ছ প্রাসঙ্গিক বা অপ্রাসঙ্গিকভাবে উদ্ধৃত করত— দেশেও অনুরূপ লাগসই বাণী উদ্ধারে আমরা কেউই কার্পণ্য করি না। ইতালিতে যাওয়ার কয়েকমাস পূর্বে চিনের যুবকদল ও একশ্রেণীর বুদ্ধিজীবী রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে প্রায় কিছু না পড়ে বা জেনে যে বিরোধিতায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন, তার সঙ্গে এই ফ্যাসিস্ত বিরোধিতা বা তোষণের প্রকৃতপক্ষে কোনো পার্থক্য নেই।

গণতন্ত্রের যে-রূপ রবীন্দ্রনাথ ইংল্যান্ড, আমেরিকা বা অন্যান্য দেশে প্রত্যক্ষ করছিলেন তাদের তিনি-যে প্রশংসাযোগ্য বলে মনে করতেন না, তাঁর রচনা মন দিয়ে পড়লেই সেটি বোঝা যায়। তাই ফর্মিকির মুখে তিনি যখন শোনেন, প্রথম মহাযুদ্ধের পরে ইতালির রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিশৃঙ্খলা দূর করতে মুসোলিনিকে কিঞ্চিৎ জবরদস্তি প্রয়োগ করতে হয়, এটি জেনে রবীন্দ্রনাথের মানবতাবাদ তাতে পীড়া বোধ করবেই তিনি এতটা নীতিবাগীশ ছিলেন বলে মনে হয় না।

22 Jan 1925 রবীন্দ্রনাথ ইতালির মিলান শহরে একটি বক্তৃতা করেন বলে নেপাল মজুমদার উল্লেখ করেছেন, সেটি অনবধানতাবশত যথাস্থানে উল্লেখ না করার জন্য আমরা লজ্জিত বোধ ক'রে প্রসঙ্গটি এখানে সংযোজিত করে দিচ্ছি। তিনি লিখেছেন : এইদিন 'মিলানের ছাত্র ও বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় আসিয়া কবির আন্তর্জাতিক মানবতাবাদ সম্পর্কে বিস্তারিত পরিচিত হইতে চাহিলেন। মিলানের জনৈক ছাত্রের প্রশ্ন-জিজ্ঞাসাকে উপলক্ষ করিয়া তিনি এক সাংবাদিক সম্মেলনে 'People and Nation' নামক একটি লিখিত বিবৃতি পাঠ করেন। এই বিবৃতিতে তিনি ন্যাশনালজিম সম্পর্কে এক নূতন দৃষ্টিভঙ্গিতে বিচার-বিশ্লেষণ করিলেন, উহা খুবই প্রণিধানযোগ্য।'[১৭৭] এটি 23 Feb 1925-সংখ্যা *The Manchester Guardian*-এ প্রকাশিত হয়। তিনি নেশন ও ব্যক্তির পার্থক্যটি একটি উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে দেন :

> I regard the difference between people and nation as the same as that between the natural and the professional man—that is, between man the father, the husband, the friend, and man the physician, the lawyer, the soldier, or the man of business. We often find real and fundamental differences between these two aspects in the same individual, between the natural and the professional. The one can be kind and hospitable, and so forth; the other grasping, deceitful, and cruel. So when I judge a people I judge them, not only from that completely human aspect, for as people they may have their love of humanity and of nature, but also as a nation, for in their national aspect they can be selfish and cruel.

যে-মানুষ সাধারণভাবে অপরের উপকার করতে চায়, সে-ই পেশাদারি পোশাকে অন্যরূপ ধারণ করে। পশ্চিমের জনগণের মধ্যে এই প্রবণতা অনেক বেশি যা তাদের মানবতাবোধকে অনেকটা আচ্ছন্ন করেছে। 'It is this professional aspect which is the national aspect. The people are naturally creative, from them come art, religion, poetry and song, but in their professional only the machinery and the organisation for producing things.' এই প্রবৃত্তি ক্রমশ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়ে তাদের মানবতাবোধ, ন্যায়বিচারের বোধ ও সত্যের বোধকে বিনষ্ট করেছে। তাদের সম্পদ যত বেড়েছে শক্তিমত্তার বৃদ্ধিও ঘটেছে সমপরিমাণে। তবে কি নেশন শুধু সংশোধনের অতীত অকল্যাণ মাত্র? আত্মরক্ষার জন্য পেশাদারি ব্যবস্থার প্রয়োজন। তবে তার প্রয়োজন হয় যখন আমরা প্রতিবেশীর সাহায্য সম্পর্কে সন্দিহান হই। এই পারস্পরিক সন্দেহ, অবিশ্বাস ও ভীতির জন্য পশ্চিমের দেশগুলি বিরাট সামরিক বাহিনী গড়ে প্রতিবেশী রাষ্ট্রের দিকে শাণিত অস্ত্র সাজিয়ে রেখেছে।

হয়তো অর্থনৈতিক বা রাজনৈতিক কারণেই এরূপ পরিস্থিতি দেখা দিয়েছে। কোনো দেশ যখন সৈন্যবাহিনী, নৌবাহিনী প্রভৃতি পেশিবলের বিস্তার ঘটায় তার মোকাবিলা করার জন্য অন্য দেশকেও একই পথ নিতে হয়। এটি হয়তো প্রয়োজনীয়, কিন্তু নিন্দনীয়ও বটে। নিজেকে বড় করে দেখানোর এই আড়ম্বরে জার্মানি তার সামঞ্জস্য হারিয়েছে, ব্রিটেনও সেই সাধনায় মত্ত, আমেরিকাও তখন এই শক্তিসাধনায় মত্ত হয়ে বিশাল নিখুঁত অস্ত্রসম্ভার নির্মাণের কাজে নিজেদের বৈজ্ঞানিক বুদ্ধিকে নিয়োজিত করছে। পাশ্চাত্য সভ্যতায়

বিজ্ঞানের এই অগ্রগতি শ্রদ্ধেয়, কিন্তু একে পুরোপুরি মানবকল্যাণে নিয়োগ করা হয় না এইটাই দোষের— 'you have used it for the purpose of killing, as the Spanish made use of gunpowder to obliterate completely that wonderful civilisation of the Incas in Peru. Is gunpowder such a great thing?' ফর্মিকির লেখা পূর্বোক্ত প্রবন্ধে এই সাক্ষাৎকার ও 'লিখিত' ভাষণের কোনো উল্লেখ নেই। নেপাল মজুমদার লিখেছেন, পরের দিন মিলানের আর-একটি সভায় রবীন্দ্রনাথ এই কথাগুলিই আরও বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করেন 'The Voice of Humanity' বক্তৃতায়— কিন্তু সেটি মৌখিক ভাষণ ছিল।

প্রাসঙ্গিক তথ্য : ৩

১ বৈশাখ ১৩৩২ [মঙ্গল 14 Apr 1925] প্রাতঃকালে মন্দিরে রবীন্দ্রনাথের নববর্ষের উপাসনা দিয়ে বৎসরটির সূচনা হয়। অমিতা ঠাকুর [চক্রবর্তী] একটি অপ্রকাশিত স্মৃতিকথায় লিখেছেন : '১৯২৫ সালে মন্দিরের পর কোণার্কের উঁচু চাতালে জন্মোৎসব উপলক্ষ্যে সকালে গান আবৃত্তি এসব হবে ও রাত্রে লক্ষ্মীর পরীক্ষা অভিনয়। কলকাতা থেকে সেবার বহু লোক গিয়েছিলেন শিশির ভাদুড়ি মশায়ের কথাটা এই উপলক্ষ্যে মনে আছে। আমাকে দুদিন আগে ২৫শে বৈশাখ কবিতাটি পড়িয়ে ঠিক করে দিয়ে মুখস্থ করতে বলেছেন··· আমি সেজেছিলাম ক্ষিরি।' অমিতা দেবী হয়তো একটু ভুল লিখেছেন, তখনও ১ বৈশাখ রবীন্দ্রনাথের জন্মোৎসব পালনের প্রথা শান্তিনিকেতনে চালু হয়নি। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের চিঠি থেকেই জানা যায়, 'ছোট মেয়েরা লক্ষ্মীর পরীক্ষা অভিনয় করেছিল।'

এবারে গ্রীষ্মাবকাশ ঘোষিত হয়েছিল ১৭ বৈশাখ [30 Apr 1925] থেকে ৯ আষাঢ় [23 Jun] রথযাত্রার দিন পর্যন্ত। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ আশ্রমেই ছিলেন, ২৫ বৈশাখ [8 May] কলকাতা থেকে আগত বহুজনের উপস্থিতিতে সকালে তাঁর জন্মোৎসব পালিত হয়, তিনি উত্তরায়ণের উত্তর-পূর্ব কোণে পথের ধারে মন্ত্র ও 'মরুবিজয়ের কেতন উড়াও' গানের সঙ্গে পঞ্চবটী রোপণ করেন। এইদিন রাত্রেও বালিকারা 'লক্ষ্মীর পরীক্ষা' অভিনয় করে— 'অমিতা ক্ষীরি আর গৌরী মালতীর পার্ট খুব ভাল করেছিল।' সজনীকান্ত দাস জানিয়েছেন, তাঁদের অনুরোধে এদিনও কলাভবনে সুন্দর-এর গানগুলি গাওয়া হয়।

গান্ধীজি চরকা ও খদ্দর প্রচারের জন্য বাংলায় এসে বহু স্থান পরিভ্রমণ করেন, এই উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আলোচনার জন্য তিনি শান্তিনিকেতনে আসেন ১৫ জ্যৈষ্ঠ [29 May] রাত্রে, দুদিন দীর্ঘ আলোচনার পরেও তিনি রবীন্দ্রনাথকে স্বমতে আনতে পারেননি। তিনদিন এখানে থেকে সুরুলের কৃষিবিভাগ শ্রীনিকেতন ইত্যাদি পরিদর্শন করে তিনি অসুস্থ চিত্তরঞ্জন দাশের সঙ্গে সাক্ষাতের উদ্দেশে কলকাতার পথে দার্জিলিং রওনা হন 2 Jun তারিখে।

চিত্তরঞ্জনের অকালমৃত্যু ঘটে ২ আষাঢ় [16 Jun], ৯ আষাঢ় বিশ্বভারতীর কাজ শুরু হলে এই উপলক্ষে একদিন অনধ্যায় ঘোষিত হয়; 'তাঁহার জীবনী আলোচনার নিমিত্ত কলাভবনে একটি সভার অধিবেশন হয়। তাহাতে শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, চৈনিক অধ্যাপক লিম্ মহাশয়, শ্রীযুক্ত কালীমোহন ঘোষ ও শ্রীযুক্ত নেপালচন্দ্র রায় মহাশয়গণ দেশবন্ধুর নানামুখী কর্ম্মজীবন ও বিস্ময়কর ত্যাগ মাহাত্ম্যের পর্য্যালোচনা করেন।

জ্যৈষ্ঠ-সংখ্যা শান্তিনিকেতন-এ সংবাদ দেওয়া হয়েছে, যেসব ছাত্র এবার বিদ্যালয় থেকে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা দিয়েছিলেন [বিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায়, অজয়কুমার সেন, হরিপদ ঘোষ, হিরণকুমার দাস, রণেন্দ্রবিজয় দাস, দেবব্রত রায়, দাশরথি চট্টোপাধ্যায় ও সুপ্রসন্ন চক্রবর্তী] তাঁরা সকলেই উত্তীর্ণ হয়েছেন। ছুটির পরে পূর্ব ও উত্তর বিভাগে অনেকগুলি নূতন ছাত্রছাত্রী এসেছেন। আষাঢ়-সংখ্যায় জানানো হয়, ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার মতো বিদ্যালয়ের আই.এ. ও বি.এ. পরীক্ষার ছাত্রছাত্রীরা আগামী বৎসর থেকে প্রাইভেট পরীক্ষার্থী হিসেবে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা দিতে পারবেন।

প্রসঙ্গটি নিয়ে রবীন্দ্রনাথ দু'দিন অধ্যাপকদের সঙ্গে আলোচনা করেন। আলোচনার মর্মটি আষাঢ়-সংখ্যা শান্তিনিকেতন-এ [পৃ ১৪১-৪২] প্রকাশিত হয় :

সম্প্রতি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষগণ বিশ্বভারতীর ছাত্রগণকে আই.এ ও বি.এ পরীক্ষা দিবার অনুমতি দিয়াছেন। খবরটি নানারকমে নানাজনের কাছে পৌছিয়াছে। আশঙ্কা হইতেছে সত্য ঘটনার চেয়ে গুজব অংশই সকলকে অধিক আকৃষ্ট করিবে। অনেকে ভয় করিয়াছেন যে বিশ্বভারতী বুঝি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের করদ বিদ্যালয়রূপে পরিবর্ত্তিত হইল। বস্তুত কোনোরূপ affiliation হয় নাই— কিম্বা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাহার কোনো নিয়ম ইহার উপর খাটাইবে না বা বিশ্বভারতী উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো নিয়মের বাধ্যকতা মানিবে না। বিশ্বভারতীর বিদ্যালয়বিভাগ হইতে যেমন সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে ছাত্ররা ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা দেয়— তাহাতে যেমন বিদ্যালয়ের বিশেষত্ব কোনো অংশে খর্ব্ব হয় না— তেমনি স্বাধীন ভাবেই ছাত্ররা আই.এ ও বি.এ পরীক্ষা দিতে পারিবে। সত্য বটে তাহারা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্দ্দিষ্ট পাঠ্য পড়িতে বাধ্য হইবে কিন্তু বিশ্বভারতীর কর্তৃপক্ষগণ এমন ব্যবস্থা করিবেন যাহাতে তাহারা এখানে থাকিয়া পরীক্ষার পাঠ্য বহির্গত কোনো কোনো বিষয় শিখিতে পারে। বিশ্বভারতীতে বিদ্যাচর্চ্চার যে বিপুল আয়োজন করা হইয়াছে— নানা কারণে তাহা কাজে লাগাইতে পারে এমন ছাত্রের খুবই অভাব। এই উপায়ে দ্বার মুক্ত হইলে— বয়স্ক ছাত্ররা আসিলে হয়তো তাহারা এই আয়োজনকে অন্তত কিঞ্চিৎ পরিমাণেও সার্থক করিতে পারিবে। এইখানকার উদার মাঠের সরল জীবনযাত্রার মধ্যে প্রকৃতির স্বহস্তের শুশ্রূষার মধ্যে ঋতু পরম্পরায় বৈতালিক— জ্ঞান ও গানের আবহাওয়ার মধ্যে ছাত্ররা সহরের ঘূর্ণীবাত্যা হইতে বাড়িয়া উঠিবে— জীবনের পাথেয় সংগ্রহ করিবে— ইহাও কম লাভ নহে।

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় উত্তর বা কলেজ বিভাগের অধ্যক্ষের পদ গ্রহণ করেন। তাঁর কন্যা শান্তা দেবী লিখেছেন : '১৯২৫এর জুলাই মাসে রামানন্দকে বিশ্বভারতী কলেজের প্রিন্সিপ্যাল করার কথা হয়। এই সময় হইতে শান্তিনিকেতন কলেজের ছেলেরা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা দিতে অনুমতি পান। সেই উপলক্ষ্যে বিশ্ববিদ্যালয় ও বিশ্বভারতীর পক্ষ হইতে একদল অধ্যাপক ১১ই জুলাই শান্তিনিকেতনে যান। তাঁহারা ১২ই জুলাই কলিকাতা ফিরিয়া আসেন।'[১৭৮] রামানন্দ এই পদে দীর্ঘদিন কাজ করেননি, তিনি ৬ ভাদ্র [22 Aug] পদত্যাগের ইচ্ছা প্রকাশ করে রবীন্দ্রনাথকে কারণস্বরূপ লেখেন :

আমি যখন শিক্ষাভবনের অধ্যক্ষের পদ আপাততঃ পাঁচমাসের জন্য গ্রহণ করিয়াছিলাম, তখন আমার এই ধারণা ছিল যে, ইহা বাহিরের কোন কর্তৃপক্ষের শাসন পরিদর্শন-আদির অধীন হইবে না। এক্ষণে দেখিতেছি, সে ধারণা ভ্রান্ত। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিষ্ট্রার যে চিঠির দ্বারা বিশ্বভারতীকে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আই-এ, ও বি-এ পরীক্ষার জন্য ছাত্র পাঠাইবার অনুমতি দিয়াছেন, তাহাতে এই সর্ত্তের উল্লেখ আছে, যে, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এক বা একাধিক ব্যক্তির দ্বারা মধ্যে মধ্যে বিশ্বভারতী অথবা শিক্ষাভবন পরিদর্শন করাইবেন। এ বিষয়ে বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষের মত কি, তাহা আমি জানি না। কিন্তু আমি বাহিরের কোন কর্তৃপক্ষের পরিদর্শনের অধীন কোন। বিদ্যামন্দিরের কাজ করিতে অনিচ্ছুক ও অসমর্থ। এই জন্য আমি দুঃখের সহিত শিক্ষাভবনের অধ্যক্ষতা কার্য্যে ইস্তফা দিতেছি। আপনি দয়া করিয়া ইহা গ্রহণ করিলে উপকৃত হইব।[১৭৯]

পরদিন আবার লেখেন : 'কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় রেগুলেশ্যন্সের যে ধারা অনুসারে বিশ্বভারতীকে তাঁহাদের পরীক্ষায় ছাত্র পাঠাইবার অনুমতি দিয়াছেন, তাহা দেখিলাম। তাহাতে পরিদর্শন করা বা না করা কিছুরই উল্লেখ নাই। যে-সব বিশ্ববিদ্যালয় কলিকাতার পরীক্ষা ও উপাধিগুলি recognise করেন, তাঁহারা কেহ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে inspect করিবার সর্ত্ত করেন নাই।'[১৮০]

রবীন্দ্রনাথ এই সময়ে কিছু ব্যক্তিগত কাজ ও 'শেষ বর্ষণ' অভিনয়ের রিহার্সাল দেওয়ার জন্য কলকাতায় ছিলেন, তাই এই আনুষ্ঠানিক চিঠিগুলির কোনো লিখিত উত্তর না পেয়ে আশ্চর্য লাগে, এমন-কি ২১ ভাদ্র নেপালচন্দ্র রায়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সংসদের সভাতেও প্রসঙ্গটি আলোচিত হয়নি দেখে বিস্মিত হতে হয়। যাই হোক, অনুমান করা যায় দুঃখের সঙ্গে এই পদত্যাগপত্র অগত্যা গৃহীত হয়েছিল।

এর অনতিকাল পরে গবর্নর লিটনের নির্দেশে তখনকার D.P.I. E.F. Oaten কলকাতা মাদ্রাসার তৎকালীন অধ্যক্ষ A.H. Harley-কে সঙ্গে নিয়ে 4 Sep 1925 [১৯ ভাদ্র] শান্তিনিকেতনে গিয়ে সেখানকার পরিবেশ ও শিক্ষাব্যবস্থা খুঁটিয়ে দেখে একটি বিস্তৃত রিপোর্ট দেন [দ্র রবীন্দ্রনাথ ও কয়েকজন রাজপুরুষ। ৯৩-৯৭], তখন রামানন্দের পরিবর্তে অ্যান্ডরুজ অস্থায়ীভাবে শিক্ষাভবনের অধ্যক্ষের দায়িত্বে ছিলেন। ওটেন শান্তিনিকেতনে অনুসৃত শিক্ষাপদ্ধতির উচ্চপ্রশংসা করেছিলেন।

এর কিছুকাল পরে লর্ড ও লেডি লিটন 24 Nov [৮ অগ্র] 'প্রাইভেট ভিজিট'-এ শান্তিনিকেতনে এলে তাঁদের বিদায়কালে রবীন্দ্রনাথ গবর্নরের হাতে একটি 'নোট' দেন, তাতে তিনি সম্ভবত বিশ্বভারতীকে অনুমোদিত বিশ্ববিদ্যালয় হিসাবে নিজস্ব ডিগ্রি দেওয়ার অধিকার প্রদান সম্ভব কি না বিচার করার জন্য অনুরোধ জানান, হয়তো পূর্বাহ্নে এইরূপ অনুরোধের জন্যই লিটন সস্ত্রীক শান্তিনিকেতন পরিদর্শনে এসেছিলেন। আমরা জীবনকথা অংশেই জানিয়েছি, বিশ্বভারতীর অনিশ্চিত আর্থিক সংগতি ও উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে যথোপযুক্ত আয়োজনের অপ্রতুলতার কারণে লিটন সরকারি অনুমোদন দেওয়ার অসুবিধার কথা জানিয়েছিলেন, এই বিষয় নিয়ে রবীন্দ্রনাথ ও লিটনের মধ্যে পত্রবিনিময়ের কথাও সেখানে আলোচিত হয়েছে।

৩ শ্রাবণ [রবি 19 Jul] কলাভবনে বর্ষামঙ্গল অনুষ্ঠিত হয়। পিঠাপুরম রাজসভার বীণাবাদক সঙ্গমেশ্বর শাস্ত্রী আবার শান্তিনিকেতনে এসে বীণা বাজিয়ে সকলকে আনন্দ দিতেন। তাঁর বীণাবাদন দিয়েই অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। এর পরে ভীমরাও শাস্ত্রী একটি হিন্দিগান গেয়ে শোনান। অতঃপর রবীন্দ্রনাথ গানের দলকে নিয়ে ছয়টি নবরচিত গান-সহ পনেরোটি বর্ষার গান পরিবেশন করেন। আশ্চর্য ঘটনা, 'ইহার পরে একজন মহিলা আচার্য্যদেবের লিখিত একটি গান গাহিয়াছিলেন। পণ্ডিতজি এই গানটিতে সুর সংযোগ করিয়াছিলেন'! ইচ্ছা-অনিচ্ছায় উপরোধে ঢেঁকি গেলার প্রবচনটি রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে মাঝে মাঝে সত্য হয়ে উঠেছে!

অবশ্য বিশুদ্ধ সুরে রবীন্দ্রনাথের গান-শেখানোর খবরও আষাঢ়-সংখ্যায় পরিবেশিত হয়েছে : 'বিশ্বভারতীর সঙ্গীতের ছাত্র ও অধ্যাপক শ্রীঅনাদিকুমার দস্তিদার সম্প্রতি গান শিখাইবার জন্য কলিকাতায় বাস করিতেছেন। ইনি পাঁচ বৎসর এখানে থাকিয়া আচার্য্য রবীন্দ্রনাথের বহু গান শিখিয়া ও শিখাইয়া বহুদর্শিতা লাভ করিয়াছেন। যাঁহারা রবীন্দ্রনাথের গান নিখুঁত সুরে শিখিতে চান নিঃসন্দেহে তাঁরা ইঁহার নিকট হইতে অনেক সাহায্য পাইবেন।' রবীন্দ্রনাথের গান-শেখানো জীবিকার্জনের মাধ্যম হতে পারে অনাদিকুমারের এই প্রয়াস সম্ভবত তার প্রথমতম দৃষ্টান্ত।

বিপরীত উদাহরণও আছে। মারাঠি ছাত্র বামনমোহন শিরোধকর তিন বৎসর সংগীতশিক্ষা করে চিত্রবিদ্যা শেখার কাজে আত্মনিয়োগ করেন।

আরও একটি সংগীতানুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় ১৯ শ্রাবণ [মঙ্গল 4 Aug] রাখী পূর্ণিমার রাত্রে কোণার্ক গৃহে— এইদিন আবার চন্দ্রগ্রহণও ছিল। 'যথাসময়ে আশ্রমবাসিগণ উপস্থিত হইয়াছিলেন— এমন সময়ে

মুষলধারে বৃষ্টি আসিয়া পড়াতে আসন্ন শরতের গান পরিবর্ত্তন করিয়া অকস্মাৎ বর্ষার সুর ধরা হইল। বর্ষার সুরে ও বর্ষার জলে সেদিনকার উৎসব সরস হইয়া উঠিয়াছিল।'

কলাভবনের কাজকর্ম ও সংগ্রহ এই সময়ে বহুবিস্তৃত হয়। কলকাতা, লখনৌ, লাহোর, মাদ্রাজ, বাঙ্গালোর, আদিয়ার, সিমলা প্রভৃতি স্থানে অনুষ্ঠিত প্রদর্শনীতে কলাভবন থেকে ছবি পাঠানো হয়। লখনৌতে All India Art Exhibition-এ নন্দলাল বসু ও রামকিঙ্কর প্রামাণিক [বেইজ] সুবর্ণপদক প্রাপ্ত হন। সুকুমারী দেবী কলাভবনের মেয়েদের সূচের কাজ ও decorative design যত্নের সঙ্গে শেখাচ্ছেন, লাহোরে তাঁর আলংকারিক নকশা গত বৎসর ১০০ টাকা পুরস্কার লাভ করে। তিনি আলপনায় সিদ্ধহস্ত, তাঁর শিক্ষায় মেয়েরাও এই বিষয়ে পরিপক্ক হয়ে উঠছেন, আশ্রমের উৎসবসমূহে তাঁদের হাতের কাজ অতিরিক্ত সৌন্দর্য সংযোজিত করে।

নন্দলাল চিন-জাপান ভ্রমণের সময়ে সেখানকার অনেক বিখ্যাত শিল্পীর আঁকা ছবি সংগ্রহ করেন। টাইকান একটি প্রকাণ্ড মাকিমনো কলাভবনে উপহার দেন, সামামুরা থানজানও একটি মাকিমনো উপহার দিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের পেরুযাত্রার ফলেও দুটি বড়ো আকারের তৈলচিত্র উপহার পাওয়া যায়। নন্দলাল ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে গৌড় ভ্রমণে গিয়েছিলেন, সেখান থেকে তাঁরা বেশ-কয়েকটি শিল্পবস্তুর ছাঁচ সংগ্রহ করে নিয়ে আসেন।

সুরেন্দ্রনাথ কর ইংল্যান্ড থেকে লিথোগ্রাফি ও বই-বাঁধানো শিখে আসেন, রবীন্দ্রনাথের আগ্রহে কিছু যন্ত্রপাতিও কিনে আনা হয়। গগনেন্দ্রনাথ তাঁর ব্যঙ্গচিত্রগুলি ছাপার জন্য একটি লিথো-প্রেস কিনেছিলেন, সেটি শান্তিনিকেতনে নিয়ে এলে রমেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী বিদ্যাটি নিষ্ঠাসহকারে আয়ত্ত করলেন। বই-বাঁধানো শিখলেন ভি. আর. চিত্রা ও শোকলা সাঁওতাল।

কলাভবনের ছাত্র অর্ধেন্দুপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় আদিয়ারে Guindy School-এ ও মণীন্দ্রভূষণ গুপ্ত কলম্বোর আনন্দ কলেজে চিত্রবিদ্যার অধ্যাপকপদে নিযুক্ত হন।

এবারে ৫ আশ্বিন [21 Sep] থেকে ৩ কার্তিক [20 Oct] পূজাবকাশ ঘোষিত হয়। মহালয়ার পরের দিন ২ আশ্বিন [18 Sep] আশ্রমের অধ্যাপক ও ছাত্রেরা 'বিসর্জন' অভিনয় করেন। এই সময়ে রবীন্দ্রনাথ কলকাতায়, পিয়র্সন হাসপাতালের জন্য অর্থসংগ্রহের উদ্দেশ্যে ৩০ ভাদ্র ও আরও দু'দিন জোড়াসাঁকো বাড়িতে 'শেষ বর্ষণ' অভিনীত হয়। বিসর্জন-এ অংশ নেন সন্তোষচন্দ্র মজুমদার [গোবিন্দমাণিক্য], সুজিতকুমার মুখোপাধ্যায় [নক্ষত্ররায়], প্রমথনাথ বিশী [রঘুপতি], বিভূতিভূষণ গুপ্ত [জয়সিংহ], শান্তিময়[দেব] ঘোষ [চাঁদপাল], ধীরেন্দ্রনাথ বসু [নয়নরায়], নিত্যানন্দবিনোদ গোস্বামী [মন্ত্রী], অমূল্য মুখোপাধ্যায়, সত্যেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সুধীরকুমার আচার্য, সাগরময় ঘোষ, সলিলচন্দ্র মজুমদার, জ্যোতিশচন্দ্র ভট্টাচার্য, তারকনাথ লাহিড়ী, প্রসাদকুমার রায় প্রভৃতি জনতার ভূমিকায় অভিনয় করেন।

এইদিনই বিকেলে আনন্দমেলা অনুষ্ঠিত হয়। এই বার্ষিক প্রথাটির মর্মকথা বিবৃত হয়েছে আশ্বিন-সংখ্যা শান্তিনিকেতন-এ [পৃ ২০০] :

ইহাতে আনন্দের দিক ছাড়া একটা শিক্ষার দিক আছে। রীতিমত কেনাবেচার মধ্য দিয়া ছেলেমেয়েরা গণিতের ব্যবহারিক অংশটা শিখিতে সাহায্য পায়। অর্থ সঞ্চয় করা একটা মূল্যবান বিদ্যা— কিন্তু কেমন করিয়া অর্থ হিসাব করিয়া খরচ করিতে হয় সে শিক্ষাও একান্ত আবশ্যকীয়। বস্তুত হিসাব মত খরচ করিতে না জানিলে হিসাব জমাইয়া লাভ নাই। খরচের অঙ্ক নাই বলিয়াই কুবেরের ধন তাহার ঐশ্বর্য্য নহে। আমাদের দেশে টাকার অভাব তত বড় কথা নহে যেমন যথার্থরূপে টাকা খরচ করিতে জানিবার বুদ্ধির অভাব। বদ্ধজলে দেশের স্বাস্থ্য বৃদ্ধি না করিয়া হানি করে — স্বাস্থ্যজনক হইতেছে সচল জল; টাকা সম্বন্ধেও সেই কথা— বদ্ধ টাকাতে দেশের শক্তিকে বাধাগ্রস্ত করিয়া মারী সৃষ্টি করে। এখন আমাদের বাঞ্ছনীয় হইতেছে টাকার সচল ও মুক্ত গতি যাহা কোন আকাশ-কালো-করা কলের শয়তানি বা প্রজার রক্ত-জল-করা জমিদারির খাজাঞ্জি খানায় রুদ্ধ না হইয়া অনায়াসে রক্তবাহী শিরা-উপশিরার মত দেশের ঘরে ঘরে প্রাণের পর্য্যাপ্তিকে বহন করিবে।

অনেকবার দিন বদলের পরে ঠিক হয়েছিল, রবীন্দ্রনাথ 1 Aug প্রথমে চিকিৎসার জন্য সুইজারল্যাণ্ডে ও পরে ইতালিতে যাবেন। কিন্তু অসুস্থ হয়ে পড়ায় ডাঃ নীলরতন সরকারের নির্দেশে তমার যাত্রা বাতিল হয়। নবরাত্রের সময়ে কোকনাদে তাঁর একটি অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার কথা ছিল, তিনি ঠিক করেন কয়েকদিন পিঠাপুরমের রাজার আতিথ্য ভোগ করে তিনি কোকনাদে যাবেন। কিন্তু হাওড়া স্টেশনে ভিড়ের জন্য তিনি ট্রেনে উঠতে না পেরে শান্তিনিকেতনে ফিরে আসেন।

আগের বারে ইতালিতে থাকার সময়ে রোম বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচ্যবিদ্যার অধ্যাপক কার্লো ফর্মিকিকে রবীন্দ্রনাথ তিন মাসের জন্য বিশ্বভারতীর অতিথি-অধ্যাপক পদে যোগ দেওয়ার জন্য আহ্বান জানান। তাঁর আরও-কিছু দাবি ছিল; বিশ্বভারতীতে ইতালীয় ভাষা ও সাহিত্য অধ্যাপনার জন্য অপেক্ষাকৃত স্থায়ী একজন অধ্যাপক এবং ইতালীয় সাহিত্য ও শিল্পকলার একটি উৎকৃষ্ট পুস্তকসংগ্রহ। ইতালির সর্বময় কর্তা বেনিতো মুসোলিনির সহযোগিতায় রবীন্দ্রনাথ ও ফর্মিকির দুটি আকাঙ্ক্ষাই পূর্ণ হয়। বিশ্বভারতীর চতুর্থ বিদেশি অতিথি-অধ্যাপক ফর্মিকি 21 Nov [5 অগ্র] শান্তিনিকেতনে এলে তাঁকে বিপুল সংবর্ধনা জানানো হয়। ফর্মিকি বেশিদিন এখানে ছিলেন না, তাঁকে ১৯ ফাল্গুন [3 Mar] উত্তরায়ণে ও ২৫ ফাল্গুন [9 Mar] কলকাতায় বিদায়-সংবর্ধনা জানানো হয়। অপর অধ্যাপক তুচ্চি কবে আসেন নির্দিষ্ট করে জানা যায়নি, তবে অগ্র-সংখ্যা শান্তিনিকেতন-এই জানানো হয় : 'বিশ্বভারতীতে ইতালীয়ান ভাষা শিখাইবার জন্য ইতালি গভর্ণমেন্ট অধ্যাপক টুচিকে প্রেরণ করিয়াছেন। অধ্যাপক টুচি বিশ্বভারতীতে দুইটি শ্রেণীতে উক্ত ভাষা অধ্যাপনা করিতেছেন— তিনি আশা করেন চারিমাসের মধ্যে ছাত্ররা চলনসই রকমের শিখিতে পারিবে।'

ফর্মিকির আগমনের অব্যবহিত পরে সস্ত্রীক লর্ড লিটন ৮ অগ্র [24 Nov] শান্তিনিকেতনে এসে বিশ্বভারতী ও শ্রীনিকেতনের কাজকর্ম পরিদর্শন করেন। আমরা আগেই বলেছি, তাঁর বিদায়গ্রহণের সময়ে রবীন্দ্রনাথ তাঁর হাতে একটি 'নোট' তুলে দেন 'in which you asked Government to grant Visvabharati a Charter as a University enabling it to confer its own degrees.' লিটন অবশ্য রবীন্দ্রনাথের সেই অনুরোধ কয়েকটি কারণে রক্ষা করতে পারেননি। তবে ইতিমধ্যেই শিক্ষাভবন বা কলেজবিভাগের নিয়মিত ছাত্ররা উপযুক্ত বিবেচিত হলে 'মধ্য' ও 'উপাধি' নামে অভিজ্ঞানপত্র লাভ করত, যথাক্রমে আই.এ ও বি.এ পরীক্ষায় বসার ছাড়পত্র ছিল এই দুটি অভিজ্ঞান— কিন্তু এগুলি সম্ভবত সমাবর্তন সভার মতো কোনো অনুষ্ঠান করে ছাত্রদের দেওয়ার পদ্ধতি তখনও প্রচলিত হয়নি।

লর্ড সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ শান্তিনিকেতনের পাশ্ববর্তী রাইপুরের জমিদার ছিলেন। শ্রীনিকেতনের গ্রামোন্নয়নের পরিকল্পনার কথা শুনে তিনি জ্যেষ্ঠপুত্র অরুণচন্দ্র-সহ ২৫ অগ্র [11 Dec] শান্তিনিকেতনে এসে দুদিন বিশ্বভারতী ও শ্রীনিকেতনের কাজ পরিদর্শন করে ফিরে গিয়ে লেখেন : 'শান্তিনিকেতন ও শ্রীনিকেতনের কার্য্যপ্রণালী চক্ষে দেখে যে কি প্রীতিলাভ করলাম তাহা বলে উঠিতে পারি না। ···আমি যে সামান্য যোগ দিব বলেছিলাম তার প্রথমাংশ পাঁচ হাজার টাকার [চেক] এই পত্রমধ্যে পাঠাই। ভক্তি, শ্রদ্ধা ও প্রীতির উপহার স্বরুপ গ্রহণ করিলে চরিতার্থ হইব। ভরসা করি মার্চ। এপ্রিল মাস মধ্যে দ্বিতীয় অৰ্দ্ধ আপনার হাতে দিয়া অঙ্গীকার পালন করিতে পারিব।' 28 Mar 'বিশ্বভারতী ছাত্রনিবাসের জন্য বাকী দেয়···পাঁচ হাজার টাকার একখানি চেক পাঠাইলাম।' তিনি এই পত্রে অনুরোধ করেন, 'রাইপুরটি যেন শ্রীনিকেতনের একটি শাখাস্বরূপ গণ্য হয়। খরচপত্র আমিই দিব।' বৈশাখ ১৩৩৩-সংখ্যা শান্তিনিকেতন-এ রাইপুর গ্রামের উন্নয়নকর্মের বিস্তৃত

বিবরণ মুদ্রিত হয়। এই সংখ্যাতেই জানানো হয়, ছাত্রাবাসটির নির্মাণকার্য শুরু হয়েছে। সুরেন্দ্রনাথ করের পরিকল্পনায় নির্মিত এই ভবনটি 'সিংহসদন' নামে পরিচিত হয়।

স্থায়ী বা অস্থায়ী বেশ-কিছু অধ্যাপক শান্তিনিকেতনের কাজে যোগ দেন। গুরুদয়াল মল্লিক ইতিপূর্বে তিনবার আশ্রমের কাজে যোগ দেন ও বিদায় গ্রহণ করেন। তিনি শ্রাবণ মাসে চতুর্থবার করাচি থেকে এসে কাজে যোগ দেন। মরিসও অনেকদিন আশ্রমে ছিলেন না, অ্যান্ডরুজের অনুপস্থিতিতে তিনি রবীন্দ্রনাথের সেক্রেটারির পদ গ্রহণ করেন।

মাদ্রাজি ক্রিশ্চান আরিয়াম ই. উইলিয়াম্‌স্ পুজোর ছুটির পরে এখানে কর্মগ্রহণ করেন। ইনি পৃথিবীর বহু দেশ পরিভ্রমণ করে শিশুশিক্ষা সম্পর্কে অভিজ্ঞতা অর্জন করেন, এখানেও তিনি সেই দায়িত্বই গ্রহণ করেন।

সন্তোষচন্দ্র মজুমদারের জ্যেষ্ঠা ভগ্নী রমা দিনেন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথের শিক্ষায় রবীন্দ্রসংগীতে বিশেষ পারদর্শিনী হয়ে উঠেছিলেন, নূতন পাঠবৎসরের সূচনায় তাঁকে সংগীত বিভাগের অধ্যাপিকা পদে নিয়োগ করা হয়।

ডাঃ কুনহন রাজা নামক একজন অধ্যাপক জার্মানি ও অক্সফোর্ডে বৈদিক শাস্ত্র সম্পর্কে অধ্যয়ন করে এখানে শিক্ষাভবনে এই বিষয়ে বক্তৃতা করেন। মিসেস এ. জে. ইলিয়ট নামক এক ইংরেজ মহিলা পালি, সংস্কৃত ও বাংলা ভাষা শিক্ষার জন্য এখানে কিছুদিন কাটিয়ে যান। বিভূতিভূষণ গুপ্ত সাময়িকভাবে বিদ্যালয়ের কাজ ছেড়ে দিলেও বিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্র অনাথনাথ বসু আশ্রমের কাজে যোগ দেন। সত্যজীবন পাল পাঠভবনে ইংরেজির অধ্যাপকরূপে যোগ দেন। বিদ্যালয় বিভাগটিকে 'পাঠভবন' নামে অভিহিত করার প্রথাটি এই বৎসর থেকেই প্রচলিত হয়— পাঠভবন, শিক্ষাভবন ও বিদ্যাভবন নামগুলির প্রচলনও এই সময়েই— অবশ্য বর্তমানে শেষ দুটি নামের অর্থপরিবর্তন ঘটেছে।

৭ পৌষ [মঙ্গল 22 Dec] আশ্রমের চতুর্বিংশতিতম উৎসব সমারোহ সহকারে পালিত হয়। এবারে রবীন্দ্রনাথ উপস্থিত ছিলেন বলে অতিথির সংখ্যাও ছিল বেশি। প্রায় দুইশত পুরুষ ও পঞ্চাশজন মহিলা অতিথির জন্য নয়টি তাঁবু, শান্তিনিকেতন অতিথিশালা ও ছাত্রাবাসের দুটি গৃহের ব্যবস্থা হয়; মহিলা অতিথিদের থাকবার ব্যবস্থা ছাত্রীনিবাসের নিকটবর্তী একটি বাড়িতে হয়েছিল। ৭ই প্রাতে রবীন্দ্রনাথ যে-উপাসনা করেন, সেটি 'মন্দির' নামে মাঘ-সংখ্যা শান্তিনিকেতন-এ ও 'শুভইচ্ছা' নামে ফাল্গুন-সংখ্যা প্রবাসী-তে মুদ্রিত হয়। 'ধ্বনিল আহ্বান মধুর গম্ভীর প্রভাত অম্বর মাঝে' এই নূতন গানটি এই উপলক্ষে গীত হয়। মন্দির শেষ হলে সকলে মিলে 'কর তাঁর নাম গান' গানটি গেয়ে ছাতিমতলা প্রদক্ষিণ করেন।

এইদিন দুপুরে আদিত্যপুর গ্রামের যাত্রাদল 'আদিশূর' পালাটি অভিনয় করে; ৮ই রাত্রে এই দলটি 'যুগলবীর' পালাটি পরিবেশন করে। ৭ই রাত্রে আতসবাজি পোড়ানো হয়।

৮ই পৌষ প্রাতে আম্রকুঞ্জে ইন্দুভূষণ সেনের সভাপতিত্বে প্রাক্তন ছাত্রদের সম্মিলনসভায় প্রায় ত্রিশজন উপস্থিত ছিলেন। তৎপরে রবীন্দ্রনাথ তাঁর বক্তব্য প্রকাশ করেন। এর পরে কার্যকরী সভার অধিবেশনে আশ্রমিক সঙেঘর সম্পাদক সন্তোষচন্দ্র মজুমদার, ধনরক্ষক গোবিন্দচন্দ্র চৌধুরী, পত্রিকা-সম্পাদক প্রমথনাথ বিশী, পত্রিকার কার্যাধ্যক্ষ যদুকিশোর চক্রবর্তী ও সংসদের প্রতিনিধি নির্বাচিত হন অচ্যুতচন্দ্র সরকার। দুপুরে মেলাতে নানারকম খেলা ও ব্যায়াম প্রদর্শিত হয়, রাত্রে আতসবাজি ও বায়োস্কোপের ব্যবস্থা ছিল, ম্যাডান কোম্পানি স্বেচ্ছায় সিনেমা দেখাবার ভার নিয়ে আশ্রমের কৃতজ্ঞতাভাজন হন।

৯ই প্রাতে আম্রকুঞ্জে বিশ্বভারতী পরিষদের বার্ষিক অধিবেশন হয়। সংসদের সদস্যগণ-সহ প্রতিষ্ঠাতা-আচার্য রবীন্দ্রনাথ সভায় প্রবেশ করলে বৈদিক স্বস্তিবচনের মধ্যে সভারম্ভ হয়। রবীন্দ্রনাথ প্রথমে তাঁর বক্তব্য প্রকাশ করেন। পরে অধ্যাপক ফর্মিকি, ক্ষিতিমোহন সেন, ইন্দুভূষণ সেন, বিধুশেখর শাস্ত্রী ও হায়দ্রাবাদের ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড হাকিম বিশ্বভারতীর আদর্শ সম্বন্ধে নিজেদের মত প্রকাশ করেন।

১০ই প্রাতে খ্রিষ্টোৎসব উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথ মন্দিরে ভাষণ দেন।

ডাচ-দম্পতি Arnold Adrian Bake ও তাঁর স্ত্রী ভারতীয় সংগীতশাস্ত্র বিষয়ে গবেষণার জন্য হল্যান্ডের কার্ন ইনস্টিট্যুট থেকে বৃত্তি নিয়ে সম্ভবত পৌষ-উৎসবের আগে শান্তিনিকেতনে এসে ভারতীয় সংগীত শিক্ষা করছেন ও য়ুরোপীয় সংগীতের পাঠ দান করছেন। তাঁরা এখানে বাঙালি পোশাক পরতেন, তাঁদের দেশীয় নামকরণ করা হয় আরুণি ও করুণা।

পৌষোৎসবের পূর্বেই বিদ্যালয়ের বার্ষিক পরীক্ষাদি শেষ হয়ে গিয়েছিল, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার জন্য যে বিশাল পরীক্ষার্থী-বাহিনী এবার প্রেরিত হচ্ছিলেন, তাঁদের মধ্যে পরবর্তীকালে রবীন্দ্রচর্চা ও নানা কারণে খ্যাতিমান অনেকে ছিলেন বলে তাঁদের তালিকাটি উদ্ধৃত করছি : আবদুল মান্নাফ, কার্ষণজি, চন্দ্রকান্ত প্যাটেল, ক্ষেমজি, সুশীল দেববর্মা, পরেশনাথ বিশী, কানাইলাল সরকার, নির্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, নীহাররঞ্জন চৌধুরী, অনন্ত গড়করি, সত্যেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সৈয়দ মুজতবা আলি, পুলিনবিহারী সেন, শেষ, প্রহ্লাদ, কৃষ্ণ, অমিতা চক্রবর্তী, মমতা সেন, তাপসী দাস, তারকনাথ লাহিড়ী ও সুনীতিকুমার মণ্ডল। সন্তোষচন্দ্র মজুমদারের ভগ্নী রেখা এবার আই.এ পরীক্ষায় অবতীর্ণা হবেন।

এই বৎসর শান্তিনিকেতন আশ্রমকে অনেকগুলি মৃত্যুর আঘাত সহ্য করতে হয়েছে, তার মধ্যে অন্যতম ৪ মাঘ সোমবার শেষরাত্রে [19 Jan 1926] 'বড়োদাদা' দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ৮৭ বৎসর বয়সে মহাপ্রয়াণ। পিতার মৃত্যুর পরে 1906 থেকে তিনি শান্তিনিকেতনের প্রায় স্থায়ী অধিবাসী। পাণ্ডিত্যের আকর্ষণে তিনি যেমন দেশবিদেশের বহু মানুষকে টেনে এনেছেন, তেমনি তাঁর ব্যক্তিসান্নিধ্যের লোভে আশ্রমের আবালবৃদ্ধবনিতাও তাঁর কাছে গিয়েছেন— পাখি, কাঠবিড়ালিও তাঁর খাবারের ভাগ থেকে বঞ্চিত হয়নি। তাঁর শূন্যতা কোনোদিন পূর্ণ হওয়া সম্ভব নয়!

১৪ মাঘ আশ্রমে তাঁর আদ্যশ্রাদ্ধ যথাশাস্ত্র অনুষ্ঠিত হয়। তাঁর পুণ্যস্মৃতির উদ্দেশে একটি কূপখননের ব্যবস্থা হয়। 'এতদুপলক্ষে গত ২০শে মাঘ বুধবার সেখানে একটী বৃহৎ ভোজের আয়োজন করা হইয়াছিল। উক্ত দিবস সমাগত দরিদ্রদিগকে ভোজনানন্তে এক-একখানি কম্বল উপহার দেওয়া হইয়াছে।'

বিশ্বভারতীর প্রতিষ্ঠাতা-সদস্যদের অন্যতম দিল্লির সেন্ট স্টিফেন্স কলেজের অধ্যক্ষ সুশীলকুমার রুদ্র 30 Jun [৫ শ্রাবণ] পরলোকগমন করেন। রবীন্দ্রনাথের একসময়ের ঘনিষ্ঠ বন্ধু নাটোরের মহারাজা জগদিন্দ্রনাথ রায়ের মাত্র ৫৮ বৎসর বয়সে মৃত্যু হয় ২১ পৌষ [5 Jan 1926] তারিখে। সেই সময়ে বাংলা গবর্মেন্টের কৃষি-শিল্প বিভাগের সেক্রেটারি গুরুসদয় দত্তের পত্নী সরোজনলিনী মাত্র ৩৭ বৎসর বয়সে মারা যান ৫ মাঘ [19 Jan] তারিখে। আশ্রমের দীর্ঘ ২৫ বৎসরের চিকিৎসক হরিচরণ মুখোপাধ্যায় গত আশ্বিন মাসে হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যান। আশ্রমের প্রাক্তন ছাত্র শ্যামকান্ত গোবিন্দ সরদেশাই বার্লিনে রসায়নে পি. এইচ.ডি ডিগ্রি লাভ করে সেখানেই যক্ষ্মারোগে প্রাণত্যাগ করেন। আশ্রম ও বিদেশ থেকে পিতামাতাকে লেখা তাঁর পত্রের সংকলন 'শ্যামকান্তচী পত্রেঁ' গ্রন্থের ভূমিকা লিখে দেন রবীন্দ্রনাথ।

কলকাতার চাইনিজ অ্যাসোসিয়েশন বিশ্বভারতীতে চিনা সাহিত্য অধ্যাপনার জন্য চৈনিক অধ্যাপক মি. লিমের কাছে ৪০০্ দিয়েছেন। সিঙ্গাপুরের চিনা সভা একই উদ্দেশে বিশ্বভারতীকে তিন হাজার ডলার দিতে প্রতিশ্রুত হয়েছে, ফলে উক্ত অধ্যাপককে আরও কয়েকমাস এখানে রাখা সম্ভব হবে।

বোম্বাইয়ের পার্শি সমাজের আনুকূল্যে বিশ্বভারতী ৩৭০০০্ টাকার একটি অনুদান লাভ করে Zorastrian Fund নামে, রবীন্দ্রনাথ ও অ্যান্ডরুজ তার ট্রাস্টি মনোনীত হন। 30 Oct 1925-এর কর্মসমিতির অধিবেশনে জানানো হয় অধ্যাপক Grof. Wilh. Geiger 1926 বৎসরের জন্য উক্ত পদ গ্রহণে লিখিত সম্মতি জানিয়েছেন— কিন্তু তিনি আসেননি, অতঃপর অধ্যাপক তারাপুরওয়ালা 1928-এ উক্ত পদে যোগ দিয়ে কয়েকটি বক্তৃতা করেন।

রবীন্দ্রনাথের ভাগিনেয়ী সরলা দেবী বিশ্বভারতীকে অনুরোধ করেন 'ভারতী' মাসিক পত্রিকার দায়িত্ব যেন তাঁরা গ্রহণ করেন এবং আশ্চর্যের বিষয় কর্মসমিতি সেই প্রস্তাব গ্রহণ ক'রে 26 Aug 1925 সংসদের কাছে সুপারিশ করে এই দায়িত্ব গ্রহণের জন্য, সংসদের সম্মতি বা অসম্মতির কোনো সিদ্ধান্ত আমাদের নজরে আসেনি— ১৩৩৩ বঙ্গাব্দে সুবর্ণজয়ন্তী পালন ক'রে পঞ্চাশ বছরের বৃদ্ধা 'ভারতী' সম্ভবত কার্তিক-সংখ্যা প্রকাশের পর ইহলীলা সংবরণ করে। হেমেন্দ্রকুমার রায় জানিয়েছেন, তাঁর অনুরোধে আনন্দবাজার পত্রিকা-র সুরেশচন্দ্র মজুমদার পত্রিকাটি পরিচালনা করতে সম্মত হয়েছিলেন, কিন্তু সরলা দেবী স্বত্বের বিনিময়ে যত টাকা চেয়েছিলেন তাতে রাজি না হওয়ার ফলে সেই চেষ্টাও ব্যর্থ হয়।[১৮১] বিশ্বভারতীর ক্ষেত্রেও তিনি অনুরূপ কোনো দাবি করেছিলেন কি না কর্মসমিতি বা সংসদের বিবরণীতে তার উল্লেখ নেই।

18 Jul 1925 কলকাতায় অনুষ্ঠিত কর্মসমিতির একাদশ অধিবেশনে 'for the mechanical productions rights of certain songs of Rabindranath Tagore' সম্পর্কে একটি চুক্তিপত্রের বিষয়ে আলোচনা হয়। তবে শেষপর্যন্ত এটি স্বাক্ষরিত হয় 5 Oct 1926 [১৮ আশ্বিন ১৩৩৩] তারিখে— রবীন্দ্রনাথ তখন বার্লিনে অবস্থান করছেন।

গত বৎসরের মতো এবারে শান্তিনিকেতন পত্রিকায় স্বতন্ত্রভাবে 'শ্রীনিকেতন সংবাদ' প্রকাশিত হয়নি, সেই কারণেই সেখানকার কাজকর্মের বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া সম্ভবপর নয়। তবে সেখানকার কাজ দেখে অনেকেই যে-রকম প্রশংসা করেছেন, তাতে মনে হয় কাজ ভালোই চলছিল। 31 May 1925 [১৭ জ্যৈষ্ঠ] ভোরে গান্ধীজি শ্রীনিকেতন পরিদর্শনে যান ও প্রায় দু'ঘণ্টা সেখানে ছিলেন। 'ঐ স্থানে গোপালনের যে ব্যবস্থা আছে তাহা দেখিয়া মহাত্মা খুব সন্তোষ লাভ করেন। মহাত্মা কর্ম্মীদের সঙ্গে এই বিষয়ে অনেক প্রশ্ন করেন।'

লর্ড লিটনও 24 Nov [৮ অগ্র] সস্ত্রীক শান্তিনিকেতনের সঙ্গে শ্রীনিকেতনও পরিদর্শন করে প্রীত হন।

জলাভাব এই অঞ্চলের একটি প্রধান সমস্যা। এর আগে ১৩২৯ সালের গ্রীষ্মে আমেরিকায় শিক্ষিত এঞ্জিনিয়র অখিলচন্দ্র চক্রবর্তীর নেতৃত্বে আশ্রমবাসীরা কয়েকদিন দিবারাত্রি পরিশ্রম করেও নলকূপ খনন করে জল উত্তোলনে ব্যর্থ হন। 30 Jan 1924-এ শ্রীনিকেতন সমিতির অধিবেশনে সেখানে একটি নলকূপ খননের উদ্দেশ্যে তিন হাজার টাকা মঞ্জুর করা হয়। 15 May-র অধিবেশনে জানানো হয়, আর পনেরো দিনের মধ্যে নলকূপটি কাজ শুরু করবে, সুতরাং টাকাটি মেসার্স স্কট অ্যান্ড স্যাক্সবি-কে দিয়ে দেওয়া যেতে পারে। কিন্তু শেষপর্যন্ত কাজটি কতটা সফল হয়েছিল বলা শক্ত। 3 Jul 1926-এর অধিবেশনে বলা হয়, বিশেষজ্ঞদের মতে

কিছুদিনের জন্য নলকূপটি যদি অবিরত চালানো হয় তাহলে সাফল্যের সম্ভাবনা অধিক। তখন বৎসরের শেষাবধি কাজটি চালানোর জন্য আরও ৩৫০ টাকা মঞ্জুর করা হয়েছিল, কিন্তু তার পরিণতি আমাদের জানা নেই।

19 Dec 1924 সংসদের অধিবেশনে জানানো হয়েছিল, বোম্বাইয়ের বাই হীরাবাই-এর ইচ্ছাপত্র অনুযায়ী অন্যতম ট্রাস্টি ডি.জে. ইরানি জানতে চান উইলের শর্তানুযায়ী জলাভাবগ্রস্ত কোনো অঞ্চলে গোরু ও অন্য প্রাণীদের জন্য একটি জলসত্র ও পথিকদের বিশ্রামের জন্য ছ'হাজার টাকায় একটি পান্থশালা নির্মাণ ও তার রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব নেওয়া বিশ্বভারতীর পক্ষে সম্ভব কি না, এখানে খোদাই করা থাকবে : 'This jagya (premises) has been got built by Bai Hirabai widow of Thakkar Lilladhar and daughter of Thakkar Damoderdas Nagindas for the use of cattle and warfs with a view to her spiritual benefit.' বিশ্বভারতী এই শর্তে সম্মত হয়ে পান্থশালাটি শান্তিনিকেতনে বা শ্রীনিকেতনে প্রতিষ্ঠার সংকল্প গ্রহণ করে। য়ুনাইটেড ট্রেডিং কোম্পানি প্রদত্ত ৪২০০ টাকার টেন্ডারটি গৃহীত হয় 26 Aug 1925-এর অধিবেশনে। ঐ বছরই 18 Dec-এর অধিবেশনে সুরেন্দ্রনাথ কর ও গৌরগোপাল ঘোষের অনুমোদন পাওয়া যায়, পান্থশালাটির নির্মাণ যথাযথভাবে সমাপ্ত হয়েছে। এটি অবশ্য শান্তিনিকেতনের কেন্দ্রস্থলে ত্রিমুখী পথের সংগমস্থলে নির্মিত হয়।

উল্লেখপঞ্জি

১ র-প্রতিলিপি

২ চিঠিপত্র ৫। ৫৩-৫৪, পত্র ১৫

৩ ঐ ৭। ১১৬, পত্র ৮৬

৪ আত্মস্মৃতি। ১৪০

৫ *The Complete Works of Mahatma Gandhi [CWMG]* 27 [1968]/ 60, No.

৬ রবীন্দ্র-প্রসঙ্গ ১। ৬

৭ আত্মস্মৃতি। ১৪১

৮ দেশ, শারদীয় ১৪০১। ৩৬, পত্র ৫৪

৯ চিঠিপত্র ৫। ৪৮-৫১, পত্র ১৩

১০ ঐ ১৮। ৩০৪-০৫, পত্র ১৬২।

১১ ঐ ১৮। ৩০৫-০৭, পত্র ১৬৩

১২ *Purabi/* 91, Letter 32

১৩ Ibid/91, Letter 34

১৪ রবীন্দ্রজীবনী ৩। ৪০৩

১৫ চিঠিপত্র ১৮। ৩০৩, পত্র ১৬১

১৬ দেশ, শারদীয় ১৪০১। ৩৭, পত্র ৫৫

১৭ চিঠিপত্র ১৮। ৩৬৫, পত্র ১২

১৮ বি. ভা. প., শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৭৬। ৩

১৯ *CWMG* 27/172, Letter 66

২০ Ibid 27/172।

২১ রবীন্দ্র-প্রসঙ্গ ১। ২৭৪

২২ রবীন্দ্রজীবনী ৩। ২৩৬-এ উদ্ধৃত

২৩ দ্র রবীন্দ্র-প্রসঙ্গ ১। ২৭৪-৭৫

২৪ ঐ ১। ২৭৫

২৫ র-মূল

২৬ চিঠিপত্র ৫। ২৭৭, পত্র ৯৩

২৭ ঐ ১৮। ৩১১, পত্র ১৬৬

২৮ দেশ, ১৩ আষাঢ় ১৩৮২। ৬৫৫, পত্র ৪৯

২৯ চিঠিপত্র ১৮। ৩০৮, পত্র ১৬৪

৩০ বি. ভা, প., শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৭৬। ৩

৩১ চিঠিপত্র ২। ৭৯, পত্র ২৮

৩২ দেশ, ১৩ আষাঢ় ১৩৮২। ৬৫৫, পত্র ৫০

৩৩ স্মৃতিসম্পুট ২ [১৪০৫]। ২৩-২৪

৩৪ চিঠিপত্র ১৮। ৩১১-১২, পত্র ১৬৭

৩৫ স্মৃতিসম্পুট ২। ২২

৩৬ রাণু মুখোপাধ্যায়ের জীবনালেখ্য। ১৫০-৫১

৩৭ বি. ভা, প., ভাদ্র-কার্তিক ১৩৭৭। ১৭৩ [লিপিচিত্র]

৩৮ *The Hindusthan Standard*, 16 Jun 1941 [লিপিচিত্র]

৩৯ প্রভাতচন্দ্র গুপ্ত : রবিচ্ছবি [1982]। ৩১

৪০ রবীন্দ্র-প্রসঙ্গ ১। ৫৭২

৪১ চিঠিপত্র ৫। ২৭৮, পত্র ৯৪

৪২ ঐ ৫। ২৭৯, পত্র ৯৫

৪৩ রবীন্দ্র-প্রসঙ্গ ১। ২৭৯

৪৪ ঐ ১। ২৮৫

৪৫ অহীন্দ্র চৌধুরী : নিজেরে হারায়ে খুঁজি ১ [১৮৮৪ শক]। ৪৮৩-৮৪

৪৬ রবীন্দ্র-প্রসঙ্গ ১। ১৭৭

৪৭ নিজেরে হারায়ে খুঁজি ১। ৪৮৭

৪৮ রবীন্দ্র-প্রসঙ্গ ১। ১৭৯

৪৯ দেশ, ৭ কার্তিক ১৩৮২। ৯৮৯, পত্র ১১৫

৫০ ঐ, ১৩ আষাঢ় ১৩৮২। ৬৫৫, পত্র ৪৯

৫১ আত্মস্মৃতি। ১৪৩

৫২ দেশ, ১৩ আষাঢ় ১৩৮২। ৬৫৫, পত্র ৫০

৫৩ ঐ। ৬৫৬, পত্র ৫৪

৫৪ সাময়িকপত্রে রবীন্দ্রপ্রসঙ্গ : প্রবাসী। ৮০-৮১

৫৫ আত্মস্মৃতি। ১৪৩

৫৬ *Flower Garden*/ 416-17, Letter 28

৫৭ Ibid138

৫৮ নির্মলকুমারী-প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ সংগ্রহ

৫৯ প্রবাসী, জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৪। ১৫৭

৬০ অলকা, আশ্বিন ১৩৪৯। ৪

৬১ *Flower Garden*/ 414-15, Letter 27

৬২ রবীন্দ্র-প্রসঙ্গ ১। ২৩৪

৬৩ দিনপঞ্জী। ৯৩-৯৪

৬৪ *Rolland and Tagore* [1945]/ 54, No. XII

৬৫ র-প্রতিলিপি

৬৬ দেশ, শারদীয় ১৪০৭। ২৫, পত্র ৪

৬৭ রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত রবীন্দ্র-হস্তাক্ষরে লিখিত খসড়া

৬৮ রবীন্দ্র-প্রসঙ্গ ১। ৫৭০

৬৯ রবীন্দ্রজীবনী ৩। ২৪০

৭০ রবীন্দ্র-প্রসঙ্গ ১। ১৭৮-৭৯

৭১ দেশ, ৮ ফাল্গুন ১৩৯৩। ৬৩

৭২ রবীন্দ্রসংগীত। ২৩৮

৭৩ রবীন্দ্র-প্রসঙ্গ ১। ১৮০

৭৪ ঐ ১। ১৮১

৭৫ ঐ ১। ৪৪৫

৭৬ চিঠিপত্র ৫। ৫৪, পত্র ১৬

৭৭ ঐ ৫। ২৮০, পত্র ৯৬

৭৮ ঐ ৪। ১১১-১২, পত্র ৪৫

৭৯ ঐ ৪। ১১৩, পত্র ৪৬

৮০ র-প্রতিলিপি

৮১ ভারতে জাতীয়তা ২। ২৯৮-৯৯

৮২ চিঠিপত্র ৫। ৫৬-৫৭, পত্র ১৯

৮৩ ঐ ৫। ৫৫-৫৬, পত্র ১৮

৮৪ র-মূল

৮৫ চিঠিপত্র ১১। ৪৪, পত্র ৩৩

৮৭ রবীন্দ্র-প্রসঙ্গ ১। ২০২

৮৮ ঐ ১। ১০২-০৩

৮৯ ঐ ১। ১০৩

৯০ ঠাকুর নবকুমার সিংহ, ‘স্মৃতিভারে আমি পড়ে আছি’ : রবীন্দ্রনাথ ও ত্রিপুরা [১৩৯৩]। ২৪৪

৯১ চিঠিপত্র ১২। ২৫০-৫১, পত্র ৫

৯১ক বারিদবরণ ঘোষ-সম্পাদিত ‘রবীন্দ্র-রচিত ভূমিকা’ [১৪০৯]। ৬৫

৯১খ ঐ। ৬৬

৯২ দেশ, সাহিত্য ১৩৮৩। ১০, পত্র ৩

৯৩ চিঠিপত্র ৫। ২৮০, পত্র ৯৭

৯৪ উত্তরা, আশ্বিন ১৩৪৮। ১৬৫

৯৫ ‘পত্রবিনিময়' : দেশ, সাহিত্য ১৩৭১। ৬৩-৬৪

৯৬ রবীন্দ্র-প্রসঙ্গ ১। ৩৬০-৬১

৯৭ রবীন্দ্রজীবনী ৩। ২৫২

৯৮ নিজেরে হারায়ে খুঁজি ১। ৫০২

৯৯ রবীন্দ্রবীক্ষা ১৪। ৪২-৪৩, পত্র ১৫

১০০ গোপালচন্দ্র রায় : ঢাকায় রবীন্দ্রনাথ [১৪০৬, দ্বিতীয় মুদ্রণ]। ৩৫

১০১ চিঠিপত্র ১৪ [১৪০৭]। ৯৯-১০০, পত্র ৮৭

১০২ দেশ, ২৫ পৌষ ১৩৯৩। ২৬, পত্র ৫৭

১০৩ ঢাকায় রবীন্দ্রনাথ। ৩৭

১০৪ রবীন্দ্র-প্রসঙ্গ ১। ৫৭১-৭২
১০৫ দ্র ‘পত্রাবলী’ : দেশ, শারদীয় ১৪০৭। ৩৮
১০৬ ঐ। ৩৪, পত্র ১৬
১০৭ ড সনৎকুমার বাগচী : রবীন্দ্রনাথ ও কয়েকজন রাজপুরুষ [১৩৯৪]। ৫৯-৬০
১০৮ ঐ। ৯৭
১০৯ ঐ। ১০০
১১০ রবীন্দ্র-প্রসঙ্গ ১। ১৮৮
১১১ ঢাকায় রবীন্দ্রনাথ। ৩৮
১১২ রবীন্দ্রজীবনী ৩। ২৫৩
১১৩ র-মূল
১১৪ রবীন্দ্র-প্রসঙ্গ ১। ৪৪৬
১১৫ ঢাকায় রবীন্দ্রনাথ। ৪৫
১১৬ ঐ। ৪৩
১১৭ ঐ। ৪৪
১১৮ দ্র ড রমেশচন্দ্র মজুমদার : জীবনের স্মৃতিদীপে [1978]। ৮৪, ১৯৭
১১৯ রবীন্দ্র ভাবনা, Jan 1984/২, পত্র ৩
১২০ রবীন্দ্র-প্রসঙ্গ ১। ৪৪৭
১২১ জীবনের স্মৃতিদীপে। ৮৩-৮৪
১২২ ঢাকায় রবীন্দ্রনাথ। ৫৩
১২৩ ঐ। ৫৪; রবীন্দ্র-প্রসঙ্গ ১। ৩৫৭-৫৮
১২৪ রবীন্দ্র-প্রসঙ্গ ১। ৪৫৭
১২৫ ঢাকায় রবীন্দ্রনাথ। ৫৬-৫৭; নলিনীকান্ত ভট্টশালী, ‘ঢাকায় রবীন্দ্রনাথ’ : শনিবারের চিঠি, আশ্বিন ১৩৪৮ থেকে উদ্ধৃত
১২৬ ঐ। ৬১
১২৭ ঐ। ৬২
১২৮ জীবনের স্মৃতিদীপে। ৮৬-৮৭
১২৯ ঢাকায় রবীন্দ্রনাথ। ৬৩
১৩০ ঐ। ৬৭
১৩১ ঐ। ৬৫
১৩২ দেশ, সাহিত্য ১৩৬৬! ৮২
১৩৩ জীবনের স্মৃতিদীপে। ২০৫

১৩৪ দ্র ঢাকায় রবীন্দ্রনাথ! ৬৮

১৩৫ দ্র আনন্দবাজার পত্রিকা, ৫ ফাল্গুন; রবীন্দ্র-প্রসঙ্গ ১। ৪৬৪

১৩৬ দ্র ঐ, ১২ ফাল্গুন; রবীন্দ্র-প্রসঙ্গ ১। ৪৬৮-৭১; সৌরভ, ফাল্গুন। ২৭-২৯

১৩৭ ঐ, ১০ ফাল্গুন; ঐ ১। ৪৬৭

১৩৮ ঐ, ১২ ফাল্গুন; ঐ ১। ৪৭৮

১৩৯ ঐ, ১০ ফাল্গন; ঐ ১। ৪৭৭

১৪০ ঐ, ১১ ফাল্গুন; ঐ ১। ৪৭৭-৭৮

১৪১ দ্র ঐ, ২৫ ফাল্গুন; ঐ ১। ৪৮১-৮২

১৪২ ঐ, ৪ চৈত্র; ঐ ১। ৪৮৪-৮৫

১৪৩ হরিদাস ভট্টাচার্য, 'আগরতলায় রবীন্দ্রনাথ' রবীন্দ্রনাথ ও ত্রিপুরা। ২৮৭

১৪৪ চিঠিপত্র ১১। ৪৫, পত্র ৩৪

১৪৫ রবীন্দ্রনাথ ও ত্রিপুরা। ২৯০

১৪৬ ঐ। ২৭৩-৭৪

১৪৭ *Flower Garden*/ 426, Letter 32

১৪৮ রবীন্দ্রনাথ ও ত্রিপুরা। ২৮৮

১৪৯ রবীন্দ্রজীবনী ৩। ২৬০

১৫০ রবীন্দ্র-প্রসঙ্গ ১। ৪৮৫

১৫১ রবীন্দ্রজীবনী ৩। ২৬০; পাদটীকা ১

১৫২ র-প্রতিলিপি

১৫৩ দ্র জীবনের স্মৃতিদীপে। ২০৬

১৫৪ রবীন্দ্র-প্রসঙ্গ ১। ২৩৫

১৫৫ অন্তরঙ্গ রবীন্দ্রকথা। ৩০

১৫৬ র-মূল

১৫৭ দেশ, ৩১ আশ্বিন ১৩৮২। ৯০৭, পত্র ১১৪

১৫৮ চিঠিপত্র ১২। ২৫১, পত্র ৬

১৫৯ র-প্রতিলিপি

১৬০ সুশোভনচন্দ্র সরকার : প্রসঙ্গ রবীন্দ্রনাথ [1983]

১৬১ নির্মলকুমারী মহলানবিশ : বাইশে শ্রাবণ [১৩৭৩]। ৩৫

১৬২ ঐ : 'পত্রাবলী', দেশ, ১৯ কার্তিক ১৩৬৭। ২১-২২

১৬৩ ঐ। ২১, পত্র ৪

১৬৪ ‘আলাপ-আলোচনা’ : সংগীতচিন্তা ২৮। ৭৮০

১৬৫ রবীন্দ্রজীবনী ৩। ২৬৩

১৬৬ চিঠিপত্র ৫। ২৮১, পত্র ৯৮

১৬৭ দেশ, ১৯ কার্তিক ১৩৬৭। ২১, পত্র ৫

১৬৮ চিঠিপত্র ৫। ২৮২, পত্র ৯৯

১৬৯ ঐ ৫। ২৮৩-৮৪, পত্র ১০০

১৭০ দেশ, শারদীয় ১৩৯৮। ৪৭, পত্র ৫২

১৭১ ঐ, সহিত্য ১৩৯০। ৯, পত্র [৯]

১৭২ ঐ, শারদীয় ১৪০১। ১৭, পত্র ৫

১৭৩ ইন্দিরা দেবী চৌধুরানী : স্মৃতিসম্পুট ২ [১৪০৫]। ২৪ [অনাথনাথ দাস-সম্পাদিত]।

১৭৪ ড অমলেশ ত্রিপাঠী : স্বাধীনতা সংগ্রামে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস [১৩৯৭]। ১৩০

১৭৫ ঐ। ১৩০-৩১

১৭৬ *CWMG* 29 [1968]/341-42, No. 75

১৭৭ ভারতে জাতীয়তা ২। ২৭৪-৭৫

১৭৮ শান্তা দেবী : ভারত মুক্তিসাধক রামানন্দ ও অর্দ্ধশতাব্দীর বাংলা। ১৮৩

১৭৯ চিঠিপত্র ১২। ৩৬৩-৬৪, পত্র ৪

১৮০ ঐ ১২। ৩৬৫, পত্র ৫

১৮১ হেমেন্দ্রকুমার রায় : যাঁদের দেখেছি ২। ২৩; সুনীল দাসের ‘ভারতী : ইতিহাস ও রচনাপঞ্জী’-তে [পৃ ৪৬] উদ্ধৃত।

নির্দেশিকা

ব্যক্তি

গ্রন্থ ও পত্রিকা

[পত্রিকার নাম বক্রাক্ষরে]

রচনার শিরোনাম

কবিতা বা গানের প্রথম ছত্র

বিবিধ

Zorastrian Fund ৩১৭